যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

বৈরাগ্য-প্রকরণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

শ্যামপুকুর—২ নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা;

দি গ্রেট ইষ্টারণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৪৩ নং গ্রে-ষ্ট্রীট।

দাস, বসু এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৫ সাল।

ভূমিকা।

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার কৃপায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য-প্রকরণ দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। শুদ্ধ চৈতন্যমূর্ত্তি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কিরূপে সাধারণ মানবের ন্যায় অজ্ঞানতায় জড়িত হইয়াছিলেন, কিরূপেই বা তাঁহার অন্তঃকরণে বিষয়বিরক্তিজনক বৈরাগ্য আসিয়া উদিত হইয়াছিল এবং বৈরাগ্যোদয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সমীপে তিনি যে সকল বৈরাগ্যব্যঞ্জক কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এবং অন্যান্য আরও অনেকানেক বিষয় এই প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈদৃশ দুরবগাহ গ্রন্থের অনুবাদাদি সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া সহৃদয় শিক্ষিত সুধী-জনগণের নয়নমন আকর্ষণ করা বা হৃদয়মধ্যে তদ্বিষয়ের অনুমাত্র চিন্তা করাও অস্মাদৃশ অনধিগতশাস্ত্র সাধারণ ব্যক্তির সর্ব্বথা শক্তিসীমার বহির্ভূত বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু করুণাময়ের কারুণ্যকণাপূর্ণ কটাক্ষবিক্ষেপমহিমায় এ গ্রন্থের এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবামাত্রই শত শত শিক্ষিত সহৃদয় জনের হৃদয়গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আজ সকল আয়াস সফল বলিয়া মনে করিলাম।

এই মহাগ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপ সম্পাদন বিষয়ে বহুতর প্রথিতনামা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিই আমার সহায় হইয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিতেছেন। তন্মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই ইহার সংশোধন ও বঙ্গানুবাদ বিষয়ে বিশেষ-রূপে লিপ্ত থাকিয়া আমাকে সাতিশয় অনুগৃহীত করিতেছেন। বলিতে কি, তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির সহায়তা না পাইলে আমি ইহা কিছুতেই সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না।

কলিকাতা।
মহাভারত কার্য্যালয়। } চন্দ্রনাথ বসু।
শকাব্দাঃ ১৮২৩।

প্রকাশকের নিবেদন।

আমাদের স্বর্গীয় পিতা ৺চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মূল টীকা
বাদ একত্র খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। বৈরাগ্য-প্রকরণ তিনিই প্রকা
গিয়াছিলেন। তাহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর আমরা ইহার প্রকাশ কার্য্যের ভার
পুস্তক বাহুল্যে আমাদিগেরও ব্যয়াধিক্য হইবেই, সুতরাং তদনুপাতে গ্রাহকগণকেই
মূল্যাধিক্য বহন করিতে হয়; এবং অধিকাংশ গ্রাহকই দুর্ব্বোধ্য মূল ও টীকার প
নহেন এইজন্য আমরা এবার মূল ও টীকা অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রাঞ্জল
প্রকাশ করিলাম। ভগবদইচ্ছায় এবং গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ও আগ্রহে অল্পদিন ম
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সমাধা হইল। ইতি—

বঙ্গাব্দ—১৩১৫, জ্যৈষ্ঠ। } জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।
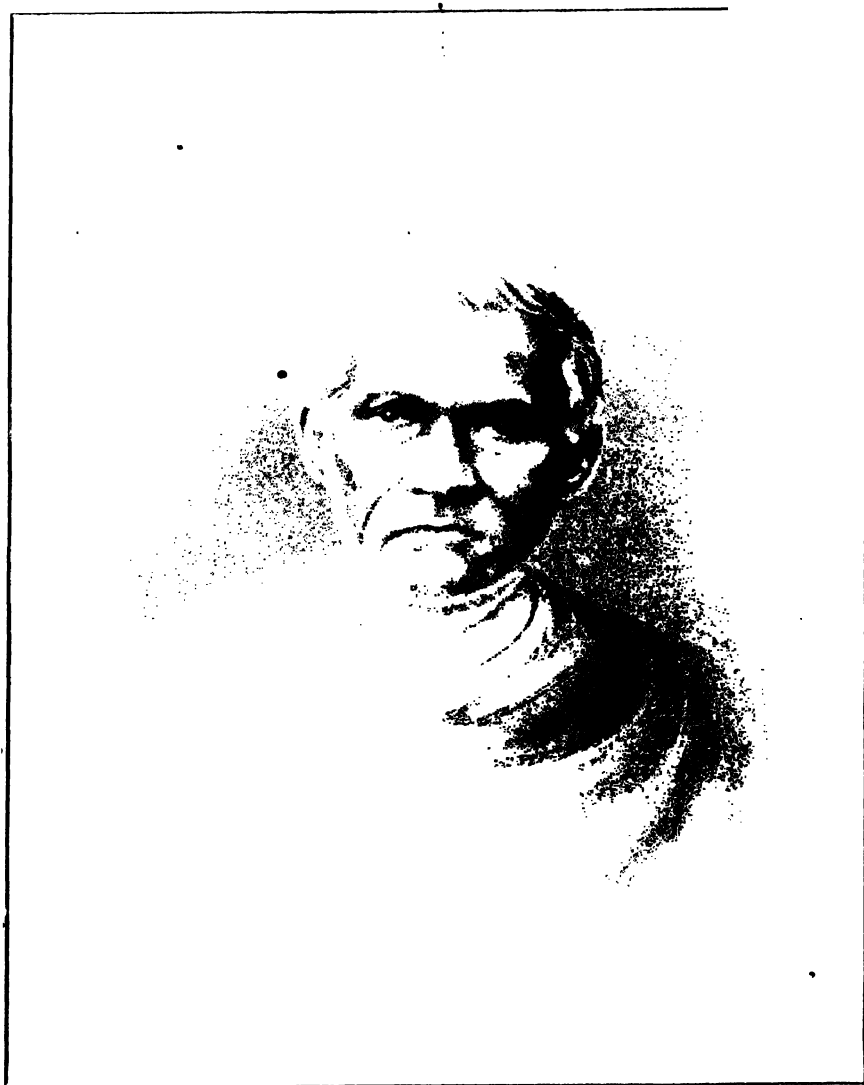
স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য,—

পিতৃদেব!

আমরা আশৈশব আপনার এই একটী স্বভাবসিদ্ধ গুণ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি যে, কখনও কোন দ্রব্য আপনার নিকট উপেক্ষিত হয় নাই। মূল্যবান্ দ্রব্য হইতে যৎসামান্য দ্রব্য পর্য্যন্ত আপনি সাদরে সাগ্রহে রক্ষা করিতেন। কোন দ্রব্যই অযত্নে নষ্ট হয়, ইহা আপনার অভীপ্সিত ছিল না। এ কারণ আপনার জামাতা স্বর্গীয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রণীত "মহাভারত" প্রকাশের ভার আপনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রহণপূর্ব্বক একে একে ছয় সংস্করণ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া উহাকে জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন। ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যদ্যপি এ মহৎকার্য্যে আপনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তবে আজ বাঙ্গলাসাহিত্য-সমাজে "কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত" শীর্ষস্থানীয় না হইয়া অন্য কোন গতি প্রাপ্ত হইত কি না, কে বলিতে পারে? স্বীকার করি,—নানাজাতীয় পার্ব্বত্য পুষ্প অতীব উৎকৃষ্ট ও মনোহর; কিন্তু এ পুষ্প যদি পার্ব্বত্য বন-মধ্য হইতে কোন বিচক্ষণ মানবদ্বারা লোক সমক্ষে সমানীত না হইত, তবে ঐ সকল অপরূপ পুষ্পের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্তও বোধ হয় শ্রুত হইত কি না, সন্দেহ। শুধু কি মহাভারত? তৎসঙ্গে তাঁহার প্রণীত "হুতোমপ্যাচার নক্সা"ও সযত্নে সংরক্ষিত করায় বাঙ্গলাসাহিত্য-মন্দিরে আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার পর সর্ব্বসাধারণে অনায়াসে অল্প ব্যয়ে আমাদের হিন্দু-পুরাণগুলি যাহাতে পাঠ করিতে পারে, তজ্জন্য আপনি এক

নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া,—হরিবংশ, অগ্নিপুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাও আপনার জীবনের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। পরে শেষ জীবনে নানা শোক, দুঃখ ও অত্যধিক পরিশ্রমে যখন স্বাস্থ্যের ভগ্ন দশায় উপস্থিত,—এমন কি, প্রায় এক প্রকার দৃষ্টিহীন হইয়া আসিয়াছিলেন,—সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আর একটী কীর্ত্তি-সংস্থাপন-মানসে এই মহাগ্রন্থের মূল, টীকা ও অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু কালের কবলে পতিত হওয়ায় তাহা আর সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পিতঃ! আপনার স্নেহাশ্রয় হইতে নিয়তি-নিয়মে পরিত্যক্ত হইয়া এই ৭ বৎসরকাল আপনার এই অধম অকিঞ্চিৎকর সন্তানগণ নানা দৈববিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়া বাতাহত তরুকাণ্ড প্রায় ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইবার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও আপনার বড় যত্নের—বড় আদরের —"যোগবাশিষ্ঠ" প্রকাশে ক্ষান্ত হয় নাই। আমাদের এ দুঃখ-জর্জ্জরিত প্রাণে আজ মহানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে যে, সেই পরম পিতা জগদীশ্বরের অনুকম্পায় আপনার রোপিত যোগ-বাশিষ্ঠরূপ পাদপকে আজ আমরা ফলে ফুলে সুশোভিত করিয়া সাহিত্য-কাননে প্রকাশ করিতে পারিলাম। পিতৃদেব! এখন এ দীন হীন ক্ষুদ্র অধম সন্তানগণের কঠিন পরিশ্রমার্জ্জিত ভক্তিপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া আমাদের মহানন্দ বর্দ্ধন করুন। সন্তানের অকিঞ্চিৎ-কর উপহারও পিতার নিকট মহা আদরণীয়!—এই মাত্র ভরসা।

বঙ্গাব্দ,
১৭ই পৌষ, ১৩১৮ সাল।

আপনার—
অকৃতি সন্তানগণ।

বৈরাগ্য-প্রকরণের সূচীপত্র।

বিষয়	সর্গ।			পত্রাঙ্ক

বৈরাগ্য-প্রকরণের সূচীপত্র সমাপ্ত

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

বৈরাগ্য-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি এবং পরিণামে যাঁহাতেই বিলয় হয়, সেই সত্যাত্মা পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যে ব্রহ্ম বস্তু হইতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, কর্ত্তা, হেতু এবং ক্রিয়া এই সমুদায়ের স্ফুরণ হইতেছে, সেই জ্ঞানরূপী ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যে প্রচুরতরানন্দ-সমুদ্রের আনন্দকণিকা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পরিস্ফুরিত হইতেছে এবং যে আনন্দময়ের আনন্দকণা জীবগণের জীবন-স্বরূপ সেই আনন্দরূপী পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

একদা সুতীক্ষ্ণ নামক কোন এক ব্রাহ্মণ সংশয়াকুলমানসে মুনিবর অগস্তির আশ্রমে গমন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— ভগবন্! আপনি ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমুদায় শাস্ত্ররহস্য বিদিত আছেন। আমার মনে একটী গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট তাহা বলুন, অর্থাৎ সদুপদেশ দিয়া আমার সেই সংশয়টী দূর করিয়া দিন। এই আমার সংশয় হইতেছে যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইটীর মধ্যে মোক্ষের কারণ কোন্‌টী? কেবল কর্ম্মই মোক্ষের কারণ, কি জ্ঞানই মোক্ষের কারণ? অথবা কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই মোক্ষের কারণ? এই

তিনটীর যেটী সত্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমার নিকট বলুন। অগস্তি কহিলেন,—হে দ্বিজ! যেমন পক্ষিগণ তাহাদের উভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া গগনপথে গমন করিয়া থাকে, মুমুক্ষুগণও সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটীকেই অবলম্বন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম্ম দ্বারা কখন মোক্ষলাভ ঘটে না। পরন্তু জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই দুইটী দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে বলিয়া. মনীষিগণ ঐ দুই-টীকেই মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে তোমার নিকট একটা প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর।

পুরাকালে কারুণ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম অগ্নিবেশ্য। কারুণ্য সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নিখিল বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী ছিলেন, তিনি গুরুগৃহে থাকিয়া সমুদায় বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া যথাকালে গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া তখন তিনি সংশয়বশতঃ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন না। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৌনাবলম্বী হইয়া অবস্থান করিতে লাগি-লেন। অনন্তর তাঁহার পিতা অগ্নিবেশ্য পুত্রকে সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতি কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে না দেখিয়া, পুত্রের হিতের নিমিত্ত এই কয়েকটী উত্তম কথা বলিতে লাগিলেন।

অগ্নিবেশ্য কহিলেন,—পুত্র কারুণ্য! এ কি! তুমি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতেছ না কেন? বল দেখি, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে? আর এই কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে কেনই বা তুমি নিবৃত্ত হইয়াছ তাহার কারণও আমার নিকট নিবেদন কর। কারুণ্য কহিলেন,—পিতঃ! শ্রুতি এবং স্মৃতিতে এইরূপ প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম বিহিত হই-য়াছে যে, "আজীবন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ ও প্রতিনিয়ত সন্ধ্যা-বন্দনাদি উপাসনা করিবে" অন্যদিকে আবার "ধন, কর্ম্ম বা পুত্রোৎপাদন দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, পরন্তু পূর্ব্বতন প্রধান প্রধান যতিগণ মাত্র ত্যাগ দ্বারাই মোক্ষ লাভ করিয়াছেন" এই নিবৃত্তিধর্ম্মও শ্রুতিবিহিত। সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ বেদ-বিধির মধ্যে কোনটী আমার অবলম্বনীয়, ইহা ভাবিয়াই আমি সংশয়-বশতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রহিয়াছি।

অগস্তি কহিলেন—দ্বিজবর কারুণ্য এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, পরে পুত্রকে তাদৃশ মৌনাবলম্বী দেখিয়া, পিতা অগ্নিবেশ্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন.—পুত্র! আমি তোমার নিকট একটী কথা বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার সকল অর্থ অবধারণ কর, পরে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, করিও। পূর্ব্বকালে যেখানে কাম-সন্তপ্ত কিন্নরীগণ কিন্নরগণের সহিত পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকে, যথায় সকল কলুষ-নাশিনী মন্দাকিনী ও কালিন্দী নদী প্রবাহিত হইতেছেন, সেই হিমালয় শৈলের শিখিকুল-সমাকুল মনোরম শিখরদেশে একদিন সুরুচিনাম্নী কোন এক প্রধান অপ্সরা উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি সহসা সম্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রদূত অন্তরীক্ষ পথে গমন করিতেছেন। সৌভাগ্যবতী সুরুচি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদূত! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং সম্প্রতি কোথাই বা যাইবেন, কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট বলুন। দেবদূত কহিলেন, ভদ্রে! তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তোমার নিকট সকল বৃত্তান্তই ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

অরিষ্টনেমি নামে জনৈক রাজর্ষি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় পুত্রের প্রতি যাবতীয় রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে থাকিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। আমি দেবরাজের আদেশানুসারে রাজর্ষির নিকট গমন করিয়াছিলাম। সুরপতি যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তথায় আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা নির্ব্বাহ করিয়াছি এবং সম্প্রতি তত্রত্য বৃত্তান্ত সমুদায় জানাইবার জন্য পুনরায় দেবেন্দ্রসমীপে গমন করিতেছি। সুরুচি কহিলেন,—হে প্রভো! আমি বিনীতভাবে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তথায় রাজর্ষির সহিত আপনার যেরূপ আলাপ পরিচয় হইয়াছে, আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া আপনি তাহা আমাকে বলুন। দেবদূত বলিলেন, হে শোভনে! তুমি শ্রবণ কর, আমি বিস্তৃত-রূপেই তথাকার ঘটনা সকল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি।

হে সুভ্রু! সেই রাজর্ষি গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া কঠোর

তপস্যায় নিরত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্র আমাকে এইরূপ আদেশ করিলেন, "হে দূত! তুমি অবিলম্বে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণভূষিত তালবেণুমৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদিত্রযুক্ত এই মনোহর বিমানবর গ্রহণ করিয়া নানাবিধ তরুরাজিবিরাজিত রমণীয় গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর এবং তথায় গিয়া সাদরে রাজর্ষিকে বিমানোপরি আরোহণ করাইয়া এই স্থানে লইয়া আইস। তিনি এই অমরাবতীতে আসিয়া তাঁহার তপস্যাজনিত সমুদায় স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিবেন।" হে শোভনে! ইন্দ্র আমাকে এইরূপ আদেশ করিলে, আমি সেই সর্ব্বোপকরণান্বিত দিব্য বিমান গ্রহণ করিয়া গিরিবর গন্ধমাদনে গমন করিলাম। আমি, সেই পর্ব্বতে গিয়া রাজর্ষি অরিষ্টনেমির আশ্রমে প্রবেশ করতঃ, দেবেন্দ্র আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সকল বৃত্তান্তই তাঁহার নিকট নিবেদন করিলাম। হে শুভে! অনন্তর রাজর্ষি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সংশয়িত-চিত্তে আমাকে কহিলেন, "হে দূত! আমি তোমার নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহার প্রত্যুত্তর দিবার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি প্রথমতঃ আমার নিকট প্রকাশ কর, স্বর্গে কি কি গুণ এবং কি কি দোষ বর্ত্তমান আছে, আমি তোমার নিকট সেই সকল জ্ঞাত হইয়া, পরে আমার যেরূপ অভিরুচি হয়, তদনুসারে স্বর্গে বাস করা উচিত কি অনুচিত, তাহা নির্ণয় করিব।"

রাজর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম,—হে রাজর্ষে! যদি প্রচুরতর পুণ্য সঞ্চয় থাকে, তাহা হইলেই স্বর্গভোগ হয়। তন্মধ্যে আবার উহা উত্তম পুণ্য হইলে উত্তম স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ মধ্যম পুণ্যে মধ্যম স্বর্গ ও অল্প পুণ্য সঞ্চয়ে অল্প স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহার যেরূপ পুণ্য, সে তদনুরূপই স্বর্গভোগ করে, সন্দেহ নাই। পরন্তু যাবৎকাল পর্য্যন্ত পুণ্যবান্‌গণের সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া না যায়, তাবৎকাল তাঁহারা স্বর্গে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না, সমানে সমানে স্পর্দ্ধা করিতে থাকেন এবং আপনা অপেক্ষা হীনপুণ্য ব্যক্তির অল্প সুখ ভোগ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। এইরূপে কালাতিপাত করিয়া যে যে সময় তাঁহাদের পুণ্যক্ষয় হইয়া

যায়, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যধামে আসিয়া জন্মলাভ করেন। হে রাজন্! স্বর্গে এই এই প্রকার গুণ ও দোষ বর্ত্তমান আছে।

হে শুভে! রাজর্ষি আমার নিকট স্বর্গের ঐরূপ গুণ দোষের কথা শ্রবণ করিয়া, আমাকে কহিলেন, "হে দেবদূত! আমি এরূপ গুণদোষ-সমন্বিত স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। সর্প যেরূপ তদীয় জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমিও ইহার পর হইতে সাতিশয় কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়া আমার এই অপবিত্র নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিব। অতএব হে দেবদূত! তুমি যে স্থান হইতে আসিয়াছ, এই বিমান গ্রহণ করিয়া এক্ষণে সেই ইন্দ্র-সন্নিধানেই প্রতিগমন কর। তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

দেবদূত কহিলেন,—হে ভদ্রে! রাজর্ষি অরিষ্টনেমি আমাকে ঐ কথা কহিলে, আমি ইন্দ্রের নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। ইন্দ্র এবং তাঁহার সভাস্থ সকলেই আমার নিকট রাজর্ষি-কথিত সকল কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিছুকাল পরে দেবেন্দ্র সুমধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া পুনরায় আমাকে কহিলেন,—'হে দূত! তুমি পুনরপি সেই বিষয়-বিমুখ রাজর্ষির আশ্রমে গমন কর এবং তথা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পরমতত্ত্ববিৎ বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গমন করিও। মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ তাঁহাকে আমার সন্দেশ বাক্য জানাইও, পরে এই বিবেকী রাজার যাহাতে আত্মজ্ঞান * লাভ হয়, সে সম্বন্ধে তুমি তাঁহাকে এই কথা নিবেদন করিও যে, মহামুনে! এই রাজর্ষি সাতিশয় বিনীত এবং পরম বিবেকী। ইনি স্বর্গভোগে অনভিলাষী। আপনি ইহাঁকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করুন। এই সংসার-তাপ-তাপিত রাজর্ষি যদি আপনার নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমে ইনি মোক্ষপথ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।' হে শুভে! মহেন্দ্র

---

* এইস্থলে ভঙ্গীক্রমে দূতকেও ইন্দ্রের এ কথা বলা হইল যে, রাজা অরিষ্টনেমি ও বাল্মীকিমুনির পরস্পর তত্ত্ববিষয়ক যে কথোপকথন হইবে, তাহাতে নিশ্চয় তোমার নিজেরও আত্মজ্ঞান জন্মিবে।

আমাকে এই কথা কহিয়া, পুনরায় রাজর্ষির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমিও ইন্দ্রের আদেশানুসারে পুনর্ব্বার তথায় গিয়া রাজর্ষির সহিত মুনিবর বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলাম এবং ইন্দ্রের আদেশমত রাজর্ষির অভীষ্ট মোক্ষসাধন বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করিলাম।

অনন্তর মুনিবর বাল্মীকি পরম প্রীত হইয়া কুশল প্রশ্নে রাজর্ষি অরিষ্ট-নেমিকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজর্ষি বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ধর্ম্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব ও লৌকিকতত্ত্ব সকল বিশেষরূপে অবগত আছেন। আমি ভবদীয় দর্শন লাভে যে কৃতার্থ হইলাম, ইহাই আমার কুশল। পরন্তু হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি বিনা বিঘ্নে তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন্। আমি ঘোরতর সংসার-বন্ধন-জনিত দুঃখপুঞ্জে পুনঃ পুনঃ পীড়িত হইতেছি, যাহাতে এই ভববন্ধন-দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

বাল্মীকি কহিলেন,—হে রাজন্, শ্রবণ কর, আমি তোমাকে অখণ্ডিত রামায়ণ বলিতেছি, তুমি যত্ন সহকারে ইহা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে, জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। হে রাজেন্দ্র! আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং তুমিও সুপণ্ডিত; সুতরাং আমি তোমাকে বশিষ্ঠ-রাম-সংবাদসংবলিত মোক্ষের উপায় স্বরূপ পরম মঙ্গলকর কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মুনিবর বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অরিষ্টনেমি সংশয়াকুল-মানসে তাঁহাকে বলিলেন,—হে জ্ঞানিপ্রবর! রাম কে? কীদৃশ? তিনি বদ্ধ না মুক্ত? তিনি কোন্ রাম? আপনি ইহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন। বাল্মীকি কহিলেন, পূর্ব্বকালে ভগবান হরি অভিশাপচ্ছলে রাজ-বেশ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রভু ও সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও কেবল ভক্তবাক্য সফল করিবার নিমিত্তই স্বীয় ইচ্ছানুসারে অজ্ঞানাবৃত হইয়া সাধারণ মানবের ন্যায় অল্পজ্ঞরূপে বিরাজমান ছিলেন। রাজর্ষি কহিলেন,—মুনিবর! যাহারা অপরাধ করে, মহর্ষিগণ তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন এবং সেই অপরাধ আবার যাহারা অজ্ঞানী ও অপূর্ণ কাম, তাহাদিগেরই সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু রাম চিদানন্দস্বরূপ চৈতন্য-

মূর্ত্তি, তাঁহার প্রতি শাপ হওয়ার কারণ কি? এবং কেই বা তাঁহাকে অভিশাপগ্রস্ত করিল, আপনি এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বাল্মীকি বলিলেন,—ব্রহ্মার মানস-তনয় রাগ-দ্বেষাদিশূন্য সনৎকুমার একদা ব্রহ্ম-ভবনে বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ত্রিলোকাধিপতি ভগবান্ হরি বৈকুণ্ঠপুরী হইতে সহসা সেই স্থানে আগমন করিলেন। ভগবান্ হরিকে সমাগত দেখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সত্যলোকনিবাসী অপরাপর সকলেই তাঁহাকে পূজা করিলেন; কিন্তু সনৎকুমার তাঁহার কোনরূপ সপর্য্যাবিধান করিলেন না দেখিয়া, জগদীশ্বর হরি তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন—"হে সনৎকুমার! তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ এবং তোমার কার্য্যকলাপও গর্ব্বসূচক।° সুতরাং তুমি শরজন্মা অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়া কামাসক্ত হইবে।" হরির শাপবাক্য শ্রবণে সনৎকুমারও তাঁহার প্রতি শাপদিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—"হে প্রভো! আপনি যখন আমাকে অভিশাপ-গ্রস্ত করিলেন, তখন আমিও আপনাকে এইরূপ অভিশাপ দিতেছি যে, আপনারও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যাহা কিছু ঈশ্বরধর্ম্ম আছে, কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত আপনিও সে সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞানী হইয়া থাকিবেন।"

এই প্রকার পুরাকালে মহর্ষি ভৃগুও ভগবান বিষ্ণু কর্ত্তৃক স্বীয় পত্নীকে নিহতা দেখিয়া কোপপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাকে এইরূপ শাপগ্রস্ত করিয়াছিলেন যে, "হে বিষ্ণো! তুমি যেমন আমার পত্নীকে নিহত করিয়া আমাকে দুঃখ প্রদান করিলে, এইরূপ তোমাকেও পত্নীবিয়োগদুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" ভগবান্ বিষ্ণু ছদ্মপরিগ্রহপূর্ব্বক জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া তৎপত্নী বৃন্দার সতীত্ব নাশ করিয়াছিলেন, পরে পতিগতপ্রাণা বৃন্দাও বিষ্ণুর ছলনা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, "হে বিষ্ণো! যখন তুমি ছলনা করিয়া আমার পাতি-ব্রত্যভঙ্গ করিলে; তখন আমার বাক্যে নিশ্চয়ই তোমার পত্নীবিয়োগ ঘটিবে।" পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করিলে গর্ভবতী দেবদত্তপত্নী তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে পয়োষ্ণী নদীর তীরদেশে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পতি দেবদত্ত

পত্নীবিয়োগে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুকে এইরূপ শাপগ্রস্ত করেন যে "হে হরে! আমার ন্যায় তোমরাও ভার্য্যাবিয়োগ অবশ্যম্ভাবী।"

এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু ক্রমান্বয়ে সনৎকুমার, ভৃগু, বৃন্দা ও দেবদত্ত কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে রাজন্, এই আমি তোমার নিকট হরির শাপচ্ছলের সকল কারণই কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি মোক্ষোপায় কথা বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

যে বিভু পরব্রহ্ম স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরীক্ষে, আমার, তোমার, সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে সততই বিবিধরূপে প্রথিত হইতেছেন, সেই চিন্মাত্রস্বভাব সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার করি।

মুনিপ্রবর বাল্মীকি বলিলেন,—যাঁহার মনে মনে এইরূপ গাঢ় নিশ্চয় আছে যে, আমি জন্মমরণাদি বিবিধ দুঃখসঙ্কুল ভবধামে থাকিয়া প্রতি-নিয়ত বাসনা-জালে আবদ্ধ রহিয়াছি, আমাকে অবশ্যই ইহা হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞানী, অথবা এক বারে অজ্ঞানীও নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিরই এই শাস্ত্রশ্রবণে অধিকার আছে এবং তাঁহারাই এই শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ফললাভ করিতে পারেন; তদ্ভিন্ন অন্য দেহাভিমানী অজ্ঞানী বা পরম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই শাস্ত্র কোন রূপ ফলবিধায়ক হয় না। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ মৎপ্রণীত চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকময় রামায়ণ কথার ভাবার্থ সকল বিচার করিয়া, পরে এই মোক্ষ-বিধায়ক বৈরাগ্য প্রভৃতি ছয়টী প্রকরণ বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, সুতরাং সংসারে আসিয়া তাঁহাকে আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।

হে অরিনিসূদন! রত্নাকর যেমন রত্নপ্রার্থীকে রত্ন প্রদান করেন, আমিও তদ্রূপ একাগ্রমনে মদীয় বিনীত শিষ্য ধীমান্ ভরদ্বাজকে মৎ-প্রণীত ষট্পঞ্চাশৎসহস্রশ্লোকাত্মক মোক্ষোপযোগী রামায়ণকথার চতু-র্বিংশতিসহস্র শ্লোকময় পূর্ব্ব খণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম। অনন্তর ধীশক্তি-সম্পন্ন ভরদ্বাজ সুমেরুগিরিস্থ কোন একটী অরণ্য মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সেই মৎপ্রদত্ত পূর্ব্বখণ্ড রামায়ণ কীর্ত্তন করেন। লোকপিতামহ উদারহৃদয় ব্রহ্মা ভরদ্বাজের নিকট রামায়ণকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে ভরদ্বাজ! আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট পরিতুষ্ট হই-য়াছি, তুমি তোমার অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।

ভরদ্বাজ পিতামহ-কথিত বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তেরই ঈশ্বর। আমি আপনার নিকট এরূপ বর প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে এই মানব-নিবহ উৎকট সংসারদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, আপনি আমাকে তাহাই বলিয়া দিন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভরদ্বাজ! তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, ইহা তোমার গুরু মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গমন করত যত্নাতিশয়-সহকারে তাঁহার নিকটই প্রার্থনা কর। হে মুনে! যেমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন সেতুবন্ধ-দর্শনে দুস্তর পাপার্ণব সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেইরূপ তিনিও যে এই সুন্দর রামায়ণ কথা প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলেও মানবগণ নিখিল মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

বাল্মীকি কহিলেন,—লোকবিধাতা ব্রহ্মা ভরদ্বাজকে এই কথা কহিয়া তৎসমভিব্যাহারে আমার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি সেই নিখিল ভূতহিতাভিলাষী জগৎপতি পিতামহকে মদীয় আশ্রমে সমুপাগত দেখিয়া অবিলম্বে পাদ্য অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করি-লাম। অনন্তর সত্ত্বগুণশালী ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে কহিলেন, হে মুনি-বর! তুমি যে এই অনিন্দিত রামচরিত্র বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছ; ইহাতে তোমার পরিশ্রমাতিশয় হইলেও যাবৎ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ হয়, তাবৎকালের মধ্যে তুমি ইহা পরিত্যাগ করিও না। যেমন অর্ণবযান পারাবারে

পতিত হইলে দ্রুতগতি পোত-সাহায্যে তাহা হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ মানবগণও ভবৎপ্রণীত এই রামায়ণ গ্রন্থ দ্বারাই অনায়াসে সঙ্কট-ময় সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আমি তোমকে এই কথা বলিবার জন্যই তোমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলাম। তুমি এক্ষণে লোকহিতার্থ এই পবিত্র শাস্ত্র সত্বর প্রণয়ন কর।

হে নৃপ! জলধিজল-সমুত্থিত উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে জলে বিলীন হইয়া যায়, ভগবান্ ব্রহ্মাও আমাকে ঐ কথা কহিয়া, সেইরূপ তাঁহার পাদস্পর্শ বশতঃ মদীয় পুণ্যতম আশ্রম হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমার আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলে, আমি কিঞ্চিৎকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলাম, পরে পুনরায় সুস্থচিত্ত হইয়া মদীয় শিষ্য ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ভরদ্বাজ! ব্রহ্মা আমাকে কি কথা বলিয়া গেলেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল। আমি বিস্ময়বশতঃ ব্রহ্মবাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারি নাই।

আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পুনরায় ভরদ্বাজ আমাকে বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা আপনাকে এই কথা বলিতে আসিয়াছিলেন যে, যাহাতে জীবগণ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, আপনি লোকহিতার্থ সেই মোক্ষোপযোগী রামায়ণগ্রন্থের উত্তর খণ্ড প্রণয়ন করুন। হে ভগবন্! আমিও আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, মনস্বী রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, যশস্বিনী সীতা দেবী ও অন্যান্য রামানুগমন-কারী মহামতি মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি, ইহাঁরা এই সঙ্কটসঙ্কুল সংসারে আসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? ইহাঁরা কি জ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় রোগ-শোক-মায়ামোহাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া সময়াতিপাত করিয়াছিলেন, অথবা জীবন্মুক্তবৎ সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিরাজমান ছিলেন? এবং কি করিয়াই বা ইহাঁদের দুঃখনিবৃত্তি হইয়াছিল? হে ঋষে! এই সকল আমি যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া সেইরূপ বলুন। আমি এবং ভবদীয় উপদেশশ্রবণে কৃতার্থ অন্যান্য মানবগণ, আমরা সকলেই ঐরূপ ব্যবহার করিয়া সংসারদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিব।

হে রাজেন্দ্র! তৎকালে আমি ঐ সকল বলিবার নিমিত্ত মুনিশ্বর

ভরদ্বাজ কর্তৃক সাদরে অনুরুধ্যমান হইয়া ব্রহ্মা আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলাম। বৎস ভরদ্বাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, শ্রবণ কর; আমি তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতেছি; ইহা শ্রবণ করিলে, তুমি যাবতীয় মোহমল দূরীভূত করিতে পারিবে। হে প্রাজ্ঞ! রাজীবলোচন রাম যেরূপ সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্তভাবে ব্যবহার করিয়া সুখী হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ ব্যবহার কর, সুখী হইতে পারিবে। অপিচ মহামনা লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, দশরথ এবং শ্রীরামবন্ধু কৃতাস্ত্র ও অবিরোধ, কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং বামদেব, ইঁহারা সকলেই পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, ভাস, সত্য, বিজয়, বিভীষণ, সুষেণ, হনুমান্ ও ইন্দ্রজিৎ শ্রীরামের এই আট্‌জন মন্ত্রী; ইঁহারাও জ্ঞানী, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সংসারবিরাগী ও জীবন্মুক্ত ছিলেন। পরন্তু ঐ মহামতিগণ কেবল বাহিরেই প্রারব্ধের অনুবর্ত্তন করিতেন। হে ভরদ্বাজ! এই মনস্বিগণ যে প্রকারে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত হোম, দান ও লৌকিক আচারব্যবহারাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তুমিও যদি তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিতে পার, তবে বিনা ক্লেশেই এই সঙ্কটময় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। অধিক কি, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যদি দুস্তর সংসারসাগরেও নিমগ্ন হইয়া থাকেন, তথাপি তিনি তত্ত্বনিশ্চয়ে আন্তরিক সমরসত্ব লাভ করিয়া প্রিয়জনবিয়োগ-জনিত বিবিধ দুঃখ, শোক, দৈন্য ও অভিমান প্রভৃতি সর্ব্বসঙ্কট হইতে বিমুক্ত হন এবং নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া নিত্য-তৃপ্ত-রূপে অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বর্ণন বিষয়ে রামচন্দ্রকেই প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া ক্রমে আমার নিকট জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি তাহা বলুন। আমি উহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা সুখী হইতে পারিব। অনন্তর বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! প্রকৃত পক্ষে আকাশ রূপবিহীন হইলেও তাহাতে যেমন ভ্রমবশতঃ নীলপীতাদি বিবিধ বর্ণ প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ এই জগৎ বস্তুত মিথ্যা হইলেও অজ্ঞান হেতু পরব্রহ্মেই জগদ্ভ্রম প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং হে সাধো! আমার বিবেচনায় যাহাতে এই ভ্রান্ত জগৎ পুনরায় আর সত্য বলিয়া মনে না হয়, এইরূপ ভাবে বিচরণ করাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক বা মুক্তিস্বরূপ।

হে ভরদ্বাজ! যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, তৎসমুদায় যাবৎ পর্য্যন্ত না একেবারেই মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। (দৃশ্যমাত্রের মিথ্যা জ্ঞান হওয়াও আত্মজ্ঞান-লাভেরই ফল; সুতরাং যখন সমস্তই আত্মা এবং আত্মাই সকলের কারণ) তখন যাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহারই উপায় অনুসন্ধান কর। বাল্মীকি এই কথা কহিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়-সম্বন্ধে পুনরায় ভরদ্বাজকে বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধিগত হইলে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের অসম্ভাবনা নাই, যেহেতু আমি তদুদ্দেশেই এই শাস্ত্র সঙ্কলিত করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি যদি ইহা শ্রবণ কর, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিবে, নচেৎ আর কোন রূপেই উহার সম্ভাবনা নাই।

হে অনঘ! এই জগৎ প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা হইলেও ইহাকে ভ্রমবশতঃ আকাশবর্ণবৎ আপাতমাত্র সত্য বলিয়া মনে হইতেছে বটে, পরন্তু যে সময়ে তুমি সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রানুশীলন করিতে আরম্ভ করিবে, তখন অবশ্যই অনুভব করিতে পারিবে যে, এ জগৎ কিছুই নহে—সমস্তই মিথ্যা! হে

ভরদ্বাজ। দৃশ্য বস্তুজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের আবরক হইয়া থাকে। ফলতঃ সমুদায় দৃশ্য বস্তুই অস্তিত্বহীন; একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই সর্ব্বত্র ভাসমান হইতেছেন; তদ্ভিন্ন যাবতীয় বস্তুই জড়, যদি এইরূপ জ্ঞানে মন হইতে সমুদায় দৃশ্য বস্তুর মার্জ্জন করা যায়, তাহা হইলেই নির্ব্বাণমুক্তির পরম শান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নতুবা যাহারা স্বভাবত অজ্ঞান, তাদৃশ নিয়তসংসার-চক্রভ্রমণশীল ব্যক্তিগণ যদি বহুকল্প পর্য্যন্তও শাস্ত্রগর্ত্তে নিপতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে, তথাপি তাহারা পরম নির্ব্বৃতিলাভ করিতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! জন্মের হেতুভূত বাসনাসমূহের যে একেবারেই পরিত্যাগ, তাহাই প্রধান মোক্ষ বলিয়া অভিহিত এবং সেই ক্রমই বিমল ক্রম। অর্থাৎ সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য এ সকল মুক্তি গৌণ মুক্তি বলিয়া কথিত; যাহা প্রধান মুক্তি তাহার নাম নির্ব্বাণ। নিঃশেষ রূপে অবিদ্যা-মল দূরীকরণ ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম বা উপাসনা দ্বারা এই মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। প্রতিদিন ভগবানের স্মরণমননাদি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, ক্রমে ক্রমে বাসনাজাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বাসনার ক্ষয় হইলেই জীবের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! যেরূপ শীতাপগমে হিমকণাসকল বিগলিত হইতে থাকে, সেইরূপ বাসনাজালের ক্ষয় হইলেই বাসনাপুঞ্জরূপ মনও গলিত হইয়া যায়। অন্তর্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম তন্তু যেমন মুক্তাকলাপকে ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ভূতগণের পঞ্জরস্থানীয় দেহকেও বাসনাই ধারণ করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং বাসনাক্ষয়ে বাসনাপুঞ্জভৃত স্থূলদেহেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ দুই প্রকার বাসনার উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটী মলিনা ও অপরটী শুদ্ধা। মলিনা বাসনা জন্মের হেতু এবং শুদ্ধা বাসনা জন্মবিনাশিনী।

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, যাহা অজ্ঞানপরিপুষ্ট ও ঘনাহঙ্কারশালিনী, তাহাই মলিনা বাসনা। এই মলিনা বাসনাই পুনর্জ্জন্মের বিধান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যাহা ভৃষ্ট বীজের ন্যায় পুনর্জ্জন্মের হেতু না হইয়া কেবল প্রারব্ধ কার্য্যে দেহ ধারণ প্রয়োজনেই অবস্থান করে, সেই তত্ত্ব-জ্ঞানোপলব্ধিশালিনী বাসনাই শুদ্ধ বাসনা। এই বাসনা পুনর্জ্জন্মবিধায়িনী

না হইয়া চক্রভ্রমণের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষগণের দেহে বিদ্যমান থাকে। যাঁহারা শুদ্ধ-বাসনাকে অবলম্বন করেন, সেই সকল জ্ঞাতজ্ঞেয় মহামতি-গণই অনর্থভাজন পুনর্জন্ম জয়পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে মতিমন্ ভরদ্বাজ! মহামতি রামচন্দ্র যে প্রকারে জীবন্মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি জরামরণ-শান্তির নিমিত্ত তাহা তোমার নিকট বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি মৎকথিত শুভ রাম-কথা শ্রবণ করিলে, সমুদায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

হে ভরদ্বাজ! কমলনয়ন রামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত গুরুগৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক কতিপয় দিবস অকুতোভয়ে বিবিধ লীলাপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন! অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, যখন নরপতি রামচন্দ্র পৃথিবীমণ্ডল পরিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার পরিপালন গুণে প্রজাগণমধ্যে কুত্রাপি রোগ, শোক, শঙ্কা, দৈন্য, দারিদ্র্য ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি কিছুই ছিল না, প্রত্যুত সর্ব্বত্রই চিরশান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। সেই সময়ে একদা পবিত্র তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম সকল অবলোকন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিতান্ত সমুৎকণ্ঠিত হইল। অনন্তর রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র তীর্থ ও আশ্রমাদি দর্শনে চিন্তান্বিত হইয়া হংস যেরূপ অভিনবোদ্ভিন্ন কমলযুগল অবলম্বন করে, সেইরূপ পিতার নখরকেসর-বিমণ্ডিত চরণযুগল গ্রহণপূর্ব্বক তৎসমীপে নিবেদন করিলেন,—হে তাত! পবিত্র তীর্থ, দেব-নিকেতন, বন ও আয়তনসকল অবলোকন করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছে; অতএব হে নাথ! আপনি অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার এই প্রাথমিকী প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন। হে প্রভো! ভুবনমণ্ডলে এবংবিধ কোন প্রার্থীই নাই, যাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আপনি পরাঙ্মুখ হইয়াছেন!

অতঃপর নরপতি দশরথ শ্রীরামকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে অভ্যর্থিত হইয়া কুলপুরোহিত মুনিবর বশিষ্ঠের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক প্রথমপ্রার্থী শ্রীরাম-চন্দ্রকে পুণ্য তীর্থাশ্রমাদি দর্শন বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। রঘুকুল-

ধুরন্ধর রামচন্দ্র পিতাকর্ত্তৃক পুণ্যতীর্থ দর্শনার্থ অনুমোদিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে শুভ দিন ও শুভ নক্ষত্রে তীর্থযাত্রা করিতে সমুদ্যত হইলে বিবিধ মাঙ্গলিক অলঙ্কারনিকরে তাঁহার শরীর বিভূষিত হইল; দ্বিজগণ মঙ্গলাভিলাষে স্বস্ত্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বশিষ্ঠ-প্রহিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় প্রিয়বয়স্য প্রধান প্রধান রাজকুমার তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন এবং মঙ্গলাভিলাষিণী জননীগণ বারংবার আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সজ্জিত করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র এইরূপে শুভক্ষণে স্বগৃহ হইতে বিনির্গত হইলে, পৌরগণ বিবিধ তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিল। পুরাঙ্গনাগণ ভৃঙ্গসজ্ঞ-চঞ্চল নয়নাবলী দ্বারা সতৃষ্ণভাবে পুনঃপুনঃ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। গ্রামবাসিনী ললনাকুল বিলোল-করকমল-ক্ষিপ্ত লাজবর্ষণে তাঁহাকে আকীর্ণ করায় তৎকালে তিনি হিমরাশি-বিমণ্ডিত হিমাচলের শোভা ধারণ করিলেন। রঘুপতি দানমানাদি দ্বারা দ্বিজাতিগণকে পরিতুষ্ট করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে প্রজাগণ-সমুচ্চারিত নানাবিধ আশীর্ব্বাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া দিগন্তসকল অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বহুতর জাঙ্গল পথ অতিক্রম করিলেন।

অনন্তর তীর্থ-দর্শন-সমুৎসুকচেতা রামচন্দ্র এইরূপে স্বীয় রাজধানী কোশল নগরী হইতে আরম্ভ করিয়া বিধিবিহিত স্নান, দান, তপস্যা ও অধ্যয়নানুষ্ঠানপুরঃসর ক্রমে ক্রমে পবিত্র নদীতীর, কানন, আয়তন, জনপদান্তবর্ত্তী জঙ্গলভূমি, গিরিতট, সমুদ্রতট, মন্দাকিনী, কালিন্দী, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বেণী, কৃষ্ণবেণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা, বিপাশা, বাহুদা, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, ধর্ম্মারণ্য, গয়া, বারাণসী, শ্রীশৈল, কেদার, পুষ্কর, মানসসরঃ, উত্তরমানস, হয়গ্রীবতীর্থ, অগ্নিতীর্থ ও মহাতীর্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, এবং অন্যান্য নদ, নদী, হ্রদ, সরোবর, স্বামী কার্ত্তিকেয়, শালগ্রাম হরি ও হরিহরের চতুঃষষ্টিস্থান, নানাশ্চর্য্যময় চতুঃসাগরতীর, বিন্ধ্য ও মন্দরস্থ লতাগৃহ, হিমালয় মলয় প্রভৃতি কুলাচলভূমি এবং রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের পরম পাবন আশ্রম সকল সাদরে দর্শন করিলেন।

সর্ব্বমান্যিতা শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে ভূয়োভূয়ঃ ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিগন্তবর্ত্তী জম্বুদ্বীপাত্মিকা সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পরে সুর-নরাদি-পূজিত দিগন্তবিহারী ভগবান্ শিব যেমন শিবলোকে সমাগমন করেন, তিনিও সেইরূপ নিখিল ভূভাগ অবলোকনপূর্ব্বক সুরনরকিন্নর-পরিপূজিত হইয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র পুণ্যতীর্থাশ্রমাদি সন্দর্শন করিয়া স্বীয় পুরে প্রত্যাগত হইলে, মঙ্গলাচারপরায়ণ পুরবাসিগণ তাঁহাকে পুষ্পা-ঞ্জলিপুঞ্জ বর্ষণে আকীর্ণ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবেন্দ্রনন্দন জয়ন্ত যেমন বৈজয়ন্তধামে প্রবেশ করেন, সেইরূপ শ্রীমান্ রামচন্দ্র নিজ পুরাভ্য-ন্তরে প্রবেশ করিলেন। নবপ্রবাসাগত রামচন্দ্র পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে পিতৃদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন, পরে কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, কুলবৃদ্ধগণ, ভ্রাতৃগণ ও বান্ধবগণ ইঁহাদের সকলকেই পূজ্যানুক্রমে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। পরম পূজনীয় পিতা দশরথ, কৌশল্যাদি মাতৃগণ, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ ও স্নেহানুরক্ত-হৃদয় বন্ধুগণ ইঁহারা সকলেই রামচন্দ্রকে মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গনাদি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিলে তিনি পূজ্যদিগকে সমুচিত অভিবাদন ও বন্ধুদিগের সহিত প্রিয়ালাপাদি করিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন। রাম গৃহে আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া যে সকল জনগণ তাঁহার দর্শনাভিলাষে দশরথগৃহে সমাগত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা রামমুখ-বিনির্গত মৃদুল মুরলী-রবোপম সুমধুর আলাপ সকল শ্রবণ করিয়া পরমানন্দহৃদয়ে পরস্পর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীরামের আগমনে রাজভবনে যে মহোৎসব

আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ক্রমান্বয়ে এক এক করিয়া 'অষ্টাহ পর্য্যন্ত প্রমোদমত্ত জনমণ্ডলীর কল-কোলাহলে আকুলিত হইয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

রঘুবংশ-সম্ভব রাম পুণ্যতীর্থাদি দর্শনে বহির্গত হইয়া তৎকালে বিভিন্ন দেশীয় যে সকল বিবিধরূপ আচার পদ্ধতি সকল নয়নগোচর করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে সেই সকল উপবর্ণন করত পরমানন্দে স্বভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা রামচন্দ্র প্রাতঃসময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিধিবিহিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সভামণ্ডপে গমন করত তথায় ইন্দ্র তুল্য স্বীয় পিতাকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠপ্রমুখ জ্ঞানিগণসহ বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন করিয়া সন্তোষচিত্তে দিবসের চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন। পরে মৃগয়াভিলাষে পিতার অনুজ্ঞা-গ্রহণ করিয়া বিপুলবাহিনী সমভিব্যাহারে বরাহমহিষাদি বিবিধ ভয়ঙ্কর জন্তুগণ পরিপূরিত নিবিড় বনপ্রদেশে গমন করিলেন। মৃগয়াব্যাপার সমাহিত হইলে তথা হইতে নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক যথাক্রমে স্নানাহ্নিকাদি সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বন্ধুবান্ধবসহ ভোজনক্রিয়া সমাপনান্তে সুখে রাত্রি যাপন করিলেন!

হে অনঘ! তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত রামচন্দ্র প্রতিদিন ভ্রাতৃত্রয়সহ এইরূপে দৈনিক কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং নৃপতিগণোচিত সম্যক্ ব্যবহার করায় তৎকালে তদীয় সুধারসকোমল সকল চেষ্টাই তদানীন্তন আত্মীয়স্বজনগণের চিত্তে চন্দ্রিকাবৎ আহ্লাদজনক হইয়াছিল। সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্র এইরূপে গৃহে থাকিয়া বহু দিন অতিবাহিত করিলেন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—অনন্তর রাম এবং রামানুগত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহারা পঞ্চদশবর্ষ বয়সে উপনীত হইলেন, ভরত পূর্ব্ব হইতেই মাতামহ গৃহে গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। নরপতি দশরথ শাস্ত্রানুসারে এই পৃথিবীমণ্ডল পরিপালন করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রিগণ সহ পুত্রগণের বিবাহের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ দিকে রামচন্দ্র তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া গৃহে আসিয়া অবস্থান করিলেন; কিন্তু শরদাগমে বিমল সরোবর যেমন অনুদিন ক্ষীণ হইতে থাকে,তিনিও সেইরূপ দিন দিন ক্ষীণ-কলেবর ধারণ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার রামচন্দ্রের বিশালনয়ন বদনমণ্ডল সম্প্রতি পাকপ্রফুল্ল বিলীনভৃঙ্গাবলি শ্বেতাম্বুজের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ শোভা ধারণ করিল। তিনি স্বীয় পাণিকমল কপোলতলে বিন্যস্ত করিয়া চিন্তান্বিতমনে পদ্মাসনে উপবেশন করত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক প্রায় অধিক সময়ই নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাংসারিক কোনরূপ চিন্তা বা দুঃখের সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি গভীর চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল,তিনি ক্ষীণাঙ্গ হইলেন; মনে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পড়িলেন। কেহ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিতেন না, মাত্র চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবেই অবস্থান করিতেন। তৎকালে রাম অন্য কোন কর্ম্মই করিতেন না, কেবল পরিজনগণের একান্ত অনুরোধে দৈনিক অবশ্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদিরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; পরন্তু তাঁহার সেই নিসর্গবিমল মুখকমল ক্রমেই পরিম্লান হইতে লাগিল।

অনন্তর সকলগুণনিধান রামচন্দ্রকে ঈদৃশদশায় উপনীত হইতে দেখিয়া রামানুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহারাও তদবস্থাপন্ন হইলেন। পরে পৃথিবীপতি দশরথ পত্নীগণসহ আত্মজগণকে তাদৃশ দুঃখিত ও ক্ষীণকলেবর অবলোকন করিয়া চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একদিবস তিনি পরম

সমাদরে মধুর-বাক্যে সম্বোধন করিয়া রামকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস রাম! তুমি কেন এরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছ, তোমার চিন্তা কি?" পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র পিতার বাক্য শ্রবণে অধিক কোন কথাই বলিলেন না, কেবল "না তাত! আমার কিছুই দুঃখ নাই" এই মাত্র বলিয়াই পিতৃক্রোড়ে তূষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর নৃপবর দশরথ সর্ব্বকার্য্যাভিজ্ঞ বাগ্মিপ্রবর বশিষ্ঠ মুনির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহর্ষে! রাম এরূপ খেদান্বিত হইতেছে কেন?" রাজার বাক্য শ্রবণে মুনিবর বশিষ্ঠ কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—হে রাজন্! রাম খেদান্বিত হইবার বিশেষ কারণ আছে, পরন্তু এ জন্য আপনি মনে কোনরূপ দুঃখ করিবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যাঁহারা প্রকৃত ধীর পুরুষ, তাঁহারা কখন অল্প কারণ বশতঃ কোপ, বিষাদ বা হর্ষের বশীভূত হন না। হে ভূপ! ইহার স্থল দেখুন, জগতে ক্ষিতি প্রভৃতি এই যে পঞ্চ মহাভূত রহিয়াছে, ইহারা এক সৃষ্টি অথবা প্রলয়কাল ভিন্ন অন্য কোন সময়েই একেবারে বিকারবিশিষ্ট হয় না।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ সর্গ।

-:*:—

বাল্মীকি কহিলেন,—সংদিগ্ধচেতা মহারাজ দশরথ মুনিনায়ক বশিষ্ঠকর্ত্তৃক ঐরূপে উক্ত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সন্দেহনির্ণয়ের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ-কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজভবনস্থিত মহিষীগণ দুঃখিতচিত্তে রামের চেষ্টাবিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাবধানহইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রথিতনামা মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাপতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন। বীর্য্যবলোন্মত্ত মায়াবী নিশাচরগণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞক্রিয়ার নিরন্তর বিঘ্ন উৎপাদন করায়, তিনি একাকী কোনরূপেই যজ্ঞক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না; সুতরাং যজ্ঞরক্ষার নিমিত্ত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। মহাতেজা তপোনিধি বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া রাজধানী অযোধ্যা-নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। মহর্ষি অযোধ্যা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজার দর্শনাভিলাষে দ্বার-পালদিগকে আদেশ করিলেন,—হে দ্বারপালগণ! তোমরা শীঘ্র গিয়া রাজার নিকট এই সংবাদ প্রদান কর যে, "গাধিনন্দন মহর্ষি কৌশিক তপোবন হইতে আগমন করিয়াছেন।"

দ্বারপালগণ মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ত্রান্তমনে রাজ-ভবনে গিয়া স্বীয় প্রভুর নিকট মহর্ষির আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। অনন্তর দ্বারপালপতি যাষ্টীক ত্বরান্বিত হইয়া আস্থানমণ্ডপাগত নৃপমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নরপতি দশরথের সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিল "দেব! নবোদিত প্রভাকরসমপ্রভ জ্বালারুণজটাজূটশালী মহাতেজা শ্রীমান্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মহারাজ! তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থান এবং তথাকার সমস্ত বস্তুই তাঁহার তেজোরাশি দ্বারা কাঞ্চনকান্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে।"

নৃপবর দশরথ অসুদ্ধতবাদী যষ্টিধারী দ্বারপালের নিকট মুনিবর বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ও সামন্তনৃপগণসমভিব্যা-

হারে সহসা হৈম সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ বামদেব ও অন্যান্য নরপতিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া যথায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি বিশ্বামিত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, দ্রুতপদ-সঞ্চারে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা দশরথ দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—যেন কোন কারণ বশতঃ ভূমিতলাবতীর্ণ প্রচণ্ডতেজা মার্ত্তণ্ডদেবের ন্যায়, ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র তেজঃপরিব্যাপ্ত মহাতেজা মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃপ্রকর্ষ পলিত জটামণ্ডলী নিরন্তর তপস্যাচরণে রুক্ষভাব ধারণ করিয়া স্কন্ধদেশে বিলম্বিত হওয়ায়, তৎকালে তিনি সন্ধ্যাকালীন অরুণবর্ণ জলদজালরঞ্জিত অচলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। তাঁহার আকৃতি সৌম্য, কান্ত অপ্রধৃষ্য ও তেজঃপ্রকর্ষে দুর্দর্শনীয়; তিনি বিনয়ান্বিত প্রগল্‌ভাকার ও কান্তিমৎ বপু ধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার পেশল অথচ ভয়ানক, প্রসন্ন অথচ অনাকুল, গম্ভীর ও অপরিচ্ছেদ্য তেজোরাশি দ্বারা যেন বহির্নিঃসৃত প্রভাপুঞ্জ রঞ্জিত হইতেছিল। তিনি হস্ত দ্বারা তাঁহার অনন্তজীবনের চিরসহচর একটী সুন্দর কমণ্ডলু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চিত্ত করুণাপূর্ণ হওয়ায় তিনি সুমধুর সম্ভাষণের সহিত প্রসন্ন অবলোকন দ্বারা যেন অমৃতজলসেচনে প্রজাপুঞ্জকে সিক্ত করিতেছেন। তাঁহার শরীরে অনুরূপ যজ্ঞোপবীত বিলম্বিত রহিয়াছে ও বদনমণ্ডলে ধবলোন্নত ভ্রূযুগল শোভিত হইতেছে এবং তিনি দর্শকদিগের অন্তঃকরণে যেন অনন্ত বিস্ময়রাশি প্রদান করিতেছেন।

রাজা দশরথ দূর হইতে তথাবিধ মুনিবরকে অবলোকন পূর্ব্বক বিনম্রমূর্ত্তি হইয়া মৌলিবিরাজিত বিবিধ মণিমাণিক্যময় কিরীট দ্বারা ভূমিতল স্পর্শ করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দিবাকর যেমন দেবেন্দ্রকে প্রত্যভিবাদন করেন, সেইরূপ মহর্ষি বিশ্বামিত্রও সুমধুর উদার বাক্যে ভূপতিকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। পরে বশিষ্ঠপ্রমুখ দ্বিজাতিগণ সকলেই সেই মুনিকে যত্নপূর্ব্বক স্বাগতসম্ভাষণাদিক্রমে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দশরথ তাঁহাকে কহিলেন,—"হে সাধো! যেমন সমুদিত সরোজিনীপতি স্বীয় ময়ূখমালা দ্বারা কমলাকর সকল প্রফুল্লিত করিয়া থাকেন,

তদ্রূপ আমরাও অদ্য ভবদীয় অসম্ভাবনীয় শুভাগমনে ও পবিত্র-প্রসন্নমূর্ত্তি দর্শনে নিরতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। হে মুনে! অদ্য আমি আপনার দর্শন লাভ বশতঃ যাহা অনাদি, যাহা অক্ষুণ্ণ এবং যাহা অপায়হীন, সেই পরমানন্দ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থসুখ প্রাপ্ত হইলাম এবং অদ্য যখন আমি ভবদীয় শুভাগমনের লক্ষ্যস্থান হইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমি এই ভুবন-মণ্ডলে ধন্য ও ধার্ম্মিক জনগণের অগ্রগণ্য হইলাম।”

এইরূপে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া ভূপতি দশরথ, অন্যান্য রাজগণ ও মহর্ষিগণ, ইহাঁরা সকলেই সভামণ্ডপে প্রবেশ করত স্বীয় স্বীয় আসনোপরি উপবেশন করিলেন। নৃপবর দশরথ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তপঃপ্রভায় পরি-পূরিত দেখিয়া শঙ্কাসন্তোষসহকারে স্বয়ংই তাঁহাকে অর্ঘ্য নিবেদন করি-লেন; মুনিবর কৌশিকও রাজার নিকট যথাবিধি অর্ঘ্য প্রতিগ্রহপূর্ব্বক প্রদক্ষিণকারী রাজাকে সমাদর-সহকারে আপ্যায়িত করিলেন এবং তৎ-কালে তিনি রাজাকর্ত্তৃক সমর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে শারীরিক ও আর্থিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত অর্চ্চনা ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে তাঁহারা দশরথভবনে মিলিত হইয়া ক্ষণকাল যাবৎ পরস্পর যথাযোগ্য পূজা ও সম্ভাষণাদি করত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপ-বেশনপূর্ব্বক সকলেই সমাদর সহকারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীমান্ কৌশিকমুনি আসনোপরি উপবেশন করিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে পুনঃপুন পাদ্য-অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিলেন এবং যথাবিধি পূজা সমাপনান্তে প্রযত ও প্রীতিমনা হইয়া অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—“হে মুনে! মনুষ্যের অমৃতলাভ, বহুকাল অনাবৃষ্টির পর জলবর্ষণ ও অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু লাভ যেমন আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে, আমাদের পক্ষে ভবদীয় শুভাগমনও সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। হে মহর্ষে! পুত্রহীন ব্যক্তির পুত্রপ্রাপ্তি, স্বপ্নে দরিদ্রের ধনলাভ, অভীষ্ট বস্তুর সংযোগ, প্রিয়জনের সমাগম, প্রনষ্ট বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি, ভূচরদিগের খেচরত্বলাভ এবং মৃত ব্যক্তির পুনরাগমনে যাদৃশ আনন্দোদয় হইয়া

থাকে, এক্ষণে আপনার শুভাগমনেও আমাদের তদ্রূপ আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুনে! আপনার আগমন বিনা ক্লেশে হইয়াছে ত? হে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মলোকে বাস কাহার না প্রীতি উৎপাদন করে, আমি যথার্থই বলিতেছি যে, ব্রহ্মলোকে বাস করিলে যেরূপ আনন্দ হয়, ভবৎসমাগমেও অদ্য আমি তাদৃশ আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আপনার অভিলাষ কি? এবং আমি আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা আমাকে আদেশ করুন। হে ঋষে! আপনি সৎপাত্র এবং পরম ধার্ম্মিক।

হে মহর্ষে! আপনি প্রথমতঃ রাজর্ষি শব্দে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, এ নিমিত্তও আপনি আমার নিকট সাতিশয় পূজনীয়। হে মুনিবর! যেমন গঙ্গাজলাভিষেকে পরমা প্রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভবদীয় দর্শনেও আমার যে প্রীতি সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আমার অন্তঃকরণ সুশীতল করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! কোনরূপ অভিলাষ, ভয়, ক্রোধ, অনুরাগ বা আময় এ সমুদায়ের কিছুই আপনার নাই। তথাপি আপনি যে আমার নিকট সমাগত হইয়াছেন, ইহাই পরম আশ্চর্য্য।

হে বেদবিদগ্রণী! অদ্য আপনার শুভাগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অন্তঃকরণেরও নিখিল পাপ দূরীভূত হইয়াছে এবং আনন্দবশতঃ বোধ হইতেছে, যেন আমি সুধাংশুমণ্ডলেই নিমগ্ন হইয়াছি। হে মুনে! আমার মনে হইতেছে ভবদীয় আগমনই সাক্ষাৎ ব্রহ্মের আগমন। সুতরাং আপনার আগমনে অদ্য আমি অত্যন্ত পূত ও অনুগৃহীত হইলাম। হে সাধো! ভবদীয় আগমনপুণ্যে অদ্য আমার জন্ম অনুরঞ্জিত এবং জীবনও সার্থক হইয়াছে। পরন্তু ইন্দুসন্দর্শনে উদ্বেলিত জলধিজল যেমন অপর্য্যাপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমিও আপনাকে দর্শনাদি করিয়া যতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরে অপর্য্যাপ্ত হইতেছে।

হে মুনিপুঙ্গব! আপনি যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন এবং যে কার্য্য আমাকে করিতে হইবে, আপনি অবধারণ করুন, যেন আমা দ্বারা আপনার সেই কার্য্য সম্পাদিতই হইয়াছে; কেননা, আপনি আমার নিত্য পূজনীয়। হে কৌশিক! স্বীয় কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে আপনি কোন

রূপ বিচার বা সন্দেহ করিবেন না। আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন বস্তুই আপনাকে আমার অদেয় নাই। অতএব আমাদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না, আপনি এরূপ বিচার না করিয়া আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার সমুদায় কার্য্যই সম্পাদন করিব। আপনি আমার পরম দেবতা।

প্রথিতযশা মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্র তৎকালে আত্মবিৎ রাজা দশরথ কর্ত্তৃক সবিনয়ে সমুদীরিত শ্রবণসুখকর মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সপ্তম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—তেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি নরপতিকেশরী দশরথের সেই আশ্চর্য্যার্থশালিনী বিবিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া পুলকিতশরীরে বলিতে লাগিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! এই মহীতলে তুমি মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ এবং তুমি মহর্ষি বশিষ্ঠের বশবর্ত্তী; সুতরাং এইরূপ আচরণ ও বাক্যপ্রয়োগ ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুরূপই হইয়াছে। হে নৃপ! আমার মনোগত বাক্য তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করত ধর্ম্মপালন কর।

হে পুরুষপ্রবর! আমি যখন সিদ্ধিলাভ কামনায় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে যে যে সময়েই আমি যাগানুষ্ঠানে দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিতে উপক্রান্ত হইয়া থাকি, দুর্ব্বৃত্ত রজনীচরগণ সেই সেই সময়েই আমার যাগক্রিয়ার বিঘ্ন সাধন করে। আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত বহুবার উদ্যোগী হইয়াছি, কিন্তু রাক্ষসদলপতিগণ রুধির ও মাংস বর্ষণে প্রত্যেক বারই আমার যজ্ঞভূমি দূষিত করিয়া বিঘ্ন সম্পাদন করিয়াছে। রাত্রিঞ্চরগণ মদমূর্চ্ছিত তথাবিধ বহুতর যাগক্রিয়ার বিঘ্নবিধান

করিলে,আমি পরিশ্রান্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া একেবারে সেই দেশই পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি ; পরন্তু হে পার্থিব ! ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতেও আমার বুদ্ধি হইতেছে না। কেন না, যাগাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াই অনুষ্ঠান করিতে হয়, সুতরাং ক্রোধপুরঃসর অভিসম্পাত প্রদান করা এ কার্য্যে কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

হে রাজন্! সেই যজ্ঞদীক্ষা এইরূপ অর্থাৎ তাহা ক্রোধ শাপ প্রভৃতির অযোগ্য। এ কারণ আমি তোমার প্রসাদেই সেই মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া মহাফল প্রাপ্ত হইব। রাজন্! আর্ত্ত এবং শরণার্থী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। ইহা তোমার অবশ্যই জানা আছে যে, প্রার্থিগণের অভীষ্ট পূরণ না করা, সাধুতম ব্যক্তির তিরস্কারস্বরূপ।

হে রাজশার্দ্দূল ! তোমার তনয় শ্রীমান্ রামচন্দ্র দৃপ্ত মৃগেন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, মহেন্দ্রসদৃশ বীর্য্যমান্ ও রাক্ষস কুলের ধ্বংসসাধনে বিলক্ষণ সক্ষম। অতএব তুমি এক্ষণে সেই কাকপক্ষধারী, মহাবল পরাক্রান্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকেই আমার নিকট প্রদান কর। রামচন্দ্র আমার দিব্যতেজঃ-প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নিশ্চয়ই অপকারী রাক্ষসগণের শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন। আমি বহুবিধ অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের এরূপ অপরিসীম শ্রেয়ঃ সাধন করিব,যাহাতে তিনি ভবিষ্যৎ কালে ত্রিলোক-বাসী জনগণের নিকট সর্ব্বপ্রকারে পূজনীয় হইবেন। হে রাজন্! যেমন কাননমধ্যে ক্রোধোদ্দীপ্ত কেশরীকে দেখিয়া হরিণগণ তৎসম্মুখে অবস্থান করিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ রণস্থলে নিশাচরগণও রামসম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। যেরূপ কোপযুক্ত কেশরী ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীই মদমত্ত মাতঙ্গগণের সহিত বিগ্রহ করিতে উৎসাহসম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ সেই গর্ব্বিত কর্ব্বুরকুলের সহিত যুদ্ধ করিতেও একমাত্র রাম ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই উৎসাহী হইবে না।

হে নরাধিপ! সেই সকল কালকূটসদৃশ পাপিষ্ঠ রাক্ষসগণ এক্ষে ক্ষু

বীর্য্যাতিশয়ে গর্ব্বিত,তাহাতে আবার-খর দূষণের ভৃত্য ;সুতরাং রণক্ষেত্রে কোপান্বিত কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু হে নরনাথ ! যেরূপ ধূলিপটল জলদ-পতিত অবিরল জলধারা সহ্য করিতে অক্ষম, তদ্রূপ রজনীচর সকলও রণাঙ্গনে রাম-নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু হে পার্থিব! তুমি পুত্রস্নেহ-বশত রামকে আমার নিকট প্রদান করিতে বিমুখ হইও না, কেননা, ইহজগতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা মহাত্মগণের অদেয়। অহো! আমি ইহা নিশ্চয়ই বিদিত আছি এবং তুমিও অবগত হও যে,'যেন রাক্ষসকুল রাম-কর্ত্তৃক নিহতই হইয়াছে' কেন না, অস্মদ্বিধ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিগণ কদাপি সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন্ না।

হে ধরাপতে ! কমলদলনয়ন রামকে আমি জানি, মহাতেজা বশিষ্ঠ-মুনি জানেন এবং অপরাপর দূরদর্শী ব্যক্তিগণও জানেন,—তিনি মহাত্মা, তিনি ইশ্বর। যাহা হউক, যদ্যপি তোমার মনে ধর্ম্ম, মহত্ত্ব এবং যশো-লাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি তোমার প্রিয়তম পুত্র রাম-চন্দ্রকে আমার নিকট প্রদান কর। আমি এক্ষণে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তাহা দশ দিবসে সম্পাদিত হইবে। রামচন্দ্র এই দশ দিন মধ্যেই মদীয় যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসদিগকে নিহত করিতে পারিবেন। অতএব হে কাকুৎস্থ ! এ বিষয়ে তোমার মন্ত্রণাকুশল বশিষ্ঠপ্রমুখ মন্ত্রিগণ অনুমতি প্রদান করুন এবং তাঁহাদের মতানুসারে তুমিও রামকে মৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ কর। হে কালজ্ঞ ! যাহাতে আমার যজ্ঞের অঙ্গভূত কাল অতীত হইয়া না যায়,তুমি তাহা সম্পাদন কর। 'তোমার মঙ্গল হউক,পরন্তু পুত্রের নিমিত্ত মনে কোন শোক করিও না। হে নরবর ! যদি যথাকালে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও সম্পাদিত হয়, তথাপি তাহা উপকার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, পরন্তু উপযুক্তকাল অতিক্রম করিয়া উপকারের নিমিত্ত বৃহৎ কার্য্য সাধিত হইলেও তাহা বিফল হইয়া যায়।

ধর্ম্মনিরত মহাতেজা মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র এবম্বিধ ধর্ম্ম্য বাক্যাবলী বলিয়া বিরত হইলেন। অন্যদিকে মহানুভব দশরথও মুনিবর-কথিত সঙ্গত বাক্য

শ্রবণপূর্ব্বক উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বী হইয়া রহিলেন। কেন না, যে ব্যক্তি যথার্থ বুদ্ধিমান্, তিনি যুক্তিযুক্ত বাক্য ভিন্ন কখন পরিতোষ লাভ করিতে পারেন না।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

—*—

বাল্মীকি কহিলেন,—নরপতিপ্রধান দশরথ বিশ্বামিত্র মুনির তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমাত্র নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিয়া পরে অতি দৈন্য সহকারে বলিতে লাগিলেন,—হে মুনে! কমলনয়ন রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ; সুতরাং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা এখনও ইহার দেখিতেছি না। প্রভো! আমার এই যে পূর্ণ অক্ষৌহিণী সেনা রহিয়াছে, একমাত্র আমিই ইহাদিগের অধীশ্বর। অতএব এই সেনাসমূহ পরিবৃত হইয়া আমিই সেই পিশিতাশী নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার সৈন্যগণ সকলেই বলবিক্রান্ত ও মন্ত্রণাদক্ষ, সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক আমি স্বয়ংই ইহাদিগের রক্ষাবিধান করিয়া থাকি। হে মুনে! কেশরী যেমন মদমত্ত মাতঙ্গগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমিও এই সেনাসমবায়ে সমবেত হইয়া ইন্দ্র হইতেও প্রবল বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। মুনিবর! রামচন্দ্র বালক, সে সৈন্যগণের বলাবল সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে, অন্তঃপুরমধ্যস্থ ক্রীড়াকল্পিত রণভূমি ব্যতীত প্রকৃত রণভূমি তাহার নয়নগোচর হয় নাই। রাম এখনও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বা পরমাস্ত্রসম্পন্ন হইতে পারে নাই; রণদক্ষতা দূরের কথা, রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া রণদুর্ম্মদ সহস্র সহস্র বীর যোদ্ধার সহিত এককালীন যে কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও রামের অবিদিত। বালক রাম অদ্যাপি প্রসূনপরিশোভিত উদ্যান,

নগর, উপবন ও উদ্যানবনকুঞ্জ মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। সমবয়স্ক রাজকুমারগণের সহিত এখনও কেবল কুসুমসমাকীর্ণ স্বীয় অঙ্গন-ভূমিতেই বিহার করিতে জানে। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আবার মদীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয় হেতু রামচন্দ্র হিমসমাচিত কমলের ন্যায় সতত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছে। রাম পানভোজনাদি কিছুই করে না এবং গৃহ হইতে গৃহান্তর-গমনেও তাহার শক্তি নাই। কেবল অন্তঃকরণের খেদবশতঃ সর্ব্বদা তুষ্ণীম্ভাবেই অবস্থান করিতেছে। হে মুনিনায়ক! আমি রামের নিমিত্ত স্ত্রী ও ভৃত্যাদিসহ শারদীয় জলধরের ন্যায় নিশ্চয়ই নিঃসারতা প্রাপ্ত হইয়াছি। বালক রাম শারীরিক ঈদৃশ দশায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে আবার মানসিক ব্যথায় অবসন্ন; সুতরাং আমি কি প্রকারে সেই প্রবল নিশাচর-গণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রামকে আপনার নিকট প্রদান করিব!

হে মহামতে! বালাঙ্গনা-সংসর্গ, সুধারস-সমাস্বাদন অথবা সাম্রাজ্য-ভোগ ইত্যাদি যতপ্রকার সুখ আছে,আমার জ্ঞান হয়,একমাত্র পুত্রস্নেহই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুখপ্রদ হইয়া থাকে! এই ত্রিলোকমধ্যে যে সকল দীর্ঘকাল-সাধ্য কষ্টজনক কার্য্যকলাপ বিহিত আছে, পুত্রস্নেহবশতঃ ধার্ম্মিকজনগণও নিঃসন্দেহে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মানবগণ ধন, প্রাণ ও ভার্য্যাপ্রভৃতি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্বীয় পুত্রকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারে না। হে মুনিশার্দ্দূল! এই স্বভাবই প্রাণিমাত্রে বর্ত্তমান। পরন্তু সেই ক্রূরকর্ম্মনিরত কূটযুদ্ধদক্ষ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধানভিজ্ঞ রাম যুদ্ধ করিবে, এ কথা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং আমিও রামের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না,অতএব আপনি যদি আমাকে জীবিত রাখিতে কামনা করেন, তাহা হইলে রামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন না।

হে কৌশিক! আমি এই নবসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকামনায় অশ্বমেধাদি নানাবিধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া অতিদুঃখে এই পুত্রচারিটী লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কমলদলনয়ন রামই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ; সুতরাং রাম ব্যতীত মদীয় অন্যান্য পুত্রগণও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না।

এ অবস্থায় আপনি যদি রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেই রামকেই এ ক্ষণে লইয়া যান, তাহা হইলে আপনি জানিবেন,—পুত্রবিচ্ছেদে অচিরকাল-মধ্যে আমার জীবন-বিয়োগ ঘটিয়াছে।

হে মহামুনে! আমার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে রামই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, ধর্ম্মনিরত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন; এ নিমিত্ত তাহার প্রতিই আমার সাতিশয় প্রীতি রহিয়াছে, অতএব আপনাকে আমি অনুরোধ করি,—আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। হে মহর্ষে! যদি নিশাচরদিগকে বিনাশ করাই আপনার অভিগত হয়, তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ-বলসমন্বিত আমাকেই আপনি লইয়া চলুন। হে মুনে! যে সকল নিশাচর আপনার যজ্ঞক্রিয়ার বিঘ্নবিধান করে, তাহারা কাহার পুত্র এবং কিরূপ বীর্য্যশালী? তাহাদের নাম কি ও আকৃতিই বা কি প্রকার এবং তাহারা কিরূপ ভাবেই বা অবস্থান করে, আপনি ইহা আমার নিকট বিশেষ করিয়া বলুন। পক্ষান্তরে হে ব্রহ্মন্! রাম অথবা আমার অন্য বালকত্রয় কিংবা আমি আমরা কিরূপে সেই কূটযুদ্ধকারী রাক্ষসদিগের প্রতিকারসাধন করিব এবং কি প্রকারেই বা সেই বীর্য্যবলোন্মত্ত নিশাচরগণের যুদ্ধে অবস্থান করিব, ইহাও আমার নিকট প্রকাশ করুন্। আমি শুনিয়াছি, বিশ্রবা মুনির তনয় গুহ্যকাধিপতি কুবেরের ভ্রাতা রাবণনামক এক নিশাচর আছে, যদি সেই দুর্ম্মতিই আপনার যজ্ঞের বিঘ্নবিধায়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, আমাদের এরূপ ক্ষমতা কাহারও নাই।

হে ব্রহ্মন্! এক এক কালে প্রভূতবীর্য্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন পৃথক্ পৃথক্ জীব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, আবার কালবশতঃ তথাবিধ জীবগণের বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদি বিলীন হইয়া যায়। সম্প্রতি যে কাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমরা রাবণাদি রিপুগণের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ নহি, ইহা বিধাতারই নিশ্চয়। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমার অনুকম্পার্হ পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি মন্দভাগ্য, আমার আপনি পরম দেবতা। হে সর্ব্বদর্শিন্! সাধারণ মানবের কথা আর কি বলিব। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা পন্নগ ইহারাও রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষমবান নহে।

নিশাচরাধিপতি রাবণ রণস্থলে প্রভূত বীর্য্যশালিগণেরও বীর্য্যবল খর্ব্ব করিয়া থাকে, সুতরাং বালকদিগের কথা কি, আমরাও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম। সম্প্রতি যে কাল পড়িয়াছে, ইহা অন্যতম কাল; এ কালে সাধুজনগণও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। অধিক কি, আমি রঘুবংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াও বার্দ্ধক্যবশতঃ শিথিল কলেবর ধারণ করিতেছি।

হে ব্রহ্মন্! যদি মধুদৈত্যতনয় লবণ রাক্ষসও আপনার যজ্ঞবিঘাতক হইয়া থাকে, তথাপি তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তও রামকে আমি প্রেরণ করিব না। অথবা আপনি যদি বলেন যে, সুন্দোপসুন্দের দুই কৃতান্তোপম তনয় আমার যজ্ঞবিঘ্নকর হইয়াছে, তথাপি রামকে আমি সমর্পণ করিব না। হে মহর্ষে! এইরূপ আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি যদি রামকে লইয়া যান, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আমি হত হইয়াছি। অন্যথা অর্থাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন ভিন্ন এ বিষয়ে অন্য কিছুই স্বীয় মঙ্গলজনক দেখিতেছি না।

রঘূদ্বহ রাজা দশরথ মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বিনয়-সহকারে এই সকল বাক্য বলিয়া মুনির [illegible] মুনির অভিমত বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মহোর্ম্মিমালাসমাকুল জলধিজল-পতিত মানবের ন্যায় ক্ষণ-কালের নিমিত্তও কোনরূপ কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—পৃথ্বীপতি দশরথ স্নেহাকুলনয়নে বিনীতভাবে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে উক্তরূপ বাক্য সকল বলিলে তিনি তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হে ভূপতে! তুমি আমার অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিবে বলিয়া, প্রথমতঃ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, এক্ষণে আবার তাহার বিপর্য্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অহো! তুমি কেশরী হইয়াও সামান্য মৃগ হইবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছ। যাহা হউক, প্রথমে তুমি অঙ্গীকার করিয়া তৎপরে তাহার এই যে বিপরীত আচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহা কখনই রঘুবংশীয়দিগের কুলোচিত কার্য্য হয় নাই, আমার জ্ঞান ছিল, শীতাংশু হইতে কদাপি উষ্ণ কিরণজাল নির্গত হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে

তুমি যদি তোমার প্রতিজ্ঞাত বিষয় পরিপালন করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে আমি যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছি, পুনর্ব্বার তথায়ই গমন করিব। তুমি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া বন্ধু-বান্ধবগণ সহ সুখী হও।

বাল্মীকি কহিলেন,—যখন মহাত্মা বিশ্বামিত্র কোপপরিব্যাপ্ত হইয়া ঐ কথা কহিলেন, তখন সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইল এবং দেবগণও সাতিশয় ভীত হইলেন। ইত্যবসরে ধৃতিশালী ধীমান্ বশিষ্ঠ, মহামুনি বিশ্বামিত্রকে ক্রোধাভিভূত জানিতে পারিয়া নরপতি দশরথকে বলিতে লাগিলেন,—"হে নরনাথ! আপনি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন। ত্রিভুবনে গুণবান্ মানবগণের যে সকল ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ গুণ আছে, আপনিও সেই সকল গুণে বিভূষিত। সুতরাং সুব্রত হইয়া ভবাদৃশ ধৃতিমান ব্যক্তির কদাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। রাজন! আপনি ত্রিলোকমধ্যে ধার্ম্মিক ও যশস্বী বলিয়া বিখ্যাত। এ কারণ আমি বলি, আপনি স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না এবং ত্রিভুবনেশ্বর মুনিবর বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করুন। হে নরাধিপ আপনি পূর্ব্বে 'আদেশ পালন করিব' বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে যদি তাহা প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে আপনার পূর্ব্বানুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান, ব্রত প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব সম্প্রতি রামকে মহর্ষির নিকট সমর্পণ করুন। আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এবং স্বয়ং দশরথ নামে বিখ্যাত রাজা হইয়াও যদি সত্য বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বলুন দেখি, অপর কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিবে? হে জনাধিপ! ভবাদৃশ বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে সকল ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, অজ্ঞজনগণ তদ্দর্শনেই ধর্ম্মমর্য্যাদা উলঙ্ঘন করে না। এ কারণে ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা আপনার পক্ষে উচিত নহে। হে ভূপতে! বহ্নি যেমন অমৃত রক্ষা করেন, এই পুরুষসিংহ বিশ্বামিত্রও রামচন্দ্রকে সেইরূপ রক্ষা করিবেন, সুতরাং ইনি কৃতাস্ত্রই হউন বা অকৃতাস্ত্রই হউন রাক্ষসেরা ইহাঁর কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না।

হে রাজন। এই বিশ্বামিত্র মুনি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, বীর্য্যশালীদিগের অগ্রগণ্য, লোকমধ্যে সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধিমান এবং তপস্যার আধার। চরাচর

ত্রিলোকমধ্যে ইনিই বিবিধ অস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইহাঁর ন্যায় অন্য কোন ব্যক্তিই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী নাই এবং হইবেও না। সুর, অসুর, নিশাচর, ঋষি, নাগ, যক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব ইহারা সকলে মিলিত হইলেও প্রভাবে বিশ্বামিত্র মুনির সমান হইতে পারিবে না। পূর্ব্বে যখন এই কুশিকবংশ-প্রসূত বিশ্বামিত্র রাজ্যলাভ করিয়া তাহার শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন শত্রুদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত ইনি রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। রুদ্রদেব ইহাঁর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁকে কৃশাশ্বজনিত পরম দুর্জ্জয় অস্ত্র সকল প্রদান করেন। ঐ সকল কৃশাশ্বপুত্র অস্ত্রদেবগণ প্রজাপতি-সুতসদৃশ বীর্য্যশালী, মহাবিক্রান্ত, অত্যন্ত দীপ্তিমান ও শত্রুকুলের উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ। ইহারা এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে বশীভূত হইয়া অনুচরের ন্যায় ইহাঁকে সেবা করিতেছে। জয়া ও সুপ্রভা নামে দক্ষপ্রজাপতির পরম রূপবতী দুইটী কন্যা ছিল, তাহাদের উভয়ের পরম দুর্জ্জয় একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে জয়া পতিশুশ্রূষায় বর লাভ করিয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কামচারী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন পঞ্চাশত পুত্র উৎপাদন করেন। সুপ্রভাও সংহারনামক অপর পঞ্চাশৎ পুত্র প্রসব করেন, সুপ্রভার পুত্রগণ সকলেই দুর্দ্ধর্ষ, ভীষণাকৃতি ও বলবান্ ছিল।

হে মহীপতে! এই সর্ব্বদর্শী মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন। অতএব রাম ইহাঁর সহিত গমন করিবেন, এ বিষয়ে আপনি বুদ্ধি বিপ্লব করিবেন না। হে সাধো! অধিক কি, এই মহা সত্বশালী মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র যদি সমীপভাগে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে,তাদৃশ সাধারণ মানবও যখন মৃত্যু ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে, তখন বিশ্বামিত্র-পরিরক্ষিত মহাপ্রভাবসম্পন্ন রামচন্দ্রের নিমিত্ত আপনার ভাবনার-বিষয় কি? আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ হইতে রামের কোন ভয়েরই সম্ভাবনা নাই। অতএব হে রাজন্! আপনি বিমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় কদাচ বিষণ্ণভাব ধারণ করিবেন না।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

—:*:—

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ নরপতি দশরথকে ঐ সকল কথা কহিলে তিনি বিষণ্ণভাব পরিহার করত আনন্দিতহৃদয়ে স্বীয় তনয় রাম-লক্ষ্মণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত জনৈক দৌবারিককে আদেশ করিলেন, "হে দৌবারিক! তুমি লক্ষ্মণের সহিত মহাবাহু সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে শীঘ্র নিরাপদে মৎসন্নিধানে আনয়ন কর।" দৌবারিক নরপতির আদেশ-শ্রবণে রামলক্ষ্মণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরালয়ে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহীপতি-সমীপে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক বলিল, "হে দোর্দ্দণ্ড-দলিত-নিখিল-রিপো! হে দেব! ভৃঙ্গ যেমন রাত্রিকালে কমলিনী মধ্যে উন্মনা হইয়া অবস্থান করে, রামচন্দ্র নিজ গৃহমধ্যে সেইরূপ বিমনা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! আমি তাঁহাকে আপনার নিকট আগমনের নিমিত্ত আহ্বান করিলে তিনি 'ক্ষণকালের মধ্যেই আসিতেছি,' এই মাত্র বলিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন; তিনি খেদান্বিতমনে কাহারও নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষী নহেন।"

দৌবারিক এই কথা কহিলে মহীপতি দশরথ তৎসহাগত রামানুচরকে আশ্বাসিত করত যথাক্রমে সমুদয় ঘটনা জিজ্ঞাসা করিতে উপক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "হে রামানুচর! তুমি বল, রামচন্দ্র কি জন্য এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং এক্ষণে কিরূপ ভাবেই বা অবস্থান করিতেছে" নৃপবর এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে রামানুচর সাতিশয় খিন্নমনে বলিতে লাগিল, "হে রাজন্! আপনার তনয় রামচন্দ্রের শরীর খেদনিবন্ধন দিন দিন পরিম্লান হইয়া যাইতেছে, এ নিমিত্ত আমরাও খিন্ন হইয়া এইরূপ কৃশ কলেবর ধারণ করিতেছি। সেই কমলদল-নয়ন রাম যে অবধি দ্বিজাতিগণ সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রা হইতে নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়াছেন, সেই অবধি দিন দিন কৃশ ও দুর্ম্মনা হইতেছেন। রামের কোনও বিষয়ে কোনরূপ অভিলাষ নাই, কেবল আমরা যদি যত্নসহকারে তাঁহাকে একান্ত অনুরোধ করি, তাহা হইলে তিনি মলিনবদনে আপন দৈনিক কার্য্যসকল কোন সময়ে সম্পাদন করেন এবং কখনও বা করেন না। রামচন্দ্র স্নান, দান, দেবার্চ্চন

ও ভোজন ইত্যাদি সমুদায় কার্য্যেই সাতিশয় অন্যমনস্ক হইয়াছেন। আমরা বহু বার প্রার্থনা করিলেও ভোজনকালে তিনি তৃপ্তি-শেষরূপে আহার করেন না। রামচন্দ্র এখন আর বারিধারাসহ ক্রীড়াকারী চাতকের ন্যায় অন্তঃপুরচারিণী ক্রীড়াভিলাষিণী রমণীগণের সহিত অঙ্গন-ভূমিতে পূর্ব্ববৎ লীলাসহকারে ক্রীড়া করিতেছেন না এবং যেমন স্বর্গ হইতে পতনোন্মুখ স্বর্গবাসীর পক্ষে স্বর্গধাম আনন্দজনক হয় না, সেইরূপ রামের নিকটও মুকুলাকার মাণিক্যখচিত বিবিধ কেয়ূরকটকাদি অলঙ্কারনিকর প্রীতিকর হইতেছে না।

"হে ধরাপতে! রামচন্দ্র মৃদু মন্দ সুগন্ধগন্ধবহ-প্রবাহিত লতানিকুঞ্জবিহারিণী মনোহারিণী কামিনীকুলের কোমল কটাক্ষপাতেও আনন্দ অনুভব করেন না, প্রত্যুত তাহাতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণভাবই ধারণ করেন এবং যে সকল নৃপগণোচিত সুস্বাদু কোমল ও মনোহর বস্তু আছে, তাহার কিছুই তিনি উপভোগ করেন না; পরন্তু সে সমুদায় দর্শন করিবামাত্রই তিনি যেন বাষ্পাকুলনয়নে সমধিক খেদান্বিত হইতে থাকেন। হে রাজন! হাব-ভাব-লাবণ্য-বিলাসাদি-পরিশোভিত পুরাঙ্গনাগণের নৃত্য দর্শনেও রামের মন আনন্দিত হয় না; বরঞ্চ তিনি ঐ সকল নৃত্যকারিণী রমণীদিগকে দুঃখদায়িনী বলিয়াই নিন্দা করিয়া থাকেন। রাম উন্মত্তের ন্যায় আনন্দিত ভোজন, শয়ন, যান, আসন, স্নান ও বিলাস দ্রব্য ইত্যাদি বিষয়ে অভিনন্দন করেন না, পরন্তু 'সম্পদ, বিপদ, গৃহ ও মনোরথ এ সমুদায়ে প্রয়োজন কি? এ সকল অসৎ' এইমাত্র বলিয়াই একাকী তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করেন। রাম সমুদায় হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোনরূপ ভোগ-বাসনায় তাঁহার স্পৃহা নাই এবং কোন কার্য্যেও তিনি আসক্ত হইতেছেন না; কেবল মৌনাবলম্বী হইয়াই অবস্থান করিতেছেন।

"হে জননাথ! যেমন চঞ্চলনয়না হরিণীগণ বন্য পাদপের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ বিলোল অলকাবলী-সমুদ্ভাসিত চপলনয়না কামিনীকুলও বিবিধশৃঙ্গার চেষ্টা দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে পারিতেছে না। হে রাজন্! যদি কোন মনুষ্যকে কোন নীচজাতীয় মনুষ্যের নিকট বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে ঐ বিক্রিত মনুষ্য যেমন একান্তে,

দিগন্তে, নদীপুলিনে ও অরণ্য প্রদেশে বাস করিতে রুচিমান্ হইয়া থাকে, সেইরূপ রামচন্দ্রও বিজন বনে বাস করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। তিনি বসন, আসন, ভোজন, পান ও দানাদি গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া সম্প্রতি পরিব্রাজক তপস্বীদিগের অনুগমন করিতেছেন। রাম নিরন্তর একাগ্রমনে জনশূন্য প্রদেশে উপবেশন করত হাস্য, গান বা রোদন ইহার কিছুই করেন না, কেবল বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশন করিয়া স্বীয় কপোলতলে বাম করতল বিন্যস্ত করত সর্ব্বদা শূন্যমনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কোন বিষয়ে অভিমান নাই, তিনি রাজ্যভোগে অভিলাষ করেন না। তাঁহার সুখোদয়ে হর্ষ নাই এবং দুঃখেও তাঁহার বিষাদ হয় না, হে মহারাজ! রামচন্দ্রের গতিবিধি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তিনি যে কোথায় গমন করেন, কেন আগমন করেন, কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কি চিন্তা করেন এবং কি অনুসন্ধান করেন, ইহা আমরা একেবারেই অবিদিত। পরন্তু হে পৃথিবীপতে! যেমন হিমসমাগমে তরুবর দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইতে থাকে, আমাদের অদৃষ্টক্রমে রামচন্দ্রও সেইরূপ দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইতেছেন। রামের অনুগমনকারী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তাঁহারাও তাঁহার প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিদিন ক্ষীণ ও বিবর্ণভাব ধারণ করিতেছেন। হে মহীপতে! ভৃত্যগণ কি অপরাপর রাজগণ অথবা তাঁহার মাতৃগণও যদি তাঁহাকে বারম্বার বিষাদের হেতু জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তিনি 'কিছুই না' এই মাত্র বলিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার পার্শ্বচর সুহৃৎদিগকে সর্ব্বদাই এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন যে, "হে সুহৃজ্জনগণ! তোমরা কখন আপাতরম্য বিষয়-সমূহে মনোনিবেশ করিও না।"

'হে জগতীপতে! বিলাসভবন-বাসিনী বিবিধ বিভবশালিনী হৃদয়হারিণী রমণীদিগকে অবলোকন করিলে রামের মনে কিঞ্চিন্মাত্রও স্নেহের উদয় হয় না, অধিকন্তু ঐ সকল কামিনীদিগকে তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যু বলিয়াই মনে করিতে থাকেন। রাম সর্ব্বদাই মধুর অস্ফুটস্বরে এইরূপ গান করিয়া থাকেন যে, 'হায় যে যেরূপ চেষ্টা করিলে অনায়াসেই পরমপদ লাভ

করা যায় ; আমি সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বৃথা আয়ুক্ষয় করিলাম।'

"হে রাজন্! রামের পার্শ্ববর্ত্তী অনুজীবিগণের মধ্যে যদি কেহ তাঁহাকে 'সম্রাট্ হও' এই কথা বলে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে প্রলাপবাদী উন্মত্তের ন্যায় মনে করিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে উপহাস করিতে থাকেন। কোন কথা কহিলে তিনি তাহা শ্রবণ করেন না, তাঁহার সম্মুখে কোন বস্তু উপস্থাপিত করিলে তিনি তাহা দর্শন করেন না এবং যদি কোন মনোরম বস্তুও প্রাপ্ত হন, তাহাতেও তিনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। হে রাজন্! যেমন আকাশরূপ মহাবনে আকাশ-কমলিনীর উৎপত্তি একেবারেই অলীক ও বিস্ময়জনক, সেইরূপ মনও অলীক ও বিস্ময়াবহ। এইরূপ ধারণাবলেই রামচন্দ্র বাহ্য বস্তু দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইতেছেন্ না। তিনি যদি বিলাসিনী কামিনীগণের মধ্যেও অবস্থান করেন, তথাপি জলধারা যেমন দুর্ভেদ্য বিপুল উপলখণ্ড ভেদ করিতে পারে না, সেইরূপ মদনবাণও তাঁহাকে ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

"হে নরবর! 'ধনই সকল আপদের আবাসস্থান, অতএব ধনে তোমরা অভিলাষ করিতেছ কেন?' এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র যাচকদিগকে সমুদায় ধনই প্রদান করিতেছেন এবং তিনি নিয়তই এইরূপ গান করিয়া থাকেন যে, 'ইহা আপদ্, ইহা সম্পদ্, এ সমুদায় কল্পনাময় মোহ একমাত্র মন হইতেই উৎপন্ন হইতেছে এবং হায় আমি বিনষ্ট হইলাম, আমি অনাথ হইলাম' এই কথা বলিয়া মানবগণ বিলাপ করিতে থাকে, কিন্তু কেহই বৈরাগ্য অবলম্বন করে না, ইহা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়।'

"হে মহীপতে! রঘুকুল-কাননের মহান্ মহীরুহস্বরূপ সেই রিপুবিনাশন রামচন্দ্র এইরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়াই আমরাও অত্যন্ত খেদান্বিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছি ; কিন্তু হে নলিননয়ন মহাবাহো মহারাজ! তাদৃশ অবস্থাপন্ন রামচন্দ্রের শোকাপনয়নের নিমিত্ত আমরা যে কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; সুতরাং এ বিষয়ে আপনিই আমাদের অবলম্বনীয়, আপনিই তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। রাজন্। যদি কোন নীতিবিদ্ ব্যক্তি রামকে সম্যক্‌রূপে

উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই,কেননা ইহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে যে, যদি কোন রাজা অথবা কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রাজনীতি সম্বন্ধে কোনরূপ উপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে মূর্খ বলিয়াই মনে করেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই বস্তু অমুক, সেই বস্তু এই ইত্যাদি করিয়া বহুবিধরূপে এই যে বিস্তীর্ণ জগৎ-নামক পদার্থটী উত্থিত হইয়াছে, ইহা মিথ্যা ; ইহা বস্তু নহে এবং আমিও বস্তু নহি অর্থাৎ আমিও কিছুই নহি, রামচন্দ্র এইপ্রকার নির্ণয় করত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

"হে বিভো! শত্রু, আত্মা, মিত্র, রাজ্য, মাতা ও সম্পদ বিপদ এ সমুদায়ে তাঁহার আস্থা নাই। তিনি সর্ব্ববিষয়েই আস্থা পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার আশা নাই, অভিলাষ নাই এবং তিনি আত্মবিশ্রান্তিও লাভ করিতে পারেন নাই! তিনি বিবেকী ; সুতরাং তাঁহাকে মূঢ় বলা যায় না এবং অদ্যাপি তাঁহার আত্মবিশ্রান্তি ঘটে নাই বলিয়া তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না। যাহাই হউক, মহারাজ! আমরা রামের ঈদৃশ দশা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতাপই ভোগ করিতেছি।

"হে রাজন্! 'পিতা, মাতা, রাজ্য, ধন এবং যত্ন এ সকল দ্বারা কি হইবে? ইহাতে কোন প্রয়োজনই সাধিত হইবে না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রামচন্দ্র এক্ষণে প্রাণত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন হে নাথ! যেমন অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে চাতক পক্ষী সাতিশয় উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে থাকে,তদ্রূপ রামচন্দ্রও সম্প্রতি ভোগ, আয়ুঃ মাতা, পিতা, মিত্র ও রাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্নমনা হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন অর্থাৎ তিনি মনে মনে ঐসকলকেই মোক্ষ-লাভের অদ্বিতীয় বিঘ্ন বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

"হে পৃথিবীপতে! এইরূপে ভাবনা চিন্তা প্রভৃতি নানাবিধ শাখাপ্রশাখা-শালিনী একটী আপদ্রূপ লতা আসিয়া আপনার পুত্র রামচন্দ্রকে আশ্রয়

করিয়া রহিয়াছে, অতএব আপনি দয়ালু হইয়া অতি সত্বরই ঐ আপদ্‌রূপ লতাটীকে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত সম্যক্‌রূপে উদ্‌যুক্ত হউন। হে প্রভো রামচন্দ্র এক্ষণে তাদৃশ স্বভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং এই যে বিস্তীর্ণ সংসারজাল বিবিধ বিভব দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া কৃত্রিম বেশভূষায় সজ্জিত রহিয়াছে, ইহা তাঁহার নিকট প্রতিকূল বিষয়ের ন্যায়ই প্রতীয়মান হইতেছে। রাজন্‌! এই ভুবনমণ্ডলে আপনি ব্যতীত ঈদৃশ মহাসত্ত্বশালী কোন ব্যক্তিই নাই, যিনি রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার প্রকৃত ব্যবহারে স্থাপন করিতে পারেন।

"হে নরবর! যেমন দিনকর নিজ করনিকর বিস্তারপূর্ব্বক জগতের অন্ধকাররাশি দূরীভূত করিয়া আপন প্রদীপ্ত জ্যোতির সার্থকতা বিধান করেন, সেইরূপ সম্যক্‌ উপদেশ প্রদানে রাগহৃদয়ের দুঃখরূপ অন্ধকারের হেতুভূত মোহ অপনয়ন করিয়া স্বীয় উপদেশ সামর্থ্যের সফলতা সম্পাদন করিতে পারেন, ইহজগতে এরূপ মনস্বী ব্যক্তি অন্য কে আছেন?"

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে প্রাজ্ঞগণ! যথার্থই যদি রামচন্দ্র তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যেরূপ হরিণগণ তাহাদের দল পতি হরিণকে আনয়ন করে, তদ্রূপ তোমরাও অতিসত্বর রঘুনন্দন রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি বিবেচনা করি, রামচন্দ্রের এই যে মোহ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কোন বিপদ বা অনুরাগ বশতঃ হয় নাই, পরন্তু বিবেক এবং বৈরাগ্যশালী পুরুষের পরম মঙ্গলাবহ যে জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা তাহাই হইয়াছে। রামচন্দ্র শীঘ্রই এই স্থানে আগমন করুন, আমরা ক্ষণকাল মধ্যেই পবন যেমন পার্ব্বতীয় ঘনাবলী দূরীভূত করে, তদ্রূপ তাঁহার মোহজাল অপনয়ন করিব। অস্মদীয় যুক্তিবল দ্বারা তাঁহার এই মোহজাল বিদূরীত হইলে তিনি আমাদের ন্যায় পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবেন। হে মহীপতে! যেমন অমৃত পানে সত্যতা, মুদিততা, প্রাজ্ঞা, বিশ্রান্তি, তাপহীনতা, পীনতা ও উৎকৃষ্টবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ অজ্ঞান দূরীভূত হইলে, রামচন্দ্র ঐ সমস্ত লাভ করিতে পারিবেন, তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া আনন্দিতমনে অখণ্ডরূপে স্বীয় ধারাবাহিক প্রকৃত ব্যবহার-পরম্পরার অনুষ্ঠান করিবেন এবং তিনি মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন হইয়া জাগতিক কার্য্যকারণতত্ত্ব সকল অবগত হইবেন, তাঁহার সুখ দুঃখ কিছুই থাকিবে না, তিনি লোষ্ট্র, পাষাণ কিংবা কাঞ্চন সর্ব্বত্রই সমদর্শী হইবেন।

মুনিনাথ বিশ্বামিত্র ঐ কথা কহিয়া বিরত হইলে নরপতি দশরথ প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে আনিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার অপর কয়েকজন দূত প্রেরণ করিলেন! ইত্যবসরে রামচন্দ্রও পিতৃসমীপে আগমন করিবার নিমিত্ত উদয়-গিরি হইতে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইলেন: তিনি কতি-পয় ভৃত্য, ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের সহিত সুরগণপরিবেষ্টিত সুরপতির ন্যায় পবিত্র পিতৃসন্নিধানে আগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্র দূর

হইতেই দেখিলেন,—নরনাথ দশরথ সামন্ত রাজগণপরিবৃত হইয়া অমরবৃন্দ বেষ্টিত বাসবের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র এই দুই মহর্ষি তাঁহার উভয় পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন এবং চারুচামরধারিণী রমণাগণ মূর্ত্তিমতী দিগঙ্গনাগণের ন্যায় যথোচিত ভাবে অবস্থান করিয়া চামর ব্যজন দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছে।

এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং অপরাপর রাজন্যগণ ইহাঁরাও দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন, রঘুনন্দন রামচন্দ্র আগমন করিতেছেন, তাঁহার রূপ কার্ত্তিকেয় সদৃশ, তিনি সকলজনসেব্য, সত্ত্বশালী, গম্ভীর অথচ সুব্যক্ত সুমধুর প্রকৃতিগুণে শৈত্যগুণশালী হিমালয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতে ছিলেন, তাঁহার আকৃতি প্রিয়দর্শন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সমভাবে বিভক্ত ও হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ। তিনি পুরুষার্থের ভাজন এবং তাঁহার কলেবর মনোহর ও উপশান্তভাবে বিরাজমান, তিনি নবযৌবনের পূর্ণ সীমায় উপনীত হইলেও বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছিলেন। বিবেকোদয়ে তাঁহার মন উদ্বেগহীন হইয়াছে। তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই অথচ তাঁহার মনোরথ প্রায় পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সংসারগতি বিষয়ে বিচারশীল, পবিত্র গুণসমূহের আধার ও সমুদায় সত্ত্ব-গুণে ভূষিত হইয়াছেন এবং তিনি অক্ষোভিত ব্যবহার দ্বারা স্বীয় সমুন্নত মনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

উক্ত প্রকার গুণগণ-সমন্বিত ও পরিমিত সুবিমলহার-বসন-পরিশোভিত শ্রীমান্ রঘুনন্দন রাম দূর হইতেই ভূকম্পন-কম্পিত সুমেরুবৎ সুচারু চূড়ামণি-মরীচি-মালিত স্বীয় মস্তক অবনমনপূর্ব্বক পিতা দশরথকে প্রণাম করিলেন এবং যে সময়ে মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র "রামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর" ইত্যাদি বাক্যসকল বলিতেছিলেন, ঐ সময়েই কমলনয়ন রাম চন্দ্র পিতার পাদবন্দনা করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদার-দয় হৃরাম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে পিতার চরণবন্দনা করিলেন, পরে মস্তক অবনত করিয়া মান্যজন মাননীয়তম বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের, তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণগণ, বন্ধুগণ ও অন্যান্য পূজ্যগণের পাদবন্দনা

করিলেন। রাম সভাস্থলে সমাগত হইলে, তথায় যে সকল সামন্ত নরপতিগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রও ঈষৎ দৃষ্টি ও মস্তক চালনাদি দ্বারা রাজগণকৃত প্রণাম-পরম্পরা গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর মুনিপ্রবর বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে পিতার পবিত্র সন্নিধানে গমন করিলেন। মহীপতি দশরথ পুত্র রামচন্দ্রকে প্রণাম-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, বারম্বার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, আলিঙ্গন ও বদনচুম্বন করিলেন। পরে প্রগাঢ় স্নেহবশতঃ রাজহংস যেরূপ পদ্মকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি পুত্রদ্বয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। অনন্তর নরপতি দশরথ 'পুত্র! আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর', এই কথা বলিলেও রামচন্দ্র ভূমিতলে ভৃত্যজন-সমাস্তীর্ণ বস্ত্রাসনেই উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নৃপবর কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি বিবেকী হইয়া সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলভাজনই হইয়াছ,কিন্তু জড়ের ন্যায় জীর্ণ বুদ্ধির আশ্রয় করিয়া আত্মাকে বৃথা খেদান্বিত করিও না। হে বৎস! তোমার মত ব্যক্তিই বৃদ্ধজন,গুরুজন ও ব্রাহ্মণগণের বাক্য পালন করিয়া, পুণ্যময় পদলাভ করিয়া থাকে; পরন্তু যাহারা মোহের অনুধাবন করে, তাদৃশ মানবগণ কখনই ঐ পদলাভ করিতে পারে না। হে পুত্র! তুমি নিশ্চয় জানিও, মোহের বশবর্ত্তী হইয়া কদাপি আপদের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না; সুতরাং যত দিন না মোহকে আশ্রয় করা যায়, ততদিনই আপদ সকল অতিদূরে অবস্থান করিয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো রাজকুমার! এই বিষয়রূপ রিপুসকল নিতান্ত দুর্জ্জয় ও দুরারম্ভ হইলেও তুমি যখন ইহাদিগকে জয় করিয়াছ, তখন বাস্তবিকই তুমি শূর নামের যোগ্য। পরন্তু তুমি ঈদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত অজ্ঞজনের ন্যায় এই তরঙ্গভূয়িষ্ঠ জড়তাময় মোহসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিয়া বিরত হইলে, মুনিবর বিশ্বামিত্রও রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—হে রাম! তুমি যখন তোমার বিলোল-নীলনলিনতুল্য নয়নের মনোবিকার জন্য চপলতা পরিত্যাগ করি-

য়াছ, তখন বল দেখি, তুমি কি নিমিত্ত ভ্রান্ত হইতেছ, তোমার ভ্রমের হেতু কি? হে রঘুনন্দন! যেমন মূষিকগণ গৃহের অনিষ্ট সম্পাদন করে, সেইরূপ যে সকল মানসিক ব্যথা তোমার মনের বিষণ্ণতা বিধান করিতেছে, তাহারা কিরূপ এবং তাহারা কাহাকেই বা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; তাহাদিগের উৎপত্তির কারণ কি ও সংখ্যাই বা কত এবং কি কর্ম্ম করিলেই বা তাহারা উপশান্ত হইয়া থাকে? ইহা আমার নিকট প্রকাশ কর। পরন্তু আমার বিবেচনা হইতেছে, তুমি ঐ সকল মানসিক দুঃখ ভোগ করিবার নিতান্তই অযোগ্য এবং যেসকল আপদের প্রতীকারবিধান করিতে হয়, তোমার পক্ষে এরূপ আপদ উপস্থিত হওয়াও একেবারেই অসম্ভব। কেননা, তোমার পিতৃপ্রভাবেই যাবতীয় আপদ বিদূরীত হইতে পারে। অপিচ তোমার সৌভাগ্যসামগ্রীরও কোনরূপ অভাব না থাকায় আধিসকল আপনা হইতেই অস্তিত্বহীন হইয়াছে। হে অনঘ! এক্ষণে তোমার অভিমত বিষয় প্রকাশ করিয়া বল। তোমার অভিপ্রায় অবগত হইলে, যাহাতে কোনরূপ মনঃপীড়া আসিয়া তোমাকে অভিভূত করিতে না পারে, আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিব! তোমার সকল দুঃখই দূরীভূত হইবে।

মতিমান্ মুনিবর বিশ্বামিত্র ঐ কথা বলিলে, রঘুকুলকেতু রামচন্দ্র স্বীয় অভিলাষানুরূপ অর্থপ্রকাশক বাক্যাবলী শ্রবণ করতঃ, ইষ্টসিদ্ধিবিষয়ে সমাশ্বস্ত হইয়া, ময়ূর যেমন জলধরনিনাদে খেদ পরিহার করে, সেইরূপ খেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আন্তরিক প্রফুল্লতা লাভ করিলেন।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে,তিনি অতি ধীরভাবে অর্থসমন্বিত অমৃতায়মান বচনে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যখন আমাকে বলিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি জ্ঞানহীন হইলেও,সম্প্রতি আমার মনোগত সমুদয় কথাই আপনার নিকট যথাযথভাবে ব্যক্ত করিতেছি। হে মুনে! ইহজগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে সাধুজনের বাক্যলঙ্ঘন করিতে পারে!

হে মুনিনায়ক! এই আমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এতকাল পিতৃগৃহে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, তৎপরে ক্রমশঃ বিদ্যালাভ করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করিতেছিলাম। অনন্তর যখন আমি সদাচারে নিরত হইলাম, তখন তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই অম্বুধিমেখলা সমগ্র পৃথিবীই পরিভ্রমণ করিলাম। অতঃপর হে মুনিবর! এত কালে আমার মনে আসিয়া এইরূপ একটী বিচার উপস্থিত হইল, যাহার সাহায্যে আমি এক্ষণে এই সংসারাস্থা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি বিবেকী হইয়া ভোগানুরাগহীন বুদ্ধি দ্বারা স্বতঃ প্রবৃত্তভাবেই এইরূপ বিচার করিতেছি যে, এই যে সাংসারিক সুখ ইহা কি এবং এই যে সংসারবিস্তার ইহাই বা কি? বস্তুতঃ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ নাই। জীবগণ এই সংসারে কেবল মরিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং জন্মপরিগ্রহ করিবার নিমিত্তই মরিতেছে, ইহারা কুত্রাপি সুখানুভব করিতে পারে না, কেননা, এই চরাচর যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, ইহাদের চেষ্টালব্ধ সমস্ত ভোগ্য বিষয়ই অস্থির, উপভোগ কালেও ঐ সকল বিষয় হইতে কোনরূপ সুখের সম্ভাবনা নাই; যেহেতু উহারা অনিষিদ্ধ হইলেও রাগাদি বিবিধ দোষের উৎপাদক বলিয়া পরম আপদের মূল ও নিষিদ্ধ হইলেও পাপের একমাত্র আলয়। বিষয় সকল লৌহশলাকার ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধহীন রূপে প্রতিভাত হইতেছে;

পরন্তু 'ইহাতে আমার এই ভোগসাধন ও ইহা দ্বারা আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিব' ইত্যাদি স্বীয় মানসিক কল্পনামাত্রেই উহারা কেবল সম্ভূত হইতেছে। এই যে বিস্তীর্ণ জগন্মণ্ডল অবলোকিত হইতেছে, ইহা একমাত্র মনেরই আয়ত্ত; সেই মনও বিবেকবলে অসতের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে, সুতরাং তাহা হইতেও যখন কোনরূপ সুখসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন আর কি নিমিত্ত আমরা বৃথা বিমুগ্ধ হইতেছি। হায় রে! মুগ্ধ মৃগগণ যেমন অরণ্যানী মধ্যে মরীচিকায় জলভ্রমবশতঃ অতিদূরে ধাবিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মূঢ়বুদ্ধি আমরাও বৃথা সুখ বাসনায় সমাকৃষ্ট হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি। অহো! ইহসংসারে আমাদিগকে কেহই বিক্রয় করে নাই, তথাপি আমরা সংসারে যেন বিক্রীত হইয়াই পরাধীনভাবে অবস্থান করিতেছি, অর্থাৎ সংসারে আমরা নিতান্ত আবদ্ধ হইয়াই রহিয়াছি, কোনপ্রকারে ইহা হইতে এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় দেখিতেছি না, ক্রীতদাসের ন্যায় সংসারে থাকিয়া প্রতিনিয়ত স্বজনগণের আদেশই পরিপালন করিতেছি। হায় কি কষ্ট! আমরা এ সকল মায়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও সর্ব্বথা বিমূঢ়ভাবেই কালাতিপাত করিতেছি।

এই জগৎপ্রপঞ্চ মধ্যে বিষয়সুখসকল কি? বস্তুত উহারা কেবল দুর্ভাগ্য মধ্যেই পরিগণিত। আমরা বৃথা ভোগসুখলালসায় ভ্রমজালে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি।

অহো! অদ্য আমি বহুকাল পরে জানিতে পারিলাম, মৃগগণ যেমন বন মধ্যবর্ত্তী গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও এই সংসার-মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া রহিয়াছি। আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি এবং ভোগেই বা আমার প্রয়োজন কি? এই দৃশ্য সকল কিংস্বরূপ এবং ইহারা কোথা হইতেই বা আসিল? আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি, এ সকল কিছুই নহে—মিথ্যা! যাহা মিথ্যা, তাহা মিথ্যা হইয়াই থাকুক, ইহাতে কাহার কি হইবে?

হে ব্রহ্মন্! এই সকল আলোচনা করতঃ মরুভূমিস্থিত পথিকজনের ন্যায়, ইহসংসারে আমার সর্ব্ববিষয়েই নিরতিশয় অরতি আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছে। অতএব হে ভগবন্! আপনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, কেন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কেনই বা পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে এবং কি নিমিত্তই বা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? * জীবগণের জন্ম, জরা, মরণ, আপদ্ ও সম্পদ্ এ সমুদায় অনর্থপরম্পরা, পুনঃপুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব হেতু বৃথাই বিবর্দ্ধিত হইতেছে; প্রকৃত পক্ষে ইহাতে কোন ফলই পরিলক্ষিত হইতেছে না। আপনি ভাবিয়া দেখুন—গিরিতরু যেমন প্রভঞ্জনবেগে বিশীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ আমরাও নিরন্তর সেই সেই পুরাতন অতিতুচ্ছ ভোগ সকল দ্বারা শিথিল হইয়া পড়িতেছি। যেমন পবনপূরিত কীচকবেণু সকল বৃথা শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ এই অচেতনপ্রায় জনসমূহও প্রাণনামক বায়ুর সাহায্যে বৃথাই শব্দ করিতেছে, ফলতঃ ইহাতে তাহাদিগের কোন পুরুষার্থই নাই।

হে মুনিবর! যেমন তরুকোটরগত তীব্র হুতাশন কর্ত্তৃক বিশুষ্ক তরু দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ 'কি প্রকারে এই সাংসারিক দুঃখপরম্পরা উপশান্ত হইবে' এই চিন্তায় আমি পরিতপ্ত হইতেছি। আমার হৃদয়-রন্ধ্র সংসারের দুঃখরূপ পাষাণ দ্বারা অতি নিবিড় ভাবেই পরিপূরিত হইয়াছে, তথাপি কেবল আমি স্বজনগণের ভয়েই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া রোদন করিতে পারিতেছি না। আমি নিরন্তর নীরবে নেত্রজল পরিত্যাগ না করিয়াই রোদন করিয়া থাকি; সুতরাং মদীয় মুখবৃত্তি হাস্যসংলাপাদি নীরস হইয়া গিয়াছে। একমাত্র হৃদয়স্থিত বিবেক ভিন্ন অন্য কেহই আমার রোদন বা কৃত্রিম হাস্যালাপাদি অনুভব করিতে পারে না। হে মহর্ষে! যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সৌভাগ্যের অবসান হওয়ায়, ঘটনাক্রমে দারিদ্র্য দশায় উপনীত হয়, তাহা হইলে সে যেমন তাহার পূর্ব্বতন অবস্থা স্মরণ করিয়া মোহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও এই ভাবাভাবময়ী স্থিতি বিচার করিয়া সংসার চেষ্টায় সাতিশয় বিমুগ্ধ হইতেছি। আমি শ্রীকে সকল অনর্থের মূল বলিয়া বিবেচনা করি, কেন না, এই কুহকিনী শ্রীই মানব-

* রামকৃত এই ত্রিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য, ইহার পর ক্রমে উৎপত্তি, স্থিতি ও উপশম এই তিনটী প্রকরণ উক্ত হইবে।

গণের মনোবৃত্তি মুগ্ধ করিয়া গুণাবলী বিনষ্ট করতঃ অশেষ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। রোগ-শোক-দৈন্যদারিদ্র্যাদি সহস্র সহস্র বিপৎ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের নিকট যেমন পুত্রকলত্রাদি-সমন্বিত গৃহ সকল আনন্দ-বিধায়ক হয় না, তদ্রূপ চিন্তানিচয়চক্র ধনরাশিও আমার নিকট প্রীতিকর হইতেছে না। হে মুনে! যেমন বনচারি দন্তী লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করতঃ আন্তরিক কোন শান্তিই লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও এই ক্ষণবিধ্বংসী দেহ ধারণ করতঃ, সাংসারিক বিবিধ দোষ ও অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া মনে মনে কিঞ্চিন্মাত্র সুখেরও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছি না।

হে মুনিনাথ! অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে প্রগাঢ় মোহজালরূপ জ্ঞানালোক অপসৃত হইলে, বিষয়রূপ সুচতুর শত শত খলস্বভাব চৌরগণ আসিয়া বিবেকরূপ রত্নটাকে অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কে এরূপ সুযোদ্ধা আছে, যে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে?

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

—•—

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিপ্রবর! ইহ সংসারে মূঢ় জনগণই শ্রীকে অচলা ও উৎকৃষ্টা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে, ফলতঃ সেই শ্রীই সকলের মোহ ও অনিষ্টের কারণ। যেমন বর্ষাকালে তরঙ্গিণী ইতস্ততঃ অনন্ত তরঙ্গরাশি বহন করিতে থাকে, সেইরূপ এই শ্রীও উৎসাহবহুল বিবিধ মনোরথশতসমাকুল মূর্খ মানবগণকে বশীভূত করিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকে। হে মহর্ষে! যেরূপ স্রোতস্বিনী হইতে চঞ্চল তরঙ্গতিতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রী হইতে চিন্তানাম্নী বহুতর দুহিতা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই দুহিতৃগণ চঞ্চলস্বভাব ও দুষ্ট চেষ্টায় পরিবর্দ্ধিত। যেমন কোন দুর্ভগা রমণী অগ্নি দ্বারা স্বীয় পদ দগ্ধ হওয়ায় যন্ত্রণা বশতঃ কুত্রাপি পদস্থাপন না করিয়া কেবল অনিয়ত চেষ্টভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে থাকে, সেইরূপ এই শ্রীও একস্থানে অবস্থান করে না এবং শাস্ত্র-বিহিতাচার-পরিশূন্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়াও অচলভাবে অবস্থান করিতে পারে না, নিয়তই নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। যেরূপ প্রদীপশিখা স্পর্শমাত্রই সমধিক দাহ ও কজ্জলপাতের কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীও পুরুষকে আশ্রয় করিবামাত্র সাতিশয় সন্তাপ ও অন্তঃকরণের মলিনতা বিধানের হেতু হয়, মূঢ় নৃপগণ যেমন প্রায়ই গুণবান্ ধার্ম্মিক জনগণের সহিত কোন সদ্ভাব সংস্থাপন না করিয়া গুণাগুণের বিচারব্যতীতই সন্নিহিত যে কোন পুরুষকে গ্রহণ করে সেইরূপ এই কৃচ্ছ্র-লব্ধ শ্রীও গুণবান্‌গণের উপভোগের নিমিত্ত না হইয়া গুণাগুণের বিচার ব্যতীতই নিকটবর্ত্তী যে কোন পুরুষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। যেরূপ ক্ষীর পান দ্বারা দুষ্ট ভুজঙ্গমের বিষবেগ পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ এই অধার্ম্মিকজন-সংশ্রয়িণী শ্রীও সেই সেই গর্হিত কর্ম্ম দ্বারাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থাৎ যজ্ঞদানাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা শ্রীকে কখন পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখা যায় না; পরন্তু যুদ্ধদ্যূতবাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই উত্তরোত্তর ইহার উপচয় হইতে

থাকে। বাতসঙ্ঘাত সহযোগে যতক্ষণ না হিমরাশি অসহ্য হইয়া পড়ে, ততক্ষণ যেমন সকলেরই সুখস্পর্শ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণও যাবৎ পর্য্যন্ত না শ্রী কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া কর্কশ স্বভাবের বশীভূত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত কি আত্মজন কি পরজন সকলের নিকটই সুখস্পর্শ থাকে, অর্থাৎ সকলের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি প্রকাশ করে।

হে ভগবন্! পাংশুমুষ্টি দ্বারা উৎকৃষ্ট মণি যেমন মলিনীকৃত হয়, সেইরূপ যাঁহারা প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, শূর ও কোমল ব্যক্তি তাঁহারাও শ্রী দ্বারা মলিনীকৃত হইয়া থাকেন। এই শ্রী কেবল দুঃখের নিমিত্তই পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহাতে সুখের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু বিষলতাকে রক্ষা করিতে গেলে তাহাতে যেমন মৃত্যু সংঘটিত হয়, তদ্রূপ এই শ্রীকেও রক্ষা করিতে গেলে মৃত্যুমুখেই পতিত হইতে হয়। ইহসংসারে শ্রীমান্ অথচ জনগণের অনিন্দনীয়, শূর অথচ আত্মশ্লাঘাবর্জ্জিত, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ অথচ সর্ব্বত্র সমদর্শী, এই ত্রিবিধ পুরুষ একেবারেই দুর্লভ।

হে মুনীন্দ্র! এই সংসারে মুগ্ধমানবগণ যাহাকে শ্রী বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে, বস্তুত সেই শ্রীই দুঃখরূপ বিষধরের গহন গুহা ও মহা-মোহরূপ গজেন্দ্রের বিশাল বিন্ধ্যতটী। এই শ্রী সৎকার্য্যরূপ সরসী-রুহের রজনী, দুখরূপ কৈরবের চন্দ্রিকা, সুদৃষ্টিরূপ দীপিকার বাতসমূহ, মনোরথরূপ কল্লোলকুলের তরঙ্গিণী, ভয় ও ভ্রান্তিরূপ অভ্রপটলের আদি পদবি, বিষাদবিষের বর্দ্ধনকারিণী, বিকল্পসমূহের ক্ষেত্র, খেদপরিণাম বিভীষিকার ভুজঙ্গিনী, বৈরাগ্যব্রততীর হিমানী ও চিত্তবিকাররূপ পেচকের যামিনী। অধিক কি, এই শ্রীই বিবেকরূপ সুধাকরের রাহুদংষ্ট্রা এবং সৌজন্যরূপ সরোজকুলের কৌমুদী। এই শ্রী বিলোল বিবিধরাগ-রঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় চঞ্চল ও মনোহর, চপলার ন্যায় উৎপত্তি মাত্রেই ধ্বংসশালিনী ও মূর্খজনের আশ্রয়। এই চুক্কুলসংশ্রয়িণী শ্রীর নিকট চপ-লতায় বন্য নকুলীও পরাজিত হইয়াছে ও প্রবঞ্চনাদক্ষতায় মৃগতৃষ্ণাও হার মানিয়াছে।

হে মুনিবর! লহরী যেমন একভাবে ক্ষণকাল কোথাও অবস্থান করে না, সেইরূপ শ্রীও কুত্রাপি স্থির ভাবে থাকে না; দীপশিখার ন্যায় সততই

চঞ্চল, সুতরাং ইহার গতি অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। এই শ্রী সিংহীর ন্যায় বিগ্রহ-ব্যগ্র জনরূপ করীন্দ্রকুলের ধ্বংসকারিণী এবং অসিধারার ন্যায় শিশিরা হইলেও তীক্ষ্ণা ও তীক্ষ্ণহৃদয় মনুষ্যগণের আশ্রয়। হে মুনে! এই অভব্যা শ্রী অপহৃত পরকীয় ধনরাশি দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে,ইহাতে দুষ্ট মনোব্যথা-সকল প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং ইহা দ্বারা দুঃখ ভিন্ন কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অহো কি আশ্চর্য্য! সপত্নীসদৃশী অলক্ষ্মী এই শ্রীকে যে পুরুষের নিকট হইতে দূরে অপসারিত করিয়া দিয়াছে, এই লজ্জাহীনা দুষ্টস্বভাবা শ্রী আবার সেই পুরুষকেই সমাদর সহকারে আলিঙ্গন করিতেছে।

হে মহর্ষে! পতন, মরণ প্রভৃতি সাহসিক কার্য্য সকল দ্বারা এইকে শ্রীলাভ করা যায় বটে; কিন্তু চিরদিন ইহাকে কোন স্থানেই অবস্থান করিতে দেখা যায় না। পরন্তু এই শ্রী ভুজঙ্গসঙ্ঘ-বিজড়িত জীর্ণ কূপাদি গর্ত্ত-সমুদ্ভূত কুসুমলতার ন্যায় মনোরমা হইয়া প্রতিনিয়ত মানবগণের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছে।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিপ্রবর! শ্রীর ন্যায় আয়ু হইতেও কোনরূপ সুখের সম্ভাবনা নাই। কেননা, ইহা পল্লবপ্রান্ত-স্থিত জলকণিকার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। আয়ু উন্মত্তের ন্যায় সহসা শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যাহাদিগের হৃদয় বিষয়রূপ বিষধরের সংসর্গ বশতঃ জর্জ্জরিত হইয়াছে এবং যাহাদিগের হৃদয়ে অল্পকালের জন্যও বিবেকের উদয় হয় নাই, তাদৃশ পুরুষগণের পক্ষে আয়ু সত্য সত্যই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। পরন্তু হে মুনিনাথ! যাঁহারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধি লাভালাভে সমভাবেই বিরাজমান

থাকে. সেই সমুদায় মহাপুরুষদিগেরই আয়ু অর্থাৎ জীবনকাল সুখের নিমিত্ত হয়। হে ভগবন্! এই পরিমিত স্থূল দেহেতেই আমাদিগের আত্মনিশ্চয় রহিয়াছে বলিয়া সংসাররূপ জলদপটলের অভ্যন্তরগত ক্ষণপ্রভাসদৃশ ক্ষণভঙ্গুর আয়ুতে আমরা শান্তি লাভ করিতে পারি না। আমরা বায়ুর বেষ্টন, আকাশের খণ্ডন ও তরঙ্গততীর গ্রন্থন এ সমুদায়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু আয়ুর প্রতি কোনরূপেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। এই আয়ু শারদীয় জলধরের ন্যায় পেলব, তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায় অস্থির ও তরঙ্গের ন্যায় চপল; সুতরাং ইহা গত বলিয়াই পরিলক্ষিত হইতেছে। তরঙ্গ, প্রতিবিম্বচন্দ্র, তড়িৎপুঞ্জ অথবা আকাশ-কমল, এ সমুদায়ের গ্রহণ বিষয়ে আস্থা রাখিতে পারি; পরন্তু স্থিতিহীন আয়ুতে কখন বিশ্বাস রাখিতে পারি না। আয়ু ব্যর্থ হইলেও বিমূঢ় মানবগণ অবিশ্রান্তমনে দীর্ঘ আয়ু কামনা করিয়া থাকে; পরন্তু ঐ আয়ু কামনা অশ্বতরীর গর্ভ কামনার ন্যায় দুঃখের নিমিত্তই হয়।

হে ব্রহ্মন্! যে দেহলতা এই সংসারভ্রমণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, ইহা এই সৃষ্টিরূপ জলধিজলের ফেন ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং আমার ইহাতে জীবিত থাকিতে অভিলাষ হইতেছে না। যাহা দ্বারা পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর শোকের বশীভূত হইতে হয় না এবং যাহা পরম শান্তির নিকেতন, তাহাই যথার্থ জীবন বলিয়া অভিহিত। তরুগণ কিংবা মৃগপক্ষিগণ ইহারাও জীবন ধারণ করে বটে; কিন্তু যাহার মন মনন দ্বারা অর্থাৎ বাসনাক্ষয়ে পর-মাত্মায় রত হইয়া নির্জীবভাবে রহিয়াছে, তাহাকেই প্রকৃত জীবিত বলা যায়। ইহজগতে যে সকল ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহাদিগের জীবনই সাধু জীবন; তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ চিরজীবী হইলেও গর্দ্দভের ন্যায় বৃথাই জীবন ধারণ করে। অবিবেকী ব্যক্তি শাস্ত্রকে, বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানকে ও শান্তিহীন ব্যক্তি মনকে ভারভূত বলিয়া বিবেচনা করে; পরন্তু যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই স্থূল শরীরও ভার বলিয়া গণ্য হয় না।

হে ব্রহ্মজ্ঞ! ভার যেমন ভারবাহী ব্যক্তির দুঃখের কারণ হয়, সেই রূপ রূপ, আয়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেষ্টা এ সকলও দুর্ব্বুদ্ধি অর্থাৎ অনাত্মদেহাদিতে আত্মাভিমানী ব্যক্তির দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির সংসার পরিভ্রমণশ্রম নির্ব্বৃত্তি হয় নাই, তাহার কামনা আপদের পরম আস্পদ ও আয়ু ব্যাধিরূপ বিহঙ্গগণের নীড়স্বরূপ ও নিরতিশয় পরিশ্রমের হেতু। মূষিক যেরূপ প্রতিদিন আপন কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া নিরন্তর শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব গর্ত্ত খনন করিতে থাকে,সেইরূপ কালও প্রতিনিয়ত পুরুষের পরমায়ু বিনিহত করিতেছে। ভয়ঙ্কর ব্যাধিরূপ বিষধরগণ শরীররূপ বিলমধ্যে অবস্থান করত সতত বিষরূপ দাহ প্রদান করিয়া প্রতিক্ষণ আয়ুবায়ু পান করিতেছে। ঘুণ যেমন জীর্ণ তরুর অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে কর্ত্তিত করিতে থাকে,সেইরূপ অন্তরস্থিত অতি তুচ্ছ ভীষণ দুঃখরাশিও পরমায়ুর ধ্বংসবিধান করিতেছে। মার্জ্জার যেমন ভক্ষণাভিলাষে একদৃষ্টে মূষিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ মৃত্যুও নিশ্চয়ই আমাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত দৃষ্টিপাত করিতেছে। যেমন বহুভোক্ত্রী মনুষ্য ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অতি তুচ্ছা গন্ধাদিগুণগর্ভিণী বারবিলাসিনীরূপিণী জরাও দেহধারীদিগকে ক্ষীণবল করত তাহাদিগের পরমায়ু পরিজীর্ণ করিতেছে। সুজন ব্যক্তি দুর্জ্জনসহ একত্র বসতি করত কতিপয় দিবসের মধ্যেই তাহার প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া অবজ্ঞাসহকারে তাহাকে যেমন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যৌবনও তদ্রূপ দেহিগণের দেহে কিয়ৎকাল বাস করিয়া পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হে তপোনিধে! লম্পট পুরুষ যেমন সৌন্দর্য্যের প্রতি অভিলাষী হয়, সেইরূপ জরা-মরণবন্ধু বিনাশসুহৃদ্ কৃতান্তও নিরন্তর পরমায়ুর প্রতি অভিলাষী রহিয়াছে।

হে তপস্বি-প্রবর! অধিক আর কি বলিব, এই আয়ু যেরূপ স্থিরতা ও জীবন্মুক্ত পুরুষপ্রসিদ্ধ সুখ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ইহা যেমন মরণভাজন হইয়া অতি তুচ্ছ ও গুণবর্জ্জিত হইয়াছে, ইহ জগতে এরূপ আর কিছুই বিদ্যমান নাই।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মোহ হইতে বৃথাই অহঙ্কারের উৎপত্তি হইতেছে এবং নিরন্তর বৃথাই তাহা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ফলতঃ ইহাতে কোন পুরুষার্থই নাই, আমি এই মিথ্যাময় দুষ্ট অহঙ্কাররূপ রিপু হইতে সাতিশয় ভীত হইতেছি। এই সংসার সাধ্যসাধন প্রভৃতি বিবিধ আকৃতিসম্পন্ন, ইহা যে দীন হইতেও দীনতম বিষয় লম্পটগণকে রাগ-দ্বেষাদি বহুবিধ দোষলক্ষণ কোষগৃহে নিক্ষিপ্ত করিয়া লাঞ্ছিত করিতেছে, তাহার হেতু কেবল অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। অহঙ্কার বশতই শারীরিক ও মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়; অহঙ্কার বসতই বিবিধ কামনার উদয় হয় এবং ঐ অহঙ্কারই আমার ব্যাধি; সুতরাং হে মুনে! আমি আমার চিররিপু অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া বিষয়ভোগের কথা বলিব কি? আমি পানভোজনও পরিত্যাগ করিয়াছি! ব্যাধ যেমন অরণ্যমধ্যে জাল বিস্তার করিয়া মৃগগণকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অহঙ্কারদোষও সংসাররূপ রজনীতে জীবগণের মনোমোহিনী সুদীর্ঘ মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতেছে। যেমন পর্ব্বত হইতে কণ্টকময় বহুতর খদিরতরুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অহঙ্কার হইতেই দুরুত্তর মহতি দুঃখপরম্পরার অবির্ভাব হইতেছে। যাহা শান্তি গুণরূপ সুধাংশুর সৌংহিকেয়মুখ, যাহা গুণরাশিরূপ প্রফুল্ল কমলকুলের হিমাশনি ও যাহা সাম্যরূপ জলধরপটলের শরৎকাল, আমি সেই অহঙ্কারকে পরিত্যগ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমি রাম নয়, আমার কোন বিষয়ে অভিলাষ নাই এবং এই যে মন ইহাও আমার নহে। আমি বুদ্ধদেবের ন্যায় স্বীয় আত্মাতেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। প্রথমতঃ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া ভোজন ও হোমাদি যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এখন আমার প্রতীতি হইতেছে, সেই সেই সমুদায় কর্ম্মই অবস্তু; ফলতঃ একমাত্র অহঙ্কার হীনত্বই বস্তু।

হে ব্রহ্মন্! যতকাল 'অহং' এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমান থাকিবে, তত-

কালের মধ্যে যদি কোন আপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই আমার দুঃখ হইবে। আর যে সময় আমার ঐ 'অহং' জ্ঞান দূরীভূত হইবে, তৎকালে আমি বিপদ্জালে জড়িত হইলেও সুখলাভ করিতে পারিব ; সুতরাং আমার বিবেচনায় অহঙ্কারশূন্যতাই সর্ব্বথা মঙ্গলাবহ। অতএব হে মুনে! আমি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াই প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভোগসমূহ ক্ষণভঙ্গুর ; তাহা দ্বারা কখনও উদ্বেগহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। যতকাল পর্য্যন্ত হৃদয়গগনে অহঙ্কাররূপ জলধরের উদয় থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্তই তৃষ্ণারূপিণী কুটজ-পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইতে থাকিবে। আবার যখন অহঙ্কাররূপ মেঘের অন্তর্ধান হইয়া যাইবে, তখন সেই তৃষ্ণারূপিণী নবসৌদামিনী নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় অতিশীঘ্রই কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইবে।

হে তপোনিধে! ঘনঘটা যেমন বিপুল আড়ম্বর সহকারে শ্রবণভৈরব গর্জ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ মনোরূপী মত্তমাতঙ্গও অহঙ্কাররূপ বিন্ধ্যাচলে গর্জ্জন করে। এই যে দেহরূপিণী অরণ্যানী মধ্যে অহঙ্কাররূপ প্রবল কেশরী সতত বিচরণ করিতেছে, এই মহামৃগেন্দ্র হইতেই জগন্মণ্ডল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। হে মহর্ষে! তৃষ্ণারূপ তন্তুর একদেশ দ্বারা এই যে অনন্ত দেহপরম্পরা গ্রথিত রহিয়াছে, ইহাকে মাত্র অহঙ্কাররূপ লম্পট পুরুষই মুক্তাবলীরূপে কণ্ঠদেশে ধারণ করিতেছে। এই অহঙ্কাররূপ রিপু কর্ত্তৃকই ইহজগতে পুত্রমিত্র-কলত্রাদিরূপ আভিচারিকক্রিয়াকলাপ প্রসারিত হইয়াছে অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদিই তন্ত্রমন্ত্র ব্যতীত মানবগণের বিবিধ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, যদি 'অহং' এই পদটী একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে যাহা কিছু দুরন্ত মানসিক দুঃখ আছে, তাহারাও আপনা হইতেই সত্বর দূরীভূত হইতে পারে। অহঙ্কাররূপ জলধর যদি ধীরে ধীরে অথবা অতি দ্রুতভাবেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অশান্তিকারিণী মনোগগনস্থিতা মোহমিহিকারও বিলয় হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! যদিও আমি অহঙ্কার পরিহার করিয়াছি, তথাপি মূর্খতা-

বশতঃ এক্ষণে শোকে অবসন্ন হইতেছি; সুতরাং এ অবস্থায় আমার পক্ষে যাহা উচিত হয়, আমাকে আপনি তাহাই প্রকাশ করিয়া বলুন। হে মহানুভাব মহর্ষে! যাহা হৃদয়ে থাকিলে সমুদায় আপদের আস্পদ হইয়া থাকে এবং যাহা শান্তিপ্রভৃতি উত্তম গুণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমি বিবেকবলে সেই সর্ব্বদুঃখবিধায়ী অহঙ্কাররূপ কলঙ্ককে পরিত্যাগ করিয়াছি; অতএব এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তৎসহ আমাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করুন্।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞ! চিত্ত যদি সাধুজনসঙ্গ এবং সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলেই কামাদি বিবিধ দোষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রবহমাণ সমীরণমধ্যবর্ত্তী ময়ূরপুচ্ছের প্রান্তভাগের ন্যায় বিচলিত হইতে থাকে এবং কুক্কুর যেমন ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া গ্রামমধ্যে ইতস্ততঃ ব্যগ্রভাবে বৃথা পরিবাধিত হয়, সেইরূপ এই দোষজর্জ্জরিত মনও দীনভাবে নিরর্থক দূর হইতে দূরান্তরে ধাবিত হইতে থাকে। মন কোথাও কিছুই প্রাপ্ত হয় না এবং যদিও কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে ধনরাশি প্রাপ্ত হয়, তথাপি করণ্ডক * যেমন জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না; তদ্রূপ ঐ সকল দ্বারাও মনের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ পরিতৃপ্তি হয় না।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যূথ হইতে পরিভ্রষ্ট মৃগ যেমন বাগুরাবদ্ধ হইয়া শান্তি লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সততশূন্য মনও দুরাশাজালে পরিবৃত হইয়া কদাপি কিঞ্চিন্মাত্রও নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারে না।

* করণ্ডক অর্থে বাঁশ কিংবা বেত্রাদির শলাকা দ্বারা নির্ম্মিত ছিদ্রযুক্ত পাত্রবিশেষ। ইহা জল দ্বারা কিছুতেই পূর্ণ করা যায় না।

অহো! বিষয়াশক্ত মন সততই তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলবৃত্তি ধারণ করিতেছে। স্থূলসূক্ষ্মভেদে সর্ব্বদাই ইহার অবয়ব বিভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং মন উহা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারে না। যেরূপ মন্থন সময়ে মন্দরগিরি-সমাহত ক্ষীরার্ণবের জলকনিকা-সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ মনও বিষয়ানুসন্ধানে বিক্ষুব্ধ হইয়া দশদিকে ধাবমান হইতেছে। হে মুনে! যাহাতে ভোগলাভাদিরূপ আবর্ত্ত ও পরবঞ্চনাদিরূপ মকরসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে,আমি সেই মনোময় মহার্ণবকে কোন প্রকারেই নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

হে ব্রহ্মন্! আমার মনোরূপ মৃগশাবক ভোগরূপ দূর্ব্বাঙ্কুর লোভে আকৃষ্ট হইয়া গর্ত্ত-(নরক)পতনের বিষয়চিন্তা না করত নিয়ত অতিদূরে ধাবমান হইতেছে,কোনরূপেই নিবৃত্ত হইতেছে না। ক্ষুব্ধ জলধি যেমন স্বীয় চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিতে পারে না,তদ্রূপ মদীয় আকুলিত মনও কদাপি স্বীয় স্থূল সূক্ষ্ম অবয়ব বিভাগ পরিহার করিতে পারিতছে না। আমার চিত্ত চিন্তানিচয়ে নিরতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, সুতরাং আমি ইহাকে নিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেও স্বীয় চঞ্চল বৃত্তি-বশতঃ পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় কুত্রাপি ধৈর্য্য ধারণ করিতেছে না। হংস যেমন নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীরভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মনও মোহরূপ রথে সমারূঢ় হইয়া শরীরি হইতে উদ্বেগহীন সমতা-সুখকে হরণ করিতেছে!

হে মুনীন্দ্র! সত্যবটে মনের প্রত্যক্‌প্রবণা বৃত্তিসকল বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহারা এক্ষণে অনন্ত কল্পনাতল্পে প্রসুপ্ত হইয়াই রহিয়াছে,কিছুতেই জাগরিত হইতেছেনা; সুতরাং আমিও নিরতিশয় সমাকুল হইয়া পরিতপ্ত হইতেছি। হে ব্রহ্মণ! ব্যাধ যেমন জালসূত্রের দৃঢ়গ্রন্থিটীকে স্বীয় ক্রোড়দেশে রক্ষা করিয়া বিস্তারিত জাল্ দ্বারা ভোজনলোলুপ বিহঙ্গমকে আবদ্ধ করিয়া থাকে,সেইরূপ মদীয় মনও ভোগতৃষ্ণার অন্তর্নিবেশিত মমতা প্রভৃতি দৃঢ়-গ্রন্থি সকল অন্তরে রাখিয়া আপনা দ্বারাই আমাকে আবদ্ধ করিতেছে। হে মুনে! যাহা বিস্তারিত ক্রোধরূপ ধূমরাশি দ্বারা সমাবৃত এবং যাহা অনন্ত চিন্তা রূপ জ্বালামালায় সমাকুল,আমি সেই অনলসদৃশ মনদ্বারা সতত শুষ্কতৃণের ন্যায় দগ্ধ হইতেছি। যেরূপ ক্রূরপ্রকৃতি কুক্কুর ভার্য্যার অনুগামী হইয়া

মৃত শবকে ভোজন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার মনও ভার্য্যারূপিণী তৃষ্ণার অনুগমন করিয়া আমাকে ভক্ষণ করিতেছে।

হে ব্রহ্মন্! চঞ্চল তরঙ্গমালা-সমাকুল তরঙ্গিণীর প্রবাহ যেমন তট-দেশে প্রতিহত হইয়া তীরতরুর ধ্বংস সাধন করে, তদ্রূপ মদীয় জড়রূপী চঞ্চল মনও আমাকে বিনষ্ট করিতেছে। সমীরণ প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইলে তাহাতে যেমন তৃণরাশি অতি দূরে নীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমিও এই চিত্ত দ্বারা শূন্যমার্গে নিপতিত হইবার নিমিত্ত অথবা শূন্যময় পৃথিবী-মধ্যে কীট পতঙ্গাদি বিবিধরূপে পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত অতি দূরে নীত হইতেছি। সেতু যেমন ক্ষুদ্র নদীর জলপ্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি এই সংসার-জলধি হইতে উত্তীর্ণহইবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত যত্নবান্ হইলেও একমাত্র কুচিত্তই আমাকে রুদ্ধ করিতেছে। কূপকাষ্ঠ যেমন কখনও ঊর্দ্ধোৎপতিত ও কখন অধঃপতিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমিও কোনসময়ে ঊর্দ্ধগামী ও কখনও বা অধোগামী এই কুচিত্ত দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি।

হে ব্রহ্মন্! বালকের ভয় উৎপাদনের নিমিত্ত পরিকল্পিত বিকৃতাকার বেতাল যেমন বালবুদ্ধিতে সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আমিও অজ্ঞবুদ্ধিহেতু কুচিত্তকে দুর্জ্জয় বলিয়া ধারণা করিতেছি, পরন্তু বালকের বাল্যাপগমে বিচারবশতঃ ঐ বেতাল যেরূপ ভয়ের হেতু না হইয়া বস্তুতঃ মিথ্যারূপেই প্রকাশিত হইতে থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞান দূরীভূত হইলে যখন বিবেকের উদয় হয়, তখন চিত্তও মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এই মনোরূপী পিশাচ উষ্ণ হইতেও উষ্ণতর, শৈল হইতেও দুরতিক্রম্য এবং বজ্র হইতেও কঠোর; সুতরাং ইহাকে বশীভূত করা একেবারেই দুঃসাধ্য। পক্ষী যেরূপ উৎকৃষ্ট আমিষমধ্যে পতিত হয়, তদ্রূপ চিত্তও সহসা বিষয়সমূহে পতিত অর্থাৎ আসক্ত হইতে থাকে এবং ক্রীড়া হইতে বালকের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই তাহা হইতে বিরত হয়। অর্থাৎ চঞ্চল মন কখনই কোন বিষয়ে একাগ্রভাব থাকে না, প্রতিক্ষণই বিষয়ান্তরে রত হইয়া বৃথা কালাতিপাত করিতেছে।

হে তাত! এই জড়প্রকৃতি, আবর্ত্তশালী ও নিতান্ত চঞ্চল মনোরূপ

জলধি আমাকে অতিদূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। হে সাধুবর! আমি বিবেচনা করি, মহান্ সুমেরু মহীধরের উন্মূলন,সাগর পান ও বহ্নিভক্ষণ এ সকল যেরূপ দুঃসাধ্য, চিত্তকে নিগ্রহ করা ততোধিক দুঃসাধ্য। চিত্তই বিষয় সকলের কারণ, চিত্তের বিদ্যমানতায়ই জগত্রয়ের অস্তিত্ব এবং চিত্তের ক্ষয় হইলেই জগত্রয়ের ক্ষয়,সুতরাং যত্নসহকারে ব্যাধির ন্যায় চিত্তের চিকিৎসা অর্থাৎ অপনয়ন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

হে মুনিবর! যেমন গিরিবর হইতে বিবিধ তরুরাজি সমুৎপন্ন হয়,সেই-রূপ নিঃসন্দেহে চিত্ত হইতেই এই শত শত সুখদুঃখ সমুদ্ভূত হইতেছে। আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি,যদি বিবেকবলে ঐ চিত্তকে ক্ষীণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর সুখদুঃখ কিছুই থাকিবে না।

হে ব্রহ্মন্! মুমুক্ষু পুরুষেরা যাহাকে জয় করিতে পারিলে শান্তি-প্রভৃতি গুণগণকে আপন বশে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, আমিও এক্ষণে এইশরীরে সেই চিত্তরূপরিপুকে জয়করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছি। পরন্তু জলভারমলিনা জলদাবলী যেমন সুধাকরের প্রাতিবিধায়িনী হয় না, সেইরূপ এই মূর্খজনবিলাসিনী লক্ষ্মীও আমার বৈরাগ্যহেতু প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিতেছে না।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি তৃষ্ণাকেও সকল অনর্থের মূল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি; কেননা, পরম প্রেমনিলয় আত্মতত্ত্ব ও হৃদয়োদ্ভব বিবেকাদির তিরোধান বিষয়ে এই দুরন্ত তৃষ্ণাই অন্ধকারময়ী রজনীরূপে প্রকাশিত হওয়ায় কেবল রাগ দ্বেষাদি দোষরূপ পেচক সকলই ঐ রজনীতে জীবরূপ আকাশপথে বিহার করিতেছে। হায়! প্রখর দিবাকর-কর দ্বারা রসবিশিষ্ট পঙ্ক যেমন বিশুষ্ক হইয়া যায়, এই অন্তঃ-

সন্তাপদায়িনী চিন্তা দ্বারা আমিও তদ্রূপ বিশুষ্ক হইতেছি। আমার মোহ-তিমিরাবৃত শূন্যময় চিত্তরূপ মহারণ্যে আসিয়া সতত আশারূপিণী পিশাচিকা নৃত্য করিতেছে। আমার বিলাপ-জনিত নেত্রজলরূপ নীহার-কণিকা দ্বারা তৃষ্ণারূপ ক্ষেত্রে থাকিয়া চিন্তারূপিণী চণকমঞ্জরী প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। হে মুনে! তরঙ্গ যেমন জলধির অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া সমধিক আবর্ত্ত উদ্ভাবনের নিমিত্তই বন্ধুরভাবে উদ্বেলিত হইতে থাকে, তদ্রূপ এই তৃষ্ণাও মনকে বিক্ষোভিত করিয়া আন্তরিক ভ্রমবিধানের জন্যই বিষমরূপে উল্লসিত হইতেছে। উৎকট অসত্য বাক্যাদি যাহার কল্লোলধ্বনি এবং প্রবৃত্তি যাহার তরঙ্গ, সেই অশেষ বিষয়গামিনী তৃষ্ণারূপিণী চঞ্চল তরঙ্গিণী আমার দেহরূপ গিরিতটে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। পবনবেগের প্রতিকূলবর্ত্তী জীর্ণ তৃণ যেমন ধূলিসমাচ্ছন্ন প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক কোন এক অদৃশ্য স্থানে নীত হইয়া থাকে,সেইরূপ তৃষ্ণাবেগ সম্বরণ করিতে সমুদ্যত আমার এই চিন্তাচাতকও পাপীয়সী তৃষ্ণাকর্ত্তৃক নিরন্তর অযোগ্য বিষয়ে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমি যে যে সময়ে বিবেক ও বৈরাগ্যাদি গুণ বিষয়ে যে যে আস্থা অবলম্বন করি, দুষ্ট মূষিক যেরূপ তন্ত্রী ছেদন করে,তৃষ্ণাও তদ্রূপ সেই সেই সময়ে আমার অবলম্বিত সেই সেই আস্থা সকল খণ্ডন করিয়া দেয়।

হে মুনীন্দ্র! যেমন জলপ্রবাহে জীর্ণ পর্ণ, পবনবগে শুষ্কতৃণ ও গগনতলে শারদ মেঘ স্থির থাকিতে না পারিয়া নিয়ত ভ্রমিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আমিও কুতৃষ্ণাবশে চিন্তাচক্রে নিপতিত হইয়া সতত পরিভ্রমণ করিতেছি। আমরা বুদ্ধিবলে আত্মপদ লাভ করিতে অক্ষম হইয়া ভ্রান্ত পক্ষিগণ যেমন জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে,তদ্রূপ চিন্তাজালে বেষ্টিত হইয়া বিমুগ্ধ হইতেছি।

হে তাত! আমি তৃষ্ণারূপিণী হুতাশনশিখা দ্বারা এরূপ ভাবে দগ্ধ হইতেছি যে, যদি অমৃত দ্বারাও লেপন করা যায়, তথাপি তাহার শান্তি হইবে বলিয়া সম্ভাবনা করিতেছি না। এই তৃষ্ণারূপিণী উন্মত্ত তুরঙ্গমী বহুদূরে গমন করত পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সহসা দিগদিগন্তে পরিভ্রমণ করিতেছে। কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার নিমিত্ত

ঘট যেরূপ রজ্জু দ্বারা গ্রীবাদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর ঊর্দ্ধ এবং অধোদিকে গমনাগমন করিতে থাকে, তদ্রূপ জীবও মমতারূপ দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিযুক্ত তৃষ্ণারূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সতত স্বর্গ নরকাদিরূপ ঊর্দ্ধাধঃ প্রদেশে যাতায়াত করিতেছে। এই অন্তর্গ্রথিত দুশ্ছেদ্য বিষয় তৃষ্ণায় সমাকুল হইয়াই মানবগণ রজ্জু বদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় প্রতিনিয়ত অসার সংসার ভার বহন করিতেছে। কিরাতরমণী যেমন পক্ষীদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুরন্ত বিষয় তৃষ্ণাও জীবদিগকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুত্রমিত্রকলত্রাদিরূপ সুদীর্ঘ জাল বিস্তার করিয়াছে।

হে মহর্ষে! এই তৃষ্ণা আমাকে অশেষ প্রকারে উত্তেজিত করিতেছে। যদিও অমি ধৈর্য্যশালী, তথাপি অন্ধকাররজনীর ন্যায় তৃষ্ণা আমাকে ভীত করিয়াছে। আমি চক্ষুষ্মান্ হইলেও তৃষ্ণা আমাকে অন্ধ করিয়াছে। আমি আনন্দময় হইলেও তৃষ্ণাই অমাকে খেদান্বিত করিতেছে। এই তৃষ্ণা কৃষ্ণা ভুজঙ্গিনীসদৃশ কুটিলা, কোমলস্পর্শা এবং পরিণামে বিষতুল্য; শত্রুতাপ্রভৃতি কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে, ইহাকে যদি কেহ অল্পমাত্রও স্পর্শ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিতে থাকে। এই দীনস্বভাবা দৌর্ভাদায়িনী তৃষ্ণাই বিবিধমায়া ও রোগের উৎপাদন করত তৃষ্ণা রাক্ষসীর ন্যায় মানবগণের হৃদয় ভেদ করিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মন্! বীণার তুম্বি স্ফুটিত হইয়া গেলে, তাহার তন্ত্রী হইতে উৎপন্ন ধ্বনি যেমন আনন্দ জনক হয় না; তদ্রূপ সুষুম্নাদিনাড়ীত্রয় পরিবেষ্টিত শরীরধারিণী তৃষ্ণাও আনন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। গিরিগুহায় সমুৎপন্ন ঘনরসশালিনী সুদীর্ঘ লতা যেমন দিবাকর-করের স্পর্শ ব্যতীত পরিম্লান হইয়া পরিণামে দুঃখজনক উন্মাদদায়িনী হয়, সেইরূপ এই বিষয়তৃষ্ণাও মানবদিগকে দুঃখ ও উন্মাদ প্রদান করে। এই তৃষ্ণা ক্ষীণ মঞ্জরীর ন্যায় নিষ্ফল, ইহা বৃথাই সমুন্নত হইতেছে; ইহা দ্বারা কোনরূপ আনন্দ বা মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

হে মহর্ষে! গতযৌবনা বর্ষীয়সী বারবিলাসিনীর ন্যায় এই তৃষ্ণা পুরুষগণের মন বশীভূত করিতে না পারিলেও সকলেরই অনুধাবন

করে, প্রত্যুত কোন ফলই লাভ করিতে পারেনা। রঙ্গালয়-গতা বৃদ্ধা নর্ত্তকী যেমন শৃঙ্গারহাস্যকরুণাদি বিবিধ রসের অবতারণা করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিষয়তৃষ্ণাও এইবিস্তীর্ণ জগন্মণ্ডলরূপ রঙ্গমঞ্চে থাকিয়া শোক মোহ প্রভৃতি বহুবিধ রসের উদ্ভাবনপূর্ব্বক সংসার মধ্যে নর্ত্তন করিতেছে। জরা মরণাদি যাহার প্রফুল্ল কুসুম এবং উন্নতি ও অবনতি যাহার ফলরাশি, তাদৃশ সংসাররূপ বিশাল অরণ্যমধ্যে সেই তৃষ্ণারূপিণী বিষলতা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। জীর্ণকলেবরা নর্ত্তকী যেমন নৃত্য ক্রিয়ায় অক্ষম হইলেও দর্শকদিগের চিত্তবিনোদন করিবার নিমিত্ত নৃত্য ক্রিয়ায় উদ্যত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বলহীনা তৃষ্ণাও মানবমণ্ডলীর মনোবিমোহনের জন্য সংসারাঙ্গণে সতত নিরানন্দভাবে নৃত্য করিতেছে। চপলস্বভাবা ময়ূরী যেমন বর্ষাকালীন নীহারসমাচ্ছন্ন দিবসে উৎফুল্ল-হৃদয়ে নৃত্য করত শরদাগমে বিরত হইয়া দুর্গম দেশে নীড় নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ এই তৃষ্ণাও মোহাবরণ সময়ে সাতিশয় স্ফুরিত হইয়া বিবেকরূপ আলোক সমুদ্ভাসিত হইলে প্রশান্তভাব ধারণপূর্ব্বক দুরধিগম বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে।

হে তপস্বিপ্রধান! যেরূপ বর্ষাগমে চিরপরিশুষ্কা তরঙ্গিণী কিছু দিনের জন্য বহুল কল্লোল বিস্তার করত উল্লসিত হয়, সেইরূপ এই চিরপরিশূন্য বিষয়তৃষ্ণাও অতি সামান্য সময়ের নিমিত্ত বৃথা আনন্দ-কোলাহলে সমাকুল হইয়া সমুল্লসিত হইয়া থাকে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া পক্ষিণী যেমন ফলশূন্য পাদপ পরিত্যাগ করত ফলশালী অপর পাদপকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ তৃষ্ণাও এক পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে অবলম্বন করে, তৃষ্ণা চপলস্বভাবা বানরীর ন্যায় অতি দুর্গম্য দেশেও পদবিন্যাস করে, পরিতৃপ্ত হইলেও ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করে না এবং চিরকাল এক স্থানেও অবস্থান করিতে পারে না। অর্থাৎ ভোগ-লালসায় তৃষ্ণা অগম্য বস্তুতেও আসক্ত হইয়া থাকে, কোনরূপ অভাব না থাকিলেও পুনঃ পুনঃ বিষয়ান্তরের অভিলাষ করিতে বিরত হয় না এবং দীর্ঘকাল এক বস্তুতে স্থৈর্য্য অবলম্বন করে না।

হে মুনে! মানবগণ "এই কার্য্য মঙ্গলকর" এইরূপ ধারণা করত

তদনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া পশ্চাৎ অমঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেও দৈবদুর্ব্বিপাক হেতু তাহা হইতে যেমন বিরত হইতে পারে না; সেইরূপ এই তৃষ্ণাও অশুভকে শুভ বলিয়া মনে করত তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ তাহা অশুভরূপে অবগত হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে নিবৃত্ত হয় না, বরঞ্চ যত্নাতিশয়-সহকারে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে থাকে। হৃদয়-কমলের মধুকরীরূপিণী তৃষ্ণা কোন সময়ে পাতালে, কখন নভস্থলে এবং কখন বা দিক্‌কুঞ্জে পরিভ্রমণ করিতেছে। সংসারে যত প্রকার দোষ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে তৃষ্ণাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখ প্রদান করে, অধিক কি, যে ব্যক্তি অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থান করে, এই তৃষ্ণা তাহাকেও অতি ভয়ঙ্কর সঙ্কটে নিপাতিত করিয়া থাকে। এই তৃষ্ণারূপিণী জলদমালিকা মোহরূপ নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমালোক অবরুদ্ধ করত নিরতিশয় জাড্য প্রদান করে। বহুসংখ্যক পশুর কণ্ঠবন্ধনের রজ্জু যেমন একটী সুদীর্ঘ রজ্জুতে গ্রথিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংসারস্থ যাবতীয় প্রাণীরই চিত্ত একমাত্র তৃষ্ণায় গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এই তৃষ্ণা ইন্দ্রধনুর ন্যায় দীর্ঘ, গুণহীন, শূন্য ও শূন্যাশ্রয় হইয়া মলিনস্থান অবলম্বন করত সতত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তৃষ্ণা সদ্‌গুণরূপ শস্যরাশির বজ্র, আপৎশস্যের শরৎ, জ্ঞানাম্বুজের হিমরাশি, তমঃপ্রসরের হেমন্তরজনী, সংসারনাটকের নটী, প্রবৃত্তিরূপ কুলায়ের বিহঙ্গমী, মানসরূপ কাননের হরিণী, কাম-সঙ্গীতের বিপঞ্চী, ব্যবহারসাগরের লহরী, মোহমাতঙ্গের শৃঙ্খলা, সংসার-বটতরুর প্ররোহ, দুঃখ কুমুদের কৌমুদী এবং জরা মরণ দুঃখের রত্নসম্পুটিকা। মানবগণের আধিব্যাধিই এই তৃষ্ণারূপিণী সততোন্মাদ-পরায়ণা বিলাসিনী রমণীর বিলাস বস্তু।

হে ব্রহ্মন্! এই তৃষ্ণাকে আকাশপথের সহিত তুলনা করা যায়, কেননা, আকাশপথ যেমন কখন আলোক, কখন অন্ধকার এবং কখন বা নীহারজালে সমাবৃত থাকে, তদ্রূপ এই তৃষ্ণাও কোন সময়ে ঈষদ্‌বিবেক-বিকাশ, কখন বিবেকশূন্যতা ও কখন বা মহা-মোহে আচ্ছন্ন হইতেছে। যেরূপ মেঘান্ধকার-সমাচ্ছন্ন-রজনীর অবসান হওয়ায় রজনীচরগণ অতি দূরে অপসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ তৃষ্ণা উপশান্ত হইলে সর্ব্ব দুঃখই বিদূরিত

হইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষজনীত বিসূচিকাসদৃশী তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া না যায়, তাবৎপর্য্যন্ত সংসারী পুরুষ মুগ্ধ, মূক ও ব্যাকুলভাবেই অবস্থান করিতে থাকে। এই লোক সকল যদি একমাত্র চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দুঃখই থাকে না, সর্ব্ব দুঃখই দূরীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানিগণ তৃষ্ণাবিসূচিকার উপশম বিষয়ে একমাত্র চিন্তা ত্যাগকেই প্রধান মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হে মহর্ষে! যেমন জলাশয়চারিণী মৎসী আমিষ মনে করিয়া তৃণ-পাষাণাদি সমস্ত বস্তুই গ্রহণপূর্ব্বক পরিশেষে বড়িশদ্বারা আবদ্ধ হইয়াও চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, তদ্রূপ এই তৃষ্ণা অন্তিমকাল সমাগত হইলেও বিষয়লোভে পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। দিনকরের করনিকর যেরূপ কমলের বিকাশসাধন করে, ব্যাধিযন্ত্রণা ও কামিনীরূপিণী তৃষ্ণাও সেইরূপ গম্ভীর ব্যক্তিরও অধীরতাবিধান করিয়া দেয়। এই তৃষ্ণা বেণুলতার ন্যায় অন্তঃশূন্য, গ্রন্থিসম্পন্ন, দীর্ঘ ও অঙ্কুরকণ্টকময়ী হইয়া মণিমুক্তালাভ-লালসার আস্পদ হইয়াছে। অহো কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এই তৃষ্ণা নিতান্ত দুশ্ছেদ্য হইলেও ধীমান্ ব্যক্তি বিবেকরূপ নিশিত অসি দ্বারা অনায়াসেই ইহাকে ছেদন করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! পুরুষগণের হৃদয়স্থিত এই তৃষ্ণা যেরূপ তীক্ষ্ণ; অসিধারা, বজ্রতেজ বা প্রতপ্ত লৌহখণ্ড-সকলও তদ্রূপ তীক্ষ্ণ নহে। তৃষ্ণা দীপশিখার ন্যায় দীর্ঘদশা ও স্নেহযুক্ত হইয়া অসিতবর্ণ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ধারণ করত অন্তর্দ্দাহ হেতু দুস্পর্শ হইয়াছে।

হে তপোনিধে! অধিক কি, যিনি সুমেরুর ন্যায় গাম্ভীর্য্যশালী প্রাজ্ঞ শূর ও স্থৈর্য্যযুক্ত তাদৃশ উত্তম পুরুষকেও একমাত্র বিষয়-তৃষ্ণাই ক্ষণকালের মধ্যে তৃণের ন্যায় অপদার্থ করিয়া থাকে। এই তৃষ্ণা বিন্ধ্যাটবীর ন্যায় ঘনজালে আবৃত, অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও রজঃপটলে বেষ্টিত হইয়া সমধিক বিস্তীর্ণ ও ভয়ঙ্কর হইয়াছে। এই তৃষ্ণা মাত্র এক হইলেও সমস্ত ভুবন মধ্যে লক্ষিত হইতেছে এবং শরীর মধ্যে অবস্থান করিলেও অনায়াসে ইহাকে লক্ষ্য করা যায় না; পরন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তৃষ্ণা চঞ্চলবীচিমালা-সমন্বিত ক্ষীরসমুদ্র-জলেমাধুর্য্যশক্তির ন্যায় সমস্ত জগতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিন্দ্র! ইহসংসারে এই যে জীবদেহ স্ফুরিত হইতেছে, ইহা কেবল বহুসংখ্যক আর্দ্রনাড়ী দ্বারা পরিবেষ্টিত, বিকারযুক্ত ও পতনশীল, সুতরাং এই জীবদেহ কেবল দুঃখের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জীবদেহ জড় হইলেও চিদাত্মার অধ্যাস হেতু চেতনপ্রায় ও অভব্য হইলেও ভব্যের ন্যায় হইয়াছে। ইহাকে সাধারণ জড় বা চেতনের মত নির্দ্দেশ করা যায় না। দেহ জড় কি চৈতন্যবিশিষ্ট এইরূপ সংশয় দুষ্টমন ও বিবেকহীন বিমূঢ় আত্মাশ্রয় দেহ মোহই প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে অল্পেই আনন্দ ও অল্পেই খেদ আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং এই দেহের ন্যায় শোচনীয়, নিকৃষ্ট ও গুণহীন আর কিছুই বিদ্যমান নাই। এই দেহ সর্ব্বথা বৃক্ষরূপেই প্রতিভাত হইতেছে, ইহা দশনরাজিরূপ কেশরে বিরাজিত ও ঈষৎহাসরূপ পুষ্প দ্বারা নিয়ত শোভিত। ইহার শোভা অতি অল্পকালই প্রকাশিত হইয়া থাকে; দেহের ভুজযুগ ইহার শাখা, অংশভাগ স্কন্ধ, নয়নদ্বয় গর্ত্ত, শিরোদেশ বৃহৎ ফল, কর্ণদ্বয় কাষ্ঠকুট্টকপক্ষীর চঞ্চুপ্রহার-কৃত ছিদ্র এবং কর ও চরণ ইহার পল্লব। ইহা গুল্মবান্ * ও শস্ত্রাদিদ্বারা ছেদন-ভেদনের যোগ্য। এই দেহবৃক্ষে বুদ্ধি ও জীব এই দুইটী পক্ষী সতত বসতি করিতেছে। ইহা কান্তিরূপ ছায়াশালী ও জীবরূপ পান্থগণের বিশ্রামস্থল। এই দেহবৃক্ষ কাহার আত্মীয় এবং কাহারই বা পর? ইহাতে আবার আস্থা এবং অনাস্থাই বা কি?

হে তাত! এই সংসারসাগর সন্তরণ করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ নৌকাতুল্য দেহলতাকে অবলম্বন করা হইতেছে; পরন্তু ইহাতে কাহারও আত্মভাবনা হইতেছে না। বহুতর ছিদ্রযুক্ত ও লোমরাজিরূপ অসংখ্যতরুসমন্বিত এই দেহনামক শূন্য অরণ্যে অশঙ্কিতভাবে বাস করিতে কাহার

* গুল্ম অর্থে—দেহপক্ষে রোগবিশেষ ও বৃক্ষপক্ষে মূল বা শিকড়

বিশ্বাস হয় ? চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত ধ্বনিহীন অসার পটহের অভ্যন্তরে যেমন বিড়াল বাস করে,সেইরূপ আমি এই মাংসস্নায়ুপ্রভৃতি-গঠিত অসার শরীর মধ্যে অবস্থান করিতেছি। যে উপায়ে ইহা হইতে বহির্গত হওয়া যায়, সেই উপদেশ-শব্দ আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। হে মুনে! এই দেহরূপ বটবৃক্ষ আমার নিকট কিঞ্চিন্মাত্রও সুখের কারণ নহে। ইহা সংসাররূপ মহারণ্যে সম্ভূত হইয়াছে, চিত্তরূপ মর্কট ইহাতে আরোহণ করিয়াছে এবং চিন্তারূপ মঞ্জরীযুক্ত হইয়া অপরিসাম দুঃখরূপ ঘুণ দ্বারা ইহা ক্ষত হইতেছে। এই দেহতরু তৃষ্ণারূপিণী ভুজঙ্গিনীর বাসস্থান ও কোপরূপ বায়সের আলয়। ইহা স্মিতরূপ প্রফুল্ল কুসুমে শোভিত হইতেছে। শুভ ও অশুভ এই দুইটী ইহার মহাফল, বাহুদ্বয় ইহার লতাজাল, হস্ত ইহার স্তবক, প্রাণবায়ুসঞ্চালিত অঙ্গ সকল ইহার পল্লব এবং সমুদায় ইন্দ্রিয় ইহার বিহঙ্গম ও জানু ইহার স্তম্ভ। ইহা যতদিন যৌবনকান্তিরূপ শীতলচ্ছায়ায় বিরাজমান থাকে, কামরূপ পান্থ ইহাকে তাবৎকাল সেবা করে। এই বৃক্ষোপরি কেশরূপ তৃণরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। অহঙ্কার রূপ গৃধ্র ইহাতে বাস করিতেছে এবং বিভক্ত বাসনারূপ প্ররোহাদি দ্বারা ইহার মূলদেশ এরূপভাবে বেষ্টিত হইয়াছে যে,সহজে ইহাকে ছেদন করা একেবারেই দুঃসাধ্য।

হে মুনিবর! এই কলেবর অহঙ্কাররূপ গৃহস্থের মহাগৃহ, ইহা বিলুণ্ঠিতই হউক অথবা স্থিরভাবেই থাকুক, ইহাতে আমার ক্ষতি কি, অহঙ্কার যে গৃহের অধীশ্বর, বিষয়-তৃষ্ণা উহার গৃহিণী। ইন্দ্রিয়গণরূপ পশু সকল উহাতে আবদ্ধ এবং কামাদি বিবিধ রাগে উহার সর্ব্বাবয়ব রঞ্জিত রহিয়াছে, সুতরাং এই দেহগৃহ আমার অভিলষিত হইতেছে না। ইহার পৃষ্ঠাস্থিরূপ কাষ্ঠমধ্যে প্রায়ই ছিদ্র রহিয়াছে এবং ইহা দীর্ঘপেশীরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ; সুতরাং এ গৃহ আমার ইষ্ট নহে। যাহাতে বিস্তৃত স্নায়ুরূপ বন্ধনরজ্জু, রুধিরজল-জনিত কর্দ্দম ও জরারূপ সুধার বিলেপন রহিয়াছে, তাহা আমার অভিলষিত নহে। চিত্তরূপ ভৃত্যের বিবিধ চেষ্টা দ্বারা যাহা স্থিরভাবে বিদ্যমান এবং মিথ্যামোহ যাহার বিশালস্তম্ভ, আমি সেই গৃহে নিস্পৃহ। যথায় দুঃখরূপ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি, সুখরূপ শয্যার রম্যতা

ও যাহাতে দুশ্চেষ্টারূপিণী দগ্ধদাসী বর্ত্তমান, আমি সেই গৃহে অভিলাষী নহি। যাহাতে মলযুক্ত বিষয়সমূহরূপ ভাণ্ড ও গৃহোপকরণ সকল সমাকীর্ণ রহিয়াছে এবং অজ্ঞানরূপ ক্ষার যাহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে, সেই দেহগৃহ আমার অভিপ্রেত নহে। গুল্‌ফ যাহার জঙ্ঘারূপ স্তম্ভের আধার দারু, জানুর উপরিদেশ স্তম্ভের ঊর্দ্ধভাগ এবং দীর্ঘ বাহুরূপ দারু দ্বারা যাহা দৃঢ়ীকৃত, আমি সেই দেহগৃহে অভিলাষ করি না।

হে ব্রহ্মন্! যথায় প্রজ্ঞারূপিণী গৃহস্বামিনী জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ গবাক্ষ-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে এবং যথায় চিন্তারূপিণী দুহিতা সকল সর্ব্বদাই রহিয়াছে, সেই দেহগৃহ আমার বাঞ্ছনীয় নহে। কেশকলাপ যাহার ছাদ, কর্ণদ্বয় যাহার শোভাশালী উপরিতন গৃহ এবং অনতি দীর্ঘ অঙ্গুলি সকল যাহার কাষ্ঠচিত্র, সেই গৃহ আমার ইষ্ট নহে। সর্ব্বাঙ্গ যাহার ভিত্তি, ঘনরোমরাজি যাহার যবাঙ্কুর এবং উদরচ্ছিদ্র যাহার মধ্য অবকাশ, আমি সে গৃহে অভিলাষ করি না। যথায় নখরনিকররূপ লূতাতন্তু রহিয়াছে, ক্ষুধারূপিণী কুক্কুরী চিৎকার করিতেছে এবং প্রাণরূপ প্রভঞ্জন ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, তাদৃশ দেহগৃহ আমার অভীষ্ট নহে। যথায় প্রবেশ ও নির্গমন বিষয়ে বেগবান্ বায়ু ব্যগ্র রহিয়াছে ও যাহা ইন্দ্রিয়রূপ গবাক্ষজালে বেষ্টিত, সে গৃহে আমার অভিলাষ নাই। যে গৃহ জিহ্বারূপ অর্গলসমন্বিত বদনদ্বারে ভীষণ হইয়াছে এবং যথায় দন্তপংক্তিরূপ অস্থিখণ্ড দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আমার ইষ্ট নহে। যাহা ত্বক্‌রূপ সুধা-বিলেপনে মসৃণ, সন্ধিরূপ শকটচলনে চঞ্চল ও মনরূপী দীর্ঘজীবী মূষিক্ যাহার ভিত্তি খনন করে, তাদৃশ দেহগৃহ আমার ইষ্ট নহে। যাহা হাস্যরূপ দীপ-প্রভায় উদ্ভাসিত, কখন আনন্দে পরিপূর্ণ ও কখনও বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-প্রবাহে পরিব্যাপ্ত, আমি সেই দেহগৃহে অভিলাষ করি না। যাহা সর্ব্বরোগের আয়তন ও বলীপলিতের আবাস এবং যাহা সর্ব্ববিধ মনোদুঃখরূপ সারঙ্গে গহন, সেই দেহগৃহ আমার অভিপ্রেত নহে; যাহা ইন্দ্রিয়রূপ ভয়ঙ্কর ভল্লুকদিগের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে, যাহা শূন্য ও সার-হীন কোটরে পরিপূর্ণ এবং যাহাতে বাম দক্ষিণাদি দিক্‌কুঞ্জ সকল অজ্ঞানান্ধকারে পূরিত রহিয়াছে, তাদৃশ দেহাটবী আমার অভীপ্সিত হইতেছে না।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যেমন কোন অল্পবল ব্যক্তি পঙ্কপতিত হস্তীকে উদ্ধার করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও এই দেহগৃহ ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছি না। এই রাজ্য, লক্ষ্মী, দেহ ও চেষ্টা এ সমুদায়ে আমার কি হইবে? ফলতঃ ইহাতে আমার কোন প্রয়োজনই নাই, কেননা সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ কাল অতি অল্প দিনের মধ্যে সমস্তই বিনষ্ট করিবে। হে মুনে! এই যে রক্তমাংসময় নশ্বর কলেবর রহিয়াছে, আপনি ইহার বাহ্য অভ্যন্তর বিবেচনা করিয়া বলুন,—ইহাতে রমণীয়তা কি? হে তাত! যাহারা মৃত্যু-কালে জীবের অনুগমন করে না, বলুন দেখি, সেই সকল কৃতঘ্ন দেহে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির আস্থা হইতে পারে? এই কলেবর মত্তমাতঙ্গের কর্ণাগ্রের ন্যায় চঞ্চল ও লম্বমান জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং যাবৎ এ আমাকে পরিত্যাগ না করে, আমি তাহার পূর্ব্বেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব। এই ক্ষুদ্র-স্বভাব দেহরূপ কোমল পল্লব সতত প্রাণ-পবনের আন্দোলন-বশতঃ চঞ্চল হইয়া বিবিধ আধিব্যাধিরূপ শত শত কণ্টক দ্বারা জর্জ্জরিত হইতেছে; সুতরাং এই কটু ও নীরসদেহে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

হে মহর্ষে! এই দেহ চিরকাল পান-ভোজনে রত থাকিয়াও নবোদ্গত কিশলয়ের ন্যায় কোমল ও কৃশ হইয়া পরিশেষে যত্ন ব্যতীতই ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতেছে। এই পামর দেহ পূর্ব্বোপভুক্ত ভাবাভাবময় সুখদুঃখ সকল ভূয়োভূয়ঃ অনুভব করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না। এই দেহ বহুকাল পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তারপূর্ব্বক বিবিধ বৈভব উপভোগ করিয়াও যখন উৎকর্ষ বা স্থৈর্য্য লাভে সক্ষম হইতেছে না, তখন আর এ দেহের পরিপালনে ফল কি? এই দেহ কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান, ইহাতে কোন ইতরবিশেষ জ্ঞান নাই; কেননা জরাকালে জরা ও মৃত্যুকালে মৃত্যু সকল দেহেই অবশ্যম্ভাবী।

হে তপোধন! এই কায়রূপী মূক কচ্ছপ আপনার উদ্ধারসাধনে বিমুখ হইয়া সতত সংসাররূপ জলধিগর্ভে তৃষ্ণাকুহরে প্রসুপ্ত হইয়াই রহিয়াছে। এই সংসারসাগরে প্রতিনিয়ত শত শত দেহ-কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছে, উহারা কেবল দহনেরই যোগ্য; পরন্তু ঐ সকল দেহমধ্যে মনীষিগণ কোন কোন্

বিবেকবান্ দেহকেই নরদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চিরস্থায়ী দৌরাত্ম্য যাহার বেষ্টন এবং অধোগতিরূপ ফলভারে যাহা অবনত, তাদৃশ দেহলতা দ্বারা বিবেকী ব্যক্তির কোন প্রয়োজনই নাই। এই দেহ পঙ্কমগ্ন মণ্ডুকের ন্যায় বিষয়ভোগে মগ্ন হইয়া সহসা জরাগ্রস্ত হইতেছে, পরন্তু এ অচিরকাল মধ্যে কি প্রকার দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহা জানা যাইতেছে না। এই কায়রূপী ঝঞ্ঝাবাতের যাহা কিছু ক্রিয়াকলাপ, তৎ-সমস্তই নিঃসার, রজোমার্গেই ইহার গতি; বস্তুতঃ কেহই ইহাকে নয়ন-গোচর করিতে পারে না।

হে ভগবন্! গমনাগমনকারী পবন, প্রদীপ এবং মন ইহাদিগের বিনাশ ও উৎপত্তি বরং বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু শরীর সম্বন্ধে কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহা যে কি জন্য কিরূপে কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায়ই বা চলিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা এই অনিত্য শরীর ও জগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই মোহ-মদিরোন্মত্ত মানবদিগকে শত শত ধিক্! হে মুনে! এই দেহ আমার নয়, আমিও দেহের নয় এবং এই দেহে ও আমাতে অভিন্নতা নাই, এইরূপ চিন্তা করত যাঁহাদিগের মন শান্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আর যাহারা মান ও অপমানের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখে এবং যাহাদিগের মন প্রচুর লাভে আহ্লাদিত হয়, তাদৃশ শরীরাভিমানী হতবুদ্ধি পুরুষগণ আপনাকে আবদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখেই পতিত হইয়া থাকে। হায়! আমরা দেহকুহরশায়িনী কোমলাকৃতি পিশাচীর ন্যায় অহঙ্কারজনিত বিষয় তৃষ্ণার কপট বশতঃ প্রতারিত হইতেছি। অহো কি কষ্টের বিষয়! এই শরীরাভি-মানিনী অজ্ঞানরূপিণী দুষ্ট রাক্ষসী বিবেকাদি সহায়হীনা দীনা প্রজ্ঞাকে নিরন্তর ছলনা করিতেছে।

হে মুনিবর! এই পরিদৃশ্যমান জগতের যখন কিছুই সত্য নাই, তখন তদন্তঃপাতী দেহও অসত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু ইহা কি আশ্চ-র্য্যের বিষয় যে, এই শরীর আপনা হইতে দগ্ধপ্রায় হইলেও ইহা দ্বারাই জীবগণ প্রতারিত হইতেছে। এই কায়রূপী পল্লব কতিপয় দিবসের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া নির্ঝরজলবিন্দুর ন্যায় আপনা হইতেই পড়িয়া

যাইবে। ইহা জলধির জলবিম্বের ন্যায় অচিরবিনাশী এবং সাংসারিক কার্য্যরূপ আবর্ত্তে বৃথা ভ্রমিত হইতেছে। হে দ্বিজ! এই দেহ মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিকার, স্বপ্নভ্রমের আলয় ও নশ্বরত্বের স্পষ্ট প্রমাণ, সুতরাং ইহাতে আমার ক্ষণকালের নিমিত্তও আস্থা হইতেছে না। যে ব্যক্তি বিদ্যুৎ, শারদীয় মেঘ ও গন্ধর্ব্বনগর* এই সমুদায়কে চিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করে, সে-ই এই দেহকে স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করুক।

হে ভগবন্! যাহা কিছু ভঙ্গুর পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এই দেহই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং ইহা সকল দোষের আকর। আমি এই দেহকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে নিরস্ত করিয়া সর্ব্বথা সুখী হইয়াই রহিয়াছি।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে তপস্বিপ্রবর! বিবিধ কার্য্যভার যাহার তরঙ্গ, তাদৃশ তরলাকার সংসারসাগরে জন্মলাভ করিলেও মনুষ্যগণের বাল্যাবস্থা কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। আপনি প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহাতে শক্তিহীনতা, আপদ্, তৃষ্ণা, মূকতা, বুদ্ধিমোহ, ক্রীড়াকৌতুকাদিতে অভিলাষ, চাপল্য এবং দৈন্য এই সমস্তই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। মাতঙ্গ যেমন বন্ধনস্তম্ভে আবদ্ধ হইয়া অশেষ দুরবস্থা ভোগ করিতে থাকে, সেইরূপ জীবও বাল্যাবস্থায়, রোষ রোদন দৈন্যাদি দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া অনন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করে। শৈশব অবস্থায় উপনীত হইলে জীবগণের হৃদয় যেরূপ চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে, যৌবনকালে, জরাকালে, আপদে, রোগে কিংবা মৃত্যুকালেও তদ্রূপ জর্জ্জরিত হয় না, বাল্যাবস্থায়

* কথন কথন কাহারও চক্ষে মানসিক ভ্রমবশতঃ আকাশে যে তেজোময় গৃহের ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহা।

কার্য্যকলাপ পশুপক্ষী প্রভৃতির সমান হইয়া থাকে এবং পদে পদে সকলের নিকটই ভর্ৎসিত হইতে হয়; সুতরাং এই চঞ্চল বাল্যকাল মরণ হইতেও দুঃখপ্রদ। ইহাতে মন প্রগাঢ় অজ্ঞানে আবৃত হইয়া নানাবিধ কল্পনাজালে নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে এবং সংকল্পিত বিষয়সমূহের অলাভ নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকারে বিচ্ছিন্ন ও সংশীর্ণ হইয়া সতত দুঃখিত হইতে থাকে; সুতরাং হে মুনীন্দ্র! এবম্বিধ বাল্যকাল কাহারও সুখাবহ নহে।

হে মহর্ষে! আপনি ভাবিয়া দেখুন, বাল্যকালে অজ্ঞানতা হেতু জল, অনল ও অনিল প্রভৃতি হইতে পদে পদে যেরূপ ভয়ের সঞ্চার হয়, কোনরূপ গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলেও কাহারও সেরূপ ভয়ের সম্ভাবনা হয় না। বালক সকল সতত নানাবিধ লীলা, দুর্ব্বিলাস, দুশ্চেষ্টা ও দুরাশায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া সমধিক মুগ্ধ হইয়া থাকে। তাহারা মোহাবৃত হইয়া নিয়তই বৃথা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত উদ্যত হয়; সুতরাং বিবিধ দুষ্ক্রিয়ার আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠাহীন শৈশবকাল কখনই শান্তি উৎপাদন করে না। উহাতে কেবল অধিক সময় গুরুজনের শাসনে থাকিয়া দুঃখভোগই করিতে হয়। পেচকগণ যেমন দিবাভাগে অন্ধকারগর্ত্তে বাস করিতে থাকে, সেইরূপ যাহা কিছু দুরাচার, যাহা কিছু দুষ্ক্রিয়া, যাহা কিছু দোষ ও যাহা কিছু মনঃকষ্ট, তৎসমস্তই বাল্যকালে বালকহৃদয়ে অবস্থান করে।

হে ব্রহ্মন্! যাহারা মন্দবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাল্যকালকে রম্য বলিয়া কল্পনা করে, সেই সকল হতচেতা মূর্খ পুরুষদিগকে ধিক্! যে কালে ত্রৈলোক্যের কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই এবং যাহাতে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারেই মনের চঞ্চলতা হইয়া থাকে, তাহা কি প্রকারে সন্তোষজনক হইতে পারে? হে মুনে! সত্য বটে, সমস্ত অবস্থায় সকল প্রাণীরই বিষয় ভেদে মনের চাঞ্চল্য হইয়া থাকে, কিন্তু বাল্যকালে তাহা অপেক্ষা মনের দশ গুণ চঞ্চলতা হয়। মানবের মন স্বভাবতই চঞ্চল, ইহাতে আবার বাল্যাবস্থা আরও চঞ্চল, সুতরাং এরূপ স্থলে উভয়ের মিলনজনিত আভ্যন্তরিক কুচাপল্য হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? হে ব্রহ্মন্! আমার বোধ হয়, কামিনীর কটাক্ষ, তড়িৎপুঞ্জ, বহ্নিশিখা ও তরঙ্গমালা, ইহারা শিশুদিগের মনের নিকট হইতেই চপলতা শিক্ষা করিয়াছে। শৈশব এবং মন

ইহারা উভয়েই সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে চঞ্চল বলিয়া ইহাদিগকে সহোদরের ন্যায়ই লক্ষিত হইতেছে। মানবগণ যেরূপ ধনী পুরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, যাবতীয় দোষ ও সমস্ত মনঃপীড়া ইহারাও বালক-দিগেরই অনুবর্ত্তন করিতে থাকে। শিশু যদি প্রত্যহ নূতন নূতন প্রীতিকর বস্তু প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে বিষতুল্য প্রবল মনঃক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

বালক কুক্কুরের ন্যায় অল্পেই সন্তুষ্ট হয়, অল্পেই অসন্তুষ্ট হয় এবং সতত অপবিত্র বস্তুতেই ক্রীড়া করিয়া থাকে। বালক এবং বর্ষাজলসিক্ত প্রতপ্ত স্থল ইহারা উভয়েই তুল্য, কেননা উভয়েই নিরন্তর বাষ্পব্যাপ্ত, উভয়েই কর্দ্দমাক্ত ও উভয়েই জড়প্রকৃতি। বালকগণ ভয়, আহার ও দৈন্য এই সমুদায়ের অধীন, ইহারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তুতে অভিলাষী হইয়া থাকে, ইহাদিগের বুদ্ধির ন্যায় শরীরও চঞ্চল; সুতরাং এরূপ বাল্যে দুঃখ ভিন্ন কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ নাই। দুর্ব্বল বালক যদি স্বীয় অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সন্তপ্তমনে দুঃখভোগ করিতে থাকে এবং তাহার হৃদয় যেন উন্মূলিত হইয়া যায়। হে মুনে! বালকগণ দুশ্চেষ্টা দ্বারা আপন অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ কুটিল ও ক্রূর উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তাহাতে যে সমস্ত দুঃখভোগ করে, সে সকল দুঃখ অপর কাহারও নাই। নিদাঘতাপে বনস্থলী যেরূপ সন্তপ্ত হইতে থাকে, মনোরথবিলাসী বেগশালী মন দ্বারাও বালকগণ সেইরূপ সতত পরিতপ্ত হয়। আলানবদ্ধ গজেন্দ্র যেমন ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে, সেইরূপ বালকগণও বিদ্যাগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। বাল্যসময়ে বালস্বভাব হেতু যেরূপ নানাবিধ বাসনা জন্মে ও সতত মিথ্যা বস্তুর প্রতি মনের যেরূপ একাগ্রতা হয়, বাস্তবিক ঐ সকল সমধিক দুঃখের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হে ভগবন্! যে অবস্থায় মূর্খতা-বশতঃ সন্তুষ্টমনে ত্রিভুবনভোজন ও আকাশ হইতে চন্দ্র গ্রহণে অভিলাষ হইয়া থাকে, সেই বাল্যাবস্থা কি প্রকারে সুখের কারণ হইতে পারে? হে মতিমন্! আপনি ভাবিয়া দেখুন, বালক ও বৃক্ষ ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই, কেননা, উভয়েরই

অন্তরে চেতনা থাকিলেও উভয়েই শীতাতপনিবারণে অশক্ত। পক্ষিগণ যেমন ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে গগনপথে উড্ডয়ন করিতে অভিলাষী হয়, পরন্তু বাতাতপাদিহেতু পূর্ণকাম হইতে সমর্থ হয় না; সেই-রূপ বালকগণও ক্ষুধায় আকুল হইয়া হস্তপ্রসারণ-পূর্ব্বক আহার গ্রহণে অভিলাষী হয় বটে; পরন্তু শরীর অবশীভূত বলিয়া সফল-কার্য্য হইতে পারে না। বালক ও পক্ষী উভয়েই ভয় ও আহারের বশীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং এ সম্বন্ধে উভয়েই তুল্যধর্ম্ম।

হে মহামুনে! বাল্যকালে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজন এবং অপরাপর বয়োজ্যেষ্ঠ জনগণের সমীপে সর্ব্বদা ভীত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। সুতরাং এই কাল ভয়েরই আলয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দোষে মন মলিন হইয়া যায় এবং ইহা অবিবেকরূপ বিলাসি-জনের আশ্রয়; সুতরাং ইহ-সংসারে এই বাল্যাবস্থা কাহারও প্রীতিকর নহে।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! অনন্তর মানব বাল্যকালের অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে তাহার অন্তঃকরণ ভোগোৎসাহে দূষিত হইয়া যায় এবং অধঃপতনের নিমিত্তই যৌবনে আরোহণ করিয়া থাকে। জ্ঞান-হীন যুবা পুরুষ অনন্ত বিলাসযুক্ত স্বীয় চঞ্চল মনের রাগদ্বেষাদি বিবিধ বৃত্তি সকল অনুভব করত দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিপতিত হইতে থাকে। এদিকে আবার নানাবিধ সম্ভ্রমজনক মদনপিশাচ যুবা পুরুষের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আপন বশে আনয়ন করে। যেমন নেত্রলিপ্ত সিদ্ধাঞ্জন বালকদিগকে নিধি প্রদর্শন করে, সেইরূপ যৌবনকালে অবশ মন যুবতীর চিত্তের ন্যায় চঞ্চলস্বভাব চিন্তাসমূহকেও ভোগ্য বস্তু সকল প্রদর্শন করিয়া থাকে।

হে মুনিবর! যে সমস্ত কামক্রোধাদি নিতান্ত দুঃখদায়ক দোষ আছে, যৌবনকালেই তৎসমস্ত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাতে যাহারা আসক্ত হইয়া থাকে, ঐ দোষ সকল পরিশেষে তাহাদিগেরই বিনাশ সাধন করে। যাহা নিরন্তর ভ্রম প্রদান করে এবং যাহা মহানরকের কারণ, সেই যৌবনে যাহারা বিনষ্ট না হয়, তাহারা অন্য কোন প্রকারেই বিনষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি এই নানারসশালিনী বিচিত্র বৃত্তান্ত-পরিপূরিতা ভীষণ যৌবন-বনভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ ধীর বলিয়া অভিহিত। যাহা নিমেষ মাত্র শোভাশালী, ভীষণ গর্জ্জনের ন্যায় যাহার অভিমানোক্তি এবং যাহা ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রকাশমান, আমি সেই অমঙ্গলজনক যৌবনের প্রতি প্রীতিমান্ হইতেছি না।

হে মহর্ষে! যাহা আপাততঃ মধুর ও পরিণামে তিক্ত, আমি সেই সুরাসদৃশ দোষাবহ যৌবনের প্রতি অনুরক্ত নহি। স্বপ্নকালে অঙ্গনাসংসর্গ যেমন অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া অতি শীঘ্রই প্রতারণা কার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই যৌবনকালও একেবারে অসত্য হইলেও মূর্খ জনগণের নিকট সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া অচিরাৎ তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকে; সুতরাং ইহা আমার রুচিকর হইতেছে না। হে মুনে! যাহা কিছু ক্ষণ-মনোহর বস্তু আছে, তন্মধ্যে যৌবনই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহা সমস্ত পুরুষের নিকটই ক্ষণকালের নিমিত্ত মনোরম হয়; সুতরাং এই গন্ধর্ব্বনগর তুল্য যৌবনে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগী নহি। যাবৎ কালের মধ্যে লক্ষ্যে শর নিপতিত হয়, এই যৌবন তাবৎকালই সুখপ্রদ হইয়া পরক্ষণেই দুঃখ প্রদান করে; অতএব এই সতত গ্রাহদোষপ্রদায়ী যৌবনে আমার অভিরুচি নাই। যৌবন বারবনিতার সংসর্গের ন্যায় আপাততঃ রমণীয় হইয়া পরিণামে সদ্ভাবহীন হয়; সুতরাং ইহা আমার রুচিজনক হইতেছে না।

হে ব্রহ্মন্! যেমন প্রলয়কালে মহোৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ সর্ব্বপ্রাণির দুঃখদায়ক যাহা কিছু ক্রিয়াকলাপ আছে, তাহারাও যৌবনকালেই উপস্থিত হইয়া থাকে, আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, যাহা হৃদয়ে অন্ধকার বিধান করে, সেই যৌবনযুক্ত অজ্ঞানরূপ রজনী

হইতে ভৈরবরূপী ভগবান্ও ভীত হইয়া থাকেন। যৌবনে যে মোহ আসিয়া পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহা সাতিশয় ভ্রমপ্রদ হয় এবং এই ভ্রম বশেই চিরদিনের জন্য যাবতীয় সদাচার বিস্মৃত হইতে হয় ও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটে। যৌবন কালে প্রণয়িনীর বিরহ বশতঃ যে দুঃসহ শোকানল সমুৎপন্ন হয়, তাহাতে দাবদহনে তরুর ন্যায় মানবহৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। প্রসন্নপূতসলিলা প্রবল তরঙ্গিণী যেমন বর্ষাকালে মলিন হইয়া যায়, সেইরূপ মানবের মতি যদি নির্দ্দোষ হেতু নির্ম্মল ও ঔদার্য্য গুণে বিস্তীর্ণ হইয়া পবিত্রভাবও ধারণ করে, তথাপি যৌবনকালে তাহা কলুষিত হইয়া যায়। হে মুনে! নদী যদি কল্লোলমালায় সমাকুল হইয়া সাতিশয় ভয়ঙ্কর-ভাবেও প্রবাহিত হইতে থাকে, তথাপি তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারা যায়; পরন্তু যাহাতে ভোগ তৃষ্ণায় অন্তরিন্দ্রিয়সকল তরলিত হইয়া পড়ে, সেই তারুণ্যতরল চিত্তবৃত্তি কখন উল্লঙ্ঘন করা যায় না।

হে মুনীন্দ্র! যৌবন কাল উপস্থিত হইলে যুবা পুরুষ কেবল "আহা! আমার সেই কামিনী, সেই পীনোন্নত স্তনযুগল, সেই মনোহর বিলাস, সেই চন্দ্রনিন্দিত সুন্দর মুখখানি" এইরূপ চিন্তা করিয়াই নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতে থাকে। যে সকল যুবা পুরুষ ক্ষণভঙ্গুর ভোগ তৃষ্ণায় নিয়ত নিপীড়িত হয়, উহারা সাধুগণের নিকট ছিন্ন তৃণের ন্যায় সততই নিন্দিত ও অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। বন্ধনস্তম্ভ যেরূপ মৌক্তিকযুক্ত মত্ত মাতঙ্গের দর্প খর্ব্ব করিবার হেতু হয়, যৌবনও তদ্রূপ অভিমানমত্ত অবিবেকী পুরুষের অধঃপতনের কারণ হইয়া থাকে। হায়! এই যৌবন কাননের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, ইহাতে প্রিয়জন-বিয়োগ-জনিত রোদনরূপ তরু-রাজি ও মনোরূপ বিপুল মূল বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ইহার সর্ব্বত্রই অশেষ দোষরূপ আশীবিষ সকলে বেষ্টিত। সুতরাং ইহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। হে মহর্ষে! এই যৌবনকে আপনি পদ্ম বলিয়া জানিবেন; ইহাতে দুঃশ্চিন্তারূপী মধুকর, সুখরূপ মকরন্দ, অনুরাগরূপ কেশর ও কবিকারূপ দলরাজি বিরাজমান রহিয়াছে।

হে মুনে! যাহারা হৃদয়রূপ সরোবরের তীরদেশে বিচরণ করে এবং পাপ ও পুণ্য যাহাদিগের সারহীন পক্ষ, এই নবযৌবন সেই আধিব্যাধিরূপ

বিহঙ্গগণের কূলায়স্বরূপ। নবযৌবন অপার কূলপ্লাবী জলধিস্বরূপ বর্ত্তমান; ইহাতে সংখ্যাতীত জড়রূপী কল্পনাতরঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে। ধূলি-পটলসমুৎসারী প্রচণ্ড পবন যেমন লূতাতন্তুর অস্তিত্ব বিনাশে সমর্থ হয়, সেইরূপ এই রজঃ ও তমোগুণের পরিবর্দ্ধক বিষম যৌবনকালও নিখিল সদ্‌গুণের অস্তিত্ব লোপে দক্ষ হইয়া থাকে। ধূলিরাশি যেমন ইতস্ততঃ পরিচালিত অপবিত্র তৃণপত্রাদি দ্বারা দুঃসহ ও রূক্ষ হইয়া জনগণের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ সম্পাদন করত ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই যৌবন-কালও সমাকুল ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দুঃসহ হইয়া মানবগণের বদনমণ্ডলের পাণ্ডুতা বিধান করত দোষের চরম-সীমায় আরোহণ করিতেছে। মানব-গণের যৌবনোল্লাস কেবল পাপ-সম্পদের বিলাস সম্পাদন করত বিবিধ দোষের উদ্বোধন ও গুণাবলীর উচ্ছেদ সাধন করে। এই নবযৌবনরূপী চন্দ্রমা রজোগুণরূপ পরাগচপলামতিরূপিণী মধুকরীকে শরীরপঙ্কজে আবদ্ধ করত মুগ্ধ করিতেছে। এই শরীররূপ নিকুঞ্জ মধ্যে রমণীয় যৌবনরূপিণী পুষ্পমঞ্জরী উৎপন্ন হইয়া সতত উন্নতি লাভ করত মনোরূপ ভৃঙ্গকে মুগ্ধ করিতেছে।

হে মুণিবর! যাহা শরীররূপ মরুভূমির উত্তাপ হইতে উত্থিত হইয়াছে, সেই যৌবনরূপিণী মরীচিকার প্রতি ধাবমান হইয়া মনোরূপ মৃগগণ নিয়ত বিষয়গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। এই যৌবন শরীররূপ শর্ব্বরীর চন্দ্রিকা, মনোরূপ মৃগেন্দ্রের জটা ও জীবনরূপ জলনিধির তরঙ্গ; ইহা আমার সন্তোষকর হইতেছে না। এই যে যৌবনরূপী শরৎকাল, ইহা মাত্র কয়েকটী দিনের জন্যই ফল প্রসব করে, অর্থাৎ ইহা অচিরকাল মধ্যে ক্ষয় হইয়া যাইবে; সুতরাং ইহাতে আশ্বস্ত হওয়া কাহারও উচিত নহে। চিন্তামণি যেমন ভাগ্যহীন ব্যক্তির হস্ত হইতে অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিভ্রষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ এই যে যৌবনরূপী বিহঙ্গম, ইহাও অতি শীঘ্রই শরীর হইতে চলিয়া যাইবে। যৌবন যে যে সময়েই উন্নতির চরম-সীমায় উপনীত হইয়া থাকে, সন্তাপ সহ কামও কেবল যুবাপুরুষের ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত সেই সেই সময়েই প্রবল হইতে থাকে এবং যাবৎ-কাল এই যৌবনযামিনীর অবসান হইয়া না যায়, তাবৎকালই রাগদ্বেষাদি পিশাচিকা সকল বিশেষরূপে সঞ্চারণ করিতে থাকে।

হে মহর্ষে! মানুষ যেমন ম্রিয়মাণ তনয়ের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে, আপনিও তদ্রূপ এই ক্ষণবিনাশী বিবিধ বিকারসম্পন্ন বিবেকশূন্য তারুণ্যের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করুন্। যে পুরুষ মোহ বশতঃ ক্ষণভঙ্গুর যৌবন দ্বারা আনন্দ লাভ করে, তাদৃশ মহামুগ্ধ পুরুষ পশু মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অভিমানযুক্ত হইয়া অজ্ঞান বশতঃ মদোন্মত্ত যৌবনের প্রতি অভিলাষী হয়, সেই দুর্ম্মতি ব্যক্তি অচিরাৎ অনুতাপ ভোগ করিতে থাকে। হে সাধো! যাঁহারা এই যৌবন সঙ্কট হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন; এই ভূমণ্ডল মধ্যে তাঁহারাই পূজ্য, তাঁহারাই মহাত্মা এবং তাঁহারাই পুরুষ নামের যোগ্য। আমি বিবেচনা করি, ভীষণ জলজন্তুগণ পরিপূর্ণ সরিৎপতি সমুদ্রকেও অনায়াসে পার হওয়া যায়; পরন্তু এই রাগদ্বেষাদি বিবিধ কল্লোলবল-সমুদ্বেলিত অশেষ দোষদুষ্ট কুৎসিত যৌবনকে কখন অতিক্রম করা যায় না।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহা অগণিত কল্পপাদপে পরিশোভিত হইয়া ভ্রমর-নিকরের বিহারভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে এবং যাহা বিকশিত নানাজাতীয় কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রমণীয়তার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, সেই নন্দনবনভূমি যেমন ভূমণ্ডলে দুর্লভ হইয়া থাকে, সেইরূপ শমদমাদি নিখিল সদ্গুণ-সমন্বিত বিনয়ালঙ্কৃত মুনিজনাশ্রয় সুযৌবনও ইহ-সংসারে সর্ব-যুগেই দুর্লভ।

বিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—যাহা স্নায়ু ও অস্থিগ্রন্থি দ্বারা শোভিত, সেই মাংসপ্রতিমা রমণীর যন্ত্র তুল্য চঞ্চলস্বভাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আবার রমণীয়তার বিষয় কি? বস্তুতঃ নারী-অঙ্গে যাহা শোভা বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে, উহা কিছুই নহে। হে মানব! তুমি প্রথমতঃ রমণীর ত্বক্, মাংস, রক্ত ও বাষ্পজলাদি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পরে তোমার বিবেকনেত্র উন্মীলন

করিয়া দেখ, যদি ইহা তোমার নিকট প্রকৃত পক্ষে রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি ইহাতে আসক্ত হইও, আর যদি তাহা না হয়, তবে ইহাতে বৃথা বিমুগ্ধ হইতেছ কেন? ফলতঃ কোথাও কেশরাশি কোথাও রক্ত ইত্যাদি সমষ্টি যোগেই ত প্রমদাতনু গঠিত হইয়াছে; সুতরাং এই নিন্দিত নারী-দেহ দ্বারা বিবেকপূর্ণ-হৃদয় মানবগণের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? আরও দেখ, যে অঙ্গ সকল নানাবিধ বস্ত্র ও সুগন্ধি চন্দনাদি অনুলেপন দ্বারা পুনঃ পুনঃ লালিত হইয়া সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, কি নারী, কি পুরুষ, সকলেরই সেই অঙ্গসকল হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে। রমণীর যে স্তনে সুমেরুশিখরবাহিনী মন্দাকিনীর সলিলধারাসদৃশ মুক্তাহারের চমৎকারিণী শোভা দৃষ্টিগোচর হয়, কালক্রমে রমণীর সেই স্তন ক্ষুদ্রাকৃতি অন্নপিণ্ডের ন্যায় কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক শ্মশানে অথবা দিগন্ত প্রদেশে কবলিত হইয়া থাকে। বনচারী খরের অঙ্গ সকল যেমন রক্তমাংসাদি দ্বারা উপচিত; কামিনীর অঙ্গসমূহও তদ্রূপ রক্ত মাংসাদি দ্বারা গঠিত; সুতরাং এ হেন রমণীর প্রতি আবার আগ্রহাতিশয় কি?

হে মুনীন্দ্র! অঙ্গনার অঙ্গ সকল আপাততঃ রম্য বলিয়া ধারণা করা যায় বটে, কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাহাও মোহের কারণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমার বিবেচনায় মদিরা ও প্রমদা এই দুয়ের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ইতর বিশেষ নাই, কেন না, উভয়েই মদ ও মন্মথের উদ্ভাবন-পূর্ব্বক বিবিধ উল্লাস প্রদান করত চিত্তবিকারের কারণ হইয়া থাকে। হে মুনিবর! এই মানবরূপী মাতঙ্গসকল ললনারূপ বন্ধনস্তম্ভে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহারা শমরূপ সুদৃঢ় অঙ্কুশ দ্বারা আহত হইলেও কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইতেছে না। রমণীগণ দুষ্কৃতরূপ অনলের শিখারূপেই বিরাজমান রহিয়াছে, ইহারা কেশকলাপরূপ কজ্জলরাশি ধারণ করত নিতান্ত দুস্পর্শ ও নয়নপ্রিয় হইয়া তৃণের ন্যায় মানবদিগকে দগ্ধ করিতেছে। ভীষণ নরকানল অতি দূরে প্রজ্বলিত হইলেও এই রমণীগণই তাহার সুন্দর ইন্ধন হইয়াছে এবং ইহারা আপাতত সরস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে নীরস হইতেছে।

হে মহর্ষে কৌশিক! তরলতারকলোচনা কৃষ্ণকুন্তলধারিণী সুধাংশুমুখী প্রফুল্ল কুসুমহাসিনী কামিনীগণ দীর্ঘ যামিনীর ন্যায় শৃঙ্গারলীলায় পুরুষগণের চিত্তচঞ্চলতা সম্পাদন করিয়া যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মের ধ্বংস সাধন করত তাহাদিগের বুদ্ধি বিবেচনা একেবারেই বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। কুসুমান্তিরামমধুরা চঞ্চলভৃঙ্গনয়না করকিশলয়-শোভিনী কামিনীগণ বিষলতার ন্যায় পুরুষগণের বধ বিধানে তৎপরা হইয়া তাহাদিগের চেতনা বিলুপ্ত করিয়া থাকে। ভল্লুকী যেমন ভুজঙ্গ দলনে অভিলাষিণী হইয়া শ্বাস আকর্ষণ করত গর্ত্ত হইতে ভুজঙ্গকে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রমণীও লম্পট পুরুষের চিত্তবিত্ত অপহরণ করিতে উৎকণ্ঠিতা হইয়া অলীক যত্নসম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাকে আপন বশে আনয়ন করে।

হে ভগবন্! মুগ্ধহৃদয় মানবরূপ বিহঙ্গমদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্যই কামনামক কিরাত কর্ত্তৃক এই রমণীরূপিণী বাগুরা প্রসারিত হইয়াছে। চিত্তরূপী মত্ত মাতঙ্গ রতিরূপ শৃঙ্খল দ্বারা রমণীরূপ বন্ধনস্তম্ভে আবদ্ধ হইয়া নিয়ত মূকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মানবগণ যাহাকে রমণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, আমার বিবেচনায় উহারা কেবল জন্মপল্বলবিচরণকারী মীনরূপী মানবগণের দুর্ব্বাসনারূপ সূত্রস্থিত পিষ্টপিণ্ডকাবৃত বড়িশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও ভুজঙ্গ ইহাদিগের যেমন ক্রমান্বয়ে মন্দুরা, আলান ও মন্ত্র এই তিনটী বন্ধন সাধন হয়, তদ্রূপ পুরুষগণেরও একমাত্র বামনয়নাই বন্ধনের কারণ।

হে মুনিপ্রধান! এই যে নানারসশালিনী বিচিত্র ভোগভূমি রহিয়াছে, ইহা কেবল রমণীগণের আশ্রয় লাভ করিয়াই ইহসংসারে বদ্ধমূল হইয়াছে। সংসারে যাহা কিছু দোষ আছে, আমার বিশ্বাস, রমণীই তৎসমুদায়ের আধার; সুতরাং এই দুঃখশৃঙ্খলরূপিণী রমণী দ্বারা আমার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রয়োজন নাই। আমি দেখিতেছি, রমণীর স্তন, নয়ন, নিতম্ব কিংবা ভ্রু এ সকল কেবল মাংস ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং ঐ সকল নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ দ্বারা আমি কি করিব? হে ব্রহ্মন্! এই [illegible] কোথাও মাংস, কোথাও রক্ত এবং কোথাও বা অস্থিরাশি নিপতিত হওয়ায় কতিপয় দিবসের মধ্যেই বিশীর্ণ হইয়া যাইবে।

হে তাত! অপরিণামদর্শী মানবগণ অদ্য যে সকল কামিনীকে প্রণয়িনী জ্ঞানে লালন করিতেছে, কিছুদিন পরে তাহাদিগেরই করচরণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শ্মশানক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহারা মহা-নিদ্রায় অভিভূত হইবে। হে ব্রহ্মন! প্রণয়ী জন প্রগাঢ় প্রেমসহকারে প্রণয়িনীর যে মুখমণ্ডলে অদ্য কর্পূর গোরচনাদি দ্বারা তিলক রচনা করিতেছে, অবিলম্বে সেই মুখমণ্ডলই আবার অরণ্য ভূমিতে বিশুষ্ক হইবে। যে সকল কেশকলাপ গুল্ফ পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকিয়া কামিনীর কান্তি সম্পাদন করিতেছে, কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহারা আবার শ্মশানস্থ বৃক্ষ শাখায় সংলগ্ন হইয়া চামরের ন্যায় বিলোলিত হইবে। এইরূপে শ্মশাননীতা কোমলাকৃতি কামিনীর অস্থি সকল অবনিতলে ইতস্ততঃ নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় শোভিত হইবে, রক্তের কিয়দংশ ধূলি মধ্যে শোষিত হইবে ও কিয়দংশ ক্রব্যাদগণ পান করিবে, শিবাগণ চর্ম্মখণ্ড চর্ব্বণ করিবে এবং শরীরস্থ প্রাণ-বায়ু সকল আকাশপথে চলিয়া যাইবে।

হে মানবগণ! অচিরকালমধ্যেই অঙ্গনার অঙ্গসমূহের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, এই আমি তোমাদিগের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলাম; অতএব বল দেখি, তোমরা ভ্রান্তির অনুসরণ করিতেছ কেন? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূত দ্বারাই কামিনীমূর্ত্তি সংগঠিত হইয়াছে, কিন্তু এই ভূতপঞ্চকসৃষ্ট তুচ্ছ কামিনীর প্রতি অনুসরণ বশতঃ ধীমান্ ব্যক্তির আসক্ত হইবে কেন? মানবের কান্তানুগামিনী চিন্তা শাখাপ্রশাখায় জটিল ও ঐহিক পারলৌকিক সুখদুঃখরূপ কটু অম্লফলে সুশোভিত হইয়া সুতালানাম্নী বন্য লতার ন্যায় নিতান্ত বিস্তীর্ণ হইতেছে। যূথভ্রষ্ট মৃগ যেমন গন্তব্য পথ স্থির করিতে না পারিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেই-রূপ মানবগণের মনও কামিনীর কামনাপূরণচিন্তায় সমাকুল হইয়া প্রবল মনোভিলাষে কোন্ দিকে গমন করিবে, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে।

হে মুনে! বিন্ধ্যাখাতনিবদ্ধ করিণীলোলুপ করী যেমন কষ্ট অনুভব করে, যুবতীসমাসক্ত যুবক পুরুষও তদ্রূপ নিরতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার কামিনী আছে, তাহারই ভোগবাসনা হয়, আর

যাহার কামিনী নাই, তাহার আবার ভোগবাসনা কোথায়? সুতরাং ত্যাগ করিতে পারিলেই জগৎকে ত্যাগ করা হয় এবং জগত্ত্যাগেই যথার্থ সুখী হওয়া যায়।

হে ব্রহ্মন্! যাহা আপাততঃ রমণীয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, আমি জরা, রোগ ও মরণ প্রভৃতিতে ভীত হইয়া সেই অলিপক্ষের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল দুরতিক্রম্য বিষয়ভোগসমূহে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিলাষী হইতেছি না। পরন্তু কিরূপে আমি পরম শান্তি লাভ করিয়া পরমাত্মার পরম পদ লাভ করিব, নিয়ত যত্নসহকারে তাহাই আমার চিন্তনীয় হইয়াছে।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! বাল্যকালে ক্রীড়া কৌতুকাদি বিষয়ে যে অভিলাষ হয়, তাহা পরিপূর্ণ না হইতেই যৌবন উপস্থিত হইয়া, তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। এদিকে আবার যৌবন কালের রমণী-সম্ভোগাদির অভিলাষ পরিপূর্ণ হইতে না হইতেই জরা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে, সুতরাং আপনি ভাবিয়া দেখুন,—ইহারা পরস্পর কতদূর কর্কশস্বভাব! হে মুনে! হিমরূপ অশনি যেমন কমলের উচ্ছেদ বিধান করে, বেগবান্ সমীরণ যেমন শারদীয় শিশির বিন্দুর অপনয়ন করে এবং বেগবতী তটিনী যেমন তীরতরুর ধ্বংস সাধন করে, সেইরূপ জরাও এই দেহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! যদি কোনরূপে কালকূটের কণিকা মাত্রও উদর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে যেমন তৎক্ষণাৎ বিবর্ণতা করিয়া দেয়, অদ্রূপ এই জরঠাকৃতি জরাও অচিরাৎ দেহের যাবতীয় অবয়ব জর্জ্জরিত করিয়া, তাহাকে বিরূপ করিয়া ফেলিবে। এই জরাপ্রভাবে যে পুরুষের কলেবর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শিথিল ও কুব্জভাব ধারণ

করিয়াছে, কামিনাগণ সেই পুরুষকে গর্দ্দভ তুল্য জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা-সহকারে অবলোকন করিয়া থাকে। যদি কোন সীমন্তিনী সপত্নীকর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে সে যেমন অগত্যা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মানবও যখন সতত-দৈন্যদায়িনী জরা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন প্রজ্ঞা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ভৃত্য, পুত্র, পত্নী, বান্ধব ও সুহৃদ ইহারাও জরাবিকম্পিত পুরুষকে উন্মত্তজ্ঞানে উপহাস করিতে থাকে। গৃধ্র যেমন উন্নত পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ লোভ আসিয়া বিকৃতাকার গুণপরাক্রমহীন দীনতম বৃদ্ধ পুরুষকে অবলম্বন করে। এইরূপে লোভ আসিয়া আশ্রয় করিলে অনন্তর যাহা হৃদয়ে দাহ প্রদান করে এবং যাহা দৈন্য দোষের আকর, সেই সর্ব্ববিধ বিপদের অদ্বিতীয় সহচরী প্রবল স্পৃহা আসিয়া বৃদ্ধ সময়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে "হায়! এখন আমি কি করিব! জানি না, ইহার পরেই বা আমাকে কত কি দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তৎকালে বৃদ্ধ ব্যক্তির এমন একটি ভয় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যাহার প্রতীকার করা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না।

হে তপোনিধে! মানব যখন বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হয়, তখন "হায়! আমি কি করি! আমি ক্ষুদ্র! আমার ক্ষমতাই বা কি! আমি কিরূপে জীবন যাপন করি! আমার কথা কহিয়া ফল কি? আমার মৌনী হইয়া থাকাই সম্মত!" এইরূপ বহুবিধ দৈন্য আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে এবং "হায়! কে আমাকে কোন সময়ে কিরূপে উত্তম ভোজন আনিয়া দিবে" এইরূপ চিন্তা করত বৃদ্ধ ব্যক্তির মন সতত দগ্ধ হইতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধ সময়ে সর্ব্ববিষয়েই স্পৃহা হয় বটে; কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া কোন বিষয়ই উপভোগ করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং বৃদ্ধজীবনে ঐরূপ শক্তির অভাব নিবন্ধনই বৃদ্ধহৃদয় আরও দগ্ধ হইতে থাকে।

হে তপস্বিবর! এই দেহদুঃখদায়িনী জরারূপিনী জীর্ণ বকরমণী দেহ-পাদপের উপরিভাগে অবস্থান করত যে সময়ে ব্যাধিরূপ বিষধরগণে

বেষ্টিত হইয়া অতি কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, মহামূর্চ্ছান্ধকার-প্রয়াসী মরণরূপী পেচকও আবার ঠিক্ ঐ সময়ে আসিয়া নয়নগোচর হয়। যেমন সায়ং সময় সমাগত দেখিয়া অন্ধকারবিহারী পেচকগণ অন্ধকারের অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই মানবশরীরে জরার আধিপত্য দেখিয়া মৃত্যুও তাহার অনুগামী হইয়া থাকে। হে মুনে! এই দেহপাদপে জরারূপী কুসুমসমূহ বিকশিত হইবামাত্র দূর হইতে দর্শন করত মৃত্যুরূপী মর্কট আসিয়া সবেগে তাহাতে অধিরোহণ করে। আমার বিবেচনায় জন-শূন্য নগর, ব্রততিবিহীন পাদপ, কিংবা অনাবৃষ্টিনষ্ট দেশ, ইহারাও বরং শোভিত হইয়া থাকে, পরন্তু জরাজর্জ্জরিত দেশ কখন শোভিত হয় না। গৃধ্র যেমন আমিষখণ্ড গলাধঃকরণ করিবার নিমিত্ত অতি কঠোরস্বরে সবেগে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই জরাও অচিরাৎ গ্রাস করিবার আশয়ে কাসধ্বনি করত নরকলেবর গ্রহণ করে।

হে মুনীন্দ্র! বালিকা যেমন বিকশিত কুমুদকুসুম দর্শন করিবামাত্র সমুৎসুকমনে কিঞ্চিৎকাল তাহার শিরোদেশ গ্রহণ করিয়া পরিশেষে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ এই জরাও প্রথমতঃ যেন উৎসুকসহকারেই কিয়ৎকাল মানবের মস্তক অবলম্বন করিয়া শেষে তাহার সর্ব্বশরীর জীর্ণশীর্ণ করে। যেমন ধূলিপটল-মলিনীকৃত প্রবল শিশির পবন প্রবাহিত হইলে শরীরে সীৎকার উপস্থিত হয় ও তরুশাখা হইতে জীর্ণ কিসলয় বিচ্যুত হইতে থাকে, সেইরূপ এই জরার উদয়েও শরীর সীৎকারযুক্ত হয় ও শেষে বিদীর্ণ হইয়া যায়। তুষারনিকরে সমাকীর্ণ হইয়া পঙ্কজ যেমন পরিম্লান হইয়া পড়ে, তদ্রূপ জরাগ্রস্ত মানবদেহও জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায়। এই জরা-রূপিনী কৌমুদী শিরোরূপ শিখরীর পৃষ্ঠদেশে সমুদিত হইয়া বাতরোগ ও কাস-রোগরূপিণী কুমুদ্বতীকে উদ্যমসহকারে বিকসিত করিয়া দেয়। মানবগণের মস্তকরূপ কুষ্মাণ্ড জরারূপ ক্ষারসংযোগে ধূসরিত হওয়ায় পরিপক্ক হইয়া থাকে এবং একমাত্র অধীশ্বর কালই ইহাকে দর্শন মাত্র ভোজন করে।

হে মুনিবর! এই জরারূপিণী জহ্নুকন্যা দ্রুতগতি আয়ুঃপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে উদ্যমসহকারে শরীররূপ তীরতরুকে উন্মূলিত করিয়া

দেয়। জরারূপিণী মার্জ্জারিকা অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া যৌবনরূপী মূষিককে ভক্ষণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করে। এই জরারূপিণী জম্বুকী দেহ জঙ্গলে বসতি করত যেরূপ কর্কশধ্বনি করে, ইহ জগতে সেরূপ অমঙ্গলাবহ আর কিছুই বিদ্যমান নাই। কাস ও শ্বাসাদি যাহার সীৎকার এবং দুঃখরূপ ধূমান্ধকারে যাহা আবৃত, সেই জরারূপিণী বহ্নিজ্বালা সতত যাহাতে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে, তাহার আর রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না; সে ব্যক্তি দগ্ধ হইয়াই যায়।

হে তাত! এই জরাপ্রভাবে মানবগণের ক্ষীণ কলেবর কুসুমভারনতা লতিকার ন্যায় বক্র হইয়া শুক্লবর্ণ শোভা ধারণ করিয়া থাকে। এই কলেবররূপ কদলীতরু যখন জরারূপ কর্পূর দ্বারা ধবলবর্ণ হইয়া যায়, মরণরূপ মাতঙ্গ আসিয়া তৎকালেই তাহা উন্মূলিত করিয়া থাকে। হে মুনে! মৃত্যুনরপতির আগমনকালীন আধিব্যাধিরূপ তদীয় প্রবল বাহিনী-দল জরারূপ শুক্ল চামর গ্রহণ করত অগ্রে অগ্রে নির্গত হইয়া থাকে। হে মুনীন্দ্র! আপনি ভাবিয়া দেখুন, যাহারা অতি দুর্গম গিরিকন্দরে প্রবেশ করত অবস্থান করিতেছে, অবশ্য শত্রুগণ তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু জরারূপিণী জীর্ণ নিশাচরীর হাত হইতে তাহারাও অব্যাহতি পায় না। যেমন শিশুগণ তুষারময় গৃহমধ্যে অবস্থানকালীন শারীরিক অবশতা হেতু গমনাগমনাদি কোন কর্ম্মই করিতে পারে না, তদ্রূপ এই জরা দ্বারা অভিভূত হইয়া অবশ ইন্দ্রিয়গণও আপন আপন কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সমর্থ হয় না।

হে মহর্ষে! বর্ষীয়সী নর্ত্তকী যেমন যষ্টি অবলম্বন করিয়া স্খলিতপদে মুরজবাদ্যের তালানুসারে মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে থাকে; সেইরূপ এই জরাও দেহযষ্টি ধারণ করত কাস ও অধোবায়ুরূপ মুরজতালে সতত নৃত্য করিয়া থাকে। সংসারনামক নরপতির ব্যবহারোচিত গন্ধাধার দেহযষ্টির উপরিভাগে জরানাম্নী চামরশোভা বিরাজিত হইতে থাকে। হে মুনে! জরারূপ নিশাকরোদয়ে শরীররূপ নগর যখন শুভ্রকান্তি ধারণ করে, মরণরূপ কুমুদকুসুমও তৎক্ষণাৎ জীবনাশারূপ সরসীমধ্যে বিকশিত হইয়া থাকে। এই জরারূপ সুধাবিলেপনে দেহরূপ অন্তঃপুর যখন ধবলিত হইয়া যায়,

অশক্তি, আর্ত্তি ও আপৎ এই তিনটী অঙ্গনা তখন তন্মধ্যে মহাসুখে বাস করিতে থাকে।

হে মুনিবর! জরা যাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং মৃত্যু যাহাদিগের অবশ্যম্ভাবী, সেই চতুর্ব্বিধ শরীরের অন্তর্গত এই শরীরে, আমি মন্দমতি—আমারও কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস হইতেছে না। হে তাত! জরাক্রান্ত হইয়াও জীবন ধারণ করিতে হইবে, দুঃখময় জীবনে এরূপ দুরাগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি? অপনি দেখুন, ইহ জগতে কোন ব্যক্তিই জরাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না, অধিকন্তু এই সর্ব্ববিজয়িনী জরাই সকলের যাবতীয় মনোরথ নষ্ট করিয়া দেয়।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে তপোনিধে! এই সংসারকুহরে বিমূঢ়চেতা জনগণই বিবিধ অসৎ কল্পনাসমূহে সমাকুল হইয়া রাগদ্বেষাদি ভেদবশতঃ অনবরত মহাভ্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। পরন্তু যাঁহারা বিবেক অবলম্বন করিয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষগণ কখন এই অলীক সংসারে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। আপনি দেখুন, যাহারা জ্ঞানহীন বালক, তাহারাই দর্পণ-বিম্বিত ফলভোজনে অভিলাষী হইয়া থাকে। এই সংসারে যাহাদিগের অসার সুখবাসনার উদয় হয়, মূষিক যেমন তন্তুচ্ছেদন করে, তদ্রূপ কাল তাহাদিগের সেই সেই বাসনার উচ্ছেদ করিয়া দেয়।

হে মুনে! বাড়বানল যেমন চন্দ্রোদয়োদ্বেলিত জলধির জলরাশি গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ কালও সকলকে গ্রাস করে; ইহ জগতে এমন কোন উৎপন্ন বস্তু নাই, যাহা সর্ব্বগ্রাসী কালের করালকবলে নিপতিত হয় না। কালই সর্ব্বসংহারক ভীষণ রুদ্র। যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, কালই তৎসমস্ত গ্রাস করিতে উদ্যত রহিয়াছেন। এই

জগতে বিদ্যা, বুদ্ধি, বল কিংবা ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে যিনি যতই উন্নত পুরুষ হউন্ না কেন, এই অনন্ত বিশ্বগ্রাসী বিশ্বাত্মা কালের কবলে সকলকেই পতিত হইতে হয়, কাল ক্ষণকালও কাহার প্রতীক্ষা করেন না। কালের রূপ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, ইনি কেবল যুগ, বৎসর ও কল্পাদি ঔপাধিক-রূপভেদে কিঞ্চিন্মাত্র প্রকটিত হইয়া জগতের যাবতীয় বস্তু আক্রমন করত অবস্থান করিতেছেন।

হে তত্ত্বজ্ঞ! গরুড় যেমন পন্নগগণকে ভোজন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই কালও যাহারা রূপবান্, যাহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ কিংবা যাহারা সুমেরুর ন্যায়ও গৌরবশালী, তাদৃশ জনগণকেও নিগীরণ করেন। কালের হাত হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না। নির্দ্দয়, কঠিন, ক্রূর, কর্কশ, কৃপণ, কিংবা অধম সকলকেই কালের উদরে প্রবেশ করিতে হইবে। সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা কালগ্রাসে পতিত হয় না। কাল সর্ব্বদাই গ্রাস করিবার নিমিত্ত অভিলাষী রহিয়াছেন। ইনি একবস্তু গ্রাস করিতে থাকিলেও অপর বস্তু ভোজন করিয়া থাকেন, ইহার বিকট বদনবিবরে প্রতিনিয়ত বহু সহস্র লোক প্রবিষ্ট হইতেছে; কিন্তু এই বহুভোজী কালের কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। রঙ্গালয়গত নট যেমন বিবিধ-রূপ ধারণ করত নৃত্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই কালও হরণ, নাশন, বিধান, ভোজন ও হনন প্রভৃতি বিবিধরূপে সংসারনৃত্য সম্পাদন করিতে-ছেন। শুক যেমন দাড়িম্বফল বিদারণপূর্ব্বক তদন্তর্গত বীজগুলি এক একটী করিয়া ভোজন করিতে থাকে, তদ্রূপ কালও এই বিনশ্বর জগৎ ভেদ করত সতত তন্মধ্যস্থ যাবতীয় জীব ভোজন করিতেছেন।

হে সাধো! এই কাল অভিমানপ্রগল্ভ জনমণ্ডলীর জন্মরূপ মহাবন-বিহারী গজরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। এই কালরূপী গজ শুভাশুভ কর্ম্ম-ফলরূপ দুইটী দন্ত দ্বারা নিরন্তর জনরূপ পল্লবদলের বিদলন করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে এক মহান্ মহীরুহ আছে, অপঞ্চীকৃত ভূতাত্মা তাহার মূল, দেবগণ ফল ও ব্রহ্মা তাহার বিশাল অরণ্য, সর্ব্বব্যাপী কাল পুরুষ ঐ অরণ্যে আধিপত্য করিতেছেন। এই কাল নিরন্তর যামিনীরূপ মধুকর ও দিবসরূপ মঞ্জরীসমন্বিত বর্ষ, কল্প ও কলা-

প্রভৃতি ব্রততী-রাজি বিরচন করিয়াও কদাপি কিঞ্চিন্মাত্র শ্রান্তি ভোগ করিতেছেন না।

হে মুনিবর! এই ধূর্ত্তচূড়ামণি কাল ভগ্ন হইয়াও ভগ্ন হয় না, দগ্ধ হইয়াও দগ্ধ হয় না এবং দৃশ্য হইয়াও দৃষ্টিগোচর হয় না। কাল মনঃ-কল্পিত রাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া নিমেষকাল মধ্যে কোন বস্তু উৎপাদন করিতেছে আবার কোন বস্তু একবারেই ধ্বংস করিতেছে। কাল যুগানুরূপ তুর্বিলাসশালিনী কষ্টসম্পুষ্ট চেষ্টা দ্বারা ভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত জীবকে অনবরত স্বর্গনরকাদি মধ্যে নিপতিত করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং স্বীয় আত্মম্ভরিতাগুণে তৃণ,পর্ণ ও পাংশু হইতে মহেন্দ্র, সুমেরু ও সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত উদ্যত রহিয়াছে।

হে মহর্ষে! ক্রূরতা, লুব্ধতা ও চঞ্চলতা প্রভৃতি যে সকল নিকৃষ্ট গুণ আছে, এই কালেই তৎসমস্ত অবস্থিতি করিতেছে এবং বালক যেমন কন্দুক নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে; তদ্রূপ এই কালও প্রতিনিয়ত গগনাঙ্গনে চন্দ্র সূর্য্যরূপ তুইটী কন্দুক নিক্ষেপ করত ক্রীড়া করিতেছে। কাল কল্পান্তসময়ে যাবতীয় প্রাণিবিভাগের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তাহাদিগের ভূতপঞ্চকময় অস্থিমালা দ্বারা আপনার আপদ মস্তক সমস্ত অঙ্গই শোভিত করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। কালের কার্য্য একেবারেই অনিবার্য্য। তাহা কেহ কখন নিবারণ করিতে পারে না। যখন কল্পান্ত কাল উপস্থিত হয়, তখন এই কালেরই অঙ্গ হইতে বিনির্গত প্রবল সমীরণ সুমেরু গিরিকেও ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় অম্বরতলে শীর্ণবিশীর্ণ করিয়া উড়াইয়া থাকে।

হে মুনীন্দ্র! এই কাল কোন সময়ে রুদ্র, কখন ইন্দ্র, কখন মহেন্দ্র, কখন ব্রহ্মা ও কখন বা কুবের হয়, আবার কখন কিছুই হয় না। অর্থাৎ কালের কোন রূপই নাই। জলধি যেমন আপন অঙ্গে অজস্র তরঙ্গমালা উদ্ভাবন করিয়া পরে তাহাকে ধারণ ও সংহার করে, সেইরূপ কালও নিরন্তর আপনাতে এক সৃষ্টি-প্রবাহ ধারণপূর্ব্বক অপর সৃষ্টি-প্রবাহের ধারণ ও সংহার করিতেছে। কাল মহাকল্প-নামধেয় তরুরাজি হইতে সতত দেব ও অসুর নামক পক্কফল সকল পাতিত করত অবস্থান করিতেছে।

হে মহাত্মন্! এই কাল একটী প্রকাণ্ড উডুম্বর তরুরূপে বিরাজমান। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ইহার ফল, প্রাণিগণ তদন্তর্গত মশক, ইহারা কিঞ্চিৎকাল বৃথা ঘুং ঘুং ধ্বনি করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। হে ব্রহ্মন্! কাল সর্ব্বাধিষ্ঠান চৈতন্যরূপ চন্দ্রিকার সান্নিধ্যবশতঃ বিকশিতা জগৎসত্তা-মাত্র-রূপিনী প্রণয়য়িনী ক্রিয়াকুমুদিনীর সহিত সঙ্গত হইয়া আপনি আপনার অদ্বিতীয় শরীরে আনন্দ অনুভব করিতেছে। ফলতঃ এই যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রাণিগণের শুভাশুভ কর্ম্ম ও তদনুসারে স্বর্গনরকাদিভোগ, এ সমস্ত এই কালেরই মহিমা বা প্রভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাল অনন্ত ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠিত স্বীয় বপু অবলম্বনপূর্ব্বক উত্তুঙ্গ মহাশৈলের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। এই কাল কোথাও বা প্রগাঢ় শ্যামবর্ণ, কোথাও বা কমনীয় বর্ণ এবং কোথাও বা উক্ত দ্বিবিধ বর্ণবিহীন স্বীয় কার্য্য উদ্ভাবন করত অবস্থান করিতেছে।

হে ভগবন্! কাল অসংখ্য জীবসংসারের বিলয় করিয়া তাহার সারাংশের ন্যায় পরিশিষ্ট ও পৃথিবীর ন্যায় ভারসহ স্বীয় সত্তায় বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই কাল শত শত মহাকল্প অতীত হইয়া গেলেও কখন ছিন্ন বা আদৃত হয় না এবং ইহার গতি, স্থিতি, উদয় বা অস্ত কিছুই নাই। কাল কেবল জগৎসৃষ্টিরূপ লীলাবিষয়ে আস্থা ও অহঙ্কারপরিহীন হইয়া আপনিই আপনাকে বিস্তীর্ণ ও পরিপালন করিতেছে। কাল যামিনীরূপ পঙ্ক হইতে উৎপন্ন মেঘরূপ ভ্রমরশালিনী দিনরূপ কোকনদাবলীকে স্বীয় আত্মরূপ সরোবর মধ্যে আরোপণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। লুব্ধ কৃপণ পুরুষ যেমন জীর্ণ মার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া তৎসাহায্যে কনকশিখরীর চতুর্দ্দিক্ হইতে সুবর্ণরাশি সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে, কালও তদ্রূপ কৃষ্ণবর্ণ রজনীরূপ মার্জ্জনী গ্রহণ করত তাহা দ্বারা জগতের আলোকরাশি আহরণ করিতেছে।

হে মনস্বিন্! কৃপণ ব্যক্তি যেমন অঙ্গুলি সাহায্যে প্রদীপবর্ত্তিকা সঞ্চালিত করত গৃহকোণের কোথায় কি আছে, তাহা দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কালও ক্রিয়ারূপ অঙ্গুলি দ্বারা দিনকররূপ দীপিকা সঞ্চালন করিয়া জগদ্গৃহের দিঙ্মণ্ডলরূপ কোণদেশের কোথায় কি আছে, তাহা

নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছে। কাল নিরন্তর দিবাকররূপ নিমেষহীন নয়ন উন্মীলন করিয়া জগৎরূপ জীর্ণ বন হইতে লোকপালরূপ পক্ক ফলরাশি সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিতেছে। কাল ক্রমান্বয়ে জগৎরূপ জীর্ণ কুটীর-মধ্যবর্ত্তী মণির ন্যায় গুণী পুরুষগণকে যত্নের সহিত মৃত্যুরূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করিতেছে এবং গুণগুম্ফিত রত্নাবলীর ন্যায় লোকসকলকে ভূষণের নিমিত্ত কণ্ঠদেশে ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এই নিতান্তচপল কাল দিবসরূপ হংসানুস্থত তারারূপ কেশরসনাথ নিশারূপিণী ইন্দীবরমালা বলয়িত করত ধারণ করিতেছে এবং শৈল, সাগর, সুরলোক ও ধরিত্রী এই শৃঙ্গচতুষ্টয়সনাথ জগদ্রূপী মেষের তারারূপ রুধিরকণা সকল প্রত্যহ পান করিতেছে।

হে ব্রহ্মন্! এই কাল যৌবনরূপ নলিনীর নিশাকর ও আয়ুরূপ মাতঙ্গের মৃগেন্দ্র। জগতে কি তুচ্ছ, কি অতুচ্ছ, এমন কোন বস্তুই নাই, কাল যাহা অপহরণ করে না। সুষুপ্তি কালে জীবগণ যেমন সমুদায় দুঃখ পরিহার করিয়া কেবল অজ্ঞানাবলম্বনে অবস্থান করিয়া থাকে, কালও তদ্রূপ কল্পান্তকেলিবিলাসচ্ছলে সর্ব্বপ্রাণী সংহার করিয়া অজ্ঞানাবভাসক স্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে।

হে মনীষিন্! কাল এইরূপে প্রলয় সময়ে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া পুনরায় সৃষ্টিকালে স্বয়ংই বিশ্বের কর্ত্তা হইয়া পরে ভোক্তা, সংহর্ত্তা ও স্মর্ত্তাদিরূপে সর্ব্ববস্তুভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কালই সুভগদুর্ভগরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। বুদ্ধিকৌশলে কোন ব্যক্তিই কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এবং সর্ব্বপ্রাণির মধ্যে একমাত্র কালই অত্যন্ত বলবান্।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে তপস্বিবর! ইহ সংসারে কালের লীলা অত্যন্ত উদ্ভট ও পরাক্রম অচিন্তনীয়। আমি রাজপুত্র কালের চরিত্র বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। এই জগৎরূপ জীর্ণ জঙ্গলে রাজপুত্ররূপ কাল নিয়ত মুগ্ধজীবগণরূপ মৃগ-সমূহের মৃগয়া অর্থাৎ বিনাশ করিতেছে। তথাপি ইহার পরিতৃপ্তি হইতেছে না। হে মুনীন্দ্র! ঐ জগৎজঙ্গলের প্রান্তভাগে কল্পান্তকালের যে মহোদধি অবস্থিত আছে, তাহা কালনামক মৃগয়াবিহারী রাজকুমারের রমণীয় ক্রীড়া পুষ্করিণী এবং উহার বাড়বানল সেই পুষ্করিণীর পঙ্কজ। এই প্রাণিগণ কটু, তিক্ত ও অম্লাদি সদৃশ। ইহারা এবং দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্রাদিসহ মিশ্রিত জগৎরূপ পর্য্যুষিত অন্ন-দ্বারা যুবরাজ কালের প্রত্যহ প্রাতর্ভোজন সম্পাদিত হইতেছে। কালের অনুরূপা প্রণয়িনী কালরাত্রি। এই কাল-প্রণয়িনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় সর্ব্ব-প্রাণীর বিনাশ সাধন করত সমুদায় মাতৃগণে বেষ্টিত হইয়া সতত সংসারবনে বিচরণ করিতেছে।

হে মহর্ষে! এই সর্ব্বরসশালিনী কমলকুমুদকহ্লরাদি কুসুমসমাবৃতা পৃথিবী কালের করতলগত বিশাল পানপাত্ররূপে বর্ত্তমান। যাঁহার ভুজা-স্ফালন দুঃসহ, কেশররাজি দুর্দ্দর্শ এবং স্কন্ধদেশ উন্নত, সেই নৃসিংহমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু কালের ভুজপিঞ্জরস্থ দানবরূপ পক্ষিবধের ক্রীড়াশকুন্ত।* যাঁহার গম্ভীরধ্বনি বহু অলাবুবটিত বীণার ন্যায় মধুর এবং যাঁহার দেহকান্তি শারদীয় বিমল নভোমণ্ডল সদৃশ, সেই সংহার ভৈরবনামক মহাকালও এই কালনামধেয় যুবরাজের ক্রীড়াকোকিলরূপে বিরাজমান। কালনামক রাজ-তনয়ের অভাব নামে যে কোদণ্ড আছে, তাহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কোদণ্ডের টঙ্কারধ্বনি অজস্র শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং উহা হইতে নিরন্তর দুঃখরূপ বাণাবলী নির্গত হইতেছে।

---

* ক্রীড়াশকুন্ত অর্থাৎ পোষা পাখী. ব্যাধেরা পাখী মারিবার নিমিত্ত বাজ পুষিয়া রাখে। যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে তৎক্ষণাৎ প্রদর্শিত পাখী মারিয়া ফেলে।

হে মহাত্মন্! সমধিক বিলাসচতুর রাজতনয় কাল স্বয়ংও ধাবিত হইতেছে এবং তাহার লক্ষ্যও নিরন্তর ধাবমান রহিয়াছে। কিন্তু রাজপুত্র কাল কখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে না। তাহার দুঃখরূপ বাণ সকলকেই বিদীর্ণ করিতেছে; সুতরাং এই অমোঘবাণ যুবরাজ কালই যাবতীয় লক্ষ্যবেধীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজকুমার কাল এই জীর্ণজগতে বিষয়লম্পট জনগণকে মর্কটের ন্যায় চঞ্চলস্বভাব সম্পাদন করত স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপূর্ণহৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া ইহ জগতে উক্তরূপে মৃগয়াবিহার করিতেছে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে তপোনিধে! কাল দুর্ব্বিলাসিগণের অগ্রগণ্য। এই কাল পূর্ব্বোক্ত মহাকাল নহে। ইহা অন্য কাল। এই কালই ইহলোকে পদার্থসমূহের সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। ইহা অবস্থাভেদে কাল ও দৈব এই দুই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। একমাত্র ক্রিয়াই ইহার স্বরূপ। তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপ লক্ষিত হয় না এবং কর্ম্মফল সম্পাদন করা ব্যতীত অপর কোন ক্রিয়া বা চেষ্টাও ইহার নাই। নীহার-জাল যেমন প্রচণ্ড তাপে বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ এই প্রাণিবৃন্দও কর্ম্ম বা কাল দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে।

এই যে বিস্তীর্ণ জগন্মণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ঐ কালের নর্ত্তনাগার। কাল ইহাতে সতত নৃত্য করিতেছে। এই দৈবনামধেয় কাল পূর্ব্বোল্লিখিত মহাকাল অপেক্ষা তৃতীয়। ইহা আবার কৃতান্ত নাম ধারণ করিয়া ভীষণ কাপালিকবেশে নৃত্য করিয়া থাকে।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ নৃত্যপরায়ণ কৃতান্ত নিয়ত স্বীয় কান্তা নিয়তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত রহিয়াছে। ইহার সংসাররূপ বক্ষঃস্থলে শশিকলা-শুভ্র অনন্ত এবং ত্রিধাবিভক্ত গঙ্গাপ্রবাহ উপবীত ও অবীত যুগলরূপে

বিরাজমান আছে। কালের করমূলে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলরূপে দুইটী হেমকটক শোভা পাইতেছে. এবং সুমেরু তাহার হস্তস্থিত ক্রীড়াকমল হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এই যে অসীম অনন্ত আকাশমণ্ডল রহিয়াছে, ইহাই কালের বস্ত্র। উহা নক্ষত্ররূপ বিন্দুসমূহে এবং পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক দুইটী প্রলয় মেঘপল্লবে* সুশোভিত হইয়া একার্ণব জলে বিধৌত হইয়া থাকে।

হে ভগবন্! ঐরূপ রূপশালী কালের অগ্রভাগে নিয়তিনাম্নী তদীয় নিয়তকামিনী দয়িতা প্রাণিগণের ভোগানুকুল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অনবরত অতন্দ্রিতভাবে নৃত্য করিতেছে। প্রাণিগণ নিরন্তর সেই অপ্রতিহত-ক্রিয়াশক্তিশালিনী নৃত্যপরায়ণা কৃতান্তকান্তার নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত জগৎরূপ মণ্ডপমধ্যে গমনাগমন করিতেছে। দেবলোকাদি যাবতীয় লোক ঐ কালদয়িতা নিয়তির সুন্দর অঙ্গভূষণ ও পাতালপর্য্যন্ত নভস্তল তাহার লম্বমান কেশরাশি। নিয়তির পাতালরূপ চরণে নরকাবলী নূপুরের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। উহা রোদন-কোলাহলে পূর্ণ, নরকাগ্নি দ্বারা সমুজ্জ্বল ও দুষ্কৃতসূত্রে গ্রথিত। চিত্রগুপ্ত ঐ নিয়তির যমরূপ মুখমণ্ডলে ক্রিয়ারূপিণী তদীয় সহচরী কর্ত্তৃক উপকল্পিত কস্তুরীতিলক চিত্রিত করিয়া থাকে। কল্পান্তকালে এই চঞ্চলপ্রকৃতি নিয়তি স্বীয় পতি কালের মুখভঙ্গীসূচক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া চঞ্চল-চরণে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, স্ফুটিত শৈলসমূহের ভীষণধ্বনি সেই চরণের শব্দরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তৎকালে নিয়তির পশ্চাদ্ভাগে তদীয় কেশরাজি কুমারের মৃত ময়ূরগণের ন্যায় লম্বিত থাকে এবং সংহাররূপী মহাদেবের নেত্রত্রয়ের সুবিশাল রন্ধ্র হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনিঃসৃত হয়। মহাদেবের সুদীর্ঘ জটাজূট-বিমণ্ডিত চন্দ্রযুক্ত মুখপরম্পরাই নিয়তির মুখ এবং মহাদেবীর প্রফুল্ল মন্দারকুসুম-মণ্ডিত কেশকলাপই ইহার চামর। অত্যুন্তট তাণ্ডবকালীন সংহারভৈরবের পর্ব্বতাকৃতি উদররূপ অলাবুপাত্রই নিয়তির হস্তে শব্দায়মান বহুশতরন্ধ্র-সমন্বিত ইন্দ্রদেহভিক্ষার ভিক্ষাপাত্ররূপে বিরাজমান হয়। এই সময়ে সর্ব্বসংহারিণী নিয়তি কঙ্কালসমূহে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া যেন আপনা দ্বারা আপনাকে ভীত করিতে থাকে এবং জীবগণের বিবিধাকার মস্তকসমূহ পুষ্কর-

* পল্লব অর্থে বস্ত্রের দশা, ছিলা বা পাড়।

মালার ন্যায় কণ্ঠদেশে ধারণ করে। মহাপ্রলয়কালীন তাণ্ডবসময়ে ঐ সকল বারম্বার আন্দোলিত হওয়ায় নিয়তি অতিশয় শোভিত হইয়া থাকে। প্রলয়কালে প্রমত্ত পুষ্কর ও আবর্ত্তনামক মেঘদ্বয়ের গর্জ্জনই এই নৃত্যপরায়ণা কালকামিনী নিয়তির নৃত্যকালীন ডমরুবাদ্যের ধ্বনিস্বরূপ হয় এবং তুম্বুরু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তৎপ্রভাবে পলায়ন করিয়া থাকে।

হে ভগবন্! নিয়তি এইরূপে নৃত্য করিতে থাকিলে তদীয় পতি কালও তৎকালে সেই নাট্যশালায় নৃত্য করিতে থাকে। এই নৃত্যপরায়ণ কাল চন্দ্রমণ্ডলরূপ কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং তারকা ও চন্দ্রিকাযুক্ত নভোমণ্ডল ইহার কেশভূষণ। কালের এক কর্ণে হিমালয় ও অপর কর্ণে সুমেরুগিরি অস্থি ও কাঞ্চনময় কমনীয় কর্ণভূষণরূপে বিরাজমান হইয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার গণ্ডমণ্ডলে বিলম্বিত কুণ্ডলরূপে শোভমান হয় এবং লোকালোক পর্ব্বত ইহার কটীতটে মেখলার ন্যায় লম্বিত হইয়া থাকে।

হে মহর্ষে! ইতস্ততঃ গমনশীল সৌদামিনী এই কালের বলয়াকৃতি কঙ্কণ এবং নানাবর্ণ নীরদাবলী ইহার পবনান্দোলিত অংশুপট্টিকা। ক্ষয়প্রাপ্ত জগৎ হইতে অথবা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বিনষ্ট সৃষ্টি হইতে নির্গত মৃত্যুগণই যেন মিলিত হইয়া যে সকল অস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে; সেই শূল, পট্টিশ ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিরচিত একটী সুন্দরমালা কালের গলে লম্বিত হইয়া থাকে। ঐ মালা সংসরণশীল জীবরূপ মৃগগণের বন্ধনের নিমিত্ত দীর্ঘীকৃত, অনন্তের শরীররূপ মহাসূত্রে গ্রথিত এবং মহাকালের করচ্যুত হইয়া কৃতান্ত নামক কালের কণ্ঠে বিরাজিত। যাহা জীবরূপ মকরিকায় লাঞ্ছিত হইয়া রত্নতেজে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাদৃশ সপ্তসাগররূপ কঙ্কণ কালের করভূষণ। বিবিধ সুখদুঃখময় রজ ও তমোগুণ কালের শ্যামবর্ণ রোমাবলী এবং স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার-পরম্পরা ঐ রোমাবলীর আবর্ত্ত।

এইরূপে কৃতান্তরূপী কাল কল্পান্তকালীন তাণ্ডবসম্ভূত নৃত্যচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করত পুনরায় ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিয়া জরা, মরণ, শোক ও দুঃখাদিশালিনী সৃষ্টিরূপিণী স্বীয় লাস্যময় নৃত্যলীলার বিস্তার করিয়া থাকে। হে মুনিবর! বালক যেমন কর্দ্দম লইয়া বিবিধ পুত্তলিকাদি প্রস্তুত করত আবার পরক্ষণেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ

কালও অনায়াসে চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ বনরাজি, অসংখ্য জনপদ, নানা জাতীয় জনতা এবং তাহাদের আচারপরম্পরা রচনা করিয়া পুনরায় ঐ সকল সংহার করিয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিনায়ক! এই সংসার কালপ্রভৃতির পূর্ব্বোক্তরূপে লীলাভূমি হইয়াছে, আপনি বলুন্ দেখি, মাদৃশ ব্যক্তি ইহাতে কিরূপে আস্থাবান্ হইতে পারে? হায় কি দুঃখের বিষয়! আমরা এই দৈবপ্রভৃতির প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া বিক্রীত এবং আরণ্য মৃগের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। এই অনার্য্যস্বভাব কাল সংহার বিষয়ে সমুদ্যত হইয়া নিরন্তর লোকসকলকে আপৎরূপ অতল জলধিগর্ভে নিপাতিত করিতেছে। দহন যেমন তীব্রতাপ শিখাসমূহ দ্বারা দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই কালও বিবিধ দুরাশা ও দুশ্চেষ্টা দ্বারা মানবদিগের অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছে। নিয়তি এই কাল-মর্য্যাদারূপ কৃতান্তের প্রিয়পত্নীরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। সে স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতায় সমাধিপর যোগীদিগকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া দেয়।

হে মুনীন্দ্র! ভুজঙ্গ যেমন অনিল ভক্ষণ করে, সেইরূপ এই ক্রূর-হৃদয় কৃতান্তও নিরন্তর তরুণদেহেও জরার আবির্ভাব করিয়া প্রাণিবৃন্দকে গ্রাস করিতেছে। আর্ত্ত ব্যক্তিও এই অতি নির্দ্দয় কৃতান্তের করুণা লাভে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ আপনি ভাবিয়া দেখুন, সর্ব্বভূতে সমানভাবে দয়া প্রকাশ করে, ঈদৃশ উদারপ্রকৃতির লোক জগতে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। হে মুনে! অজ্ঞান ব্যক্তি যাহাকে ভোগভূমি বলিয়া ধারণা করে, ফলতঃ তাহা কেবল দারুণ দুঃখের আকর এবং আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত লোক সকলও দুঃখের আবাসস্থল।

হে মহর্ষে! বলিব কি, এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে জীবন ও যৌবন উভয়ই নিতান্ত অস্থিরভাবাপন্ন। মৃত্যু একেবারেই কারণ্যশূন্য। বাল্যকাল নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানাচ্ছন্ন। লোকসকল বিষয়ানুসন্ধানে মনোমালিন্যসম্পন্ন। বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ দুর্ভেদ্য ভববন্ধনস্বরূপ। ভোগ সকল সংসারের মহারোগ। তৃষ্ণা মৃগতৃষ্ণার সমান। ইন্দ্রিয়গণ প্রবল শত্রু। সত্য অসত্যরূপে পরিণত। মন আত্মার পরম রিপু, আত্মা তাহার সহিত বাস করিয়া আপনিই আপনাকে ক্লেশ দিতেছেন। অভিমানপ্রধান অন্তঃকরণ আত্মকলঙ্কের কারণ। বুদ্ধি একেবারেই শিথিলভাবাপন্ন। ক্রিয়া সকল ক্লেশপ্রদায়িনী। মানসিক গতি রমণীর প্রতিই ধাবমান। বাসনা বিষয়েই আসক্ত। আত্মা স্ফূর্তিহীন, রমণীগণ দোষের পতাকিনী-রূপে বিরাজমান এবং অনুরাগ একান্ত নীরস হইয়াছে।

হে ভগবন্! অধিক আর কি বলিব, বস্তুমাত্রেই অবস্তুর ন্যায় প্রতীত হইতেছে। অহঙ্কারশালী জীব তাহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে। ভাব-মাত্রই অভাবে পূর্ণ হইয়াছে এবং ভাবের অবসান ভূমিও অপ্রাপ্য হইয়াছে। হে সাধো! সংসারে সকলেরই অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়া নিরন্তর দহ্যমান হইতেছে এবং সকলেরই রাগরূপ রোগ নিরতিশয় প্রবল হওয়ায় বৈরাগ্য-লাভের সম্ভাবনা একেবারেই ঘুচিয়া গিয়াছে।

হে ব্রহ্মন্! সকল লোকেরই দৃষ্টি রজোগুণে কলুষিত হইয়াছে, তমোগুণ অনবরত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং সত্ত্বগুণ অতিদূরে পলায়ন করিয়াছে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান সুদূরপরাহত হইয়াছে। জীবন অত্যন্ত অস্থির, মৃত্যু সর্ব্বদাই সম্মুখে দণ্ডায়মান, ধৈর্য্যবন্ধন শিথিলতাসম্পন্ন, অনুরাগ অসার বিষয় সুখের অনুসন্ধানে ধাবমান, মতি মূর্খতাবশতঃ কলুষিত, কলেবর বিনাশের বশীভূত; জরা পাবকশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত এবং একমাত্র পাপ-প্রবৃত্তিই অত্যন্ত স্ফূর্তিযুক্ত হইতেছে।

হে মুনিবর! যৌবন যত্ন করিলেও থাকে না, সাধুসঙ্গ সঙ্ঘটন হওয়া দুর্লভ। স্বর্গাদি গতি লাভ স্বপ্নসুখের ন্যায় অনিশ্চিত, সত্যের সুবিমল বদনকান্তি একেবারেই অদৃশ্য, মন মোহজালে আবৃত, সন্তোষ অতি দূরে পলায়িত, উজ্জ্বল করুণা অন্তর্হিত এবং একমাত্র নীচতারই প্রাদুর্ভাব

অভিব্যক্ত হইয়াছে। ধৈর্য্যবন্ধন শিথিলতায় পর্য্যবসিত, লোক সকল পুনঃ-পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশীভূত, দুর্জ্জন সংসর্গ সর্ব্বত্রেই সুলভ, সাধুসমাগম একেবারেই দুর্লভ, বস্তু মাত্রেই জন্ম মৃত্যুর আয়ত্ত এবং বিষয়-বাসনাই ভব-বন্ধনের হেতুভূত।

হে মুনিন্দ্র! এই ভূতবৃন্দ মৃত্যু কর্ত্তৃক অহরহ অপহৃত হইয়া কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইতেছে। সংসারে সদুপদেশ তিরোহিত হইয়াছে। লোভমোহাদির অপ্রতিহত অধিকার প্রদুর্ভূত হইয়াছে, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার জাল সর্ব্বত্র বিস্তৃতি পাইয়াছে, শঠতা ও কুটিলতা প্রভৃতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রকটিত হইয়াছে, ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়াছে এবং সাধুগণের অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপগত হইয়াছে। অপিচ কাল-প্রভাবে দিক্‌সকলও অদৃশ্য হয়, দেশসকলও নামান্তর প্রাপ্ত হয় এবং মহীধর সকলও বিশীর্ণ হয়; সুতরাং ঈদৃশ ক্ষণবিধ্বংসী সংসারে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে আস্থাবান্ হইতে পারে?

হে তপস্বিন্! পরমেশ্বরের মহীয়সী শক্তির প্রভাব একেবারেই অনির্ব্বচনীয়। কেন না, এই যে অপরিসীম আকাশ, ইহাও সন্মাত্রস্বভাব ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে, ভুবনও তাঁহারই বদনে প্রবেশ করে, পৃথিবীও বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সাগর সকলও বিশুষ্কভাব ধারণ করে, তারকা-রাজিও বিপর্য্যস্ত হয়, সিদ্ধগণও বিনষ্ট হইয়া থাকে, নরগণও বিদীর্ণ হইয়া যায়, ধ্রুবও অধ্রুবরূপে পরিণত হয়, অধিক কি, যাঁহারা অমর, তাঁহারাও মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়া থাকেন; সুতরাং এহেন ক্ষণভঙ্গুর সংসারের প্রতি মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে?

হে ভগবন্! অন্যের কথা কি, যিনি অমরগণেরও অধিপতিরূপে বিরাজমান, সেই দেবরাজ ইন্দ্রও কালের করালবদনে চর্ব্বিত হইয়া থাকেন, যমও নিযমিত হন, বায়ুও অবায়ুরূপে পরিণত হন, সোমও ব্যোম হন, মার্ত্তণ্ডও খণ্ডিত হন এবং ভগবান্ বিভাবসুও চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হন। হে মুনে! ব্রহ্মারও অবসান হয়, হরিরও সংহার হয় এবং যিনি সর্ব্বসংহারক, সেই ভগবান্ ভূতভাবন ভবেরও অভাব হইয়া থাকে। আরও দেখুন, যে কাল সকলেরই কলয়িতা, সেই কালেরও যখন

কাল আছে, নিয়তিরও বিলয় আছে এবং এই অনন্ত আকাশেরও বিনাশ আছে, তখন মদ্বিধ ব্যক্তির আস্থা হওয়া একেবারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না।

হে ব্রহ্মন্! যাঁহার রূপ, শ্রবণ, নয়ন ও বচনের অগোচর, এমন এক অজ্ঞাতমূর্ত্তি তত্ত্ব আছেন, তিনি স্বয়ংই আপনাতে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়াশক্তি প্রভাবে এই বিশ্বভুবন প্রদর্শন করিতেছেন, অর্থাৎ যাহা তত্ত্ব, তাহা আচ্ছাদিত করিয়া, যাহা কল্পিত তাহাই দেখাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনিই অভিমানধারী হইয়া সর্ব্বত্র অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ত্রিলোক মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাঁহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। যেমন প্রস্রবণ বেগে অবশ হইয়া প্রস্তরখণ্ড পর্ব্বতগাত্র হইতে নিপতিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অশ্বসহিত প্রভাকরও তাঁহারই আদেশে শিলা, শৈল ও বপ্র প্রভৃতি প্রদেশে যথানিয়মে কিরণ বিকিরণ করিয়া পরিচালিত হইতেছেন। যেমন পক্ক অক্ষোট ফল ত্বক্ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ এই সুরাসুরগণের আশ্রয় ভূগোলও তাঁহারই প্রভাবপ্রহিত জ্যোতিশ্চক্রে বেষ্টিত রহিয়াছে। স্বর্গে সুরগণ, মর্ত্ত্যে মানবগণ ও পাতালে পন্নগগণ তাঁহারই সঙ্কল্প মাত্রে সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহারই ইচ্ছামাত্রে প্রলয়কবলে নিপতিত হইতেছে। দুরাচার কাম তাঁহারই প্রভাবে সময়ে লব্ধপরাক্রম হইয়া নিতান্ত অযথোচিতরূপে সবলে লোক সকলকে আপনার আয়ত্ত করত পরাক্রমপ্রদর্শন করিতেছে। ঋতুপতি বসন্ত তাঁহারই মহিমায় মদবর্ষণে মাতঙ্গের ন্যায় বিকসিত কুসুমবর্ষণে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করত লোকসকলের অন্তঃকরণ বিচলিত করিতেছে। আবার, অনুরাগিণী রমণীগণ চঞ্চলনয়নে যে কটাক্ষ বিক্ষেপ করে, যাহার প্রভাবে চিত্ত অবিচলিত রাখা মহাবিবেকেরও সাধ্যায়ত্ত হয় না, সেই বিমোহনশক্তি রমণীকটাক্ষেও তাঁহারই মহিমা অনুস্যূত।

হে তপোনিধে! পরোপকারকারিণী পরসন্তাপসন্তপ্ত সুস্নিগ্ধ বুদ্ধিবলে যাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে; আমি বিবেচনা করি, তাঁহারাই যথার্থ সুখী। এই সংসাররূপ সমুদ্র মধ্যে নিয়ত কালরূপ বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, ইহাতে প্রতিনিয়ত কত শত কল্লোলপরম্পরা উৎপন্ন

ও বিলীন হইতেছে, তাহার সঙ্খ্যা করিতে কেহই শক্তিমান্ হয় না। অরণ্য মধ্যে লতাজালে বদ্ধ ও অবসন্ন মৃগের ন্যায় মানবগণ মোহবশতঃ জন্মরূপ জঙ্গলে দুরাশাপাশে সংযত হইয়া অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করত অবসন্ন হইতেছে। লোক সকল ইহজগতে পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক সতত কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় পরমায়ু বৃথা বিনষ্ট করিতেছে। তাহারা যে যে ফলের কামনা করিয়া ঐরূপ নিন্দিত কর্ম্মে নিরত হইয়া থাকে, তাহা আকাশোৎপন্ন পাদপের লতাবিরচিত কণ্ঠপাশসদৃশ নিতান্তই অসার। বলিতে কি, ঐ সকল ফল যে কতদূর সত্য, তাহা আমরা বিচারজ্ঞ হইয়াও বুঝিতে পারিতেছি না।

হে মুনীন্দ্র! মানবগণ 'অদ্য এই উৎসব, এই ঋতু, এই যাত্রা, এই আমার বন্ধু, এই আমার সুখ, এই আমার বিশিষ্ট ভোগ' ইত্যাকার বিবিধ অসার কল্পনাজালের আবিষ্কার করত বিমুগ্ধমনেই দিবানিশি বিগলিত হইতেছে।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে তাত! আমি আপনার নিকট আরও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই জগতের স্বরূপ আপাততঃ মনোরম বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাবিয়া দেখিলে ইহা একেবারেই অরমণীয়। ইহাতে রমণীয়তার লেশমাত্রও নাই এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে চিত্ত অত্যন্ত বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে, এমন কোন পদার্থও ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি ভাবিয়া দেখুন, বাল্যকাল কেবল বৃথা বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকেই অতিবাহিত হইয়া যায়। তৎপরে যৌবন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেও মনোরূপ মৃগ রমণীরূপ গিরিগুহার অনুসন্ধানেই তৎপর হইয়া কালযাপন করে; সুতরাং যৌবনেও শান্তি ঘটে না। অনন্তর বার্দ্ধক্যের সমাগম হইলে

তাহাতেও শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালেও কেবল নিতান্ত সন্তাপ ভোগ ব্যতীত মানবের ভাগ্যে অন্য কিছুই ঘটে না।

হে ব্রহ্মন্! এই শরীররূপ সরোজিনী যখন জরারূপ তুষারপাতে পরিম্লান হইয়া যায়, জীবনরূপ মধুকরও তৎকালেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অতিদূরে গমন করিয়া থাকে। সুতরাং তখন মানবের সংসাররূপ সরোবর আর পূর্ণ থাকে না, তাহা বিশুষ্ক হইয়া যায়। লতা যদি দিন দিন অভিনব কুসুমভরে অবনত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে দর্শকের মনে যেমন প্রীতির সঞ্চার হয়, সেইরূপ এই মানবগণের দেহও যে যে সময়ে জরার আবির্ভাব বশতঃ পরিপাক প্রাপ্ত হইতে থাকে, মৃত্যুও তৎতৎসময়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে থাকে। হে মুনে! ইহলোকে তৃষ্ণারূপ তরঙ্গিণী প্রবল প্রবাহে অখিল বস্তুজাত কবলিত ও সন্তোষরূপ তরুর মূলদেশ উৎপাটিত করিয়া অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। এই চর্ম্মময়ী দেহতরী জলধির উপরিভাগে থাকিয়া সর্ব্বদাই উত্তাল তরঙ্গসঙ্ঘাতে আকুলিত ও পরিভ্রমিত হইতেছে; সুতরাং ইহা নিমগ্নপ্রায় হইয়াই রহিয়াছে; পরন্তু তাহাতে আবার বিবেকরূপ কর্ণধারের অভাববশতঃ ইন্দ্রিয়গণরূপ মকরনিকরও ইহাকে আলোড়িত করিয়া থাকে। এই মনোরূপ শাখামৃগ সর্ব্বদাই তৃষ্ণারূপ লতাকানন মধ্যে বিচরণ করিয়া কামরূপ মহীরুহের শত শত শাখা পরিভ্রমন করত কেবল বৃথা কালক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই পূর্ণমনোরথ হইতেছে না।

হে ব্রহ্মন্! যাঁহারা বিপদে বিষাদসম্পন্ন বা মোহে সমাচ্ছন্ন, সম্পদে গর্ব্বপূর্ণ এবং কামিনীর কুটিল কটাক্ষে অবসন্ন হন না, সংসারে তাদৃশ মহাপুরুষ একেবারেই দুর্লভ। যাঁহারা মাতঙ্গসঙ্ঘরূপ তরঙ্গ-সমাকুল ভীষন সমরসাগর অনায়াসে পার হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে শূর বলিয়া গণ্য করি না; কিন্তু যাঁহারা মনোবৃত্তিরূপ তরঙ্গসঙ্কুল দেহেন্দ্রিয়রূপ জলনিধি সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারাই প্রকৃত শূর। হে মুনে! সত্য বটে, মানবেরা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, কিন্তু যাহার পরিণাম সুখফল উদ্ভাবন করে, যাহাতে সংসারদুঃখের অপগম হয়, যাহার অনুষ্ঠান করিলে চিত্তবৃত্তি দুরাশাকর্ত্তৃক সমাহত হয় না এবং যাহার

আশ্রয়ে বিশ্রামসুখ সঙ্ঘটিত হয়, এরূপ কোন ক্রিয়া কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত দেখা যায় না। যাঁহার কীর্ত্তি ত্রিভুবনব্যাপিনী, প্রতাপ দিগন্তগামী, সম্পদ্ অর্থিগণের প্রার্থনাপূরণে ব্যাপৃত, লক্ষ্মী বিনয়াদিগুণে অলঙ্কৃত এবং যাঁহার ধৈর্য্য অবিচলিত, এ জগতে তাদৃশ মহাপুরুষও অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে।

এই সংসারে এমন কোন স্থান বিদ্যমান নাই, যেখানে গিয়া বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যদি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ অথবা বজ্রময় সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যেও লুকায়িত থাকা যায়, তথাপি অপ্রতিহতগতি বিপদ্ তন্মধ্যে প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে আবার সম্পদও অণিমাদি সিদ্ধি সমূহের বেগ সহকারে ভাগ্যবান্ মানবের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। হে তাত! মানবগণ ভ্রান্তি বশতঃ বুদ্ধিবলে পুত্রকলত্রাদি যে সকল বস্তু সুখজনক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে, মৃত্যুকালে সে সকল দ্বারা কোন উপকারই সাধিত হয় না; পরন্তু বিষমূর্চ্ছনার ন্যায় কেবল ক্লেশেরই কারণ হয়। যখন বয়স ও শরীরের অবসান হওয়ায় বিষাদময়ী বিষমদশার সমাগম হইয়া থাকে, তখন জরাজীর্ণদেহ মানব স্বীয় ধর্ম্মসম্পর্কহীন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মপরম্পরা স্মরণ করিয়া দুর্ব্বিসহ অন্তর্দাহে দহ্যমান হইতে থাকে। মানব প্রথমতঃ ধনার্জ্জন ও ভোগতৃষ্ণার প্রবলতাবশতঃ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কাম ও অর্থমার্গের অনুবর্ত্তী হইয়া তদুপযোগী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই প্রায় সমস্ত জীবনকাল অতিবাহিত করে, কিন্তু যখন অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণ চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকে; সুতরাং তখন আর তাহার কিরূপে শান্তি ঘটিতে পারে?

হে মুনিবর! পরমার্থচিন্তা পরিহারপূর্ব্বক কামনাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে যে সকল ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও তরঙ্গিণীর তুঙ্গতর তরঙ্গের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ; সুতরাং সে ফল পাওয়া না পাওয়া উভয়ই তুল্য বলা যায়; অথবা ভিন্নরুচিশালী লোক দৈববশতঃ প্রাপ্ত ক্রিয়াফল দ্বারাই বিড়ম্বিত হইতেছে। অদ্য ইহা করিব, কিছুদিন পরে ঐ সকল করিব, ইত্যাদি চিন্তাজালবেষ্টিত মানুষ

সেই সেই পরিণামবিরস কর্ম্মপরম্পরার অনুষ্ঠান এবং দিবারাত্র অসার পরিবারবর্গের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিরত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে করিতে যখন জরায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে, তখন বিবেক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই চলিয়া যায়, তাহার আর সুখশান্তি কিছুই থাকে না। পাদপের পর্ণরাজি যেমন উৎপন্ন হইয়া অচিরাৎ জীর্ণ ও বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মবিবেকবিহীন লোক সকলও জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কতিপয় দিবসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে।

হে মহাত্মন্! যে দিবস বিবেকী পুরুষের অনুসরণ ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না হয়, ঐ দিবস ইতস্ততঃ সুদূরপথ পরিভ্রমণপূর্ব্বক দিবাবসানে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মূঢ়জন ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে? আপনি দেখুন, রিপুকুল নির্ম্মূলিত ও বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কগত হইলে মানব যেমন বিবিধ সুখভোগ করিবার উদ্যম করিতে থাকে, মৃত্যুও তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে গ্রাস করে। হায়! এই অসার বিষয়রাশি কোন এক অনির্দ্দিষ্ট কারণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্ষণ-কালের নিমিত্ত দৃষ্ট ও ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট হইতেছে, জগদ্বাসী জন-গণ ইহাতেই বিমোহিত হইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী মৃত্যুকেও অবগত হইতেছে না।

হে মহর্ষে! যাহারা নিরন্তর বিষয়ভোগ ও দেহপোষণাদি দ্বারা বৃথা পীবর কলেবর ধারণ করত অবস্থান করে এবং যাহারা কস্মিন্ কালেও বিবেক বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করে নাই, প্রিয়প্রাণরূপ যজমান সেই সকল কুকর্ম্ম-যূপবদ্ধ নরমেষগণের মুখমণ্ডল প্রথমে দোষরূপ অঞ্জন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ করিয়া সংস্কার সম্পাদন করে, অনন্তর রোগরূপ ঋত্বিকগণ আসিয়া তাহা-দিগের সংজ্ঞপন ও বিশসন কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া দেয়; সুতরাং তখন তাহারা অসৎপ্রায় হইয়াই পড়ে। * এই জগতে তরঙ্গমালার ন্যায় ক্ষণ-

* এখানে আর এক অর্থও হয়, যথা —যেমন যজমান যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যূপনিবদ্ধ মেষগণকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ লোক সকল বিষয়ভোগ ও দেহপোষণাদি দ্বারা যাহার পুষ্টিবিধান করে ও যাহার জন্য কুকর্ম্মপাশে আবদ্ধ হয়, সেই নিতান্ত প্রিয় প্রাণও তাহাদিগকে কালকবলে নিপাতিত করিয়া দেহাবসানে চলিয়া যায়।

ভঙ্গুর লোক সকল অনবরত কোথা হইতে আগমন করিতেছে এবং সবেগে কোথাই বা চলিয়া যাইতেছে, তাহার নির্ণয় করা যায় না। বিলোল-ভৃঙ্গনয়না বিম্বোষ্ঠী কামিনীগণ লোহিতপর্ণশালিনী বিষলতার ন্যায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যগুণে মানবগণের মনপ্রাণ উভয়ই হরণ করিয়া থাকে।

হে মুনীন্দ্র! যেমন কোন যাত্রা বা মহোৎসবদর্শনাভিলাষী জনগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাদাগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব-নির্ণীত সঙ্কেত স্থানে সকলেই একত্র মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ লোক সকলও ইহলোক হইতে স্বর্গ বা নরকে গমন করিয়া পুনরায় স্বর্গ বা নরক হইতে কর্ম্মবশতঃ সঙ্কেত স্থানরূপ ইহসংসারে আগমনপূর্ব্বক পুত্র, মিত্র, কলত্রাদিরূপে একত্র সঙ্গত হইতেছে। নিশাকালে তৈলযুক্ত বহুতরবর্ত্তি গ্রাস করিয়া পরিশেষে প্রদীপ যখন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, তখন যেমন তাহার আর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, তদ্রূপ এই মিথ্যাভূত চঞ্চল সংসারেরও প্রকৃত তত্ত্ব প্রতীত হইতেছে না। যেমন কুলালচক্র ভ্রাম্যমাণ হইলেও মন্দবুদ্ধি মানবের বুদ্ধিতে তাহা স্থির বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সংসারপ্রবৃত্তিরূপ কুচক্রিকা বর্ষাকালিন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ভঙ্গুরস্বভাব হইলেও নির্ব্বোধ পুরুষেরাই ইহাকে চিরস্থায়ী বোধ করে। শরৎকালে কমলের যে সকল সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ প্রভৃতি গুণ থাকে, শিশিরের সমাগমে সে সকল যেমন বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ মানবেরও যৌবনকালে সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্যাদি যে সকল গুণ থাকে, জরার আবির্ভাব হইলে সে সকল একেবারেই বিদুরিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সমুদায় কখনই বিশ্বাস্য হইতে পারে না।

হে বিজ্ঞবর! আপনি বিচার করিয়া দেখুন, এই জগতীতলে তরুগণ দৈববশতঃ জন্ম, বৃদ্ধি, পত্র, পুষ্প, ফল ও ছায়া প্রভৃতি লাভ করিয়া স্বীয় দেহ ধারণে অনবরত লোক সকলের উপকারই সম্পাদন করিতেছে; কিন্তু কৃতঘ্নহৃদয় লোকেরা কঠোর কুঠারাঘাতে সেই তরুদিগেরই ধ্বংস সাধন করে; সুতরাং এ হেন কৃতঘ্নতাদি দোষপরিপূর্ণ পাপ সংসারে আশ্বাস লাভের সম্ভাবনা কি? অপিচ হিতাভিলাষী স্বজনগণ হইতেও দোষ ব্যতীত অন্য কিছুরই সম্ভাবনা নাই, কেননা, যাহা মনোরম হইলেও দোষসম্পন্ন

এবং যাহা জীবন বিনাশের জন্য সমুৎপন্ন, সেই বিষদ্রুমের সংসর্গবশতঃ যেমন মোহপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ যাহা রম্য হইলেও দোষান্বিত এবং যাহা অশান্তির জন্য সংঘটিত, সেই আত্মজনের সংসর্গেও মোহপ্রাপ্তিই ঘটে। অতএব এতাদৃশ আত্মজনের সহবাসে থাকিলে পদে পদে যে মোহাভিভূত হইতে হইবে, তাঁহাতে আর সন্দেহ কি ?

হে মুনে ! এই সংসারে এমন দৃষ্টি কি আছে, যাহাতে দোষের লেশ নাই, এমন বিষয় কি আছে, যাহাতে দুঃখ বা অন্তর্দাহের উদয় হয় না, এমন ব্যক্তি কে আছে যাহার ভঙ্গুরত্ব নাই এবং এরূপ ক্রিয়াই বা কি আছে, যাহাতে ছলের সম্পর্ক নাই ? আবার দেখুন, যাহারা কল্পান্তপর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহাদিগকেও চিরজীবী বলিয়া গণ্য করা যায় না, কেন না, বহুকল্পজীবী ব্যক্তির নিকট তাহারাও অচিরজীবী। আবার যাহারা বহুকল্প পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে, তাহারাও তদপেক্ষা বহুকল্পজীবী ব্রহ্মার নিকট অচিরজীবী। সুতরাং অবয়বশালী কাল সমবারের যে লঘুত্ব ও দীর্ঘত্ব বুদ্ধি, তাহাও অসত্য ব্যতীত সত্যমধ্যে পরিগণিত নহে। এইরূপে দেখিতে গেলে এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহাও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডদ্রষ্টার নিকট অণু বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, অতএব অণুত্ব মহত্ত্বাদি বুদ্ধিও অসত্য ভিন্ন সত্য নহে। আপনি দেখুন, সর্ব্বত্রেই পর্ব্বতসকল পাষাণময়, যে সকল বৃক্ষ, তাহারা দারুময়, যাহা পৃথিবী, তাহা মৃণ্ময়ী এবং যে সকল মানব, তাহারা মাংসাদিময় ; বস্তুতঃ সমস্তই জড় বিকারমাত্র। ইহার কিছুই সত্য নহে। বস্তু সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপাদি কেবল পুরুষপরম্পরা-প্রচলিত ব্যবহার অনুসারেই কল্পিত হইয়াছে।

হায় ! যাহারা অবিবেকী পুরুষ, তাহারাই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের সম্মিলনে ঘটপটাদি বিবিধ পদার্থলক্ষ্মীর লীলাভূমিরূপে পরিণত এই জগৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক সত্য বলিয়া নয়নগোচর করিতেছে, কিন্তু যাঁহারা বিবেকসম্পন্ন পুরুষ, তাঁহারা কখন এই জগৎকে পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি ভিন্ন অন্য কোন যথার্থ পদার্থ বলিয়া ধারণা করেন না। হে সাধো ! স্বপ্নকালে অলীক বিষয় সকল সম্ভোগ করিয়াও মানব যখন বিস্ময়সম্পন্ন হয়, তখন এই মিথ্যাভূত জগতে যে মনস্বিগণের

বিস্ময়াবেশ হয়, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবার দেখুন, মানুষের ভোগচমৎকৃতি আছে বলিয়াই সে যে প্রথম বয়সে ইচ্ছানুরূপ ভোগসকল উপভোগ করিয়া চরমবয়সে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্ম-বিচারে নিরত হইতে পারে, এ কথাও কখনই সম্ভাবিত হয় না; কেননা, আমার বিশ্বাস—অজ্ঞানান্ধ মানুষেরা প্রথম বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া চরম বয়স পর্য্যন্ত আকাশলতিকার ফল তুল্য মিথ্যাভূত ভোগসমূহে যে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতেই পরমাত্মার স্বরূপ-নির্ণয়কথা সুদূরপরাহত হয়, সে কথা আর তাহাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হয় না। পশুগণ যেমন হরিদ্বর্ণ লতিকার ফল কামনায় নিঃশঙ্কমনে ধাবমান হইয়া গিরিশিখর হইতে ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, জড়চেতা মানবেরাও তদ্রূপ উচ্চপদের অভিলাষি হইয়া আপন বুদ্ধিদোষে প্রথম বয়সেই অধঃ-পতিত হয়।

হে মনীষিন্! দুর্গম গহ্বরস্থিত পাদপ এবং ইদানীন্তন জ্ঞানপরিহীন মানব ইহারা উভয়ই পরস্পর সমান। কেন না, দুর্গম গহ্বরমধ্যে যে সকল পাদপ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের পত্র, পুষ্প, ফল ও ছায়া এ সমুদায়ের কিছুই যেমন লোকের উপকারকারক হয় না বলিয়া সমস্তই ব্যর্থ হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানহীন সংসারী মানবগণেরও বিদ্যা, বিনয় ও ধনাদি এ সমুদায় কেবল তাহাদিগের শরীর পরিপোষণেই বৃথা ব্যয়িত হয় বলিয়া কাহারও উপকারকারী হয় না; সুতরাং তাহাদিগের জন্মও ব্যর্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃষ্ণসার মৃগগণ যেমন কখন গহন কাননে এবং কখন বা জনগম্য বনান্ত ভূভাগে বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মানবগণও কখন ক্রোধলোভাদিসম্পন্ন কঠোরহৃদয় অসাধুসমীপে এবং কখনও বা বিদ্যা-বিনয়াদিসম্পন্ন বদান্য সাধুজন সন্নিধানেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, ফলতঃ প্রকৃত বিবেকী জন-সংসর্গ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।

হে তপোনিধে! নির্দ্দয় বিধাতা এই সংসারে অহরহ যে সমুদায় নূতন নূতন আপাতরম্য ও পরিণামনীরস ভীষণ ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, তাহাতে কোন্ বিবেকী পুরুষের অন্তঃকরণ না বিস্ময়সম্পন্ন হয়? হায়! লোকমাত্রেই কামনায় আসক্ত, চাতুর্য্যে পণ্ডিত, ও প্রতারণা প্রভৃতিতে

বিলক্ষণ দক্ষ; ক্রিয়ামাত্রেই কষ্টদায়ক ও বিফল, ব্যবহার মাত্রেই দোষ-সম্পৃক্ত এবং সাধুসহবাস স্বপ্নেও একান্ত দুর্লভ, সুতরাং জানি না, এই পাপ সংসারে কিরূপে আমার জীবনকাল অতিবাহিত হইবে!

সপ্তবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই স্থাবরজঙ্গম যাহা কিছু জগৎ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, এ সকল স্বপ্নসমাগমের ন্যায় সম্পূর্ণই অস্থির বা মিথ্যা। হে মুনে! আজ যেখানে শুষ্কসাগরের ন্যায় গভীর গর্ত্ত দেখা যাইতেছে, হয় ত প্রভাতে তাহা জলদজালবেষ্টিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতরূপে পরিণত হইবে। আজ যাহা নিবিড় বনরাজিপরিপূর্ণ অভ্রভেদী মহাগিরিরূপে বিরাজমান, হয় ত দুইদিন পরে তাহা সমতল ভূমি বা গভীর গহ্বররূপে বিদ্যমান হইবে। আজ যে অঙ্গ কৌশেয় বসন ও সুগন্ধি মাল্যচন্দনে মণ্ডিত, হয় ত কাল তাহা নগ্ন অবস্থায় অতি দূরবর্ত্তী গর্ত্তমধ্যে বিশীর্ণ হইবে। আজ যে নগর বিবিধ ব্যবহারসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন মানবগণে পরিপূর্ণ দেখিতেছি, কিছু দিন পরেই আবার সেই নগর জনশূন্য অরণ্যরূপে পরিণত হইতেছে। আজ যে পুরুষ দম্ভভরে ধরামণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে সর্ব্বত্র শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছে, কিয়দ্দিন পরে সেই পুরুষই আবার ভস্ম-রাশিরূপে পরিণত হইবে।

হে মুনীন্দ্র! আরও দেখুন, যে অরণ্যানী বিস্তীর্ণতা ও নীলিমাগুণে গগনমণ্ডলের অনুকরণ করিয়া থাকে, সেই ভীষণ মহারণ্যও আবার কাল-বশে অভ্রংলিহ পতাকাপরিশোভিত পুরী হইয়া থাকে। আজ যাহা লতা-জালজড়িত ভয়ঙ্কর বনাবলীরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কতিপয় দিবস মধ্যেই তাহা পুনরায় মরুভূমিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ফলতঃ কালপ্রভাবে জলও স্থল এবং স্থলও জল হইয়া যায়। জগতে কিছুই অবিকৃত থাকে

না। বলিতে কি, এই যে জগন্মণ্ডল, ইহাও কাষ্ঠ, জল ও তৃণাদির সহিত বিপরীতভাব প্রাপ্ত হয়।

হে মুনে! বলিব কি, বাল্য, যৌবন, শরীর বা দ্রব্য এ সমুদায়েরও কিছুই নিত্য নহে, সমস্তই তরঙ্গের ন্যায় অনবরত এক ভাব হইতে ভাবান্তরে উপনীত হইতেছে। এ জগতে জীবন পবনমধ্যবর্ত্তিনী দীপ-শিখার ন্যায় চঞ্চল এবং ত্রিজগতের পদার্থলক্ষ্মীও ক্ষণপ্রভার প্রভার ন্যায় ক্ষণস্থায়িনী। যেমন পুনঃপুনঃ উপচয় ও অপচয়বশতঃ বীজরাশি বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই প্রভূত ভূতপরম্পরাও অজস্র বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। এই যে আড়ম্বরাতিশয়শালিনী সংসাররচনা, ইহা কৌশলাতিশয়বিদুষী নটীর ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। এই সংসার-রচনা নটীর ন্যায় স্বীয় কৌশলাতিশয় প্রকাশ করিতে গিয়া নৃত্যাবেশে যে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাতেই যেন পদে পদে ভ্রান্তি উৎপাদন করে, মনোরূপ পবনবিচলিত ভূতরূপ ধূলিরাশি এই সংসাররচনারূপিণী নর্ত্তকীর বস্ত্র, প্রাণিগণের পুনঃপুনঃ জন্মমরণ ও স্বর্গনরকাদি গমন ইহার অভিনয় এবং বিবিধ ক্ষণভঙ্গুর ব্যবহারপরম্পরা ইহার মনোরম কটাক্ষবিক্ষেপ। ইহা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ভ্রম বিধান করে, অর্থাৎ যেমন ঐন্দ্রজালিকবনিতা নয়ন প্রচ্ছাদনপূর্ব্বক অবস্তুকে বস্তু বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই তড়িত্তরলনয়না সংসাররচনারূপিনী নটীও অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে।

হে ব্রহ্মন্! আপনি দেখুন, সেই দিবস, সেই সম্পদ, সেই হর্ষ, সেই উৎসব, সেই ক্রিয়া এবং সেই সেই সাধুপুরুষসম্প্রদায়, এ সকল একে-বারেই অদৃশ্য হইয়াছে এবং আমরাও ক্ষণমধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইব। এ সংসার অহরহ ক্ষয় পাইতেছে এবং অহরহ উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই ত এই দগ্ধ সংসারের অবসান হইতেছে না। এ সংসারে মনুষ্যও তীর্য্যক্ ও তির্য্যকও মনুষ্য হইতেছে এবং দেব অদেব ও অদেবও দেব হইয়া জন্মিতেছে; সুতরাং বলুন দেখি, প্রভো! ইহাতে কাহার স্থিরতা আছে? এই কালরূপী দিবাকর স্বীয় কিরণজালে পুনঃ পুনঃ ভূতবৃন্দের বিরচন করিয়া রাত্রিদিন অতিবাহিত করত স্বরচিত ভূতবৃন্দেরই বিনাশকাল

নিরীক্ষণ করিতেছেন। অন্যের কথা কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র অথবা এক কথায় সমস্ত ভূতবৃন্দই বাড়বানলশোষিত সলিলরাশির ন্যায় মৃত্যুমুখেই নিপতিত হইতেছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পবন, পর্ব্বত, আকাশ, নদী ও দিঙ্মণ্ডল—এ সমস্তও মরণানলের শুষ্ক কাষ্ঠ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি মরণভয়ে ভীত, তাহার নিকট ধন, জন, ভৃত্য, মিত্র বা বিভব এ সমুদায়ের কিছুই মনঃপ্রীতিকর হয় না, কিন্তু যতক্ষণ না মরণরূপ দুরাচার নিশাচরের কথা মনে আসিয়া উদয় হয়, এ জগতে ততক্ষণই সেই সেই বিষয় সকল ভাল লাগিয়া থাকে।

হে ভগবন্! বলিব কি, এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ধনী ক্ষণমধ্যেই দরিদ্র হইতেছে, দরিদ্রও ক্ষণমধ্যে ধনী হইতেছে, আবার রোগী ক্ষণমধ্যে নীরোগ হইতেছে এবং নীরোগও ক্ষণমধ্যে রোগগ্রস্ত হইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই ভ্রমপরিপূর্ণ জগৎ পদে পদে বিপর্য্যাসগ্রস্ত ও বিনশ্বর হইলেও কি পণ্ডিত, কি অপণ্ডিত সকলেই ইহাতে বিমুগ্ধ হইতেছে। আরও দেখুন,—এই গগনমণ্ডল যেমন কোন সময়ে নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কখন কনকদ্রবের ন্যায় উজ্জ্বল আলোকমালায় সমুদ্ভাসিত, কখন জলদপটলরূপ নীলনলিনদলে বলয়িত, কখন গভীর ভৈরবরবে পরিপূর্ণ, কখন তারকাপুঞ্জে সুরঞ্জিত, কখন প্রভাকরপ্রভায় প্রভাসিত এবং কখন বা নিশাকরকরে আহ্লাদিত হইয়া আবার পরক্ষণেই ঐ সকলে বিরহিত হইয়া থাকে, এই মায়াময় পাপসংসারের অবস্থা বা স্বভাবও সেইরূপ। সুতরাং এ সংসারে এমন ধীর পুরুষ কে আছেন, যিনি এই আগমাপায়-পরায়ণা স্থিতিবিনাশশীলা জাগতিক অবস্থা দ্বারা ভয়বিহ্বল হন না?

হে সাধো! এ সংসারে ক্ষণমধ্যেই বিপদ্ আসিতেছে, আবার ক্ষণমধ্যেই সম্পদ্ আসিতেছে। এইরূপে জন্ম ও মৃত্যু এ দুইটীও ক্ষণমধ্যেই সম্পন্ন হইতেছে; সুতরাং দেখিতেছি, সংসারের সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, ইহাতে কাহারও চিরস্থায়িতা নাই। মানুষ জন্মিবার পূর্ব্বে একরূপ থাকে, পরে জন্মিয়া আর একরূপ হয়, আবার কিছুদিন পরে অন্যরূপ হইয়া থাকে। ফলত সর্ব্বদা একরূপে দীর্ঘকাল থাকে, এরূপ কিছুই বিদ্যমান নাই।

দেখিতেছি, ঘটও পট হইতেছে, আবার পটও ঘট হইতেছে। * সুতরাং এ সংসারে এমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার পরিবর্ত্তন বা বৈপরিত্য ঘটে না।

হে বিভো! মানবের পক্ষে উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, হ্রাস ও ক্ষয় এ সকল ক্রমান্বয়ে দিবারাত্রির ন্যায় প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বলবান্‌ও দুর্ব্বলের হস্তে জীবন হারাইতেছে। এক ব্যক্তিও বহুশত ব্যক্তির জীবন নাশ করিতেছে এবং নীচ ব্যক্তিও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতেছে। বলিব কি, এইরূপ সমস্ত জগতই পরিবর্ত্তনস্বভাব। এই দেখুন, এই যে জনমণ্ডলী, ইহাও পবনপরিচালিত জলতরঙ্গের ন্যায় অজস্র বিপর্য্যস্ত হইতেছে। বাল্যের পর যৌবন ও যৌবনের পর জরা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এইরূপে এই দেহই যখন একরূপে থাকে না, তখন বাহ্য বস্তুর প্রতি আর কিরূপে আস্থা রাখা যাইতে পারে? আবার দেখুন, মানবের মনও সকল বিষয়েই নটের ন্যায় কখন আনন্দ, কখন বিষাদ ও কখন সমভাব অনুভব করে। বালক যেমন খেলিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রচনা করিয়া কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না, সেইরূপ ক্রীড়াপরায়ণ বিধাতাও একস্থানে একরূপ, অন্যস্থানে আররূপ ও অপরস্থানে অন্যরূপ বস্তু সৃষ্টি করিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছেন না। তিনি তৎ তৎ বস্তু সকল ক্রমান্বয়ে উপচয়, উৎপাদন, নিহনন ও ভক্ষণ করিয়া পুনরায় আরও কত কত জীব সৃষ্টি করিতেছেন। দিন এবং যামিনীর পরিবর্ত্তনের ন্যায় বিধাতৃসৃষ্ট নরগণের প্রতি হর্ষ ও বিষাদাদি সকল সদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সংসারে মানবেরা পুনঃপুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে। তাহাদের বিপদ্ বা সম্পদ্ কিছুই স্থিরভাবে থাকিতেছে না।

হে ব্রহ্মন্! এই কাল এইরূপে প্রায় সকলকেই অবলীলাক্রমে বিচলিত ও বিপৎসাগরে নিপাতিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। এই বিশাল সংসার একটী মহান্ মহীরুহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ত্রিভুবনস্থ

---

* ঘট ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কার্পাসক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে ক্রমে তাহা কার্পাসবৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল উৎপাদন করে, পরে ফলে তূলা, তূলায় সূত্র ও সূত্রে পট প্রস্তুত হয়। এইরূপে পট অর্থাৎ বস্ত্রও মাটিতে পুতিয়া রাখিলে তাহা মাটি হইয়া যায়, পরে ক্রমে তাহাতে ঘট তৈয়ারি হয়।

যাবতীয় প্রাণী ইহার ফলরাশি ; এই ফল সকল প্রতিদিন সম ও বিষম বিপাকে বিভিন্নাকারে পরিণত হইয়া সমীরণবেগে ইহা হইতে নিপতিত হইতেছে।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিচারজ্ঞ ! আমার বিবেকপূর্ণ মন সংসারের এই সকল দোষদর্শনরূপ দাবদহনে দগ্ধ হওয়ায় সরোবরে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় তাহাতে আর ভোগবাসনা সমুদিত হইতেছে না। নিম্বলতা যেমন কাল-পাক বশতঃ ক্রমেই কটু হইতে কটুতর হইতে থাকে, সেইরূপ এই সংসার-রচনাও যতই দিন যাইতেছে, ততই আমার নিকট অধিকতর কটু হইতেছে। মানবের মন করঞ্জফলের ন্যায় কর্কশ। উহাতে প্রতিদিন দৌর্জ্জন্যের বৃদ্ধি ও সৌজন্যের ক্ষয় হইতেছে। সংসারের অবস্থা প্রত্যহই শুষ্ক মাষশিম্বীর ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহাতে প্রভেদের মধ্যে এই যে, শুষ্ক মাষশিম্বী ভাঙ্গিবার সময় টঙ্কার শব্দ হয়, আর সংসারের অবস্থা-ভঙ্গ কালে তাহা হয় না।

হে মুনীশ্বর ! দেখিতেছি, রাজ্য ও ভোগ এ উভয়ই চিন্তার আস্পদ ; সুতরাং আমার বিবেচনায় রাজ্য ও ভোগ অপেক্ষা নিশ্চিন্তভাবে নির্জ্জনে থাকাই উত্তম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, উদ্যানে আমার আনন্দ হয় না, রমণীতে আমার প্রীতি হয় না এবং ধনাশায়ও আমার হর্ষ হয় না। আমি মনের সহিত একমাত্র শান্তিভোগ করিব, তাহাতেই আমার সমস্ত হইবে। কিন্তু হে তাত ! এ সংসারে সুখ যেরূপ অনিত্য, বিষয়বাসনা যেরূপ দুরুদ্বহ, চিত্ত যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে কেমন করিয়া আমি শান্তি লাভ করিব ? আমি মরণেও আনন্দিত নহি এবং জীবনেও প্রীত নহি, তবে যে ভাবে থাকিলে শোক-তাপে পতিত হইতে হয় না, আমি সেই ভাবেই থাকিব। আমার রাজ্য, ভোগ, ধন ও চেষ্টা এ সমুদায়ের কিছুতেই

প্রয়োজন নাই। কেন না, এ সকলের মূল কেবল অহঙ্কার; সে অহঙ্কারই আমার নাই।*

হে মহর্ষে! যাহারা ইন্দ্রিয়রূপ সুদৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত জন্মাবলীরূপ চর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ, তাহাদের মধ্যে যাহারা সেই বন্ধনমোচনে যত্নশীল, বাস্তবিক তাহারাই শ্রেষ্ঠ। করী যেমন চরণপাতে কোমল-কমল দলিত করে, কামও তেমনি কামিনীসাহায্যে মানবের মন মথিত করে। আজ যদি বিমল বুদ্ধিতে বিকৃত চিত্তের স্থিরত্ব বিধান না করি, তবে কাল আর তাহার সময় সম্ভবিবে না। আমার মতে প্রকৃত বিষ বিষ নহে, বিষয়বৈষম্যই বিষ; কেন না, বিষ একটী দেহমাত্র হরণ করে, আর বিষয়বিষ অশেষ জন্ম নাশ করিয়া থাকে। আমি জানি, সুখদুঃখ, মিত্রবন্ধু, জীবনমরণ এ সমুদায়ের কিছুই জ্ঞানীর মনের বন্ধনের কারণ হয় না; অতএব হে সর্ব্বজ্ঞানীর অগ্রগণ্য! যাহাতে আমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় ও যাহাতে আমি শোক, শঙ্কা ও ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, আপনি আমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন্।

হে প্রভো! অজ্ঞান ভীষণ বনের ন্যায় বাসনাজালে জড়িত, দুঃখ-কণ্টকে সঙ্কীর্ণ ও স্বর্গ নরকরূপ উচ্চ নীচপ্রদেশে পরিপূর্ণ। আমি ক্রকচের অগ্রঘর্ষণও বরং সহ্য করিতে পারি, কিন্তু সংসারব্যবহার-জনিত আশা ও বিষয়কৃত বিনাশ সহ্য করিতে পারি না। এই আমার ইষ্ট, এই আমার অনিষ্ট, এই আমার কর্ত্তব্য, এই আমার অকর্ত্তব্য, আজ ইহা আছে, কাল তাহার অভাব, ইত্যাদি ব্যবহাররূপ অবিদ্যাঞ্জন-জনিত ভ্রমে পড়িয়া আমার নিসর্গচপল মন বায়ুবিচালিত ধূলিরাশির ন্যায় বিকম্পিত হইতেছে। এই সংসার সর্ব্বহর কালের কণ্ঠহারস্বরূপ বিরাজমান। ইহাতে তৃষ্ণা-রূপ তন্তু, জীবরূপ মুক্তা ও সাক্ষিচৈতন্যনির্ম্মল মনোরূপ মধ্যমণি শোভা পাইতেছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়াছি, সিংহ যেমন বাগুরা ছেদন করে, আমিও তদ্রূপ বৈরাগ্য সাহায্যেই এই সংসারহার ছেদন করিব।

হে তত্ত্বজ্ঞানীর অগ্রণী! আপনি শীঘ্রই একটী সুখকর বিজ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া আমার হৃদয়াটবীর নীহারসদৃশ মনস্তিমির বিদূরিত করিয়া দিন। হে মহাত্মন্! নিশাকরোদয়ে নৈশ অন্ধকার যেমন অপসারিত

হইয়া যায়, সেইরূপ সাধুজন সংসর্গেও সমুদায় আধি বিদূরিত হইয়া থাকে। আয়ু, বায়ুবিলোড়িত জলদজাললম্বিত অম্বুকণার ন্যায় ভঙ্গুর, ভোগসকল মেঘমধ্যবিলাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল এবং যৌবনবিলাস জলরয়ের ন্যায় অস্থির। আমি মনে মনে বহুদিন ধরিয়া ঐ সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া এক্ষণে সে সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিদেবীকেই আমার হৃদয়রাজ্যের অধিকারিণী করিয়াছি।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই শত শত অনর্থপরিপূর্ণ সংসার-কূপে জগদ্‌বাসী জীবগণকে নিপতিত দেখিয়া আমার মন চিন্তাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। আমি পদে পদে ভীত হইতেছি। আমার মনোমধ্যে মহাভ্রম উপস্থিত হইতেছে এবং জীর্ণ তরুর পর্ণরাশির ন্যায় আমার সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতেছে। অরণ্যবাসিনী বালিকা যেমন দুর্ব্বল পতির আশ্রয়ে থাকিয়া ভীত হয়, আমার মতিও তেমনি শুদ্ধ সন্তোষ ও ধৈর্য্য এই দুইটীর অঙ্কলাভে বঞ্চিত হইয়া শঙ্কিত হইতেছে। মৃগগণ যেমন তুচ্ছ তৃণের লোভে আকৃষ্ট হইয়া তৃণাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত হয়, আমার অন্তঃকরণ-বৃত্তিও সেইরূপ বিষয়লোভে বিড়ম্বিত হইয়া দুঃখভোগ করিবার জন্য দুঃখ-কূপে পতিত হইতেছে। সৎপথভ্রষ্ট চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ অবিবেকী পুরুষের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্ধকূপপতিত জীবগণের ন্যায় চিরকাল এই ক্লেশময় সংসারে বাস করিতেছে; তাহারা একদিনের জন্যও নিত্যপদে আরোহণ করিতেছে না।

হে মুনিবর! স্বামীর অধীনা রমণী যেমন স্বামিগৃহে গিয়া স্থির থাকিতে পারে না এবং ইচ্ছামত অন্যত্র গমন করিতেও সমর্থ হয় না, সেইরূপ চিন্তাও জীবরূপ ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া ইচ্ছানুসারে স্থির থাকিতে বা

যাইতে পারিতেছে না, সে দেহ মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। লতিকা যেমন হিমসমাগমে জীর্ণ পর্ণ পরিত্যাগ করত রসযোগে পুনরায় নূতন পত্র ধারণ করিয়া ক্রমেই অবসাদ পাইতে থাকে, জীবের ধীরতাও তদ্রূপ কখন বিষয়রাশি পরিত্যাগ ও কখনও বা গ্রহণ করত ক্রমেই অবসন্ন হইতেছে। হে মুনে! আমার চিত্তের যে অস্থিরতা, তাহাতেই আমার সাংসারিক বা পারমার্থিক সমস্ত সুখ দূরীভূত হইয়াছে। এখন আমার সংসারস্থিতি এক-বার কিয়দংশে আত্মাকে অবলম্বন ও আবার কিয়দংশে তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। লোকে যেমন অল্পান্ধকারে দূর হইতে শাখাদি হীন পাদপ দর্শন করিলে 'এটী স্থাণু, না—চোর' এইরূপ সংশয়ে সমাকুল হইয়া থাকে, আমার মতিও এখনও আত্মতত্ত্ব বিনিশ্চয় করিতে পারে নাই বলিয়া 'এইটী তত্ত্ব, কি—ঐটী তত্ত্ব' এইরূপ সন্দেহে দোলায়মান হইতেছে। অমরগণ যেমন আপন আপন বিমান পরিত্যাগ করেন না, ভোগবাসনাপূর্ণ ভুবনমধ্য-বিহারী চঞ্চলস্বভাব মদীয় মনও তদ্রূপ সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিতেছে না।

হে সাধো! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি, যেখানে সত্য সর্ব্বদাই শোভমান রহিয়াছে এবং যেখানে ক্লেশ, উপাধি, ভ্রম বা শোকের অধিকার নাই, সেই পরম সুখময় বিশ্রাম স্থান কোথায়? জনকাদি মহা-পুরুষগণ সংসারব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেন? সংসারে কোন্ প্রকারে অবস্থান করিলে সংসারপঙ্ক অঙ্গসংলগ্ন হইলেও তাহাতে পরিলিপ্ত হইতে হয় না? এবং ভবাদৃশ মহাপুরুষগণই বা এই সংসারে কিরূপ জ্ঞান অবলম্বন করত নিষ্পাপ হইয়া জীবন্মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছেন? এ সকল আমারে বলিয়া দিন। বহুমানপ্রদ! আমি যেরূপ বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে এই সাংসারিক বিষয় সকল বিষম বিষধরের ন্যায়ই রহিয়াছে; ভোগসকল এই বিষয়বিষধরের ফণা, বিভব ইহার বিষ, এবং ক্ষণভঙ্গুরতা ইহার কুটিল গতি; সুতরাং কিরূপে ইহা মঙ্গলাবহ হইতে পারে? হে মুনে! বুদ্ধি-রূপ সরোবর মোহরূপ মাতঙ্গে আলোড়িত হইয়া কলুষভাব ধারণ করিলে কিরূপে তাহা আবার প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হয়? মানবেরা সংসার ব্যবহারে নিরত থাকিয়াও কিরূপে পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় তাহাতে

নির্লিপ্ত হইয়া থাকে? জনগণ কামের সেবা না করিয়া এবং পরদুঃখকে আত্মবৎ ও নিজ দুঃখকে তৃণবৎ বোধ করিয়া কি প্রকারে উত্তমতা প্রাপ্ত হইতে পারে? এ সংসারে অজ্ঞানসাগরের পরপারগত কোন্ মহাপুরুষের চরিত্র অনুকরণ করিলে মানুষেরা দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে? ফলতঃ এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংসারে থাকিয়া কিরূপ ক্রিয়া করিলে মোক্ষলাভ হয়, কি প্রকারেই বা উপযুক্ত ফল অধিগত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা ব্যবহার করিতে হয়? এ সকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

হে প্রভো! আপনি আমাকে এমন একটী উপদেশ প্রদান করুন্—যাহাতে আমি এই বিধাতৃবিহিত বিনশ্বর জগতের পূর্ব্বাপর ভাব বিদিত হইতে পারি। হে ব্রহ্মন্! যাহাতে আমার হৃদয়াকাশের শশধররূপী মনের মল মার্জ্জিত হইতে পারে, আপনি তাহা সম্পাদন করিয়া দিন্। এ সংসারে উপাদেয় কি? হেয় কি? এবং কি উপায়েই বা চপল চিত্ত অচলের ন্যায় অটল হইতে পারে? তাহাও আমাকে বলুন্।

হে মুনিনাথ! এই অশেষ-ক্লেশবিধায়িনী সংসারবিসূচিকা কোন্ পবিত্র মন্ত্রপ্রভাবে প্রশমিত হইতে পারে? এবং কিরূপেই বা আমি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন্দতরুর মঞ্জরীরূপিণী পূর্ণশীতলতা প্রাপ্ত হইতে পারি? আপনারা তত্ত্বজ্ঞানশালী সাধুপুরুষ, অধুনা যাহাতে আমি অন্তঃকরণের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আর শোকসাগরে পতিত না হই, আমাকে আপনারা সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন্। হে মহাত্মন্! যেমন কুক্কুরেরা কাননমধ্যে ক্ষুদ্র জীবের ক্লেশ বিধান করে, মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ আমার মনকে বিশ্রান্তিসুখে বঞ্চিত করিয়া অশেষ ব্যাথায় ব্যথিত করিতেছে।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ! আয়ু উচ্চতরুর চঞ্চলপত্রস্থিত লম্বমান অম্বুকণার ন্যায় ভঙ্গুরস্বভাব। কলেবর হরচূড়ামণীকৃত চন্দ্রকলার ন্যায় দুর্লক্ষ্য ও শলিক্ষেত্রবিহারী শব্দকারী ভেককুলের কণ্ঠচর্ম্মের ন্যায় ভঙ্গুর। সুহৃৎ ও স্বজনসমাগম বাগুরার ন্যায় বন্ধনসাধন। বাসনারূপ বায়ু-বাহিত দুরাশারূপিণী বিদ্যুৎ বিকাশিত মোহরূপ মিহিকাময় মেঘজাল বজ্রপাত ও গর্জ্জন করিতেছে, তদ্দর্শনে লোভরূপ চণ্ডস্বভাব চপল ময়ূর নৃত্য করিতেছে, অনর্থরূপ কুটজতরু কলহরূপ কলিকার সহিত বিকশিত হইতেছে এবং সর্ব্বভূতরূপ মূষিকভোজী কৃতান্তরূপ ক্রূরহৃদয় মার্জ্জার জলপ্রবাহের ন্যায় অজস্র অশ্রান্তভাবে সঞ্চরণ করত কোন এক অতর্কিত স্থান হইতে সহসা আসিয়া আক্রমণ করিতেছে।

হে মতিমন্! এ অবস্থায় আমার উপায় কি? গতি কি? অবলম্বন কি? কোন্ বিষয়ের চিন্তা করা উচিত? এবং কি করিলেই বা এই জীবনকানন ভবিষ্যতে অমঙ্গলজনক হয় না? হে ব্রহ্মন্! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা অন্তরীক্ষে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা অতিশয় তুচ্ছ হইলেও ভবাদৃশ প্রাজ্ঞগণের ইচ্ছায় রমণীয় হয় না? আপনি বলুন, এই দুঃখপূর্ণ দগ্ধ সংসার মূঢ়তা ব্যতীত কেমন করিয়া সুস্বাদু হইয়া থাকে এবং বসন্তের অভ্যুদয়ে কুসুমসমূহ বিকশিত হওয়ায় বসুন্ধরা যেমন রমণীয় শোভা ধারণ করে, সেইরূপ দুরাশা পরিত্যাগ হইলে এ সংসার কিরূপে পূর্ণ-কামতারূপ ক্ষীরস্নানে রমণীয় হইয়া থাকে? হে প্রভো! কামরূপ কলঙ্ক-স্পর্শে মদীয় মনোরূপ সুধাকরের শোভা দূরীভূত হইয়াছে, কি রূপ ক্ষালন করিলে ঐ কলঙ্কের পরিহার হইতে পারে, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। যিনি সংসারের গতি অবলোকন করিয়াছেন ও ঐহিক আমুষ্মিক ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ কোন্ মহাপুরুষের ন্যায় আমরা এই সংসারবনে বিচরণ করিব এবং কিরূপ করিলেই বা রাগ দ্বেষাদি মহারোগ-

বিধায়ক ভোগবহুল বিভূতিসকল সংসারসাগরচারী প্রাণিদিগকে পীড়িত করিতে পারে না? তাহাও আমাকে বলুন।

হে ধীরবর! পারদ যেমন অগ্নিতে পড়িলেও দগ্ধ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানরসশালী সংসারী ব্যক্তি সংসারপাবকে পতিত হইলেও কি প্রকারে দগ্ধ হন না? হে মুনে! জলধিপতিত জন্তুর যেমন অজল স্থিতি সম্ভব হয় না, সেইরূপ এ সংসারেও ব্যবহারক্রিয়া ব্যতীত কেহই অবস্থান করিতে পারে না। অগ্নির যেমন দাহহীন শিখা নাই, সেইরূপ সংসারেও রাগ-দ্বেষাদিসম্পর্কহীন সৎক্রিয়া নাই। হে ভগবন্! ত্রিভুবনের সত্তা মনো-বৃত্তির উপরই রহিয়াছে, তত্ত্ববোধক যুক্তি ব্যতীত তাহার ক্ষয় হয় না; সুতরাং সেই বিষয়বিরতিজনক উত্তম যুক্তি আমাকে উপদেশ দিন। যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্যবহার করিলে অথবা ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে আমি দুঃখভাগী হইব না, সেই উত্তম যোগ আমাকে উপদেশ দিন। যাহা করিলে মন পবিত্র হয় এবং যাহাতে পরম শান্তি ঘটে, সেই যোগপ্রভাবে পূর্ব্বকালে কোন্ মনস্বী পুরুষ কি প্রকারে মোহনিরাস করিয়াছেন এবং করিয়া কি তত্ত্বই বা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাও আমাকে বলুন।

হে ভগবন্! সাধুগণ যে উপায়ে দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহা আপনার যেরূপ জানা আছে, আমার মোহ নিবৃত্তির নিমিত্ত সেইরূপ আমাকে উপদেশ করুন। অথবা হে ব্রহ্মন্! সেরূপ যুক্তি যদি না থাকে, কিম্বা থাকিলেও যদি কেহ আমাকে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া না দেন এবং আমি নিজেও যদি বিচার করিয়া সেই পরম শান্তি লাভে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে আমি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও অহঙ্কারপরিহীন হইয়া ভোজন, পান বা বসনপরিধান এ সমুদায়ের কিছুই করিব না এবং স্নান দানাদি সমস্ত ক্রিয়াই পরিত্যাগ করিব। হে মুনিবর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সম্পদ্, বিপদ্ বা বিষয়কার্য্য ইহার কিছুতেই আমি লিপ্ত থাকিব না। দেহ ত্যাগ ভিন্ন অন্য কোন বাঞ্ছাও করিব না। আমি মমতা, মৎসর ও শঙ্কা এ সকল পরিহার করিয়া কেবল চিত্রার্পিতের ন্যায় মৌনী হইয়াই কালাতিপাত করিব। অতঃপর শ্বাস, প্রশ্বাস ও বাহ্যজ্ঞান এ সকলও পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত অনর্থের মূলীভূত এই দেহ নামক সন্নিবেশ

ত্যাগ করিব। হে মুনে! আমি দেহের নহি, এ দেহও আমার নয় এবং দেহ-বহির্ভূত অন্য কিছুও আমার নহে। আমি তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব এবং সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক এই কলেবরও পরিত্যাগ করিব।

বাল্মীকি কহিলেন,—হে ভরদ্বাজ! মেঘের উদয়ে ময়ূর যেমন কেকারব করিয়া বিরত হয়, অকলঙ্ক শশাঙ্কসন্নিভ সুন্দরমূর্ত্তি রঘুনন্দন রামচন্দ্রও সেইরূপ বিশুদ্ধহৃদয়ে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণের নিকট এই সকল বিবেক-বাক্য বলিয়া অবশেষে যেন শ্রমবশতই তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—নলিনদল-নয়ন রাজকুমার রামচন্দ্র সভামধ্যে ঐ সকল মোহনিবৃত্তিকর কথা কহিলে তথাকার সমস্ত ব্যক্তির নেত্র বিস্ময়-বশতঃ বিকশিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের দেহের রোমসকল যেন রামের সেই সকল কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াই পরিধেয় বসন ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল। তৎকালে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তাঁহাদের সমস্ত ভব-বাসনা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা কিছুকালের নিমিত্ত যেন অমৃতসাগরের তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রবণকুশল ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় রামচন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিতে লাগিল। সভামণ্ডপগত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ, জয়ন্ত ও ধৃষ্টিপ্রমুখ মন্ত্রিবর্গ, মহীপতি দশরথ ও তৎসদৃশ পারশবাদি অন্যান্য সমস্ত রাজন্যবর্গ, পৌরগণ, রাজকুমারগণ, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ, ভৃত্যগণ, অমাত্যগণ, এমন কি পঞ্জরস্থ পক্ষিগণও রাম-চন্দ্রের সেই সেই শ্রবণমধুর বচনাবলী শ্রবণ করিল। তখন ক্রীড়ামৃগগণ নিস্পন্দ হইয়া, তুরঙ্গগণ চর্ব্বণ ত্যাগ করিয়া, কৌশল্যাপ্রমুখ রাজমহিষীগণ

স্বীয় স্বীয় বাতায়নে থাকিয়া এবং উদ্যান ও বিটঙ্কবাসী বিহঙ্গগণ নিস্পন্দ ও নীরব হইয়া রামের কথায় কর্ণপাত করিল। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি নভশ্চরগণ, নারদ, ব্যাস ও পুলহপ্রমুখ মুনিপুঙ্গবগণ এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেব, দেবাধিপ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ, ইহাঁরা সকলেই নিস্পন্দ হইয়া রামকথিত সেই সেই বিচিত্রার্থশালিনী উদারবচনাবলী শ্রবণ করিলেন।

অনন্তর সেই রঘুকুল-আকাশের পূর্ণচন্দ্র নলিন-নয়ন রামচন্দ্র মৌনী হইয়া অবস্থান করিলে, মুমুক্ষুমাত্রেই সাধুবাদ প্রদান করিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অবিশ্রান্ত পুষ্পবর্ষণে আকাশ যেন চন্দ্রাতপশোভায় শোভিত হইল। মন্দারমধ্যগত মধুকর-নিকর ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। মানবেরা মন্দারের মধুর গন্ধে মোহিত ও মনোহর সৌন্দর্য্যে আনন্দিত হইল। তখন সকলেরই মনে হইতে লাগিল, বুঝি, তারকাপুঞ্জ বায়ুকর্ত্তৃক নিপাতিত হইল, যেন দেবাঙ্গনাগণের হাস্যরাশি ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল, যেন বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরব মেঘখণ্ডসকল বিচ্যুত হইল, যেন রাশি রাশি হৈয়ঙ্গবীন পিণ্ড বিক্ষিপ্ত হইল, অথবা যেন অসংখ্য মুক্তাহারতুল্য প্রবল হিমবৃষ্টি পতিত হইল। তৎকালে চন্দ্রের কিরণমালার ন্যায় অথবা ক্ষীরসাগরের ঊর্ম্মিমালার ন্যায় সেই শুভ্রকান্তি কুসুমসকল কেশরান্বিত কমলকুলে সুশোভিত, মধুকরনিকরে করম্বিত, সুমধুর সমীরণে সঞ্চালিত এবং কেতকী, কুমুদ, কুন্দ ও কুবলয়মালায় বলয়িত হইয়া সুনীল গগনতল হইতে ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন অবিশ্রান্ত অবিরল অসংখ্য কুসুমপাতে গৃহপ্রাঙ্গণাদি সকল স্থল পূর্ণ হইয়া গেল। নগরবাসী নরনারী সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। সিদ্ধগণ ও দেবগণ আকাশপথে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া প্রায় মুহূর্ত্তের চতুর্ভাগ পর্য্যন্ত এইরূপে পুষ্পবৃষ্টি নিপাতিত করিলেন।

ক্রমে সমুদায় সভাস্থল সমাচ্ছাদিত করিয়া কুসুমবর্ষণ নিবৃত্ত হইলে, সভাগত সকল ব্যক্তিই শুনিতে পাইলেন,—সিদ্ধগণ আকাশে থাকিয়া পরস্পর বলিতেছেন, আমরা কল্পের প্রারম্ভ হইতে স্বর্গের সর্ব্বত্রই বিচরণ

করিতেছি ; কিন্তু এই রঘুকুলচন্দ্র রামচন্দ্র বৈরাগ্যবশতঃ অদ্য যে সকল অভূতপূর্ব্ব শ্রবণমনোহর উদার বাক্য ব্যক্ত করিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা আর কোথাও শ্রবণ করি নাই। বুঝি বা, বৃহস্পতিও এরূপ বলিতে সমর্থ নহেন। অহো! আজ আমরা রামমুখনির্গত মনঃপ্রীতিকর পরম পুণ্য-কথাই শুনিতে পাইলাম। এই রামচন্দ্র আজ যে শান্তিসুধাময় সুন্দর কথা কহিলেন, তাহাতেই আমরা পরম জ্ঞান লাভ করিলাম।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

সিদ্ধগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—মহর্ষিরা রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র-কৃত এই সকল পরম পবিত্র প্রশ্নের কিরূপ সদুত্তর প্রদান করেন, তাহা আমাদের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। নারদ, ব্যাস ও পুলহপ্রমুখ মুনিপুঙ্গবগণ এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহর্ষিগণ সকলেই এই সভায় সমাগত হউন এবং চল, আমরাও পদ্মিনীতে মধুকরের ন্যায় ঐ সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন পুণ্যময় দশরথ-সভায় গমন করিতে যত্নবান্ হই।

বাল্মীকি কহিলেন,—সিদ্ধগণ ও দেবর্ষিগণ পরস্পর ঐ কথা কহিয়া যেখানে রামচন্দ্রাদি বসিয়াছিলেন, সেইখানে সমাগত হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই দেখিলেন, সেই মহাসভার অগ্রভাগে বীণাবাদনপরায়ণ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ও নবঘনশ্যাম ব্যাস উপবেশন করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে ও পশ্চাদ্ভাগে ভৃগু, অঙ্গিরা ও পুলস্ত্যপ্রমুখ মহামুনিগণ বিরাজমান রহিয়াছেন এবং এতদ্ভিন্ন চ্যবন, উদ্দালক, উশীর ও শরলোমা প্রভৃতি মহর্ষিগণও সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পরস্পর গাত্রসংঘর্ষণে স্বীয় স্বীয় মৃগ-চর্ম্ম সকল বিসংষ্ঠুল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা সকলেই হস্তে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু ধারণ করিতেছেন। তাঁহাদের শরীরপ্রভা প্রভাবাতিশয়ে পাটলবর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা আকাশস্থ তারকারাজির ন্যায় এবং পরস্পরের মুখপ্রভায়

প্রভাকরনিকরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং পরস্পর বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করায় রত্নাবলীর ন্যায় ও অতিশয় শোভিত হওয়ায় মুক্তাবলীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্রই বোধ হয়, যেন দ্বিতীয় কৌমুদী-বৃষ্টি কিম্বা অপর সূর্য্যমণ্ডলী অথবা যেন চিরসম্ভৃত শত শত পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে।

এই মহাসভার যে স্থানে ব্যাস বিরাজমান ছিলেন, তথায় নক্ষত্রপুঞ্জ-সমীপে অম্বুধরের ন্যায়, যেখানে নারদ, সেখানে তারকারাজিসমীপে সুধা-করের ন্যায়, যেখানে পুলস্ত্য, তথায় সুরগণসমীপে সুরেন্দ্রের ন্যায় এবং যে স্থানে অঙ্গিরা, তথায় দেবগণসমীপে আদিত্যের ন্যায় শোভা হইয়াছিল। এই সময় সিদ্ধগণ আকাশতল হইতে ভূতল সমীপে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই উত্থিত হইলেন। তৎকালে ভূচর ও খেচরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের শরীরপ্রভায় দশদিক্ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। সভায় সমবেত সিদ্ধগণ, মহর্ষিগণ ও মুনিগণের মধ্যে কেহ কেহ হস্তে বেণুদণ্ড, কেহ কেহ লীলাকমল, কেহ কেহ কেশ-পাশে চূড়ামণি, কেহ বা শিখাদেশে দূর্ব্বাঙ্কুর, কেহ কেহ মস্তকে কপিলবর্ণ জটাজূট, কেহ কেহ করমূলে স্ফটিকমালা, কেহ কেহ রুদ্রাক্ষমালা, কেহ কেহ মল্লীমালা, কেহ কেহ চীর, কেহ কেহ বল্কল, কেহ কেহ কৌশেয়-বসন, কেহ কেহ কোটীতটে বিলোল মেখলা এবং কেহ কেহ বা মুক্তা-মালা ধারণ করিতেছিলেন।

অনন্তর মহাতপা বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র পাদ্য, অর্ঘ্য ও বিনয় বাক্যে সমাগত সিদ্ধগণকে সম্মানিত করিলেন। তাঁহারাও প্রীত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদিদ্বারা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে সমাদর সহকারে অর্চ্চনা করিলেন। এইরূপে ভূচর ও খেচরগণের পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ ও অর্চ্চনাদি সম্পন্ন হইলে রাজা দশরথ সাদরে সিদ্ধগণের সপর্য্যা বিধান করিলেন এবং সিদ্ধ-গণও কুশলপ্রশ্নে রাজাকে আপ্যায়িত করিলেন। ভূচর ও খেচরগণ সেই সেই সপ্রণয় সম্ভাষণাদি দ্বারা পরস্পর সকলেই সৎকৃত হইয়া স্বীয় স্বীয় আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক সম্মুখস্থিত প্রণত রামচন্দ্রকে সাধুবাদ ও পুষ্পবর্ষণ

দ্বারা সম্মানিত করিলেন। অনন্তর রাজলক্ষ্মী-বিরাজিত রামচন্দ্র তাঁহাদের অনুমতিক্রমে সেই সভায় উপবেশন করিলে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, নারদ, দেবপুত্র, ব্যাস, মরীচি, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, শর-লোমা, বাৎসায়ন, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, উদ্দালক, ঋচীক, শর্য্যাতি ও চ্যবন, ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন আরও বহুতর বেদবেদাঙ্গবিশারদ মহাপুরুষগণও তথায় উপবেশন করিলেন।

তখন বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত মিলিত হইয়া নারদাদি মহর্ষিগণ সকলেই একবাক্যে নমিতানন রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আহা! রাজকুমার রামচন্দ্র আজ যে সকল কথা প্রকাশ করিলেন, তৎসমস্তই কল্যানজনক, গুণশালী, বৈরাগ্যগর্ভ, সুস্পষ্ট, আর্য্যজনোচিত, নির্দ্দোষ, জ্ঞানাকর, উদার, মনোহর, হিতকর, প্রিয়ঙ্করও নিতান্ত সন্তোষকর। এ সকল শ্রবণ করিলে কাহার চিত্তে না বিস্ময়ের উদয় হয়? বাস্তবিক শত শত ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ কোন কোন ব্যক্তিরই বাক্য এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও মনোভাব প্রকাশে সমর্থ হইয়া থাকে। হে কুমার! তোমা ব্যতীত এরূপ বিবেকসমন্বিত প্রজ্ঞা আর কাহার বিকাশ পাইয়াছে? ফলতঃ তোমার হৃদয়ে যেরূপ প্রজ্ঞারূপিণী দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া অনন্যসাধারণ আলোক প্রকাশ করিতেছে, এরূপ যদি অন্য কাহারও হয়, তবে তিনিও মহাপুরুষ বলিয়াই গণ্য। এ জগতে রক্তমাংসাদিময় দেহাভিমানী বহুতর ব্যক্তিই জন্মিতেছে; কিন্তু তাহারা বিষয়জালে জড়িত; তাহাদের আত্মচৈতন্য নাই, তাহারা সৎ কিম্বা অসৎ কিছুই পরিজ্ঞাত নহে, কেবল পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দুঃখরাশিই ভোগ করিতেছে এবং মোহে পড়িয়া পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। বস্তুতঃ এই রামচন্দ্রের ন্যায় বিচারজ্ঞ নির্ম্মলহৃদয় লোক কদাচিৎ কোনও মতে এক আধটী দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেমন উত্তম ফলশালী সুন্দর সহকারতরু সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ সংসারেও সৌম্যমূর্ত্তি সাধুপুরুষের দর্শনলাভ প্রায়ই সংঘটিত হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রামচন্দ্র এই অল্প বয়সেই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ বিশেষ-রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং স্বীয়বুদ্ধিকৃত বিবেকচমৎকৃতিও অনুভব করিয়াছেন। সত্য বটে, অনেক স্থানেই সুন্দর সুখারোহ ফলপল্লবশালী

তরুরাজি উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সুন্দর চন্দনতরু কোথাও জন্মিতে দেখা যায় না। ফলপল্লবশোভিত পাদপশ্রেণী প্রত্যেক বনেই আছে; কিন্তু অপূর্ব্ব শোভাশালী লবঙ্গতরু সর্ব্বদা সুলভ হয় না। যাহা হউক, অদ্য আমরা সুধাংশু হইতে শীতল কৌমুদীর ন্যায়, সুন্দর তরু হইতে মঞ্জরীর ন্যায় এবং প্রসূন হইতে পরিমলপ্রবাহের ন্যায় এই রামচন্দ্র হইতে চিত্তচমৎকৃতি দর্শন করিলাম।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! দুরাচার দৈবগঠিত দোষাকর দগ্ধ সংসারে, সার পদার্থ অতীব দুর্লভ। যে সকল যশোনিধি পুরুষেরা বুদ্ধিপ্রভাবে সেই সার পদার্থ পাইবার জন্য যত্নবান্ হন, এ সংসারে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই সাধুশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারাই মহাপুরুষ। এ জগতে বর্ত্তমান সময়ে রামচন্দ্রের ন্যায় বিবেকবান্ উদারহৃদয় পুরুষ আর নাই, পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই এবং পরেও হইবে না।

হে মহর্ষিগণ! আমরা যদি রামচন্দ্রের এই সর্ব্বলোকচমৎকারকর প্রশ্নসমূহের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে বুঝিব, আমরা সমস্তেই নির্ব্বোধ।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

বৈরাগ্য-প্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

শ্যামপুকুর—২ নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

নূতন সংস্করণ।

কলিকাতা;

দি গ্রেট ইস্টারণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৪৩, গ্রে-ষ্ট্রীট।
দাস, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

ভূমিকা।

ভগবদিচ্ছায় মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণের অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন ও প্রকাশিত হইল। এই প্রকরণের মূলাংশে এক সহস্র শ্লোক আছে। ইহাতে প্রধানতঃ মুমুক্ষু মনুষ্যদিগের স্বভাব ও বিবিধ যুক্তিযুক্ত তত্ত্ব কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইতিহাস উপন্যাসাদি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন পাঠকের রসবোধ হয়, কোন দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়া তত সহজে রসগ্রহ করা যায় না। যোগবাশিষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ। যিনি যেমন অধিকারী, তাঁহার নিকট এ গ্রন্থ ততদূর মনোহর, সুবোধ বা দুরূহ। নারিকেল ফলের উপরের আবরণ কঠিন হইলেও তাহার ভিতর রসে ভরপুর; সে রসে তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে; দার্শনিক গ্রন্থও সেইরূপ। ফলে, ধৈর্য্য ও একাগ্রতাদির সহিত একবারে না হউক, একাধিক বার পাঠে এ গ্রন্থ হইতে রসগ্রহ হইবেই।

যোগবাশিষ্ঠের মূলগ্রন্থ অতীব দুর্ব্বোধ; অনুবাদ কার্য্য যথাসম্ভব সহজ ও সরল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কোথাও কোথাও সহজ বোধের জন্য কিছু কিছু অর্থবিবৃতিও দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মূলাংশের হানি হয় নাই; তবে সে পক্ষে কত দূর কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে, তাহার সাফল্যবিচার পাঠকগণই করিবেন।

আমাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর প্রধানতঃ এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং এই মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণের কতকাংশ পর্য্যন্ত প্রকাশিতও করেন। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পথানুসরণ করিয়া আমরা ইহার প্রকাশকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় ও পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণতার উপরই আমাদিগের যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের সর্ব্বসাফল্য নির্ভর। ইতি—

কলিকাতা
সন ১৩১৫ সালের বৈশাখ।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণের সূচীপত্র।

মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণের সূচীপত্র সমাপ্ত

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—সভ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কথা কহিলে, বিশ্বামিত্র সম্মুখস্থিত রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে রাঘব! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য! তোমার আর কিছুই জানিবার বিষয় নাই। তুমি স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রভাবে সমস্তই বিদিত হইয়াছ। তোমার বুদ্ধি স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় স্বভাবতই নির্ম্মল। তাহাতে কেবল অল্পমাত্র মার্জ্জনা অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ তুমি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও এই যে প্রশ্নসকল করিলে, ইহা কেবল প্রমাণ ও গুরূপদেশ প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় বিশ্বাস দৃঢ় করিবার নিমিত্তই করিয়াছ। ফলতঃ তোমার মতি ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেবের ন্যায় অন্তরে সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াও বাহিরে কেবল শান্তি অপেক্ষা করিতেছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ভগবান্ ব্যাসতনয় শুকদেব স্বয়ং বিচার-বলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রথমে তিনি শান্তি-লাভে সমর্থ হন্ নাই এবং পরেই বা গুরূপদেশ পাইয়া কিরূপে তিনি শান্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—রাম! ব্যাসনন্দন শুকদেবের বৃত্তান্ত তোমার বৃত্তান্তেরই অনুরূপ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট সেই পুনর্জ্জন্মনাশক শুকবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপেই বিজ্ঞাপন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। রাম!

এই যে অঞ্জনশৈলসন্নিভ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ তোমার পিতার পার্শ্বে হৈমাসনে বসিয়া আছেন; ইনিই ভগবান্ ব্যাস। ইহাঁরই শুক নামে এক শশিনিভানন সুন্দরাকৃতি তনয় ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরম জ্ঞানসম্পন্ন ও মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। মহাত্মা শুক মনে মনে সর্ব্বদাই সংসারের গতি চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে তোমার ন্যায় তাঁহার মনেও বিবেকের উদয় হইল। মহামনা শুক আপনিই আপনার বিবেকবলে বহুকাল পর্য্যন্ত বিশেষরূপে বিচার করিয়া পরে যাহা সত্য সেই আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনা হইতে পরম বস্তু লাভ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে তাহাতে শান্তি হইল না। কেননা উহাই যে প্রকৃত বস্তু এরূপ বিশ্বাস তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই। তবে এইটুক মাত্র হইয়া রহিল যে, চাতক যেমন বৃষ্টিধারা ভিন্ন অন্য জলে বিমুখ হয়, সেইরূপ তাঁহারও অবিচল চিত্ত কেবল ক্ষণ-বিনাশী বিষয়ভোগে বিরত হইল।

এইরূপে একদিন সেই বিমলমতি শুক সুমেরু শৈলের কোন এক বিজন প্রদেশে অবস্থিত স্বীয় পিতা মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পিতঃ! এই সংসারাড়ম্বর কি প্রকারে কোন্ সময়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে? ইহার পরিমাণ কি? ইহা কাহার এবং কোন্ সময়ে কিরূপেই বা ইহার উপশম হইবে?' তখন আত্মতত্ত্ববিৎ বেদব্যাস পুত্রের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বক্তব্য যথাযথরূপে অতি বিশদভাবে কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু শুকদেব তখন পিতার কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, পিতা যাহা আমাকে কহিলেন, এ সকল তত্ত্ব পূর্ব্বেও ত আমি জানিতাম। তবে পিতা আমাকে অধিক কিছুই বলিলেন না। শুক এইরূপ ভাবিতে থাকিলে ভগবান্ বেদব্যাসও পুত্রের তথাবিধ মনোভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় কহিলেন,—'বৎস! তত্ত্ববিষয়ে আমার বিশেষরূপ জানা নাই। ভূতলে জনক নামে এক রাজা আছেন, তিনি এ বিষয়ের বিলক্ষণ পারদর্শী। তুমি তথায় গিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে সমস্তই জানিতে পারিবে।'

শুকদেব পিতার আদেশ পাইয়া সুমেরু হইতে বসুধাতলে অবতরণ করত জনকপরিপালিত বিদেহনগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে দৌবারিকেরা রাজর্ষি জনকের নিকট গিয়া নিবেদন করিল,—'মহারাজ! ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন'; রাজা জনক দৌবারিকমুখে শুকদেবের আগমনসংবাদ শুনিতে পাইয়া তাঁহার জ্ঞানপরীক্ষার নিমিত্ত অবজ্ঞার সহিত 'থাকুক' এইমাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। তিনি সাতদিনের মধ্যে শুককে কোন সংবাদই দিলেন না। শুক সাতদিন তথায় অবস্থান করিলেন; পরে সপ্তাহ অতীত হইলে রাজর্ষি জনক তাঁহাকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। শুক এখানে আসিয়াও সাত দিন যাবৎ জনকের দেখা পাইলেন না। তিনি উন্মনা হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনক শুকদেবকে স্বীয় অন্তঃপুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলেন; এখানেও তিনি জনকের সাক্ষাৎ পাইলেন না। জনক জনৈক লোকমুখে শুককে বলিয়া পাঠাইলেন, 'এখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।'

শুক জনকের কথা শুনিতে পাইয়া উৎকণ্ঠিতমনে সেইস্থানেই অবস্থান করিলেন। এদিকে রাজর্ষি জনক মদোন্মত্ত কামিনীগণ দ্বারা এবং বিবিধ ভোগভোজনাদি দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করাইতে লাগিলেন। ক্রমে এক এক করিয়া সাতদিন অতীত হইয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মন্দ মন্দ সমীরণ যেমন দৃঢ়মূল অচলকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ সেই সকল ভোগসামগ্রী ও সেই সেই দুঃখরাশি ব্যাসনন্দন শুকের মন বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি কেবল সেইস্থানে সুসম, সুস্থ, মৌনী ও মুদিত-মানস হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রসন্নবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি জনক এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা শুকদেবের স্বভাব সর্ব্বথা সুপরি-জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে স্বসমীপে আনয়ন করিলেন, অনন্তর সেই মুদিতমনা শুককে সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্নান্তে কহিলেন, 'হে জ্ঞানিবর! আপনি সংসারিক সমস্ত কর্ত্তব্য নিঃশেষিত করিয়াছেন এবং আপনার নিখিল মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার অভিলাষ কি, তাহা আমাকে বলুন।'

শুকদেব কহিলেন,—হে গুরো! এই সংসারাড়ম্বর কিরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপেই বা ইহার উপশম হয়, ইহা আমাকে সত্বর সবিশেষ উপদেশ প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—রাম! শুকদেব জনকের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর জনক তাহা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শুককে যেরূপ কহিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপই উত্তর প্রদান করিলেন। তখন শুক তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুরো! ইহা আমি পূর্ব্বেও আপনা আপনি বিবেকবলে বিদিত হইয়াছিলাম, পরে পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনিও আমাকে এইরূপই বলিয়াছিলেন। আপনি বাগ্মিগণের অগ্রগণ্য, আপনিও এক্ষণে ইহাই বলিলেন। আর শাস্ত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিশ্চয় এই অসার দগ্ধ সংসার কেবল অজ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ অজ্ঞান ক্ষয়েই ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু হে মহাবাহো! আমি যাহা স্বয়ং বিচারবলে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, ইহাই কি তবে সত্য? যদি সত্য হয়, তবে তাহা যাহাতে নিঃসংশয়রূপে আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে, আপনি আমাকে সেই রূপই উপদেশ প্রদান করুন। আমার চিত্ত তত্ত্বনির্ণয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে আপনিই আমার ত্রাণকর্ত্তা, আমার বিশ্বাস—আমি আপনার নিকট হইতেই বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হইব।

জনক কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনি স্বয়ং যাহা বিদিত হইয়াছেন এবং পুনরায় গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, ইহার পর আর কোন নিশ্চয়ই নাই। একমাত্র অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় পরমাত্মা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই নাই। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই স্বীয় সঙ্কল্পবশতঃ জীবরূপে সংসারে বদ্ধ হন্ এবং সংকল্পের অবসানে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। হে মহাত্মন্! আপনি ভোগ করিবার পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চে বীতরাগ হইয়াছেন; সুতরাং আপনার আর জানিবার বিষয় নাই। আপনি সমুদায় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় বিশদরূপেই বিদিত হইয়াছেন। শৈশব হইতেই আপনার ভোগবাসনায় বিরতি হওয়ায় মহাবীরত্ব বিলসিত হইয়াছে। আপনার মতি মহারোগতুল্য ভোগরাশি

হইতে সম্পূর্ণরূপেই নিবৃত্ত হইয়াছে। হে বালমহাবীর! আপনি যাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমি তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে আপনি আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আপনার যেরূপ পূর্ণতা জন্মিয়াছে, ভবদীয় পিতা সর্ব্বজ্ঞান-মহানিধি মহাতপা ব্যাসদেবেরও সেরূপ হয় নাই। আমি বেদব্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু আপনি তাহার পুত্র ও শিষ্য হইয়াও ভোগ-বাসনা পরিহার করায় আমা অপেক্ষাও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে এবং নিখিল প্রাপ্তব্যই আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আর দৃশ্যপ্রপঞ্চে নিমগ্ন নহেন, আপনি মুক্ত হইয়াছেন, এক্ষণে ভ্রান্তি পরিত্যাগ করুন্।

তখন মহাত্মা জনকের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া মহামনা শুক নির্ম্মল পরমাত্মায় মনঃসমাধান করত মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি শোক, ভয়, ক্লেশ ও সমস্ত চেষ্টাপরিবর্জ্জিত হইয়া সমাধির নিমিত্ত সুন্দর সুমেরুশিখরে গমন করিলেন। শুকদেব তথায় গমন করিয়া নির্বিকল্প-সমাধিযোগে দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অবস্থান করত পরিশেষে তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় ধীরে ধীরে পরমাত্মায় নির্ব্বান প্রাপ্ত হইলেন।

হে রাম! জলবিন্দু যেমন জলধিজলে বিলীন হইয়া যায়, সমাধিপর শুকদেবও তদ্রূপ দৃশ্যসম্বন্ধ ও অজ্ঞান অপগমে বিশুদ্ধ হইয়া পরম পাবন পরমাত্মার সুবিমল পরম পদে বিলীন হইয়াছিলেন।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে রাম! যেমন সেই ব্যাসনন্দন শুকদেবের কেবল মনোমল মার্জ্জন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, সেইরূপ তোমারও এক্ষণে মাত্র মনোমল দূরীকরণ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

হে মুনীশ্বরগণ! এই সদ্বুদ্ধিশালী রামচন্দ্রের নিকট যখন রোগের ন্যায়

ভোগরাশি প্রীতিকর হইতেছে না, তখন ইনি নিশ্চয়ই সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। বাস্তবিক সমগ্র বিষয়জালে বিরতি হওয়াই জ্ঞাতজ্ঞেয় মনের লক্ষণ। ভববন্ধন অবাস্তব হইলেও ভোগ-বাসনায়ই তাহার দৃঢ়তা হইয়া থাকে এবং সেই ভোগবাসনা ক্ষীণ হইলে ভববন্ধনও ক্ষয় হইয়া থাকে।

হে রাম! মনীষিগণ বিষয়বাসনার আতিশয্যকেই বন্ধন এবং বিষয়-বাসনার ক্ষয়কেই মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মানবগণের আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আপাতজ্ঞান অল্পায়াসেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিষয়-বিরতি বহুক্লেশ ব্যতীত কদাপি সমুৎপন্ন হয় না। যিনি সমীচীনরূপে আত্মদর্শী হন, বাস্তবিক তাঁহাকেই আত্মজ্ঞ, জ্ঞাতজ্ঞেয় ও পণ্ডিত বলা যায়; ভোগরাশি কদাচ সেই মহাত্মাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহার নিকট যশঃপ্রভৃতি বিশিষ্ট হেতু ব্যতীত স্বভাবতঃই ভোগসকল রুচিজনক হয় না, জগতে প্রকৃতপক্ষে তাদৃশ জীবই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন মরুভূমিতে কদাপি লতার উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ যতদিন না তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতার উদয় হয়, ততদিন কোন-ক্রমেই জনগণের বিষয়বিরতি উৎপন্ন হয় না। হে মুনিগণ! এই রঘু-কুলশিরোমণি রামচন্দ্রকে যখন অতি রম্য বিষয় সকলে অনুরক্ত করিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন ইহাঁকে আপনারা যথার্থই জ্ঞাতজ্ঞেয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন।

হে মুনীন্দ্রগণ! রামচন্দ্র অন্তরে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত বস্তু এই কথা তিনি জ্ঞানিবর বশিষ্ঠের মুখে শ্রবণ করিতে পারিলেই চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবেন। শারদীয় শোভা যেমন মেঘহীন সুবিমল নভোমণ্ডলের অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ রামচন্দ্রের মতিও কেবল কৈবল্যশান্তির অপেক্ষা করিতেছে। অতএব এক্ষণে এই মহাত্মা ভগবান্ বশিষ্ঠই রামচন্দ্রের চিত্তবিশ্রান্তির নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করুন্। এই জ্ঞানিবর বশিষ্ঠই সমগ্র রঘুকুলের উপর চিরদিন প্রভুত্ব করিতেছেন। ইনিই রঘুকুলের গুরু, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী ও ত্রিকালদর্শী, সুতরাং ইনিই রামকে উপদেশ প্রদান করুন্।

হে ভগবন্ বশিষ্ঠ! পূর্ব্বকালে আপনার সহিত আমার বিরোধ হইলে, ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা আমাদিগের বৈরশান্তির জন্য এবং সরলদ্রুম-সমাকীর্ণ নিষধাচলের সানুদেশবাসি মুনিগণের মঙ্গলবিধানের জন্য যে সকল জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কি আপনার স্মরণ আছে? হে ব্রহ্মন্! দিবাকরোদয়ে নৈশ-অন্ধকার যেমন অপসারিত হয়; সেইরূপ যে যুক্তিযুক্ত জ্ঞান দ্বারা সংসারবাসনা বিনষ্ট হয়, আপনি সত্বর আপনার এই অন্তেবাসী রামচন্দ্রকে সেই যুক্তিসম্পন্ন জ্ঞান উপদেশ প্রদান করুন্ এবং তৎশ্রবনে ইনিও পরম শান্তি প্রাপ্ত হউন্।

হে ভগবন্! বিমলমুকুরে যেমন মুখপ্রতিবিম্ব অনায়াসেই পতিত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ রাম-হৃদয়েও ভবদীয় উপদেশ সহজেই প্রতিফলিত হইবে; সুতরাং আপনার এ বিষয়ে বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। হে সাধো! বিষয়বিরতি-সম্পন্ন সৎশিষ্যকে যে শাস্ত্রার্থ বা জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা যায়, বস্তুতঃ সাধুদিগের তাহাই শাস্ত্রার্থ বোধ, তাহাই জ্ঞান এবং তাহাই সর্ব্বজন-প্রশংসিত পাণ্ডিত্য। আর বৈরাগ্য-সম্পর্কশূন্য অসৎস্বভাব-সম্পন্ন কু-শিষ্যকে যাহা কিছু উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা কুক্কুরচর্ম্মস্থ গোক্ষীরের ন্যায় নিতান্তই অপবিত্রভাব সম্পন্ন। হে জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য! ভবাদৃশ বৈরাগ্যসম্পন্ন ভয়ক্রোধপরিশূন্য নিষ্পাপ নিরভিমান সাধুগণ যাহা-দিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাদিগের বুদ্ধিমালিন্য উপদেশকালেই দূরীভূত হইয়া যায়।

গাধিনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই সকল কথা কহিলে, তৎকালে ব্যাস-নারদপ্রমুখ মুনিমণ্ডলী তৎশ্রবণে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করত তদীয় বাক্যাবলীর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর নরবর নরপতি দশরথের পার্শ্ববর্ত্তী ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় পরমতেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মপুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রমুনিকে কহিলেন,—হে মুনে! ক্ষমতা থাকিতে কোন্ ব্যক্তি সাধুগণের বাক্য অগ্রাহ্য করিতে পারে? অতএব আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিলেন, তাহা আমি নির্ব্বিঘ্নেই নির্ব্বাহ করিতেছি। আমি দীপালোকে নৈশ অন্ধকারের ন্যায় রামপ্রভৃতি রাজকুমারগণের মনোমল অবিলম্বেই অপনোদিত করিব। পুরাকালে কমলযোনি ব্রহ্মা নিষধাচলে

আবির্ভূত হইয়া অস্মদীয় সংসারভ্রম অপনয়ন করিবার জন্য যে সকল জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে অখণ্ডিতরূপে জাগরূক রহিয়াছে।

বাল্মীকি কহিলেন,—মহাত্মা বশিষ্ঠ ঈদৃশ বাগ্‌বিন্যাসপূর্ব্বক মহোৎসাহ-সহকারে উপযুক্ত বক্তৃশোভায় শোভিত হইয়া নিখিল জগতের অজ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত এই পরম তত্ত্ববোধক উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শ্রীরাম! ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে জগতের দুঃখশান্তির জন্য যে জ্ঞানশাস্ত্র উপদেশ দেন, আমি তোমার নিকট তাহাই প্রকাশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যে বিস্তৃত মোক্ষসংহিতা বলিবেন, তাহা আমি পরে শ্রবণ করিব। এক্ষণে আমার মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অগ্রে তাহাই বিদূরিত করিয়া দিন। হে ব্রহ্মন্! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, ভগবান্ শুকদেবের পিতা মহামতি বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইলেন না, আর তদীয় তনয় শুকদেব বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইলেন, ইহার কারণ কি তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! পরমার্করূপ পরমাত্মার প্রকাশমান চৈতন্য-শক্তির অভ্যন্তরে পূর্ব্বে যে কত কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ত্রসরেণু-প্রবাহ সমুত্থিত হইয়া বিলীন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না; বর্ত্তমান কালেও যে কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে, তাহারও সংখ্যা করিতে কেহই সমর্থ নহে, আর ভবিষ্যত কালেও পরমাত্ম-রূপ অম্ভোনিধিতে যে কত কত জগৎসৃষ্টিরূপ তরঙ্গরাশি সমুত্থিত হইবে, তাহার সংখ্যা করিবার কথামাত্রও ত সম্ভবপর হয় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে যে সকল জগৎ সৃষ্টিপরম্পরা হইয়া গিয়াছে ও পরে যে সকল হইবে, তাহার সংখ্যা করা যে কখনই সম্ভবপর হয় না, তাহা আমি জানি। কিন্তু এক্ষণে এই বর্ত্তমান অনন্ত সৃষ্টির স্বরূপ যে কি প্রকারে বিদিত হওয়া যায়, তাহাই উপদেশ করুন্।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! পশু, পক্ষী, মানব ও দেব প্রভৃতির মধ্যে যে যখন যে স্থানে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার জীবাত্মা তৎকালে সেই-স্থানেই আতিবাহিক নামক সূক্ষ্ম দেহে হৃদয়াকাশে ভ্রান্তিবশতঃ বাসনাময় জগত্রয় অবলোকন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই চিদাকাশরূপী জীবাত্মা জন্মপ্রকৃতি সর্ব্ববিক্রিয়ার বহির্ভূত। এইরূপে কোটি কোটি প্রাণী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। ঐ সকল প্রাণী মৃত্যুকবলে পতিত হইবার পূর্ব্বে জীবদ্দশায় যে বাসনাময় জগত্রয় দর্শন করে, তন্মধ্যে অদৃষ্টবশতঃ দেবমনুষ্যাদিভেদে যাহার যে প্রকার বাসনার উদ্রেক হয়; সে মরণান্তে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাঘব! মানস-পূজাকালীন যত্ননির্ম্মিত রত্নপ্রাসাদাদি, মনঃকল্পিত রাজ্য, ইন্দ্রজালকৃতমালা, উপন্যাসের ঘটনা, বায়ুবেগে ভূকম্প, বালভীষণার্থ কল্পিত পিশাচ, নির্ম্মলা-কাশে লম্বমান মুক্তাবলী, নৌকারোহীর চক্ষে তীরতরুর প্রচলন, স্বপ্নদৃষ্ট পুরী এবং স্মৃতিজাত আকাশকুসুম, এই সকল যেমন অলীক বা মিথ্যা; তদ্রূপ এই জগৎসংসারও যে সম্পূর্ণই মিথ্যা; ইহা মৃত্যুদশাগ্রস্ত জীব স্বয়ং স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকে। মরণকালে যে বাসনাময় দৃশ্যপ্রপঞ্চ অনুভূত হয়, মরণোত্তর তাহাই আবার অজ্ঞানজনিত চিরপরিচয়বশতঃ পঞ্চীকরণরূপে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া ইহলোক নামে জীবাকাশে বিকাশ পাইয়া থাকে। ইহলোকেই জন্ম, জীবন, চেষ্টা বা মরণ ইত্যাদি অনুভব হয়। পরে মরণান্তে যে পরলোক হয়, তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় জন্ম মরণপ্রভৃতি অনুভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহা বর্ত্তমান জন্মের ইহ-লোক, তাহাই পূর্ব্বজন্মের পরলোক, আর যাহা ভবিষ্যৎজন্মের ইহলোক, তাহাই বর্ত্তমান জন্মের পরলোক।

হে রাম! এই বাসনাময় স্থূলদেহের অভ্যন্তরে অন্য আর একটী দেহ আছে, তাহা সূক্ষ্মদেহ নামে অভিহিত। এই সূক্ষ্মদেহেরও অভ্যন্তরে

আর একটী দেহ আছে, তাহার নাম কারণদেহ। এই ত্রিবিধ দেহই কদলীত্বকের ন্যায় অবস্থান করত সংসারসংজ্ঞায় প্রতিভাত হয়। পৃথিবী, জল ও তেজঃপ্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের সম্বন্ধ বা তদধীন জাগতিকক্রম ইহার কিছুই মরণাবস্থায় থাকে না, তথাপি ইহাতে জীবগণের জগদ্‌ভ্রম সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; ইহার কারণ কেবল অবিদ্যা। এই নানাপ্রসব-শালিনী অনন্ত অবিদ্যা সুদীর্ঘ সরিতের ন্যায় সৃষ্টিরূপ চঞ্চল তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হে রাম! পরমার্থরূপ মহাসাগরে ভূয়োভূয়ঃ ভূরিভূরি সৃষ্টিতরঙ্গাবলী সমুৎপন্ন হইতেছে। ঐ সকল তরঙ্গের মধ্যে কতিপয় তরঙ্গ প্রাচীন, কতিপয় অভিনব, কতকগুলি কুলক্রম মন ও গুণে সর্ব্বপ্রকারে সমান, কতকগুলি অর্দ্ধসাদৃশ্যসম্পন্ন এবং কতকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, এই যে সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহর্ষি বেদব্যাস বসিয়া রহিয়াছেন; ইনি সমুচিত জন্ম ও বিজ্ঞনাদিসমুপলক্ষিত সেই সেই ব্যাসসৃষ্টিতরঙ্গের দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ। অর্থাৎ ইহাঁর পূর্ব্বে আরও একত্রিংশৎ ব্যাস জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বাদশজন কুল, আকৃতি এবং চেষ্টা এই সমুদায়ে সমান; কিন্তু জ্ঞানাংশে ন্যূনতাসম্পন্ন; আর দশজন সর্ব্বাংশে তুল্য এবং অবশিষ্ট দশজন বংশাদিক্রমে বিভিন্ন। এইরূপে এখনও অন্যান্য কত ব্যাস, কত বাল্মীকি, কত ভৃগু, কত অঙ্গিরা এবং কত পুলস্ত্যাদি মহর্ষিবৃন্দ জন্মগ্রহণ করিবেন। কাহারও কাহারও শরীরসংস্থান পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। আবার কাহারও কাহারও বা পরিবর্ত্তিত হইবে। কত কত মানব, কত দেবতা ও কত দেবর্ষি এক সময়েই সমুৎপন্ন এবং এক সময়েই বিলয় পাইতেছেন। আবার কখন কখন বা ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্নরূপে সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিলীন হইতেছেন।

হে রাম! এই যে এক্ষণে ব্রহ্মকল্পের অবয়বভূত ত্রেতাযুগ চলিতেছে ইহা পূর্ব্বে বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং পরেও বহুবার হইবে। ইহাতে পূর্ব্বে কত কত কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, গো, অশ্ব ও মনুষ্যাদি জন্মিয়াছে বর্ত্তমানে জন্মিতেছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে। তুমি সম্প্রতি এইযুগে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, পূর্ব্বকালেও কতবার রাম হইয়াছিলে এবং

ভবিষ্যতেও কতবার হইবে তাহার ইয়ত্তা কি? আমি বশিষ্ঠ, আমিও কতবার জন্মিয়াছি, কতবার জন্মিতেছি ও কতবার জন্মিব, তাহারই বা নির্ণয় কি? এই যে দীর্ঘদর্শী অদ্ভুতকর্ম্মা বেদব্যাস, ইহাঁকে আমি এইবার লইয়া ক্রমান্বয়ে দশবার জন্মিতে দেখিলাম। আমি, ব্যাস ও বাল্মীকি, আমরা যে কতবার একত্রিত হইয়া, কতবার পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, কতবার সমান হইয়া, কতবার অসমান হইয়া, কতবার অভিজ্ঞ হইয়া, কতবার অনভিজ্ঞ হইয়া, কতবার ভিন্নাকৃতি হইয়া এবং কতবার তুল্যাভিপ্রায় হইয়া জন্মিয়াছি তাহার নিশ্চয় করা যায় না। এই ব্যাস জগতে পুনর্ব্বার আরও আটবার জন্ম লাভ করত পুনরায় ভারত-ইতিহাস প্রকাশ, বেদচতুষ্টয়ের বিভাগ, বংশগৌরবপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তার করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিবেন। ইহাঁর শোক, ভয় ও সর্ব্বপ্রকার কল্পনা তিরোহিত, চিত্ত প্রশান্ত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত এবং মন বিজিত হইয়াছে। ইনি এক্ষণেও জীবন্মুক্ত-ভাবেই অবস্থান করিতেছেন।

হে রাম! বিত্ত, বন্ধু, বয়স, বিদ্যা, বিজ্ঞান, কর্ম্ম ও চেষ্টা এ সমুদায়ে পরস্পর সাদৃশ্যসম্পন্ন জীবগণ কখন কখন বিদ্যমান থাকে, কখন বা থাকে না, আবার কখন কখন বা শত শত সৃষ্টির অন্তরালেও তাহারা উৎপন্ন হয় না এবং কখন বা সেই সেই সৃষ্টির প্রত্যেক সৃষ্টিতেই তাহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ এ সকলই মায়া, এ মায়ার আদি এবং অন্ত একে-বারেই নাই। এই প্রভূত ভূতপরম্পরা বীজরাশির ন্যায় পুনঃপুনঃ পূর্য্যমাণ হইয়াও অজস্র বিপর্য্যস্তভাব ধারণ করিতেছে।

হে রাঘব! কালরূপ মহাসাগরের সৃষ্টিরূপ তরঙ্গরাশি কখন বা পূর্ব্বানু-রূপ সন্নিবেশানুসারে এবং কখন বা ভিন্ন ভিন্ন রূপেই বারম্বার আবির্ভূত হইতেছে। কিন্তু যাঁহার অন্তঃকরণ সমাহিত এবং অজ্ঞানজনিত বিকল্পজাল তিরোহিত হইয়া যায়, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের মন কখনই ঐ সকল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধভাব ধারণ করে না। তাঁহারা আবরণের অপগমবশতঃ পরমোত্তম শান্তিসুধায় সন্তৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সৌম্য! সাগরের সলিল ও তরঙ্গ এ দুইটী আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া ধারণা হইলেও প্রকৃতপক্ষে পরস্পর যেমন সমান, সেইরূপ মুনিগণের সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই তুল্য, কিছুই প্রভেদ নাই। সদেহমুক্তিই হউক বা বিদেহমুক্তিই হউক, মুক্তি কখন বিষয়ের অধীন নয়। যিনি ভোগাস্বাদন করেন না,—তাদৃশ ব্যক্তির বিষয়রসজ্ঞান কেমন করিয়া হইবে? আমরা স্বীয় স্বীয় কল্পনাবশতই এই জীবন্মুক্ত মুনিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাসকে কেবল ঘটপটাদি পদার্থের ন্যায় সম্মুখভাগে অবলোকন করিতেছি; কিন্তু ইঁহার অন্তরাশয় কিছুই আমরা পরিজ্ঞাত নহি। হে রাম! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেমন জলের তরঙ্গাবস্থা ও নিশ্চলাবস্থা এ উভয় অবস্থাতেই যে জল, সেই জল ব্যতীত অন্য কোন প্রভেদ থাকে না, সেইরূপ সদেহমুক্ত এবং বিদেহমুক্ত ইহাঁরা উভয়েই বোধস্বরূপ; ইহাঁদের মধ্যেও কোন প্রভেদই বিদ্যমান নাই। দেখ, বায়ু যেমন স্পন্দযুক্তই হউক, আর স্পন্দহীনই হউক, যে বায়ু সেই বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ সদেহমুক্তই হউন্ কিংবা বিদেহমুক্তই হউন, উভয়ই সমান; উভয়ের মধ্যে অল্পমাত্রও প্রভেদ বর্ত্তমান নাই। আমি এবং বেদব্যাস আমাদের সদেহমুক্তি বা বিদেহমুক্তি পরমার্থদৃষ্টির বিষয় নহে। কিন্তু দ্বৈতহীন জীবব্রহ্মের অভিন্নতাই অস্মদীয় পরমার্থদৃষ্টির বিষয়ীভূত রহিয়াছে। অতএব হে রঘুনাথ! তুমি এক্ষণে সংশয়হীন হইয়া মৎকর্ত্তৃক উপদিশ্যমান শ্রবণভূষণ অজ্ঞানান্ধকারনাশন পরম জ্ঞান শ্রবণ কর।

হে রঘুনন্দন! ইহ সংসারে যথাযথরূপে পুরুষকার প্রয়োগ করিলে, সকলেই সর্ব্বদা সকল বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিলে চন্দ্র হইতে আনন্দসন্দোহজনক সুশীতল কিরণের ন্যায় হৃদয়াকাশে যে কামক্রোধাদি সর্ব্বসন্তাপহর শীতল আহ্লাদকর জীবন্মুক্তিসুখ সমুদিত হয়, তাহা একমাত্র পুরুষকার হইতেই সংঘটিত হইয়া

থাকে; তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপেই তাহার সম্ভাবনা হয় না। পুরুষকার যে গমনভোজনাদি ক্রিয়া দ্বারা দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তি বা তৃপ্তি-লাভাদি সম্পাদিত করে, তাহা প্রত্যক্ষতই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দৈবই ফল প্রদান করে, ইহা মন্দবুদ্ধি মূঢ়জনেরই কল্পনা। বাস্তবিক দৈব নামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই; কেন না, ভাবিয়া দেখিলে তাহাও পূর্ব্বজন্মেরই পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সাধুজনোপদিষ্ট সৎ-পথাবলম্বনে কায়মনোবাক্যে যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার এবং সেই পুরুষকারই সফল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য পুরুষকার উন্মত্তচেষ্টার ন্যায় বিফল।

হে রাম! যে ব্যক্তি যে অর্থ প্রার্থনা করে, সে যদি তদর্থ শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে চেষ্টা করিতে থাকে, তাহা হইলে চেষ্টাকারী ব্যক্তি অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। আর যদি তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, তবে অর্দ্ধপথ হইতেও নিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব হয় না। ভাবিয়া দেখ, ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য বশতঃ যে ইন্দ্রত্বের এত গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত, কোন এক প্রাণিবিশেষই পুরুষকারনামক প্রযত্নবলে সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন এক প্রাণিবিশেষ পুরুষকারনামক প্রযত্নপ্রভাবে পদ্মাসনে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কোন এক প্রাণিবিশেষ স্বীয় শ্রেষ্ঠতম পুরুষকার-বলে গরুড়ধ্বজ রূপে পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কোন এক প্রাণি-বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নবলে অর্দ্ধনারীশ্বর চন্দ্রার্দ্ধচূড়রূপে শোভমান রহিয়াছেন।

হে রাঘব! এই যে পুরুষকারের কথা কহিলাম, ইহা দুই প্রকার; প্রাক্তন পুরুষকার এবং ঐহিক পুরুষকার। এই দ্বিবিধ পুরুষকারের মধ্যে ঐহিক পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন পুরুষকারকে অতি শীঘ্রই অভিভূত করিতে পারা যায়। প্রাক্তন পুরুষকারের কথা ত সামান্য কথা, সহায় ও উৎসাহসম্পন্ন যত্নশীল দৃঢ়ভ্যাসপরায়ণ পুরুষগণ সুমহান্ সুমেরুপ্রভৃতি শৈলকুলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যে সকল পুরুষেরা শাস্ত্রশাসিত পৌরুষসাধনে তৎপর হয়, তাহাদিগের পুরুষকারই অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। অন্যথা শাস্ত্রগর্হিত পুরুষকারে কখন সুফল

ফলে না; তাহাতে কেবল অনর্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ অশাস্ত্রীয় প্রযত্নবশতঃ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া মানুষকে এমন একটী দুরবস্থায় উপনীত হইতে হয় যে, তাহাতে তাহার স্বীয় হস্তপ্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরেও স্বাধীনতার অভাব হইয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ পুরুষের পক্ষে অঙ্গুল্যগ্রসঙ্কোচনে একবিন্দু জল উত্তোলন করিয়াও মুখে নিক্ষেপ করা সাধ্যায়ত্ত হয় না। আবার কোন কোন পুরুষ শাস্ত্রসঙ্গত সুনিয়ম সুদৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করত এতদূর ঐশ্বর্য্যদশায় উপনীত হয় যে, পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে বিভাগ করিয়া দিতে গিয়া এই সদ্বীপা, সসাগরা সভূধরা বসুন্ধরাও তাহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিলে সমুদয় সিদ্ধিই অদূরবর্ত্তিনী হয়।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! প্রভা যেমন শ্বেতপীতাদি বিভিন্ন বর্ণবিকাশের প্রতি কারণ, সেইরূপ প্রথমতঃ একমাত্র প্রবৃত্তিই শাস্ত্রানুসারে ব্যবহারপরায়ণ অধিকারিগণের সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির সাধন। যে পুরুষ শাস্ত্রবিহিত বিধির ব্যতিক্রম করত স্বেচ্ছাচারে পুরুষার্থসাধনে সমুদ্যত হয়, তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটে না, প্রত্যুত মত্তচেষ্টার ন্যায় সে উদ্যম ব্যর্থ ও মোহেরই হেতু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাহার অভিলাষে যেরূপ যত্ন করে, সে তাহার তদনুরূপই ফল প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্বীয় স্বীয় কর্ম্মই দৈব, তদ্ভিন্ন অন্য দৈব নাই। এই পুরুষকার আবার শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়ভেদে দ্বিবিধরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে যে পুরুষকার শাস্ত্রসঙ্গত, তাহাতেই পরমার্থ সাধিত হইয়া থাকে এবং তদ্ব্যতিরিক্তি অন্য অশাস্ত্রীয় পুরুষকার ফলোপধায়ক হয় না, তাহা অনর্থেরই সমুদ্ভাবন করে।

প্রাক্তন ও ঐহিক এই দ্বিবিধ পুরুষকারই সর্ব্বদা সমবিষমভাবে মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছে। পরন্তু ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষকার সাতিশয় হীনবীর্য্য, সেই পরাভূত হয়, আর যে সমধিক বলসম্পন্ন, তাহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে ঐহিক কর্ম্ম সৎকর্ম্মের সহায়তায় সত্বরই প্রাক্তনকে পরাভূত করিতে পারে, শাস্ত্রশাসিত পুরুষকারসহকারে সকলেরই সেইরূপভাবে যত্ন করা উচিত।

হে রাঘব! আবার বলি, উক্ত উভয়বিধ পুরুষকারই সমবিষমভাবে মেষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে; কিন্তু তন্মধ্যে যে পুরুষকার সাতিশয় শক্তিশালী, তাহারই বিজয়লাভ সর্ব্বদা সম্ভাবিত হয়। যে স্থলে শাস্ত্রসঙ্গত পুরুষকারের অবলম্বন করিলেও অনর্থপ্রাপ্তি ঘটে, তথায় বুঝিতে হইবে, জন্মান্তরীয় স্বীয় দুষ্কর্ম্মই বলবদ-নিষ্টবিধায়ক রহিয়াছে; তখন তাহাতে হতাশ্বাসতার বশবর্ত্তী না হইয়া দৃঢ়তর পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক দন্ত দ্বারা দন্ত চূর্ণনের ন্যায় শুভজনক ঐহিক কর্ম্মবলে অশুভফলোন্মুখ প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মকে পরাজয় করিবে। কোন-রূপ প্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তখন যদি মনোমধ্যে এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় যে, 'প্রাক্তন পুরুষকারই আমাকে ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে' তবে তদ্দণ্ডেই বলপূর্ব্বক সে বুদ্ধিকে দূরীভূত করিয়া দিবে; কেন না, প্রত্যেক পুরুষকারের নিকট সে বুদ্ধির আধিক্য একেবারেই নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐহিক পুরুষকার দ্বারা অশুভজনক প্রাক্তন পুরুষকার দূরীভূত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ঐহিক সুপৌরুষের প্রতি প্রযত্ন করা বিধেয়। যেমন এতদ্দিসীয় লঙ্ঘনাদি দ্বারা পূর্ব্বপূর্ব্বদিবসীয় অজীর্ণাদি দোষ প্রশমিত হইয়া যায়, তদ্রূপ অদ্যতন সুপৌরুষ দ্বারাও প্রাক্তন দোষ খণ্ডিত হইয়া থাকে। অতএব স্বকীয় উদ্যমশীল বুদ্ধিপ্রভাবে জন্মান্তরীয় দুরদৃষ্টকে দূরীভূত করিয়া আপনাকে সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং শমদমাদি সম্পদের উদ্দেশে সর্ব্বদা যত্ন করিবে।

হে রঘুনন্দন! উদ্যমাভাবে গর্দ্দভের ন্যায় না হইয়া শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্য সর্ব্বথা উদ্যত হওয়া উচিত। উদ্যমবলশালী হর্য্যক্ষ যেমন বিপক্ষকৃত পিঞ্জরবন্ধন হইতে নিরাপদে নির্গত হয়, তদ্রূপ এই

সংসারকুহর হইতেও সকলেরই বলপূর্ব্বক বহির্গমন করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন স্বীয় কলেবর নশ্বর বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিবে। পশুতুল্য মূঢ়ভাব পরিহার করিবে এবং সাধুজনসমুচিত সৎকর্ত্তব্যের সম্পাদনে সমুদ্যত হইবে। ব্রণরস-সমাস্বাদী কীটের ন্যায় গৃহে থাকিয়া কমনীয় কামিনী-সম্ভোগ বা অন্নপানাদি আপাতমনোরম বিষয়রস আস্বাদন করিয়া পুরুষার্থ-সাধন স্বীয় যৌবন ভস্মীভূত করা উচিত নহে। শুভ পৌরুষ অবলম্বন করিলে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অশুভ পৌরুষ আশ্রয় করিলে অশুভ ফলই ঘটে; সুতরাং জানা উচিত যে, দৈব নামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যে পুরুষ প্রত্যক্ষপ্রমাণ গ্রহণ না করিয়া অনুমানমাত্র অবলম্বন করে, তাদৃশ ভ্রান্ত পুরুষ স্বকীয় ভুজযুগলও ভুজগযুগলবৎ অবলোকন করিয়া পলায়নপর হইয়া থাকে। 'আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই সংঘটিত হইবে' এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক যে সকল মূঢ়পুরুষেরা পুরুষকারপ্রয়োগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, লক্ষ্মীদেবী তাদৃশ পুরুষকারহীন অদৃষ্টমাত্রবাদী পুরুষগণের মুখসন্দর্শনেও বিরত হইয়া থাকেন। অতএব মুমুক্ষু পুরুষেরা স্বীয় পুরুষকারোপরি নির্ভর করিয়া পূর্ব্বক্ষণে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকপ্রভৃতি সাধনচতুষ্টয় সমাশ্রয় করিবে। অতঃপর বিবেকোদয়ে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সমালোচনা করিবে। যাহারা শাস্ত্রানুসারে স্বীয় মানসে শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদি দ্বারা পরমার্থভূত আত্মতত্ত্বের চিন্তা করে না, তাদৃশ পুরুষার্থসাধনবিমুখ মূঢ়মতি মানবনিবহের ভোগলিপ্সা কদাপি প্রসংশনীয় নহে, তাহা সর্ব্বথা ধিক্কারেরই যোগ্য।

হে রাম! শাস্ত্রীয় পুরুষকার যে অনন্তকাল অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। কেন না, আত্মসাক্ষাৎকারোদয় পর্য্যন্তই তাহার অবধি নিরূপিত রহিয়াছে। আর আত্মসাক্ষাৎকার বিপুল পরিশ্রমেরও অপেক্ষা করে না; কেন না, মহাযত্ন করিলেও প্রস্তর হইতে কখনই রত্ন লাভ করা যায় না। ফলতঃ সময়ে স্বয়ংই তিনি সাক্ষাৎ হইয়া থাকেন। সুতরাং পুরুষার্থ কখন অনবধি বা অপরিমাণ নহে। ঘটপটাদির যেমন পরিমাণ আছে, তদ্রূপ পুরুষার্থেরও আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই পরিমাণ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। এই পুরুষার্থ যথাবিধানে সৎশাস্ত্রের সমালোচনা,

সাধুপুরুষসম্প্রদায়ের সংসর্গ এবং সদাচারের অনুষ্ঠান, এই সমুদায়ের সহ-যোগেই ফলবিধায়ক হয়; আর ইহার বৈপরীত্য হইলে অনর্থপাতেরই হেতু হইয়া থাকে, ইহাই পুরুষার্থের স্বভাব।

হে রঘুবর! বাস্তবিকপক্ষে মানবেরা পুরুষকারের ঈদৃশ স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়া যদি তদনুসারে ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সকলেই সর্ব্ববিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে, কাহারও যত্নফলের ব্যভিচার ঘটে না। দেখ, নলহরিশ্চন্দ্রপ্রভৃতি অন্যান্য কত শত পূর্ব্বতন মহাপুরুষ পূর্ব্বে দুর্ব্বিপাকবশতঃ দুর্নিবার দৈন্যদারিদ্র্যকৃত দুর্ব্বিষহ দুঃখদহনে দগ্ধ হইয়াও পরে পুরুষার্থপ্রভাবে দেবেন্দ্রতুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি শৈশব হইতে বিশেষরূপে সৎশাস্ত্রের সমালোচন, সাধুসংসর্গে বাস, সদ্-গুরুর সেবা এবং সদ্‌গুণের উপার্জ্জন, এই সমুদায় দ্বারা পুরুষার্থ অবিচল করিতে পারা যায়, তবে তাহাতেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ আমি পুরুষকারসম্বন্ধে তোমার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা অস্মদাদি জীবন্মুক্তগণ কর্ত্তৃক বহুবার প্রত্যক্ষীকৃত, আকর্ণিত, অনুভূত, অধিক কি, সম্পাদিতও হইয়াছে। তবে এই সকল ফল যাহারা দৈবাধীন বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি অথবা কুবুদ্ধিশালী।

হে ধীরচেতা রাম! পুরুষার্থের এবম্বিধ মহাসামর্থ্য থাকিলেও একমাত্র আলস্যই ইহার প্রধান প্রতিপক্ষ। তুমি ভাবিয়া দেখ, আলস্যই যদি যথার্থপক্ষে অনর্থের হেতু না হইত, তাহা হইলে জগতীতলে কোন্ ব্যক্তি না ধনাঢ্য হইত? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা না পণ্ডিত হইতে পারিত? বাস্তবিক এক আলস্যদোষেই এই সসাগরা ধরা বহুতর নরপশু ও বহুতর দরিদ্র লোকে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতএব কল্পিতকেলি-বিলোল বাল্যকাল অতীত হইলে পদপদার্থ-পরীক্ষায় ব্যুৎপত্তিশালী হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সাধুজনগণের সংসর্গ সমাশ্রয় করত সকলেরই স্বীয় শান্তিপ্রভৃতি গুণ ও রাগাদিদোষসমবায়ের বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

দেবদূত মহর্ষি বাল্মীকিকথিত এই সকল কথা কহিয়া রাজা অরিষ্ট-নেমিকে কহিলেন,—হে রাজর্ষে! বাল্মীকিমুনি ভরদ্বাজকে বশিষ্ঠকথিত এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান হইল। সায়ংকাল

সমাগত হইল। ভগবান্ দীধিতিমান্ অস্তাচল অবলম্বন করিলেন। ভরদ্বাজাদি মুনিসমিতি বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া সায়ন্তন সন্ধ্যোপাসনাদি সম্পাদন করিতে গমন করিলেন এবং যামিনীর অবসানে নবোদিত দিবাকর-করসহ পুনরায় বাল্মীকিসমীপে সমাগমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যখন দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাক্তন পৌরুষভিন্ন দৈব নামে অন্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, তখন সেই দৈবকে দূরে পরিহার করত সাধুজনসংসর্গ ও সৎশাস্ত্রের সমালোচন দ্বারা সংসার হইতে বলপূর্ব্বক জীবকে উদ্ধার করা উচিত। ফলসাধনবিষয়ে যেরূপ যেরূপ প্রযত্ন করা যাইবে, ফলও তদনুরূপই সমুৎপন্ন হইবে। এইরূপ প্রযত্নই পুরুষকার ও দৈবনামে অভিহিত। লোকে যেমন দুঃখের সময় দুঃখিত হইয়া 'হা কষ্ট' এইরূপ বলিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই 'হা অদৃষ্ট' এরূপ বাক্য প্রয়োগ করে। ফলতঃ প্রাক্তন স্বকর্ম্ম ভিন্ন দৈবনামে আর কিছুই বিদ্যমান নাই। বলবান্ যেমন বালককে পরাভূত করিতে পারে, সেইরূপ ঐহিক কর্ম্মই এই দৈবকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যেমন এতদ্দিবসীয় প্রায়শ্চিত্তাদি সদাচার দ্বারা পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিবসীয় অসদাচার সত্বর শুভরূপে পরিণত করা যায়; তদ্রূপ ঐহিক সৎকর্ম্মপ্রভাবেও প্রাক্তন দুষ্কর্ম্ম মঙ্গলজনক করা যাইতে পারে।

হে রাঘব! যাহারা লোভবলে লাম্পট্যযুক্ত হইয়া সেই প্রাক্তন কর্ম্ম পরাজয় করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, সেই সকল অদৃষ্টবাদী দীনহীন মানবেরা প্রকৃতপক্ষে পামর বা মূঢ় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যে স্থলে দৈবক্রমে পুরুষকারকৃত কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, তথায় জানিতে হইবে, কর্ম্মনাশয়িতা পুরুষের পুরুষকার আরও বলবত্তর। যথায় এক বৃন্তস্থিত ফলদ্বয়ের মধ্যে একটী রসশূন্য দেখা যায়, তথায় বুঝিবে, ফলরসভোক্তার পূর্ব্বাকৃত কর্ম্মই

সেই ফলরসবিঘাতের নিমিত্ত স্ফুরিত হইয়াছিল। হে রাম! যে স্থলে জাগতিক প্রসিদ্ধ পদার্থ সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তথায় ক্ষয়কর্ত্তারই প্রযত্নের প্রবলতা জানিতে হইবে। ফলতঃ ঐহিক ও প্রাক্তন এই দ্বিবিধ পুরুষকার পরস্পর মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকে; তন্মধ্যে যে সমধিক বলশালী হয়, সেই ক্ষণমধ্যে জয়ী হইতে পারে।

রাজবংশের বিলোপ হইলে যদি মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া মাঙ্গলিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মাতঙ্গ দ্বারা জনৈক ভিক্ষুকতনয়কে আনয়ন করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে, তবে সে বিষয়ে মন্ত্রী ও পৌরপ্রভৃতিরই প্রযত্নের মহাবল বলিতে হইবে। যেমন পুরুষগণ পৌরুষবলে অন্ন গ্রহণ করিয়া দন্ত দ্বারা বিচূর্ণিত করে, তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তিও পুরুষকারপ্রভাবে অন্য ব্যক্তিকে বিদলিত করিয়া থাকে। পুরুষকারপরাঙ্মুখ ক্ষুদ্রহৃদয় মানবেরাই যত্নশালী মহাপুরুষগণের উপভোগ্যস্বরূপ হয় এবং তাহারা মৃৎপিণ্ডের ন্যায় মহতের ইচ্ছানুসারে যে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে থাকে।

ক্ষমতাশালী পুরুষের পুরুষকার দৃশ্যই হউক আর অদৃশ্যই হউক, নির্ব্বোধ শক্তিহীন ব্যক্তিগণ তাহাকেই আপন মনে দৈব বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি বিদ্যমান আছে; তাহারা আবার আপনা অপেক্ষা হীনশক্তি ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টতই বুঝিতে হইবে যে, দৈব একেবারেই নাই। শাস্ত্র, অমাত্য, হস্তী ও পৌরগণ, ইহাদিগের স্বাভাবিকী একতাবুদ্ধিই পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুকপুত্রের রাজত্বের বা প্রজাস্থিতির কর্ত্রী ও ধারয়িত্রী। কোন কোন স্থলে মঙ্গলহস্তী যে ভিক্ষুককেও রাজপদে অধিষ্ঠিত করে; সে বিষয়ে ভিক্ষুকেরই প্রাক্তন পুরুষকার বলবৎ কারণ বলিতে হইবে।

হে রাম! কোন কোন সময়ে ঐহিক কর্ম্ম প্রবল হইয়া প্রাক্তন কর্ম্ম বিনাশ করিয়া থাকে, আবার কখন কখন বা প্রাক্তন কর্ম্ম প্রবল হইয়া ঐহিক কর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যত্নাতিশয়শালী হইয়া অলসতা পরিহার করিতে পারে; সেই ব্যক্তিই সর্ব্বথা জয় লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রাক্তন ও ঐহিক এই উভয়ের

মধ্যে ঐহিকই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া ইহাকেই সমধিক বলশালী বলা যায় এবং বলবান্ যুবাপুরুষের হীনবল বালক নিগ্রহের ন্যায় একমাত্র প্রযত্নই দৈবকে অভিভূত করিতে পারে। যে স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষক সম্বৎসর পর্য্যন্ত বিপুল যত্নে শস্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আর মেঘ উদিত হইয়া এক দিনেই তাহা বিনাশ করিয়া দিল; তথায় জানিতে হইবে, উহা কেবল মেঘেরই পুরুষার্থ এবং অধিক যত্নশালীর জয়লাভ সর্ব্বত্রেই সুনিশ্চিত। এইরূপে ক্রমোপার্জ্জিত অর্থ যদি কোন ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত খিন্ন হওয়া উচিত নহে। তখন সকলেরই এইরূপ ধারণা করিতে হয় যে, যাহাতে আমার ক্ষমতা বা শক্তি নাই; সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে বিষয় আমার শক্তির অনায়ত্ত, তন্নিমিত্ত নিত্য যদি দুঃখ করিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকে মারিতে পারিলাম না বলিয়াও প্রত্যহই দুঃখিতমনে রোদন করা কর্ত্তব্য।

হে রাঘব! আমি তোমাকে এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, দেখ, এ জগতে ভাবসকল দেশকালাদি অনুসারেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। পরন্তু যে ব্যক্তি সাতিশয় যত্নপরায়ণ হয়, তাহারই ভাগ্যে জয়লাভের সম্ভাবনা সর্ব্বপ্রকারে সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞার নির্ম্মলতা সম্পাদনপূর্ব্বক সর্ব্বজনেরই সংসার-সাগরের পরপারে গমন করা বিধেয়। পুরুষরূপ কাননমধ্যে ঐহিক ও প্রাক্তন পুরুষকাররূপ দুইটী ফলোৎপাদক পাদপ রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে যেটীকে বিশেষরূপ পরিপালন করা যায়, সেইটীই সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুভকর্ম্মপ্রভাবে অতিতুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম্ম নির্ম্মূলিত করিতে পারে না, সেই পশুতুল্য অজ্ঞব্যক্তি স্বীয় সুখদুঃখে নিতান্তই অসমর্থ; দুঃখের সমুচ্ছেদনে বা সুখের সমুৎপাদনে তাহার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই; সে ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া স্বর্গ বা নরকে গমন করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু তাহার পরাধীনতা মুহূর্ত্তের জন্যও অপগত হয় না; সে নিশ্চয় নিয়তপরাধীন পশুর ন্যায় কালাতিপাত করে।

হে রাম! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচারে নিরত থাকিয়া প্রযত্নকৌশলাতিশয়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে; সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পঞ্জর হইতে মৃগেন্দ্রের

নির্গমনের ন্যায় এই জগন্মোহ হইতে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে পুরুষ পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়া 'দৈবই আমাকে প্রেরণ করিতেছে,' এইরূপ অনর্থকর কুকল্পনায় নিশ্চিন্ত ও নিরুৎসাহভাবে অবস্থান করে; সেই পৌরুষপরাঙ্মুখ অধমকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমাদের নিকট সহস্র সহস্র ব্যবহারপরাম্পরা আগমন ও প্রতিগমন করিতেছে, কিন্তু সেই সকলের মধ্যে রাগদ্বেষ পরিহার করত শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করাই উচিত। যে পুরুষ শাস্ত্রানুসারে স্বীয় মর্য্যদা উল্লঙ্ঘন করে না, রত্নাকরে রত্নরাশির ন্যায় তাহার নিকটেও সমুদায় অভীষ্টই উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখনিবৃত্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেই সমুদায় কর্ম্মে যে শাস্ত্রযন্ত্রিত একান্ত প্রযত্নপরায়ণতা,—তাহাকেই পণ্ডিতেরা পৌরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাহাই যথার্থ পরম পুরুষার্থ লাভের হেতু হয়। সুধীগণ শুশ্রূষা, শ্রবণাদি ক্রিয়া, সাধু-সংসর্গ ও সৎশাস্ত্রের সমালোচন এই সমুদায়ে স্বীয় বুদ্ধি বিশুদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা দোষরাশি দূরীভূত করত আত্মোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রঘুবংশসুধাংশো বিজ্ঞ রাম! বিজ্ঞগণ, অজ্ঞানকৃত বৈষম্য নিবৃত্তি নিমিত্ত যে অসীম অমন্দ আনন্দ সংঘটিত হয়, তাহাকে পরমার্থ এবং যাহার সমালোচনায় সেই পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাকেই সর্ব্বদা সাধুজন-সেব্য সৎশাস্ত্র বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন দেবলোক হইতে ইহলোকে আসিয়া যে ভুক্তাবশিষ্ট পুণ্যফল উপভোগ করা যায়; তাহাই প্রাক্তন পুরুষকার এবং তাহাই দৈব নামে অভিহিত। মূর্খ পুরুষেরা অজ্ঞানতাবশতঃ যে দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে, সে নিমিত্ত তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু যাহারা পৌরুষকে অমান্য করিয়া মূঢ়কল্পিত দৈবকে মান্য করিয়া থাকে; তাহারাই সর্ব্বথা নিন্দার ভাজন এবং তাহারাই অচিরকাল মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদা স্বীয় পুরুষকারপ্রভাবেই ঐহিক ও পারলৌকিক হিত সাধিত হয়। যেমন অদ্যতন সৎকর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্ব দিবাতন দুষ্কর্ম্ম শোভিত হইয়া থাকে; সেইরূপ ইহকালকৃত সৎক্রিয়া দ্বারাও প্রাক্তনী ক্রিয়া শোভা পাইয়া থাকে। সুতরাং যে পুরুষ স্বীয় পৌরুষে সাধুকার্য্যে লিপ্ত হয়, সে হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায় তাহার

ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা মূঢ়তায় সমাচ্ছন্ন, তাদৃশ পুরুষেরা প্রত্যক্ষ ফল পরিহারপূর্ব্বক দৈবমোহে মগ্ন হইয়া থাকে।

হে শুভাশয়! তুমি যাবতীয় কার্য্যকারণবিবর্জ্জিত স্বীয় বিকল্পবলোপ-কল্পিত মিথ্যাভূত সেই দৈবের অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় পুরুষকারকেই অবলম্বন কর। বেদস্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্র ও সাধুদিগের আচরণ, এই সমুদায়ে বিস্তীর্ণ দেশধর্ম্ম ও নিয়মাদি দ্বারা যে চিরপ্রসিদ্ধ চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানরূপ ফল ফলিত হয়, তাহা হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে, প্রথমে তৎসাধনে ইচ্ছা ও তৎপরে তন্নিমিত্ত শারীরিক চেষ্টা সমুৎপন্ন হয় এবং এইরূপ চেষ্টাকেই বিচক্ষণগণ পৌরুষ নামে অভিহিত করেন। পুরুষগণ এবম্বিধ পুরুষত্বকে একমাত্র পরমার্থসিদ্ধিতেই সফল বলিয়া বিবেচনা করত প্রথমতঃ সতত প্রযত্নপরায়ণ হইবে এবং তৎপরে সৎশাস্ত্র, সাধু ও সুধীবর্গের সংসর্গদ্বারা সেই প্রযত্নপরতার সফলতা বিধান করিবে। এই আত্মপৌরুষ নিত্য নিত্য আচরিত হইলে দৈবকে অভিভূত করা যায়, দৈব এবং পুরুষকারের এরূপ বলাবলবিচারে সমর্থ সকল ব্যক্তিরই শমদমাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া সাধুজন-সেবায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সমুদ্যত হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

সংসারী জীব ফলাবিসংবাদি ঐহিক পৌরুষকেই অর্থসিদ্ধির হেতু-রূপে বিদিত হইয়া সতত সন্তোষস্বভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্ বিদ্বান্‌গণের সেবারূপ অমোঘ মহৌষধ দ্বারা জন্মপরম্পরারূপ মহাব্যাধির শান্তি-বিধান করুক।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যাহাতে ভবধামে আসিয়া পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়, ব্যাধিবিহীন অল্পমনঃকষ্টবিশিষ্ট দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীবগণের চিত্তসমাধানের নিমিত্ত সেইরূপই প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়। যিনি পুরুষকারবলে দৈবকে নিরাকৃত করিতে অভিলাষী হইয়া

থাকেন, তিনি ইহপর উভয়লোকেই সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ। যে সকল কাপুরুষেরা কেবল দৈবমুখপ্রেক্ষী হইয়া অবস্থান করে, সেই আত্ম-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সমস্তই বিনাশ করিয়া থাকে। তাহা-দিগের ধর্ম্মার্থাদিলাভ কদাপি সংঘটিত হয় না। সংবিৎস্পন্দ, মনঃস্পন্দ ও ইন্দ্রিয়স্পন্দ* এই তিনটী পুরুষার্থের রূপ এবং ইহা হইতেই অভীষ্টফল সমুদিত হইয়া থাকে। চিত্তে যাদৃশ সংবেদন হয়, চিত্ত তদ্রূপই স্পন্দিত হয়; শরীরচেষ্টাও তদনুরূপ হইয়া থাকে এবং তৎপরে সে সমুদায়ের ফলভোগও তাদৃশই ঘটিয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতে যে যে বিষয়ে যেরূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা যায়, সময় উপস্থিত হইলে ফললাভও তদনুরূপই সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলতঃ কুত্রাপি দৈব দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহজগতে পৌরুষই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দেখ, একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবেই ভগবান্ বৃহস্পতি দেবগণের এবং শুক্র দৈত্যেন্দ্রগণের গুরুরূপে বিরাজ করিতেছেন। হে সাধো! এইরূপে কত শত মহাপুরুষ প্রথমতঃ দুরন্ত দৈন্যদারিদ্র্যজনিত দারুণ দুঃখে নিপীড়িত হইয়া পরে পুরুষকারনামক প্রযত্নবলে দেবেন্দ্র-তুল্যতাও প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার, নহুষাদি নরপতিগণ নানাবিধ অভূত-পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যরাশির অধীশ্বরতা প্রাপ্ত হইয়াও স্বীয় পৌরুষদোষেই নরকের অতিথি হইয়াছিলেন। এইরূপে এ সংসারে সহস্র সহস্র ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ নিজ পৌরুষদোষে দারুণ দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইয়াছেন এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি পৌরুষবলে উত্তম ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন।

শাস্ত্রসমালোচনা, গুরূপদেশ ও স্বীয় পরিশ্রম, এই তিনটীর সাহায্যেই সর্ব্বত্র পুরুষার্থসিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু দৈবসাহায্যে কুত্রাপি কোন সিদ্ধিই সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। চিত্ত যদি অশুভবিষয়ে সমাবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক শুভবিষয়ে পরিচালিত করিবে। ইহাই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। হে বৎস! যাহা মঙ্গলকর, যাহা অপায়-বিবর্জ্জিত এবং যাহা যথার্থ সত্য, প্রযত্নসহকারে সেই বিষয়েরই ব্যবহার

---

* সংবিৎস্পন্দ—তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ; পরে মনঃস্পন্দ—পুরুষার্থসাধনে বলবতী ইচ্ছা; তৎপরে ইন্দ্রিয়স্পন্দ—অঙ্গসঞ্চালনের নিমিত্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি।

কর; গুরুজনের ইহাই উপদেশ। আমি যেরূপ প্রযত্ন করিব, ফলও শীঘ্রই তদনুরূপ প্রাপ্ত হইব, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বশেই আমি পুরুষকার হইতে অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি; বাস্তবিক দৈব হইতে আমি কিছুই লাভ করি নাই। পৌরুষপ্রভাবেই পুরুষের সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি ও বুদ্ধিবিক্রম বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। দৈব মাত্র অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের দুঃখসময়ে আশ্বাসবাক্য। পুরুষগণের ইচ্ছামাত্রেই দেশদেশান্তর গমন প্রভৃতি পুরুষকার যে ফলবান্ হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষপ্রমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভোক্তা, সে-ই তৃপ্ত হয়, যে ভোজন করে না, তাহার তৃপ্তি হয় না। যে গমনশীল, সে-ই গমন করে, যে গমন-হীন, তাহার গতি হয় না। যে বক্তা, সে-ই কথা কহে, যে অবক্তা, সে বলে না; সুতরাং দেখা যায়, মানবের পুরুষকারই সফল।

সুধীগণ পুরুষকারবলেই বিনাক্লেশে দুরন্ত সঙ্কট হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু দৈবমুখপ্রেক্ষী হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিলে কস্মিন্-কালেও সঙ্কটত্রাণ সম্ভবিবে না। যে ব্যক্তি যেরূপ প্রযত্ন প্রকাশ করে, সে তদনুরূপই ফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নিরুদ্যম হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করিলে কেহই কোন ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না।

রাম! শুভ পুরুষকারে শুভফল এবং অশুভ পুরুষকারে অশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি ইহা ধারণা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পার! দেশকালানুসারে পুরুষকার প্রয়োগ করত কোন কোন ব্যক্তির অতিশীঘ্র ও কোন কোন ব্যক্তির বা কালবিলম্বে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, মন্দ-মতি মানবেরা তাহাকেই দৈব বলিয়া ধারণা করে। কেহ কখন দৈবকে দর্শন করে নাই এবং লোকান্তরেও দৈব বলিয়া কিছুই বিদ্যমান নাই। স্বর্গলোকে যে কর্ম্মফল ভোগ হয়, মনীষিগণ তাহাকেই দৈবনামে নির্দ্দেশ করেন। লোকসকল ইহলোকে জন্মিতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে এবং জরাগ্রস্ত হইতেছে; কিন্তু ইহাতে বাল্য, যৌবন বা জরা এ সমুদায় যেমন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, দৈবের ত সেইরূপ প্রত্যক্ষতা হয় না।

পরমার্থপ্রাপক কার্য্যে যে একান্ত যত্নপরতা, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পৌরুষ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন এবং তাহাতেই সমুদায় সিদ্ধি সমীপবর্ত্তিনী

হইয়া থাকে। দেখ, এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন, হস্তে করিয়া দ্রব্য ধারণ বা আঙ্গিক ব্যাপার এ সমস্তই পুরুষকারবলে সম্পন্ন হয়; দৈববলে হয় না। যাহাতে অনর্থপ্রাপ্তি ঘটে, সেরূপ কার্য্যে যে প্রযত্নপরতা, তাহা উন্মত্ত-চেষ্টা বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা দ্বারা কোনরূপ সুফল প্রাপ্তিরই সম্ভাবনা নাই। স্পন্দধর্ম্মিণী ক্রিয়া যে স্বার্থসাধন করে, তাহা তাহার স্বভাব। পরন্তু সদ্‌বুদ্ধিশালী পুরুষ সাধুসংসর্গ ও সৎশাস্ত্রের সমালোচনায় স্বীয় বুদ্ধি বিশুদ্ধ করিয়া ক্রিয়া এবং ক্রিয়াফলের উন্নতি-সাধন করিয়া থাকেন। অজ্ঞানজনিত বৈষম্যনিবৃত্তি জন্য যে অসীম আনন্দ লাভ হয়, সুধীগণ তাহাকেই পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেই পরমার্থ যাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যত্নসহকারে সেই শাস্ত্রানুশীলন ও সাধুসেবা করা বিধেয়।

সাধুসংসর্গ ও সৎশাস্ত্রের অভ্যাসবশতঃ সদ্‌বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের বুদ্ধি যথাসময়ে সরসী ও সরসীরুহের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি বাল্যকাল হইতে বিশেষরূপে সাধুসঙ্গম ও সৎশাস্ত্র অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে বিনাক্লেশে হিতজনন স্বার্থসাধন হইতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণু একমাত্র পৌরুষ প্রভাবেই দৈত্যকুল বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন এবং পুরুষকারবলেই অনন্ত ভুবনক্রিয়া সংস্থাপিত ও এই বিশাল জগন্মণ্ডল বিরচিত করিয়াছেন।

হে রঘুনাথ! এ জগতে একমাত্র পুরুষকারই ইষ্টসিদ্ধির কারণ। যাহাতে তরু ও সরীসৃপদিগের দশা প্রাপ্ত হইতে না হয়, তুমি এক্ষণে চিরদিন নিঃশঙ্কভাবে সেইরূপ প্রযত্নই প্রকাশ কর।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! দৈবের কোনরূপ আকার, কর্ম্ম, স্পন্দ বা পরাক্রম নাই। সুতরাং ঐ মিথ্যাজ্ঞানের ন্যায় রূঢ় দৈব যে কি, তাহা যথার্থ পক্ষে নির্ণয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না। ফলতঃ কর্ম্মসমাপনান্তে

ফললাভ হইলে পর 'এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এইরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়,' স্বকর্ম্মের ফললাভ বিষয়ে ইত্যাকার বাক্যই দৈব্যনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দৈব আর কিছুই নহে। যাহাদিগের মতি মূঢ়তায় সমাচ্ছন্ন, তাহারাই ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে ভুজঙ্গজ্ঞানের ন্যায় দৈবের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে স্বীকার করিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্য যেমন বর্ত্তমান সৎকার্য্য দ্বারা অপনোদিত হয়, সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মও ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সৎকার্য্যপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

যে দুর্ম্মতি মূঢ়ানুমানসিদ্ধ দৈবের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সেই দুর্ব্বিবেচক ব্যক্তির 'দৈবক্রমে আমার দেহ দগ্ধ হইবে না,' এইরূপ বিনিশ্চয় করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। অথবা যদি দৈবেরই সমস্তের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? লোকসকল নির্ভাবনায় বসিয়া থাকুক, দৈবই তাহাদিগের স্নানদানাদি নির্ব্বাহ করিয়া দিবে। অথবা অন্যের নিকট শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণের আবশ্য-কতা কি? এবং অন্য কাহাকে শাস্ত্রোপদেশপ্রদানেরই বা প্রয়োজন কি? দৈবই যদি সর্ব্ববিধাতা হয়, তবে সেই দৈবই সকলকে জ্ঞানোপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করিবে ;—সমস্ত ব্যক্তিই নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক্।

সংসারে মৃতব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও স্পন্দহীনতা দেখা যায় না, এবং স্পন্দব্যতিরেকেও ফলপ্রাপ্তি হয় না ; সুতরাং দৈব নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজন। দৈবের কোনরূপ মূর্ত্তি নাই। তাহাকে কোন মূর্ত্তিমান্ পুরুষের সহকারী কর্ত্তা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দৈবকথাটা সম্পূর্ণই বৃথা। যাহা বৃথা, তাহা পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বথা সার্থক পুরুষকার আশ্রয় করাই মঙ্গলাবহ। কিঞ্চিৎ প্রণিধান সহকারে ভাবিয়া দেখ, দৈবের কর্ত্তৃত্ব কুত্রাপি নাই। পুরুষের হস্তদ্বয়মধ্যে লেখনীপ্রভৃতি উপকরণ উপগত হইলে, যুগপৎ হস্তদ্বয় দ্বারা লেখনাদি সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একের কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু পুরুষের হস্তপ্রভৃতি অঙ্গসকল যদি ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা হইলে দৈব কি কখন কাহারও কিছু সম্পাদন করিয়া দেয়? ফলতঃ দৈব দ্বারা কাহারও কোন কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। গমন, ভোজন, শয়ন, উপবেশন, লেখন

খা গ্রহণ ইত্যাদি নিখিল ব্যাপারই একমাত্র পুরুষপ্রযত্নে সিদ্ধ হইয়া থাকে। দৈবের উপর নির্ভর করিলে কিছুই সম্পন্ন হয় না।

এই জগতে নীচাশয় নিকৃষ্ট গোপাল হইতে আরম্ভ করিয়া কৃতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই এই দৈবকে মন ও বুদ্ধির ন্যায় প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং দৈব যে একেবারেই অলীক বা মিথ্যা, ইহাতে কদাপি কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ সমুপস্থিত হইতে পারে না। কর্ম্মসম্পাদিকা বুদ্ধি ও দৈব ইহারা যদি পরস্পর বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে দৈবকল্পনার প্রয়োজন কি, আর যদি ঐরূপ বুদ্ধিকেই দৈব বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি হইতে দৈবের কোন প্রভেদই সম্ভাবিত হয় না। সমানবুদ্ধিসম্পন্ন দুই ব্যক্তি কোন এক কর্ম্মসম্পাদন করিবার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিল, তন্মধ্যে একজনের মনোরথ পূর্ণ হইল, আর অন্য জন তাহাতে হতাশ হইল। এই ফলবৈষম্যের কারণরূপে যদি দৈবকেই কল্পনাবলে প্রমাণিত করিতে হয়, তাহা হইলে পুরুষকারের দোষ কি? পুরুষকারকেই ঈদৃশ ফলবৈষম্যের কারণরূপে কল্পনা কর না কেন? যেমন গগনের সহিত অস্মদাদি বপুষ্মান্ ব্যক্তির সংযোগ সম্ভবে না, সেইরূপ মূর্ত্তি-পরিহীন দৈবের সহিতও কারকান্তরের সংযোগ হয় না। ফলতঃ মূর্ত্তিমান্ পদার্থদ্বয়কেই পরস্পর সংযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। দৈব মূর্ত্তিমান্ নহে; সুতরাং ইহার সংযোগ হওয়া অসম্ভব এবং ইহার অস্তিত্বও অলীক। অথবা যদি দৈবই এই ত্রিজগদ্বাসী জীবসমূহের নিয়োগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে সমস্ত জীবই চিন্তাপরিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকুক, দৈবই তাহাদিগের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিবে। "আমি দৈব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি" ইহা কেবল মনের আশ্বাসনাবাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে; ফলতঃ দৈবনামে কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই।

রাম! ইহা প্রত্যক্ষতই প্রমাণিত হয় যে, যে যে ব্যক্তিই সেই মূঢ়-কল্পিত দৈবের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভাবনায় রহিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তিই অচিরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যাঁহারা প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ, তাঁহারা পুরুষ-কারোপরি নির্ভর করিয়াই উত্তম পদের অধিকারী হইয়াছেন। বাস্তবিক

পক্ষে তুমি বল দেখি, এ জগতে যাঁহারা প্রকৃত শূর, যাঁহারা বিক্রমসম্পন্ন, যাঁহারা প্রতিভাশালী এবং যাঁহারা পণ্ডিত, তাদৃশ ব্যক্তিগণ কি নিমিত্ত দৈবমুখপ্রেক্ষী হইয়া অবস্থান করিবেন? দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া যাহার জীবনকাল অতি দীর্ঘ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলেও সে যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে; তাহা হইলে অবশ্যই দৈবের অস্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিব। অথবা কাল-বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; সে ব্যক্তি যদি অধ্যয়ন না করিয়াই পণ্ডিত হইতে পারে, তাহা হইলেও দৈবের উত্তমতা নিশ্চয়ই মান্য করিব। রাম! এই যে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত মহাপ্রভাব বিশ্বামিত্র মুনিকে দেখিতে পাইতেছ, ইনি দৈবচিন্তা দূরে পরিহার করত একমাত্র পৌরুষবলেই অতি দুর্লভ ব্রাহ্মণত্বও প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরাও পৌরুষপ্রভাবেই মুনিত্ব এবং চিরকালব্যাপী গগনগামিত্ব লাভ করিয়াছি। এইরূপে পুরুষকারবলেই দৈত্যেন্দ্রগণ ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে আপনাদিগের একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আবার সুরেন্দ্রগণও পৌরুষপ্রভাবেই দানবেন্দ্রদিগকে বিদলিত করিয়া এই বিশাল বিশীর্ণ জগন্মণ্ডল তাহাদিগের নিকট হইতে পুনরায় আহরণ করিয়াছিলেন।

হে রাঘব! দেখ, এই পৌরুষযুক্তিবলেই করণ্ডকমধ্যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জল অবস্থান করে; কিন্তু দৈব ইঁহার কারণ নহে। ইহার কারণ সেই পুরুষকার। কেন না, পুরুষেরাই তাহাকে যুক্তিবলে জলধারণযোগ্যরূপে প্রস্তুত করিয়াছে। স্বজনগণের পরিপোষণ, বলপূর্ব্বক শত্রু বিধ্বস্ত করিয়া ধনগ্রহণ, ভোগবিলাসসম্পাদন বা অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্ম্ম এ সমুদায়ের কিছুতেই দৈবের কোন ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব হে শুভমতে রাম! তুমি সমস্ত কার্য্যকারণ-বর্জ্জিত বিকল্প-কল্পিত মিথ্যাভূত দৈবের মুখপ্রেক্ষী না হইয়া মঙ্গলাবহ পুরুষকার অবলম্বন কর।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সমস্ত ধর্ম্মেরই মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, অতএব আমাকে এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি দৈবচিন্তা বাস্তবিক নিরর্থকই হয়, তাহা হইলে লোকে যাহা দৈবনামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা কিরূপ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! জাগতিক যাবতীয় কার্য্যকলাপের একমাত্র পুরুষকার ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাই, জীবগণ পৌরুষবলেই সর্ব্বপ্রকার ফলভোগে সমর্থ হইয়া থাকে। ফলতঃ দৈব তাহার কারণ হইতে পারে না। দৈব কিছুরই কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। দৈবের অস্তিত্ব একেবারেই নাই। দৈব কাহারও কখন নয়নগোচর হয় না এবং উহাকে কেহ সমাদরও করে না; সুতরাং দৈব কেবল মনের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলবান্ পুরুষকার প্রয়োগ করিলে, তাহাতে যে শুভাশুভ ফল সমুৎপন্ন হয়, অজ্ঞানান্ধ জীবগণ তাহাকেই দৈবনামে অভিহিত করে। পুরুষকারবশতঃ সর্ব্বদা যে ইষ্ট বা অনিষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ইষ্টই হউক আর অনিষ্টই হউক অজ্ঞ লোকেরা তাহাকেও দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কেবল পুরুষকার দ্বারাই যে অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা আপতিত হয়; ইহলোকে তাহাই দৈবনামে কথিত।

দৈব শূন্যাকার; সুতরাং সে কোন লোকেরই কিছুই সম্পাদন করে না। সম্যক্‌প্রযুক্ত পুরুষকার দ্বারা শুভাশুভ ফলের অভ্যুদয় হইলে লোকে যে অদৃষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহাই তাহাদিগের দৈব। কর্ম্মফল অধিগত হইলে লোকে যে বলিতে থাকে, 'আমার এই প্রকার মতি হইয়াছিল, আমার এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছিল; সেই জন্য এই ফল লাভ করিলাম' এইরূপ উক্তিও দৈব বলিয়া খ্যাত। আর ইষ্ট অথবা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইলে 'ইহা প্রাক্তন কর্ম্মের ফল' এইপরূ যে আশ্বাসবাক্য তাহাই দৈবনামে কথিত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আপনি প্রথমতঃ প্রাক্তনকর্ম্মকেই দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে আবার কি নিমিত্ত তাহার অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! তুমি সর্ব্ববিষয়ই সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছ; অতএব যাহাতে তোমার [illegible] 'দৈব নাই' বলিয়াই স্থির করিতে পারিবে, আমি তোমাকে তৎসমস্তই এক্ষণে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি; তুমি শ্রবণ কর। মানুষের মনোমধ্যে প্রথমতঃ যে বাসনা সমুদিত হয় তাহাই কর্ম্মে পরিণত হইয়া থাকে। জীবগণ যেরূপ বিষয়ে বাসনান্বিত হয়, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করে। মনোভাব একরূপ ও কর্ম্ম অন্যরূপ এ প্রকার কখন সম্ভব হয় না। যে গ্রামে গমনে প্রবৃত্ত হয়; সে, গ্রাম প্রাপ্ত হয়, আর যে পত্তনগমনে অভিলাষ করে; সে, পত্তনই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, যাহার যেরূপ বাসনা হয়, সে তদ্বিষয়েই প্রতিনিয়ত যত্নপরায়ণ হইয়া থাকে। ফলাভিলাষের আতিশয্যনিবন্ধন পূর্ব্বে প্রযত্নাতিশয়ে যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়; তাহাই পর্য্যায়ক্রমে দৈবশব্দে অভিহিত হইয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তৃগণের সমস্ত কর্ম্মই উক্ত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপচিত স্ববাসনাই কর্ম্ম। বাসনাও স্বীয় কারণ মন হইতে ভিন্ন নহে এবং মনও আত্মা হইতে পৃথক্ নহে।

হে সাধো! তুমি এখন অন্তরে চিন্তা করিয়া দেখ, লোকে যাহাকে দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা কর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে। মন পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারভাবপ্রাপ্ত কর্ম্মের আধার বলিয়া ঐ কর্ম্মও মন ভিন্ন পৃথক্ কিছুই নহে। আবার যাহা মন, তাহাই পুরুষ; সুতরাং নিশ্চয়ই অবগত হইতে হইবে যে, পুরুষ বা আত্মাই সত্য, তদ্ভিন্ন দৈবের অস্তিত্ব একেবারেই নাই।

এই জীবই মনঃস্বরূপে যে যে প্রিয় কার্য্য উদ্দেশে প্রযত্ন প্রকাশ করে, স্বস্বরূপ দৈব হইতেই সেই সেই কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হয়; এ নিমিত্ত সাধুগণ দুর্নিশ্চেয় মনঃস্বরূপ-সম্পন্ন পুরুষের মন, চিত্ত, বাসনা, কর্ম্ম ও দৈব এই কয়েকটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে রাম! এবম্বিধ পুরুষ সুদৃঢ়-ভাবনাবলে প্রতিনিয়ত যেরূপ প্রযত্নপরায়ণ হয়, ফললাভও তদনুসারেই

সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষকারপ্রভাবেই যাবতীয় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে অন্য কাহারও কর্তৃত্ব বিদ্যমান নাই। অতএব সেই পুরুষকারই তোমাকে সকল মঙ্গল প্রদান করুক।

রামচন্দ্র কহিলেন,— হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জন্মান্তরীণ বাসনাজাল আমাকে যে প্রকারে নিয়োজিত করিতেছে, আমি সেইরূপেই অবস্থান করিতেছি, সুতরাং আমি পরাধীন;—করিব কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! অতএবই বলিতেছি, তুমি স্বীয় প্রযত্নোপনীত পুরুষকার দ্বারা নিশ্চয়ই পরম শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে; শীঘ্রই পুরুষকার অবলম্বন কর। রাম! শুভ ও অশুভ এই দ্বিবিধ প্রাক্তন বাসনাব্যূহ অথবা এতদ্বয়ের একতর বাসনাব্যূহ তোমার বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে তুমি যদি সম্প্রতি প্রাক্তন শুভ বাসনাব্যূহে পরিচালিত হও, তাহা হইলে তদীয় শুভময় পরিণামরূপী পুরুষকারপ্রভাবেই শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অথবা যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনাব্যূহ তোমাকে সঙ্কটময় পথে নিয়োজিত করে; তাহা হইলে তুমি তাহাকে যত্নের সহিত বলপূর্ব্বক পরাজিত করিবে। তুমি স্বয়ং প্রাজ্ঞ ও চিন্মাত্রস্বভাব। এই জড়াত্মকদেহ তুমি নও এবং স্বয়ং চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া তুমি অন্য কোন চেতন দ্বারা চেতিতও নহ। যদি বল অপর কোন চেতন তোমাকে চেতিত করিতেছে, তাহা হইলে তাহাকে আবার চেতিত করিল কে? এবং এই চেতয়িতারই বা আবার চেতয়িতা কে? এইরূপ ক্রমপরম্পরা অনবস্থাদোষে দূষিত; সুতরাং উহা বস্তুসিদ্ধিকর নহে।

জীবগণের বাসনারূপিণী তরঙ্গিণী শুভ ও অশুভ এই দ্বিবিধ পথেই প্রবাহিত হয়, পরন্তু পুরুষকারসহায়ে উহাকে শুভপথে প্রবাহিত করাই বিধেয়। অয়ি অমিতপরাক্রম! তুমি যে সময়ে বুঝিবে, তোমার মন অশুভ পথে সমাবিষ্ট হইতেছে, তখন বলপূর্ব্বক পৌরুষসহকারে তাহাকে তুমি শুভপথে অবতারিত করিবে। প্রাণিগণের মন সততই শিশুর ন্যায় চঞ্চল-স্বভাব। তাহাকে যদি অশুভ হইতে নিবারিত করা যায়, তাহা হইলে সে তখন শুভপথ অবলম্বন করে, এইরূপে আবার শুভ হইতে নিবারিত করিলে অশুভকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং বলপূর্ব্বক চিত্তকে অশুভ

হইতে পরিচালিত করিবে। চপলমতি শিশুকে যেমন সহসা অবরুদ্ধ না করিয়া সান্ত্বনাসহকারে ধীরে ধীরে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে হয়, চিত্তকেও তদ্রূপ সহসা রুদ্ধ না করিয়া রাগদ্বেষাদি বৈষম্যত্যাগে সমতা প্রাপ্ত করত শনৈঃশনৈঃ আত্মস্বরূপে নিরোধলক্ষণ পৌরুষপ্রযত্নে পরিপালন করিবে। তুমি যদিও পূর্ব্বে অভ্যাসবলে শুভ বা অশুভ বাসনা প্রগাঢ় করিয়াছ, তথাপি এক্ষণে তুমি শুভ বাসনাকেই প্রগাঢ় করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন প্রকাশ কর।

হে অরিন্দম! তোমার বাসনা যখন পূর্ব্বকৃত অভ্যাসবলেই ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তুমি জানিও,—বাসনাভ্যাস কখন বিফল হয় না। হে অনঘ! তোমার বাসনা এক্ষণেও অভ্যাসবশতঃ ঘনীভূত হইতে পারে; সুতরাং তুমি শুভাভ্যাসেই যত্নপরায়ণ হও। আর তোমার মনে যদি এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আমার পূর্ব্বতন দুর্ব্বাসনাই প্রগাঢ় রহিয়াছে; তথাপি হে বৎস! তুমি তজ্জন্য বিষণ্ণভাব ধারণ করিও না। অর্থাৎ দুর্ব্বাসনাবৃদ্ধি হেতু অনর্থের সম্ভাবনা করিয়া বিষাদ করা বিধেয় নহে। কেন না, অধুনাও অভ্যাস এবং প্রযত্নপরায়ণ হইলে তাহা আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না; প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইবে। অভ্যাসবলে বাসনা বৃদ্ধি সম্ভবপর কি না, তোমার যদি এরূপ সন্দেহও উদিত হইয়া থাকে; তথাপি তুমি শুভবাসনারই উপচয় করিতে প্রবৃত্ত হও। ফলতঃ শুভ আচরণবশতঃ শুভবাসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কোন দোষেরই সম্ভাবনা নাই। দেখ, ইহজগতে যে, যে বিষয় উত্তমরূপে অভ্যাস করে, সে নিশ্চয়ই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এ নিয়ম বা কথা কখন অপ্রসিদ্ধ নহে; আবালবৃদ্ধ সর্ব্বত্রই ইহার পরিচয় রহিয়াছে। অতএব হে কল্যাণ-ভাজন! তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবার নিমিত্ত পরম পুরুষকার অব-লম্বনপূর্ব্বক শুভবাসনায় সমন্বিত হইয়া ইন্দ্রিয়পঞ্চকের পরাজয় বিধান কর। তুমি যাবৎ পর্য্যন্ত না মনের স্বরূপ অবস্থা এবং তৎপদ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত গুরুশুশ্রূষা, সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অভ্যাস, এই সমুদায়ে নিরত থাকিয়া নির্ণীত কর্ম্ম আচরণ কর। পরে যে সময়ে তোমার মনোমল গলিত হইয়া যাইবে এবং যে সময়ে তুমি আত্মবস্তু বিজ্ঞাত

হইতে পারিবে, তখন তোমার আর মানসী ব্যথা থাকিবে না; তুমি বিগত-মনোজ্বর হইয়া ঐ শুভবাসনাও পরিহার করিবে।

হে প্রিয়দর্শন! শুভবাসনা সম্পন্ন সুস্নিগ্ধ বুদ্ধিবলে সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করত আর্য্যজনপরিসেবিত পরমমঙ্গলালয় পরমার্থবস্তু পরিজ্ঞাত হও এবং সর্ব্বপ্রকারে সমদর্শী হইয়া পরে শুভবাসনাও পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎস্বরূপে অবস্থিত হও।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সৌম্য! স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব সচ্চিদানন্দরূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত। ব্রহ্মসম্বন্ধপ্রযুক্তই এই বিশ্বপ্রপঞ্চসত্তা ব্যবহৃত। এই সত্তাই ভবিষ্যৎকালসম্বন্ধে ব্যপদিশ্যমান হইয়া নিয়তি নামে অভিহিত। লোকে যাহা ভবিতব্য বলিয়া অবধারিত, এই নিয়তি তাহারই নামান্তর রূপে পরিচিত এবং ইহাই কারণের কারণত্ব ও কার্য্যের কার্য্যত্ব। যখন সর্ব্বানুকূল ব্রহ্মসত্তাই নিয়তি বলিয়া নিরূপিত, তখন তাহা পৌরুষসাফল্যে প্রতিকূল না হইয়া বরং আনুকূল্যকারিণীই হইবে। অতএব মদীয় বক্ষ্যমান বাক্য শ্রবণ কর। রাম! তুমি এক্ষণে শ্রেয়ঃসংসাধনের নিমিত্ত পুরুষকার-সহায়ে নিত্যবন্ধুস্বরূপ চিত্তের একাগ্রত্ব বিধান কর। ইন্দ্রিয়বৃন্দ মনোরথ-রথে আরোহণ করিলে মুক্তিবিঘ্নবিধায়ক ঐহিক স্বর্গাদিসুখে নিপতিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা যাহাতে পুনরায় আর মনোরথরথে সমারূঢ় হইতে না পারে, তুমি পৌরুষবলে তাহাদিগকে সেইরূপেই সংযত করিয়া মনের সমতা সাধন কর।

অয়ি রঘুবংশভূষণ! যাহাতে মর্ত্তলোকবাসী ও স্বর্গলোকবাসী অধিকারি-গণের জ্ঞানসিদ্ধি হয়, আমি তন্নিমিত্ত তোমার সন্নিধানে পুরুষার্থফল-প্রসবিনী মোক্ষোপায়স্বরূপিণী পরম সংহিতা কীর্ত্তন করিব; তুমি ইহা

অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই মোক্ষসংহিতা শ্রবণ করিলে সমুদায় সুখ-দুঃখ দূরীভূত ও পরলোকে পরমানন্দ সমুপাগত হইয়া থাকে। উদারচেতা মানবগণ পুনরুৎপত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত এই মোক্ষোপায়ময়ী পরম সংহিতা শ্রবণপূর্ব্বক সংসারবাসনা দূরে পরিহার করত সম্পূর্ণ শান্তি ও সন্তোষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও এক্ষণে বেদের পূর্ব্বাপর * বাক্যার্থ বিচারপূর্ব্বক বিষয়বিরত চিত্তকে সমরস ও আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপরায়ণ করিয়া মদীয় বক্ষ্যমাণ মোক্ষোপযোগী বাক্য শ্রবণ কর। হে রাম! পূর্ব্বকল্পে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সর্ব্বদুঃখক্ষয়কর বুদ্ধিসমাশ্বাসপ্রদ মোক্ষবাক্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সমুদায় বিবেকিজনসহ সম্মিলিত হইয়া এই মোক্ষকথা শ্রবণ করিলে তোমার আর কোন দুঃখই থাকিবে না; তুমি নিশ্চয়ই অক্ষয় দুঃখ হইতে রক্ষার পথ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা ইহা পূর্ব্বকালে কি নিমিত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং আপনিই বা ইহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন; তৎসমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন্।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যিনি সকলকে ধারণ, সর্ব্বত্র গমন এবং সর্ব্বজন্তুর অন্তরে বিরাজ করেন, সেই অনন্ত মায়িকবিলাসের অধিষ্ঠান চিদাকাশরূপী অবিনাশী আত্মাই সর্ব্বজীবে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই বিরাট্‌রূপী আত্মা কি স্পন্দ কি অস্পন্দ সকল কালেই একরূপ অর্থাৎ বিকারপরিশূন্য। যেমন সাগর হইতে তরঙ্গ সম্ভূত হয়, সেইরূপ ঐ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপনশীল সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাট্‌পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর এই বিরাট্‌পুরুষের সুমেরুরূপ কর্ণিকা, দিক্‌রূপ দলরাজি ও তারকারূপ কেশরপরিশোভিত হৃদয়পদ্ম হইতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। এই মুনিমণ্ডলমণ্ডিত বেদবেদার্থবিৎ পরমেষ্ঠী স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়া মনের বিকল্পজালনির্ম্মাণের ন্যায় যাবতীয় জীব সৃষ্টি করিলেন। তিনি তাঁহার সৃষ্টির এক পার্শ্বস্থ জম্বু-দ্বীপের কোন এক কোণদেশে এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ নামক ভূভাগে সতত

* পূর্ব্ববাক্য—কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি। অপর বাক্য—উপাসনাকাণ্ডীয় শ্রুতি।

আধিব্যাধিসমাক্রান্ত অসংখ্য প্রাণিবৃন্দের সৃষ্টিবিধান করত পরে তাহাদিগকে বিবিধ বিষয়, বিভব, ভাব, অভাব, লাভ, অলাভ ও সুখদুঃখ প্রভৃতিতে নিরন্তর বিষাদসমাকুল ও জন্মমরণাদি নানারূপ ব্যসনপরম্পরায় পরিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত করুণাক্রান্ত হইলেন। যেমন পুত্রের দুঃখ দর্শনে পিতার মন কারুণ্যপূর্ণ হয়, সেইরূপ সেই সকললোকবিধাতা ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মাও তৎকালে স্বসৃষ্ট প্রাণিনিবহকে নিতান্ত দুঃখে নিপীড়িত দর্শনে সাতিশয় করুণাপরবশ ও চিন্তাসমাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—'অহো! আমার এই অল্পায়ু সন্তানগণ নিরন্তর নানাবিধ দুঃখদহনে দহ্যমান হইতেছে; ইহাদিগের দুঃখ শান্তির উপায় কি?'

করুণানিধান কমলাসন ভগবান্ ভূতভাবন ব্রহ্মা ক্ষণকাল একাগ্রমনে স্বসৃষ্ট ভূতনিবহের প্রভূত ভূতিবিধানের নিমিত্ত ঐরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পরে তাহাদিগের সর্ব্বদুঃখ দূরীকরণের উপায়স্বরূপ তপস্যা, সত্য, দান, ধর্ম্ম ও তীর্থ-সার্থের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর এই সকল সৃষ্টি করিয়াও তাঁহার মন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি পুনরায় ভাবিলেন, কেবল এই সকল উপায় দ্বারা সংসারতাপতাপিত জীবগণের দুঃখনিবৃত্তি হইবে না। যাহা প্রাপ্ত হইলে নির্ব্বাণনামধেয় পরম সুখ সমুদিত হয়, যাহাতে জন্ম-মরণাদি দুঃখভোগ আর সংঘটিত হয় না; তাহা আত্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ে লভ্য হইবে না। জীবগণের সংসারোত্তরণবিষয়ে তপস্যা, দান বা তীর্থ এ সমুদায় প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অভিহিত নহে; একমাত্র আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই তদ্বিষয়ে প্রধান উপায়। অতএব আমি এক্ষণে এই মন্দচেতা মানবনিবহের সর্ব্বদুঃখবিমোক্ষণের নিমিত্ত সংসারোদ্ধারের অভিনব সুদৃঢ় উপায় প্রকটিত করিব।

হে অনঘ! কমলযোনি ব্রহ্মা মনে মনে ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া সঙ্কল্প-বলে আমাকে সমুৎপাদিত করিলেন। আমি তৎকালে তদীয় অনির্ব্বচনীয় মায়াপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়া জলতরঙ্গসমীপে জলতরঙ্গের ন্যায় সত্বর সেই পিতৃসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলাম। আমার হস্ত অক্ষমালা ও কমণ্ডলু দ্বারা মণ্ডিত ছিল। আমি তদবস্থায় উপস্থিত হইয়া কমণ্ডলুধারী অক্ষমালাবান্ ভগবান্ পিতৃদেব ব্রহ্মার পাদপদ্মপ্রান্তে বিনীতভাবে অভিবাদন করিলাম।

তখন তিনি মৎকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া সস্নেহে ‘এস পুত্র’ এই মাত্র বলিয়া হস্তদ্বয়ে মদীয় হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মল নীরদমণ্ডলে নিশাকরের ন্যায় আমাকে আপন আসনপদ্মের উত্তরদলে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর সারসসমীপে সরলমন মরাল যেমন মনোভাব অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ মৃগচর্ম্মধারী মৎসন্নিধানে মৃগচর্ম্মপরিধান মদীয় পিতা পরমেষ্ঠীও মনোভিপ্রায় প্রকাশিত করত কহিলেন,—‘পুত্র! শশাঙ্ক যেমন শশচিহ্নে কলঙ্কিত রহিয়াছে; তদ্রূপ তোমারও চিত্ত কিঞ্চিৎকালের জন্য চঞ্চল অজ্ঞানতায় কলঙ্কিত হউক।’

আমি তৎকর্ত্তৃক ঐ প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই সুবিমল পূর্ণস্বরূপ ভুলিয়া গেলাম। সুতরাং সংসারভ্রম সবেগে সমাগমন করত তৎকালে আমাকে আশ্রয় করিল। আমি তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের অভিজ্ঞাতায় বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইলাম এবং ধনশূন্য দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় দুঃখশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, ‘হায়! এই কঠোর সংসারক্লেশ কোথা হইতে কিরূপে আগমন করিয়া আমাকে অভিভূত করিল!’

আমি দিন দিন ঐরূপ চিন্তা করত নিরন্তর মৌনী হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। অনন্তর একদিন পিতা আমাকে সাতিশয় বিষাদময় অবলোকন করিয়া কহিলেন,—‘বৎস! তুমি কি কারণে ঈদৃশ দুঃখদশায় পতিত হইয়াছ? আমাকে তুমি দুঃখশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা কর; তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হইবে; তুমি সর্ব্বদা বিপুল সুখে সুখী হইতে পারিবে।’

অতঃপর, তিনি আমাকে ঐ কথা কহিলে, আমি হেমকমলদলে অবস্থান করত সকললোককর্ত্তা স্বীয় পিতা ভগবান্ ব্রহ্মাকে সংসাররূপ মহাব্যাধির ঔষধ জিজ্ঞাসা করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিলাম,—‘পিতঃ! জীবগণের এই মহাদুঃখময় সংসার কি প্রকারে সমাগত হইল এবং কি প্রকারেই বা ইহার ক্ষয় হইতে পারে?’ তখন মৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতা আমাকে বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলেন। আমি তাঁহার নিকট সেই পরমপাবন তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া যেন পিতা অপেক্ষাও অধিক নির্ম্মল পরিপূর্ণস্বভাব তত্ত্বাববোধরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। অনন্তর সেই সকলকারণ

বিশ্ববিধাতা পিতা আমাকে বিদিতবেদ্য ও পূর্ব্ববৎ স্বীয় প্রকৃতিপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন,—'পুত্র! আমি অধিকারিজনসম্প্রদায়ের জ্ঞান-সারসিদ্ধির নিমিত্ত শাপপ্রদানপূর্ব্বক তোমার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসু করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি শাপমুক্ত ও পরম বোধ-প্রাপ্ত হইয়াছ। বহুদিন মালিন্যসংসর্গে অকনকভাবসম্পন্ন কনক যেমন পুনঃসংশোধনে বিশুদ্ধ কনকে পরিণত হয়, তুমিও তদ্রূপ অজ্ঞানমালিন্য পরিহারপূর্ব্বক আমার ন্যায় একাত্মরূপে অবস্থান করিতেছ। হে সাধো! সম্প্রতি তুমি মানবদিগকে অনুগৃহীত করিবার নিমিত্ত ধরণীতলে জম্বু-দ্বীপান্তঃপাতী ভারতবর্ষে গমন কর। তথায় বহুসংখ্যক ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ মানবগণ বাস করিতেছে; তুমি তাহাদিগকে ক্রিয়াকাণ্ডক্রমে উপদেশ প্রদান করিবে এবং যে সকল বিষয়বিরতিসম্পন্ন বিচারপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাস করিতেছেন; তুমি তাঁহাদিগকেও পরমানন্দবিধায়ক আত্মজ্ঞান উপদেশ প্রদান করিবে।'

হে রঘুবংশবর্দ্ধন! আমি আমার পিতা কমলযোনি ভগবান্ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তৎকালাবধি এই স্থানেই অবস্থান করিতেছি এবং যতকাল এই সংসারে অধিকারী জনগণ অবস্থান করিবে; আমি ভবিষ্যতেও তত কালই অবস্থান করিব।

রাম! এই পৃথিবীতে আমার অপর কিছুই ক্রিয়াপ্রয়োজন নাই। আমি কেবল ঐ কারণে থাকিতে হইবে বলিয়াই নির্ম্মনস্কভাবে অবস্থান করিতেছি। সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি যেমন নিরভিমান হইয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ নিরভিমান চিন্তায় যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুবর্ত্তন করিতেছি; ফলতঃ আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছি না।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই পৃথিবীতে যে প্রকার জ্ঞানের অবতারণা হইয়াছে, আমি যে প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছি এবং আমার ও কমলযোনির যাহা কিছু চেষ্টা, তৎসমস্তই তোমায় নিকট প্রকাশ করিলাম। হে পাপপরিশূন্য সাধুহৃদয় রাম! বাস্তবিক অদ্য তোমার চিত্ত অপরিমেয় পুণ্যপরিপাকবশেই পরম জ্ঞান শ্রবণ করিবার জন্য সাতিশয় সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ পরমেষ্ঠী সৃষ্টিব্যাপার নির্ব্বাহ করিলে পর কি প্রকারে তদীয় বুদ্ধি জ্ঞানের অবতরণের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিল? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অম্বুরাশিতে ঊর্ম্মির ন্যায় সেই মদীয় পিতা ব্রহ্মা পরব্রহ্মে সর্ব্বদা স্বভাববশে স্বয়ংই ক্রিয়াশক্তিময় হইয়া সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি সৃষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহপূর্ব্বক স্বসৃষ্ট ভূতনিবহকে আত্ম-জ্ঞানের অভাবনিবন্ধন পুনঃপুনঃ জন্ম, জরা, মরণ ও নরকাদিতে নিতান্ত কাতর দেখিয়া যাবতীয় সৃষ্টির ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সর্ব্ববিধাতা পিতামহ কিঞ্চিৎকাল পর্য্যালোচনা করত দেখিলেন,—যাহাতে স্বর্গ ও অপবর্গসাধনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, সেই কৃতযুগপ্রভৃতির ক্ষয় হইয়া গেলে ভবিষ্যতে মানবেরা মহামোহে নিমগ্ন হইবে এবং এতদর্থে তাহাদিগের নরকপাতও অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তিনি এইরূপ সমালোচনা করত সংসারস্থ জীবগনের প্রতি সাতিশয় করুণাপরবশ হইলেন এবং পরক্ষণেই আমাকে সৃষ্টি করিয়া ভূয়োভূয় উপদেশপ্রদানে আমার জ্ঞানোৎপাদন করিলেন। পরে পিতার প্রসাদে আমি লব্ধজ্ঞান হইয়া জীবগণের অজ্ঞান দূরীকরণের নিমিত্ত তৎ-কর্ত্তৃক মহীতলে প্রেরিত হইলাম।

জীবের অজ্ঞানশান্তির নিমিত্ত তৎকালে পিতা কর্ত্তৃক কেবল আমিই

যে মহীতলে প্রেরিত হইয়াছিলাম, তাহা নহে। আমার ন্যায় সনৎকুমার ও নারদপ্রমুখ অন্যান্য আরও বহুসংখ্যক মহর্ষি তৎকালে ক্রিয়াক্রম ও উপাসনাক্রম দ্বারা মনোমোহরূপ সংসাররোগ-বশীকৃত লোকদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কৃতযুগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপও পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল। কোথাও আর পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ সৎক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল না। তখন পিতামহপ্রেরিত সেই সেই মহর্ষিগণ ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত এবং ধর্ম্মমর্য্যাদা সংস্থাপনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেশ বিভাগ করত পৃথক্ পৃথক্ পৃথিবীপাল পরিকল্পিত করিলেন। অনন্তর রাজা ও প্রজাবৃন্দের ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অবনিতলে বহুতর বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্রও প্রচারিত করিলেন। কিন্তু কাল-চক্রের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে লাগিল। পৃথিবীস্থ লোক সকল ভোগভোজননির্ব্বাহার্থ অর্থোপার্জ্জনে প্রত্যহ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মহীপতিগণের পরস্পর বিষয়সম্পত্তি লইয়া নানাপ্রকার মনোবাদ ও শত্রুতা প্রবর্ত্তিত হইল। এই সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশস্থলেই স্বার্থসাধনতৎপর রাজগণ কর্ত্তৃক প্রজাগণ বিলক্ষণ পরি-পীড়িত হইতে লাগিল। তখন ক্রমেই পৃথিবীর অবস্থা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। রাজগণের মধ্যে যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্যশাসন করা তৎকালে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। সুতরাং রাজা ও প্রজা সকলকেই সাতিশয় দৈন্যদশায় উপনীত হইতে হইল। সকলেরই সুখশান্তি অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। কোন ব্যক্তিই সম্যক্‌স্বাস্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্যলাভে সমর্থ হইল না। এদিকে আমাদিগকেও সেই সেই দীনভাবাপন্ন রাজন্য ও জন-সাধারণের দৈন্যাপনয়নের জন্য এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিবার নিমিত্ত নানাবিধ জ্ঞানশাস্ত্র প্রকাশিত করিতে হইল।

হে রঘুবংশাবতংস! এই অধ্যাত্মবিদ্যা সর্ব্বপ্রথম রাজগণের জ্ঞানের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়া তৎপরে লোক মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এ কারণ এই অধ্যাত্মবিদ্যা রাজবিদ্যা বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজবিদ্যা রাজ-গণের অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু ছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বতন কত শত মহীপতিগণ

ঐ রাজগুহ্য সর্ব্বোত্তম অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিজ্ঞাত হইয়া সংসারের সর্ব্বপ্রকার জ্বালাযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরম নির্ব্বৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল অমলকীর্ত্তি ধার্ম্মিক ধরণীপতিগণ ধরাতলে আর নাই! বহুকাল হইল তাঁহারা এই ভূলোক পরিহার করিয়া চলিয়া গেলে তুমি এই ধরণীতলে ধরাপতি দশরথ হইতে অধুনা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। হে অরিকুলকালম রাম! তোমারও নিতান্ত নির্ম্মল মনে আসিয়া বিনাকারণ পরমপাবন বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে।

রাম! এই পৃথিবীতে বিবেকিগণ মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই সকল সাধুপুরুষদিগেরও প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিরই নির্ব্বেদাদি কারণ বশতঃই প্রথমে রাজসবৈরাগ্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার এই স্বীয় বিবেকজাত অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক বৈরাগ্য কোনরূপ কারণ ভিন্নই সমুৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ইহা সাধুগণেরও যে চমৎকারকর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বীভৎস বিষয় বিলোকন করিয়া কোন্ ব্যক্তি না বৈরাগ্যসম্পন্ন হয়? ফলতঃ প্রায় সকল ব্যক্তিরই তত্তদ্বিষয়ে বিরতি হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সধুপুরুষ, তাহাঁদিগের বৈরাগ্য বিবেক হইতেই সমুদিত হইয়া থাকে; সুতরাং সেই বৈরাগ্যই সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোনরূপ কারণ ব্যতীত যাঁহাদিগের হৃদয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাঁরাই মহাপুরুষ, তাঁহারাই মহাপ্রাজ্ঞ এবং তাঁহাদিগেরই অন্তঃকরণ প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মল। যিনি বিবেকবশতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক তত্ত্বাভিমুখ্যে বিষয়বিরাগী হন্, তিনি বিমল বরমাল্যধারী যুবা পুরুষের ন্যায় বিরাজমান হইয়া থাকেন। আর যাহাঁরা স্বীয় বিবেকবুদ্ধিপ্রভাবে এই সংসাররচনা বিচারপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করেন; বাস্তবিক পক্ষে পুরুষগণ মধ্যে তাহাঁরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

হে রঘুবর! আত্মবিবেক দ্বারা পুনঃপুনঃ বিচারপূর্ব্বক এই মায়িক দৃশ্যসমূহ ইন্দ্রজালবৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া ধারণা করত বাহ্য ও আভ্যন্তর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও অবিদ্যা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা বিধেয়। শ্মশান, ব্যাধিপীড়ন, বিপদ্ বা দৈন্য এ সমুদায় দর্শন করিলে কাহার মনে না বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়? বস্তুতঃ সুনিপুণভাবে পর্য্যালোচনা করিলে অনেকেই

তখন বিরাগী হইয়া থাকে; কিন্তু যে বৈরাগ্য আপনা হইতেই সমুদিত হইয়া থাকে; তাহাই পরম শ্রেয়ঃ। তুমি অধুনা অকৃত্রিম বৈরাগ্য এবং সাতিশয় মহত্ত্ব লাভ করিয়াছ, সুতরাং কোমল স্থল যেমন বীজবপনের যোগ্য হয়; তুমিও তদ্রূপ আত্মবিদ্যার অত্যুত্তম পাত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছ। ফলতঃ পরমেশ পরমাত্মার প্রসন্নতাবশতঃই ভবাদৃশ পুরুষের সুবুদ্ধি বৈরাগ্যের অনুগামিনী হইতেছে।

যদি বহুকাল পর্য্যন্ত যজ্ঞদানপ্রভৃতি সৎক্রিয়া, বিপুল তপস্যা, শাস্ত্রোক্ত নিয়মপালন এবং তীর্থাদি পরিসেবন এই সকল দ্বারা জন্মজন্মান্তরীয় দুষ্কৃতিরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তৎকালে বিবেকবশে মানবের বুদ্ধি কাকতালীয় ন্যায়ে পরমার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু যাবৎকাল জীবগণ পরমাত্মার পরমপদদর্শনে বঞ্চিত থাকে; তাবৎকাল তাহারা চক্রবদাবর্ত্তনশীল রাগদ্বেষাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগসাধন ক্রিয়াকলাপে তৎপর হইয়া ইহসংসারে পুনঃপুনঃ পরিভ্রমন করিতে থাকে। মাতঙ্গ যেমন বন্ধনস্তম্ভ সমুৎপাটিত করত দ্রুতপদে পলায়ন করে, তদ্রূপ সাধুগণও বিবেকবুদ্ধিবলে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রকৃতপক্ষে অসার বলিয়া বিদিত হইয়া, সংসারময়ী বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রাম! এই সংসারগতি অত্যন্ত বিষম। ইহার অন্ত নিতান্তই অসম্ভব। ইহাতে জীব দেহযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, পরন্তু জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত তথ্য পরিজ্ঞাত হইতে শক্তিমান্ হয় না। হে রঘুকুলধুরন্ধর! বিবেকসম্পন্ন মহাপুরুষগণ জ্ঞানযুক্তিরূপ ভেলার সাহায্যে নিমেষমধ্যেই এই সুদুস্তর সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অতএব তোমাকেও আমি বলি, তুমিও এক্ষণে বিবেকবৈরাগ্যাদিপ্রসিদ্ধ নিত্যৈকাগ্র বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে সেই সংসারসাগরতারিণী জ্ঞানযুক্তি শ্রবণ কর। দেখ, ঐ অনিন্দিত জ্ঞানযুক্তি ব্যতীত এই অনন্তবেগময় জগতে দুঃখভীতিসকল নিরন্তর অন্তর্দ্দাহই সমুৎপাদন করে। এই জ্ঞানযুক্তির অভাব থাকিলে সাধুগণ কি প্রকারে শীতবাতাতপাদি দ্বন্দ্বদুঃখ সকল সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন? ফলতঃ ঐ সকল শীতবাতাতপাদি দুঃখ চিন্তা পদে পদে

মূঢ়জনগণসমীপেই সমাপতিত হইয়া থাকে এবং হুতাশনশিখা যেমন তৃণরাশি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ঐ দুঃখচিন্তাও মূঢ়নরগণকেই দগ্ধ করিয়া থাকে। অগ্নিশিখা যেমন বর্ষাজলসিক্ত বনাবলী দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন প্রকার মানসিক ব্যথাও সম্যক্‌দর্শী বিজ্ঞাতজ্ঞেয় প্রাজ্ঞ পুরুষকে কিঞ্চিমাত্র উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয় না। এই সংসারমরুভূমি-প্রসিদ্ধ মারুত যদি আধিব্যাধিরূপ ভীষণ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া অতি প্রবলভাবেও প্রবহমাণ হইতে থাকে; তথাপি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কিছুতেই বিচলিত হন না। তিনি কল্পপাদপের ন্যায় অভগ্নভাবেই অনুক্ষণ অবস্থান করিতে থাকেন। অতএব ধীমান্ ব্যক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যত্নপূর্ব্বক প্রণয়-সহকারে প্রমাণপটু প্রবুদ্ধচেতা ব্যক্তিকে তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিবেন। পরে কুঙ্কুমরসনিমগ্ন বসন যেমন কুঙ্কুম গ্রহণ করে, সেইরূপ কৃতপ্রশ্ন ব্যক্তিও যত্নপূর্ব্বক উত্তমাশয় প্রামাণিক বক্তার বচন গ্রহণ করিবেন।

হে বাগ্‌বিদাংবর! যে ব্যক্তি তত্ত্বানভিজ্ঞ অপ্রাজ্ঞ অযোগ্য পুরুষের নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে, তদপেক্ষা মূঢ় নর জগতে আর নাই এবং প্রমাণ-প্রয়োগকুশল তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তৎপরে যে ব্যক্তি তদীয় বাক্য উল্লঙ্ঘন করে, তদপেক্ষাও নরাধম আর দ্বিতীয় বিদ্যমান নাই। যে পুরুষ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে ব্যবহারাদিদর্শনে বক্তা ব্যক্তির তত্ত্ববিষয়িণী অভিজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতার বিষয় বিশেষরূপে বিনির্ণয় করিয়া, পরে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাদৃশ প্রশ্নকর্ত্তাই মহামতি ও উত্তম বলিয়া অভিহিত। আর যে মূর্খ ব্যক্তি বক্তার প্রকৃতি নির্ণয় না করিয়া প্রশ্ন করিতে সমুদ্যত হয়; সেই মূর্খ প্রশ্নকর্ত্তা অধমমধ্যে গণ্য এবং তাদৃশ পুরুষ কদাপি পরমার্থ-ভাজন হইতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হইয়া থাকে, তত্ত্বোপদেশক প্রাজ্ঞপুরুষ সেই অনিন্দার্হ বিনীত শিষ্যকেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিবেন। এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি পশুধর্ম্মী ও অধমমধ্যে গণ্য, তাহার নিকট কোন কথাই প্রকাশ করিবেন না। এইরূপে আবার যে গুরু প্রশ্নকর্ত্তার উপদেশ গ্রহণের সামর্থ্য অপরিজ্ঞাত হইয়া অপাত্রে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হন, প্রাজ্ঞগণ তাদৃশ ব্যক্তিকেও মহামূর্খ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে রঘুনন্দন! এক্ষণে তুমি এবং আমি, আমরা কেহই প্রকৃত প্রশ্ন-কর্ত্তা ও প্রকৃত বক্তা হইতে কোন অংশে হীন নহি। কেন না, তুমি সর্ব্বসদ্‌গুণ-পরিশোভিত প্রশ্নকর্ত্তা এবং আমিও তত্ত্ববিষয়ে সম্যক্ বক্তা; সুতরাং আমাদিগের এই সম্মিলন পরস্পর অসমান হয় নাই; ইহা অবশ্যই ফলোপধায়ক হইবে। হে শব্দার্থপারদর্শিন্! আমি তোমার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিব, তুমি তাহা যত্নপূর্ব্বক "ইহাই প্রকৃততত্ত্ব" এইরূপে বিনির্ণয় করিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। তুমি মহাপুরুষ হইয়াছ, বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়াছ এবং জীবস্থিতি বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছ; সুতরাং তোমাকে যাহা উপদেশ করা যাইবে, তাহা নিশ্চয়ই তোমার অন্তঃকরণে বসনে কুঙ্কুমরসের ন্যায় সংলগ্ন হইবে। তোমার বুদ্ধি উপদেশগ্রহণে এবং পরমার্থবিবেচনে সমর্থ হইয়াছে; সুতরাং যেমন প্রভাকরপ্রভা সলিল-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ত্বদীয় বুদ্ধিও তত্ত্বার্থ মধ্যে প্রবেশ করিবে। আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিব, তুমি যত্নপূর্ব্বক তৎসমস্তই হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। আর তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে আমার নিকট নিরর্থক প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইও না।

রাম! মন এই সংসাররূপ কাননের চপলস্বভাব শাখামৃগস্বরূপ। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সংশোধিত করিয়া তৎপরে যত্নপূর্ব্বক পরমার্থ-বাক্য শ্রবণ করিবে। বিবেকহীন, জ্ঞানহীন ও সাধুসংসর্গহীন মানবের সংসর্গ করা সঙ্গত নহে; প্রত্যুত তাহাদিগকে অতি দূরে পরিহারপূর্ব্বক প্রত্যহ সজ্জনগনের সেবা করাই কর্ত্তব্য। নিরন্তর সাধুজনগনের সংসর্গ করিলে বিবেকের উদয় হয় এবং ভোগ ও মোক্ষ এই দুইটী সেই বিবেক-পাদপেরই ফলরূপে প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—মোক্ষ-নামক যে নগর আছে, তাহার দ্বারপ্রান্তে শম, বিচার, সন্তোষ ও সাধু-সঙ্গম, এই চারিজন দ্বারপাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহারা মোক্ষ রাজ-নিকেতনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়; সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই দ্বারপাল-চতুষ্টয়ের সেবা করা সর্ব্বথা বিধেয়। যদি উক্ত চারি জনকেই সেবা করিয়া উঠা সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ তিন জনকে অথবা তাহাতেও অশক্ত হইলে অন্ততঃ পক্ষে দুই জনকে সেবা করিবে। অথবা দুই জনকে

সেবা করিতেও যদি একান্ত অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদিগের মধ্যে এক জনকে সেবা করা একান্তই আবশ্যক। কারণ, ঐ চারি জনের মধ্যে যদি এক জনকেও বশীভূত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অপর তিন জনও বশীভূত হইয়া থাকে।

প্রভাকর যেমন যাবতীয় তেজঃপুঞ্জের ভূষণস্বরূপ, সেইরূপ বিবেকবান্ ব্যক্তিও শাস্ত্র, জ্ঞান, তপস্যা ও শ্রুতি এই সমুদায়ের ভূষণ ও ভাজন হইয়া থাকে। যেমন শৈত্যের আতিশয্যনিবন্ধন জলরাশি পাষাণের ন্যায় কাঠিন্য-ময় হয়, সেইরূপ মন্দমতি মূর্খমানবগণেরও মূর্খতা ক্রমান্বয়ে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া যায়। কিন্তু হে রাঘব! তুমি তাদৃশ নহ। তুমি পরম বিবেকী। তোমার মূর্খতা দূরীভূত হইয়াছে। সরোজবন্ধু সবিতা সমুদিত হইলে সরোজ যেমন বিকসিত হইয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ সৌজন্যগুণ ও শাস্ত্রার্থদর্শনে প্রফুল্লান্তঃকরণে অবস্থান করিতেছ! হে সাধুহৃদয়! মৃগাদি জন্তু যেমন উৎকর্ণ হইয়া সুমধুর বীণারব শ্রবণ করে, তুমিও তদ্রূপ উৎকর্ণ হইয়া এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অববোধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছ; সুতরাং তুমিই উপদেশের পবিত্র যোগ্য পাত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছ।

হে রামচন্দ্র! যাহাতে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না, তুমি অধুনা বৈরাগ্যাভ্যাসে সেই শান্তি ও সৌজন্যসম্পদের অর্জ্জন কর। প্রথমে সংসার হইতে মুক্তির নিমিত্ত সৎশাস্ত্র, সাধুসংসর্গ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপঃক্রিয়া এই সমুদায় দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞাশক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে। কারণ, সুসংস্কৃত বুদ্ধি দ্বারা যদি শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করা হয়; তাহা হইলে জানিও, মূর্খতানাশের তাহাই অদ্বিতীয় উপায়। এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষ সমস্ত আপদেরই একমাত্র আস্পদ। ইহা অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকেই পদে পদে বিমোহিত করিতেছে। অতএব প্রযত্নসহকারে সর্ব্বাগ্রে মূর্খতা বা অজ্ঞানতা বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বথা বিধেয়। যদি দুরাশা বশতঃ কুটিলগতিসম্পন্ন মূর্খতা হৃদয়ে বিবল্গিত হইতে থাকে; তাহা হইলে অনলসংযোগে চর্ম্ম যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তদ্রূপ চিত্তও তখন সঙ্কুচিতভাব ধারণ করিতে থাকে। নীরদবিহীন নির্ম্মল নভোমণ্ডলগত পূর্ণ

নিশাকর দর্শনে দৃষ্টি যেমন প্রসন্নভাব ধারণ করে, তদ্রূপ এই যথার্থ তত্ত্বদৃষ্টিও প্রাজ্ঞজনেই প্রসন্নভাবে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। যাহার মতি পূর্ব্বাপর বিচার করত সূক্ষ্মার্থগ্রহণে সুচারু চাতুর্য্যে পরিশোভিত হইয়া সবিকাশা নামে প্রথিত হইয়াছে; তাদৃশ পুরুষকেই পণ্ডিতগণ প্রকৃত পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

অয়ি রঘুকুলানন্দবর্দ্ধন রাম! যেমন তমস্তোমনাশী সুশীতল সুবিমল সুধাময় সুধাকর দ্বারা নভোমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ তুমিও এক্ষণে অজ্ঞানদূরকারী শান্ত্যাদি সদ্গুণবিভূষিত স্বীয় স্বচ্ছ হৃদয়ে বিরাজিত হইতেছ।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! তোমার মন পূর্ব্বলিখিত গুণনিকরে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ এবং কথিত বিষয়ের অবধারণ করিতেও তোমার বিলক্ষণ সামর্থ্য রহিয়াছে; সুতরাং আমিও তোমাকে যত্নসহকারে উপদেশপ্রদানে সমুদ্যত হইয়াছি। তুমি সম্প্রতি জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তোমার রজস্তমোহীন শুদ্ধসত্ত্বানুগামিনী মতিকে পরমাত্মায় সংস্থাপিত করত স্থিরভাবে অবস্থান কর।

হে রাম! জিজ্ঞাসুজনের যাদৃশ গুণাবলী বিদ্যমান থাকে, তোমাতে তাহা সম্পূর্ণরূপেই বিরাজিত রহিয়াছে এবং জলধিতে যেমন রত্নশোভা শোভিত হয়; তদ্রূপ বক্তা বা উপদেশকর্ত্তারও যেরূপ গুণাবলী থাকা আবশ্যক, আমাতেও তৎসমুদায় শোভমান রহিয়াছে। হে বৎস! তুমি বিবেকাসঙ্গজাত পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়া তোমার অন্তঃকরণ চন্দ্রকরসংযোগে চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় আর্দ্রভাব ধারণ করিতেছে। কমলের যেমন সৌরভ্যাদি বিশুদ্ধ সদ্গুণের সহিত চিরসম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে,

তুমি বিশুদ্ধচেতা,—তোমারও তদ্রূপ শৈশবকাল হইতেই সর্ব্বদিগ্‌বিখ্যাত অবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ সদ্‌গুণসমূহসহ চিরসম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব তুমি বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলী শ্রবণ কর। আমি বিবেচনা করি, যেমন নিশাকর ব্যতীত শুভ্রকান্তি কুমুদিনী বিকশিত হয় না, সেইরূপ তুমি ব্যতীতও মদীয় ঈদৃশ উপদেশের ভাজনান্তর সম্ভবে না। ফলতঃ তত্ত্বকথা শ্রবণ করিবার তুমিই একমাত্র উপযুক্ত পবিত্র পাত্র।

হে রঘুনন্দন! যাহা কিছু সমারম্ভ এবং যাহা কিছু প্রমানপ্রমেয় দৃষ্টি, তৎসমুদায় পরমপদদর্শনেই নিঃশেষরূপে উপশান্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তখন আর তোমার উপদেশ শ্রবণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। দেখ, যদি জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিলে সাধুহৃদয় অধিকারী ব্যক্তির বিজ্ঞানবিশ্রান্তি সঙ্ঘটিত না হইত, তাহা হইলে ইহসংসারে কোন্ বিবেকী পুরুষ এই চিন্তাবিমূঢ়তা সহ্য করিতে পারিত? ফলতঃ যেমন প্রলয়কালোদিত প্রভাকরনিকরের করসংযোগে সুমেরুপ্রভৃতি কুলশৈলকুল বিলীন হইয়া যায়; সেইরূপ পরম পদ অধিগত হইলেও যাবতীয় মননবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাম! এই সংসারবিষের আবেশবশে যে দুঃসহ বিসূচিকারোগ সমুৎপন্ন হয়, একমাত্র পবিত্র যোগরূপ গারুড়মন্ত্রপ্রভাবেই তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে। সেই পরমার্থ জ্ঞানরূপ যোগ জগতে কাহারও দুরধিগম হয় না; পরন্তু সজ্জনগণসহ সৎশাস্ত্রের বিচার করিলে নিশ্চয়ই তাহা লাভ করিতে পারা যায়।

এই অধিকারিজন্মে যদি সম্যক্‌রূপে বিচারপরায়ণ হওয়া যায়, তাহা হইলে, অবশ্যই সকল দুঃখের পরিক্ষয় হইবে; এইরূপ অবধারণ করাই বিধেয়। অতএব বিচারদৃষ্টি কখন অনাদরসহকারে অবলোকন করা কর্ত্তব্য নহে। ভুজঙ্গ যেমন তদীয় জীর্ণ কঞ্চুক পরিহার করিয়া থাকে, সেইরূপ বিচারপরায়ণ পুরুষগণও প্রথমতঃ এই নিখিল আধিপঞ্জর পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমদর্শিতা লাভ করত বিগতজ্বর ও শীতলান্তঃকরণ হইয়া পরে এই সমগ্র মায়াময় জগৎপ্রপঞ্চ ইন্দ্রজালের ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকেন। পরন্তু যাহারা সম্যগ্‌দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তাদৃশ পুরুষেরাই সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে।

এই সংসারাসক্তি সাতিশয় ভীষণ। যাহারা মোহবশতঃ বিষয়জালে পরিপতিত হয়; তাদৃশ পুরুষগণকে এই বিষম সংসারাসক্তি ভীষণ আশীবিষের ন্যায় দংশন করে, নিশিত অসির ন্যায় ছেদন করে, কুন্তের ন্যায় বিদ্ধ করে, রজ্জুর ন্যায় বেষ্টন করে, তীব্রতাপ পাবকশিখার ন্যায় দগ্ধ করে, ঘোরান্ধকারময়ী নিশীথিনীর ন্যায় সান্দ্রতর মোহান্ধকারে অন্ধীভূত করে, পাষাণের ন্যায় অবশ করে, প্রজ্ঞাশক্তি বিলুপ্ত করে, মর্য্যাদা বিনষ্ট করে, মোহান্ধকূপে পাতিত করে এবং ভোগতৃষ্ণায় জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। হে রাম! বলিতে কি, এমন কোন দুঃখই বিদ্যমান নাই, যাহা সংসারী পুরুষের ভোগ করিতে হয় না। এই দুরন্ত বিষয়বিসূচিকারোগের যদি উপযুক্ত চিকিৎসা বিধান করা না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই বিষয়বিসূচিকা নরকনিকরের নগরস্বরূপ স্বকীয় পরকীয় দেহপরম্পরায় পুরুষকে আবদ্ধ করিয়া সেই সেই নরকদুর্দ্দশা ভোগ করাইয়া থাকে। ঐ সকল ভীষণ লোমহর্ষণ নরকনিকরে পাষাণভক্ষণ, অসি দ্বারা ছেদন, পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপাতন, প্রস্তরখণ্ডে তাড়ন, অগ্নি দ্বারা অঙ্গদাহন, সর্ব্বদা হিমরাশিতে সিঞ্চন, কুঠারাঘাতে অঙ্গকর্ত্তন, চন্দনকাষ্ঠে সংঘর্ষণের ন্যায় শিলাফলকে শরীর ঘর্ষণ, অসিপত্র নামক তরুবনে ধাবন, সর্ব্বাঙ্গে কাষ্ঠযন্ত্রনিপীড়ন, কণ্টকময় প্রতপ্ত লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন, কণ্টকযুক্ত মার্জ্জনীসমূহে অঙ্গমার্জ্জন, অনবরত অগ্ন্যুদ্গারী সমরনারাচ বর্ষণ, ছায়া এবং পানীয় জল ব্যতীত নিদাঘকালাতিবাহন, শীত সময়ে অনবরত ধারাগৃহে সীকরবর্ষণ, পুনঃপুনঃ শিরশ্ছেদন, সুখনিদ্রা দূরীকরণ, মুখবন্ধন জন্য বাক্য রোধন, অঙ্গসকল নিম্নোন্নতভাবে বিসংষ্ঠুল হওয়ায় ব্যবহারে অশক্তি ও পর্ব্বতের ন্যায় অঙ্গবৃদ্ধি, এই সকল এবং এইপ্রকার অন্যান্য আরও সহস্র সহস্র সুদারুণ যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে হয়।

অতএব হে রাঘব! এবম্বিধ সহস্র সহস্র কষ্টচেষ্টা দ্বারা এই সংসারযন্ত্র যখন অতীব ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে; তখন ইহা হইতে যাহাতে মুক্তি লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। অপিচ সৎশাস্ত্রের বিচার করিলে শ্রেয়োলাভ যে নিশ্চয়ই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে; ইহাও মমে মনে অবশ্যই বিচার বা অবধারণ করা সর্ব্বতোভাবে

বিধেয়। হে রঘুকুলসুধাকর! তোমার মনে যদি এইরূপ আশঙ্কা বা সংশয় আসিয়া সমুদিত হয় যে, এই যে সকল জ্ঞানকবচাবৃত-কলেবর মহামুনিগণ, মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং রাজর্ষিগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহাঁরা দুঃখভোগের একান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও কি নিমিত্ত সেই সেই দুঃখকরী দশা ও অশেষ প্রকার সংসারকদর্থনা অনুভব করত অবস্থান করিতেছেন? তাহা হইলে আমি তোমার তাদৃশ সংশয় দূরীকরণের জন্য বলিতেছি, এই সকল মহাপুরুষগণ সর্ব্বদাই মুদিতমনে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা প্রাকৃত জনের ন্যায় কদাপি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হন না। যেমন হরি, হর ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ ইহসংসারে কৌতুক ও বিক্ষেপপরিহীন হইয়া নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন; সেইরূপ বিশুদ্ধবুদ্ধি আত্মদীপপ্রাপ্ত নরশ্রেষ্ঠগণও নির্লিপ্ত ও আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া সংসারে অবস্থান করিতেছেন। যখন পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ায় মোহজাল পরিক্ষীণ ও ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ নিবিড় নীরদপটল বিগলিত হইয়া যায়, তখন তাদৃশ জীবের নিকট এই জগদ্ভ্রমণ কোনরূপ পীড়াবিধায়ক না হইয়া বরঞ্চ তাহা তাহার সুখাবহ ক্রীড়াব্যাপারই হইয়া থাকে।

হে রাম! আমি আরও বলিতেছি; যখন সেই সেই চিন্মাত্রস্বভাব পরমার্থ বস্তু প্রসন্ন হন, তখন জীবের সর্ব্বসন্দেহ বিদূরিত, পরম শান্তি সমুদিত এবং যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তি শান্তিরসাস্বাদরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন শান্তিরসে নিমগ্ন হইলেই পরমোত্তম ব্রহ্মরসাস্বাদনে সামর্থ্য হয় এবং এই সময়েই জগৎ ও আত্মা এ উভয়ে অভিন্নভাব বা সমদর্শিতা সমুপাগত হইয়া থাকে; সুতরাং তখন সেই সমানদর্শী তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাধুপুরুষগণের নিকট এই জগদ্ভ্রমণ যে সুখকর ক্রীড়াস্বরূপে প্রতিভাত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আরও দেখ,—এই ছিন্নপাদপের ন্যায় অচেতন দেহ একটী রথস্বরূপে পরিশোভিত। ইন্দ্রিয়গণের গতিই এই দেহরথের গতি, প্রাণপবন কর্ত্তৃক ইহা পরিচালিত; মন ইহার রশ্মি, আত্মা আরোহী এবং গন্তব্যবিষয় আনন্দ। এই রথের সারথি দেহী সূক্ষ্ম হইলেও সমাধিসময়ে মহান্ হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শনানন্তর ঐরূপ বিমল বুদ্ধি দ্বারা ঈদৃশ জগদ্ভ্রমণ কদাপি সুখাবহ ব্যতীত অসুখাবহ নহে।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সাম্রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন আনন্দিত-মনে কালাতিপাত করে; সেইরূপ সুবুদ্ধিশালী মহাপুরুষগণও ঈদৃশ জ্ঞান-দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ইহসংসারে পরমানন্দে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই সকল লব্ধজ্ঞান মহাপুরুষগণ কখন শোক প্রকাশ করেন না। কোন বিষয় অভিলাষ করেন না। শুভ বা অশুভ ইহার কিছুই প্রার্থনা করেন না। সকল কার্য্যই সম্পাদন করেন, অথচ কিছুই করেন না। ইহাঁরা বিশুদ্ধ-ভাবে অবস্থান করেন, বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন এবং হেয়োপাদেয়তাপক্ষ পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মায়ই অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের গমনাগমন স্ববুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। ইহাঁরা যাহা কিছু করেন বা যাহা কিছু বলেন; তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় স্ববুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়া পরিগণিত নহে।

সেই পরম পদ অধিগত হইলে যাহা কিছু সমারম্ভ এবং যাহা কিছু দৃষ্টি, তৎসমস্ত হেয়োপাদেয়ভাব-বিবর্জ্জিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন মন সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাপরিশূন্য ও আনন্দ-রস প্রবাহে ভাসমান হইয়া যেন চন্দ্রবিম্বাবস্থিত স্বর্গীর ন্যায় পরম সুখের ভাজন হইয়া থাকে। যেমন পূর্ণ সুধাকরস্থিত সুধারসের পরিমাণ করা সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ বিষয়াভিলাষবিহীন সর্ব্বকৌতুক-পরিশূন্য মনেরও অপরিসীম সুখের পরিমাণ করা যায় না। যিনি একবার মাত্র আত্মতত্ত্ব অধিগত হইয়াছেন, তিনি আর মায়িক বিক্ষেপ অবলোকন করেন না এবং কোন প্রকার বাসনারও অনুসরণ করেন না। তিনি বাল্যচাপল্য পরিহারপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ পরমাত্ম-সুখেই বিরাজমান হইয়া থাকেন। হে রাম! একমাত্র আত্মতত্ত্বাবলোকন ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই এবম্বিধ জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করা যায় না; সুতরাং অধিকারী পুরুষ বিচারপূর্ব্বক যাবজ্জীবন মননিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সেই আত্মতত্ত্বান্বেষণে যত্নপরায়ণ হইবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই করিবেন

না। যিনি শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদির অভ্যাস দ্বারা অনুভবসম্পন্ন এবং শাস্ত্রানুশীলন ও গুরূপদেশগ্রহণে তৎপর, তাদৃশ পুরুষই আত্মাবলোকনে সমর্থ হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ ব্যক্তি কদাপি শাস্ত্রার্থাবহেলনকারী মহাজনগণাবধীরয়িতা মূঢ়পুরুষের ন্যায় কষ্টপ্রদায়িনী দুঃখদশা প্রাপ্ত হন না। মানবগণের স্বশরীরমধ্যগত একমাত্র মূর্খতা যেরূপ কষ্টপ্রদায়িনী হয়, আধি, ব্যাধি, বিপদ্ বা বিষও তদ্রূপ কষ্টপ্রদায়ক হয় না। যাহাদিগের বুদ্ধি অল্পমাত্রও সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষগণ মৎকথিত এই অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণপূর্ব্বক সর্ব্বদুঃখাকর মূর্খতাদোষ বিনাশ করিতে যেরূপ সমর্থ হইয়া থাকে, সেরূপ আর অন্য কোন শাস্ত্রেই হয় না। যিনি শাস্ত্রোক্ত মহাবাক্য-প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে পরমবন্ধু বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এই দৃষ্টান্তসুন্দর শ্রুতিসুখকর অধ্যাশাস্ত্রাবিরোধী মদুক্ত শাস্ত্র তাঁহাদিগেরই শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে রাঘব! যেমন খদির তরু হইতে কণ্টকাবলী সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে সকল দুর্নিবার আপদ্ ও যে সকল নিতান্ত তুচ্ছ কুযোনি, তাহা কেবল মূর্খতা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব হে রাম! যদি হস্তে শরাব ধারণ করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত চণ্ডালগৃহদ্বারেও পরিভ্রমণ করিতে হয়, তাহাও বরং শ্রেয়স্কর, তথাপি মূর্খতাকলুষিত জীবন কখন শ্রেয়স্কর নহে। বরং ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় কূপমধ্যে অথবা ভূমিরুহগণের কোটরমধ্যে একান্তে অন্ধকীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করা শ্রেয়ঃ, তথাপি দুঃখপ্রদ মূর্খতাময় জীবনধারণ করা শ্রেয়ঃ নহে। এই মোক্ষোপায়ময় জ্ঞানালোক আসাদিত হইলে কোন মানবই আর মোহান্ধকারে অন্ধীভূত হয় না। যত দিন না বিবেকরূপ বিভাকরের বিমল বিভা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, অনর্থসার্থসাধিকা তৃষ্ণা তত দিনই মানবরূপ সরসিজের সঙ্কোচন সাধন করে।

অয়ি রঘুকুলানন্দপ্রদ! হরি, হর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং অন্যান্য ব্রহ্মর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ ও মুনিগণ ইহাঁরা যেমন জীবন্মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, তুমিও তদ্রূপ অস্মাদৃশ বন্ধুগণসহ গুরুশাস্ত্রপ্রমাণানুসারে আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া ইহসংসারে পরম সুখে বিচরণ কর। দেখ, এ

সংসার অনন্ত দুঃখের ভাণ্ডার। ইহাতে যে তৃণলবোপম অতি লঘু সুখ রহিয়াছে, তাহাও আবার অশেষ দুঃখের আকর; সুতরাং এই দুঃখানুবন্ধী সুখের প্রতি কদাপি আস্থা স্থাপন করা বিধেয় নহে। বিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত যাহা অনন্ত এবং যাহা ক্লেশপরিশূন্য, সেই পরম পদেরই সাধন করিতে সযত্নে প্রবৃত্ত হইবেন। যাঁহাদিগের মন সর্ব্বোত্তম পরম পদ অবলম্বনপূর্ব্বক বিগতজ্বর হইয়াছে, তাঁহারাই পুরুষার্থের ভাজন এবং তাঁহারাই পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। আর যাহারা রাজ্যাদি অকিঞ্চিৎকর সুখসম্ভোগমাত্রেই যথেষ্ট পরিতুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তুমি নিশ্চয় জানিও—সেই সকল দুষ্টচেতা নষ্ট পুরুষেরা অন্ধ-কূপস্থিত অন্ধ ভেক ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহারা প্রবঞ্চনাপটু, দুরন্ত দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ এবং মিত্ররূপী শত্রুতে ও ভুজঙ্গরূপী ভোগে একান্ত অনুরক্ত হয়, সেই সকল মোহমন্থরবুদ্ধিসম্পন্ন মূঢ় পুরুষেরা দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে, দুর্গম হইতে দুর্গমান্তরে, ভয় হইতে ভয়ান্তরে এবং নরক হইতে নরকান্তরে পতিত হইয়া থাকে।

হে রাম! সুখ দুঃখ ইহারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিয়া থাকে এবং ইহাদিগের অবস্থা অচিরপ্রভার ন্যায় অচিরস্থায়িনী। সুতরাং সুখানু-সন্ধানপরায়ণ মানবগণ কস্মিন্ কালেও মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। তাহারা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সুখদুঃখপ্রবাহে ভাসমান হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত-ভাবে কালাতিপাত করিতে থাকে। যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষেরা তোমার ন্যায় সম্যক্‌রূপে বিবেকবৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ভোগমোক্ষের একমাত্র পাত্র এবং তাঁহারাই সর্ব্বজনের বন্দনীয়। যদি পরমোত্তম বিবেক অবলম্বনপূর্ব্বক বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে পারা যায়; তাহা হইলেই এই আপদ্রূপিণী ভীষণ সংসারসরিৎ সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়। ফলতঃ জ্ঞানবিবেকশালী পুরুষগণের কদাপি এই বিষমূর্চ্ছনাসদৃশ সম্মোহ-দায়িনী সংসারমায়ায় অভিভূত হইয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। যে পুরুষ এই অশেষ দুঃখাকর সংসার সম্প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে অবস্থান করত ইহা হইতে নিস্ক্রান্তিলাভ করিতে সমুদ্যত হয় না, সে পুরুষ নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত গৃহমধ্যে স্তূপীকৃত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

হে সৌম্য! তুমি নিশ্চয় জানিও, যাহা প্রাপ্ত হইলে কাহারও আর পুনরাবৃত্তি বা শোকমোহাভিভূতি সংঘটিত হয় না; সেই পরব্রহ্মপদ একমাত্র বুদ্ধিবলেই লাভ করিতে পারা যায়। যদি বল, সেই পরব্রহ্মপদ নাই, তাহা হইলে বলি, সে বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিলে দোষ কি? যদি তাহা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ত বিচারবলে অনায়াসেই ভবার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে। এই সংসারবাসী পুরুষগণের মধ্যে যখন যাহার প্রবৃত্তি মোক্ষোপায়বিচারে ধাবিত হয়, তখনই তাহাকে মোক্ষভাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি সুনিপুণভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, যাহাতে কোনরূপ শঙ্কা, বিভ্রম বা অস্বাস্থ্যের লেশমাত্রও নাই, তাদৃশ অনপায়ী নিরাপদ পদ কেবল কেবলীভাব ভিন্ন ভুবনত্রয়ে অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। যদি বিচারপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তখন আর কৈবল্যপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না; তাহা অনায়াসেই সংঘটিত হইয়া থাকে। ধন, মিত্র, বান্ধব, করচরণসঞ্চালন, দেশ হইতে দেশান্তরে গমন, কায়িক ক্লেশ বা তীর্থাদিপরিসেবন, ইহার কিছুই সেই কেবলীভাবপ্রাপ্তির উপকারকারী হয় না। পরন্তু শ্রবণমননাদি পৌরুষমাত্রসাধ্য দ্বৈতবাসনাবিরোধী ব্রহ্মাকার দৃঢ়বাসনারূপ কর্ম্মবলে কেবল মনোজয় দ্বারাই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবেকমাত্রসাধ্য ব্রহ্মপদ বিচার ও একাগ্রতা দ্বারাই নিশ্চয় করিতে পারা যায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষই তৎপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুখসেব্য আসনে সমাসীন হইয়া স্বয়ং বিচারপূর্ব্বক সেই পরম পদ অধিগত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আর শোকে অভিভূত হইতে হয় না এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্মও সংঘটিত হয় না। সাধুপুরুষেরা সেই ব্রহ্মপদকেই যাবতীয় সুখধারার সীমা এবং সর্ব্বোত্তম পরম রসায়ন বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। যখন সমস্ত পদার্থেরই ক্ষয়শীলতা নিশ্চিত রহিয়াছে, তখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এতদুভয়লোকীয় সুখও সুখ নহে, প্রত্যুত মৃগতৃষ্ণায় সলিলের ন্যায় উহা একবারেই মিথ্যা।

অতএব হে রাঘব! সর্ব্বাগ্রে শান্তি ও সন্তোষ দ্বারা মনোজয় করিবার নিমিত্তই চিন্তা করা কর্ত্তব্য এবং মনোজয় হইলেই অনন্তসমসংযোগরূপ

আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্যক্‌রূপে যত্নপরায়ণ হইলে কোন প্রাণীই সেই পরম সুখলাভে বঞ্চিত হয় না। ফলতঃ স্থিতিশীল, গমনশীল, পতনোন্মুখ, ভ্রমণপরায়ণ অথবা দেব, দানব, নিশাচর কিংবা নর সকলেই সেই বিকশিত শমকুসুমসমন্বিত বিবেকমহামহীরুহের ফলস্বরূপ মনঃশান্তিসঞ্জাত পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন দিবাকর অম্বরতলে অবস্থান করিয়াও তদ্বিষয়াকাঙ্ক্ষা করে না, সেইরূপ পরমপদপ্রাপ্ত পুরুষগণ ব্যবহারপরায়ণ হইয়াও তৎফলে আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহারা ফলাভিসন্ধান পরিহারপূর্ব্বকই সর্ব্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মন প্রশান্ত, নির্ম্মল, বিশ্রান্ত, ভ্রমশূন্য, অনীহ ও অনাকাঙ্ক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে; সুতরাং তাহাতে লৌকিক বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা বা পরিবর্জ্জন এতদুভয়ের কিছুই থাকে না।

হে রাম! মোক্ষের দ্বারপ্রান্তে যে কয়েকজন দ্বারপাল অবস্থান করিতেছে, আমি যথাক্রমে তোমার নিকট তাহাদের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। তুমি নিশ্চয় জানিও,—সেই সকল দ্বারপালের মধ্যে যদি একটীর প্রতিও আসক্তি হয়, তাহা হইলেই মোক্ষদ্বারে প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই সংসাররূপ মরুস্থলী সুখাশারূপ পিপাসাদোষে নিতান্তই দুরতিক্রমণীয় হইয়াছে। ইহা কেবল শীতাংশুর প্রভা সদৃশ শমসেবা দ্বারাই জীবগণের নিকট শীতলভাব ধারণ করিয়া থাকে। একমাত্র শমসেবা দ্বারাই জীবের শ্রেয়োলাভ সঙ্ঘটিত হয়; সুতরাং শমই পরম পদ, শমই পরম শিব, শমই শান্তি এবং শমই ভ্রান্তিনিবারক। যাঁহার চিত্ত শমগুণে বিভূষিত এবং আত্মা সাতিশয় শীতল ও স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছে, সেই প্রশমতৃপ্ত পুরুষের শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের অন্তরাশয় শমরূপ সুধাকরে শোভিত হইয়াছে, তাঁহারা ক্ষীরোদার্ণবের ন্যায় নিরতিশয় বিশুদ্ধ। যাঁহাদিগের হৃদয়পদ্মকোষে শমপদ্ম বিকশিত হইয়াছে, সেই হৃদয়পদ্মদ্বয়পরিশোভী সাধু সকল হরির ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের কলঙ্কহীন মুখশশাঙ্কে শমশোভা শোভিত হয়, সেই সৌন্দর্য্যবিজিতেন্দ্রিয় সাধুকুলচন্দ্র সজ্জনগণ সর্ব্বজনেরই বন্দনীয় হইয়া থাকেন। সাধুগণের শমরূপ বিভূতিসকল যেমন আনন্দবিধায়ক হয়, এই ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিনী বিপুলসম্পত্তিও সেরূপ আনন্দজনক হয় না।

হে সৌম্য! ইহসংসারে মানবগণের যে সকল দুর্নিবার দুঃখ, দুরন্ত তৃষ্ণা ও দুঃসহ দুরাধি সমাপতিত হইয়া থাকে, শান্তচেতা পুরুষগণসমীপে তৎসমুদায় অবস্থান করিতে পারে না, প্রত্যুত প্রভাকরের তমোরাশির ন্যায় তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। প্রাণিগণের মনই অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রশান্তচেতা মানবদর্শনে মন যেরূপ প্রসন্ন হয়, ফলতঃ পূর্ণ সুধাকরের সন্দর্শন লাভেও তাদৃশ প্রসন্ন হয় না। শমশালী সাধুপুরুষ সর্ব্বভূতেই সৌহার্দ্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার নিকট পরমতত্ত্ব স্বয়ংই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। দেখ, কোমলহৃদয় ও কঠিন বা ক্রুরহৃদয় এই দ্বিবিধ পুরুষের মধ্যে কেহই যেমন স্নেহময়ী মাতাকে অবিশ্বাস করে না, সেইরূপ কি দুষ্ট, কি শিষ্ট কোন ব্যক্তিই সেই সর্ব্বত্র সমদর্শী শমশালী সাধুকে অবিশ্বাস করে না; বরঞ্চ শমশালী সাধুসন্দর্শনে সকলেই সাতিশয় বিশ্বাস প্রাপ্ত হয়। মানবের মন শমসেবায় নিরত থাকিয়া যেরূপ অতুলনীয় সুখলাভে সমর্থ হইয়া থাকে; আমার বিশ্বাস, রসায়ন পান করিয়া অথবা লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়াও সেরূপ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

হে রঘুবংশবর্দ্ধন রাম! তুমিও এক্ষণে তোমার সর্ব্ববিধ আধিব্যাধি-বিচলিত ও তৃষ্ণারূপ রজ্জু দ্বারা সমাকৃষ্ট মনকে শমরূপ সুধাসেকে সমাশ্বস্ত কর। হে বৎস! তুমি শমশীতল বুদ্ধি দ্বারা গমন ভোজনাদি যাহা কিছু কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, তোমার নিকট তৎসমস্তই পরমোপাদেয় বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত তোমার মন শমরসাস্বাদে বঞ্চিত থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত তোমার নিকট কিছুই রুচিজনক হইবে না। দেখ, মন যদি শমরূপ সুধারসে সমাপ্লুত হইতে থাকে, তাহা হইলে যে যেমন পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হয়; আমি মনে করি, তাদৃশ নির্ব্বৃতি দ্বারা ছিন্ন অঙ্গও পুনরায় প্ররূঢ় হইতে পারে। যাঁহারা শমামৃত পানে পরিতুষ্ট হইয়াছেন; এই ত্রিলোকে সেই সকল প্রশান্তাকৃতি পুরুষগণের কেহই শত্রু নাই। পিশাচ, রাক্ষস, দৈত্য, দানব, মানব, এমন কি বনবিচারী হিংসাপরায়ণ ভীষণ শার্দ্দূল অথবা ভুজঙ্গেরাও তাঁহাদিগকে দ্বেষ করে না। শমশালী সাধুদর্শনে দুর্নিবার্য্য দুর্ব্বৃত্তগণও প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে।

কার্ম্মুকমুক্ত বাণ যেমন বজ্রশিলা ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সর্ব্ববিধ দুঃখও শমামৃতরূপ বর্ম্মাবৃত ব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও অনিষ্ট সম্পাদন করিতে পারে না। যদি একজন সাধারণ ব্যক্তিও উপশমশীল সম ও স্বচ্ছ-বুদ্ধি অবলম্বন করে তাহা হইলে সে যেমন শোভিত হইয়া থাকে; আমি-বিবেচনা করি, একজন সমৃদ্ধিসম্পন্ন অন্তঃপুরবিহারী রাজাও তদ্রূপ শোভিত হন না।

মানবগণ শমাশয় সাধুপুরুষকে দর্শন করিয়া যেরূপ শান্তি ও সন্তোষ লাভ করে; বোধ হয়, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু দর্শনেও তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না। যে পুরুষ শমশালিনী সর্ব্বাভিনন্দিত বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সাধুভাবে অবস্থান করিতে থাকেন, সেই পুরুষেরই জীবন যথার্থ পক্ষে সার্থক হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও জীবন জীবন বলিয়া পরিগণিত নহে। অনুদ্ধতপ্রকৃতি শান্তহৃদয় সাধুপুরুষ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এই যাবতীয় ভূতবৃন্দ তদনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মেরই অভিনন্দন করিয়া থাকে। যিনি শুভাশুভ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন বা ভোজন করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র হর্ষ বা গ্লানিসম্পন্ন হন না; তিনিই যথার্থ শান্তপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যে পুরুষ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যিনি প্রযত্নসহকারে ইন্দ্রিয়বৃন্দ পরাজিত করিয়াছেন এবং যাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের আকাঙ্ক্ষা বা প্রাপ্ত বিষয়ের পরিহার নাই; তিনিও প্রকৃত শান্ত বলিয়া কথিত। যিনি পরের কুচক্রকৌটিল্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়াও অন্তরে ও বাহিরে নির্ম্মল সরলবুদ্ধিতে কার্য্য করিয়া থাকেন; তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া বিদিত হইবে। যাঁহার মন মরণ, উৎসব বা যুদ্ধ সকল সময়েই হিমকরবিম্বের ন্যায় নিরাকুলভাব ধারণ করে; তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে। যে পুরুষ সর্ব্বদা সুষুপ্তের ন্যায় স্বচ্ছভাবে অবস্থান করেন, যিনি স্থিত হইয়াও অস্থিতের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন এবং যাঁহার হর্ষ বা কোপের উদ্রেক হয় না; মনীষিগণ তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার পীযূষনিষ্যন্দের ন্যায় সুন্দর দৃষ্টি সর্ব্বপ্রাণির প্রতিই প্রীতিময়ী হইয়া নিপতিত হয়; বিচক্ষণ-গণ তাদৃশ সাধুপুরুষকেও শান্ত বলিয়া নিরূপিত করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তঃকরণ তাপত্রিতয়ের অপগমে শীতলভাব ধারণ করিয়াছে এবং যিনি

বিষয়সমূহে ব্যবহারপরায়ণ হইয়াও মূঢ়জনের ন্যায় তাহাতে আসক্ত হন না; তিনিও পরম শান্ত বলিয়া অভিহিত। যাঁহার মন বহুকালস্থায়ী দুরন্ত আপদ্ উপস্থিত হইলে অথবা কল্পান্তকাল সমাগত হইলেও নশ্বর দেহাদিতে অহন্তাব সমুদ্ভাবন করে না; আমরা তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকি। যাঁহার মতি আকাশসদৃশ স্বচ্ছভাব ধারণ করত কদাপি কলঙ্ক-পঙ্কে পঙ্কিল হয় না, তাদৃশ ব্যবহারপরায়ণ পুরুষও শান্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে রাঘব! এই জগতে তপস্বী, বহুদর্শী, যাজক, নরপাল, বলবান্, গুণবান্ ও গুণহীন ইত্যাদি যত প্রকার লোক বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে একমাত্র শমবান্ ব্যক্তিই সাতিশয় শোভিত হইয়া থাকেন। যেমন স্নিগ্ধকর সুধাকর হইতে কৌমুদী সমুদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শমবান্, গুণবান্, মহান্ মানবের মন হইতেও অনবরত নির্ব্বৃতিসুখ আবির্ভূত হইয়া থাকে। যতপ্রকার গুণ বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ের মধ্যে একমাত্র শান্তিই সর্ব্বোচ্চ সীমা আরোহণ করিয়াছে এবং এই শান্তিই পুরুষকারের প্রধান ভূষণস্বরূপ হইয়া ভয়স্থান, সঙ্কটস্থান সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্নরূপে বিরাজমান রহিয়াছে।

হে রঘুবংশসম্ভব! যেমন মহানুভবশালী সাধুগণ আর্য্যজনগুপ্ত অহার্য্য শমামৃত প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রভাবে পরম পদ অধিগত হইয়াছেন; তদ্রূপ তুমিও এক্ষণে মোক্ষসিদ্ধির জন্য সেই ক্রম অবলম্বন কর।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! কারণতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রাববোধপরি-মার্জ্জিত পরম পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা অনবরত আত্মবিচার করিবেন। বুদ্ধি যদি বিচারবলে ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে শক্তিমতী হয়; তাহা হইলে, তদ্দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলতঃ একমাত্র বিচারই

সংসাররূপ উৎকট ব্যাধির অদ্বিতীয় মহৌষধ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। মানবগণের আপৎরূপ অরণ্য প্রতিনিয়ত অনন্ত কামনাদি দ্বারা পল্লবিত হইতেছে, পরন্তু বিচাররূপ করপত্র দ্বারা একবার যদি ইহাকে সমূলে সমুচ্ছেদিত করা যায়, তাহা হইলে ইহা আর পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইবে না।

হে মহাপ্রাজ্ঞ! আত্মীয়জনের বিচ্ছেদ বা অশেষবিধ সঙ্কট ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখস্থানেই মোহজালে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সুতরাং এরূপ স্থলে একমাত্র বিচার অবলম্বন ব্যতীত সাধুগণের অন্য কোন গতিই নাই। বিচারই বিপশ্চিদ্‌গণের বিশিষ্ট উপায়স্বরূপ এবং এই বিচারবশতই তাঁহাদিগের বুদ্ধি অশুভকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া শুভফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল, বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল ইত্যাদি সমস্তই ধীমান্‌গণের বিচারপ্রভাবে ফলিত হইয়া থাকে। বিচারই হেয়োপাদেয়ের প্রকাশন বিষয়ে উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া যাবতীয় অভীষ্টফল সম্পাদন করিয়া থাকে; সুতরাং সাধুচরিত্র পবিত্রহৃদয় পুরুষগণ এই বিচার অবলম্বন করিতে পারিলেই সংসারপারাবারের পরপারগমনে ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন। মহামোহরূপ মাতঙ্গগণ হৃদয়ের বিবেকরূপ কমলদল বিদলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, একমাত্র বিশুদ্ধ বিচারনামধেয় প্রবল মৃগেন্দ্রই তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে। কালপ্রভাবে নিতান্ত হতবুদ্ধি ব্যক্তিগণও যে পরমপদ অধিগত হইয়া থাকে, তাহাও বিচাররূপ আলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিজৃম্ভণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

হে রাঘব! বিপুল রাজ্য, অতুলনীয় সম্পদ্, অনন্য দুর্লভ ভোগ এবং অক্ষয় মোক্ষ এই সকল সেই বিচাররূপ কল্পপাদপেরই ফল। যেমন নীরস তুম্বীফল জলমধ্যে নিমগ্ন হয় না, সেইরূপ মহাপুরুষগণের বিবেকবিকাশিনী মতিও বিপদে বিষণ্ণ হয় না। যাঁহারা বিচারোদয়কারিণী বুদ্ধিবলে ব্যবহার-পরায়ণ হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি দুর্লভ মহাফলেরও ভাজন হইয়া থাকেন। দুঃখশরপরম্পরাই প্রথমতঃ মূর্খগণের হৃদয় কাননস্থিত মুমুক্ষা-বিরোধিনী করঞ্জবল্লরীর মঞ্জরীরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব হে রাম! কজ্জলমলিনা প্রতিভাপ্রকাশিনী ত্বদীয় অবিচারময়ী নিদ্রা অচিরে ক্ষয় হইয়া যাউক্। যেমন তেজোময় মরীচিমালী কদাপি তমোরাশি মধ্যে

নিমগ্ন হন না, সেইরূপ সদ্বিচারনিরত নরগণও কখনই মহাবিপত্তিসঙ্কুল নিতান্ত দীর্ঘ মোহগর্ত্তে নিপতিত হন না। যাঁহার স্বচ্ছ মানসসরোবরে বিচাররূপ কমলকুল বিকাশপ্রাপ্ত হয়, নিশ্চয় তাদৃশ পুরুষ হিমাচলের ন্যায়ই সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইয়া থাকেন। যেমন মূঢ়তাবশতঃ বালকসমীপে বেতালের উদয় হয়, সেইরূপ বিচারবিমুখ মূর্খ মানবের নিকট নিশাকর হইতেও অশনিপাত হইয়া থাকে। হে রাম! অবিবেকী নরাধমদিগকে দূরে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বথা মঙ্গলাবহ। কেননা, ঐ সকল নরাধমেরাই দুঃখরূপ বীজরাশির স্থূলতম কুশূল ও বিপদ্রূপ নবলতিকার বসন্তকাল। যেমন নিবিড়তর অন্ধকারেই বেতাল ভয় সম্ভূত হয়, সেইরূপ যাহা কিছু দুরারম্ভ, যাহা কিছু দুরাচার এবং যাহা কিছু দুরাধি, তৎসমস্তই একমাত্র অবিচারবশেই প্রতিভাত হইয়া থাকে।

হে রঘুকুলপ্রধান! যে সকল বিচারবিহীন মানবেরা কোনরূপ সাধু-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ক্ষমবান্ হয় না; তুমি তাহাদিগকে বিজন বিপিনজাত পাদপের ন্যায় দূরে পরিত্যাগ কর। মন যেমন পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া সান্দ্রতর আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ জীবগণের মনও বিচার-পরায়ণ হইয়া দুরাশার অধীনতাপাশ সমুচ্ছেদ করিতে পারিলে পরমাত্মায় পরমোত্তম বিশ্রান্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যেমন সুস্নিগ্ধ কৌমুদিরাশি সমুদিত হইয়া ভুবনমণ্ডলের সাতিশয় শীতলতা ও শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ মানবদেহও বিবেকের আবির্ভাব হইলে সকল ব্যক্তিই সমধিক অলঙ্কৃত ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। নিশাকালে নিশাকরের যেরূপ শোভা হয়; পরমার্থের পতাকারূপিণী বিশুদ্ধ বুদ্ধির শ্বেতচামরস্বরূপ বিচারেরও তাদৃশ শোভাই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন দিবাকর করনিকর প্রসারিত করত অন্ধকাররাশির বিনাশ করিয়া দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করেন; বিচারচারু জীবন্মুক্ত জীবনিবহও তদ্রূপ বিচারপ্রকাশে প্রভূত ভূতগণের ভবভীতি বিদূরিত করত প্রতিভাত হইয়া থাকেন। রাত্রিকালে গগনমণ্ডলে মনো-মোহকল্পিত যে বেতাল বালকের প্রাণ পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে সমর্থ হয়; একমাত্র বিচারবলে তাহাই আবার বিলয়প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ জগতের যাবতীয় পদার্থই অবিচারে চারু বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু বিচার

করিয়া দেখিতে গেলে সমস্তই আবার শিলাক্ষালিত লোষ্টের ন্যায় অসার বা মিথ্যাভূত হইয়া থাকে।

রাম! এই যে সংসাররূপ চিরপ্রসিদ্ধ ভীষণ বেতাল মানবের মনোমোহে প্রকম্পিত হইয়া অনবরত অনন্ত দুঃখ প্রদানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে; ইহা কেবল বিচারবলেই বিলীন হইয়া যায়। হে রাম! যাহাতে জগদ্বৈষম্য নাই, যাহা কাহারও অধীন নহে এবং যাহা কখন বাধিত হয় না; সেই পরম সুখপ্রদ অনন্ত কেবলীভাবও বিচারনামধের মহামহীরুহেরই ফল বলিয়া পরিজ্ঞাত হও। যেমন শীতাংশুর সমুদয়ে শৈত্যের উদয় হয়, সেইরূপ বিচারবলে মোক্ষের উদয় হইলে পরমোদার নিশ্চল নিষ্কামতা সমুদিত হইয়া থাকে। পুরুষ যখন পরমোত্তম আত্মবিচাররূপ মহৌষধি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে, তখন সে কোন বিষয় বাঞ্ছা করে না এবং কোন বিষয় পরিত্যাগও করে না। যৎকালে চিত্ত সেই একমাত্র পরম পদের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আর তাহার বাসনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না; সমস্তই দুরীভূত হইয়া যায় এবং অন্তর ব্রহ্মভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় আকাশের ন্যায় তৎকালে তাহার অস্ত বা উদয় এতদুভয়ের কিছুই বিদ্যমান থাকে না। তখন সাধুপুরুষ এই বিশাল জগন্মণ্ডল কেবল সাক্ষীর ন্যায় সন্দর্শন করত অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি অনুরাগ-পরতন্ত্র হইয়া দৃশ্য বস্তুসমূহে মনঃসংযোগ করেন না এবং কোন বস্তুর দান, আদান বা উন্মন এতত্রিতয়েরও কিছুই অনুষ্ঠান করেন না; কেবল প্রশান্তভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। সাধুপুরুষেরা অন্তর বা বাহ্য এতদুভয়ের কোথাও অবস্থান করেন না, কোন প্রকারেই বিষণ্ণভাব ধারণ করেন না, কোনরূপ কর্ম্মেও লিপ্ত হন না এবং নৈষ্কর্ম্ম্য গ্রহণেও যত্নপরায়ণ হন না। তাঁহারা গত বস্তুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্প্রাপ্ত বস্তুর অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন; পরন্তু পরিপূর্ণ মহোদধির ন্যায় কিছুতেই তাঁহারা ক্ষুব্ধ বা অক্ষুব্ধভাব পরিগ্রহ করেন না।

রাম! এই জগন্মণ্ডলে মহাত্মা মহাশয় জীবন্মুক্তযোগিগণই ঐ প্রকারে পরিপূর্ণমনে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং সেই সকল জীবন্মুক্ত ধীরপ্রকৃতি পুরুষগণই ইহজগতে ইচ্ছানুসারে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া পরে উপাধি-

আভাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অপরিচ্ছিন্ন বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ধীমান্ পুরুষ আত্মীয় কুটুম্বাদির ভরণপোষণে ব্যাপৃত কিংবা মহাবিপদে পতিত হইলেও প্রযত্নসহকারে প্রতীকারপুরঃসর 'আমি কে? এ সংসার কাহার?' ইত্যাদি চিন্তা করিবেন। হে রঘুবর! যে ব্যক্তি রাজপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; কোনরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য কষ্টকর সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনিও তৎকার্য্যের সাফল্য বা বৈফল্যের বিষয় একমাত্র বিচারবলেই অবধারিত করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন না। যেমন নিশাকালে দীপালোকে স্থান নির্ণয় হয়; সেইরূপ বিচারপ্রভাবেই পুরুষার্থপ্রতিষ্ঠার প্রাপক বেদ-বেদান্তসিদ্ধান্ত বিনির্ণীত হইয়া থাকে। রাম! এই বিচাররূপ চারু চক্ষু এমনি চমৎকারকর হয় যে, ইহা প্রগাঢ়তর অন্ধকারেও বিনষ্টশক্তি হয় না, প্রখরতর তেজোমধ্যে নিপতিত হইলেও প্রতিহত হয় না এবং অতি দূরস্থিত বস্তুদর্শনেও অপারগ হয় না। যাহার বিবেক-নয়ন নাই, তাদৃশ দুর্ম্মতি ব্যক্তিই প্রকৃত অন্ধ ও সর্ব্বজনের শোচনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর যিনি বিবেকী হইয়া দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট কোন বস্তুই অজিত থাকে না; তিনি বিচাররূপ দিব্যচক্ষুপ্রভাবে নিখিল বস্তুই আয়ত্ত করিয়া থাকেন। অতএব সেই মাননীয়া মহানন্দসন্দোহজননী পরমাত্মরূপিণী বিচারচমৎকৃতি ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যেমন পরিপক্ক সহকার-ফল সর্ব্বত্র সর্ব্বজনেরই রুচিবিধায়ক হয়; সেইরূপ বিচারবান্ সাধুপুরুষও কি ক্ষুদ্র, কি মহান্, সর্ব্ব ব্যক্তিরই সমাদৃত ও সাতিশয় প্রিয় হইয়া থাকেন। [illegible] গমনাগমন সময়ে পথাভিজ্ঞ সুমতি ব্যক্তি পথিস্থিত গর্ত্তাদিমধ্যে [illegible] হন না; সেইরূপ বিচারকমনীয়চেতা নরগণও কদাপি দুঃখজালে

[illegible] অবিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মাকে [illegible]; তাহারা যেরূপ জন্মপরম্পরায় রোদনপরায়ণ হয়, [illegible] অনর্থপরম্পরায় জর্জ্জরিত ভীষণ রোগগ্রস্ত [illegible] হয় না। যদি পঙ্কনিমগ্ন ভেক, মলমধ্যগত [illegible] হইয়াও অবস্থান করিতে হয়; তাহাও [illegible]

বরং শ্রেয়ঃ ; তথাপি বিচারবিহীন হওয়া কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যাহা অশেষ প্রকার অনর্থপরম্পরার আকর এবং যাহা সাধুসম্প্রদায় কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ; সেই সর্ব্বদুঃখের সীমান্তস্বরূপ অবিচার পরিহার করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। যাঁহারা মহানুভব মহাপুরুষ, তাঁহারা সর্ব্বদাই বিচারনিরত হইয়া অবস্থান করিবেন। ফলতঃ অন্ধকূপে নিপতিত হইলেও একমাত্র বিচারই তখন অবলম্বনীয় হইয়া থাকে।

রাম! সাধু পুরুষ বিচারবলে আপনিই আপনাকে স্থিরীকৃত করিয়া পরে এই সংসারমোহরূপ মহোদধি হইতে স্বীয় মনোরূপ মৃগকে সমুত্তারিত করিবেন। "আমি কে?" এবং "কি প্রকারে এই সংসারনামধেয় দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল?" শ্রুত্যাদিদর্শিত ন্যায়ানুসারে এবম্বিধ পরামর্শকেই বিচারজ্ঞগণ বিচার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বিচারবিহীন দুর্ম্মতি-জনের হৃদয় সাক্ষাৎ পাষাণ, অন্ধ হইতেও অন্ধ এবং নিবিড়তর মোহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগেরই হেতু হইয়া থাকে। হে রাঘব! যাহারা সত্য কিংবা অসত্য সন্দর্শনে সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাদৃশ পুরুষগণও একমাত্র বিচার ব্যতীত কোনরূপ সাধুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। বিচার হইতেই তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তি সঙ্ঘটিত হয় এবং আত্মবিশ্রান্তি হইতেই সর্ব্বদুঃখপরিক্ষয়কারিণী পরমা শান্তি সমুদিত হইয়া থাকে।

অয়ি রঘুকুলানন্দ! যখন দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র বিচারদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক ইহ জগতে যাবতীয় লোকই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম-পরম্পরার অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তর তৎ তৎ কর্ম্মসমূহের সফলতালাভে পরমোত্তমতা প্রাপ্ত হইতে অধিকারী হইয়া থাকে ; তখন তুমি শমশালী পুরুষ,—তোমারও এক্ষণে এই বিচারশালিতা প্রীতিবিধায়িনী হউক।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অরিন্দম! মোক্ষদ্বারস্থিত তৃতীয় দ্বারপাল সন্তোষ। সন্তোষ পরম মঙ্গলের আলয়, সন্তোষই পরমোত্তম সুখ বলিয়া নিরূপিত এবং সন্তোষপরায়ণ পুরুষগণই পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সন্তোষরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যলাভে পরম সুখ অনুভব করত অন্তঃকরণে চিরবিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন; সেই সকল শান্তহৃদয় সাধুগণ-সমীপে সাম্রাজ্যও জীর্ণ তৃণলবের ন্যায় নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের মতি সন্তোষশালিনী হয় তাঁহারা রোগ শোক, বিয়োগ, দৈন্য ও দারিদ্রপ্রভৃতি বৈষম্যসঙ্কুল সংসারব্যবহারে দৈবাৎ লিপ্ত হইয়াও কদাপি উদ্বিগ্ন বা সুখপরিহীন হন না। যে সকল শান্তহৃদয় সাধু-পুরুষ সন্তোষরূপ পীযূষপানে পরম পরিতৃপ্ত লাভ করেন; তাঁহাদিগের নিকট অতুলনীয় ভোগসম্পত্তিও প্রতিকূল বিষের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ অশেষদোষবিনাশী সাতিশয় মধুরাস্বাদশালী সন্তোষ যেরূপ সুখ সমুদ্ভাবন করে, আমি বিবেচনা করি, পীযূষরসের তরঙ্গাবলীও তাদৃশ সুখ সমুৎপাদিত করিতে সমর্থ হয় না।

হে রাঘব! যে পুরুষ অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষী হন না এবং প্রাপ্ত বিষয়েও হর্ষাদিবিহীন হন; ইহ জগতে তাদৃশ সুখদুঃখশূন্য পুরুষই সন্তুষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। মন যতকাল পর্য্যন্ত না আপনিই আপনাতে সন্তোষ অনুভব করিতে পারে; ততকাল পর্য্যন্তই মনোরূপ বিল হইতে আপদ্রূপ ব্রততিরাজি সমুৎপন্ন হইতে থাকে। যেমন দিবাকরের করনিকরে নলিনদল বিকসিত হয়, সেইরূপ সন্তোষশীতল অন্তঃকরণও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানদৃষ্টিসহায়ে নিতান্ত বিকশিত হইয়া থাকে। মলিন মুকুরে যেমন মুখপ্রতিবিম্ব নিপতিত হয় না; সেইরূপ সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইলেও আশাবেশবিকল সন্তোষহীন অন্তঃকরণে কখন জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় না। যাঁহার নিকট নিরন্তর সন্তোষরূপ সরোজবন্ধু সমুদিত রহিয়াছেন; সেই

মানবরূপ সরোজ কখন অজ্ঞানরূপিণী নিবিড়ান্ধকারময়ী রজনীতে সঙ্কুচিত হয় না। যাহার মানস সর্ব্বদা সন্তোষে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, কোনরূপ আধিব্যাধি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং সে ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও অসীম সাম্রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যিনি অসম্প্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ না করিয়া ক্রমপ্রাপ্ত সুখদুঃখ ভোগ করিতে থাকেন; সেই জগদানন্দজনক আচারসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠই সন্তুষ্ট বলিয়া কথিত। যে সকল পূর্ণচেতা বিশুদ্ধহৃদয় মহাপুরুষগণ সন্তোষামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন; লক্ষ্মী তাঁহাদিগের মুখে ক্ষীরসাগরের ন্যায় বিরাজ করিয়া থাকেন।

হে রাম! ধীশক্তিশালী পুরুষ প্রযত্নসহকারে স্বয়ং আপনাতে প্রচুরতর আনন্দরূপ পূর্ণতা অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বত্রেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিবেন। যিনি শীতাংশুর ন্যায় সন্তোষামৃতে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন; তাদৃশ ব্যক্তির অন্তঃকরণ শমশীতল বুদ্ধিবলে সতত স্বয়ংই স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কিঙ্করগণ রাজার উপাসনা করে; সেইরূপ মহতী সমৃদ্ধিও সন্তোষ-সম্পুষ্টমনা মানবের কিঙ্কর হইয়া উপাসনা করিতে থাকে। যেমন বর্ষাজল-নিপাতে ধূলিপটল প্রশমিত হইয়া যায়, সেইরূপ স্বয়ংস্বস্থ সন্তোষাবলম্বী পুরুষগণেরও সমুদায় আধিব্যাধি বিদূরিত হইয়া থাকে। হে রাম! কলঙ্ক-বিহীন সুশীতল সুপরিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি দ্বারা পুরুষগণ প্রতিনিয়ত পূর্ণ সুধাকরের ন্যায়ই বিরাজিত হইয়া থাকেন। মানুষেরা শান্তিগুণাবলম্বী পুরুষের সমতাসুন্দর সুবিমল মুখমণ্ডল সন্দর্শন করত যাদৃশ পরিতোষ লাভ করে; সুবিপুল ধনরাশির সঞ্চয় দ্বারাও তাদৃশ সন্তোষলাভে সমর্থ হয় না।

হে রঘুনন্দন! যিনি গুণগণপরিশোভী পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম শমগুণে সমলঙ্কৃত হইয়া থাকেন; দেবগণ, মহর্ষিগণ ও মহামুনিগণও সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সাধু ব্যক্তিকে সতত নমস্কার করিয়া থাকেন।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মতিমন্! মোক্ষদ্বারের চতুর্থ দ্বারপাল সাধু-সমাগম। এই সাধুসমাগম সঙ্ঘটিত হইলেও মানবগণ সংসারোত্তরণ বিষয়ে বিশেষরূপে উপকৃত হইতে পারে। সাধুসঙ্গরূপ তরু হইতে যে বিবেকরূপ সুরম্য কুসুম সমুৎপন্ন হয়; যত্নপূর্ব্বক যাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই মোক্ষফল ভোগ করিতে সমর্থ। সাধুজনের সমাগম হইলে দুঃখ সুখে, মৃত্যু উৎসবে এবং আপদও সম্পদে পরিণত হয়। এই জগতে সর্ব্বোৎকর্ষশালী একমাত্র সাধুসঙ্গই আপৎরূপ নলিনীর হিম ও মোহরূপ নীহারের মারুতরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! তুমি নিশ্চয় জানিও,—পরমোত্তম সাধুসঙ্গ সঙ্ঘটিত হইলে, বুদ্ধি বিবর্দ্ধিত, অজ্ঞানতরু বিনাশিত এবং সর্ব্বপ্রকার মানসী ব্যথা নিরাকৃত হইতে পারে। যেমন উদ্যানমধ্যে জলসিঞ্চন করিলে মনোহর পুষ্পগুচ্ছ সকল সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ সাধুজনের সংসর্গ করিলেও হৃদয় মধ্যে পরমোজ্জ্বল বিবেকদীপ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

রাম! একমাত্র সাধুসঙ্গরূপ বিভূতি হইতেই সেই অপায়হীন বিঘ্ন-বিহীন পরমসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি পদে পদে ভীষণ বিপদ্‌জালে জড়িত হইয়া দুঃসহ দুঃখদশায়ও উপনীত হইতে হয়; তথাপি মুহূর্ত্তকালের জন্যও সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করা কাহারও উচিত নহে। সাধুসংসর্গে সমুদায় সদাচার প্রকাশিত হয়, হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং পরক্ষণে জ্ঞানরূপ বিভাকর বিভাসিত হয়। যিনি সাধুসঙ্গতিরূপ সুবিমল গঙ্গাসলিলে সতত অবগাহন করেন; দান, তপস্যা, তীর্থসেবা বা যাগযজ্ঞাদি এ সমুদায়ে তাঁহার আর প্রয়োজন কি? হে অনঘ! যাহাঁদিগের সর্ব্বসংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং যাঁহারা দুর্ব্বাসনাদি দোষরাশি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল বীত-রাগ সাধুপুরুষেরা যদি সম্মুখে বিদ্যমান থাকেন; তাহা হইলে তপস্যা বা তীর্থপরিসেবনাদির কোন প্রয়োজনই হয় না। মহামূল্য মণি যেমন দরিদ্র

জনের সন্দর্শনীয় হয়; সেইরূপ শান্তচেতা শ্লাঘ্যতম সাধুগণও সকলেরই সাতিশয় যত্নসহকারে সন্দর্শনীয় হইয়া থাকেন। কোমলাকৃতি কমলা যেমন অপ্সরোগণমধ্যে বিরাজিত হন; সাধুসংসর্গজনিত সৌন্দর্য্যশালিনী ধীমান্‌গণের মতিও তদ্রূপ সতত শোভাশালিনী হইয়া থাকে। যে সকল ধন্যপুরুষ সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করেন না; তাঁহারাই সেই বিমল বিচারলভ্য ব্রহ্মপদ সর্ব্বপ্রথমে চূড়ামণিরূপে গ্রহণ করত পরে প্রথিত করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন অহঙ্কারপরিশূন্য সর্ব্বসম্মত সাধুপুরুষগণ ভবসাগর-তরণের উপায়স্বরূপ। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে সেবা করা কর্ত্তব্য। যাহারা নরকানলনির্ব্বাণকারী নীরদস্বরূপ সাধুগণকে অবজ্ঞা-সহকারে অবলোকন করে; তাহারাই নিতান্ত অসাধু এবং তাহারাই নরকাগ্নির শুষ্ক ইন্ধনস্বরূপ। হে রাঘব! দারিদ্র, মৃত্যু ও দুঃখ ইত্যাদি যে সকল বিষয়রোগ আছে; একমাত্র সাধুসঙ্গই তৎসমুদায় প্রশমিত করিবার অদ্বিতীয় মহৌষধ। সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, বিচার ও শম এই চারিটীই মানবনিবহের ভবপারাবারের পরপারগমনের উপায়স্বরূপ। সন্তোষই পরম লাভ, সাধুসংসর্গই পরম গতি, তত্ত্ববিচারই পরম জ্ঞান এবং শমই পরম সুখ। যাঁহারা ভববন্ধনবিমোচনের অত্যুত্তম উপায়স্বরূপ সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, তত্ত্ববিচার ও শম এই চারিটীকে অভ্যাস করিতে পারেন; তাঁহারাই মোহ-জলময় ভবসাগরতরণে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

হে প্রাজ্ঞগণের অগ্রণী! ঐ সন্তোষাদি উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে যদি একটীকেও আয়ত্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তৎসঙ্গে অপর তিনটীও আয়ত্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের এক একটীই সমস্ত কয়টীর উৎপত্তি স্থান; সুতরাং সিদ্ধিলাভ করিবার নিমিত্ত অন্ততপক্ষে যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগের একটীকেও অবলম্বন করা বিধেয়। যেমন অর্ণবপোত অতিসাবধানে সাগরে গমন করে; সেইরূপ সাধুসঙ্গ, সন্তোষ ও বিচার ইহারাও অতি সতর্কতার সহিত শমপরায়ণ পুরুষসমীপে গমন করে। যেমন কল্পপাদপাশ্রিত পুরুষের নিকট সৌভাগ্যলক্ষ্মী সমুপাগত হইয়া থাকেন; সেইরূপ বিচার, সন্তোষ, সাধুসঙ্গ ও শম এতচ্চতুষ্টয়পরায়ণ পুরুষসমীপেও জ্ঞানসম্পত্তি স্বয়ংই সমাগত হইয়া থাকেন। যেমন পূর্ণনিশাকরে সৌন্দর্য্যাদি গুণরাশি আপনা হইতেই

প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ বিচার, সাধুসঙ্গ, সন্তোষ ও শমাবলম্বী পুরুষে প্রাসাদাদি গুণরাশি স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হয়। মন্ত্রণাগোপনকারী নরপতির যেমন বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কগামিনী হয়; সেইরূপ শমসন্তোষাদিসম্পন্ন সাধু-সমীপেও জয়শ্রী সমাগত হইয়া থাকে।

অতএব হে রঘুনন্দন! পুরুষকারবলে মনোজয়পূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে প্রতিনিয়ত ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি গুণেরও আশ্রয়গ্রহণ করা সর্ব্বথা বিধেয়। যত দিন পর্য্যন্ত না প্রবল পুরুষকারসহায়ে চিত্তরূপ মত্তগজকে বিজিত করিয়া উক্ত গুণচতুষ্টয়ের অন্যতম গুণ অর্জ্জন করিতে পারা যায়; তাবৎ পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হে রাম! যাবৎ পর্য্যন্ত না তোমার মন গুণার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হইবে; তুমি তাবৎ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্যম অবলম্বন করিবে। তুমি পুরুষ, পাদপ, যক্ষ বা দেব যাহাই হওনা কেন, যতদিন না ঐ সকল গুণ আয়ত্ত করিতে পারিবে, ততদিন কোন উপায়ই প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। যদি ঐ সকল গুণের মধ্যে একটী মাত্রও ফলপ্রদ গুণ অভ্যাসযোগে দৃঢ়ীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও বিবশচেতা পুরুষের যাবতীয় দোষ অচিরে ক্ষয় হইতে পারে। দেখ, যদি একটীগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে অশেষ-দোষনাশী অন্যান্য গুণরাশিও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এইরূপে আবার একটী দোষ বর্দ্ধিত হইলেও গুণগণনাশন অশেষ দোষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাম! শুভাশুভরূপ বিপুল কূলশালিনী বাসনারূপিণী বেগবতী তটিনী সতত জীবগণ মধ্যে মনোমোহরূপ নিবিড় বনে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি এই তটিনীকে প্রযত্নপূর্ব্বক শুভ ও অশুভ এই কূলদ্বয়ের মধ্যে যে কূলে নিপাতিত করিবে, ইহা তৎক্ষণাৎ সেই কূল ধরিয়াই প্রবাহিত হইবে; অতএব এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম সমাধা কর। অয়ি রঘুবংশভূষণ রাম! এই মনোবনপ্রবাহিণী বাসনারূপিণী 'মহানদী যাহাতে শুভতটেরই অনুগামিনী হইয়া প্রবাহিত হয়, তুমি এক্ষণে ক্রমান্বয়ে পৌরুষপ্রভাবে তাহারই অনুষ্ঠান কর। হে মহামতে! এইরূপ করিলে তোমাকে আর কদাচ অশুভপ্রবাহে বিচলিত হইতে হইবে না।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! এইরূপে যাঁহার অন্তরে বিবেকের উদয় হয়, ইহসংসারে তিনিই মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নরপতি যেমন নীতি-কথা-শ্রবণের যোগ্য পাত্র, উক্ত বিবেকী ব্যক্তি তেমনি জ্ঞান-গর্ভ বাক্যাবলী শ্রবণ করিবার প্রকৃত অধিকারী। মেঘসঙ্গ-হীন গগন যেমন শারদ সুধাকরের সন্নিধান স্থান, সেইরূপ অজ্ঞান-সঙ্গ-শূন্য নির্ম্মলপ্রকৃতি মহাশয় পুরুষই বিশুদ্ধ তত্ত্ব-বিচারের যোগ্য পাত্র। তুমি তথাকথিত গুণ-সম্পদের আধার হইয়াছ; সেই নিমিত্ত তোমার নিকট এই মানস-মোহ-বিনাশক উপদেশবাণী বলিব, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যাহার পুণ্যরূপ কল্পবৃক্ষ ফলভারে নম্র হইয়া রহিয়াছে, তাদৃশ পুরুষই মুক্তি-লাভার্থ মদুক্ত বাক্যে কর্ণপাত করিতে সমুৎসুক হইবে। যে সকল পরম পবিত্র উপদেশবাণী একমাত্র পরম জ্ঞানের প্রদানকর্ত্রী, যিনি উল্লিখিত গুণসমূহে সম্পন্ন, আত্মোন্নতির জন্য তিনিই কেবল তৎসমস্ত শ্রবণ করিবার অধিকারী; এতদ্ভিন্ন যে অধম ব্যক্তি উক্ত গুণে বর্জ্জিত, তাহার ইহাতে শ্রবণাধিকার নাই। সকল সংহিতার সারস্বরূপ এই সংহিতায় মোক্ষোপায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই সংহিতা দ্বাত্রিংশৎ সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন নিশাকালে নিদ্রাহীন ব্যক্তির পুরোভাগে প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকিলে উক্ত দর্শকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলোক আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ এই সংহিতা শ্রবণ করিলে নিরাশ ব্যক্তিরও অন্তরে অনায়াসে মোক্ষসাধন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মন্দাকিনীর মাহাত্ম্য-কথা সম্যক্ পরিজ্ঞাত, পর-মুখে বর্ণিত বা স্বয়ং শ্রুত হইলে তাহা যেমন ভ্রমজনিত পাপ তাপ বিদূরিত করিয়া সুখশান্তি সম্পাদন করে, সেইরূপ এই সংহিতা সুচারু-পরিশীলনে পরিজ্ঞাত, পর-বর্ণিত বা স্বয়ং সংশ্রুত হইলে সংসার ভ্রম-নিরাস করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ সন্বিধান করিয়া থাকে। যেমন সুনিপুণ সন্দর্শনে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম নিরাকৃত হয়,

সেইরূপ এই সংহিতা প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইলে সংসারের সর্ব্বদুঃখ শান্তিতে পরিণত হইয়া থাকে।

এই সংহিতায় ছয়টী বিভিন্ন প্রকরণ কল্পিত হইয়াছে। ঐ প্রকরণ-গুলির বাক্যাবলী যুক্তিযুক্ত, অর্থসম্পন্ন এবং উহাতে সদৃষ্টান্ত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা বর্ণিত।

ঐ সকল প্রকরণের মধ্যে প্রথম প্রকরণ বৈরাগ্য। এই প্রকরণ পাঠ করিলে, সলিল-সেচনে মরুভূমিতেও যেরূপ বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ বৈরাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই বৈরাগ্যপ্রকরণ সার্দ্ধ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ। মার্জ্জন করিলে মণির মালিন্য যেমন বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ এই প্রকরণ-গত শ্লোকগুলির বিচার করিয়া দেখিলেও অজ্ঞান-জন্য বুদ্ধিমালিন্য তিরোহিত হয়; মন বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে।

অনন্তর দ্বিতীয় প্রকরণ মুমুক্ষু-ব্যবহার। এই প্রকরণের শ্লোক-সংখ্যা এক সহস্র। ইহা নানাবিধ যুক্তিবাদের সঙ্কলনে সুশোভিত। এই প্রকরণে মুমুক্ষু-মানবগণের স্বভাবাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী তৃতীয় প্রকরণ উৎপত্তিসংজ্ঞায় অভিহিত। এই উৎপত্তি-প্রকরণ নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা সপ্ত সহস্র। এই প্রকরণ, পাঠক এবং শ্রোতার জ্ঞান উৎপাদন করে। ইহাতে 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদিরূপ জাগতিক দ্রষ্টৃ ও দৃশ্যভেদ বর্ণিত হই-য়াছে। ঐ দৃষ্টৃ-দৃশ্যভেদ উৎপত্তিহীন হইলেও ইহাতে উহা উৎপন্নবৎ প্রতীত ভাবে বর্ণিত। এই প্রকরণ শ্রবণ করিলে আমি, তুমি, জগদ্বিস্তার, নিখিল লোক, আকাশ ও পর্ব্বত, ইত্যাদি চরাচরাত্মক সমস্ত সংসারই মূর্ত্তি-রহিত, অমূলক, অপর্ব্বত, ও পৃথিব্যাদি-ভূতবিহীন বলিয়া শ্রোতার অন্তরে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যিনি এই উৎপত্তি প্রকরণ শ্রবণ করেন, সংসারের অকিঞ্চিৎকরতা স্পষ্টতই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি ধারণা করিতে থাকেন, এ সংসার কিছুই নহে; ইহা মনঃকল্পিত রাজধানীর ন্যায় মনো-রথ মাত্র, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অলীক, মনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ন্যায় নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত, মরীচিকার ন্যায় ভ্রান্তি-বিলসিত, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসার, দ্বিচন্দ্র কল্পনার ন্যায় ভ্রম-পরিপূর্ণ এবং পিশাচবৎ মোহ-পরিকল্পিত।

বাস্তবিক উহাতে সত্য বা পুরুষার্থের সম্পর্কমাত্র নাই। নৌকার দ্রুতগমন-কালে নৌকারোহী ব্যক্তি যেমন তীরগত পর্ব্বতাদির ও সঞ্চলন অনুভব করে, কিম্বা অদূরদর্শী যেমন ভ্রান্তিবশে আকাশে মুক্তাবলী, কনকে কটক, সলিলে তরঙ্গ ও গগনগাত্রে নীলিমা নিরূপণ করিয়া লয়, সেইরূপ অনভিজ্ঞ সংসারা-সক্ত দেহী, এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা বা সত্তাহীন হইলেও কেবল মোহ-বশতই উহাকে সত্য বলিয়া কল্পনা করে। বস্তুতঃ যেমন ভিত্তিহীন, বর্ণক-বিহীন ও কর্ত্তৃ-বিরহিত চিত্র, স্বপ্নযোগে কিম্বা আকাশে ভ্রান্তিবশে পূর্ব্বানুভূতির স্মৃতিরূপে প্রকাশমান হয়, এই জগৎ বিবেকীর নিকট সেইরূপেই বিলসিত হইয়া থাকে। আলেখিত অনল যেমন অনল না হইলেও অনলবৎ অব-লোকিত হয়, সেইরূপ এই সংসার অসার বা অসৎ হইলেও সত্যবৎ প্রতীত বা জগৎ পদ-বাচ্য হইতেছে। যেমন জলতরঙ্গে উৎপলমালা ভ্রম,* পূর্ব্বদৃষ্ট নৃত্য-ব্যাপারের পুনঃস্মরণে সাক্ষাৎ অনুভূতি এবং চক্রবাকের চীৎকাররবে আকাশে জলাশয় কল্পনা,† সেইরূপ এই সংসার তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর।

বাস্তবিক এই প্রকরণ শ্রবণে মনে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয়, যাহাতে এই সংসার নিদাঘকালের পতিত পত্র ও ছায়া-ফল-কুসুম-পরিশূন্য জীর্ণ অরণ্যবৎ অসার ও নীরস বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে থাকে এবং উহা মৃত্যু-মুখ-পতিত মানুষের মনের ন্যায় ভ্রান্তিসঙ্কুল ও চঞ্চল, গিরিগুহার ন্যায় শূন্যময় ও ভীষণ এবং তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বতগহ্বরে একক নৃত্যের ন্যায় উন্মত্ত-চেষ্টিত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। আরও অনুভূত হয়,—স্তম্ভ-সমুৎকীর্ণ ও ভিত্তিলিখিত চিত্র এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সচেতন প্রতিমূর্ত্তি ও অচেতন পদার্থ, এই সমস্তের ন্যায় এই সংসারের উপাদান-সত্তা ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান নাই। পরমার্থত দেখিতে গেলে এই সংসার অজ্ঞান-নীহার-রহিত

* দূর হইতে তরঙ্গ দেখিলে মনে হয়, যেন জলোপরি কমলমালা ভাসিয়া যাইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কেবল জলেরই সন্নিবেশবিশেষ।

† চক্রবাক পাখী আকাশে চীৎকার করিয়া বেড়ায়, তার চীৎকারে মনে হয় যেন সেখানে জল রহিয়াছে; কিন্তু আকাশে জল নাই, সেথায় শুধু চীৎকারই মাত্র। এইরূপ এই জগৎস্থিতিও শুধুই ভ্রান্তিকল্পনা।

বিজ্ঞানময় শারদীয় আকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। ফলে অজ্ঞান-বিকারের অপগমে এ-সংসার পরব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়।

অতঃপর চতুর্থ স্থিতি-প্রকরণ। এই প্রকরণ তিন সহস্র শ্লোকে গ্রথিত। প্রপঞ্চসহ পরমার্থ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও নানাবিধ আখ্যায়িকায় ইহার কলেবর পরিপূর্ণ। ইহাতে এই জগতের অহঙ্কাররূপে স্থিতিপ্রাপ্তি এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ক্রম কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুবিশাল দশ দিঙ্মণ্ডলে এই জগদ্‌ভ্রম কেমন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে সবিশেষ বর্ণিত আছে।

অনন্তর পঞ্চম প্রকরণ উপশান্তি বা উপশম। এই প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা পঞ্চ সহস্র। ইহা পরম পবিত্র ও নানাবিধ যুক্তিবাদে সুশোভিত। ইহাতে 'এই জগৎ, আমি, তুমি, সে' ইত্যাদি প্রকার উৎপন্ন ভ্রমের উপশান্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকরণ শ্রবণে ক্রমশ সংসারভ্রম উপশান্ত হইতে থাকে। শ্রোতা জীবন্মুক্তভাবে তৎকালে অবলোকন করেন,—এই সংসার চিত্রার্পিত বিশীর্ণ সৈন্যদলের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট এবং ভ্রান্তরূপের প্রশান্তিবশতঃ উহা শতাংশের একাংশে পর্য্যবসিত। কোন ব্যক্তি নিজের মনে মনে রাজধানী স্থাপন কল্পনা করিতেছে, তদীয় পার্শ্ববর্ত্তী অপর কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় রাজ্যভোগ সুখ অনুভব করিতেছে এবং সে রাজ্য রক্ষার জন্য স্বপ্নযোগেই সংগ্রাম করিতেছে ও কত কি উচ্চরব করিতেছে; পরন্তু তাহা হইতে বাস্তবপক্ষে কোনই লাভ হইতেছে না। এবম্ভূত রাজধানী বা রাজ্য—যে ব্যক্তি কল্পনা করিতেছে, তাহার পক্ষে অল্প-লক্ষিত, আর যে ব্যক্তি স্বপ্নদর্শী, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ লক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা যেমন অসত্য, সেইরূপ এই সংসার কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষিত এবং অপর সাধারণের নিকট সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইলেও বাস্তবপক্ষে অসত্য ব্যতীত কিছুই নহে।

ক্রমশঃ সঙ্কল্পের উপশম হইলে সঙ্কল্প-কল্পিত মত্ত-মাতঙ্গ-নিভ নিরঙ্কুশ ঘনঘটার ভীষণ বজ্রধ্বনি, স্বপ্ন-কল্পিত বা সঙ্কল্প-কল্পিত নগরের বিস্মৃতি, ভাবা নগরোদ্যানে বন্ধ্যানারীর সন্তান প্রসব এবং জিহ্বাহীন মানব কর্ত্তৃক বন্ধ্যা নারীর বীরপুত্রের চরিত্র বর্ণনা কিম্বা বন্ধ্যা নারীর প্রসব-

যন্ত্রণা-বর্ণনার অর্থানুভূতি যেমন মিথ্যা, শূন্যময়, অলীক ও অসত্য, এই সংসারও সেইরূপই প্রতীত হইয়া থাকে। কাহারও নিকট এই সংসার অস্ফুট চিত্ররচনাময় ভিত্তিভূমির ন্যায় এবং বিস্মরণবশে বিলুপ্তপ্রায় কল্পনা-কলিত নগরীর ন্যায় অস্পষ্ট ছায়ামাত্রে অনুভূত হইয়া থাকে। কেহ বা সর্ব্বঋতুতে সমভাবাপন্ন ভাবী অরণ্যের স্পন্দনের ন্যায় কিম্বা কল্পিত কুসুম-কাননে বসন্ত-সমাগমের ন্যায় ইহাকে কল্পনা-কলিতরূপে অনুভব করেন এবং অপর কেহ বা এই সংসারকে অন্তর্লীন-তরঙ্গশালিনী স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রশান্ত-রূপ মনে করিয়া থাকেন।

অনন্তর ষষ্ঠ প্রকরণ নির্ব্বাণাখ্য। এই প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ সহস্র। ইহা জ্ঞানরূপ মহান্ অর্থের দানকর্ত্তা। এই প্রকরণ পরিজ্ঞাত হইলে মূল অবিদ্যার উচ্ছেদ বশতঃ নিখিল কল্পনা বিদূরিত হয় এবং নির্ব্বাণ-রূপ নিঃশ্রেয়স অধিগত হইয়া থাকে, তখন বিজ্ঞানাত্মা বা জীব নির্ব্বিষয়, নিরাময় ও শুদ্ধচিৎপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহার যাবতীয় সংসার ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। তিনি পরম আকাশ-কোশের ন্যায় নির্ম্মলরূপে প্রতিভাত হইতে থাকেন। তাঁহার যাবতীয় জগদ্‌যাত্রা এই সময় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হওয়ায় তিনি তখন সুস্থির বা সমত্বসম্পন্ন হন। হীরকমণিময় স্তম্ভ যেমন সম্মুখাগত লোক-সকল ও তাহাদিগের কার্য্য-পরম্পরার আশ্রয় হয়, সেইরূপ তিনিও তৎকালে পূর্ণাকারে প্রতিভাত হইয়া নিখিল লোক ও তাহাদিগের সেই সেই কার্য্যাবলীর আধাররূপে বিরাজ করিতে থাকেন। অখিল জগৎ তৎকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই যেন তিনি অত্যধিক তৃপ্তিসম্পন্ন হন। তাঁহার সমগ্র বহিরিন্দ্রিয় ভোগ ও মানস তখন চিদাকাশে পরিণত হইয়া থাকে। তৎকালে তাঁহার সমস্ত কার্য্যত্ব, কারণত্ব ও কর্ত্তৃত্বের প্রতি হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব বিদ্যমান থাকে না।

ঐ সময়ে তিনি দেহ সত্ত্বেও দেহহীন এবং সংসারসম্পন্ন হইলেও সংসার-বর্জ্জিত হন। তিনি তখন ঘন পাষাণ-জঠরের ন্যায় অখণ্ড চিন্ময় অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে দৃশ্যমাত্রেই বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তখন লোকপ্রকাশক পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইলেও যেন

প্রগাঢ় অন্ধকার-শিলার ন্যায় দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সংসার-দুর্লীলা তখন তাঁহার নিবৃত্ত হয়, আশারূপিণী বিসূচিকা বিনাশ পায় এবং অহঙ্কাররূপী বেতাল বিদূরিত হইয়া থাকে। তিনি দেহবান্ হইলেও দেহে তাঁহার তখন দেহত্ব জ্ঞান থাকে না। যেমন সুমেরু-শৈলস্থ কোন একটি কুসুমোপরি মধুকরী বাস করে, সেইরূপ তদীয় রোমা-গ্রবৎ পরিচ্ছিন্ন অবিদ্যার এক দেশে এই জগৎসমৃদ্ধি বিরাজ করিতে থাকে। চিদাকাশ স্বীয় অন্তঃকরণ-কল্পিত আকাশরূপ প্রত্যেক পরমাণুতে সহস্র সহস্র জগৎসমৃদ্ধি উৎপাদন করিতে এবং উৎপাদন করিয়া দর্শন করিতেও সক্ষম হইয়া থাকেন। মহামতি জীবন্মুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ই পর-মাত্মা; সুতরাং সেই পরমাত্মার বিস্তার শত লক্ষ হরি-হরাদির সহিতও অতুলনীয়। ফলতঃ তদপেক্ষাও জীবন্মুক্তের হৃদয় সমধিক বিস্তৃতিসম্পন্ন। কারণ, কর্ত্তা, আনন্ত্য ও আনন্দ-স্বভাবে যাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আত্মবস্তু আর নাই, তাদৃশ আত্মবস্তুর বিস্তার তদীয় হৃদয়ে পরমার্থতঃ বিদ্যমান।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! বিশিষ্ট ভূমিতে বিশিষ্ট বীজ বপন করিলে তাহা হইতে যেমন উৎকৃষ্ট ফল অবশ্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই ষট্‌প্রকরণময়ী মোক্ষোপায়-সংহিতা অধ্যয়ন করিলে কিম্বা করাইলে তাহা হইতে জ্ঞানপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। যে শাস্ত্র যুক্তিবলে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দেয়, তাহা মানুষ কর্ত্তৃক প্রণীত হইলেও উপাদেয় হইয়া থাকে, আর যাহাতে তাহার অভাব আছে, তাদৃশ শাস্ত্র যদি বেদবিহিতও হয়, তথাপি তাহা হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মানুষকে একমাত্র ন্যায্য পথেরই পথিক হইতে হইবে। বালকের মুখ হইতেও যদি যুক্তিযুক্ত কথা নির্গত হয়, ধীমান্ ব্যক্তি তাহাও সাদরে গ্রহণ করিয়া লইবেন; আর অযৌক্তিক কথা

যদি ব্রহ্মাও ব্যক্ত করেন, তথাপি তাহা তৃণবৎ অগ্রাহ্য। সম্মুখে গঙ্গাজল রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 'ইহা আমার পিতার কূপ', এই বলিয়া যদি কেহ কূপোদকই পান করিতে থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাদৃশ অতি অনুরাগী ব্যক্তিকে কেহই উপদেশ বা শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় না। যেমন ঊষার উদয়ে অবশ্যই আলোকের সঞ্চার হয়, সেইরূপ এই সংহিতা পাঠে সুবিবেকের অভ্যুদয় নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সংহিতার আদি-অন্ত শুনিলে কিম্বা চিন্তার বলে নিজেই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে, ক্রমে ক্রমে তাহার সংস্কার, বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হয়। তারপর তাহার অন্তরে সংস্কারসম্পন্ন বিশুদ্ধ বাণীর অভ্যুদয় ঘটে। ঐ সংস্কৃত বাণী সুপরিষ্কৃত লতার ন্যায় সভাস্থানের শিরোভূষণরূপে শোভা পাইতে থাকে। অনন্তর তাহার মহত্ত্ব-গুণশালিনী চতুরতা বা বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই বাক্যার্থ-চাতুর্য্য উহার দ্বিতীয় ফল বলিয়া উল্লিখিত। ঐ চাতুর্য্যবশে মহীপতিগণ এবং দেববৎ পূজনীয় পণ্ডিতগণ তৎপ্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যাহার দর্শনশক্তি আছে, তাদৃশ নর যেমন হস্তে প্রদীপ লইয়া রাত্রিকালে নিখিল পদার্থই প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সেইরূপ এই সংহিতার সাহায্যে বুদ্ধিমান্ মানব সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাপর সর্ব্ব পদার্থতত্ত্বের অভিজ্ঞতা-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। ফলতঃ এই সংহিতার সহায়তায় মানুষ বুদ্ধিমান্ হয় এবং যাবতীয় কার্য্যকারণ-তত্ত্বে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মে। যেমন শরৎকালের সমাগমে দিঙ্মণ্ডলের নীহার-জন্য মালিন্য বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ এই সংহিতার সাহায্যে বুদ্ধির লোভ-মোহাদি যাবতীয় দোষ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে।

রামচন্দ্র! সম্প্রতি তোমার বুদ্ধির কেবল বিবেক অভ্যাস আবশ্যক হইয়াছে; কেননা, কোন ক্রিয়াই বিশেষ করিয়া অভ্যাস না করিলে ফল-বতী হয় না। বিবেক-অভ্যাসবশে শারদীয় সরোবরের ন্যায় মন প্রসন্ন হয় এবং মন্থনের পর মন্দরাচলের বিক্ষোভ-বিহীন সাগরের ন্যায় সাম্যভাব অবলম্বন করে। যেমন রত্ন-দীপ-শিখা অন্ধকারপুঞ্জ অপসারিত করিয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে, সেইরূপ অসাধারণ ধীশক্তি তখন অজ্ঞান-তিমির

বিনাশ করিয়া পদার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দেয় এবং মোহকজ্জল অপনীত করিয়া উদ্ভাসিত হইতে থাকে। যে যোদ্ধা-পুরুষ চর্ম্ম-বর্ম্মে আচ্ছাদিত, শর-সমূহ যেমন তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ বিবেক-বুদ্ধিবলে ধনাদি বিষয়ের অকিঞ্চিৎকরতা অবগত হইলে এই দৈন্য-দারিদ্র্যাদি দোষ-পরিপূর্ণ সংসারদৃষ্টি তখন মর্ম্মান্তিক যাতনা দান করিতে অক্ষম হয়। বাণ যেমন প্রকাণ্ড পাষাণ ভেদ করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি যথার্থ প্রাজ্ঞ পুরুষ, তিনি ভয়-কারণের সম্মুখে অবস্থান করিলেও ঘোর সংসারভয় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল করিতে সমর্থ হয় না। যেমন দিবাভাগে অন্ধকারপুঞ্জ বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিবেক-অভ্যাসে 'প্রথমে জন্ম, কি তৎপরে কর্ম্ম, কিম্বা অগ্রে কর্ম্ম, কি পরে জন্ম অথবা দৈব শ্রেষ্ঠ, কি পুরুষকার শ্রেষ্ঠ?' ইত্যাদি সংশয়রাশি নিরস্ত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ হইলে বিভাবরীর অবসান হয়, সেইরূপ প্রজ্ঞারূপ আলোক-সমাগমে সকল পদার্থগত রাগ-দ্বেষাদি ক্ষোভ বিদূরিত হইয়া যায়। যিনি এই শাস্ত্রতত্ত্বের বিচারে নিরত থাকেন, তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং সুমেরুর ন্যায় ধৈর্য্যশালী হন। তাঁহার অন্তঃকরণ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হইয়া থাকে।

মানুষ ক্রমে বিচারবলে জীবন্মুক্ত হয়। ক্রমশঃ তাহার অজ্ঞান-জনিত সমুদয় ভেদ-দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন তাহার যে জীবন্মুক্তি-অবস্থা ঘটে, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এই শাস্ত্রবিচারশীল ব্যক্তির বুদ্ধি তখন শরৎকালের জ্যোৎস্নার ন্যায় সর্ব্বথা সুশীতল, সুনির্ম্মল ও স্বপ্রকাশ হয়। তিনি ঐ বুদ্ধিবলেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি যে সকল ভয়াবহ দোষ আছে, উহারা ধূমকেতুর ন্যায় নিয়ত অনর্থপরম্পরা উৎপাদন করে। পরন্তু যখন বিবেকরূপ দিবা-করের শমরূপ আলোকচ্ছটা নির্ম্মল হৃদয়াকাশে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন সেখানে উহাদিগের কোনই আধিপত্য থাকে না। যেমন নির্ম্মল জলে তৃষ্ণার এবং শরৎ-সময়ে মেঘমালার প্রশান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা জীবন্মুক্ত বিচারশীল পুরুষ, তাঁহারা সমুন্নত সুস্থির আত্মপদে প্রশান্ত হইয়া শুদ্ধ সৌম্যভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। যেমন দিবসাগমে পিশাচ-লীলার পরিসমাপ্তি হয়, সেইরূপ তাঁহাদিগের মুখে তখন কটু, কঠোর,

অশ্লীল কথার অবসান হইয়া থাকে। তাঁহারা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে পরনিন্দা বা পরদ্বেষ প্রকাশ পায় না এবং তাহাতে কাহারও মুখশ্রীও পরিম্লান হইবার নহে। বায়ু যেমন চিত্রার্পিত লতাকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহাদিগের ধর্ম্মভিত্তিতে সুদৃঢ়-সংলগ্ন অতিস্থির বুদ্ধিকে কোনরূপ মনঃপীড়াই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কদাচ বিষয়াসঙ্গময় মোহগর্ত্তে নিপতিত হন না। বাস্তবিক কোন্ পথাভিজ্ঞ ব্যক্তিই বা আপন ইচ্ছায় গভীর গর্ত্তের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে? কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যত্র তত্র বিচরণ করেন না। সাধ্বী রমণী যেমন অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি সেইরূপ সদাচার ও সৎশাস্ত্রের অবিরোধী যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মেই প্রীতিভরে আসক্ত হইয়া থাকে।

যাঁহাদিগের বুদ্ধি সঙ্গহীন হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষেরা লক্ষ কোটি জগতে যত পরমাণু আছে, তাহার সম-সংখ্যক বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড আপনার অন্তরেই অবলোকন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝিয়া দেখেন, এই যে অসংখ্য পরমাণুর ন্যায় অসংখ্য সৃষ্টিপরম্পরা, এ সমস্তই সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কার্য্য; সুতরাং কিছুই অসম্ভব নহে। মোক্ষসাধনের উপায়-পরিজ্ঞানে যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, ভোগরাশি তাঁহাকে কদাচ দুঃখিত বা আনন্দিত করিতে পারে না। প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণুতে কত শত শত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে; ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড জলতরঙ্গের ন্যায় একবার উত্থিত হইতেছে আবার পতিত হইতেছে; বিচারজ্ঞ জীবন্মুক্ত এই সমস্তই দেখিতে পান; কিন্তু দেখিয়াও বিস্মিত হন না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কি কার্য্য, কি কার্য্যফল, তৎসমস্ত বুঝেন; কিন্তু বুঝিয়াও জড়প্রকৃতি পাদপের ন্যায় অনিষ্টপাতে বিরক্ত হন না, অথবা ইষ্ট আকাঙ্ক্ষায় হৃষ্ট হন না জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যবহারত সাধারণ মানবের ন্যায় ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট যে ফলই যখন উপস্থিত হউক, নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাই তখন ভোগ করিতে থাকেন।

রামচন্দ্র! তুমি এই সমস্ত শাস্ত্র বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম কর এবং ইহার প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বার্থ অবগত হও। পরন্তু ইহাকে তুমি একটা কথামাত্র বলিয়া মনে করিও না।

কারণ পূজ্য-জনের প্রদত্ত বর ও অভিশাপের ন্যায় ইহা হইতেও প্রত্যক্ষ ফল অনুভূত হইয়া থাকে। এই শাস্ত্র একখানি সু-লিখিত সুখবোধ্য রসময় কাব্য। ইহাতে নানাবিধ দৃষ্টান্ত আছে এবং মনোজ্ঞ উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে ইহা অলঙ্কৃত হইয়াছে। পদ কিম্বা পদার্থতত্ত্বে যাঁহার সামান্য মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনি নিজেই ইহা বুঝিতে পারেন। যদি নিজে নিজে বুঝিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া লইবেন।

এই গ্রন্থ শ্রবণান্তে বিচার করিয়া ইহার তত্ত্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মানবের মোক্ষ লাভ বিষয়ে তপস্যা, ধ্যান, ধারণা কিম্বা জপ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। এই শাস্ত্র বারম্বার অভ্যাস ও পুনঃপুন দর্শন করিলে চিত্ত-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হয়। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে পিশাচের অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ 'আমি দ্রষ্টা, জগৎ আমার দৃশ্য' ইত্যাকার দ্রষ্টৃ দৃশ্য বিভাগ তখন আপনা হইতে অনায়াসেই অবসান হয়। তখন 'জগৎ ও আমি' এই ভেদ ভ্রম থাকিলেও তাহা উপশান্ত হইয়া যায়। যেমন স্বপ্ন-মোহ বুঝিতে পারিলে তাহাতে আর বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ উহারও তখন ভ্রম জন্মাইবার ক্ষমতা থাকে না।

বৎস! ভাবিয়া দেখ, মনে মনে একটা নগর কল্পিত হইলে, কল্পনাকারী পুরুষ যদি তাহাকে কল্পনামাত্র বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তখন হর্ষ কিম্বা বিষাদ যেমন সেই পুরুষকে কোনরূপ সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না, সেইরূপ এই জগদ্‌ভ্রম বুঝিতে পারিলে তখন আর মনঃপীড়াদায়ক হয় না। যদি বুঝিতে পারা যায়, সর্প টা চিত্রপটে অঙ্কিত, তাহা হইলে যেমন সেই সর্প ভয় জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-সর্পের তত্ত্ব যদি একবার জানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তখন আর উহা সুখ বা দুঃখ কিছুই উৎপাদন করে না। যেমন 'এই সর্প টা চিত্রিত' এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, চিত্র-সর্পের সর্পত্ব অপগত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানবলে সংসারের আধার-তত্ত্ব জানিয়া লইতে পারিলে, তখন আর তাহা থাকে না; সংসার তখন আধাররূপে পরিণত হইয়াই উপশান্ত হইয়া যায়।

দেখ, পুষ্প এবং পল্লব এই দুইটী বস্তুকে সূচী কিম্বা নখাদি দ্বারা ভেদ করিতে হইলে কিছু না কিছু যত্ন করিবার আবশ্যক হয়; কিন্তু পরমার্থ পদ প্রাপ্তি বিষয়ে অল্পমাত্রও প্রয়াস করিতে হয় না। পুষ্প এবং পল্লব এই দুইটীর মর্দ্দন বা ভেদ ব্যাপারে অঙ্গ-স্পন্দনের আবশ্যক হয়; কিন্তু পরমার্থ পদ লাভ করিতে অঙ্গ-স্পন্দনেরও প্রয়োজন নাই; বরং উহা লাভ করিতে হইলে বুদ্ধিমাত্রেরও স্পন্দন রোধেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সুখাসনে উপবেশন, যথাসম্ভব ভোগ্যবস্তু উপভোগ, সদাচার বিরোধী কার্য্যের অকরণ, দেশ ও কালানুসারে সুখের বিচার, যথাযোগ্য সাধুসঙ্গের অনুবর্ত্তন এবং মদুক্ত এই শাস্ত্র এবং অপরাপর মোক্ষশাস্ত্রের অনুশীলন, এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেই সংসার-শান্তিপ্রদ পরমাত্মবোধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত মহাজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সংসারে পুনরায় জন্মলাভ বা যোনি-যন্ত্রে পতিত হইয়া যাতনা ভোগ করিতে হয় না। যে সকল পাপাত্মারা উক্ত অনায়াস-সাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানেও ভীত হইয়া ভোগরসে মগ্ন হয়, তাহারা স্ব স্ব জননীর বিষ্ঠাকৃমি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঐ সকল অধম ব্যক্তিবর্গের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে নাই।

হে রঘুনন্দন! শ্রবণ কর; যাহা বিবেকবুদ্ধির গ্রহণযোগ্য সারতর বিষয়সমূহের অবধিস্বরূপ, এক্ষণে আমি তথাবিধ জ্ঞানবিস্তারক শাস্ত্রতত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। যে দৃষ্টান্ত ও পরিভাষা দ্বারা এই শাস্ত্র শ্রবণ ও প্রকৃত অর্থ বিচার করা যায়, এক্ষণে সেই সেই বিষয়ের অবধারণরূপ অবতরণিকা শ্রবণ কর। যে দৃষ্ট-বস্তুর সাধর্ম্ম্য দ্বারা অনুভূত বা অদৃশ্য পদার্থের বোধ জন্মিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে দৃষ্টান্ত আখ্যায় অভিহিত করেন।

হে রাম! যেমন রাত্রিকালে প্রদীপ ব্যতীত গৃহের দ্রব্যসামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ দৃষ্টান্ত না হইলে অপূর্ব্ব অর্থ বোধগম্য হয় না; হে কাকুৎস্থ! যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়া আমি তোমাকে এখন বুঝাইব, জানিয়া রাখিও,—সে সমস্ত দৃষ্টান্তই সকারণ অর্থাৎ অনিত্য বস্তু; পরন্তু তাহার সাহায্যে যাহা প্রাপ্য বা বোধগম্য, তাহা কারণহীন অর্থাৎ নিত্য সত্য পদার্থ। যত কিছু উপমান ও উপমেয় পদার্থ, তৎসমস্তেরই কার্য্যকারণভাব

বর্ণিত আছে; একমাত্র পরব্রহ্মের তাহা নাই। পরব্রহ্ম ব্যতীত আর সকলেরই কার্য্যকারণ ভাব বিদ্যমান। আমি এই গ্রন্থে ব্রহ্মোপদেশকালে তোমাকে যে যে দৃষ্টান্ত দেখাইব, বুঝিবে—সে সকল সর্ব্বাংশে তুল্য নহে। সুতরাং সেই সেই দৃষ্টান্তগুলি পরব্রহ্মের আংশিক সাধর্ম্ম্যরূপেই গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে। ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যে যে দৃষ্টান্ত যোজনা করিব, জানিও,—তৎসমস্তই জগতের অন্তর্গত, সুতরাং স্বপ্নজাত বস্তুর ন্যায় মিথ্যাভূত।

ব্রহ্ম যখন নিরাকার, তখন তাঁহাতে সাকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় কিরূপে? এইখানে এইরূপ নানা আপত্তি উঠিতে পারে; কিন্তু আমার মতে এইরূপ বিকল্প-কল্পনা মূর্খদিগের অন্তরে ভিন্ন স্থান পায় না; একাদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে কোন বিকল্পেরই স্থান নাই; তার্কিক সম্প্রদায় যে হেতু-সাধ্যাদির অসঙ্গতি ও বিরোধ প্রভৃতি দোষ উত্থাপন করেন, স্বপ্নবৎ মিথ্যা জগতে সে সকল দোষ উদিত হইয়া স্থির থাকিবার নহে; অর্থাৎ যখন দেখা যায়, এই দৃশ্যমাত্র কিছুই নহে—মিথ্যা, তখন ব্যপ্যত্বাসিদ্ধি* নামে হেত্বাভাস এবং জাগতিক হেতু, এই উভয়ই বিরোধ নামক হেত্বাভাসে দোষস্পৃষ্ট হয়। যাহা অনুমান করিবে, তাহার আশ্রয়ে যদি হেতু না থাকে, তবেই বিরোধ নামক হেত্বাভাস ঘটে। ব্রহ্মে যখন সত্তা প্রভৃতির অনুমান করা হয়, তখন ব্রহ্মে কোন জাগতিক হেতু থাকে না, সুতরাং বিরোধ-হেত্বাভাস ঘটে। এইরূপ দোষ দেখাইয়া তার্কিক সম্প্রদায় বেদান্ত দৃষ্টান্তে দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দোষ কোন কাজেরই হয় না; কেন না, এই জগৎ স্বপ্নসদৃশ অলীক। জাগ্রদবস্থায়

* কথিত আছে,—দৃষ্টান্ত অনুমানের উপযোগী। যথা,—যেখানে যেখানে ধূম, সেই সেই স্থানে বহ্নি আছেই। ইহার দৃষ্টান্ত—পাকশালা। এই পাকশালার দৃষ্টান্তে যেখানেই ধূম দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেখানেই বহ্নির অনুমান হইবে। কিন্তু বেদান্তের মতে দৃষ্টান্ত কোন কাজেরই নহে; কারণ অনুমান করিতে হইলে ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদির প্রয়োজন হয়। যে যে স্থান ধূমের আধার, সেই সেই স্থান বহ্নির আধার হইবেই; এইরূপ যে বাক্যপ্রয়োগ, তাহা দ্বারাই ব্যাপ্তি-জ্ঞান হয়। তৎপরে যখন বুঝিতে পারা যায় যে, সেইরূপ ধূম এই পর্ব্বতে আছে, তখন আবার সেই পর্ব্বতে বহ্নিজ্ঞান হয়। এইরূপ যে জ্ঞান, তাহারই নাম অনুমান বা অনুমিতি। কিন্তু ব্যাপ্তি যখন অলীক হয়, তখন হেত্বাভাস দোষ থাকে; এই দোষের নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি।

যে যে হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ বা বিরুদ্ধ, স্বপ্নাবস্থায় তাহা সিদ্ধ ও অবিরুদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং তাহা দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় অনুমান অসম্ভব নহে। যদি স্বপ্নাবস্থায় তাহাতে অসিদ্ধি বা বিরোধ থাকে, তবেই স্বপ্নাবস্থায় সেই সেই হেতুতে হেত্বাভাস দোষ ঘটিবে, অন্যথা নহে। এইরূপ ব্যবহার স্থলে এই অনুমানের অসঙ্গতি হইতে পারে না।

বুঝিতে হইবে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পরে যাহার অভাব আছে, বর্ত্তমানকালেও তাহার অভাব বিদ্যমান। * এইরূপ আশৈশব সহচর জগদ্-বস্তু ও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু এই উভয়ের কিছুই প্রভেদ নাই; অর্থাৎ উভয়ই মিথ্যা। মনে কর, নিদ্রাকালীন স্বপ্ন হয়; এই স্বপ্নাবস্থায় কার্য্যাকার্য্য বিচার করা যায়। চিন্তা বা ধ্যান পূজাদিও স্বপ্নাবস্থায় করা হয়। স্বপ্নে কোন দেবতা বা ঋষির অনুগ্রহ বা নিগ্রহের ভাজন হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় ঔষধাদিও লাভ হইয়া থাকে অথচ এ দিকে জাগ্রদবস্থায়ও সে সমুদায়ের ফল ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, এই স্বপ্নের যে যে ধর্ম্ম, সংসারযাত্রারও তাহাই; অতএব স্বপ্নদৃষ্টান্ত মিথ্যা নহে। অথবা স্বপ্নে বর, অভিশাপ ও ঔষধাদি লাভ, ধারণানুসারে বর শাপাদি প্রাপ্তি এবং ধ্যান বলে বরাদি লাভ, জাগ্রদবস্থাতেও ফলজনক হইয়া থাকে, সমস্ত সংসার-যাত্রাতেই সেই একই ভাব লক্ষিত হয়; অতএব স্বপ্ন, ধারণা বা সঙ্কল্প অথবা ধ্যান বা চিন্তা, সমস্তই সংসারের দৃষ্টান্ত।

এই মোক্ষোপায়-শাস্ত্রের প্রণয়নকর্ত্তা বাল্মীকি মুনি অপরাপর যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ্য-বোধন বিষয়ে এই একই নিয়ম বা ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইবে, সেইগুলির সম্ভবপর অংশের সহিতই সমত্ব জানিবে। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিবা মাত্র হঠাৎ যে এই জগতের স্বপ্ন তুল্যতা বা অলীকতা প্রতীত হইবে, এমন কথা অবশ্য বলিতে পারা যায় না; কেন না, বাক্যমাত্রই ক্রমে ক্রমে

* বুঝিয়া দেখ, ঘট একটি পদার্থ, উহা উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকা ব্যতীত কিছুই নহে। আবার বিনাশের পরও উহা যে মৃত্তিকা, সেই মৃত্তিকামাত্র; অতএব বর্ত্তমানেও উহাকে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তবে ঘট কি, না—মৃত্তিকার অবস্থাবিশেষের একটা নামমাত্র।

শ্রোতার কুসংস্কারগুলি উচ্ছেদ করিয়া পরেই বিশেষ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। সুতরাং তাহা অল্পকালে ঘটে না।

যে হেতু এই জগৎ স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও ধ্যান-কল্পিত নগরাদির সহিত উপমেয়; সুতরাং সেই সেই স্বপ্ন প্রভৃতিই এই গ্রন্থের দৃষ্টান্ত। তদ্ভিন্ন অপর দৃষ্টান্ত নাই। কুণ্ডল একটী অলঙ্কারবিশেষ; তাহার কারণ যেমন সুবর্ণ, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের কারণ বলিয়া কথিত। ব্রহ্ম পদার্থ কি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তই এই উপমা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সুবর্ণে যেমন বিকার আছে, ব্রহ্মপদার্থে সেরূপ কিছুই নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে, উপমা প্রয়োগের প্রযত্নে সম্পূর্ণ সাধর্ম্ম্য ব্রহ্মপদার্থে অসম্ভব। এই জন্যই যাঁহারা নির্ব্বিবাদ বুদ্ধিমান্ অধিকারী, তাঁহারা তত্ত্ববোধের নিমিত্ত উপমানের কোন এক অংশের সহিতই উপমেয়ের সাধর্ম্ম্য স্বীকার করিয়া লয়েন।

পদার্থ দর্শনে দীপালোকেরই প্রয়োজন হয়, পরন্তু দীপাধার, তৈল, বা বর্ত্তি প্রভৃতি কোন বস্তুরই প্রয়োজন সে বিষয়ে হয় না। প্রদীপ যেমন আলোকমাত্রেই পদার্থ প্রকাশ করাইয়া দেয়, সেইরূপ উপমা তাহার একাংশ দ্বারাই উপমেয়ের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। দৃষ্টান্তের একাংশ মাত্রের সামর্থ্যে বোধ্য-বিষয়ে বোধ উৎপন্ন হইলে "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের নিশ্চয় করিয়া লইবে। কিন্তু কুতার্কিক সাজিয়া যাহাতে অনুভবের অপলাপ হয়, এরূপ অপবিত্র বিকল্প-কল্পনায় তত্ত্বজ্ঞানের বিলোপ সাধন করা কর্ত্তব্য নহে। 'আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য, বহুল আয়াস ও ত্যাগ স্বীকার করাইয়া পরে মোক্ষপথে লইয়া যাইবার অনুকূল হয়, এই কারণে উক্ত মহাবাক্যকে বৈরিবাক্যের ন্যায় মনে করিয়া উহার উপাদেয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করা বাস্তবিকই অবিচার বা অজ্ঞতারই ফল; কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে ঐ মহাবাক্য বৈরি-বাক্য হইলেও নিত্য নিরতিশয়ানন্দ আত্মরূপ পরম পুরুষার্থের অনুভব জন্মায় বলিয়া আমাদের উপাদেয়। তদ্ভিন্ন যাহাতে পরমার্থতত্ত্ব নাই, এমন বাক্য *যদি নিজের প্রণয়িনীও ব্যক্ত করেন, তথাপি তাহা প্রলাপ বাক্য; সে বাক্য* কোন আগম, আপ্তবচন বা প্রমাণ নহে।

হে রামচন্দ্র ! যে বুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, সে বুদ্ধি আমরা লাভ করিয়াছি। তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রেরই এক মহাবাক্যার্থে অর্থাৎ একই অদ্বিতীয় অখণ্ড আত্মতত্ত্বে তাৎপর্য্য সুনিশ্চিত হইয়াছে। এই যে আত্মতত্ত্ব তাৎপর্য্যের অবধারণ, ইহাই পরম পুরুষ-সাক্ষাৎকারের উপযোগী। যে সকল শাস্ত্র বেদান্তের বিরোধী, শ্রুতির তাৎপর্য্য রক্ষায় যাহাদের আনুকূল্য নাই এবং যাহারা তর্কাদি দ্বারাই পরিপুষ্ট, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য সেই সকল শাস্ত্রের মত পরিপোষণ করে না, কিন্তু ঐ সকল মহাবাক্য আমাদিগেরই মত পরিপোষণ করে ; অতএব ইহাই প্রমাণ।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—উপমাস্থলে বিশিষ্ট অংশের সাধর্ম্ম্যই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। নতুবা সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য স্বীকার করিলে উপমান ও উপমেয়ের প্রভেদ থাকে কি ? জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বোধনের উপযোগী সেই সেই দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লইতে পারিলে নিখিল বেদান্তের তাৎপর্য্য—সেই এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে ; তাহা হইতেই 'আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্যার্থ আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয়, সেই স্ফুরণ হইতেই অজ্ঞান এবং অজ্ঞান কার্য্যের শান্তি হইয়া থাকে ; এই শান্তিই নির্ব্বাণ নামে অভিহিত এবং নির্ব্বাণই দৃষ্টান্ত-জ্ঞানের ফল বলিয়া নিরূপিত। অতএব উক্ত দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে কি কোন এক অংশে গৃহীত হইবে ? দৃষ্টান্ত এবং দৃষ্টান্তবোধ্য ব্রহ্মস্বরূপ লইয়া এরূপ তর্কবিতর্কের কোনই প্রয়োজন নাই। যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবেন, তিনি ঐ সকল তর্কজাল পরিহার করিয়া যে কোন এক অনুকূল যুক্তির সাহায্যে 'আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের আশ্রয় লইবেন।

বৎস! বুঝিও—শান্তিই একমাত্র পরম শ্রেয়ঃ; সুতরাং সেই শান্তি লাভের জন্যই যত্নবান্ হও। প্রাপ্ত অন্ন ভোজন করিতে হইবে; কিন্তু কেমন করিয়া কি উপায়ে সে অন্ন প্রস্তুত করা হইল, এ সকল তর্কবিতর্ক করিবার তখন প্রয়োজন কি? অবস্থা বৈষম্যবশতঃ উপমান ও উপমেয় কারণ ও অকারণ উভয় রূপেই প্রতীত হইলে পরস্পরের কিয়দংশের সাম্য লইয়াই অভীষ্ট অর্থবোধ নিষ্পন্ন হয়।

রামচন্দ্র! পাষাণগর্ভস্থ স্থূলদেহ অন্ধ ভেকের ন্যায় বিবেক বিসর্জ্জন করিয়া ভোগ সুখে রত থাকা উচিত নহে। যত্নের সহিত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদিত পরম পদ প্রাপ্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকারে শান্তি আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রার্থের অনুশীলনপূর্ব্বক সর্ব্বদা বিচার-পরায়ণ হইবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ, সৌজন্য-প্রকাশ, প্রজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞান, সৎসঙ্গ ও ধর্ম্মার্থ সঞ্চয়ে কৃতযত্ন হইয়া যত দিনে না আত্মা বিশ্রাম সুখ লাভ করে, তাবৎ যথাক্রমে ধর্ম্ম, গুরু-শুশ্রূষাদির উপযোগী অর্থ এবং শাস্ত্রের অপূর্ব্ব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া বিচারানুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন, তাহা হইলেই তুরীয় নামিকা অক্ষয় শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অর্থাৎ এই সংসার মোহ, ব্যামোহ, অন্তর্দাহ, সন্দেহ ইত্যাদির আধার, এ সকল জানিয়া শুনিয়া যাহাতে পুনরায় এ সংসারে আসিতে না হয়, সে জন্য সবিশেষ যত্ন করা মনুষ্যের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। ভাবিয়া দেখ, জননীর গর্ভরূপ অন্ধকূপে ভেকের ন্যায় দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকা, কি শোচনীয় দশা! উহা স্মরণ হইলেও যাহাদের হৃদয়ে বিবেক সঞ্চার হয় না, তাহারা কি পশুর অপেক্ষাও অধম নহে? অন্যদিকে দেখ, সংসারে থাকিয়া সামান্য উদর-ভরণের জন্য কখন প্রভুর দ্বারে, কখন ধনীর দ্বারে, কখন দাতার দ্বারে, কখন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের দ্বারে, কখনও বা উত্তমর্ণের দ্বারে কাক ও কুকুরবৎ বারবার ছুটাছুটি করা কি ঘৃণিত ব্যাপার! ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করিয়া যাহারা বিবেকের আশ্রয় লয় না, তাহাদের স্বভাব কি পশুর অপেক্ষাও কোন অংশে উচ্চ বলা যায়? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদিগকে জঘন্য যোনি বলিয়া মানুষ ঘৃণা করিতে পারে; কিন্তু বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখ, তাহারাও যেমন মরিতেছে, জন্মিতেছে, মানুষও যদি সেইরূপেই জন্মিতে

বা মরিতে থাকে, তবে মনুষ্য বলিয়া তাহাদের সহিত তাহার পার্থক্য রহিল কি? সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পশুগুলি বিচার-বিবেক-বিমূঢ় হইয়া কেবল স্ব স্ব উদর পূর্ত্তির জন্য ব্যস্ত, মানুষকেও যদি উদয়াস্ত প্রভুর বা অন্য কাহারও দ্বারে অনবরত কঠোর পরিশ্রমে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের সংগ্রহেই তৎপর রহিতে হইল, তবে আপনাকে সিংহ ব্যাঘ্রাদি না বলিয়া মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে কি লজ্জা হয় না? ফলতঃ বিচার এবং বিবেকই মনুষ্যত্ব। বিচার এবং বিবেকবলেই তুরীয়পদ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সে পদ পাইলে জন্ম, মৃত্যু, সংসার, কিছুই আর থাকে না। যিনি ঐ তুরীয় পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি গৃহী হউন, যতিই হউন, কিম্বা তিনি শ্রবণ মননাদি করুন আর নাই করুন, তাহাতে তাঁহার ঐহিক-পারলৌকিক কোন ফলই নাই। তিনি সমুদ্র-মন্থনের পর মন্দর-বিলোড়ন-বিহীন সাগরের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোধ্য তত্ত্ব বুঝিতে হইলে উপমানের একাংশ দ্বারাই উপমেয়ের সাদৃশ্য অনুভব করিবে এবং যে কোন যুক্তি আশ্রয় করিয়া বোধ্য বিষয় অবগত হইতে হইবে, নতুবা অন্যদীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য মৌখিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা উচিত নহে। কেন না তাদৃশ বোধচঞ্চু* পণ্ডিতেরা ব্যাকুলতা বশতঃ যুক্তাযুক্ত বা বৈধাবৈধ কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না।

জ্ঞানময় হৃদাকাশে যে এক অনুভবাত্মক সদানন্দময় পরম বস্তু আছে, তাহাতে যাহারা অনর্থ কল্পনা করে, তাহাদিগকেও বোধচঞ্চু আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার অনভিজ্ঞ বোধচঞ্চু আছে, তাহারা স্ব স্ব পাণ্ডিত্যের অভিমানভরে কুতর্ক উত্থাপন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান ও জ্ঞান সাধন বিষয়ে বিকল্প-কল্পনা করে। এই শ্রেণীর বোধচঞ্চু-গণের জ্ঞান মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় মলিন হইয়া থাকে।

* যাহাদের জ্ঞান বা বোধ হৃদয়ের অন্তস্তল প্রবেশ করে না, কেবল পরের মতটী খণ্ডনের জন্য মুখাগ্রেই থাকে, তাহাদিগকে বোধচঞ্চু বলে।

রামচন্দ্র! সাগর যেমন সকল সলিলের আধার, সেইরূপ একমাত্র প্রত্যক্ষই নিখিল প্রমাণ-প্রামাণ্যের আশ্রয়। অতএব আমি এক্ষণে সেই প্রত্যক্ষ বিষয়ই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সকল প্রমাণের সার ইন্দ্রিয় এবং সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের সার চেতন বা জ্ঞান,† পণ্ডিতগণ এই মূল জ্ঞানকেই প্রধান প্রত্যক্ষ আখ্যায় অভিহিত করেন। এই প্রধান প্রত্যক্ষ অবচ্ছেদ, আশ্রয় ও বিষয়ভাবে 'আমি ঘট জানিতেছি' ইত্যাকার ত্রিপুটীপ্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই ভাবত্রয়ের নাম ত্রিপুটী। ঐ ত্রিপুটীবোধও প্রত্যক্ষ বলিয়া পরিগণিত। উক্ত ত্রিপুটীর বিভিন্ন বিকাশের নাম অনুভূতি, বেদন ও প্রতিপত্তি। এই অনুভূতি, বেদন ও প্রতিপত্তি-ব্যাপী যে সাক্ষিচিন্মাত্র, ব্যবহার ক্ষেত্রে তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ সাক্ষিচৈতন্যই প্রাণ ধারণ-হেতু জীব নামে নির্দ্দিষ্ট। তিনিই বিজ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনিই অহন্তা ও প্রত্যয়রূপী পুরুষ। তাঁহাকে জানিলেই সকল জানা হয় এবং তাঁহাকে পাইলেই সকল পাওয়া যায়। তিনি যে সংবিৎ দ্বারা আবির্ভূত হন, তাহাকেই পদার্থ কহে। জল যেমন তরঙ্গাদিরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ সেই চৈতন্য ব্রহ্মই সঙ্কল্প-বিকল্পাদি বিবিধ ভ্রম-বশতঃ জগদাকারে প্রকাশিত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন। কেন না, জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা আর তিনি সম্পূর্ণ সত্য; সুতরাং মিথ্যা ও সত্য কদাচ এক পদার্থ হইতে পারে না। যাহা মিথ্যা, তাহা চির মিথ্যা; আর যাহা সত্য, তাহা চির সত্য। বস্তুতঃ অজ্ঞান-বশতই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে অসত্যরূপ জগতের আরোপ হইয়া থাকে। এই জগতের তত্ত্ব জানিলে জগৎ আর থাকে না; তখন সমস্তই তন্ময় হইয়া থাকে।

যখন জগৎ-সৃষ্টি হয় নাই, তখন তিনি অকারণরূপে বিরাজ করেন। পরে সৃষ্টি সময়ে লীলা বশতঃ কারণরূপে স্বীয় স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন।

† যে কোন প্রমাণই হউক না কেন, ইন্দ্রিয় না থাকিলে, কোন প্রমাণই থাকে না, এই জন্যই ইন্দ্রিয়কে প্রমাণের সার বলা হইয়াছে।

চেতন বা জ্ঞান না থাকিলে কোন অঙ্গ ইন্দ্রিয়ই কার্য্য-কর হইতে পারে না, তাই জ্ঞানকে সকল ইন্দ্রিয়ের সার বলা যায়।

অবিচারোত্থিত জীবের অজ্ঞান অসত্য হইলেও কারণরূপে প্রতিপন্ন হইয়া সত্যবৎ প্রতীত হয়। এই অবিচারসম্বলিত আত্মরূপ প্রকৃতিতে জগৎ-প্রপঞ্চও সত্যবৎ স্ফুরিত হইতেছে। পরমার্থ হইতে সমুৎপন্ন বিচারবলে অজ্ঞান বিনাশ হইলে যখন বুঝিতে পারা যায়, এই জগৎ কিছুই নহে, তখন পরম পুরুষার্থরূপ মহত্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার পরমার্থবিচারে আপনাকে জানিতে পারিলে 'তুমি, আমি' ইত্যাদি জগদ্‌ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়, বিচার তখন শব্দাদির অবিষয়ীভূত একমাত্র পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়। মন যখন শান্ত ও নিরীহভাব ধারণ করে, তখন স্বীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য-পরম্পরা অনুষ্ঠিত হউক, বা না হউক, তাহাতে কোনই ফলোদয় নাই; কেন না, সেই সেই কার্য্য বা তত্তৎ জ্ঞান হইতে সংস্কার-উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।* যন্ত্রী যদি যন্ত্র না চালায়, তবে যন্ত্র যেমন কোন কর্ম্মেরই উপযোগী হয় না, সেইরূপ মন শান্ত ও নিরীহভাবে রহিলে তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি কিছুতেই কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। মনে কর, দুইটী কাষ্ঠনালিকার অভ্যন্তরে দুইটী কাষ্ঠময় মেষ আছে, ভিতরের সূত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিলে তবে তাহাদিগের পরস্পার সংঘর্ষ ঘটিল। এক্ষেত্রে যেমন সেই অন্তরের সূত্রই ঐ কাষ্ঠময় মেষের পরস্পার সজ্ঘর্ষের হেতু, সেইরূপ বিষয়বাসনাও মনোযন্ত্র-সঞ্চলনের মূল। বিষয়েরআবির্ভাব মন হইতেই হয়; সুতরাং বিষয়বাসনা না জন্মিলে মন সঞ্চলিত হয় না, এ কথা বলা চলে কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যেমন বায়ুর ভিতরে তাহার সঞ্চলন-শক্তি নিহিত রহিয়াছে, সেইরূপ বিষয়বাসনার অন্তরালেই বাহ্যিক ভোগ ও চিন্তার বিষয়ীভূত জগৎ, সংস্কাররূপে বিরাজ করিতেছে। সংস্কার অবস্থায় পরিণত বিষয়রাশি বাসনা-বিলোড়িত মন হইতে দৃশ্যাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সত্ত্বগুণবহুল বাসনা যেমন উদিত হয়, অমনি সুবিস্তৃত দিঙ্মণ্ডল, কাল ও বাহ্য আভ্যন্তর রূপ প্রভৃতিরূপে সেই বাসনার বিকাশ হইয়া থাকে। অতঃপর ঈশ্বর স্বয়ংই ভিন্ন ভিন্ন মলিন উপাধির সংসর্গবশে দেহাদি সমস্ত

* বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলেই বিষয় ভোগ হইয়া থাকে। ভোগ-জন্য সংস্কার হয়, সেই সংস্কারই বাসনা। বাসনাই জন্মান্তরের হেতু; কিন্তু মন যদি শান্ত হয়, তাহ হইলে কিছুতেই সেরূপ বাসনা উৎপন্ন হয় না। যদি সংস্কার না হয়, তবে জন্মান্তরও ঘটে না।

দৃশ্যবস্তুকেই আপনার স্বরূপ মনে করিয়া জীবভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। ফলতঃ নিজের ধারণানুসারেই বস্তুস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সেই সর্ব্বাত্মা পুরুষ যে দেশে, যে কালে, যে পদার্থে, যে ভাবে সমুল্লসিত হয়েন, সে দেশে, সেই কালে, সেই পদার্থে, সেই ভাবে তাদৃশরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করেন। সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা সর্ব্ব-স্বরূপ; তাই প্রতীয়মান হয়, তিনি যেন দৃশ্যরূপীও হইয়া থাকেন। কিন্তু কথা এই যে, যদি দ্রষ্টা থাকে, তাহা হইলেই ত তিনি প্রকৃত দৃশ্য হইবেন? যদি সমস্তই দৃশ্য, তবে দ্রষ্টা হইবে কে? অন্যদিকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই দৃশ্য আছেন। ফলতঃ যে কোন কার্য্যই হউক, তৎতাবৎই ভোগ্য, আবার সেই ভোগ্যবস্তুমাত্রই মরুমরীচিকা-জলের ন্যায় মিথ্যা বা অসত্য। মরীচিকা যেমন ভ্রম-জলের আশ্রয়, ব্রহ্মও তেমনি সমস্ত ভোগ্যবস্তুরই আশ্রয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি দুষ্ট হইলে মরীচিকায় যেমন জল-ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার অজ্ঞানদোষে ব্রহ্মেই জগদ্‌-ভ্রম হয়। আবার যখন আশ্রয় প্রত্যক্ষ হয়, তখনই সে ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। মরীচিকা প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে যেমন জল-ভ্রম থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম যদি প্রত্যক্ষ হন, তবে আর জগদ্‌ভ্রম হয় না; কিন্তু যতদিনে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ না হইবেন, ততদিন ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাসমান হইতে থাকেন। সুতরাং যদিও ব্রহ্ম ভোগ্যবস্তু মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য, তথাপি মরীচিকায় যেমন শৈত্য-আদি মরীচিকাজলীয় ধর্ম্ম নাই, সেইরূপ ব্রহ্মেও বাস্তবপক্ষে ভোগ্যতা বা দৃশ্যতা নাই।

যখন জন্মমাত্রই মিথ্যা, তখন এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের আবার কারণান্তর কোথায়? বাস্তবিক তাঁহার কারণান্তর নাই। যদি প্রত্যক্ষতত্ত্বের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। তবে অনুমানাদির কথা কহিবে? সে সকল ত প্রত্যক্ষেরই অংশবিশেষ। ফলতঃ ঘট, শরাব প্রভৃতি যে কিছু নাম আছে, সেগুলি মৃত্তিকার সাময়িক সংজ্ঞা মাত্র, বাস্তবিক ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সমস্ত কার্য্যপরম্পরা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবে যে, কার্য্যের কারণই সত্য; কিন্তু কার্য্য কিছুই নহে—মিথ্যা; উহা ব্যবহার করিবার একটা সংজ্ঞামাত্র। প্রত্যক্ষ যতদূর চলিতে পারে, তাহাতে

এইরূপই দেখিতে থাকিবে; পরন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ চলিবে না, তথায় অনুমানাদির সাহায্যে বুঝিয়া লইতে থাকিবে যে, কার্য্যভাব বা জন্যভাব কতদূর পর্য্যন্ত রহিয়াছে। দেখ, ঘটের কারণ হইল মৃত্তিকা। মৃত্তিকা পরমাণু হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ঘটের তুলনা পক্ষে ঘটের কারণ মৃৎপিণ্ড সত্য হইলেও বস্তুত তাহা মিথ্যা। মৃৎপিণ্ড—সংজ্ঞামাত্র। কেন না, মৃৎপিণ্ডের কারণ যে পার্থিব পরমাণু, তাহাই মৃত্তিকার প্রকৃত অবস্থা। এইরূপে কারণপরম্পরার আলোচনা করিতে করিতে বুঝা যাইবে যে, যাহা বাস্তবিকই সত্য, তাহার কারণ নাই, যদি কারণ থাকে, তবে প্রকৃত সত্য বা পারমার্থিক সৎ হইতে পারে না। যাঁহার কারণ নাই, যাঁহাতে নিখিল কারণের পর্য্যবসান, তিনিই সত্য বা পরমার্থ সৎ। সেই যে সদ্বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম।

হে সাধো! নিজের জন্মান্তরীয় প্রযত্নই দৈব, তদ্ভিন্ন দৈব পদার্থ অন্য কিছুই নহে। যিনি মোক্ষপদ পাইবার প্রয়াসী, তিনি ইন্দ্রিয়াদি জয়পূর্ব্বক শূরনামে পরিচিত হইয়া উক্ত দৈব পদার্থকে দূরে নিক্ষেপ করতঃ আপন পুরুষকার বলে স্বীয় হৃদয়েই পরমোত্তম ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন; পরন্তু যতদিনে তুমি নিজ বুদ্ধিবলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে না পার, ততদিন যাবৎ আচার্য্যসম্প্রদায়ের প্রমাণসিদ্ধ সত্য মতের অনুসরণ করিয়া তত্ত্ব বিচার করিতে থাক।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! প্রথমে সাধুসঙ্গ, সাধু-ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ, সদাচার শিক্ষা ও যোগানুশীলন দ্বারা স্বীয় জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া পরে শাস্ত্রবিহিত মহাপুরুষোচিত লক্ষণে আপনার মহাপুরুষত্ব সাধন করিবে। মহাপুরুষের যে কিছু লক্ষণ আছে, সেগুলি যদি একাধারে কোন পুরুষে না থাকে,

তবে যে পুরুষ যে গুণে অলঙ্কৃত হইয়া জনসাধারণ মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পুরুষের সেই গুণটী শিক্ষা করত তাহার সাহায্যে আপন প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিয়া লইবে। হে রাম! উক্ত মহাপুরুষত্ব শমদমাদি গুণে বিভূষিত। পরন্তু সম্যক্ জ্ঞান না জন্মিলে ঐ মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না। যেমন নবাঙ্কুর সকল বর্ষাজলে সিক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয় ও ক্রমে ফলসম্পদ্ প্রসব করে, সেইরূপ জ্ঞানবলে শমদমাদি গুণসমূহ বৃদ্ধি পাইয়া আত্মসুখ-ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন অন্ন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টি হইতে আবার অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান বলে শমদমাদি গুণ বর্দ্ধিত হয় এবং শমদমাদি গুণ জন্মিলে বিশিষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যেমন পঙ্কজ ও সরোবর পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শমদমাদি গুণ ও জ্ঞান উভয়ে উভয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। সদাচার হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে সদাচার জন্মিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মতিমান্ মুমুক্ষু-ব্যক্তি শম, দম ও প্রজ্ঞা প্রভৃতির সাহায্যে সুনিপুণ মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ করিয়া জ্ঞান ও সৎপুরুষের আচারপ্রণালী অভ্যাস করিবেন।

বৎস! জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অনুশীলন না করিলে উভয়ের কোনটীই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। কৃষককামিনীরা পক্ক শালিক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া উচ্চ করতালি দিয়া গান করিতে থাকে। উহাতে যেমন ধান্যভক্ষণার্থী পতঙ্গপাল বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সঙ্গীতামোদ উপভোগ হইয়া থাকে, সেইরূপ মুমুক্ষু পুরুষ কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া নিস্পৃহভাবে জ্ঞান ও সদাচার অভ্যাস করতঃ আনুষঙ্গিক বিঘ্নবিনাশের সহিত পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রঘুনন্দন! এই আমি তোমাকে সদাচারক্রম উপদেশ দিলাম। এইরূপ এক্ষণে উত্তর প্রকরণে সম্যক্ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিব। ইহাতে যশ, আয়ু ও পুরুষার্থ ফল লাভ হইয়া থাকে। ঈদৃশ সাধুশাস্ত্র আপ্তমুখে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। জল যেমন কতক* যোগে কলুষতা ত্যাগ করিয়া

* নির্ম্মলী বীজবিশেষ।

নির্ম্মল হয়, সেইরূপ এই শাস্ত্র শ্রবণে তোমার বুদ্ধি এক্ষণে নির্ম্মল ও প্রসন্ন হইবে; তুমি পরম পদ লাভ করিবে। মননশীল মুমুক্ষুর অন্তঃকরণ যখন প্রকৃত সাধন বলে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা নিজের প্রেরণা না থাকিলেও পরম পদে প্রবেশ করে। অপিচ তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান জাল ছিন্ন করিয়া যে অখণ্ডিত পরম পদ প্রকাশ পায়, অন্তঃকরণ তাহাকে তখন আর পরিত্যাগ করে না।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

মুমুক্ষু-ব্যবহার প্রকরণ সমাপ্ত।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

উৎপত্তি-প্রকরণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

শ্যামপুকুর—২ নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের
মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

নূতন সংস্করণ।

কলিকাতা;

দি গ্রেট ইষ্টারণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,—৪৩ নং গ্রে-ষ্ট্রীট।
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

ভূমিকা।

ভগবৎকৃপায় যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের উৎপত্তিনামক তৃতীয় প্রকরণের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। প্রকরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, এইখানে একরূপ সমগ্র গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। শ্লোকসংখ্যার আধিক্য অনুসারে উত্তরার্দ্ধ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বটে; কিন্তু আমরা আশা করি, নিয়মিত প্রকাশে নাতিচিরকাল মধ্যেই আমাদের আগ্রহবান্ গ্রাহকগণ সমস্ত গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন এই গ্রন্থ যে কিরূপ দুরূহ অথচ উপাদেয়, তাহা আমাদের অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে এখানে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ইতি

কলিকাতা।
মহাভারত কার্য্যালয়, মাঘ
বঙ্গাব্দ ১৩১৫।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

উৎপত্তি-প্রকরণের সূচীপত্র।

উৎপত্তিপ্রকরণ-সূচীপত্র সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

উৎপত্তি-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম; যিনি বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম; আমিই ব্রহ্ম এবং 'তত্ত্বমসি' এই চতুর্ব্বিধ মহাবাক্য পর্য্যালোচনা করত যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য বন্ধরূপ আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া স্বপ্নের ন্যায় প্রকাশমান হন এবং সমস্ত সংসার ব্রহ্মময়, এবম্বিধ পরমার্থজ্ঞানজনক বাক্য দ্বারা যিনি যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হন, তিনিই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন; অতএব তিনিই ব্রহ্মবিৎ। সংক্ষেপতঃ এই যাহা বিবৃত করিলাম, ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, এই যে কিছু জগৎপ্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে, রজ্জুতে ভ্রম-সর্পের ন্যায় ইহা ব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত; ব্রহ্মই জগৎরূপে বিরাজিত। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জ্ঞানোদয়ে এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে এই জগৎ বা এই সংসার কি, কোথা হইতে জন্মিয়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, এ সকল প্রশ্ন আপনা হইতেই মীমাংসিত হইয়া নিরাকৃত হয়।

হে বিজ্ঞ! আমি তোমার নিকট জ্ঞান, বস্তু ও স্বভাবানুসারে যথাক্রমে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া কহিতেছি, তুমি সে সকল শ্রবণ কর। আত্মার কোন আকার নাই, তিনি আকাশের ন্যায় নিরাকার

এবং তিনি চৈতন্যস্বরূপ। সেই আত্মাই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় অবলোকন করেন। 'আমি, তুমি, সে' ইত্যাদিরূপে এই যে জগৎসংসার প্রতীয়মান হয়, স্বপ্ন দৃষ্টান্ত দ্বারাই ঐ জগৎ-সংসারের ভাব বুঝিয়া লওয়া যায়। অর্থাৎ যেমন স্বপ্ন দর্শন সত্য, কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা কিছুই নহে,—মিথ্যা; সেইরূপ জগৎ যে দেখা যাইতেছে, ইহাই সত্য; কিন্তু জগৎ মিথ্যা।

আমি পূর্ব্বে মুমুক্ষু-ব্যবহার প্রকরণ কীর্ত্তন করিয়াই অতঃপর এই উৎপত্তি প্রকরণ বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বৎস! তুমি হয়ত মনে করিতে পার যে, কি করিয়া সংসারবন্ধন মোচন হয়, আমি তাহারই উপায় জানিতে চাই, কিন্তু এই মিথ্যা জগতের উৎপত্তি কথা শুনিয়া আমার কি হইবে? বাস্তবিকই তোমার মনোভাব এরূপ হইয়া থাকিলে আমি বলি, এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, ইহা আছে বলিয়াই বন্ধন হয়। এই প্রপঞ্চের অভাব ঘটিলেই বন্ধন আর থাকে না। সুতরাং যাহাতে দৃশ্য-সম্ভাবনা ঘুচিয়া যায়, ক্রমে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই জগতে যে জন্ম-লয়, সেই বর্দ্ধিত হয়, সেই মোক্ষ পায় অথবা সেই স্বর্গ কিম্বা নরক ভোগ করে। বদ্ধ জীবের ইহাই হইল গতি। কিন্তু আত্মা এ নিয়মে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, এবং মোক্ষ, স্বর্গ বা নরকভোগ নাই। কেবল স্বস্বরূপের অজ্ঞতানিবন্ধনই তাঁহার জন্মাদি ভ্রম বিভাবিত হয়। তিনি দৃশ্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনি, অণুমাত্রও বিকৃত হন না। বৎস! যে হেতু তুমি নিজের স্বরূপ জানিতে পার নাই বলিয়া তোমার বন্ধন আছে—তুমি সংসারে বদ্ধ রহিয়াছ; অতএব আমি তোমার সেই আত্মজ্ঞান প্রতিপাদনার্থ তোমার আমার উৎপত্তি হইবার বিবরণ বর্ণন করিব। হে রঘুনন্দন! এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য হইল সংসারের উৎপত্তি। আমি অগ্রে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরে তোমার ইচ্ছামত ইহার বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্ত করা যাইবে।

স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই যে চরাচর বিশ্ব দেখা যাইতেছে, এ সকল প্রলয়ে বিলয় পাইয়া থাকে। যিনি না তেজ, না অন্ধকার, সেই স্তিমিতগম্ভীর বিশ্ববিভাসক ব্রহ্মই কেবল

তৎকালে বিরাজ করেন। প্রলয়ে তিনি বিলয় প্রাপ্ত হন না। তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, বা স্পন্দন নাই। পণ্ডিতেরা কেবল লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে সত্য, আত্মা ও পরব্রহ্মাদি নামে নির্দ্দেশ করেন। তিনি বিশুদ্ধ চিৎস্বভাব বটে; কিন্তু যখন সৃষ্টিবিস্তারের উপক্রম হয়, তখন তিনি আপনিই আপন মায়ায় বিভিন্ন জড়রূপে বিবর্ত্তিত ও জীব নামে বিড়ম্বিত হইয়া জীবভাব পরিগ্রহ করেন। তাঁহাকেই ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। অনন্তর সেই জীবভাবাপন্ন পরমাত্মা মন-আকারে পরিণত হন। তখন তিনি বিবিধ সঙ্কল্প-বিকল্পের অবলম্বনে বহুল জড়ভাব আশ্রয় করিবার পর প্রাণ ও পঞ্চভূতরূপ পরিগ্রহ করেন। তিনি মন-আকারে পরিণত হইলেই নিজের পরমাত্মভাব ভুলিয়া যান; তখন সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গনিচয়ের ন্যায় তাঁহা হইতেই সঙ্কল্প-বিকল্পাদি বিবিধ মনোধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়। পরে সেই সমষ্টি-মন-আকারে পরিণত হিরণ্যগর্ভ-নামক চৈতন্য আপনিই আপন ইচ্ছায় পূর্ব্বসংস্কার বশে প্রতিনিয়ত নানাবিধ সঙ্কল্প করিতে থাকেন; সেই সত্য সঙ্কল্পবলেই এই ইন্দ্রজাল তুল্য বিশাল জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মনে কর, যেমন স্বর্ণবলয় স্বর্ণ হইতে ভিন্ন নয়, এবং ঐ বলয়ের যে স্বর্ণ, তাহাকেও স্বর্ণ বলয় হইতে ভিন্ন বলা চলে না, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তা আছে বলিয়া যে জগতের সত্তা, সে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয় আবার ব্রহ্মও জগৎ হইতে পৃথক্ নহেন। এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব ব্রহ্মভাবেই পর্য্যবসিত; পরন্তু জগদ্ভাবে নহে। ইহার দৃষ্টান্ত—স্বর্ণ-বলয়ের অস্তিত্ব স্বর্ণভাবেই পর্য্যবসিত, পরন্তু বলয়ভাবে পর্য্যসিত নহে। ফলতঃ বলয় একটা সাময়িক নামমাত্র; সুতরাং স্বর্ণবলয়কে সত্য বলিতে হইলে তাহার স্বর্ণভাব লইয়াই বলিতে হইবে। মরুমরীচিকায় নদীতরঙ্গ-হিল্লোল অসত্য হইলেও যেমন সত্যবৎ মনে হয়, সেইরূপ এই ইন্দ্রজালময় জগৎ প্রকৃত অসত্য হইলেও মনে মনে সত্য বলিয়া ধারণা জন্মে। এই কারণেই সর্ব্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই জগতের অবিদ্যা, সংসৃতি, বন্ধ, মায়া, মোহ, মহৎ ও তম এই সাতটী নাম কল্পনা করিয়াছেন।

হে চন্দ্রানন! তুমি শ্রবণ কর, আমি অগ্রে তোমার নিকট বন্ধের

স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি; অতঃপর মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন করিব। যিনি দর্শনকর্ত্তা, দৃশ্যপদার্থের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহাকেই বন্ধন বলা যায়। ঐ দর্শনকর্ত্তা বা দ্রষ্টাই দৃশ্য দ্বারা বদ্ধ এবং দৃশ্যের অভাবেই বিমুক্ত হয়েন। 'তুমি আমি' ইত্যাদি মিথ্যাভেদ-কল্পিত জগৎকেই দৃশ্য নামে অভিহিত করা যায়। জগৎ সম্বন্ধে যাবৎ ঐরূপ মিথ্যা ধারণা থাকিবে, তাবৎ মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ কোন বস্তু দেখিবার সময় যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্যবধান বা অন্তরাল বশত ঐ বস্তু আর দেখিতে পাওয়া যায় না; এইরূপ এই দৃশ্য জগৎ অন্তরালে থাকিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। 'ইহা নাই, তাহা নাই, এ সকল অলীক' এ সমস্ত কথা অনর্থক প্রলাপ বাক্যের ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিলে কখন দৃশ্যবোধস্বরূপ ব্যাধি শান্তি হইবার নহে। বরং উহাতে তাহা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। বিচারকেরা বলিয়াছেন, তর্কের কৌশলজাল বিস্তার, তীর্থ-সেবা বা নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিলে এই সত্যবৎ প্রতীয়মান দৃশ্য জগৎকে তুচ্ছ বা উপেক্ষা করা যায় না, পরন্তু মনকে যিনি আত্ম-বিচারে নিয়োগ করেন, তিনিই এই জগৎকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যান। এই যে দৃশ্য জগৎ, ইহা যদি সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে কখন ইহার অন্যথা বা অবসান হইবে না; কেন না, যাহা অসৎ, তাহার সত্তা আর যাহা সৎ, তাহার অসত্তা একেবারেই অসম্ভব।

বৎস! যতদিনে না দৃশ্য নিবৃত্তি ঘটে, বুদ্ধির অবিষয়ীভূত চিন্ময়াত্মা তাবৎ পর্য্যন্ত যে যে স্থানেই অবস্থান করুন, সেই সেই স্থানে এমন কি পরমাণুগর্ভেও তাঁহার দৃশ্য দর্শন ঘটিবে। এই জন্যই আমি জগৎ থাকিলেও তাহার দৃশ্যভাব পরিত্যাগ করিয়াছি। সুরাপানে পরিতৃপ্তি আছে, এই ধারণা যেমন পরিত্যাগ করিতে হয়, আমি তপস্যা, ধ্যান ও জপ অভ্যাসে চিত্তশুদ্ধি সাধন করিয়া এই দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব ভ্রম সেইরূপ বিসর্জ্জন করিয়াছি। ফল কথা, এই জগৎ রহিয়াছে, ইহাকে দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহা সত্য, এই যে ধারণা, ইহা পরিত্যাগ করা উচিত। জগৎ নাই,

তাহা দেখা যাইতেছে না, যাহা রহিয়াছে ও দেখা যাইতেছে, তাহা আত্মা বা আমি, এই ভাব অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাসের ফলে অল্পে অল্পে দৃশ্য মার্জ্জন ঘটিবে, তখন ইহা থাকিলেও আর বন্ধনের কারণ হইবে না।

রামচন্দ্র! যত কাল জগৎ দর্শন ঘটিবে, পরমাণুর অভ্যন্তরে থাকিলেও তাবৎ পর্য্যন্ত চিৎস্বরূপ দর্পণে জগতের প্রতিবিম্বপাত হইবেই হইবে। মনে কর, দর্পণ বিস্তৃত বা সঙ্কীর্ণ যে কোন স্থানেই থাকুক, সেই-স্থানেই যেমন তাহাতে ভূতল, সলিল, শৈল, সাগর, ও সরিৎ প্রভৃতি প্রতি-বিম্বিত হয়, চিৎস্বরূপ দর্পণেও সেইরূপই জগতের প্রতিবিম্বপাত ঘটিয়া থাকে। প্রতিবিম্বপাত বশতই পুনঃপুন দুঃখ, জরা, মরণ ও জন্ম এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা, পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম ও স্থির অস্থির বিভাগ ও সে সকলের লয়, এই সমস্তই দৃষ্ট হয়। অবশ্য এরূপ মনে ধারণা করিও না যে, জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি আয়ত্ত করিতে পারিলেই দৃশ্য বোধ মার্জ্জিত হইয়া যাইবে। কেন না, সমাধি কালেও আমি দৃশ্য দেখি-তেছি না, দৃশ্য মার্জ্জন করিয়া অবস্থান করিতেছি, এইরূপ সংস্কারের অভাব হয় না। ঐরূপ সংস্কার থাকে বলিয়াই সমাধি ভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়। এই স্মরণই পুনঃপুন সংসারের অক্ষয় বীজ এবং এই বীজই পুনঃ-পুন সংসারাঙ্কুর উৎপাদন করে। সুতরাং সবিকল্প সমাধি দৃশ্য মার্জ্জনের হেতু হইতে পারে না। তবে কথা এই যে, নির্ব্বিকল্পক সমাধি অবলম্বনে নির্ব্বাণ পদ পর্য্যন্তও লাভ হইতে পারে বটে; কিন্তু দৃশ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত না হইলে নির্ব্বিকল্পক সমাধির সম্ভাবনা কোথায়? গাঢ় নিদ্রার অবসানে যেমন মানুষের পূর্ব্বতন সমস্ত জ্ঞান আসিয়া উদিত হয়, সেইরূপ সমাধি ভঙ্গের পর উত্থিত হইলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় অখণ্ডিত দুঃখময় জগৎ প্রতিভাত হইতে থাকে।

রামচন্দ্র! পুনরায় যাহাতে অনর্থবহুল ভোগরাশিতে মগ্ন হইতে হয়, এরূপ ক্ষণিক সম-সুখজনক ঐ সমাধিতে কি ফল হইয়া থাকে? যদি এমন কখন ঘটে যে, কোন কালেও নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইবে না, অনন্ত কাল একই ভাবে থাকিবে, তাহা হইলে অবশ্য অনন্ত সুষুপ্তির ন্যায় নির্ম্মল ব্রহ্মপদ লাভ হইতে পারে; কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা

নাই। কেন না, মন হইল মূল দৃশ্য, সেই মনই যখন বিদ্যমান রহিল, তখন যত্নপরায়ণ যোগিগণেরও দৃশ্য মার্জ্জন হইবার নহে। ফলতঃ তথাবিধ চিত্ত যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে, সেই সেই বিষয়েই জগদ্ভ্রম থাকিবেই। দ্রষ্টা যদি জোর করিয়া আপনাকে পাষাণ ভাবনায় ভাবিত করত পাষাণ পরিণামে স্থাপিত করেন, তবে সে পরিণামের অবসানেও পুনরায় তাঁহার দৃশ্য দর্শন ঘটিবেই ঘটিবে। আর এ কথাও স্থির যে, এ পর্য্যন্ত কোন যোগীরই নির্ব্বিকল্প সমাধি পাষাণবৎ অনন্তকাল স্থিতিশীল হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই; ইহা সমস্তেরই অনুভবসিদ্ধ।

নির্ব্বিকল্প সমাধি নিয়ত পাষাণবৎ স্থিতিশীল হয় না, আর যদিই বা হয়, তাহাতেও অনাদি অনন্ত শান্ত সচ্চিদানন্দরূপ পরম মোক্ষপদ প্রদান করিতে পারে না; সুতরাং পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইলে দৃশ্যজ্ঞানের অপসারণ একান্তই আবশ্যক। দৃশ্যজ্ঞান দূরীকরণ বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা উচিত,—অদ্য মাতা, কল্য পিতা, পরশ্ব পুত্র, এইরূপে কলত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং তুমি আমি, কাহারও মৃত্যুমুখ হইতে অব্যা-হতি নাই। সংসারের মহাপ্রদীপ চন্দ্র সূর্য্যও কালবশে নির্ব্বাণ হইবে। কালবশে জগতের শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুও রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বাধার আকাশও কালবশে বিলীন হইবে। এইরূপে পৃথিবীর কিছুইত চিরস্থায়ী নহে। আমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া, স্বয়ং ভুগিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, তবে আর কেন ইহাতে আসক্ত হইব? কেনই বা ইহার অনিত্য অসার সুখে মত্ত হইয়া নিত্য সার পরম তত্ত্ব ভুলিয়া রহিব?—

যত্ন করিয়া, না খাইয়া, না পরিয়া যে বিষয় সঞ্চয় করা হয়, কৈ তাহা ত কখন সুখের হয় না, পাছে পাপে উহা নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়েই সদা ব্যাকুল থাকিতে হয়। যদি অর্থ রহিল, তবে দস্যু তস্করাদি ত দূরের কথা, নিজের পুত্র কলত্র হইতেও তাহাতে ভয় ও অনর্থসঞ্চার হয়। ইহা আমি ভোগ করিয়া বিশেষরূপ বুঝিতে পারিয়াছি। অন্য-দিকে আবার আমি বিষয়ের পর বিষয় ও বিভবের পর বিভব কতই সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কৈ কিছুই ত রাখিতে পারি নাই? যাহা রাখিয়াছি

রা রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতেও ত বিষম বিবাদ বিসংবাদ ও নানা অনর্থ ঘটিয়াছে। এই অসার বিষয় বৈভবের জন্য অনেক সময় পিতা মাতা ও পুত্র কলত্রাদিরও আমি বিষম বিরাগভাজন হইয়াছি। আমি নিজের ও পরের রক্ত শোষণ করিয়া এমন কি প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া জনক-জননী প্রভৃতিকে বৈরী করিয়া এবং আত্মীয় স্বজনকে কষ্ট দিয়া এই যে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি, এ সকল কি আমার চিরকাল থাকিবে অথবা মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে যাইবে? কখনই নহে। উর্ণনাভ যেমন যত্নের সহিত জাল রচনা করিয়া শেষে আপনিই তাহাতে আবদ্ধ হয়, দেখিতেছি, সংসারের মানুষও ত সেইরূপ বহুল আয়াসে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়া আপনারই বন্ধনকারণ ঘটাইতেছে। তবে আর কেন এমন বিষয় সংগ্রহে আগ্রহ?—

পুত্রের পর পুত্র, কন্যার পর কন্যা জন্মিতেছে, মরিতেছে; এই-রূপে যাহা হইতেছে, তাহাই ত চলিয়া যাইতেছে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ভোগ করিয়াও ত চৈতন্য সঞ্চার হয় না। ফলতঃ বার বার ঐ বিনশ্বর বিষয়েই বিশিষ্ট আগ্রহের উদয় হইতেছে। এ সকল দৈবী বিড়ম্বনা কি বুঝা যাইতেছে না?—

আমি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি বহুমূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি, নানা দুরাশা ও অসার চিন্তা আসিয়া আমায় ঘিরিয়াছে, বহু যত্নে—বহু আরাধনায়ও আমার নিদ্রাসুখ লাভ হইতেছে না, কিন্তু ঐ যে কুটিরবাসী দরিদ্র গৃহী কদর্য্য শয্যায় শুইয়া আছে, আহা! কেমন আরামদায়িনী নিদ্রায় উহার কত শান্তি হইতেছে! সুতরাং আমি ধনী আর ঐ দরিদ্র, উভয়ের গৌরব লাঘব কি এবং বহুমান, অসম্মান কি? এইত বহুমূল্য বসন ভূষণে ভূষিত দিব্য দেহ, ইহাও এক দিন শ্মশানে যাইবে আর ঐ যে রুক্ষ নগ্ন দরিদ্র দেহ, উহাও ত সেই শ্মশানেরই চিতা ভস্মে পরিণত হইবে। তবে আর ধনী দরিদ্রের বিশেষত্ব কি? ইহা অপরের দৃষ্টান্তেও হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভূত হইতেছে।—

কেবল ভোগেতেই তৃপ্তি হয় না, তৃপ্তিতে ও ভোগে অনেক ব্যবধান। আমি বহু ব্যয়ে বহু যত্নে বিবিধ খাদ্য আহার করিয়াছি, কিন্তু কৈ

আমার ত তেমন তৃপ্তি হয় নাই। কিন্তু ঐ যে বনের ক্ষুদ্র হরিণ, বনে বনে যথেচ্ছ ঘুরিয়া ফিরিয়া সামান্য আহারে কাল কাটাইতেছে, মনে হয় না কি উহার মনে কত তৃপ্তি, কত স্ফূর্ত্তি! তবে আর এ দগ্ধ উদরের জন্য কেন এত বিব্রত ও ব্যাকুলিত হইয়া শতদিকে—শতরূপে শত পাপ সঞ্চয় করিতেছি? ইহা অপেক্ষা আমার মূর্খতা আর কি আছে? অতএব আর না—আর আমি এমন করিয়া এমন অলীক অকিঞ্চিৎকর সংসারের কোন কিছুতেই বদ্ধ রহিব না। ক্ষুধা হয়, বনের ফল-মূল আমার উদর পূরণে সহায় হইবে; তৃষ্ণা হয়, নির্ঝরিণী আমায় বারি বিতরণ করিবে; নিদ্রাভরে অলস হই, ভূতধাত্রী ধরিত্রী আমায় ক্রোড়ে লইবেন; গ্রীষ্ম হয়, বায়ু আমার সেবা করিবে; শীত হয়, অগ্নি আমার শরণ হইবেন; বৃষ্টি হয়, ঐ গিরিগুহা আমি আশ্রয় লইব। আর যদি সকলেরই ত্যাগের পাত্র হই, সকলকেই ত্যাগ করিতে পারি, তখন ত সর্ব্বভূতশরণ্য সর্ব্ববরেণ্য ভগবান্ আমার চরমের পরম সহায় হইবেন।—

বৎস! এইরূপে যোগশাস্ত্র-সঙ্গত বিবেক বিচার করিয়া বিশ্ববস্তুর পরিহার করা কর্ত্তব্য। ইহা হইলেই দৃশ্য জ্ঞান তিরোহিত, সমদর্শিতা আবির্ভূত, পরমার্থ পথ পরিষ্কৃত ও মোক্ষ মার্গ আবিষ্কৃত হয় এবং পরে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

রামচন্দ্র! এই যে সমস্ত দৃশ্য, ইহা অসত্য; কারণ উহা যদি সত্য হইত, তবে উহার অবসান ঘটিত না। আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিনাশই এই দৃশ্যের বিনাশ বা অপসারণ। তপ, জপ ও ধ্যানাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; কিন্তু তাহাতে যে দৃশ্য জ্ঞান পরিহার হইয়া শান্তি লাভ হয়, ইহা অবশ্য অজ্ঞজনেরই কল্পনা।

যে কমলিনী ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, তাহার বীজ যেমন কমল মধ্যে নিহিত থাকে, সেইরূপ যিনি দ্রষ্টা বা চিদাত্মা, তাঁহাতে দৃশ্যবুদ্ধি সংস্কাররূপে লুক্কায়িত থাকে। পদার্থ বিশেষে রস, তিলাদিতে তৈল এবং কুসুমাদিতে গন্ধ যেমন নিত্য সন্নিহিত, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধিও তেমনি সংসক্ত আছে। কর্পূরাদি পদার্থ যে স্থানেই থাকুক, সেইখানেই যেমন

গন্ধ উদ্ভাবন করে, সেইরূপ জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যেখানেই যে অবস্থায় অবস্থান করুন, তদীয় উদরে দৃশ্য জগতের উদয় অবশ্যম্ভাবী। উক্ত দৃশ্য-বুদ্ধি স্বপ্ন-সঙ্কল্পাদির ন্যায় তোমার হৃদয়দেশেই বিরাজমান; তুমি উহা স্বীয় অনুভব দ্বারাই বুঝিতে পারিবে।

রামচন্দ্র! আপনার চিত্ত-কল্পনা-প্রসূত পিশাচ যেমন বালকের বিনাশ সাধন করে, সেইরূপ এই দৃশ্যরূপিণী পিশাচীও দ্রষ্টাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই দৃশ্যবুদ্ধি অন্তর্নিহিত চিৎসংযুক্ত চিত্তে সংস্কাররূপে বিরাজিত। বীজগর্ভস্থ অঙ্কুর যেমন দেশ কালবশে বৃহৎ বৃক্ষরূপে প্রস্ফুরিত হয়, ঐ দৃশ্য-বুদ্ধি তেমনি দেশ, কাল ও অবস্থাক্রমে বিবিধ দেহ কল্পনা করিয়া সংসার-পরম্পরা বিস্তার করে।

হে রঘুনন্দন! বীজাদির অন্তরে বৃক্ষ-শক্তি যেমন সতত বর্ত্তমান; কিন্তু সে শক্তি কখন বিলুপ্ত এবং কখন পরিত্যক্ত বোধ হয়। সেইরূপ চিন্মাত্রমূর্ত্তি জীবের অন্তরে তাঁহার স্বভাবভূত জগৎ নিরন্তরই অবস্থিত; তবে কাল-বিশেষে উহা মাত্র লুপ্ত বা ত্যক্ত বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনন্দন! এক্ষণে আমি তোমার নিকট আকাশজ বিপ্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে তুমি উৎপত্তি প্রকরণ বুঝিতে পারিবে।

পুরাকালে আকাশজ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, ধ্যানৈকনিষ্ঠ, এবং সতত সর্ব্বভূতের হিতৈষী। ব্রাহ্মণ ঐ অবস্থায় চিরকাল জীবন ধারণ করিতেছিলেন। মৃত্যু তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, আমি একে একে সকলকেই সংহার করি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণকে

বিনাশ করিতে পারিতেছি না কেন? প্রস্তরে খড়্গধারার ন্যায় এই ব্রাহ্মণে আমার শক্তি প্রতিহত হইতেছে।

মৃত্যু এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণের বিনাশ জন্য তদীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। বস্তুতঃ কোন উদ্যমশীল পুরুষই স্বকার্য্য সাধনে কদাপি ঔদাস্য করেন না। যাহা হউক, মৃত্যু যেমন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিলেন, অমনি কল্পান্তকালীন বহ্নিতুল্য পাবক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু মৃত্যু সেই পাবকের প্রচণ্ড প্রকোপ গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র অগ্নির মহতী জ্বালামালা ভেদ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য তাঁহার শত হস্ত প্রসারিত হইল; ব্রাহ্মণ সম্মুখে আছেন, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সঙ্কল্প-কল্পিত পুরুষকে যেমন ধরিতে পারা যায় না, সেইরূপ মৃত্যু বলবান্ হইয়াও তাঁহাকে তখন স্পর্শ করিতেও পারিলেন না। অনন্তর মৃত্যু, সর্ব্ব-সংশয়ের উচ্ছেদ-কর্ত্তা যমকে আসিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমি আকাশজ ব্রাহ্মণকে কি কারণে ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছি না?

যম উত্তর করিলেন, হে মৃত্যো! ঐ ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিবার একাকী তোমার সাধ্য নাই। বধ্য ব্যক্তির কর্ম্মই তাহার বধের কারণ, মানুষের মরণোপযোগী কর্ম্ম না থাকিলে কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। কর্ম্মই প্রকৃতপক্ষে সংহারক, তুমি উপলক্ষমাত্র। অতএব ঐ ব্রাহ্মণের মরণোপযোগী কোন কর্ম্ম আছে কি না, অন্বেষণ কর, যদি কর্ম্ম থাকে, তবে তাহার সাহায্যে তুমি উহাঁকে গ্রাস করিতে পারিবে।

তখন যমের কথায় মৃত্যু সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্মান্বেষণে উদ্যত হইয়া নানা-দিগ্দিগন্ত পরিভ্রমণ করিলেন। কত নদী, কত বন জঙ্গল, কত সাগর, তীর, কত সরোবর, কত শৈল এবং কত-কত দ্বীপান্তর, দেশান্তর, নগর, পুর, অরণ্য, গ্রাম ও দুর্গম স্থান, এমন কি সমগ্র ভূমণ্ডল এই উপলক্ষে মৃত্যু কর্ত্তৃক অন্বেষিত হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় কিম্বা কল্পিত পর্ব্বতের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্মের অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন মৃত্যু প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ যমের নিকট আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিলেন। বাস্তবিক অনুজীবিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে প্রভুরাই তাহার একমাত্র মীমাংসাস্থল।

মৃত্যু জিজ্ঞাসিলেন, প্রভো! আকাশজ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম কোথায় আছে বলিয়া দিন। ধর্ম্মরাজ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মৃত্যো! আকাশজ ব্রাহ্মণের কোন কর্ম্মই নাই। সেই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন। আকাশজাত ব্যক্তি নির্ম্মল আকাশই হইয়া থাকে; সুতরাং সেই ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ম্ম বা মরণের সহকারী কারণ নাই এবং বন্ধ্যার পুত্র ও অবাস্তব পদার্থ, এই উভয়ের ন্যায় কোনরূপ প্রাক্তন কর্ম্মের সহিতও ইহাঁর সম্বন্ধ একেবারেই অলীক। ইহাঁর জন্মের প্রতি যখন আকাশ ভিন্ন অন্য কারণ নাই, তখন ইহাঁকে আকাশ বৈ আর কি বলা যায়? প্রত্যুত ইনি কেবল আকাশই। আকাশে যেমন প্রকাণ্ড পাদপ থাকে না, ইহাঁতেও তেমনি পূর্ব্ব কর্ম্ম নাই। পূর্ব্বকর্ম্মের অভাব হেতু ইহাঁর চিত্তও বশীভূত হইয়াছে। কায়িক কিম্বা মানসিক কোন কর্ম্মই ইনি সঞ্চয় করেন নাই; সুতরাং ইনি নির্ম্মল আকাশ-স্বরূপ এবং স্বীয় কারণ আকাশ বা ব্রহ্মেই ইহাঁর অবস্থান। ইনি নিত্য পুরুষ। আকাশ বৈ অন্য কারণ ইহাঁর নাই এবং প্রাক্তন বা অদ্যতন কোন কর্ম্মও ইহাঁর নাই। ইনি কেবল বিজ্ঞান আকাশস্বরূপ। আমরা না জানিয়া ইহাঁকে প্রাণ-স্পন্দনাদিবিশিষ্ট মনে করি। বাস্তবিক পক্ষে ইহাঁর কর্ম্মবুদ্ধি নাই। মনে কর, স্তম্ভের উপর কাষ্ঠপুত্তলিকা ক্ষোদিত আছে; ঐ পুত্ত-লিকা স্তম্ভ হইতে যদিও অভিন্ন, তথাপি যেমন উহাকে বিভিন্নাকার দেখায়, সেইরূপ চিন্ময়ী প্রপঞ্চরচনা ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকিলেও স্বীয় আকার চিৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

এইরূপ ঐ আকাশাত্মা ব্রাহ্মণও পরমার্থ হইতে অভিন্নভাবে অবস্থিত। আকাশে শূন্যতা, জলে তরলতা ও বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায় পরম পদে স্বভাব-তই ইহাঁর অধিষ্ঠান। প্রাক্তন বা অদ্যতন কোন কর্ম্ম সঞ্চিত না থাকাতে ইনি সংসারেরও বশীভূত নহেন। সহকারী কারণের অভাবে যাহার জন্ম হয়, সে স্বীয় কারণ হইতে ভিন্ন নহে; ইহা অনুভবেই বুঝিয়া লওয়া যায়। সুতরাং ইহাঁর যখন কোন কারণ নাই, তখন ইহাঁকে স্বয়ম্ভু নামেই অভিহিত করা যায়। বিশেষতঃ পূর্ব্বতন বা অধুনাতন কোন কর্ত্তৃত্বও ইহাঁর নাই;

অতএব তুমি কেমন করিয়া ইহাঁকে আক্রমণ করিবে বল? যে জীব কল্পনা-বলে আপনাকে পৃথিব্যাদি ভূতবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করে, সেই পার্থিব জীবকেই তুমি আক্রমণ করিতে পার। ইনি সেরূপ কল্পনা করেন না, বা পৃথিব্যাদির সম্বন্ধজ্ঞান ইহাঁর নাই। ইনি কোন আকারবান্‌ও নহেন। সুতরাং আকাশকে যেমন দৃঢ় রজ্জু দিয়াও বাঁধিতে পারা যায় না, সেইরূপ ঐ নিরাকার ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব।

মৃত্যু কহিলেন, ভগবন্! আকাশ হইল শূন্য; সেই শূন্য হইতে কেমন করিয়া ব্রাহ্মণের জন্ম হইল? আর পৃথিব্যাদি ভূতগণ কখন থাকে এবং কখন বা না থাকে কেন? এ সকল তত্ত্ব আমার নিকট বলুন।

যম উত্তর করিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। উঁহার অস্তিত্ব চিরদিনই আছে। উনি কেবল বিজ্ঞান-বিভা ও নিরাকাররূপে বিরাজিত। অর্থাৎ উহাঁর জন্ম নাই, মরণ নাই, বিকার নাই, উনি নিত্য মুক্ত অনাদি অনন্ত চিৎস্বরূপ। যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; থাকেন কেবল—সেই শান্ত শূন্য সূক্ষ্ম নিত্যপ্রকাশ নিরুপাধি অনন্ত অজর পরব্রহ্ম। অনন্তর যখন সৃষ্টির উপক্রম হয়, তখন বাসনা অদৃষ্ট-সম্বলিত জীবের অবিদ্যা-বশত ঐ জ্ঞানমাত্রস্বভাব ব্রহ্মের সন্নিকটেই 'আমি দেহ' ইত্যাকার অদ্রিপ্রমাণ তেজোময় বিরাট দেহের ঈষৎ স্ফুরণ হয়। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাবশেই কাকতালীয়বৎ ঐ ভ্রমসঙ্কুল মিথ্যাভূত আকার আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিরাট পুরুষের তাৎকালিক সেই যৎকিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই আমরা মনে করি, ইনি বুঝি আকারবান্। বস্তুতঃ আমাদের সে জ্ঞান বা দর্শন স্বপ্নবৎ অলীক। উহা পরমার্থ সত্য নহে। ব্রহ্ম—আকাশস্বরূপ, হিরণ্যগর্ভের উপাধি অজ্ঞান—জলাশয়সদৃশ। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সেই উপাধিতে পতিত হইয়া জলাশয়ধর্ম্ম বিক্ষোভাদির আশ্রয় লয়; সেই উপাধিই তেজোময় বিরাট দেহ. আখ্যায় অভিহিত হয়। জলের কিয়দংশ যেমন জলাশয়ের ব্যষ্টি, প্রত্যেক স্বাপ্ন জীব সেইরূপ হিরণ্য-গর্ভের ব্যষ্টি।

এই সেই হিরণ্যগর্ভই আকাশজ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ সৃষ্টির উপক্রমে আকাশোদরে নির্ব্বিশেষ চিদাকাশরূপে অবস্থান করেন। দেহ,

কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব বা বাসনা এ সমুদায়ের কিছুই ইহাঁর নাই। ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ ও কেবল জ্ঞানঘনরূপে উদ্ভাসিত। প্রাক্তন বাসনা জাল ইহাঁর কিছুই নাই। দীপ্তিই যেমন তেজের রূপ, তেমনি ঐ আকাশজ ব্রাহ্মণের আকাশই কেবল রূপ। যখন বেদনা বা বহির্ম্মুখী চিৎপ্রবৃত্তিও প্রশান্ত হইয়া যায়, তখন আর ঐ প্রাতিভাসিক শরীরও থাকে না। ঐ বেদনার শান্তি চিদাকাশের স্বরূপ পরিচয়েই হয়। অতএব বুঝিয়া দেখ, যেখানে চিন্মাত্রস্বভাব বেদনারও বিরাম ঘটে, তথায় কিরূপে কেমন করিয়া পৃথিব্যাদির কীদৃশ সম্বন্ধ থাকিবে? ফলতঃ ঐ ব্রাহ্মণে পৃথিবীপ্রভৃতির কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং হে মৃত্যো! তুমি ইহাঁর আক্রমণে প্রয়াস পাইও না। এ চেষ্টা পরিত্যাগ কর। বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি আকাশ আক্রমণে সমর্থ হইয়া থাকে? মৃত্যু এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে স্বমন্দিরে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি এক্ষণে আমাকে যাহা কহিলেন, আমার মনে হয়, ইহা সেই স্বয়ম্ভু অজ একাত্মা বিজ্ঞানময় প্রপিতামহ ব্রহ্মারই কথা। প্রত্যুত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তাহাই বটে; আমি তোমার নিকট এই সেই ব্রহ্মার কথাই কহিয়াছি। পূর্ব্বে মৃত্যু ইহাঁরই জন্য যমের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন। মন্বন্তর কালে সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু যখন প্রজা সমষ্টি সংহার করিয়া প্রবল মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ঐ ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করেন, তখন যম তাঁহাকে উক্তরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যে যাহা নিত্য করে, অভ্যাসবশে তাহাতেই তাহার প্রবৃত্তি হয়। অর্থাৎ মৃত্যু আপন অভ্যাসবশেই ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

মৃত্যুর প্রতি যমের উপদেশ এইরূপ,—সেই ব্রহ্মা পরমাকাশস্বরূপ। তাহাঁকে তুমি আক্রমণ করিবে কিরূপে? তিনি মনোমাত্র ও সঙ্কল্পমাত্র। তাহাঁর আকৃতিতে পৃথিব্যাদি সম্পর্ক নাই। তিনি কেবল চিদাকাশরূপ আকারের অনুভব করেন বলিয়া তাহাঁকে চিদাকাশ ব্যতীত অপর কিছুই বলা যায় না। তাহাঁর কেহ কারণ নাই এবং তিনি কাহার কার্য্যও নহেন। অপার্থিব আকাশে যেমন অবাঙ্মুখভাবে অবস্থিত ইন্দ্রনীলময় মহাকটাহ-আকার এবং মনোমধ্যে যেমন সঙ্কল্পিত পুরুষাকার প্রকাশিত হয়, তেমনি পৃথিব্যাদি সম্পর্ক না থাকিলেও তিনি আপনি আপন চিদাকাশে অনির্দ্দেশ্য

আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই জন্য তাহাঁকে স্বয়ম্ভু নামে অভিহিত করা হয়। এই স্বয়ম্ভু নির্ম্মল নভোমণ্ডলে যেমন মুক্তাশ্রেণী এবং যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ও সঙ্কল্প-কল্পিত নগরী, সেইরূপ পৃথিব্যাদি সম্বন্ধ নাই, অথচ প্রকাশমান হন। ইনি কেবল পরমাত্মা, তাই ইহাঁতে দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদি কোন ভাব নাই। ইনি স্বয়ং শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বভাব, তথাপি স্বয়ম্ভু হইয়া প্রকাশমান। সঙ্কল্পমাত্রই মনের রূপ; ঐ মনোভাবাপন্ন চৈতন্যই ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মপুরুষ সঙ্কল্পাকাশরূপেই বিরাজমান। ইহাঁতে পৃথ্ব্যাদির লেশ মাত্র নাই। পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে চিত্রকরের অন্তঃকরণে যেমন দেহহীন পুত্তলিকা উদিত হয়, তেমনি চিদাকাশের স্বচ্ছ প্রতিবিম্বগ্রাহক মনোরূপী হইয়া এই ব্রহ্মা চিদাকাশে উদিত বা প্রকাশিত হয়েন। কেবল চিদাকাশই ঐ ব্রহ্মা। উহাঁর আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। উনি স্বয়ম্ভু হইয়া নিজ চিত্তবশে আকারবান্ পুরুষবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকেন; বস্তুতঃ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় উহাঁর শরীর অলীক বা মিথ্যা।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথায় বুঝিলাম, মন* শুদ্ধ ও পৃথিব্যাদি-রহিত। আপনি এই মনকেই ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার, আমার এবং অন্যান্য ভূতবর্গের প্রাক্তনী স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কার যেমন শরীরাদি উৎপত্তির প্রতি কারণ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মার উৎপত্তির প্রতি তদীয় প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ হয় না কেন?† আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

---

* এই মন ইন্দ্রিয়াত্মক মন নহে। ইহা মহত্তত্ত্ব।

† বশিষ্ঠ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে মনোরূপে নির্দ্দেশ করেন। বাসনাজালকে মন বলা হয়, অথচ ঐ ব্রহ্মার প্রাক্তন বাসনাজাল কিছুই নাই, এ কথা সঙ্গত হয় কিরূপে? এই সন্দেহবশতঃই রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সম্বলিত পূর্ব্বদেহ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর বিদ্যমান, তাহার পক্ষেই প্রাক্তনী স্মৃতি বা পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কার শরীরাদি-উৎপত্তির কারণ হয়। ব্রহ্মার যখন কিছুই প্রাক্তন কর্ম্ম নাই, তখন আর তাঁহার প্রাক্তনী স্মৃতি কোথা হইতে কিরূপে সম্ভব হইবে ? অতএব জানিও—তিনি আপনিই আপন শরীরের কারণ অথবা স্বীয় চিৎস্বরূপ মনই তাঁহার একমাত্র কারণ। উক্ত চিৎ হইতে তিনি অভিন্ন ; সুতরাং আপনা হইতেই উৎপন্ন বলিয়া তিনি স্বয়ম্ভু নামে অভিহিত। হে রাম ! এই স্বয়ম্ভূর আতিবাহিক নামে একই মাত্র দেহ বিদ্যমান। ইনি জন্মবর্জ্জিত ; ইহাঁর আধিভৌতিক দেহ নাই।[১]

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! নিখিল প্রাণীরই আতিবাহিক ও আধিভৌতিক নামে দুইটী দেহ বিদ্যমান, কিন্তু ব্রহ্মার একমাত্র আতিবাহিক দেহ হইবার কারণ কি, তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, নিখিল কারণাত্মক‡ প্রাণীরই আতিবাহিক ও আধিভৌতিক নামে দ্বিবিধ দেহ বিদ্যমান। পরন্তু ব্রহ্মার কোন কারণ নাই বলিয়া একই মাত্র আতিবাহিক দেহ বর্ত্তমান। ইনি সর্ব্বভূতের কারণ; কিন্তু অজ ইনি—ইহাঁর কোনই কারণ নাই। সুতরাং ইনি একমাত্র দেহবিশিষ্ট। ইনিই আদি প্রজাপতি ; ইহাঁর আধিভৌতিক দেহ নাই। ইনি কেবল আতিবাহিক দেহ ধারণপূর্ব্বক চিদাকাশরূপে প্রকাশমান। চিত্ত বা সঙ্কল্পমাত্রই ইহাঁর দেহ ; পৃথিব্যাদির ক্রমসম্পর্ক ইহাঁতে নাই। এই আকাশদেহ আদ্য প্রজাপতিই প্রজাসমূহের সৃষ্টি বিস্তার করেন। ঐ সকল সৃষ্ট প্রজাও চিদাকাশ-স্বরূপ। কেন না, কারণান্তরের সাহায্য ব্যতীত যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহা ত সেই কারণ বৈ আর কিছুই নহে, ইহা সকলেরই অনুভবগম্য। পরমবোধ-স্বরূপ নির্ব্বাণপুরুষ ভ্রমবশতঃ যদিও চিত্তমাত্র, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তিনি চিদাকাশই বটেন, ভৌতিক পুরুষাদি ভাব তাহাঁতে নাই। ঐ চিত্তদেহই

(১) যেরূপ ফলোন্মুখী বাসনায় মৃত্যুর অধিকারযোগ্য শরীর সম্বন্ধ ঘটে, তাদৃশ বাসনা বা তাদৃশ শরীরসম্বন্ধ হিরণ্যগর্ভের নাই।

‡ চক্ষুরাদি ব্যবহারিক প্রমাণের সাহায্যে পরিজ্ঞেয় পঞ্চীকৃত ভূতসমষ্টিরূপ কারণ।

নিখিল সংসারী জীবের প্রথম স্পন্দন এবং তাহা হইতেই অহম্ভাবের আবির্ভাব। যেমন সূক্ষ্ম বায়ু হইতে স্থূল স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রথম বা আদিম স্পন্দন [ব্রহ্মা] হইতে তদনুরূপ প্রজাসমষ্টির বিস্তৃতি ঘটে। এই যে জীবসমূহ দেখা যাইতেছে, ইহারা চিন্মাত্রমূর্ত্তি পরমব্রহ্ম ইহতে উৎপন্ন বলিয়া যদিও চিন্মাত্রস্বরূপ, তথাপি প্রত্যক্ষভাবে ইহাদিগকে অচিন্ময়-আকারে অর্থাৎ জড়রূপেই প্রকাশমান দেখা যায় এবং জীবের নিকট ইহাই সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। যে বস্তু অসৎ, তাহা হইতে যে সত্যবৎ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, সে পক্ষে দৃষ্টান্ত—স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীসঙ্গম। অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীসঙ্গম সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে যেমন সত্যবৎ প্রয়োজন অর্থাৎ ধাতুক্ষয়াদি সম্পন্ন হয়, সেইরূপ প্রতিভাসমাত্র আকৃতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই প্রতিভাসরূপী সৃষ্টিও সত্যের ন্যায় প্রয়োজন সমাধা করে।

সর্ব্বভূতের ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ আকাশস্বরূপ ; তাঁহাতে পৃথিব্যাদি সম্বন্ধ নাই। তিনি দেহহীন হইলেও সৃষ্টি বিস্তার করেন বলিয়া দেহবান্ পুরুষের ন্যায় প্রকাশিত হন। তিনি সম্বিৎ ও সঙ্কল্পস্বরূপ, স্বীয় স্বভাব বা রূপ তাঁহার স্বায়ত্ত ; এই জন্য তিনি কখন প্রকাশিত এবং কখন বা অপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ পৃথিব্যাদিহীন চিত্ত-মাত্র-স্বরূপ সঙ্কল্প পুরুষ ব্রহ্মাই ত্রিগজৎ স্থিতির একমাত্র কারণ। প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারে ঐ স্বয়ম্ভুর সঙ্কল্প যখন যে আকারে যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সেই আকারে সেই ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। মনে কর, তোমার সঙ্কল্পে মন যখন পর্ব্বত ভাবনা করে, তখন সে পর্ব্বতরূপেই প্রতিভাত হয় ; এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ। সংসারের লোকেরা সুদৃঢ় আত্মবিস্মৃতি বশতঃ স্বীয় আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ নিরাকারতা বিস্মৃত হইয়া বৃথা আধিভৌতিক বা স্থূলদেহ জ্ঞানে পিশাচবৎ বিমোহিত হয়। কিন্তু ঐ ব্রহ্মার রূপ মায়াশবলিত ব্রহ্মের সাহায্যে সমুৎপন্ন ; তিনি সমস্ত স্থূল প্রপঞ্চ অপেক্ষা মূলকারণ ও সূক্ষ্ম ভূতাত্মক এবং সেই সূক্ষ্মভূত সঙ্কল্পেই তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ; সুতরাং তমোগুণের আবরণ তাঁহাতে নাই। তিনি শুদ্ধ সম্বিৎস্বরূপ ; এই জন্যই তিনি আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহ বিস্মৃত হন না। প্রথমে আধিভৌতিক দেহ-

সমূহের উৎপত্তি হয় না ; স্থতরাং তৎসমস্ত দ্বারা তাঁহাতে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা জড়তার আবেশ হওয়াও অসম্ভব। জানিতে হইবে, ব্রহ্মা যখন পৃথিব্যাদিময় নহেন, তিনি একমাত্র মনঃস্বরূপ ; স্থতরাং তাঁহা হইতে উৎপন্ন এই বিশ্বও প্রকৃতপক্ষে মনোময় ব্যতীত অপর কিছুই নহে। অর্থাৎ ইহাতেও বাস্তবিক আধিভৌতিক ভাবের অভাব রহিয়াছে। কেন না, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহা তাহারই স্বরূপ। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে স্থবর্ণ-কুণ্ডলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।*

ব্রহ্মার জন্ম নাই, তাহার কোন সহকারী কারণ নাই ; স্থতরাং তাহা হইতে উৎপন্ন এই যে জগৎ, ইহারও কোন সহকারী নাই। কারণ হইতে কার্য্যের যে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য আছে, এ কথা বলা চলে না। কেন না যেমন যেমন বিশুদ্ধ কারণ, কার্য্যও সেই সেই রূপই হয়, ইহা স্থনিশ্চয়। তবেই দেখ, কার্য্য-কারণের যখন কোনই ভেদ উৎপন্ন হয় না, তখন কারণ ব্রহ্ম ও কার্য্য ত্রিজগতেও কোনরূপ ভিন্ন ভাব নাই।† ব্রহ্ম যখন মনঃ-স্বরূপে এই জগতের সৃষ্টি বিস্তার করেন, তখন জলের তরলতা গুণ যেমন জল হইতে অভিন্ন, সেইরূপ এই জগৎ বিশুদ্ধ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।

* কুণ্ডল একটী স্বর্ণালঙ্কার। ইহা স্বর্ণে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার কারণ স্বর্ণ এবং কার্য্য যে কুণ্ডল, তাহাও স্বর্ণ বৈ আর কিছুই নহে ; তবে কুণ্ডল একটা সাময়িক নাম মাত্র। এখানে কার্য্য-কারণ বস্তুতঃ একই।

† অর্থাৎ জগতের আলোচনা করিলেই ব্রহ্মের আলোচনা করা হয়। ব্রহ্ম অতি দুজ্ঞেয় বিষয়। সহজে তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। যেমন কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িতে হইলে অগ্রে অকারাদি বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে তাঁহার স্বরূপ এই জগৎকে প্রথমে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হয়।

প্রবন্ধান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য এইখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান এবং মৌনাবলম্বনে বাচালতা জয় করিবে। এইরূপে উৎসাহ ও উদ্যম দ্বারা তন্দ্রা জয়, বেদে বিশ্বাস দ্বারা সন্দেহ জয়, ছয় রিপুর বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা জয় এবং যোগপ্রভাবে ক্ষুধা জয় করিবে। সংসারের বস্তুমাত্রই অসৎ ও অনিত্য, এই প্রকার বিচার দ্বারা স্নেহ জয় করিবে। স্পৃহা পরিহার দ্বারা অর্থ জয়, ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ জয়, সঙ্কল্প ত্যাগে বাসনা জয়, সত্যানুশীলনে নিদ্রা জয়, অবধানি

সঙ্কল্প-কল্পিত নগর কিম্বা গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় ঐ মন কর্ত্তৃকই এই মিথ্যাভূত বিশাল প্রপঞ্চ বিস্তৃত হইয়াছে। রজ্জুতে যেমন সর্পত্বনাই, তেমনি উহাতেও বস্তুতঃ আধিভৌতিকতা নাই। ব্রহ্মাদি তত্ত্বদর্শীরা প্রবুদ্ধ; সুতরাং তাঁহাদের উপর আধিভৌতিকতা থাকার সম্ভাবনা কৈ? বিশেষতঃ যখন প্রবুদ্ধমতির আতিবাহিক দেহেরই অভাব, তখন আর তাহার সম্বন্ধে আধিভৌতিক দেহের কথাই বা উত্থাপন হইবে কিরূপে?

এই জগৎ ব্রহ্মাকারধারী মনোনামক মানুষের মনোরাজ্য, মূঢ়লোকেরা ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করে। ফলতঃ মনই ব্রহ্মার রূপ, তাহাও সঙ্কল্পাত্মক; সেই সঙ্কল্পাত্মা মনোরূপী ব্রহ্মাই আপনার সঙ্কল্প বিস্তার করিয়া এই বিশ্ব বিচরণ করেন। মনের রূপ ব্রহ্মা; মনই ব্রহ্মার রূপ। সুতরাং ইহাতে পৃথিব্যাদি সম্পর্ক নাই। পরন্তু মনই পৃথিব্যাদিকল্পনার হেতু। যেমন পদ্মবীজে আর একটী পদ্ম অবস্থিত, সেইরূপ মনোমধ্যে দৃশ্যবর্গ বিরাজিত। মন ও দৃশ্যকে কখন কাহারও ভিন্ন বলিবার সাধ্য নাই, অর্থাৎ

দ্বারা লজ্জা জয়, আত্মচিন্তা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস জয়, ধৈর্য্য দ্বারা কাম দ্বেষ জয়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম-প্রমাদ ও বিষয়তৃষ্ণা জয়, জ্ঞানাভ্যাসে অকার্য্য চিন্তা জয়, পথ্যবস্তুর পরিমিত আহার দ্বারা শরীরের ক্লেশ জয়, সন্তোষ দ্বারা লোভ মোহ জয়, দয়া দ্বারা অধর্ম্ম জয়, সর্ব্বদা অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম জয়, অদৃষ্ট বিচার দ্বারা আশা জয় এবং ইহলোক পর্য্যালোচনায় পরলোক জয় করিবে। এই সকল সদনুষ্ঠানই ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়। এতদ্ভিন্ন বিঘ্নগণ ও অবিঘ্নগণ নামে দুইটী গণ আছে, উহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে কদাচ ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভাব হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন, এই পাঁচটী ব্রহ্ম পথের বিষম কণ্টকস্বরূপ; এই জন্য ইহারা বিঘ্নগণ নামে খ্যাত। ইহা ভিন্ন দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-শুদ্ধি, এই দশটী ব্রহ্মসিদ্ধির সাক্ষাৎ উপায় যোগসাধনের একমাত্র পথ। এই কারণে ইহাদিগের নাম অবিঘ্নগণ। যাহারা তেজ বৃদ্ধি, পাপ নাশ, সঙ্কল্প সুসাধন, বিবিধ জ্ঞান উৎপাদন ও রোগাদি ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাণ সুখ লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে উক্ত অবিঘ্নগণের পরিচর্য্যা করিবেন। এইরূপ কায়, মন ও বাক্যের সংযম, মূঢ়তা ও বিষয়বাসনা বর্জ্জন, কাম-ক্রোধ-পরিহার, অনুৎসাহ ও অহঙ্কার ত্যাগ এবং উদ্বেগ ও গৃহবাস লিপ্সা পরিহার, এই কয়টীকে মোক্ষগণ কহে। ইহাদের সাহায্যে মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী।

অগ্রে বুদ্ধি দ্বারা বাক্য ও মন বশীভূত করিয়া জ্ঞান বলে ঐ বুদ্ধির বশীকরণ করিবে। পরে আত্মজ্ঞান বলে ঐ জ্ঞানকে বশ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ বোধ করিবে, শান্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবে।

মনের সত্তাতেই ঐ দৃশ্যদর্শন ঘটে; মনের যখন উচ্ছেদ হয়, তখন দৃশ্য-দর্শনেরও উচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। তোমার মনোমধ্যে যেমন স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও মনোরাজ্য, সেইরূপ হৃদয়েই এই দৃশ্য অবস্থিত, নিজের অনুভব দ্বারাই ইহার দৃষ্টান্ত বোধগম্য। অতএব বুঝিবে, বালকের মনের কল্পনাপ্রসূত পিশাচ যেমন তাহাকে ভয় দেখাইয়া মৃতপ্রায় করে, সেইরূপ যিনি দ্রষ্টা, তাঁহার অন্তর-কল্পিত দৃশ্য তাঁহাকে বিভীষিকায় অভিভূত করিয়া ফেলে। অর্থাৎ ফলে কিন্তু পিশাচ ও দৃশ্য উভয়ই অলীক। বীজের মধ্যস্থিত অঙ্কুরের ন্যায় দেশ ও কালানুসারে এই দৃশ্য বাহিরে স্থূলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এখন কথা এই যে, এত যুক্তিতর্ক লইয়া এত করিয়া দৃশ্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিবার এত প্রয়াস কেন? দৃশ্য যদি সত্যই হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় উত্তর এই যে, দৃশ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও দুঃখের শান্তি ঘটে না। দৃশ্যের উপশম হইলেই বোদ্ধার কৈবল্য লাভ হয়, অন্যথা তাহার সম্ভাবনা নাই। দৃশ্য অসম্ভব হইয়া উঠিলেই বোদ্ধায় বোদ্ধৃভাব শান্ত হয়। এই বোধ্য-বোদ্ধৃ-ভাবের শান্তি নিবন্ধন যে কেবলত্ব বা কৈবল্য, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মোক্ষনামে নির্দ্দেশ করেন।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ পরম উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমবেত জনগণ উহা শুনিবার জন্য একাগ্রমনে অবস্থান করিতে লাগিল। কাহারও মুখে বাঙ্ নিষ্পত্তি হইল না। নিস্পন্দভাবে রহিল বলিয়া তাহাদের কটিতটস্থ কিঙ্কিনীধ্বনিও নিবৃত্ত হইয়া গেল। এমন কি, পঞ্জরস্থ হারীত শুক-

প্রভৃতি বিহঙ্গেরাও ক্রীড়া হইতে বিরত রহিল। বিলাসিনী ললনাকুলও স্ব স্ব বিলাসবিভ্রম ভুলিয়া গেল ও তথায় স্থির হইয়া রহিল। ফলতঃ রাজ-ভবনস্থ প্রাণীমাত্রেই যেন চিত্র-লিখিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। দিবস ক্রমে মুহূর্ত্তমাত্রে অবশিষ্ট হইলে, আতপ-তাপ মন্দ হইয়া আসিল। তখন দিবাকর-কিরণের সঙ্গে সঙ্গেই লোকের কর্ত্তব্য-সকল ক্ষীণ ভাব ধারণ করিল। প্রফুল্ল কমলের সুগন্ধবাহী সান্ধ্য সমীরণ যেন বশিষ্ঠ-বাক্য শুনিবার জন্যই তৎকালে মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল। ভগবান্ ভাস্করও যেন তদীয় বাক্যার্থ অবধারণ জন্য দিবসরচনার ভ্রমণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রহিয়া অস্তাচলরূপ নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিলেন। নীহার-পাত-জনিত একাকারতা তখন বনভূমি আবৃত করিল; মনে হইল, যেন মূর্ত্তিমতী শমতা বা শান্তিদেবতা জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অন্তঃশীতল হইয়া সর্ব্বত্র সমশীতল করিলেন। প্রাণিগণ বশিষ্ঠ-বাক্যে মন নিবিষ্ট করিয়াই সর্ব্বচেষ্টা হইতে বিরত রহিলে দিকে দিকে তাহাদের আর তেমন গমনাগমন রহিল না। তৎকালে বস্তুমাত্রেরই ছায়া দীর্ঘ হওয়ায় মনে হইল, তাহারা বুঝি বশিষ্ঠ-বাক্য-শুনিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়াছে।

এই সময় দ্বারপাল আসিয়া বিনীতভাবে মহারাজকে নিবেদন করিল, দেব! স্নান ও দেবার্চ্চনার কাল অতিবাহিত হইতেছে। তৎশ্রবণে ভগবান্ বশিষ্ঠ তাঁহার মধুর বাক্যের উপসংহার করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ! অদ্য আপনাদের এই পর্য্যন্তই শুনা হইল। প্রভাতে আবার আমি অবশিষ্ট কথা কহিব। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

ভূপতি বশিষ্ঠ-বাক্যে সম্মত হইয়া ভূতি-বর্দ্ধন-বাসনায় পুষ্প, পাদ্য, অর্ঘ্য ও দক্ষিণাদি দানে দেবগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণকে পরম সমাদরে পূজা করিলেন। অনন্তর সভা-সমাসীন রাজগণ, মুনিগণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণ সকলেই স্ব স্ব স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। রত্নালঙ্কারের মণ্ডলাকার কিরণচ্ছটায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল আবৃত হইল। তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলে, তাঁহাদের অঙ্গসঙ্ঘর্ষণে কেয়ূর ও কঙ্কণের মনোজ্ঞ নিক্কণ উত্থিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের কনক-ফলকবৎ সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থল সুন্দর হারে শোভিত হইল। রাজন্যগণের

মস্তকস্থ পুষ্পমাল্যে মধুকরনিকর নিপতিত ছিল, এক্ষণে অঙ্গচালনে প্রবুদ্ধ হইয়া তাহারা গুন্ গুন্ রব করিতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল, যেন রাজগণের কেশকলাপ বশিষ্ঠ-বাক্য-শ্রবণ-জনিত সন্তোষ প্রকাশ করিল। তাঁহাদের কণ্ঠস্থ মণিময় হারগুচ্ছে সুবর্ণখচিত সুনির্ম্মল বসনের প্রতিভা বিচ্ছুরিত হইল, তাহাতে বক্ষঃস্থলের অপূর্ব্ব রাগ প্রকাশ পাইল এবং প্রদীপ্ত কনকাভরণের উজ্জ্বল প্রতিভা-পাতে দিক্সকলও সুবর্ণবৎ সমুদ্ভাসিত হইল। বশিষ্ঠবাক্যের অর্থাববোধে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া খেচরগণ বিমান পথে এবং ভূচরগণ ভূতলে গিয়া স্ব স্ব আবাসে দৈনিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিলেন।

ইত্যবসরে বিভাবরী আসিয়া উপস্থিত হইল। জনসঙ্ঘ-বিমুক্ত যুবতী রমণীর ন্যায় শ্যামবর্ণ রজনী তখন সকলের নয়নগোচর হইল। দিবাকর এইবার দেশান্তর আলোকিত করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ সকল স্থানে সমানভাবে আলোকদান করাই সৎপুরুষের নিয়ম। ক্রমে কিংশুকাদি কুসুমসমূহের বিকাশ বশতঃ বনরাজি যেন বাসন্তী শোভা ধারণ করিল। তারকাস্তবক-রাজিতা সন্ধ্যা দেবী সমগতা হইলেন। যেমন সাধুগণের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ব্যবহার বিলীন হয়, সেইরূপ বিহঙ্গমেরা কেহ কেহ চূত, নীপ ও কদম্ব প্রভৃতি তরুনিকরের অগ্রভাগে, কেহ কেহ চৈত্য-প্রদেশে এবং কেহ কেহ গৃহাভ্যন্তরে স্ব স্ব কুলায়ে আশ্রয় লইল। তখন অস্ত-ভূধর অস্ত-গমনোন্মুখ দিবাকরের কুঙ্কুমকান্তি কিরণচ্ছটায় সুরঞ্জিত খণ্ড খণ্ড মেঘমালা ধারণ করিল। মনে হইতে লাগিল, যেন ঐ অস্তাচল মেঘরূপ পীতবসন ও তারকারাজিরূপ হার ধারণ করিয়া বিষ্ণুর ন্যায় বিমানপথে উপনীত হইল।

ক্রমে সন্ধ্যাদেবী পূজা লইয়া বিদায় লইলেন। তখন বপুষ্মান্ বেতালের ন্যায় ভয়ঙ্কর অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল। নীহারকণবাহী কুমুদগন্ধী কোমল অনিল তখন পল্লব-দল আন্দোলিত করিয়া মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল; তারকানিকর নীহার-পাতে আবৃত হওয়ায় মনে হইল, দিগাঙ্গনারা দিবাকর-বিরহে পতিবিয়োগ-বিধুরা বিধবা কামিনীর ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়াছে। অনন্তর সুধাকর আপনার সুশোভন কিরণ বিকিরণ করিতে

করিতে সমুদিত হইলে, অন্ধকার পুঞ্জ কোথায় পলাইয়া গেল আর তাহার চিহ্নও দেখা গেল না; মনে হইল, বশিষ্ঠের জ্ঞানগরীয়সী বাণী শুনিয়া মহীপতিগণের মন হইতে অজ্ঞানরাশি অপনীত হইল। শান্তির উদয়ে সাধুর হৃদয়ের ন্যায় সুধাংশুর সুধাময় কিরণচ্ছটায় সর্ব্বসংসার স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। ঋষিগণ, মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও রাজগণ তখন স্ব স্ব আশ্রমে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠের বাক্যাবলী তাঁহাদের চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া উঠিল।

ক্রমে যমবৎ ভীমাকৃতি অন্ধকারময়ী বিভাবরী অপসৃত হইল। নীহারময়ী ঊষাদেবী আসিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিলেন। ভাস্বর তারকা-নিকর আকাশে অন্তর্হিত হইল। বুঝি, প্রভাতপবন কুসুমবর্ষণ অপহরণ করিল! সাধু-সহবাসের ন্যায় সুখসেব্য সুস্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু বিবিধ কুসুম গন্ধ আহরিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। বিবেকবান্ ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে যেমন অভিনব ভাববৈচিত্র্য উদিত হয়, দেখা গেল—অখিল লোকলোচন দিনকর তেমনি গগন-প্রাঙ্গনে আবার আবির্ভূত হইলেন। এইবার আবার উদয়-ভূধরও উদয়োন্মুখ দিবাকরের কুঙ্কুমকান্তি কিরণ-রঞ্জিত খণ্ড খণ্ড মেঘ-মালা ধারণ করিল। মনে হইল, বুঝি বা উদয় গিরি মেঘরূপ পীত পট এবং তারকানিকর-রূপ হার ধারণ করিয়া আকাশে বিষ্ণুর ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

তখন বিমানচর ও ভূচরগণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে পূর্ব্বদিনের ন্যায় পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সভা আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব দিন যিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, তিনি আবার সেই সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। স্থির গম্ভীর সভাস্থলী তখন নিবাতনিষ্কম্প পদ্মিনীর ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর রামচন্দ্র প্রস্তাবানুসারে মধুর বাক্যে মুনিবর বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! এই নিখিল লোকপরম্পরা মন কর্ত্তৃক বিস্তৃত হইতেছে, অতএব সেই মনের রূপ কি প্রকার, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! যেমন জড়াকৃতি শূন্য আকাশের নামমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেইরূপ এই শূন্যাত্মক মনেরও কোনও প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না। এই মন অন্তরে বা বাহিরে কুত্রাপি কোনও রূপে নাই অথচ

জানিও, ইহা সর্ব্বত্রই আকাশবৎ বিরাজমান। মৃগতৃষ্ণা যেমন জলের, এই মন তেমনি জগৎ সৃষ্টি করে। সুতরাং তাহার রূপ দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায় ভ্রম-সঙ্কুল। আদিতেও নহে, অন্তেও নহে, মধ্যে যে সৎ কিম্বা অসৎ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান জন্মে, জানিও—তাহাই মনের আকার। অর্থাৎ বুঝিবে, যাহা অন্তরে বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই মন; ইহা ভিন্ন মনের অন্য আকার নাই; অপিচ সঙ্কল্পই মন। তরলতা হইতে জল এবং স্পন্দতা হইতে পবন যেমন অভিন্ন, সেইরূপ মনও সঙ্কল্প হইতে অভিন্ন। যেখানে সঙ্কল্প, সেইখানেই মন; সুতরাং সঙ্কল্প ও মন ভিন্ন নহে—একই। সত্য হউক আর অসত্য হউক জানিবে, পদার্থরূপে প্রকাশ হওয়াই মন এবং এই মনই অর্থাৎ মনোভাবাপন্ন চৈতন্যই পিতামহ ব্রহ্মা। আতিবাহিক দেহরূপী ব্রহ্মাই মন নামে অভিহিত এবং ইনিই আধিভৌতিকী বুদ্ধি অর্থাৎ স্থূলদেহের জ্ঞান সম্পাদন করেন।

মনীষীরা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের অবিদ্যা, সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধন, মল এবং তম ইত্যাদি বহুনাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চই মনের রূপ; ইহা ভিন্ন মনের আর কোনও রূপ নাই। অর্থাৎ আমি, তুমি ইত্যাদি দৃশ্য কল্পনা মনেরই স্বভাব ও কার্য্য। মন যতকালে স্থিরভাব অবলম্বন না করে, ততদিন সংসারের পর সংসার বিস্তৃত হইয়া বন্ধনের পর বন্ধন ঘটিয়া থাকে। তাই বলি, তুমি জ্ঞানবলে মনোরূপ আদর্শ হইতে দৃশ্যরূপ মার্জ্জনা করিয়া সুখী ও স্বচ্ছন্দ হও; আর সংসার ভাবনায় জড়িত হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও আবার বলিতেছি, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ বাস্তবিক উৎপন্ন নহে। যেমন কমল বীজের অভ্যন্তরে কমললতিকা, তেমনি মহাচিৎ পরমাণুর মধ্যে এই দৃশ্য জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত। জ্যোতিঃপদার্থে আলোক, বায়ুতে চপলতা এবং জলে তরলতার ন্যায় দ্রষ্টা পরমাত্মাতে দৃশ্যবুদ্ধির অবস্থান স্বভাবসিদ্ধ। সুবর্ণে বলয়, মৃগ-তৃষ্ণায় জল এবং স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকায় ভিত্তি যেমন মিথ্যা, সেইরূপ দ্রষ্টাতেও দৃশ্যবুদ্ধি মিথ্যা বা ভ্রম মাত্র। এইরূপে দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতে যে অভিন্নভাবে অবস্থিত, তাহা তুমি শীঘ্রই অনুভব করিতে পারিবে। অচিরেই আমি তোমার চিত্ত-দর্পণের ঐ মলিনতা অপনীত করিব; অর্থাৎ তোমার মন যে দৃশ্য

দর্শন করিতেছে, তাহাই তোমার চিত্তমালিন্য। ঐ মালিন্য মার্জ্জিত হইলে তখন আর দৃশ্য দর্শন ঘটিবে না, তখন তুমি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছভাব ধারণ করিবে। দৃশ্য দর্শনের অভাব ঘটিলে দ্রষ্টা যে অদ্রষ্টা হন, জানিবে, তাহাই কেবলীভাব বা কৈবল্য। কৈবল্য কালে সকলই সৎস্বরূপ আত্মাতে অবশেষিত হয়। যেমন বায়ুর স্পন্দন বন্ধ হইলে বনবৃক্ষ-লতাদি নিষ্কম্প বা নিশ্চল হয়, সেইরূপ কেবলীভাব বা আত্মার সহিত একতা ঘটিলে চিত্ত স্পন্দনের অপগমে চিত্তস্থিত রাগ, দ্বেষ ও বাসনাদি বিদূরিত হইয়া যায়।

যে প্রকাশে অর্থাৎ চৈতন্যময় জ্ঞানে দিক্, ভূমি, আকাশ, ইত্যাদি প্রকাশ্য বা জ্ঞেয় প্রকাশ পায়, সে প্রকাশ যদি প্রকাশ্যহীন অর্থাৎ দিক্ ভূমি ও আকাশাদি বিরহিত হয়, তাহা হইলেই মদুক্ত নির্ম্মল আত্মপ্রকাশের উদাহরণ হইতে পারে। যখন তুমি, আমি, ত্রিজগৎ, নিখিল দৃশ্যই অসত্য বলিয়া বুঝা যাইবে, জানিবে,—তখনই দর্শকের আত্মা নির্ম্মল হইয়াছে, তিনি কেবলীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তরু শৈলাদি বহিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব-পাত না হইলে দর্পণ যেমন কেবল হয়, সেইরূপ তুমি, আমি, জগৎ, ইত্যাদি ভাব ঘুচিয়া গেলে অথবা ঐ সকল দর্শনের অপগমে, দ্রষ্টারও আত্মকৈবল্য ঘটিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বুঝিয়াছি যাহা সৎ, তাহা নষ্ট হইবার নহে, এবং যাহা অসৎ বা অবিদ্যমান, তাহারও উৎপত্তি সম্ভাবনা নাই। পরন্তু এই অশেষদোষ-বিধায়ক দৃশ্য যে অসৎ, তাহা আমি বুঝিতে পারি-তেছি না। অর্থাৎ যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, বিশ্ব রহিয়াছে, তখন কিরূপে ইহা মার্জ্জিত হইতে পারে,—কেমন করিয়াই বা ইহাকে নাই বলিয়া ভাবিতে পারি? অতএব আমি জিজ্ঞাসিতেছি, কিরূপে—কেমন করিয়া আমার এই জনন-মরণাদি-ভ্রমবিধায়িনী অশেষ দুঃখদায়িনী দৃশ্যরূপিণী বিসূচিকা-ব্যাধির শান্তি হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! আমি তোমাকে এই দৃশ্য-পিশাচের প্রশমন মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে, দৃশ্যরূপ পিশাচসকল পলায়ন করিবে। হে রঘুনন্দন! যাহা আছে, তাহা আছেই; তাহার কখন নাশ নাই। তবে কিনা পর-পর অবস্থা দ্বারা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অবস্থার

পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তনে অদর্শনপ্রাপ্ত দৃশ্যের বীজ বা সংস্কার সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতে এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে অবস্থান করে। সেই বীজ বা সংস্কারীভূত জগৎ আবার চিদাকাশে পুনরায় লোক-শৈলাদি সহ পূর্ব্বের ন্যায় দৃশ্যাকারে প্রকাশ পায়; সুতরাং এ মতে মোক্ষ সম্ভাবনা থাকে না অথচ অনেক দেবতা, ঋষি ও মুনির্দিগকে জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিত দেখা যায়। অতএব বুঝ, এই দৃশ্য জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকিত, তাহা হইলে কখন কাহার মুক্তি হইতে পারিত না। দৃশ্যপ্রপঞ্চ বাহিরে থাকে থাকুক, তাহাতে কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অন্তরে থাকাই নাশের কারণ, অর্থাৎ অন্তরে দৃশ্য দর্শন ঘটিলে তাহা মুক্তির প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। অতএব রাম! বিষয়ানুরাগীদিগের ভয়াবহ মদীয় ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর, যাহা আমি পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বচনে বলিব, তাহা শুনিলে জগতের পারমার্থিক অবস্থা কি তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে।

সম্মুখে এই যে ভৌতিক আকাশাদি ও অন্তরে 'অহং' রূপ প্রভৃতি লক্ষিত হইতেছে, ব্যবহার-দশায় এই সমস্তই জগৎ বটে; কিন্তু পরমার্থ-দশায় ঐ সকল সেই অজর অমর অব্যয় পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎশব্দের অপর কোনই পরমার্থ নাই। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, আকাশে আকাশের উদয় এবং ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অধিষ্ঠান। বাস্তবিক দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন কিছুই নাই; ইহা শূন্যও নহে, জড়ও নহে, কেবল শান্তিময়।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র পর্ব্বত পিষিতেছে, শশশৃঙ্গ গান করিতেছে, শিলাসকল বাহু বিস্তারিয়া নাচিতেছে, সিকতাসমূহ তৈল ক্ষরণ করিতেছে, প্রস্তর-পুত্তলিকারা অধ্যয়ন করিতেছে, চিত্রলিখিত মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, এইরূপ অনেক কথাই আছে। ভবদুক্ত কথাও আমার কাছে সেইরূপই বোধ হইতেছে। কেন না, প্রকৃতই যদি জরা-মরণ-দুঃখ-শোক-সম্বলিত শৈল-আকাশাদিময় সংসার কিছুই নয়, কিম্বা না-ই থাকে, তবে এ সকল দেখা যাইতেছে কি? আর আপনিই বা আমাকে কি কহিতেছেন? হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্ব পূর্ব্বে ছিল না, উৎপন্নও হয় নাই এবং বর্ত্তমানেও কিছুই নয়, এ সকল কথার মর্ম্ম আমাকে এরূপ

ভাবে বলুন, যাহাতে ঐ বিষয়ে আমার একটা স্থির নিশ্চয় হইতে পারে।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! আমি কখন অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করি না; যাহা কহিয়াছি, তাহা অসঙ্গত নহে। শ্রবণ কর, আমি আবার বলিতেছি, সত্য সত্যই ইহা বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অলীক। তবে যে ইহা প্রকাশ পাইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ভাবিয়া দেখিলে সে কিছুই নহে। এই বিশ্ব কস্মিন্ কালেও উৎপন্ন হয় নাই; সুতরাং ইহার অস্তিত্ব একেবারেই নাই। ইহা কেবল স্বপ্নানুভূত নগরাদির ন্যায় মনেরই একটা ভাব মাত্র। এই মনও আবার বাস্তব পক্ষে অনুৎপন্ন ও অসদ্বপু। যাহা হউক, তুমি যাহাতে এ রহস্য বুঝিতে পারিবে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর।

নশ্বর মনই এই দোষময় বিনশ্বর বিশ্ব বিস্তার করিতেছে। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নান্তর দর্শন করায়, সেইরূপ মন আপনি অসৎ হইলেও স্বেচ্ছায় শীঘ্র স্বদেহ কল্পনা করিয়া তাহারই সাহায্যে ইন্দ্রজালশোভার ন্যায় এই জগৎ-সমৃদ্ধি বিস্তার করে অর্থাৎ মন স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নান্তর দর্শনবৎ স্বয়ং নিতান্ত অসৎ হইলেও এই জগৎকে সৎস্বরূপে প্রকাশ ও এই বিনশ্বর দৃশ্যরূপ দোষরাশিকে বিস্তার করিতে থাকে। মন ক্ষণকালের জন্যও স্থির নহে; সে স্বভাবতই চঞ্চল; তাই কখন স্ফুরিত হইতেছে, কখন ভ্রমণ করিতেছে, কখন গমনাগমন করিতেছে, কখন যাচ্ঞা করিতেছে, কখন নিমগ্ন হইতেছে, কখন সংহার করিতেছে, কখন নীচগামী হইতেছে এবং কখন বৈকল্য লাভ করিতেছে। ফলতঃ সকলই মনের খেলা, মনই বিশ্বসংসার; মন ভিন্ন অন্য বিশ্ব নাই। সেই মনই যখন মিথ্যা, তখন তদ্‌বিজৃম্ভিত বিশ্বকেও মিথ্যা বৈ আর কি বলিব?

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মন যে কিছুই নহে, মিথ্যা; তৎপ্রতি কারণ কি? এই প্রকার মায়াময় ভ্রমময় মন কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা অগ্রে আমাকে সংক্ষেপে বলিতে আজ্ঞা হউক। হে বক্তৃবর! পরে অবশিষ্ট বক্তব্য ব্যক্ত করিবেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে কোন পদার্থই থাকে না, সকল পদার্থই লয় পায়, তখন লয়ের পর ও ভাবী সৃষ্টির প্রাক্‌কালে কেবল ব্রহ্মই বিরাজ করেন। তাঁহার জন্ম নাই, বিকার নাই; তিনি নিত্য, সর্ব্বস্বরূপ,স্বপ্রকাশ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমাত্মা মহেশ্বর। তিনি বাক্যের অগোচর। কেবল যুক্ত বা মুক্ত পুরুষেরাই তাঁহাকে জানিতে পারেন। তাঁহার আত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি যে সকল নাম আছে, সে সমুদায় স্বাভাবিক নহে; ঐ নামগুলি কল্পনামাত্র। সাংখ্যশাস্ত্রে তাঁহাকে পুরুষ, বেদান্তে ব্রহ্ম, বিজ্ঞানাত্মবাদীরা নির্ম্মল বিজ্ঞানস্বরূপ এবং শূন্যবাদীরা তাঁহাকে শূন্য বলেন। সূর্য্যাদি তেজস্বিগণের তেজঃপ্রকাশ তিনিই করেন। শরীরে অবস্থান করত তিনিই বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তারূপে প্রকাশমান। তিনিই সত্যস্বরূপ। তিনি নিত্য হইলেও অনিত্য জগতে সর্ব্বদা বিরাজমান। তিনি দূরস্থ হইয়াও নিকটস্থ এবং দেহস্থ হইয়াও দূরস্থ। ভাস্কর হইতে আলোকের ন্যায় তাঁহা হইতে চিৎপ্রকাশ হইয়াছে এবং প্রভাকরের প্রভাপটলের ন্যায় তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সমুদ্ভূত হইয়াছেন। জলধি হইতে বুদ্বুদের ন্যায় তাঁহা হইতেই এই অনন্ত জগৎ জন্মিয়াছে। জলরাশি যেমন জলধির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সমুদায় দৃশ্যবৃন্দ তাঁহারই অভিমুখে গমন করে। তিনিই দীপের ন্যায় আপনাকে ও সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করেন। তিনি আকাশে, দেহে, উপলে, জলে, লতায়, ধূলিতে, ভূধরে, বায়ুতে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, সকল স্থানেই বাস করিতেছেন। ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অবিদ্যা, কর্ম্ম, কাম, ও অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে তিনিই স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করি-

তেছেন। তিনিই মূঢ়গণকে মূক করিয়াছেন। তিনিই শৈলসকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, উপলাদিকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন। তিনিই অগ্নি ও সূর্য্যে আলোক দিয়াছেন।

রামচন্দ্র! অক্ষয় অমৃত বা জলপূর্ণ জলদজাল হইতে বারিধারা বর্ষণের ন্যায় তিনি আপনা হইতেই এই অসার সংসারের প্রতি অসার ও বিচিত্র দৃষ্টি বৃষ্টি করিতেছেন। মরুস্থলীস্থিত মরীচিকার ন্যায় এই জগৎ তাঁহারই আবির্ভাব ও তিরোভাবময়। তিনি বিনশ্বর নহেন; কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিনশ্বর। অতি সূক্ষ্মরূপে জীবমাত্রেরই অন্তরে তিনি বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বাতিশায়ী হইয়াও গুপ্তরূপে সকল ভাবে অধিষ্ঠান করেন। তিনি আপন চিদাকাশে প্রকৃতিরূপিণী লতাকে সৃজন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়সকল ঐ লতার দল, ব্রহ্মাণ্ড উহার ফল এবং চিৎ উহার মূল। ঐ লতা আত্মা-রূপ বায়ুর হিল্লোলে সর্ব্বদাই আন্দোলিত। তিনিই প্রত্যেক দেহীর দেহপেটি-কার অভ্যন্তরে চিন্ময় মণি স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারই প্রভাবে প্রত্যেক দেহে চিৎ-প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারই প্রশান্ত চিদ্‌ঘনে সৃষ্টিরূপ বিদ্যুতের বিকাশ ও প্রাণরূপ বারিবর্ষণ হয়। তাঁহারই আলোকে বস্তুসকল পরস্পর চমৎকারিতা প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহা হইতেই সদ্বস্তু সকল সত্তাস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। তিনি ইচ্ছাহীন, সঙ্গহীন, শান্ত, আত্মস্থ; তাঁহারই সান্নিধ্য বশতঃ এই সুর-নর-তির্য্যগাদি জড় শরীর চলাচল করি-তেছে। তিনি সর্ব্বসত্তাতিগামী; তাঁহা হইতেই নিয়তি, দেশ ও কালা-নুসারে চলন-স্পন্দনাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইতেছে। তিনি শুদ্ধ সম্বিৎমাত্র-স্বরূপ। ব্যোম চিন্তায় তিনি ব্যোমভাবে ও পদার্থ চিন্তায় তিনি পদার্থভাবে অধিষ্ঠিত। তিনি এই অনন্ত বিশাল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তত্র তত্র বিচিত্র লীলা করেন অথচ তিনি কিছুই করেন না। তিনি অদ্বৈতস্বরূপ। উদয়-স্থিতি-গতি-বিরহিত নির্ব্বিকার বিজ্ঞানাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠান। তিনি ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! পূর্ব্বে যাঁহার কথা কহিলাম; সেই দেবাধিদেব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র সাধন। জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধিলাভের অন্য উপায় নাই। ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবার নহে। জ্ঞান হইতেই সম্যক্ সিদ্ধি সমধিগত হওয়া যায়। মরু-মরীচিকার জ্ঞান যেমন তথাকথিত জল-ভ্রম অপনয়ন করিয়া দেয়, তেমনি একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই সংসার ভ্রম নিরস্ত করে। জ্ঞানই সংসারভ্রান্তির শান্তিবিধায়ক বলিয়া নিরূপিত। জ্ঞান ভিন্ন ভ্রমনিবারণের অন্য কিছুই উপযোগী নহে।

সেই জ্ঞানলভ্য পরমাত্মা দূর নহেন, নিকটও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন। তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ ; সাধনবশে এই আপন দেহেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যা, দান কিম্বা ব্রতাদিতে কিছুই লাভ নাই ; পরমাত্মার লাভ বিষয়ে ঐ সকল কিছুমাত্র উপকারক হয় না। একমাত্র স্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ ব্যতীত পরমাত্মপ্রাপ্তির অপর সাধনা নাই। সাধুসঙ্গ, সৎশাস্ত্রের সমালোচনা এবং মোহজালের অকৃত্রিম অপসারণ, এই কয়েকটীও পরমাত্মলাভের উপায়। 'এই সেই পরমাত্ম দেব' এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইবামাত্র জীবের সর্ব্বদুঃখ দূর হয়, জীব জীবন্মুক্তি লাভ করে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! বুঝিলাম, বুদ্ধিযোগে পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে জনন-মরণাদি দোষরাশি কখন আর ক্লেশ জন্মাইতে পারে না। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এই দেবদেব পরমাত্মাকে কত দূরে—কত কালে—কোন্ তীব্র তপস্যায় বা কিরূপ ক্লেশে লাভ করা যায় ?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! আপনার বিবেকবিকাশী পৌরুষ প্রযত্ন দ্বারাই সেই দেবদেবের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। তদ্ভিন্ন স্নান, দান বা তপস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাগ, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতির পরিত্যাগ না হইলে তপস্যা বা দানাদি কোন কর্ম্ম ফলদায়ক হয় না ; প্রত্যুত উহারা ক্লেশমাত্রই সাধন করে। রাগাদির

বশবর্ত্তী হইয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক যে ধন উপার্জ্জন করা হয়, সেই ধন দান করিলে দাতার কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না, ঐ ধনের যিনি পূর্ব্বস্বামী, তাঁহারই তাহাতে ফল লাভ হয়। এইরূপ, রাগাদি সত্ত্বে ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিলেও কোনই ফল হয় না, প্রত্যুত উহাতে কেবল দম্ভই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব পুরুষকার অবলম্বনে অগ্রে সৎশাস্ত্রানুশীলন ও সাধুসঙ্গ-রূপ দুইটী মহৌষধি সংগ্রহ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, তথাবিধ মহৌষধির গুণেই সংসারব্যাধি বিনষ্ট হইয়া যায়। পৌরুষ প্রযত্ন আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির অপর কোনই উপায় নাই।

রামচন্দ্র! ঐ যে পৌরুষের কথা উল্লেখ করিলাম, উহা অবলম্বন করিলে, দ্বেষাদিরূপ বিসূচিকা-ব্যাধির একেবারেই উপশম হয়। এক্ষণে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে কিরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।—যাহা লোকবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, ঈদৃশ যথাসম্ভব জীবিকায় মন সন্তুষ্ট রাখিবে, ভোগবাসনা পরিহার করিবে এবং অনুদ্বিগ্নমনে যথাযোগ্য উদ্যমশীল হইয়া সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গের অনুশীলন করিবে। এই সকল হইল প্রথম কর্ত্তব্য। যিনি যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট হইয়া—বেদবিরোধী কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া, সৎশাস্ত্রের সেবা ও সাধুসঙ্গের অনুশীলন করেন, তিনি শীঘ্রই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যাঁহারা বিচারবলে সবিশেষ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন। দেশস্থ সৎলোকেরা যাঁহাকে সাধু বলিয়া জানেন বা নির্দ্দেশ করেন, তিনিই বৈরাগ্যাদি গুণসম্পন্ন বিশিষ্ট-সাধু; অতি যত্নে তাদৃশ সাধুরই সঙ্গ লইতে হয়। যাবতীয় বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যাই প্রধান বিদ্যা এবং যে শাস্ত্রে আত্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে, তাহারই নাম সৎশাস্ত্র; সেই সৎশাস্ত্রের বিচারণাতেই মুক্তিলাভ। যেমন কতক ফলের সঙ্গগুণে সলিলের কালুষ্য নষ্ট হয়, তেমনি যোগাভ্যাসবশেই বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হইয়া যায়। তখন সৎশাস্ত্রের অনুশীলনে ও সাধুজনের সঙ্গলাভে যে বৈরাগ্য উদয় হয়, তাহাতে অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় অর্থাৎ সংসার মায়ার শান্তি হয়।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যাঁহার কথা কহিলেন, যাঁহাকে পাইলে জীব সংসারে মুক্ত হয়, সেই দেবদেব কোথায় আছেন এবং আমিই বা কিরূপে তাঁহাকে পাইতে পারিব, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! আমি যে দেবদেবের কথা কহিলাম, তাঁহার অবস্থান বহু দূরে নহে; তিনি আমাদের দেহের মধ্যেই চিন্মাত্ররূপে নিত্য সন্নিহিত। এই বিরাট বিশ্বরচনাই তিনি; অথচ সেই সর্ব্বাত্মা স্বয়ং কস্মিন্ কালেও বিশ্ব নহেন। কেন না, তিনিই একমাত্র বিদ্যমান; পরন্তু বিশ্ব নামে অপর দৃশ্য নাই। যিনি চন্দ্র-মৌলি নামে বিখ্যাত, তিনিও চিন্মাত্র, আবার যিনি গরুড়বাহন বিষ্ণু, তিনিও ঐ চিন্মাত্র। এইরূপে ঐ যে তপনদেব, উনিও চিন্মাত্র আর যিনি কমলযোনি ব্রহ্মা, তিনিও চিন্মাত্র।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এই বিশ্ব যদি চেতনামাত্র হইত, তবে ত বালকেরাও তাঁহাকে বিদিত হইতে পারিত, এ বিষয়ে সদুপদেশ লইবার প্রয়োজন কি?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এই বিশ্বকে যদি তুমি চিন্মাত্র বা চেতন বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বলিব—ভবনাশনের উপায় তোমার কিছুই বিদিত হয় নাই; কেন না, এই জীবনামক চেতন বা অন্তঃকরণবিম্বিত চেতনাভাসই সংসার। জীবচেতন বহির্মুখী বৃত্তি বা ইন্দ্রিয় সাহায্যে বহিঃপ্রকাশিত হইয়া বিষয় দর্শন করে এবং তাহাকেই সার বলিয়া জ্ঞান করে; এই জন্য ঐ জীবকে পশু আখ্যায় অভিহিত করা হয়। জীবভাব হইতেই জরামরণাদি ভীতিপরম্পরার আবির্ভাব হয়। জীব-পশু আপনার অজ্ঞতার জন্য আপনি যে অশরীরী, তাহা সে বুঝিতে পারে না। আপনাকে আপনি জানে না বলিয়াই এই জীব দুঃখের একমাত্র আধার। জীবের নিজ চৈতন্যে অন্তঃকরণ পরিব্যাপ্ত। জীব সেই অন্তঃকরণে অবস্থিত বলিয়াই বৃথা অনর্থপরম্পরা ভোগ করে। অতএব আত্মা পূর্ণস্বভাব ও নিত্য চেতন; তাঁহার যদি জগৎ-দর্শন নিবৃত্ত হয়, অথবা বহির্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়া

অন্তর্মুখী গতি অর্থাৎ আত্মাবগাহনশীল জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে, সেই আত্মার তাৎকালিক যে পূর্ণাবস্থা প্রকট হয়, তাদৃশ পূর্ণাবস্থারই নাম তত্ত্বসাক্ষাৎকার। এই তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞান হইলে তখন আর জীবকে শোক-মোহে অভিভূত করিতে পারে না। পরাৎপর পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে, হৃদয়ের গ্রন্থি বা মায়া মোহ ছিন্ন হইয়া যায়, সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয় এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

মনে হয় বটে, চিত্ত নিরোধ করিলেই চেত্য অর্থাৎ দৃশ্য-দর্শন বিলুপ্ত হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে দৃশ্য-দর্শন বিলুপ্ত হইবার নহে। ফল কথা, দৃশ্য সকল মিথ্যা, 'এ সকল ভ্রান্তির পরিণাম মাত্র' এইরূপ জ্ঞান ব্যতীত অন্য উপায়ে চিত্তের দৃশ্য-দর্শন কদাপি নিরোধ করা যায় না; সুতরাং দৃশ্য-দর্শন শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।* 'দৃশ্য মাত্রেই অসম্ভব বা ইন্দ্রজালবৎ অলীক' এইরূপ জ্ঞান না জন্মিলে দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষের লাভ-সম্ভাবনা কোথায়? যোগাবলম্বনে দৃশ্য-দর্শনের নিরোধ করিলে কোনই ফল নাই; কেন না, তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার ঘটে না। এদিকে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার না হইলেও মোক্ষলাভ অসম্ভব।†

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাহাকে জীব বলিয়া জানিলে সংসার-যাতনার অবসান হয় না, সেই ব্যোমরূপী অজ্ঞ জীবের স্বরূপ কি? সে কোন্ আধারে কোথায় কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের সহায়তায় যাঁহাকে জানিলে সংসার-সাগর পার হওয়া যায়, তাঁহারই বা স্বরূপ কি? হে ব্রহ্মন্! এ সকল আমাকে বলুন।

* স্থূল কথা এই যে, যতক্ষণ জগতের জ্ঞান রহিবে, ততক্ষণের মধ্যে মোক্ষের উদয় হওয়া অসম্ভব। যখন জগদ্ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইবে, তখনই মোক্ষলাভ ঘটিবে। সুতরাং 'ব্রহ্মই—জগৎ' এইরূপ স্থির ধারণা না করিয়া 'এই জগৎ—ব্রহ্ম' এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইলে জগৎ-জ্ঞান লুপ্ত হইবার নহে। জগদ্-জ্ঞান লোপ না পাইলেও মোক্ষলাভ ঘটে না। এই কারণেই বশিষ্ঠ রামের উক্তি শুনিয়া তাঁহাকে ভবনাশের উপায়সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়াছিলেন।

† যোগ দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিলে দৃশ্য-শান্তি হয় বটে; কিন্তু যোগভঙ্গের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ দৃশ্য-দর্শন ঘটিতে থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই যে চেতন জীব, ইনি জন্মরূপ জঙ্গলে বিশীর্ণ হইতেছেন। এই জীবকে যাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিজ্ঞ হইলেও মূর্খ; কেন না, জীববুদ্ধিই সংসার ও দুঃখ-পরম্পরার হেতু। সুতরাং জীবকে জানিলে জানিবার মত কিছুই জানা হয় না, তবে যদি পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায় অর্থাৎ জীবের জীবভাব ত্যাগ করিয়া পরমভাব প্রস্ফুরিত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিবে, বিষবেগ অপগত হইবার পর বিসূচিকা-রোগের উপশমের ন্যায় এককালে সর্ব্ব-দুঃখ বিদূরিত হইয়াছে। ফলে জীবত্ব-বোধের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মত্ব বোধ জন্মিলে তখন আর সংসারের কোন দুঃখই থাকে না, সকল দুঃখেরই অবসান হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাঁহাকে জানিলে মনের সকল মোহ বিগলিত হইয়া যায়, সেই পরমাত্মার স্বরূপ কি, তাহা বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! যে সম্বিৎরূপ দেহ নিমেষমধ্যেই দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যায়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অর্থাৎ যে চৈতন্য নামক বোধ মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অথবা মনোবৃত্তির উদয়ে তাহাতে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, সেই বোধই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। যে বোধ-রূপ মহাসাগরে ত্রিকালমিথ্যা জগৎ-সংসার রহিয়াছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহাতে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য ও দর্শন-ক্রম থাকিলেও নাই, যাহা আকাশ না হইলেও বিপুলতা বশতঃ আকাশের সহিত উপমিত, এই অনিত্য অসার জগৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত এবং এই সৃষ্টিপ্রবাহের আদি না থাকিলেও এই জগৎ যাহাতে মিথ্যারূপেই প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা যিনি মহাচিন্ময় হইয়াও পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিত এবং জড় হইয়াও যিনি অজড়স্বভাব, তিনিই পরমাত্ম-স্বরূপ। বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ বস্তু সকল যাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়াই ব্যবহার-যোগ্য হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ এবং আলোক যেমন প্রকাশক পদার্থের ও শূন্যত্ব যেমন আকাশের স্বভাবসিদ্ধ রূপ, তেমনি যাহা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! পরমাত্মা যে সদ্রূপী অর্থাৎ তিনি যে

আছেন, ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? আর জগৎ যখন দৃশ্য বা দেখা যাইতেছে, তখন ইহারই বা অবস্তুত্ব বা অবিদ্যমানতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! আকাশ শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নহে; কিন্তু উহাতে যে নীল পীতাদি নানা বর্ণ দেখা যাইতেছে, ঐ বর্ণগুলি কি সত্য? কখনই নহে;—সকলই ভ্রম-পরিপূর্ণ। কেন না, যাহা কিছুই নহে, তাহাতে আবার বর্ণ কি? অতএব তোমার আমার স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, তাহা সত্য নহে। এইরূপ 'এই ভ্রমময় জগৎ চিন্ময় ব্রহ্মে দেখা যাইতেছে' ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হইলেই পরমাত্মার বা ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। কিন্তু 'দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা' এইরূপে দৃশ্যজ্ঞানের একেবারেই বিলোপ না হইলে ব্রহ্মকে কোনরূপেই জানিবার উপায় নাই। প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। এই দৃশ্য জগতের আর কিছুই থাকে না বা ছিল না; মাত্র ব্রহ্মই থাকেন ও ছিলেন। এই ব্রহ্ম পরম বোধস্বরূপ। তাঁহার সেই বোধ হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়। দৃশ্য-জ্ঞানের অভাব ব্যতীত বুদ্ধিতে কখন ব্রহ্মের প্রতিবিম্বপাত হয় না, আবার আদর্শও কিছু প্রতিবিম্ব না লইয়া থাকে না; ফলে দৃশ্য-জ্ঞানের অভাব হইলেই বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বপাত হয়। সুতরাং এই জগৎরূপ দৃশ্য যাবৎ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, তাবৎ কোন ব্যক্তিই কখন পরম তত্ত্ব জানিতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে! এই ত চক্ষুর উপর প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে অথচ ইহাকে মিথ্যা অর্থাৎ কিছুই নহে বলিয়া কেমন করিয়া অবধারণ করা যায়? আর এই ত অসীম অনন্ত জগৎ, ইহারই বা অবস্থান অতি সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মায় সম্ভবে কিরূপে? সর্ষপের অভ্যন্তরে কি সুমেরুর সংস্থান অসম্ভব নহে?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি যদি কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত অনুদ্বিগ্নমনে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলনে তৎপর হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি অচিরকাল মধ্যেই তোমার চিত্তস্থ দৃশ্যভ্রান্তি প্রমার্জ্জিত করিয়া দিব। তখন জ্ঞানোদয়ে বুঝিতে পারিবে, সমস্ত দৃশ্যই মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা। যে

কালে দৃশ্য-জ্ঞান ঘুচিয়া যাইবে, তখন দ্রষ্টৃত্ব-জ্ঞানও থাকিবে না। 'দেখা যাইতেছে' ও 'দেখিতেছি' এইরূপ বোধ ঘুচিয়া গেলেই তখন কেবল বোধ বা চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট রহিবে; আর কিছুই রহিবে না। 'দেখিতেছি' এরূপ বোধ যদি রহিল, তবে 'দেখা যাইতেছে' এরূপ বোধও রহিবে। ফলে, দ্রষ্টা—দৃশ্যেরই অন্তর্গত। এক যেমন দু'য়ের অন্তর্গত, সেইরূপ এক যদিও দু'য়ের অন্তর্গত নয় বটে; কিন্তু তাহাকে দু'য়ের অধীন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এক আর এক যোগ করিলে তবে দুই হয়, এ কারণ এক দু'য়ের অন্তর্গত। ফল কথা, দ্বৈত-বোধ ঘুচিয়া গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে একত্ব বোধও লোপ পায়। আর এক কথা,—যদি এক না থাকে, তবে দুইও থাকিবার নয়; সুতরাং একত্ব যোগযুক্ত দ্বিত্বের অভাব হইলে যেমন মাত্র তদনুবিদ্ধ অস্তিত্ব বা 'আছে' মাত্র ভাবটুকু রহিয়া যায়, সেইরূপ দ্রষ্টৃ ও দৃশ্য ভাব ঘুচিয়া গেলে তদুভয়ের আশ্রয়ীভূত মাত্র ব্রহ্মসত্তাটুকুই স্থির থাকে।

রামচন্দ্র! এ জগতের মিথ্যাত্ব বোধ জন্মাইয়া আমি তোমার মনো-মুকুর হইতে 'অহং'-আদি যাবতীয় দৃশ্য মল মার্জ্জিত করিয়া দিব। দেখ, যাহা প্রকৃত অসৎ বা কস্মিন্ কালেও নাই, তাহার অস্তিত্বও অসম্ভব; আর যাহা প্রকৃত সৎ, তাহারও কখনও অভাব বা অসত্তা নাই। সুতরাং যাহা স্বভাবতই মিথ্যা, তাহার উন্মার্জ্জনে আবার ক্লেশ কি? বৎস! এই বিস্তৃত জগৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আদিতেও ছিল না, পরেও থাকিবে না; ইহা মিথ্যা। আদৌ ইহা উৎপন্নই হয় নাই; ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম চৈতন্যেই উপচিত; ফল কথা—এ জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। যখন দেখা যায়, জগৎ নামে কোন একটা কিছুই নাই, কখন হয় নাই এবং কখন দেখিতেও পাওয়া যায় না, তখন আর তাহার মার্জ্জনে কতই বা শ্রম হইবে?

রাম! তুমি সহজে যাহাতে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পার, সে জন্য বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমি তোমাকে তাহা বিস্তৃতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন মরুপ্রদেশে জলাশয় এবং আকাশে দুইটী চন্দ্রের উদয় অসম্ভব,. সেইরূপ এই জগৎ যখন আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, তখন ইহার

অস্তিত্বসম্ভাবনা কোথায়? ফলে তাহা একেবারেই অসম্ভব। বন্ধ্যার পুত্র নাই, মরুদেশে জল নাই, আকাশে বৃক্ষ নাই; এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিও—জগতের অস্তিত্বও নাই। জগৎ ভ্রমময়, উহা কিছুই নহে।

বৎস! এই যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, সমস্তই সেই নিরাময় ব্রহ্ম। এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি পরে কেবল বাক্যে নহে—যুক্তি দ্বারাও বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। রাম! তুমি উদারবুদ্ধি, তোমায় অধিক বলিব কি? তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা যুক্তিবলে যেরূপ উপদেশ বাক্য বলেন, তাহাতে অবহেলা করা অনুচিত। কেন না, যে মূঢ়মতি যুক্তিযুক্ত বাক্য অবজ্ঞা করিয়া অযৌক্তিক বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে মূর্খ বলিয়াই মনে করেন।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিলেন, তাহা কেমন করিয়া সিদ্ধ হয়, এবং কিরূপ যুক্তিবলেই বা তাহা লাভ করা যায়? যদি আমি যুক্তিবলেই তাহা অনুভব করিতে পারি, তবে আর আমার কোনই জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এই জগৎ-নাম্নী অজ্ঞান-বিসূচিকা বহুকাল হইতে বদ্ধমূল রহিয়াছে। জ্ঞানযোগ না হইলে এ অজ্ঞান শান্তি হইবার উপায় নাই। হে সাধো! আমি তোমার বোধ-সাধনের জন্য যে সকল আখ্যায়িকা বর্ণন করিব, সেগুলি যদি তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলেই বুঝিবে যে, তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুরুষ। তবে কথা এই, তুমি যদি ইহার কিয়দংশ শুনিয়াই অধৈর্য্যবশে নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে সৎশাস্ত্র শ্রবণের অযোগ্য পশুধর্ম্মী হইতে হইবে; সুতরাং তখন তোমার সিদ্ধি লাভ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। যে যাহা চায়, তাহার জন্য তাহাকে

বিশেষ যত্ন করিতে হয়; যত্ন করিলে ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। আর যত্ন করিতে শ্রম বোধ করিলে অভীষ্ট ফল ঘটে না। রামচন্দ্র! তুমি যদি সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলনে তৎপর হইতে পার, তাহা হইলে এক দিনে না হউক, এক মাসে তোমার পরম পদ প্রাপ্তি হইবেই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বুধশ্রেষ্ঠ! আপনি উপদেশ করুন, আত্মজ্ঞান উন্মেষিত হইবার পক্ষে কোন্ শাস্ত্র প্রধান এবং সে শাস্ত্র কি?—যাহা জানিলে জীবকে কখন শোকগ্রস্ত হইতে হয় না?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহামতে! যে সকল শাস্ত্রের অনুশীলনে আত্ম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে এই মহারামায়ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরম শুভ-জনক। এই ইতিহাস সকল ইতিহাসেরই সার। ইহা শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই বাঙ্ময় গ্রন্থ শ্রবণ করিলে আপনা হইতেই অক্ষয় জীবন্মুক্তি লাভ হয়; এই কারণে ইহা পরম পবিত্র শাস্ত্র। যেমন স্বপ্ন দেখিবার পর 'ইহা স্বপ্ন' এইরূপ ধারণা হইলে তাহা আর থাকে না, সেই-রূপ এই দৃশ্য-জগৎ থাকিলেও এই শাস্ত্র-বিচারে তাহা দূর হইয়া যায়। এই শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা শাস্ত্রান্তরেও আছে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা অপর কোন শাস্ত্রেই নাই। এই কারণে পণ্ডিতেরা বলেন, এই শাস্ত্র সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোষস্বরূপ; ইহা নিত্য শ্রবণে উত্তম বুদ্ধি লাভ হয়, অন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে যে বোধ জন্মিবে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ ইহা হইতে হইবে। নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হইলে আর কাহারও ইহাতে অরুচি জন্মিবার নহে। ভাগ্য দোষে যাহার ইহাতে রুচি না হইবে, তাহার পক্ষে প্রথমে অপর কোন বাঙ্ময় শাস্ত্রের আলোচনা বিধেয়। উত্তম ঔষধ সেবনে রোগী যেমন রোগমুক্ত হয়; তদ্রূপ এই শাস্ত্র শ্রবণে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে শ্রোতা বুঝিতে পারিবেন—বর ও অভিশাপের ন্যায় আমাদের উক্তি সকল মিথ্যা নহে, সে সমস্ত ধ্রুব সত্য। রামচন্দ্র! আত্মতত্ত্ব বিচার ও আত্মকথা দ্বারাই তোমার সংসার দুঃখ দূরীভূত হইবে। দান, তপস্যা, স্বাধ্যায়, যজ্ঞাদি কিম্বা গ্রন্থান্তরের আলোচনা দ্বারা ভবযন্ত্রণা শান্তি হইবার নহে।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! যাঁহাদের মন পরমাত্মাতে নিবিষ্ট, এবং প্রাণ পরমাত্মাকে পাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল, যাঁহারা পরমাত্ম-কথা লইয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনা করেন, পরমাত্মাই যাঁহাদের সন্তোষ ও আনন্দস্থল, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানীদিগের জীবন্মুক্তি লাভ হয়, এই জীবন্মুক্তিই বিদেহমুক্তি।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তের লক্ষণ কি? তাহা বলুন। আমি শাস্ত্র-দর্শনে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা সেইরূপ হইবার চেষ্টা করিব।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! সাংসারিক বৈধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও যিনি এই সংসারকে আকাশের ন্যায় শূন্য বোধ করেন, অথবা সংসারের সর্ব্বকর্ম্ম করিলেও 'আমি কিছুই করি না' এইরূপ ধারণা করেন,তাদৃশ ব্যক্তি-কেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি জাগতিক ব্যবহারে তৎপর হইয়াও একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ এবং জাগ্রৎ অবস্থাতেও যিনি সুষুপ্তবৎ নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, সুখে যাঁহার মুখশ্রী প্রফুল্ল এবং দুঃখে পরিম্লান হয় না; যিনি যথাপ্রাপ্ত জীবিকতেই সসন্তোষে অবস্থিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। যিনি নির্ব্বিকার আত্ম য় সুখ-সুপ্তবৎ থাকিয়াও অবিদ্যা-নিদ্রার ক্ষয়বশতঃ স্বীয় আত্মায় সদাই জাগ্রত থাকেন, লৌকিক জাগ্রৎ যাঁহার নাই এবং যাঁহার বোধ বাসনাবিহীন, তিনিই জীবন্মুক্তনামে অভিহিত। যিনি নটের ন্যায় বাহিরে রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেও অন্তরে যাঁহার ঐ সকলের লেশমাত্রও নাই, সুতরাং আকাশের ন্যায় সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া স্বস্থ চিৎস্বরূপেই যিনি অবস্থিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যাঁহার দেহে অহম্ভাব নাই; কর্ত্তা বা অকর্ত্তা হইলেও যাঁহার বুদ্ধি পাপ বা পুণ্যাদিতে লিপ্ত নহে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। যে চিদাত্মার উন্মেষে লোকত্রয়ের প্রলয়

এবং নিমেষে উদ্ভব হয়, তিনিই যথার্থ জীবন্মুক্ত। যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, লোক সকল যাঁহা হইতে বা যিনি লোক সকল হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যাঁহার হর্ষ নাই, ক্রোধ নাই, ভয় নাই, সেই মহাপুরুষকেই জীবন্মুক্ত বলে। সংসারে যাঁহার বাসনা নাই, দেহাবয়ব থাকিলেও যাঁহার নাই, ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও যিনি তাহার অধীন নহেন, এবং মন সত্ত্বেও যাঁহার মন নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি যাবতীয় বিষয়-ব্যবহারে লিপ্ত রহিলেও যাঁহার রাগ, দ্বেষ বা হর্ষাদির লেশমাত্র নাই, সুতরাং যিনি শীতল ও শান্তভাবসম্পন্ন, যাঁহার আত্মা নিখিল পদার্থে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত।

উল্লিখিতরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহ কালের বশীকৃত হইলে, জীবন্মুক্ত পদ পরিহারের পর বিদেহমুক্তি লাভ হয়। স্পন্দনহীন পবনের ন্যায় বিদেহমুক্ত তখন স্থিরভাব অবলম্বন করেন। তাঁহার উদয় নাই, অস্ত নাই, প্রকাশ বা অপ্রকাশ নাই, তিনি দূরও নহেন, নিকটও নহেন, তিনি 'অহং' 'অনহং' বা 'অপর' এ সকলের কিছুই নহেন। তিনি ব্রহ্ম। তিনি সূর্য্য হইয়া উত্তাপ দেন, বিষ্ণু হইয়া ত্রিজগৎ পালন করেন, ব্রহ্মা হইয়া সমস্ত সৃজন করেন এবং রুদ্র হইয়া সংহার করেন। তিনি আকাশরূপে পবন-স্কন্ধ* এবং কুলাচল হইয়া ঋষি, সুর, অসুর ও লোকপাল সকল ধারণ করেন। তিনি ভূমি হইয়া লোক মর্য্যাদা পালন, তৃণ লতা ও গুল্মাদি হইয়া ফলাদি প্রসব, জল ও অনল হইয়া দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বিধান এবং চন্দ্র হইয়া অমৃত ক্ষরণ করেন। তিনি বিষরূপে মৃত্যু বিধান করেন। দিক্-রূপে তিনি তেজঃপ্রকাশ ও তমোরূপে অন্ধকার বিস্তার করেন। তিনিই শূন্য হইয়া ব্যোমরূপে বিরাজিত হন, শৈল হইয়া অবরোধ করেন, এবং অন্তঃকরণ-বিম্বিত চৈতন্য হইয়া জঙ্গমের ও অব্যক্ত চৈতন্যরূপে স্থাবরাদির সৃষ্টি করেন। তিনিই ধরণীরূপিণী রমণীর সাগররূপ বলয়স্বরূপ। তিনিই অনাবৃত চিদাত্মারূপে এই বিশাল বিশ্ব বিস্তার করিয়া স্বয়ং শান্তরূপে অবস্থান করেন। অধিক আর কি কহিব, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কালেই যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে, সেই সমস্ত দৃশ্যই তিনি।

* উপরি উপরি স্থিত উনপঞ্চাশৎ বায়বীয় স্তর

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! মনুষ্যদিগের দৃষ্টি অতি বিষম এবং মন অতি চঞ্চল; সুতরাং আপনি যেরূপ মুক্তির কথা কহিলেন, তাহাদিগের পক্ষে ঐরূপ মুক্তিলাভ ত একান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এই মুক্তির কথা কহিতেছি। তত্ত্ব-দর্শী সাধুগণের মতে ব্রহ্মই সাক্ষাৎ মুক্তি ও নির্ব্বাণ পদ। ব্রহ্ম প্রাপ্তিই মুক্তি লাভ। কি উপায়ে উহা লাভ করা যায়, তাহা এখন শ্রবণ কর। এই যে 'তুমি, আমি, সে' ইত্যাদি মিথ্যাবস্তুময় দৃশ্য-জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একান্ত অলীক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই উক্তরূপ মুক্তি লাভ হইতে পারে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিজ্ঞবর! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, বিদেহ-মুক্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্মরূপে ত্রিলোক বিধান করেন; সুতরাং আমার মনে হয়, তাঁহারা সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এই ত্রিভুবন যদি প্রকৃত পক্ষে থাকিত, তাহা হইলে বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরা তাহা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ত্রৈলোক্য-নামে কোন একটা পদার্থই নাই; সুতরাং ব্রহ্মের সংসারভাব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? এই জগৎ বা সংসার শব্দ একান্তই কাল্পনিক। আকাশবৎ স্বচ্ছ শান্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই জগৎ। তদ্ভিন্ন জগৎ আর কিছুই নহে। রামচন্দ্র! আমি বিশেষ বিচার করিয়াও ত স্বর্ণবলয়ে শুদ্ধ স্বর্ণ ভিন্ন বলয় নামে কোন বস্তু দেখিতে পাই না, আর জল তরঙ্গেও ত জল ভিন্ন তরঙ্গ নামে কোন পদার্থ ই আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলতঃ বলয়ে স্বর্ণ, জল তরঙ্গে জল, পবনে স্পন্দন, আকাশে শূন্যত্ব, মরুভূমিতে তাপ এবং আলোকে তেজের ন্যায় এই জগৎ স্বভাবতই ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে। সমস্তই সেই ব্রহ্ম।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জগৎ কস্মিন্ কালেও নাই, ঈদৃশ অবিচল জ্ঞান দ্বারাই দৃশ্য জগতের দর্শন ঘুচিয়া যায়। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, কোন্ যুক্তিবলে ঐরূপ জ্ঞানের বিকাশ হয়? দ্রষ্টা ও দর্শন পরস্পর সাপেক্ষ, ঐ উভয়ের অভাবে যেরূপে নির্ব্বাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, 'জগৎ কোন কালেই নাই' এই বুদ্ধিবলে যে স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম

করা যায় এবং যাদৃশ যুক্তিবলে সিদ্ধিলাভ ঘটিলে অপর সাধনের প্রয়োজন থাকে না, সে সকল বিষয় আমাকে উপদেশ দান করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! মানবের মনে বহুকাল হইতে 'জগৎ' এই মিথ্যা জ্ঞানটী বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে উহা আমূলতঃ বিদূরিত হয়। এই যে মিথ্যা জ্ঞান-রূপ বিসূচিকাব্যাধি, একমাত্র বিচারই উহার শান্তি-মন্ত্র। যেমন পর্ব্বতে আরোহণ বা তাহা হইতে অবরোহণ করা সহজ নহে, সেইরূপ বহুকাল মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধমূল এই মিথ্যাজ্ঞান সহসা উন্মূলিত করা একান্তই সুকঠিন। অতএব অভ্যাস, যোগ, যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত উপদেশাদি দ্বারা যেরূপে এই জগদ্‌ভ্রান্তি প্রশান্ত হইতে পারে, তাহা আমি তোমায় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র! আমি তোমার বোধসিদ্ধির জন্য যে আখ্যায়িকা বর্ণন্ করিব, ইহা শ্রবণ করিলে তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া মুক্ত হইবে। এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে তোমার নিকট এই উৎপত্তি-প্রকরণ ব্যক্ত করিতেছি, ইহা শ্রবণে নিশ্চয়ই তোমার ভববন্ধন কাটিয়া যাইবে; তুমি মুক্ত-পুরুষ হইবে। এই যে জগদ্‌ভ্রান্তি, ইহা অজাত আকাশবৎ প্রতিভাত হইতেছে; অধুনা উৎপত্তি-প্রকরণে ইহাই আমার বক্তব্য।

বৎস! এই যে সুরাসুর-নর-কিন্নর-পরিবৃত সর্ব্বপদার্থ-পরিপূর্ণ চরাচর বিশ্ব বিলোকিত হইতেছে, ইহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; মহাপ্রলয়ে সকলই বিলয় পাইবে। এমন কি, রুদ্রাদি দেবগণও তৎকালে অন্তর্হিত হইবেন। তখন না আলোক, না অন্ধকার, কিছুই থাকিবে না; থাকিবার মধ্যে—কেবল মাত্র স্তিমিত-গম্ভীর সৎস্বরূপ এক ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিবেন। ঐ সৎ, অনাখ্য ও অনির্দ্দেশ্য। তিনি শূন্য বা সাকার, দৃশ্য বা দর্শন, পূর্ণ বা অপূর্ণ, সৎ বা অসৎ, ভাব বা অভাব, এ সকলের কিছুই নহেন। তবে তিনি কি? তিনি কেবল চিন্মাত্র মূর্ত্তি—অজর, অমর, অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অনাশয় মঙ্গলস্বরূপ। হংসাকৃতি মুক্তাবিকারে হংসের বিকাশ যেমন,† তেমনি এই জগৎ তাঁহাতে বিকাশ পাইতেছে। তাঁহাকে

† এখানে এই উপমাটা আর একটু খুলিয়া বলি, ঝিনুকের ভিতর মুক্তা থাকে, হংস জলে

'ইহা নহে,—উহা' এরূপ নির্দ্দেশ করা চলে না; কারণ সেই দেব সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক। তাঁহার কর্ণ নাই, জিহ্বা নাই, নাসা নাই, ত্বক্ নাই, নেত্র নাই, অথচ তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও দর্শন করিয়া থাকেন। যে আলোক দ্বারা সৎ ও অসৎ দ্বিবিধরূপ লক্ষিত হয়, অজ্ঞান কালে যাহাতে চিত্রবিচিত্র জগৎসৃষ্টি ও অজ্ঞাননিবৃত্তিতে যিনি অনাদিনিধন চিৎপ্রকাশ, সমস্তই তিনি।

যোগী পুরুষ খেচরী মুদ্রার† সহায়তায় ভ্রূমধ্যে অর্দ্ধোন্মীলিত দৃষ্টি সন্নিবেশিত করত সেই অস্ফুট তারকা দ্বারা সদাভাস জগৎ দর্শন করেন। তখন ঐরূপ ভাবে যে ব্যোমাত্মাই সদাভাস স্ব-স্বরূপ অবলোকন করেন, তিনিও তদ্ভিন্ন নহেন। তিনি বিভু, কারণহীন; তাঁহার কোনরূপ কারণ-কল্পনা, শশশৃঙ্গের ন্যায় একান্তই অলীক। তিনি নিজেই নিজের কারণ। সমুদ্রের যেমন তরঙ্গভঙ্গ, সেইরূপ এই জগৎ তাঁহার কার্য্য। তিনিই সকলের চিত্তস্থানে থাকিয়া সতত তাহা সমুজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহার চিৎস্বরূপ দীপের দীপ্তিতে সর্ব্বদা সর্ব্ববিশ্ব সমুদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি বিনা, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ তিমিরতুল্য প্রকাশহীন। তাঁহারই মায়ায় এই ত্রিজগৎরূপ মৃগতৃষ্ণার আবির্ভাব। তিনি সচেষ্ট হইলে আলত-চক্রবৎ এই জগতের প্রকাশ এবং নিশ্চেষ্ট রহিলে উহার বিলয় হয়। জগতের নির্ম্মাণ ও বিলয় তাঁহার বিলাস। তিনি সর্ব্বব্যাপী। স্পন্দ ও অস্পন্দ উভয়ই তাঁহার স্বরূপ। তিনি নির্ম্মল ও অক্ষয়স্বভাব। তাঁহার সত্তা পবনের ন্যায় স্পন্দ ও অস্পন্দময়ী এবং সর্ব্বগামিনী। ঐ সত্তা নামতই ভিন্ন; কিন্তু কার্য্যতঃ ভিন্ন নহে। তিনি সর্ব্বদাই প্রবুদ্ধ বা সুপ্ত। আবার তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রবুদ্ধ বা সুপ্ত এ দু'য়ের কিছুই নহেন। তিনি

ডুবিয়া ডুবিয়া সেই ঝিনুক তুলিয়া খায়; তাহাতে তাহার দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হয়। সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, হংসের দেহটা মুক্তারই পরিণাম মাত্র। এ ক্ষেত্রে আগে মুক্তা, শেষে হংস এবং মুক্তাই হংস, এরূপ যেমন বলা চলে, সেইরূপ আগে সৎ, তৎপরে জগৎ এবং সৎই জগৎ এরূপ বলা সমীচীন হইতে পারে।

† কপালরন্ধ্রে বিপরীতক্রমে জিহ্বা প্রবেশ ও ভ্রূযুগ মধ্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ করার নাম খেচরী মুদ্রা। এই মুদ্রা জানা থাকিলে যোগীকে যোগে পতিত, কর্ম্মে জ[illegible]ত ও কালের কবলিত হইতে হয় না।

অস্পন্দ অবস্থায় শান্ত ও শিবস্বরূপ এবং স্পন্দ অবস্থায় ত্রিজগতের স্থিতিস্বরূপ। তিনি পুষ্পস্থ গন্ধের ন্যায় নশ্বর বস্তুতে থাকিয়াও অবিনাশী, শুক্ল বস্ত্রের শুক্লতার ন্যায় প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষ, মূক হইলেও বাক্য-সম্পন্ন, ব্যক্ত হইলেও অব্যক্ত, শিলার ন্যায় জড়াকার হইলেও মননশীল, নিত্যতৃপ্ত হইলেও ভোক্তা, ক্রিয়াহীন হইলেও ক্রিয়াময়, অনঙ্গ হইলেও সর্ব্বাঙ্গযুত, চক্ষুহীন হইলেও পরম চক্ষুষ্মান্, অপদ হইলেও সহস্র-পদ, নিরিন্দ্রিয় হইলেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় এবং অহস্ত হইলেও সহস্র হস্ত-সম্পন্ন। তাঁহার কোনরূপ সংস্থান বা গঠন নাই অথচ তিনি সর্ব্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান। তাঁহার মন নাই অথচ তাঁহার মানস কার্য্য বা মায়িক সঙ্কল্প বিদ্যমান। তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়াই জীবের ভ্রমজ্ঞান ও সংসাররূপ সর্প-ভীতি উৎপন্ন হয়, আবার তাঁহাকে দেখিলেই সে সকল ভয় ও কামনাজাল বিদূরিত হইয়া যায়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকিলে নটেরা যেমন নাট্যক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়, তেমনি তিনি সাক্ষিরূপে বিরাজমান রহিলেই মন স্পন্দিত ও চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। সাগর হইতে তরঙ্গ-কল্লোল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু লহরীর ন্যায় তাঁহা হইতেই ঘটপটাদি বিবিধ বস্তু বিকাশ পায়। একই কাঞ্চন যেমন কেয়ূর, কটক ও নূপুরাদি নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি তিনিও মায়াবশে বিবিধ বিভিন্ন ভ্রমময় পদার্থে বহুরূপে প্রকাশিত হন।

বৎস! অজ্ঞান যখন অপসারিত হয়, তখন তুমি, আমি, সে এবং আর আর সমস্ত, সকলেরই নিকট সেই বোধাত্মা একই রূপে সাক্ষাৎকৃত হন। তৎকালে আমরা সকলেই জানিতে পারি, সেই চিদাত্মা এক ভিন্ন দুই নহেন। কিন্তু অজ্ঞানের অবসান না হইলেই জীবের নিকট 'তুমি আমি, সে' ইত্যাদি ভেদ দর্শন হইতে থাকে। সলিল হইতে তরঙ্গমালার উদ্ভবের ন্যায় তাঁহা হইতেই এই ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্য জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন নহে। কাল তাঁহা কর্তৃকই হেমন্ত বসন্তাদিরূপে বার বার বিবর্তিত হইতেছে। তাঁহা হইতেই দৃশ্য বস্তুর দর্শন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাঁহারই প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়। তাঁহা হইতেই তেজের প্রকাশ ও মানসী স্ফূর্তি সংঘটিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং চেতনাদি যাহা কিছু তুমি জানিতেছ, এতৎসমস্তই সেই দেব এবং যাঁহা দ্বারা জানিতেছ, তাঁহা তিনি ব্যতীত আর কেহই নহেন। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এই তিনের মধ্যে যিনি সাক্ষিরূপে বিরাজমান, বুঝিয়া দেখ—তিনিই সেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। হে সাধো! প্রণিধানের সহিত তাঁহাকে জানিলেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, জরা নাই, জন্ম নাই, তিনি সত্য শুদ্ধ, নিত্য নির্ম্মল, মঙ্গলময়; তিনি শূন্য-স্বরূপ, সর্ব্ববন্দ্য, অনিন্দ্য ও সকল কারণের কারণ। তাঁহাকে অনুভব দ্বারা জানা যায় অথচ তিনি অবেদ্য; কিন্তু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকলই তিনি জানিতেছেন।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহর্ষে! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, যে সৎমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; হইতে পারে, তাঁহার নাম নাই, তিনি নিরাকার; এ বিষয়ে আমার সংশয়ও নাই। কিন্তু তিনি যে শূন্য নহেন, প্রকাশ নহেন, তম নহেন, ভাস্বর নহেন, চিৎস্বরূপ নহেন, জীব নহেন, বুদ্ধিতত্ত্ব মন নহেন, কিম্বা তুমি, আমি ইত্যাদি কিছুই নহেন, অথচ আবার সমস্তই তিনি, ইহার কারণ কি? আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতেছি না, ফলে আপনার ঐ সকল বাক্যভঙ্গীতে আমি যেন মোহমগ্নই হইতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! তোমার এই প্রশ্ন অতি কঠিন প্রশ্ন; যাহা হউক, সূর্য্য যেমন নৈশ অন্ধকার অপনয়ন করেন, আমি তেমনি তোমার ঐ প্রশ্ন সন্দেহ নিরাস করিতেছি। রাম! মহাপ্রলয় কালে যে সৎমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, তিনি যে শূন্য নহেন, তাহাই অগ্রে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর স্তম্ভ ক্ষোদিত করিবার পূর্ব্বে তাহাতে যেমন কৃত্রিম পুত্তলিকাদির অস্তিত্ব থাকে, সেইরূপ সেই সৎ বস্তু বা পর-ব্রহ্মেই এই বিশ্ব রহিয়াছে বলিয়া তিনি শূন্য নহেন। এই বিপুলায়তন ব্রহ্মাণ্ড সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, যাঁহাতে থাকিয়া প্রতিভাত

হইতেছে, তাহাতে শূন্যতা থাকিতে পারে না। যাহাতে পুত্তলিকা উৎকীর্ণ হয় নাই, তাদৃশ স্তম্ভও যেমন পুত্তলিকা-শূন্য নহে, তেমনি ব্রহ্মও জগৎ-শূন্য নহেন। শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যে স্তম্ভ হইতেই পুত্তলিকার প্রাদুর্ভাব হয়, তেমনি মায়ার কৌশলে ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি ঘটে; এই জন্যই বলিতে হয়, পরব্রহ্ম-পদ শূন্য নহে। যেমন শান্ত সলিলে তরঙ্গ আছে এবং নাও আছে, তেমনি পরব্রহ্মে এই বিশ্ব শূন্য ও অশূন্য উভয়-রূপেই বিরাজমান। পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করা যায়, এমন সকল উপকরণ থাকিলেও যেমন শিল্পীর ইচ্ছা ভিন্ন নির্ম্মাণ-কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, তেমনি মহাপ্রলয়ের পরেও বিশ্বসৃষ্টি হইতে পারে না; কেন না, জগৎ অনন্ত পরমাত্মায় বিলীন হইলে কে তাহার কর্ত্তা হইয়া আবার তাহাকে উৎপাদন করিবে? এইরূপ আপত্তি তুলিয়া বিপরীতবুদ্ধি লোকেরা স্তম্ভগত পুত্ত-লিকার দৃষ্টান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, ঐ দৃষ্টান্ত বস্তুগত্যা জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে সর্ব্বাংশে গ্রাহ্য নহে, উহা মাত্র একাংশে অর্থাৎ কেবল উৎপত্তি অংশেই গ্রহণীয়। কর্ত্তৃ-আদি অংশ এখানে ধর্ত্তব্য নহে।

বৎস! এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে কদাপি উদয় বা অস্তপ্রাপ্ত হয় না; পরন্তু উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে বলিয়া সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই উহার নিত্য অবস্থান। ব্রহ্মকে যে শূন্য বলিয়া কল্পনা করা হয়, সে কেবল অশূন্য অপেক্ষায়ই জানিবে; নতুবা একমাত্র অশূন্য হইতে শূন্যতা ও অশূন্যতা, এ উভয়ের উৎপত্তি সম্ভাবনা কোথায়? তার পর দেখ, ব্রহ্ম অব্যয়; তাঁহাতে কোন ভূতজন্য প্রকাশ সম্ভাবনা নাই; সুতরাং চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রকাশ-সম্বন্ধ ব্রহ্মে থাকিবে কোথা হইতে? অতএব তিনি অপ্রকাশ এবং অভাস্বর। তৃতীয়তঃ, পণ্ডিতগণের মতে ভৌতিক প্রকাশের অভাবই তমঃ। কিন্তু ব্রহ্মে অনলাদি ভূত প্রকাশের প্রসরই হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাতে তাহার অভাব জন্য তমঃসম্পর্ক হইবে কিরূপে? প্রত্যুত তিনি ব্যোমবপু স্বপ্রকাশ; তাই তমঃ নহেন। তিনি যে অপর কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নহেন, তৎপক্ষে একমাত্র অনুভূতিই প্রমাণ। তিনি বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থেরও অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করেন, তিনি অনুভূতিস্বরূপ; তাই

তাঁহারই সাহায্যে অপরাপর পদার্থ অনুভবগম্য হইয়া থাকে অথচ তিনি নিজে কাহারও অনুভবগম্য নহেন। ব্রহ্ম, তম ও প্রকাশ এই উভয়েরই অতীত; সুতরাং সেই ব্রহ্মপদ অজর বা অব্যয়। রামচন্দ্র! জানিয়া রাখিও, আকাশ-কোশের ন্যায় তিনিই এই অসীম অনন্ত জগৎ স্থিতির আগারস্বরূপ। যেরূপ বিল্বফল ও তাহার মধ্যভাগ এ উভয়ের বিশেষত্ব নাই, সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্মে কিছুই ভিন্নতা নাই। জলে তরঙ্গ ও মৃত্তিকায় ঘটাদির ন্যায় এই জগৎ যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনি কিরূপে শূন্য হইতে পারেন? যদি এরূপ বল যে, জলমধ্যগত মৃত্তিকা যখন জলীয় স্বভাব ধারণ করে না এবং ঘটমধ্য-গত যে জল, তাহাও কুত্রাপি ঘটের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না; অতএব ব্রহ্মের অন্তর্গত যে জগৎ, তাহার কিরূপে ব্রহ্ম-স্বভাবতা বুঝিব? এরূপ প্রশ্নে আমার বক্তব্য এই যে, ভূমি ও জলাদি সাকার বস্তু; তাহার সহিত ব্রহ্ম ও জগতের উপমা সুসদৃশী নহে। কেন না, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় শূন্যস্বরূপ; তাঁহার মধ্যগত জগৎও শূন্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ব্রহ্ম আকাশরূপ চিন্ময়; তিনি আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ; সুতরাং তাঁহার মধ্যগত যে জগৎ নামক দৃশ্য, তাহাও তদ্রূপ নিরাকার। পরন্তু যেমন অনুভবকারী ব্যক্তির নিকট রবি-কিরণের তীক্ষ্ণতা ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না, তেমনি চিদাকাশেও চিন্ময়েরই দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই ঘটে না। ইহার ভাবার্থ এই যে, দর্শন বা জ্ঞান দৃশ্য বা জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্ত নহে। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, চিৎ ও অচিৎ উভয়ই পরমাত্মায় অবস্থিত। ফলতঃ তিনিই দর্শন এবং তিনিই দৃশ্য। অথচ বাস্তবিক দৃশ্যতা তাঁহাতে নাই; বাস্তব দৃশ্যতার অভাবের ন্যায় বাস্তব জগৎও নাই। বাহ্যিক দর্শন এবং অন্তঃস্থ বিজ্ঞান সকলই তিনি। তদতিরিক্ত কিছুই নহে।

রামচন্দ্র! এই বিশ্ব যেরূপভাবে যে অবস্থায়ই থাকুক, শেষকালে ইহা সুষুপ্ত অথবা তুরীয় অবস্থায় রহিবে। এই জন্যই শান্তচিত্ত যোগীরা সংসারী হইলেও সকল জ্ঞানের আধার সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মেই অবস্থান করেন। আকারযুক্ত জলে যেমন আকারযুক্ত তরঙ্গমালা প্রতিষ্ঠিত আছে, নিরাকার ব্রহ্মে সেইরূপ নিরাকার জগৎ অবস্থান করিতেছে।

ঔপাধিকভেদে পূর্ণব্রহ্ম হইতে যে কিছু প্রকাশ পায়, তাহাও পূর্ণ ; যাহা পূর্ণ, তাহা নিরাকার। পূর্ণব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের বিকাশ। কেবল স্ব-স্বরূপলাভ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যও ইহা জীবভাবে প্রকাশমান। যাহা পূর্ণ হইতে প্রকাশিত, তাহাও পূর্ণ ; অতএব এই বিশ্ব কদাচ ভিন্নভাবে উৎপন্ন নহে। যাহা উৎপন্ন, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যিনি জ্ঞানী, মন যাঁহার পরম পদে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহার পক্ষে দৃশ্য-দর্শন অসম্ভব বলিয়া ব্রহ্ম ও জগৎ এক অর্থাৎ অভিন্নভাবেই প্রতীত হয়। অতএব দেখ, অনুভবকারী লোক না থাকিলে সূর্য্য রশ্মির তীক্ষ্ণতা থাকে কোথায় ? ফলে অজ্ঞানীর পক্ষে পূর্ব্বরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব।

বৎস ! সমুদায় জীব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব হইতে উৎপন্ন, সেই ব্রহ্ম উক্ত প্রকারেই প্রতিভাত। তাঁহার প্রতিবিম্বভাব ভিন্ন কদাপি জীবভাবের উদ্ভব হইতে পারে না। এই জন্য তাঁহাকে জীববান্ নামে অভিহিত করা যায়। তিনি শুদ্ধ সূক্ষ্ম, আকাশকোশ হইতেও প্রশান্ত এবং পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। দিক্ দেশ ও কালাদি দ্বারা তাঁহার রূপের সীমা নির্ণয় হয় না, তাই তিনি অতিবিস্তৃত। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি চিৎস্বরূপ ও আভাসরূপ। যেখানে তাঁহার আবির্ভাব নাই, সেখানে জীবত্ব, বুদ্ধিত্ব, চিত্তত্ব, ইন্দ্রিয়ত্ব এবং বাসনাদি কিছুই নাই। হে রামচন্দ্র ! এইরূপে সেই আকাশ অপেক্ষাও অধিক শূন্য, শান্ত, পূর্ণ, অজর, পরম পদ আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে বিরাজ করিতেছেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহর্ষে ! আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত পুন-রায় সেই অনন্ত চিদাকার পরমাত্মার রূপ বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! মহাপ্রলয়ে সেই একমাত্র নিখিল কারণের কারণ পরব্রহ্ম বিরাজ করেন। আমি তোমার নিকট তাহা কহি-তেছি, শ্রবণ কর। সমাধিযোগে মনের বৃত্তি সকল ক্ষয় হইলে দাহ্য শূন্য অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মনকে বিলীন করিয়া যে নাম-রহিত সৎ বিরাজ করেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা দৃশ্য কিছুই নাই, দৃশ্যের অভাবে দ্রষ্টাও বিলীনবৎ হইয়াছে, এই প্রকার জ্ঞানই পরমাত্মার রূপ। জীব-স্বভাব চৈতন্যের জীবভাব তিরোহিত হইয়া গেলে যে প্রশান্ত নির্ম্মল চিন্মাত্র

অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা জীবদেহে জল, অনল ও পবনাদি স্পর্শ ঘটিলেও চিত্তে যদি স্পর্শ জন্য বিকার না জন্মে, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিকার চিত্তের তাদৃশ রূপই পরমাত্মার রূপ। হে অনঘ! মন স্বপ্নহীন, অজড়, ও অনন্ত হইলে যে সুষুপ্তি অবস্থা ঘটে, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের রূপ সেইরূপই অবশিষ্ট থাকে। অথবা যাহা আকাশের, বায়ুর ও শিলার হৃদয়, তাহাই সেই চিৎস্বরূপ ব্যোমরূপী পরমাত্মার রূপ। চেত্যভাব ও চিত্তভাব না থাকিলে জীবের যে শান্তিময়ী সত্তা অবশিষ্ট থাকে এবং যাহা চিৎপ্রকাশের, আকাশ-প্রকাশের ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তরে প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই সেই আদি বস্তু পরমাত্মার রূপ। অথবা যাহা দ্বারা ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রকাশিত হইতেছে, জীবের সাক্ষিরূপে বিরাজমান সেই অনাদি অনন্ত চিৎই পরমাত্মার রূপ। যাহা নিত্য অব্যক্ত হইলেও, যাহা হইতে জগৎ ব্যক্তরূপে বিভাত হইতেছে, তাহা ভিন্নই হউক, আর অভিন্নই হউক, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও ব্যবহারাসক্ত হইলেও পাষাণবৎ নিশ্চল বা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং যাহা অনাকাশ হইলেও আকাশস্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহা হইতে জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম উদিত ও অস্তমিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। বিস্তৃত দর্পণে প্রতিবিম্ব পাতের ন্যায় যাহাতে জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এই তিনটীই প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। মন স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা হইতে মুক্ত হইলে মহাচৈতন্য যে অবস্থায় বিরাজ করেন, চরাচর বিশ্বের বিলয় ঘটিলে তাহাই পরমাত্মার অবশিষ্ট রূপ থাকে। স্থাবরসমূহের রূপ যদি বোধময় বা চৈতন্যশালী হয়, আর তাহাতে যদি মন বা বুদ্ধি প্রভৃতির সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে তথাবিধ চিদ্‌ঘন বস্তুর সহিত পরমাত্মার তুলনা হইতে পারে।

রামচন্দ্র! ব্রহ্মা, সূর্য্য, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র ও সদাশিবাদি সুরবৃন্দ প্রলয়ে বিলয় প্রাপ্ত হইলে যে একমাত্র পরমমঙ্গল বস্তু অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহার কোন উপাধিই থাকে না; তিনি তখন বিশ্বসংজ্ঞা পরিহার করিয়া একাদ্বয় চৈতন্যময় ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাকেন।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! এই যে বিবিধ জীবাদি-পূর্ণ জগৎ স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে, মহাপ্রলয়ে ইহা কোন্ স্থানে অবস্থান করিবে?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! বন্ধ্যাপুত্রের আকার কীদৃশ? কোথা হইতে আসিয়া কোথায় গমন করে এবং আকাশ-কাননই বা কোথা হইতে আইসে, কোথায় যায়, তাহা তুমি আমাকে অগ্রে বল দেখি?

রামচন্দ্র কহিলেন,—মহর্ষে! বন্ধ্যাপুত্র এবং আকাশ-কানন কখন নাই এবং হইবেও না; সুতরাং তাহার আবার দৃশ্যতাই বা কি আর অবিদ্যমানতাই বা কি?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস! যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশ-কানন কখন নাই, তদ্রূপ এই নিখিল দৃশ্য জগৎও কদাচ নাই। ইহা আদিতেও ছিল না, উৎপন্নও হয় নাই; অতএব ইহার আবার উৎপত্তি ও বিনাশের কথা কি?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোম বৃক্ষ এ দুইটি কল্পনার সামগ্রী; কিন্তু জগৎ হইল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। কল্পনার যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, জগতের সেরূপ হইবে না কেন? আর যদি না-ই হয়, তবে বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত ইহার উপমা সঙ্গত হয় কিরূপে?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! যাহার কোন তুলনা নাই, পণ্ডিতেরা তাহারই সহিত তাহার তুলনা করেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে এরূপ তুলনার নাম অনন্বয়। বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত জগৎ সত্তার তুলনাও ঐরূপ। অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রাদির অস্তিত্ব যেরূপ অলীক, জগতের পৃথক্ সত্তাও সেইরূপই। মনে কর, যেমন সুবর্ণবলয় প্রত্যক্ষ দেখা গেলেও তাহাতে সুবর্ণ ভিন্ন বলয়ত্ব বলিয়া অপর একটা কিছুই নাই, এবং আকাশে শূন্যত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভূত হয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পরব্রহ্মে পৃথক্ জগৎ থাকে না এবং অনুভূতও হয় না। যেমন কজ্জল হইতে কালিমার, হিম

হইতে শৈত্যের এবং শশী ও শিশির হইতে শীতলতার প্রভেদ নাই, সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতেও জগৎসৃষ্টির পার্থক্য বিদ্যমান নাই। এই জগৎ আপাত-দৃষ্টিতে দেখা যায় বটে; কিন্তু মরুভূমির নদীর জল এবং দ্বিতীয় চন্দ্র এই উভয়ের অসদ্ভাবের ন্যায় নির্ম্মলাত্মা ব্রহ্মে উহার অভাব সুনিশ্চিত।

রামচন্দ্র! কারণ ছিল না বলিয়া আদৌ যাহা ছিল না, বর্ত্তমানেও যাহা নাই, ভবিষ্যতেও যাহা থাকিবে না, তাহার আবার বিনাশের সম্ভাবনা কি? তুমি মনে করিতে পার, ব্রহ্মাই জগতের কারণ; কিন্তু সেরূপ মনে করা এক্ষেত্রে সঙ্গত হইবে না; কেন না, পৃথ্বী প্রভৃতি জড়বস্তুর কারণ জড়বস্তুই হইতে পারে, পরন্তু ব্রহ্ম ত জড়বস্তু নহেন। ব্রহ্ম ও জড়, ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। সত্য বটে, কারণ বিনা কোন কার্য্যই হয় না, কিন্তু এক্ষেত্রে সেই যে আদি কারণ ব্রহ্ম, তিনিই কার্য্যরূপে বিশ্বাকারে বিরাজ করিতেছেন। বলিতে পার, বিশ্বের কারণ অজ্ঞান; কিন্তু তাহাও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসৃষ্টি করে না। তাহা মাত্র সচ্চিৎ ব্রহ্ম-বস্তুকে জগদাকারে আভাসিত করে; কিঞ্চিন্মাত্রও বিকৃত করে না। সুতরাং এই জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট জগতেরই অনুরূপ। স্বপ্নকালীন নগরাদি বিবিধ বস্তু প্রত্যক্ষ হইলেও সে সকল যেমন কিছুই নহে, সেইরূপ পরব্রহ্মে জগৎ না থাকিলেও আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের কুহকেই তাহাতে জগদ্দর্শন হইয়া থাকে।

বৎস! এই যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, এই সমস্তই নিত্য পর-মাত্মায় অবস্থিত। সুতরাং জগৎ কখন উদিত ও অস্তমিত হয় না এবং হইবেও না। যেমন জল তরল ভাবে, পবন স্পন্দনাকারে এবং প্রকাশ প্রভা-রূপে বিরাজিত, ব্রহ্মও তেমনি ত্রিভুনাকারে অবস্থিত। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির অন্তঃকরণের বিজ্ঞানই যেমন তাৎকালিক নগরাদিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মাই পরমাত্মায় জগদাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! এই বিষময় দৃশ্য জগৎ যদি বাস্তবিকই স্বপ্নানুভবের ন্যায় মিথ্যা, তাহা হইলে কল্প-কল্পান্ত পর্য্যন্ত মনুষ্যের ইহাতে একটা সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমুল আছে কেন? আমি আরও জিজ্ঞাসা করি, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এ উভয়ের একটী রহিলেই অপরটী রহিল।

উহাদের একটীতেই উভয়ের বন্ধন নিশ্চিত। কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে যদি একের অভাব ঘটিল, তবে উভয়েই মুক্তি পাইল। অতএব দেখা যাইতেছে, যতক্ষণ দৃশ্যবুদ্ধি একেবারে ক্ষয় না পাইবে, তাবৎ পর্য্যন্ত দ্রষ্টার দৃশ্য-দর্শন ঘটিবেই; পরন্তু তাহাতে প্রকৃত মোক্ষজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি অগ্রে দৃশ্যজ্ঞানের উদয় হয় ও পশ্চাৎ তাহার ক্ষয় হয়, তাহাতেও অনর্থ। কেননা, উহাতে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ মন সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে। আদর্শ যেখানেই থাকুক, তাহাতে প্রতিবিম্ব-পাত হইবেই, সেইরূপ চিদাদর্শ যে কোন ভাবে রহিলেও তাহাতে স্মরণ জন্য সংসার-সংস্কারের প্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবেই হইবে। তবে কথা এই, দৃশ্য যদি আদৌ উৎপন্ন না হইয়া থাকে, কিম্বা যদি সত্য সত্যই দৃশ্য না থাকে, তাহা হইলে দ্রষ্টা স্বভাবতই মুক্তি পাইতে পারেন; কিন্তু সেরূপ হওয়া সহজ নহে। অতএব হে আত্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ! আমি নিবেদন করি, যাহাতে আমার দৃশ্যজ্ঞানাদি একেবারে অপনীত হইয়া যায়,—সর্ব্বসংশয় দূর হয়, আপনি সদ্যুক্তি দ্বারা আমাকে তাহা উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস রাম! এই জগৎ অসত্য হইলেও যেরূপে সত্য-বৎ প্রকাশিত হইতেছে, আমি দীর্ঘ উপাখ্যান বলিয়া তাহা তোমাকে বুঝাই-তেছি, শ্রবণ কর। হ্রদ হইতে যেমন ধূলিকণা উত্থিত হয় না, তদ্রূপ যতক্ষণ না আমি প্রাচীন উপখ্যানাদি বর্ণন করিতেছি, তাবৎ তোমার দৃশ্যবুদ্ধির বিলোপ ঘটিবে না।

রামচন্দ্র! এই জগতের স্থিতি বস্তুতই ভ্রমময় মিথ্যা, তুমি এইরূপ বিবেচনায় ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া সংসারে ব্যবহার-রত রহিবে, তাহা হইলেই দেখিবে, বাণ যেমন বিপুল শৈলগাত্র বিদারণে অসমর্থ, তেমনি ভাবাভাব গ্রহণ, স্থূল সূক্ষ্মাদি ধারণা, স্থির ও অস্থির জ্ঞান ও বিবিধ ব্যবহার দর্শন, এ সকল তোমায় আক্রমণ করিতে পারিবে না। বৎস! সেই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, এই জগৎ তাঁহাতেই আবির্ভূত হইয়াছে। তিনিই ব্যষ্টি এবং তিনিই সমষ্টি। তাঁহা হইতেই চরাচর বিশ্ব বিকাশ পাইতেছে। সেই মহাত্মাই রূপাদি দর্শন ও মনোমননাদি নিখিল পদার্থরূপে উদিত

ও অস্তমিত হয়েন। হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট সমস্তই কীর্ত্তন করিতেছি।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! সেই পরম পবিত্র পরম শান্ত ব্রহ্মপদ হইতে যেরূপে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন সুষুপ্তি-অবস্থা স্বপ্ন-বিশিষ্ট হইয়া বিকাশ পায়, তেমনি সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মই সৃষ্টি-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়েন। এই যে বিশাল বিশ্ব, ইহাকে অনন্ত প্রকাশ ও অনন্ত চিন্ময় পরমাত্মার স্বাভাবিক সত্তা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল। তাঁহাতে প্রথমতঃ আপনা হইতে যে কিছু চেত্য বা জ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়, সেই চেত্য ভাবই অহংভাব; এই অহংভাবের মধ্যেই যাবতীয় সৃজ্যমান পদার্থের অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান-সংস্কার থাকে এবং তাহাই আমাদিগের সংস্কারসম্পন্ন চিত্তের উদ্বোধন করিয়া দেয়। তার পর ঐ চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিসম্পন্ন যে চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তা, তাহাই তাহার অনতিরিক্ত চিন্ময়ী পরমেশসংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইবার যোগ্য হয়। পরে যৎকালে তিনি চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ-সংবেদনের বশীভূত হইয়া জ্ঞানঘন হন, তখন তাঁহার আত্মস্বভাবে বিস্মৃতি জন্মে; তিনি পরম পদ পরিহার করিয়া পুনরায় ভাবী সংসারোপাধিক জীবভাব প্রাপ্ত হইতে থাকেন। অর্থাৎ জগৎ সেই সর্ব্ব-প্রকাশময় ব্রহ্মের সত্তামাত্রাত্মক। তিনি যখন মায়াবলে আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করিবার মনন করিয়া আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যান, তখন জীব-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই জীব যখন আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের আনুগত্য পরিহার করেন, তখন তিনি নানাবিধ সংসার বিস্তার করিয়া তাহাতে লিপ্ত হইয়া থাকেন।

বৎস! তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মভাবের অপচয় ঘটে না; কেননা, উল্লিখিত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ দ্বারা প্রকাশোন্মুখী হয়; তাহাতে তাঁহার কোনই বিকৃতি ঘটে না। ঐ জীবভাব প্রাপ্তির পরই অগ্রে খ-সত্তা বা শূন্যতার আবির্ভাব হয়। এই শূন্যরূপতাই শব্দাদি গুণের ও আকাশাদি ভাবী সংজ্ঞার নিদান। অনন্তর কাল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অহংভাবের উদয় হয়। এই অহংভাবই জগৎস্থিতির মূল। এইরূপে পরম সত্তা হইতেই এই অসৎ জগৎ জন্মিয়া সতের ন্যায় প্রকাশিত হয়। অহংভাব ও আকাশ, এই উভয়-সম্বলিত ব্রহ্ম চৈতন্যই সম্বিৎ; সেই সম্বিৎই সঙ্কল্পসমূহের বীজ। উল্লিখিত অহংভাব কিয়দংশে স্পন্দিত হইলেই স্পন্দন-স্বভাব বায়ুর আবির্ভাব হয়। অহম্ভাব-বিশিষ্ট আকাশস্বরূপ পরম সত্তা যৎকালে শব্দ-তন্মাত্রের ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রমে আকাশভাব হইতেই ঈষদ্‌ঘনীভূত হইয়া খ-তন্মাত্র বা শব্দ-তন্মাত্র হয়। উল্লিখিত শব্দতন্মাত্রই শব্দময় পাদপের মূল। উহা হইতেই ভাবী নাম, রূপ, অর্থ, পদ, বাক্য ও প্রমাণাদি-সম্পন্ন বেদ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই নিখিল শব্দ ও অর্থ-পরিপূর্ণ বেদভাবাপন্ন পরমাত্মা হইতেই এই অসীম অনন্ত জগৎসমৃদ্ধির আবির্ভাব হয়।

পূর্ব্বে যে বায়ুর কথা কহিয়াছি, সেই বায়ুসম্পন্ন ব্রহ্মচৈতন্যই জীব নামে অভিহিত। এই জীব শব্দে কথিত বায়ুযুক্ত চিৎই নিখিল মূর্ত্তির বীজ। ইনিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদির কারণ। ইহাঁ হইতেই জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণিসমেত চতুর্দ্দশ ভুবন ব্রহ্মাণ্ডোদররূপে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-চৈতন্য উল্লিখিতরূপে বায়ুভাব প্রাপ্ত হইলে তদীয় বেগে যে শরীর প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই স্পর্শতন্মাত্র আখ্যায় অভিহিত। এই স্পর্শ-বিশিষ্ট বায়ুরূপী চৈতন্য একোনপঞ্চাশৎ স্কন্ধে বিভক্ত হইয়া সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করেন এবং তাহাতেই সকলের স্পন্দনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এইরূপে তাহাতে পরম প্রকাশময় চিৎশক্তির ভাবনায় তেজস্তন্মাত্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে; এই তেজই আলোক-সকলের মূল। ইহাই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুদাদি আলোক আকারে প্রকাশিত হয় এবং ইহা হইতেই রূপভেদে সংসার বিস্তার ঘটিয়া থাকে। এইরূপে তেজোভাবময়

চৈতন্য যখন জলময় আকার ধারণ করিবার মনন করেন, তখনই জলের আবির্ভাব হয়। মধুরাদি বিবিধ আস্বাদ এই জলাত্মক বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারই নাম রসতন্মাত্র। ইহাই যাবতীয় দ্রব-পদার্থের বীজ এবং এই বীজও সংসারবিস্তারের মূল। উল্লিখিত জলভাব-প্রাপ্ত পরমাত্মা 'আমি পৃথিবী হইব' মনে করিলেই আপনাতে আপন সঙ্কল্পগুণে গন্ধতন্মাত্রতা অবলোকন করেন। এই গন্ধতন্মাত্রাই ভাবী ভূ-গোলকের মূল এবং উহাই মনুষ্যাদি বিবিধ আকৃতির কারণ ও সকলের আধার। উহা হইতেও সংসারের প্রসার হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! যেমন জলের বুদ্বুদ সকল জলেতেই পরিণত হয়, সেইরূপ উল্লিখিত অহম্ভাবযুত চিৎশক্তির ভাবনার ফলে উৎপন্ন উক্ত তন্মাত্র সকল, পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। বৎস! এইরূপেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। পরে উহারা কিছুকাল মিলিত থাকে, শেষে আবার পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। যত কালে প্রলয় উপস্থিত না হয়, তাবৎ উহাদিগকে বিশুদ্ধ চিৎশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। সূক্ষ্ম বটবীজের অভ্যন্তরে যেমন কত সংখ্যাতীত বটবৃক্ষ রহিয়াছে, সেইরূপ গগনগর্ভেই ঐ সকল তন্মাত্র অবস্থিতি করে। উহারাই স্থূলাকারে পঞ্চভূতাদিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। মনে করিতে পার, তন্মাত্র সকল সাতিশয় সূক্ষ্ম; সে সকলে অবকাশমাত্র নাই, সুতরাং তাহাতে স্থূলাবস্থান অসম্ভব। কিন্তু এ কথার উত্তর এই যে, তাহাতে স্থূলাবস্থান বাস্তবিক নহে। বীজ হইতে অঙ্কুর হইল, শত শত শাখায় প্রসৃত হইল এবং ক্ষণমধ্যে ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইল, এ সকল মায়িক বা ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টিদর্শন পরমাণুর অভ্যন্তরেও ঘটিয়া থাকে; জগৎসৃষ্টি দর্শনও এইরূপই। ইহা ক্ষণমধ্যে আবির্ভূত ও ক্ষণমধ্যে তিরোভূত হইয়া থাকে। এবম্বিধ অবাস্তব স্থূলতায় বাস্তব সূক্ষ্মতার অপচয় ঘটে না। কেন না, এ সকল কখন বিবর্ত্তকে † অনুসরণ করিতেছে, কখন বিবর্ত্তহীন হইতেছে, কখন বা চিদাধারে অতি সূক্ষ্ম হইয়া লুক্কায়িত রহিতেছে এবং কখন বা ক্ষণমধ্যে পিণ্ডাকারে প্রকাশ পাইতেছে। সঙ্কল্পাত্মিকা চিৎশক্তিই

† বিবর্ত্ত = মিথ্যা, অন্যথা হওয়া; যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প।

তন্মাত্রগণরূপে ত্রসরেণুর আকার ধারণ করিতেছে, আবার কখন বা নিরাকাররূপে দেখা যাইতেছে।

রামচন্দ্র! ব্রহ্মই যে জগদাকার, এ উক্তি সর্ব্বথা সুসিদ্ধ। দেখ, এই দৃশ্য জগতের বীজ হইল পঞ্চতন্মাত্র। পরমাত্মার পরাশক্তি বা মায়াশক্তি হইল উক্ত তন্মাত্র-পঞ্চকের বীজ। ঐ মায়াশক্তি হইতেই জগৎশ্রীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই কারণেই জগৎ অজ, অনন্ত ও চিন্মাত্র আখ্যায় অভিহিত। চিন্মাত্রতাই জগতের রহস্য। এই জাগতিক রহস্য বা তত্ত্ব সর্ব্বদাই আমাদের অনুভূত।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! নভঃ, তেজঃ, তমঃ, এ সকল উৎপন্ন নহে। উহাদিগের যে সত্তা, তাহার কারণ চিদাত্মা। ঐ চিদাত্মাই মায়াকাশে বিকাশপ্রাপ্ত হইলে প্রথমতঃ তাঁহাতে কল্পনা, তৎপরে জীবভাবের, অনন্তর অহম্ভাবের এবং অহম্ভাবের অপচয় বশে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। এই বুদ্ধিই শব্দ-তন্মাত্রাদি-বিশিষ্ট মন † এবং এই মনই পঞ্চতন্মাত্রের সম্মিলনে মহাভূতাকারে উপচিত হওয়ায় জগদাকারে অবলোকিত হইয়া থাকে। যাহা কখন নির্ম্মিত হয় নাই, কিম্বা কোথাও দৃষ্ট হয় নাই, এমন নগরাদি বস্তুও যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নযোগে সহসা দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ চিদাত্মাও মনের আবেশে জগৎ দর্শন করেন; সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এ বিশ্ব স্বপ্নের ন্যায় চিৎ-নামধেয় মহাকাশে বার বার উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

বৎস! চিদাত্মাই জগৎনামক করঞ্জ-কুঞ্জের * অনুপ্ত বীজ।

---

† এখানে বুদ্ধি অর্থে মহত্তত্ত্ব এবং মন অর্থে সঙ্কল্পবিকল্পকর্ত্তা অন্তঃকরণ বুঝিতে হইবে।

* করঞ্জ এক প্রকার বৃক্ষ, তাহার কুঞ্জ।

ইহাতে ক্ষিতি, জল বা তেজ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই, এ বীজ আপনিই অঙ্কুরিত হয়। যাহা বিশুদ্ধ চিৎ, তাহাই স্বপ্ন-দৃষ্টবৎ পৃথিব্যাদি সৃষ্টি করিতেছেন; পরন্তু ঐ বিশুদ্ধ চিৎ যেখানেই থাকুন, সর্ব্বত্রই জগদ-স্কুর হইতে তিনি বর্জ্জিত। পঞ্চতন্মাত্র হইল স্থূল জগতের বীজ আর পঞ্চতন্মাত্রের বীজ হইল অক্ষয় অব্যয় চিৎ; সুতরাং জানিও—যাহা বীজ, তাহাই ফল—এরূপ ভাবেও এ জগৎ ব্রহ্মময় বলা যায়।

রামচন্দ্র! সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র মহাকাশে থাকে। চিৎই স্বীয় প্রভাবে ঐ পঞ্চতন্মাত্রার কল্পনা করিয়া থাকেন; সুতরাং উহাকে বাস্তব বলা যায় না। ঐ কল্পিত পঞ্চতন্মাত্রই উপচিত হওয়ায় এই স্থূল জগৎ বিস্তৃত হইতেছে। অতএব যাহা সৎ ও কল্পনার অধিষ্ঠান, তাহাতে স্বপ্নকল্পনার ন্যায় কল্পিতরূপে থাকে বলিয়া ঐ সকলই সেই সৎস্বরূপ। অতএব যাহা কেবল কল্পনাতেই উপচিত, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র যেমন ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত, সেইরূপ তন্মাত্রা হইতে উৎপন্ন স্থূল ভূত-সমষ্টিও ব্রহ্মচৈতন্যেই বিরাজিত। সুতরাং জানিয়া রাখিবে, ব্রহ্মই এই ত্রিজগৎ; ব্রহ্মই জগতের কার্য্য হইয়াও কারণ হইতেছেন। অতএব জগৎ নামে কোন একটা পৃথক্ পদার্থ এ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় নাই এবং হইয়াছে বলিয়া দেখাও যায় নাই।

বৎস! স্বপ্নকালে কিম্বা কল্পনার ফলে যে সকল নগরাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসৎ হইলেও যেমন সতের ন্যায় মনে হয়, তেমনি পরমপ্রকাশ পরমাত্মায় জীবাকাশের বস্তুতঃ অভাব রহিলেও অজ্ঞের চক্ষে তাহার অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। উল্লিখিতরূপে সুনির্ম্মল পরমাত্মায় পৃথিব্যাদির প্রকৃত অবস্থান অসম্ভব বলিয়া আকাশে নিজ কল্পনায় গন্ধর্ব্বপুরাদি দর্শনের ন্যায়, ব্রহ্মে জীবের উদয়ও কল্পনাতেই কথিত। রামচন্দ্র! উক্ত জীবাকাশ* যে প্রকারে এই স্থূল দেহ লাভ করেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্রে পরমেশ্বরে সমষ্টি জীবাকাশ কল্পিত হইয়া থাকে। তৎপরে ঐ সমষ্টি জীবাকাশে

* জীবভাব আকাশের ন্যায় নিরাকার বলিয়া এখানে জীবে আকাশের আরোপ করা হইয়াছে।

'আমি স্ফুলিঙ্গবৎ অল্প' ইত্যাকার অসংখ্য ভাবনা বিচ্ছিন্ন ভাবে উদিত হয়। এরূপ ভাবনার উদয় হইলেই স্থূল জীবের প্রকাশ বা জন্ম হইয়া থাকে। মনে মনে কল্পনা করিয়া একটা চন্দ্র দেখা গেল, ঐ চন্দ্র যেমন অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া ধারণা জন্মে, তেমনি জীবের ঐ ভাব অসৎ হইলেও সতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে ভাবনার প্রাবল্যেই তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যাকারে পরিণত হয়েন এবং তৎকালে সূক্ষ্মভাব পরিহার করিয়া আপনাকে তারকার ন্যায় স্থূল অনুভব করেন; তাহাতে তাঁহার যে কিঞ্চিৎ স্থূলাভাব লাভ হয়, তাহাকেই জীবের লিঙ্গদেহ বলে। এই লিঙ্গ দেহ জ্ঞান ও কল্পনাবশে স্থূল শরীর ধারণ করে। চিত্ত-কল্পনাবশতঃ জ্ঞান ও শরীর উভয়েরই প্রাদুর্ভাব ঘটে। জীব স্বীয় কল্পনাজালে সেই সেই উপাধিতে 'সোঽহং' ইত্যাকারভাবে ভাবিত হয়। জীবের উল্লিখিত তারকাকার লিঙ্গভাবই তদীয় ভাবী কর-চরণাদিবিশিষ্ট স্থূলদেহের কারণ হইয়া থাকে। মনুষ্য যেমন স্বপ্নযোগে আপনাকে পথিক বলিয়া মনে করে, ঐ জীবও তেমনি নিজেকে শরীরী বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। চিত্ত যেমন যেমন বিষয় স্বরূপ ধারণ করে, জীবও অমনি সেই সেই উপাধির অনুগামী হয়েন। পর্ব্বত বহির্ভাগে থাকিলেও সম্মুখে দর্পণাদি রাখিলে তাহা যেমন তাহারই মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়, সর্ব্বত্র গমনাগমন-পটু এই দেহ যেমন কূপ মধ্যে পতিত হইলে, মাত্র কূপের ভিতরই গতিবিধি করে কিম্বা দূরবিসর্পী উচ্চস্বর যেমন কোন একটা আবরকের ভিতর উত্থিত হইলে তন্মধ্যেই সীমাবদ্ধভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ সর্ব্বগামী আত্মাও লিঙ্গ-শরীরাদির অভ্যন্তরেই 'অহং' অভিমান ধারণ করিয়াই যেন অবস্থান করিতে-ছেন, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। স্বপ্নদর্শন ও সঙ্কল্প যেমন দেহের ভিতরই ঘটিয়া থাকে, জীব সেইমত স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ উপাধিতে অহঙ্কারের সহ-যোগিতায় তাহারই মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় রহিয়া বাসনাময় দেহাদি অনুভব করেন।

রামচন্দ্র! এইরূপে বাসনাময় দেহাদি লাভ হইলে জীব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, চেষ্টা ও স্পন্দনবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়েন। 'আমি দেখিব' এই ভাবের উদয়

হইলেই ভাবী বাহ্য দৃশ্য দেখিবার জন্য আকাশে ছিদ্রদ্বয় প্রসারিত হয়। সেই দুই ছিদ্র দ্বারা দেখা যায় বলিয়া তাহাদের নাম নেত্র। এইরূপে যাহা দ্বারা স্পর্শ করা যায়, তাহাকে ত্বক্, যাহা দ্বারা শ্রবণ করা যায়, তাহাকে কর্ণ, যাহাতে ঘ্রাণকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে নাসিকা এবং যাহা দ্বারা বস্তুর আস্বাদন সম্পন্ন হয়, তাহাকে রসনা নামে অভিহিত করা হয়। স্পর্শ করিব, শ্রবণ করিব, ঘ্রাণ লইব ও আস্বাদ লইব, এই সকল ভাবের প্রভাবেই উল্লিখিত ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহা স্পন্দিত হয় এবং যাহা হইতে চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাই বায়ু নামে অভিহিত। এই বায়ুই বাহ্য ও আভ্যন্তর বিজ্ঞানের সম্পাদক। এইরূপে আতিবাহিক দেহ-সম্পন্ন ব্রহ্মাই স্থূলাকার ধারণ করেন। পরে তাঁহার এই সকল স্থূল দর্শন হয়। তিনিই উল্লিখিত স্ফুলিঙ্গাকারাদি বাহ্য বিষয়ের কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থান করেন।

বৎস! ঐ সকল কল্পনা অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়। ব্রহ্মা ঐ সকল আশ্রয় করিয়াই জীবশব্দিত অপর নাম ধারণ করেন। আতিবাহিক দেহ-সম্পন্ন পরমাত্মা স্থূলদেহের আবরণ ধারণ করিয়া স্বীয় বুদ্ধি-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডকে বিলোকন করিতেছেন। কেহ জল মধ্যস্থ, কেহ সম্রাট্ স্বরূপ এবং কেহ বা ভাবী ব্রহ্মাণ্ডরূপে দর্শন ও অনুভব করিয়া থাকেন। দেশ কালাদি শব্দ-নির্ম্মাতা জীব আতিবাহিক দেহে আপনার চিত্ত হইতেই কল্পনানুরূপ দেশ কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যাদির কল্পনা ও অনুভব করত সেই সেই কল্পিত শব্দ দ্বারা আবদ্ধ হয়েন। এইরূপে এই জগৎ স্বপ্নকল্পনার ন্যায় একান্ত অসৎ তুচ্ছ ও অলীক; সুতরাং কিছুতেই ইহাকে উৎপন্ন বলা যায় না। বাস্তব পক্ষে অনুৎপন্ন হইলেও বিরাটবপু আদ্য প্রজাপতি প্রভু স্বয়ম্ভু আপনা হইতেই উল্লিখিতরূপে উৎপন্ন হয়েন বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হয়।

রামচন্দ্র! এই যে ব্রহ্মাণ্ডাকার ভ্রম, ইহাতে এমন কোন একটা বস্তুই নাই, যাহাকে সম্পন্ন বা সুসিদ্ধ বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই, কিছুই হয় নাই বা কিছুই দেখা যাইতেছে না।

ইহা কেবল সেই অনন্ত আকাশবৎ ব্রহ্মাকাশই অবস্থিত। সৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও সঙ্কল্প নগরের ন্যায় ইহা একান্ত অসৎ। ইহা কোন বাহ্য সামগ্রী দ্বারা নির্ম্মিত বা আন্তরিক প্রযত্নে প্রস্তুত নহে; তথাচ ইহা আশ্চর্য্য-রূপে প্রকাশিত। এই অলীক দৃশ্য কাহারও আন্তরিক প্রযত্নে প্রস্তুত বা অনুভূত না হইলেও ইহা সেই সৎস্বরূপে অবস্থিত। মহা-প্রলয়ে যখন ব্রহ্মাদিরও বিলয় হইয়া থাকে, তখন তাঁহাদের সৃষ্ট এই জগৎকে সত্য বলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; পূর্ব্বস্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার প্রাক্তনী স্মৃতির ফলও ইহা নহে। জগতের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যেরূপ ভাবাপন্ন, তাঁহার সৃষ্ট এই জগৎও তাদৃশ বলিয়াই বিদিত। পৃথিবী-প্রভৃতির সৃষ্টি ব্যাপারে যে পরমাত্মা কারণরূপে বিরাজমান, এই জগৎ-স্বপ্ন যখন তিরোহিত হইয়া যায়, তখন তিনিই কেবল অদ্বয় ব্রহ্মভাবে বিরাজ করেন। এ সকল দৃশ্য তখন কিছুই থাকে না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর স্বপ্ন-দৃষ্ট পৃথিবী বা অন্য কোন পদার্থাদি যেমন শুদ্ধ স্মৃতির আকারেই অনুভূত হইতে থাকে, ব্যোমরূপী পরমাত্মার ভাবও সেইরূপই। জলের তরলতা যেমন জল হইতে অভিন্ন, সেইরূপ সৃষ্টিও পরমাত্মা হইতে অনতিরিক্ত।

এইরূপে এই জগৎ সেই আকাশরূপী ব্রহ্মের ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মল, শান্তস্বরূপ, আধার ও আধেয়-হীন, দ্বৈতরহিত, একত্ববর্জ্জিত; কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মাণ্ড একটা ভ্রান্তিমাত্র। ইহা ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াও জন্মে নাই। ইহা একটা কিছুই নহে; তবে যাহা কিছু আছে, ইহা পরমাকাশবৎ শূন্য ও সুনির্ম্মল। বাস্তবপক্ষে সংসার বলিয়া একটা কিছুই নাই। ইহা আধেয় নহে, আধার নহে, দ্রষ্টাও নহে বা দৃশ্যও নহে। অধিক আর কি কহিব, ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াও কোন পদার্থই নাই। এ সকল থাকিবার পক্ষে প্রমাণ করিতে যাওয়া কেবল বিতণ্ডাবাদ মাত্র। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, এ সমস্ত কিছুই নহে। সকলই সলিলে আবর্ত্তাদি উদ্গমের ন্যায় সেই ব্রহ্মেতেই আপনা আপনি বিকাশ পাইয়া বিলীন হইতেছে। ব্রহ্ম-স্বভাবের আবর্ত্তেই দৃশ্য জগতের আবির্ভাব। সুতরাং এ জগৎ অসৎ হইলেও আধারের অনুবর্ত্তী বলিয়া সতের ন্যায়

প্রকাশমান। স্বপ্নাবস্থায় লোকে আপনার মৃত্যু দেখিয়া থাকে; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর জ্ঞানোদয় হইলে তাহা একান্ত অলীক বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই এ জগৎ অলীক বা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং কেবল সেই অনাদি অনন্ত অনাময় অখণ্ড ব্রহ্মাই জ্ঞানময় অম্বরোদরে উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! আদ্য প্রজাপতি স্বয়ং শূন্যস্বরূপে পরমাকাশেই নিত্য বিরাজমান। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই। তিনি আতিবাহিক দেহ ধারণ করেন। অতএব তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত এই পৃথিবী-প্রভৃতিও অনুৎপন্ন শশশৃঙ্গাদিবৎ মিথ্যা।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস! এই যে অহম্ভাব-বিশিষ্ট জগদাদি দৃশ্য-পরম্পরা, ইহা কিছুই নহে। ইহা আদৌ জন্মে নাই বলিয়া ইহার বিদ্যমান-তাও নাই। তবে যাহা বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়, তাহা পরম পদ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সুস্থির সাগরের অস্থির তরঙ্গাকারে পরিণতির ন্যায় প্রথমতঃ পরমাকাশই আপনি আকাশরূপ পরিহার না করিয়া জীবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সঙ্কল্পস্বরূপিণী চিদ্বৃত্তিই অসংখ্য জীবস্বরূপ ধারণ করেন। আদি আবির্ভূত জীবই ব্রহ্মা। সেই বিরাট্ বপু ব্রহ্মার দেহে পৃথিব্যাদি সম্পর্ক নাই। ঐ দেহ চিন্মাত্রস্বরূপ, নির্ম্মল নভোময় এবং আতিবাহিক সংজ্ঞায় উহার পরিচয়। ঐ দেহ অক্ষয় এবং স্বপ্নদৃষ্ট শৈলের ন্যায় আভাসিত মাত্র। স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি যদি চিরস্থির হয়, তবে তৎসমস্ত কিম্বা চিত্রকর যে একাগ্রতার সহিত মনে মনে সমরসমুৎসুক সৈন্যদলের চিত্র কল্পনা করে, সেই সংস্কারময় সৈন্যদলও সেই জীবঘন ব্রহ্মার সহিত তুলিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যদি কোন মহাস্তম্ভে

অক্ষোদিত পুত্তলিকা বিদ্যমান থাকে, তবে তাহারও সহিত এই বিরাট পুরুষের উপমা দেওয়া যাইতে পারে। ফল কথা, এই বিরাট পুরুষকেও ব্রহ্মস্বরূপ মহাস্তম্ভের অক্ষোদিত বা অনুৎকীর্ণ পুত্তলিকা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়।

রামচন্দ্র! ঐ আদি প্রজাপতি ব্রহ্মার নিজের কোন কর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি কারণহীন। অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রাণীর ন্যায় তাঁহার কোন উৎপাদক কারণ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতামহেরা গত গত মহাপ্রলয়ে মুক্ত হইয়াছেন, অতএব প্রাক্তন কর্ম্ম তাঁহাদিগকে বন্ধন করিতে পারে নাই। দর্পণাদিতে প্রাচীরাদির প্রতিবিম্বপাত হয়; আদি প্রজাপতি ঐ প্রতিবিম্বের ন্যায় দৃশ্য হইলেও পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়া তিনি দর্শনের অযোগ্য। ফলতঃ তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সৃজন এবং ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, এ সকলের কিছুই নহেন। কিন্তু সমুদায়ই আবার তিনি। তিনিই সমস্ত প্রতিশব্দ এবং সমস্ত পদার্থের স্বরূপ। একটী দীপ হইতে অসংখ্য দীপমালার ন্যায় তাঁহা হইতেই নিখিল জীবপরম্পরা জন্মিয়াছে। সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পান্তরের এবং স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরের উৎপত্তির ন্যায় বিরাট দেহ হইতেই এই জগতের আবির্ভাব। বৃক্ষ হইতে শাখা-প্রশাখাদির প্রসারের ন্যায় সেই একই মাত্র বিরাটবপু ব্রহ্মের স্পন্দন হইতেই জীবপ্রবাহের সমুদ্ভব হইতেছে। কোন সহকারী কারণ নাই বলিয়া ঐ জীবপ্রবাহ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। ফলতঃ সহকারী কারণের অভাব হইলেও কার্য্য ও কারণ উভয়ই অভিন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও পরব্রহ্ম এক ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পৃথিবী প্রভৃতি অসৎ বস্তু সকল যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, তিনিই জীবাকাশরূপী আদি ব্রহ্মা এবং তিনিই বিরাড়াত্মা বা বিরাটবপু বলিয়া শাস্ত্রে সমুল্লিখিত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জীব পরিমিত কি অপরিমিত? উহার সংখ্যা আছে, কি নাই? অথবা অসংখ্য হইলেও জীবপিণ্ড কি প্রকাণ্ড পাষাণবৎ অনন্তস্বরূপ? প্রভো! আপনি বলিয়াছেন, আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে জীবপ্রবাহের প্রসার হয় বটে; কিন্তু তাহা বাস্তব নহে। এখন কথা এই, মূল যদি প্রকৃতই অবাস্তব, তবে জলধর হইতে

জলধারার ন্যায়, অম্বুধি হইতে অম্বুকণার ন্যায় কিম্বা তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ স্ফুরণের ন্যায় এই জীবপুঞ্জ কোথা হইতে কেমন করিয়া নির্গত হইল ? তাহা আমাকে বলিয়া দিন। এই জীবপ্রবাহের তত্ত্ব যদিও আমি ভবদীয় উপদেশে কতকাংশে বুঝিতে পারিয়াছি, তথাচ আবার তাহা পরিস্ফুটরূপে বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! জীব যখন একটীও নাই, তখন অসংখ্য জীব বা জীবরাশির কথা উত্থিত হইবে কোথা হইতে ? বস্তুতঃ 'শশশৃঙ্গ উড়িয়া যাইতেছে' এইরূপ কথার ন্যায় তোমার এই কথাও একান্তই অলীক। হে রঘুনন্দন ! ফল কথা, জীবও নাই, জীবরাশি বা অসংখ্য জীবও নাই এবং প্রকাণ্ড পাষাণবৎ কোন জীবপিণ্ডও নাই। জীব শব্দটা শুদ্ধ প্রতিভাস মাত্র। তুমি নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, অমলাত্মা শুদ্ধ চিন্মাত্র সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই কেবল আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ; সুতরাং যে কিছু কল্পনাকৌশল, তাহা তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। লতা যেমন প্রথমে আপনাকে কোরকিত ও পরে ফুল্ল কুসুমিত অবলোকন করে, ব্রহ্মও সেইরূপ সঙ্কল্পবৃত্তির ক্রম অনুসারে চিন্মাত্র আভাসের অনু-প্রবেশে ঐ কল্পনাকৌশলকেই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত বা সাকার ও নিরাকাররূপে আবির্ভূত দর্শন করেন। যিনি চিন্ময় ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত, তিনি নিজেই নিজেকে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া, মন, দ্বিত্ব ও একত্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে বিদিত হয়েন। অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব একমাত্র ব্রহ্মেই বিরাজমান। ব্রহ্মের অস্তিত্ব লইয়াই অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্ব। তবে কথা এই যে, ব্রহ্মের সত্তাকে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই তাহা অন্যের সত্তা বা অস্তিত্বরূপে প্রতীত হইতে থাকে। যখন যথাযথ জ্ঞানোদয় হয়, তখন বুঝা যায়—সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই ; ব্রহ্মের সত্তাতেই সকলের সত্তা সুনিশ্চিত। যে অজ্ঞান ব্রহ্মসত্তার আবরক, তত্ত্বজ্ঞানই তাহার বিনাশক। কিন্তু অজ্ঞান যে কি, তাহা দুর্ব্বোধ। অন্ধকার যেমন দীপালোকের প্রকাশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ অন্ধকারের তত্ত্ব যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না ; অজ্ঞান বা অবোধ সম্বন্ধেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। এতাবতা এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মই

জীবাত্মা। তিনি বিভাগরহিত বা অপরিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড। তিনিই সর্ব্ব-শক্তিশালী। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি মহাচৈতন্য ও আনন্দ-স্বরূপ। সর্ব্বত্র অপরিচ্ছিন্নতা হেতু কুত্রাপি তাঁহার ভেদকল্পনা নাই। তবে যে কিছু ভেদ-কল্পনা, সে সকলই তদীয় মায়িক বিভূতি।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা এইরূপই বটে; কিন্তু মহাজীব বা সমষ্টি জীব এবং ক্ষুদ্র বা ব্যষ্টি জীব, এই উভয় জীবই যখন এক অর্থাৎ অভিন্ন, তখন একটী মাত্র ক্ষুদ্র বা ব্যষ্টি জীবের ইচ্ছানুসারে জগতের যত কিছু ব্যষ্টিজীব সকলেই সম্মিলিত বা চালিত হয় না কেন? স্থূল কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসমষ্টি লইয়াই হইল মহাজীব। মহাজীবের অঙ্গীভূত একটী মাত্র ক্ষুদ্র-জীবের যদি কোন বিষয়ে ইচ্ছাস্ফূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে নিখিল জীবেরই ত তদ্বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় না কেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! সেই ব্রহ্মই মহাজীবের আত্মা। তিনি সর্ব্বশক্তিশালী। জগতের যাহাতে সুব্যবস্থা সিদ্ধ হয়, কিম্বা 'সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বদা আমি সত্যসঙ্কল্প রহিব' ইত্যাকার ইচ্ছা তাঁহাতে বিদ্যমান। ব্যষ্টি বিভাগের পূর্ব্বে তাঁহার ঐরূপ ইচ্ছা থাকে। তিনি যেমন যেমন ইচ্ছা করেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। তাঁহার ইচ্ছার বিষয়ীভূত সত্যসঙ্কল্প পূর্ব্বে থাকে বলিয়া ব্যষ্টিবিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সমষ্টি জীব বা মহাজীব যে ব্যষ্টিজীব বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আকারে বিভক্ত হয়েন, তাহা সেই সমষ্টি জীব বা মহাজীবস্বরূপ ব্রহ্মেরই ইচ্ছা বা লীলা মাত্র। অনন্তর ব্রহ্মের স্বীয় অংশস্বরূপ ঐ বিভক্ত জীবসমূহের ক্রিয়াপ্রণালী তিনি কল্পনা করিয়া দেন। 'ইহা এইরূপই হইবে' অর্থাৎ যেমন কুম্ভকারের দণ্ড, চক্র ও চক্রভ্রমণাদি দ্বারা ঘটাদির উৎপত্তি হয়, ঈদৃশ ক্রিয়াক্রম বা ক্রিয়া-প্রণালীই জীবসমষ্টি সম্বন্ধে তৎকর্তৃক কল্পিত হয়। উল্লিখিত ক্রিয়াপ্রণালীর অবলম্বন ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি কিছুতেই হইবার নহে। ফল কথা, সমষ্টি জীবের সঙ্কল্পমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি হয় আর যত কিছু ব্যষ্টিজীব, তাহাদের যত্ন, অধ্যবসায় ও ব্যাপার প্রভৃতি দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি ঘটে। ব্যষ্টি জীবের পক্ষে উক্ত নিয়ম সত্ত্বেও স্থলবিশেষে যে তাহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহাতেও মহাজীব বা সমষ্টিজীবের ইচ্ছাই অনুমেয়। অর্থাৎ মুনি ঋষিরা মহাজীবের অংশশক্তি ব্যষ্টিজীব; কোনরূপ ক্রিয়াক্রম বিনাও তাঁহাদের ইচ্ছা ফলবতী হয়। এই যে ইচ্ছা-সাফল্য, ইহাও সেই সমষ্টি জীবেরই ইচ্ছায় ঘটিয়া থাকে। সমষ্টিজীব বা ঈশ্বরের নিয়ম-বহির্ভূত কিছুই হইবার নহে; সুতরাং মুনি ঋষিগণের ইচ্ছামাত্রেই যে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাও ঐশ্বরিক নিয়ম। ফলে, সমষ্টিজীবের শক্তিই ব্যষ্টিজীবের পক্ষে কার্য্যকরী। সমষ্টিজীবশক্তির নিয়মানুষ্ঠান ভিন্ন ইচ্ছা সাফল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমষ্টিজীবের ইচ্ছা যখন ফলসিদ্ধির অনুকূল হয়, তখনই ব্যষ্টি জীবের ফললাভ ঘটে। কেন না, এতৎসমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। এই জন্যই ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছা হইবামাত্রই যে ফলসিদ্ধি হইবে, এ কথা কখনই বলা চলে না।*

রামচন্দ্র! উল্লিখিতরূপে সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মই মহাজীব। তিনিই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে প্রকাশমান। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই। জড়বস্তুর সংসর্গ বা বিষয়ানুভব দ্বারা ব্রহ্ম বা চিৎশক্তিরই জীবভাব প্রাপ্তি ঘটে এবং ঐ জীবই সংসার অনুভব করেন। উক্ত জড়সংসর্গ বা বিষয়ানুভব যখন বিদূরিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনরায় আপনার সমব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তাম্র যেমন রসৌষধাদির যোগে—পাকবিশেষে কিম্বা স্পর্শমণির স্পর্শমাত্রে সুবর্ণভাব ধারণ করে, কনিষ্ঠ জীবেরাও সেইরূপ জ্যেষ্ঠ জীব বা মহাজীবের উপাসনাদি ক্রমে মহাজীবত্ব বা ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। জীবভাব এবং জগদ্ভাব এই উভয় ভাবের পর্য্যালোচনা করিলে কেবল চেতনেরই অপূর্ব্ব লীলা বুঝিতে পারা যায়; পরন্তু তাহাতে কোন পৃথক্ বস্তু লব্ধ হয় না। এই জগৎপ্রপঞ্চ অসৎ হইলেও হৃদয়প্রকাশিত মহাকাশস্বরূপ আত্মায় উহা উক্তরূপে সত্যবৎ উদিত হইতেছে।

* জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, এই তিনটী কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের ধর্ম্ম। সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীব যদি এক হয়, তবে উক্ত শক্তিত্রয়ও তাহাদিগের এক হইয়া পড়ে। রামচন্দ্রকৃত উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, জীবের চৈতন্যাংশ এবং উপাধিরও কোন অংশ এক হইলেও সম্পূর্ণ উপাধির ভেদ আছেই। যিনি জীবসমষ্টি, তিনি কারণ এবং সূক্ষ্ম শরীরশালী। ব্যষ্টি জীব ঐ উভয় শরীরসম্পন্ন হইলেও তাহার অপর

বৎস! উল্লিখিত চেতনের যে স্বভাবসিদ্ধ চমৎকারিতা বা স্ফূর্ত্তি, তাহাই ভাবী নাম ও দেহাদির অবভাস এবং তাহাই অহম্ভাবনা বলিয়া বিদিত। চিৎস্বরূপ রসের আস্বাদনে চিত্ত অনুরক্ত; উঁহা চিন্ময় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুতরাং উহা অনন্ত অথচ চিৎ হইতেই প্রস্ফুটিত। তথাবিধ চিত্তে বা চিদাভাসে এই ভুবনত্রয় প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ জগৎ সংস্কারে সংস্কৃত মায়াতে প্রতিফলিত যে আত্মচৈতন্য, তাহাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুরিত হইতেছে। ঈদৃশ জগৎ স্ফূর্ত্তি অনাদি প্রবাহে চলিতেছে। ঐ চিৎ অব্যয় ও বাস্তব চিৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও তদীয় স্বীয় শক্তির প্রভাবে তিনি পরিণাম ও বিকার প্রভৃতি শব্দে বিভিন্নবৎ প্রতীত হইয়া থাকেন। চিৎ এবং তৎপ্রকাশ্য বিষয়সমূহের যে স্বভাবসিদ্ধ বা স্বতঃসমুত্থিত সম্মিলিত প্রকাশ, তাহাই ভ্রান্তিবশে জগৎরূপে বিরাজিত। চিতের শক্তি অসীম ও আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এই চিৎশক্তিতেই অহম্ভাব দর্শন ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন হইলেও যাহা চিৎশক্তির অন্তরে বারি-তরঙ্গের ন্যায় বিভিন্নাকারে প্রস্ফুরিত হয়, সেই অহম্ভাবমূলক জগদ্ব্রহ্মাণ্ডান্ত যাবতীয় প্রপঞ্চ, ইনি আত্মাতে আত্মা দ্বারা স্বয়ং সন্দর্শন করেন।

রঘুনন্দন! জগৎ বলিয়া একটা পৃথক্ বস্তু কিছুই নাই। চমৎকার-করী চিৎশক্তির স্বয়ং স্বরূপে যে চারু চমৎকারিতা, তাহারই নাম জগৎ। চিতের প্রথম চেত্য অহঙ্কার; ঐ অহঙ্কার কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তন্মাত্রাদিও চিদ্বিবর্ত্ত মাত্র; সুতরাং কল্পনায় দ্বিত্ব একত্ব স্থিতিবিচারের ত কথাই নাই। ফলে, এই অহম্ভাবময় জগৎ একটা কল্পনামাত্র। বাসনা ও কর্ম্মাদি হইল জীবভাবের প্রতি হেতু। ঐ বাসনাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'তুমি, আমি' ইত্যাকার ভেদকল্পনা পরিহার করা কর্ত্তব্য। সমুদায় কল্পনার মধ্যে 'তুমি, আমি' ইত্যাদি কল্পনা পরিত্যাগ করা অতীব কঠিন। যদি ঐ 'তুমি আমি' কল্পনা পরিত্যাগ করা যায়, তখন ত সর্ব্বকল্পনার অভাবে নির্ব্বিকল্প অবস্থা স্থায়ী হয়; সুতরাং তৎকালে সৎ ও অসতের মধ্যে কেবল অপরিচ্ছিন্ন আত্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে। যেমন আকাশে মেঘ উঠিলে,

একটী উপাধি আছে—স্থূল শরীর। এই স্থূল শরীরই ক্রিয়ার আশ্রয়। এই যে উপাধি-ঘটিত তারতম্য, ইহাই বৃত্তিজ্ঞান, ইচ্ছা এবং ফলতারতম্যের কারণ।

আকাশের স্বরূপ অনুভব করা যায় না, মেঘ কাটিয়া গেলে আকাশ আবার পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠে এবং আকাশের অস্তিত্বও আকাশস্বরূপেই অনুভূত হয়; সেইরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চ তিরোহিত হইলে চিৎশক্তির স্বতঃসিদ্ধ সত্তা সমুদিত হইয়া থাকে; এই সত্তা তাঁহা হইতে অভিন্ন। আমরা সত্তা অসত্তা বুঝি না, এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিনি তখন স্বীয় স্বচ্ছস্বরূপে অবস্থিত হয়েন।

মনের চেষ্টারূপ যে সূক্ষ্ম জগৎ, তাহা শূন্যমাত্র। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত স্থূল-দেহ ও দেবনিলয় ব্রহ্মাণ্ডও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে যে সর্ব্বপ্রকার আকারবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা কেবল চিতের চমৎকারিত্ব প্রযুক্তই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ চৈতন্য হইতে কিছুই ভিন্ন নহে। যে পদার্থ যাহা হইতে জন্মে, তাহা হইতে কদাচ তাহা ভিন্ন হইতে পারে না। যে পদার্থের অবয়ব আছে, তৎসম্বন্ধেও যখন ঈদৃশ নিয়ম বর্ত্তমান, তখন যাহার অবয়ব নাই, তাদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আর কথা কি? [কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা দেখাইবার দৃষ্টান্ত স্থলে 'মৃদ্‌ঘট' 'স্বর্ণ কুণ্ডল' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে]

চিৎশক্তির নাম নাই, পরিচ্ছেদ নাই, তিনি স্বতঃপ্রকাশিনী সর্ব্বসাক্ষিণী; তাঁহার যে রূপ, তাহাই জগতের তাত্ত্বিক রূপ। বিশদার্থ এই যে, চিতের নামরূপাদি নিকৃষ্টভাবই চেত্য, সেই চেত্য হইতে জগৎ প্রস্ফুরিত। ফলে, অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ হইতেই এই স্ফুরণরূপী জগতের নাম রূপাদি কল্পিত ও প্রকাশিত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতপঞ্চক, ভূধরনিকর ও দিক্‌সকল ইত্যাদি যতকিছু রচনা, তৎসমস্তই চিৎশক্তি হইতে নিষ্পন্ন। কেন না, এই যে জগৎপ্রপঞ্চ, ইহার স্বরূপ চৈতন্যমাত্রেই পর্য্যবসিত। বৎস! জগৎপ্রপঞ্চকে চিৎশক্তির ধর্ম্মমাত্র বলিয়াই জানিও। জগৎ ছাড়িয়া দিলে চিৎশক্তির চিৎশক্তিত্ব লুপ্ত হয়, উহার বিদ্যমানতা থাকে না। জগদ্ভাব তিরোহিত হইলে জড়পদার্থের যে পরিণাম, তাহারও চিৎশক্তিতে পর্য্যবসান হয় আর যদি তাহা তিরোহিত না হয়, তবেই ভেদজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ঐ ভেদ বাস্তব নহে। অতএব দেখ, কল্পনা ব্যতীত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? চিদ্‌ব্রহ্মের যে বিষয় প্রকটন করিবার শক্তি,

তাহাই জীব ও তদুপাধিভূত তন্মাত্ররূপে প্রতিভাসিত হইয়া জগদাকারে অবস্থান করিতেছে। চিন্তাব বশতঃ চিৎশক্তির যে অহন্তাবরূপে স্বশক্তি-স্ফুরণ হয়, তাহাই স্পন্দনকর্ম্মা প্রাণের সহযোগে জীবশব্দের অভিধেয়। চিৎশক্তি ও চিৎশক্তি-ধর্ম্মের যে পরিস্ফুরণ, তাহা অহন্তাবাদি বিকারে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া জীবাদি সংজ্ঞা হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল ব্যবচ্ছেদ-ধর্ম্ম অলীক বা মিথ্যা বলিয়া বস্তুগত্যা চিৎস্বভাবের কোনই ভেদ নাই। চেতনপ্রধান অহঙ্কার হইল কর্ত্তা আর ক্রিয়াপ্রধান প্রাণ হইল কর্ম্ম। কর্ত্তা ও কর্ম্ম অভিন্ন; কেন না, কর্ম্ম ত কর্ত্তারই ধর্ম্মবিশেষ বৈ আর কি? সুতরাং যাহা কর্ম্ম, তাহাই জীব বা ক্রিয়া। চিৎশক্তির যে সমাবেশ, তাহাই জীবপদের অভিধেয়। এই ক্রিয়াময় জীবই পুরুষের চিত্ত। এই চিত্তই ইন্দ্রিয়াকারে প্রকট হইয়া বিবিধরূপে প্রতীত হয়। বিশদার্থ এই যে, চেতন ও ক্রিয়া এই উভয়ের সম্মিলনে জীবপদার্থ হইলে আপাত-দৃষ্টে জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুইটী অংশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ক্রিয়াংশই চিত্ত পদার্থ নামে নিরূপিত; অতএব জীব হইতে উহা অভিন্ন। এদিকে আবার ইন্দ্রিয় হইল চিত্তের আকার; অতএব ইন্দ্রিয়াদিও জীব হইতে ভিন্ন নহে। পরন্তু জীব ও ব্রহ্ম যে এক—জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এ কথা বারবারই উল্লিখিত হইয়াছে। জীব ও জগতের অবাস্তবত্ব উক্তরূপে বিদিত হওয়া যায় এবং ইহাও ধারণা হয় যে, এই অতিতুচ্ছ অকিঞ্চিৎ কার্য্য-কারণাদি-ভাব-স্বভাব জগৎ চিৎপ্রকাশের ছটা অর্থাৎ প্রান্তস্থ অন্য একরূপ প্রকাশ। অতএব জীব ও জগতের স্বরূপতঃ ভেদ একেবারেই নাই। ঐ প্রকাশ চিদাশ্রিত মায়ারই বিলাস এবং মায়ার অপগমে ঐ চিৎ নির্ব্বিশেষ প্রত্যগাত্মরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাই পরমাত্ম-দর্শন বা ব্রহ্মদর্শন নামে নিরূপিত। এই ব্রহ্ম-দর্শনের ফলে অনর্থ নিবৃত্তি ঘটে।

এই অনর্থনিবৃত্তির অনুভূতি এইরূপে হয়; যথা—আমার ছেদ নাই, ভেদ নাই, ক্লেদ নাই, দহন নাই এবং শোষণ নাই। আমি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির ও অচলবৎ অবস্থিত। অজ্ঞ জীবেরা এই তত্ত্ব বুঝে না; না বুঝিয়া পরস্পর বিবাদ করে। তাহারা নিজেরাই যে কেবল ভ্রান্ত হয়, তাহা

নহে ; অপরকেও ভ্রমে নিপাতিত করে। কিন্তু আমাদের ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে ; এই ব্রহ্মতত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। অজ্ঞদিগের নিকটেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মূর্ত্তিমান্ বলিয়া বোধ হয় এবং অজ্ঞ-দৃষ্টিতেই তাহার বিকারাদি পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তাহা হয় না। জ্ঞানীর চক্ষে দৃশ্যপ্রপঞ্চ সকলই মূর্ত্তিহীন এবং স্বচ্ছ চিদাকাশে সৎ ও অসৎ সকল ভাবের পর্য্যবসান।

চিৎ একটী বৃক্ষরূপে বিভাত। তাহাতে বিষয়াসঙ্গরূপ রসসঞ্চারে বসন্তকান্তির ন্যায় তদীয় অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তির বিকাশ। তাহাতে ঐ চিৎবৃক্ষ আকাশ-বিকাশ-শালিনী কালাদিনাম্নী মঞ্জরীর বিকাশ বিধান করে। চিৎ স্বয়ংই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপে স্ফুরিত। চিৎই অণ্ডজাত্মক বা সূত্রাত্মা বায়ুস্বরূপ। চিৎই অনিখাত-গত বারিস্বরূপ। চিৎই স্বর্ণ-রজতাদি বিচিত্র ধাতুস্বরূপ। চিৎ হইতেই সুরাসুর-নরাদি দেহ নির্ম্মিত। চিৎই বিবিধ বিচিত্র ওষধি প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্নাস্বরূপে সমুদিত। চিৎ স্বয়ম্প্রকাশ-স্বরূপ। যাবতীয় বাহ্য বস্তুর বিলয়েও চিৎ স্বপ্রভাবে সুপ্রকাশ। চিৎ মহাজ্যোতিঃস্বরূপ। চিৎই জড়ভাবে যাবতীয় জড় বস্তুতে সুষুপ্তিভাব উপগত হইয়াছেন। এই চিৎ বিচারশূন্য হইলে প্রাণাদিবিশিষ্ট জীবরূপ পরিগ্রহ করেন এবং বিচারপরায়ণ হইলে স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হয়েন।

ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সত্তা ; পরন্তু স্বরূপতঃ জগতের সত্তা নাই। এই জগৎ চিৎস্বরূপ তেজের ভাস্বর রূপ, চিৎস্বরূপ মহাকাশের কেবল শূন্যভাব, চিৎস্বরূপ মারুতের স্পন্দনশক্তি, চিৎস্বরূপ ঘনান্ধকারের কালিমা, এবং চিৎস্বরূপ দিনকর-কিরণের দিবস-রচনা। অতএব উহা স্বরূপতঃ বা বস্তুগত্যা অসত্য ; পরন্তু অধিষ্ঠান স্বরূপে সত্য। হ্যায়িত্ব বিষয়ে চিৎ ও জগতের ভাব কজ্জল ও তৈলাক্ত দীপশিখার ন্যায়। অর্থাৎ তৈলাক্ত দীপশিখা নিবিয়া গেলে তাহার যেমন কজ্জলরেখা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও সেইরূপ ব্রহ্মমাত্রই বিরাজ করেন। জগৎই— চিৎস্বরূপ অগ্নির উষ্ণতা, চিৎস্বরূপ শঙ্খের শুক্লতা, চিৎস্বরূপ ভূধরের কন্দর, চিৎস্বরূপ সলিলের তারল্য, চিৎস্বরূপ ইক্ষুরসের মাধুর্য্য, চিৎস্বরূপ দুগ্ধের স্নিগ্ধতাব, চিৎস্বরূপ তুষারের শৈত্য, চিৎস্বরূপ দহন-শিখার দাহিকা-

শক্তি এবং চিৎস্বরূপ সর্ষপের তৈল স্বরূপ। জগৎই—চিৎস্বরূপিণী তরঙ্গিণীর তরঙ্গ, চিৎস্বরূপ মধুর মিষ্টতা, চিৎস্বরূপ সুবর্ণের কেয়ূর, চিৎস্বরূপ কুসুমের সৌগন্ধ্য এবং চিৎস্বরূপ লতার প্রান্তভাগের ফল। চিৎসত্তাই জগতের সত্তা; জগৎসত্তা বলিয়া পৃথক্ একটা কিছুই নাই। জগতের যে সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহাই চিৎসত্তার আকার বা স্বরূপ।

মনে কর, আকাশে যেমন নীলিমার প্রতীতি হয়, অথচ তাহা আকাশে নাই; সেইরূপ তুমি-আমি-নগ-নদ-নদী ইত্যাদিরূপে ভুবনত্রয় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় সত্য; কিন্তু তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কেবল আধারের অস্তিত্বে উহা সৎ বলিয়া প্রতীত হয়; সে আধার কে?—চিদ্‌ব্রহ্ম। এখানে কথা উঠিতে পারে, তবে কি জগদসত্তা অন্য কোন একটা বস্তু? তাহাতে এই বলা যায় যে, কল্পিত পদার্থের সত্তা কিম্বা অসত্তা রজ্জু-সর্পের ন্যায় সৎ যে অধিষ্ঠান, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব ভ্রান্ত যে পদার্থ, তাহার সত্তা অসত্তা উভয়ই তুল্য। অনুভবের অর্গলাপার্থ যাহারা 'অবয়ব ও অবয়বি-জাত শব্দার্থকল্পনায় নিরবয়ব ও সাবয়বের সমান সত্তা হইতে পারে না' এইরূপ দোষ দেখাইয়া থাকে, তাহাদিগকে ধিক্কার দি; কেন না তাহাদিগের বুঝা উচিত—তাহাদের যে ঐ শব্দার্থ-কল্পনা, তাহাও শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক বা মিথ্যা। আরও বুঝিতে হয়, এই যে নদ-নদী-শৈল-সাগর-মালিনী মেদিনী, ইহারও যথায় স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সেখানে আবার অবয়বাদি ভ্রমকল্পনার প্রসঙ্গ হইবে কি? স্ফটিকশিলা অন্তরে বাহিরে পূর্ণাকার হইলেও তাহার ভিতরে বাহিরে স্বচ্ছ আকাশ বিরাজমান অথচ ঐ শিলা নানাবিধ পদার্থের প্রতিবিম্বাধিষ্ঠান; এইরূপ চিন্ময়ী মায়াও অন্তরে বাহিরে জড়স্বরূপ হইলেও তাহার বহিরন্তরে চিৎ বিরাজিত; সেই চিৎপ্রতিবিম্ব-সম্বলিত মায়াতেই অখিল অলীক জগৎ প্রতিভাত। পদার্থ-নিবহের মধ্যগত স্থূল আকাশে যখন আকাশজাত বায়ুপ্রভৃতি সাবয়ব প্রপঞ্চ নাই, তখন চিদাকাশে সত্তা, অসত্তা বা তুমিত্ব আমিত্বরূপ মালিন্য আশ্লেষের বিদ্যমানতা অসম্ভব। পল্লব যেমন স্বীয় অভিন্নাত্মভাবে শিরা-রেখাদি ধারণ করে, সেইরূপ ঐ চিৎ জগৎ হইতে এবং জগৎ চিৎ হইতে অভিন্ন হইলেও এই জগৎকে চিৎই স্বভাবতঃ ধারণ করেন। ঐ চিৎই নিখিল কারণপ্রবাহের

আদি কারণ পিতামহ। চিত্তের স্বভাবতঃ কারণ নাই, চিত্তের বা সর্ব্ব-পদার্থেরই স্বরূপাবস্থা ব্রহ্ম। যথায় চিত্তের কারণ নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে চিত্তের স্বরূপাবস্থা আর যেখানে কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় উহার ঔপাধিক অবস্থাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই চিত্ত অর্থাৎ চেত্য অনুভব দ্বারাই বুঝিয়া লইবে। চেত্য যে পদার্থ, তাহার সত্তা বা অসত্তা ব্যবহারতঃ হয় বটে; কিন্তু অচেত্য যে চিৎ, তাহার অসত্তা ব্যবহারতও সিদ্ধ নহে। অর্থাৎ চিৎ নাই এরূপ একটা কথাও অসমীচীন; কেন না, চিৎ বা চৈতন্য অনুভবসিদ্ধ। যাহা আছে, তাহারই উদয় হয়; বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় ইহাই ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

রামচন্দ্র! এই গগনবৎ মহাচিতের অন্তরে যে এই ভেদবিহীন ত্রিভুবন রহিয়াছে, তাহাতে তুমি 'এই সমস্ত দৃশ্যই ব্রহ্মস্বরূপ' অনুভব দ্বারা এইরূপ নিশ্চয়বান্ হও।

মুনিবর বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবা অবসান হইল। সায়ংকাল আসিল। সায়ন্তন বিধি সমাধার জন্য সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। সায়ং স্নান করিবার জন্য সভাসদ্গণ নমস্কারান্তে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বিভাবরীর অবসান হইল। দিনকরের কিরণ-নিকর প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সভাসদ্গণ আবার আসিয়া সভাশোভা সম্পাদন করিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। চিদাকাশ ও আত্মা একই কথা। স্বচ্ছ আকাশে মুক্তা-ভ্রমের ন্যায় নির্ম্মল আত্মাতেই জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে। এই ভুবনত্রয়রূপ কৃত্রিম পুত্তলিকা চিৎস্বরূপ স্তম্ভেতে অনুৎকীর্ণ অবস্থাতেই

রহিয়াছে। ইহার উৎকিরণকর্ত্তা কেহই নাই; সুতরাং ইহা সততই অক্ষোদিত-ভাবে বিদ্যমান। সাগর যেমন স্বীয় স্বাভাবিকতায় প্রস্পন্দিত ও তদীয় তরঙ্গবেগ প্রসৃত হয়, সেইরূপ এই দৃশ্য জগৎও পরব্রহ্মেই প্রতীত হইয়া থাকে। মূঢ়বুদ্ধি মানবেরা এই জগৎকে অতিমহৎ বলিয়া মনে করিলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। পর্ব্বত ও পরমাণুর পার্থক্য যতদূর, চৈতন্য ও চৈতন্যে ভাসমান জগতের পার্থক্যও তদনুরূপ। পরমাণুর ক্ষুদ্রতা এতদুর যে, গবাক্ষ-জাল-পাতিত সৌর করের সাহায্য ভিন্ন তাহা দৃষ্টিগোচর করা যায় না। গবাক্ষ-পথাগত দিনকর-কিরণে ভাসমান পরমাণুগুলি যেমন দিনকর-কিরণ-পাতের অভাবে অবলোকন করা যায় না, সেইরূপ আত্মচৈতন্যে ভাসমান এই জগতের সূক্ষ্মভাব আত্মচৈতন্য ব্যতিরেকে অনুভবগম্য হয় না। ফল কথা, আপন আত্মভ্রান্তিই জগদ্দর্শনের মুল। যদি স্পষ্টতঃ আত্মদর্শন হয়, তবেই জগদ্দর্শনের অবসান ঘটে। এই চিদাকাশরূপী জগৎ পৃথ্বীপ্রভৃতি রূপে অনুভূত হইলেও ইহা স্বপ্নকালীন কল্পনার ন্যায় অলীক। যেমন মরুস্থলী-গত নদীতে সলিল সঞ্চার অসম্ভব, তেমনি এই বিজ্ঞানাকাশরূপী জগতের অবয়বজ্ঞানও কদাপি সম্ভাবিত নহে। অর্থাৎ তাহা ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়। মরুস্থলী-স্থিত নদীপ্রবাহের ন্যায় এই যে সঙ্কল্প-নগরবৎ নিরাকার জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাকে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা যেমন জাগ্রদবস্থায় অসৎ বলিয়া জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ যাঁহারা সদসদ্‌বিচারক্ষম জ্ঞানী পুরুষ, তাঁহারা এই দৃশ্যমান জগৎসম্বন্ধিকে অসৎরূপে বুঝিয়া লইয়া ইহার অস্তিত্ব ব্রহ্ম-স্বরূপের অনতিরিক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। যাহারা অজ্ঞ অবিবেকী পুরুষ, তাহারাই ব্রহ্ম শব্দের সহিত জগৎশব্দের প্রভেদ কল্পনা করে; পরন্তু যাঁহারা বিবেকী, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম ও জগৎ একই। বস্তুগত্যা জগৎ ও ব্রহ্ম শব্দের অর্থে কোনই পার্থক্য নাই। আকাশে সৌরালোকের ন্যায় এবং সূক্ষ্ম মেঘে কল্পনাত্মক মেঘের ন্যায় চিন্ময় ব্রহ্মেই এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। ফল কথা, তত্ত্বদর্শীর নিকট জগদ্দর্শন ও ব্রহ্মদর্শন তুল্য। তাঁহারা দেখেন, এ সকলই সেই ব্রহ্ম। স্বপ্নকালীন দৃষ্ট নগর ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট নগর, এই উভয়

নগরই যেমন তুল্য, সেইরূপ এই দৃশ্য জগৎ ও সঙ্কল্পিত জগৎ উভয়ই সমান। সুতরাং এই জগৎ কেবল চিন্ময় ব্যোম ব্যতীত কিছুই নয়। অতএব জানিও, জগৎ ও মহাকাশ, উভয়ই একপর্য্যায়ক শব্দ। উহারা চিন্ময় ব্রহ্মেরই রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। উল্লিখিত কারণে প্রতিপন্ন হয়, জগদাদি দৃশ্যসমূহের কিছুই উৎপন্ন হয় নাই; উহা অনাখ্য ও অনভিব্যক্ত-ভাবে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিয়াছে।

উল্লিখিতরূপে মায়ারূপ মহাকাশে জগৎ অবস্থান করিতেছে। অথচ চিদাকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহাতে আবৃত হইবার নহেন। এই যে কল্পিত জগৎ, ইহা চিদাকাশের অণুমাত্র আবরণ করিতে অক্ষম। ফলে ইহা আকাশবৎ নির্ম্মল ও নিরাকাররূপে ব্যোমে ব্যোমময় চিত্র ও সঙ্কল্প-কল্পিত নগরের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

রামচন্দ্র! আমি এ সম্বন্ধে তোমার নিকট মণ্ডপোপাখ্যান নামে একটী শ্রুতি-প্রীতিকর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি; তুমি ইহা শ্রবণ কর। এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে মদুপদিষ্ট বিষয়গুলির অর্থ তোমার চিত্তে অসন্দিগ্ধভাবে প্রবিষ্ট হইবে। অন্তরে তুমি শান্তি লাভ করিবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি মদীয় বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত সত্বর সংক্ষেপতঃ সমগ্র মণ্ডপোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন। ঐ উপাখ্যান শুনিলে আমার বোধ বৃদ্ধি হইবে।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! এই মহীপৃষ্ঠে পদ্মনামে এক বিবেকবান্ শ্রীমান্ মহীপতি ছিলেন। তাঁহার বহু পুত্র ছিল। তিনি যশঃসৌরভে স্বকুলের প্রস্ফুটিত পদ্ম, মর্য্যাদা-পালনে অম্ভোধি, শত্রুরূপ তিমিরের ভাস্কর, কান্তারূপিণী কুমুদিনীর চন্দ্রমা, দোষরূপ তৃণচয়ের হুতাশন, সুরসমূহের সুমেরু, ভবাব্ধিমধ্যে যশোরূপ চন্দ্রমা, সদ্গুণরূপ হংসশ্রেণীর সরোবর, কমলরূপিণী কমলাবলীর নির্ম্মল প্রভাকর, সংগ্রামরূপ বল্লীর বায়ু, মনোরূপ মাতঙ্গের কেশরী, সর্ব্ববিদ্যার প্রিয়তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণের আকর, সাগর-মন্থনে সুরাসুর-চালিত মন্দরাচলের ন্যায় অচল অটল ও সহিষ্ণু, বিলাস-রূপ কুসুমরাশির বসন্তকাল, সৌভাগ্যশোভার কুসুমায়ুধ, লীলা-লতিকার

বিলাসবায়ু, সৌজন্য-কুমুদের শশাঙ্ক, দুর্লীলা-বল্লীর অনলস্বরূপ এবং উৎসাহ ও সাহসে কেশব স্বরূপ ছিলেন।

ঐ মহীপতির সহধর্ম্মিণীর নাম ছিল লীলা। লীলা সুভগা, বিলাসিনী ও সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী। মনে হইত, লীলা বুঝি ভূতলাগতা কমলা। লীলা মধুরভাষিণী ছিলেন। সর্ব্বদা পতি ও পরিজনবর্গের প্রিয়াচরণ করিতেন। আনন্দভরে মৃদুমন্দ গমন করিতেন। লীলা যখন হাস্য করিতেন, তখন দ্বিতীয় চন্দ্রোদয় বলিয়া মনে হইত। লীলার বদনপদ্ম অলকারাজিরূপ অলিকুলে আকুল থাকিয়া মনোজ্ঞ শোভা ধারণ করিত। তাঁহার আকৃতি নির্ম্মল ছিল। তিনি কর্ণিকার ন্যায় গৌরাঙ্গী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে একটী জঙ্গমা সরোজিনী বলিয়াই ভ্রম হইত। পুষ্পপ্রবালশোভিনী সুরসিকা লীলা, লতাবিলাসিনী কুন্দকুসুম-হাস-শালিনী মকরন্দময়ী মূর্ত্তিমতী মধুশ্রীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। পুণ্যমূর্ত্তি লীলার দেহকান্তি অতি স্বচ্ছ ছিল। তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও আহ্লাদ জন্মিত; মনে হইত, বুঝি হংসবিলাসিনী মূর্ত্তিমতী গঙ্গাদেবী ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। লীলাকে দেখিয়া তৎকালে সকলেই ভাবিত, বুঝি সর্ব্বজনের আনন্দদাতা ভূতলাগত নিজ পতি কুসুমায়ুধের দীর্ঘ দিন পরিচর্য্যা করিবার জন্যই স্বয়ং রতি দেবী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লীলা পতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন। পতি উদ্বিগ্ন হইলে, তিনি উদ্বিগ্না হইতেন। পতি আনন্দিত হইলে, তিনিও আনন্দিতা হইতেন। পতিকে ব্যাকুল দেখিলে, তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। কিন্তু পতি যখন ক্রোধ করিতেন, তখন তিনি কেবল ভীতা হইয়া তাঁহার অন্তরে শান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। লীলা এইরূপে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! মহারাজ পদ্ম ভূচারিণী অপ্সরার অনুরূপা প্রিয়তমা লীলার সহিত অকৃত্রিম প্রেমরস অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি লীলা সহ ক্রীড়া বিনোদনার্থ কখন উদ্যান, কখন তমালগহন, কখন রম্য রম্য পুষ্পমণ্ডপ, কখন লতানিকুঞ্জ-পুঞ্জ, কখন পুষ্পময় অন্তঃপুর-শয্যা, কখন পুষ্পসম্ভার-বীথি, কখন চির বসন্ত-বিরাজিত উদ্যান-দোলা, কখন ক্রীড়াপুষ্করিণী, কখন চন্দনতরু-মণ্ডিত শৈলতট, কখন সন্তানকাদি তরুতল, কখন কদম্বষণ্ড-মণ্ডিত কৃত্রিম নিকেতন, কখন বিকসিত কুন্দ-মন্দার-কুসুমের মকরন্দ-সুগন্ধী কোকিল-কাকলী-সমাকুল বসন্ত-বনস্থলী, কখন কখন ঈষদুদ্ভাসিত নানা বন-তৃণভূমি, কখন সীকরাসারবর্ষী নির্ঝরদেশ, কখন কখন নানা মণিমাণিক্য-মণ্ডিত বহু বিচিত্র শৈলফলক, কখন দেব ঋষি ও মুনিগণের পুণ্য নিকেতন এবং কখন কখন বা দূরবর্ত্তী অন্যান্য পুণ্যাশ্রমসমূহে বাস করিতেন। তাঁহারা কখন কুমুদ-বন প্রস্ফুটিত হইলে রজনীযোগে এবং কখন বা নলিনীবন ফুটিয়া উঠিলে দিন-মানে ফলকুসুম-শালিনী শ্যামায়মানা বনস্থলীতে থাকিয়া পরস্পর কোমল ও প্রগাঢ় প্রেম রসের উদ্দীপনাময় সুরতাদি নানাবিলাস-হিল্লোলে কাল কাটাইতেন। তাঁহারা উভয়েই দেবসুলভ যৌবনে পরিপূর্ণ। উভয়েই সুন্দরা-কৃতি, সুতরাং সে কালের সকল ব্যবহারই তাঁহাদের সুন্দর। তাঁহারা কখন প্রহেলিকা বা লৌকিক পরিহাস কথায়, কখন প্রাচীনতম ইতিহাসের আলোচনায় এবং কখন বা নাটিকা, আখ্যায়িকা, গূঢ়াশয় ও গুপ্তচতুর্থপদ শ্লোকাদির অনুশীলনায় নিরত রহিতেন। কখন কখন তাঁহারা দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে নগর ও গ্রামোচিত ব্যাবহারের অনুবর্ত্তী হইতেন। কখন কখন বিবিধ মাল্যে মণ্ডিত হইয়া, কখন নানাভরণে ভূষিত হইয়া, কখন বিলাস-বিলোলভাবে গমন করিয়া, কখন বিচিত্র রস ভোজনে ব্যাপৃত রহিয়া এবং কখন বা কুঙ্কুম-কর্পূর-বাসিত আর্দ্র তাম্বূলীদল চর্ব্বণ করিয়া নানা ভোগ সুখে রত থাকিতেন। তাঁহারা পতিপত্নী কখন কখন প্রফুল্ল পুষ্পময়

লতাকুঞ্জে আত্মদেহ গোপন করিতেন, কখন লীলাক্রমে পরস্পর নখাঘাত করিতেন, কখন একে অন্যের অজ্ঞাতে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া স্পর্শ করিতেন, কখন পরস্পর পরস্পারের প্রতি পুষ্পমাল্য ছুড়িয়া ফেলিতেন, কখন গৃহমধ্যে পুষ্প-দোলায় চড়িয়া পরস্পর দোল খাইতেন, কখন নৌকায় চড়িতেন, কখন হস্তীতে অশ্বে ও উষ্ট্রযানে গমনাগমন করিতেন, কখন জল-কেলি করিতে করিতে পরস্পর পরস্পারের প্রতি সলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেন, কখন নৃত্য গীত ও কলাদি ব্যাপারে কাল কাটাইতেন, কখন নিজেরাই সঙ্গীতামোদে মগ্ন হইতেন, কখন নানাবিধ গীতিকথার আলাপ করিতেন, কখন বীণাবেণু ও মুরজাদি-বাদনে আমোদিত হইতেন, কখন উদ্যানভূমিতে, কখন নদীপুলিনগত পাদপতলে, কখন রম্য বীথিকায় এবং কখন কখন বা অন্তঃপুরস্থ রম্য হর্ম্ম্যে ফুল্ল দোলায় আন্দোলিত হইয়া অসীম সুখভোগ অনুভব করিতেন।

এইরূপে সুখ-ভোগ-লালিতা পদ্মরাজের প্রিয়তমা লীলা, একদা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই পতি পৃথিবীর অধীশ্বর, শ্রীমান্ এবং যৌবন-বিলাসে পরিপূর্ণ। ইনি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। ইনি কেমন করিয়া অজর ও অমর থাকিবেন? আমিই বা কিরূপে চিরদিন উন্নতস্তনী ও কান্তিমতী থাকিয়া কুসুম-নিকেতনে শত শত যুগ যাপন করিতে পারিব? যাহা হউক, অধুনা আমি তপ, জপ ও সংযমাদির অনুশীলনে এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে আমার এই প্রাণপতি সুধাংশুবদন রাজা চিরদিন অজর ও অমর থাকিতে পারেন। আমি তপোবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ দ্বিজাতিবর্গকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিব যে, কি উপায়ে মানব-দিগের মরণ না হইতে পারে?

লীলা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজবর্গকে আনয়ন করিলেন এবং যথা-যোগ্য পূজা করিয়া প্রণামান্তে তাঁহাদিগকে বারম্বার জিজ্ঞাসিলেন,—বিপ্র-গণ! আপনারা বলুন, কি উপায়ে অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়?

দ্বিজগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দেবি! তপ, জপ ও সংযমাদির অনুষ্ঠানে সর্ব্বসিদ্ধিই লাভ করা যায়; কিন্তু অমরত্ব কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

লীলা ব্রাহ্মণগণের মুখে এই কথা শুনিয়া ভাবী প্রিয়বিয়োগে শঙ্কিতা হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন, যদি ঘটনাক্রমে স্বামী বর্ত্তমানেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত আমি সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম ; তখন ত আমার পরম সুখই উপস্থিত হইবে। আর যদি সহস্র বর্ষ অতীত হইলেও স্বামী আমার লোকান্তর গমন করেন, তথাপি আমি এমন কার্য্য করিব, যাহাতে আমার স্বামীর জীবন গৃহ হইতে অন্যত্র যাইতে সক্ষম হইবে না। তখন আমার ভর্ত্তার জীবন এই অন্তঃপুরের মণ্ডপেই বিচরণ করিবে। ভর্ত্তা আমায় দেখিতে পাইবেন। আমি নিত্য সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিব। অতএব আমি অদ্য হইতেই আমার স্বামীর অমরত্ব লাভের জন্য জপ, উপবাস ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে চিন্ময়ী সরস্বতী দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।

বরবর্ণিনী লীলা এইরূপ স্থির করিয়া পতিকে এ বিষয় না বলিয়াই নিয়মাবলম্বনে যথাশাস্ত্র তীব্র তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেব, দ্বিজ, গুরু ও পণ্ডিতবর্গের পূজায় তৎপর হইলেন। উপবাসী থাকিয়া প্রতি ত্রিরাত্রের অন্তে চতুর্থ দিবস পারণ করিতে লাগিলেন। স্নান, দান, তপ ও ধ্যানাদিতে নিত্য ব্যাপৃতা হইলেন। যাবতীয় আস্তিক্য-বুদ্ধি ও সদাচারের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। লীলা স্বামীর অজ্ঞাত-সারে এইরূপ নিয়মে থাকিয়াও যথাকালে যথাশাস্ত্র যথাক্রমে স্বামীর সন্তোষ উৎপাদনে উদাসীন ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহার স্বামি-সেবা পূর্ব্ববৎ

সেই নিয়মশালিনী বালা লীলা এইরূপে ত্রিশত রাত্র নিরন্তর কষ্ট-চেষ্টায় তপোনিষ্ঠ হইয়া রহিলেন। অনন্তর শত ত্রিরাত্র অতীত হইল। ভগবতী গৌরী বাগীশ্বরী পূজিত ও প্রতিমানিত হইয়া প্রীত হইলেন। তখন সরস্বতী আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—বৎসে! তোমার এই স্বামি-ভক্তি-সুশোভিত নিরবচ্ছিন্ন তপোনুষ্ঠানে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।

রাজ্ঞী লীলা বলিলেন,—ভগবতি! আপনি জন্ম-জরাদি দাহ-দোষের শান্তিদায়িনী শশিপ্রভা এবং হৃদয়ের অন্ধকার-নিবারিণী রবিপ্রভা। পুনঃ-

পুন আপনার জয় উচ্চারণ করি। হে অম্ব! হে মাতঃ! আপনি ত্রিজগতের জননী। হে শুভদায়িনি! আমি আপনার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তাহা দান করিয়া আপনার এই দীনা কন্যাকে পরিত্রাণ করুন। হে অম্বিকে! আমার প্রার্থিত একটী বর এই যে, আমার স্বামীর দেহাবসানেও তাঁহার জীবন যেন এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে অন্যত্র কুত্রাপি গমন না করে। আর হে মহাদেবি! আপনার নিকট আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা এই যে, আমি যখন যখন আপনাকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিব, যেন সেই সেই কালেই আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি।

জগন্মাতা দেবী সরস্বতী লীলার ঈদৃশ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।—মনে হইল, সাগরের ঊর্ম্মি সাগর হইতে উঠিয়া সাগরেই লয় পাইল।

অনন্তর রাজমহিষী লীলা ইষ্টদেবতার পরিতুষ্টিতে শ্রুত-গীতা হরিণীর ন্যায় আনন্দে আপ্লুতা হইলেন। ক্রমে কালচক্র চলিতে লাগিল। যাহার বলয় হইল—মাস ও পক্ষ, দিবস হইল—শঙ্কু, বর্ষ হইল—দণ্ড এবং ক্ষণ হইল—নাভি, সেই সূর্য্যাদির স্পন্দনময় কালরূপ চক্রের পরিবর্ত্তন ঘটিল। লীলা-পতির আয়ুষ্কালও ফুরাইল। দেখিতে দেখিতে শুষ্কপত্রের রসের ন্যায় লীলা-পতির স্থূলদেহের চেতন, লিঙ্গদেহে অন্তর্হিত হইল। লীলা তখন অন্তঃপুরমণ্ডপে স্বামীর মৃতদেহ পতিত দেখিয়া নির্জ্জল দেশের নলিনীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিম্ববৎ উষ্ণ নিশ্বাসে অধরপল্লব বিবর্ণ হইল। শল্যবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় তিনি তখন প্রায় মরণদশায় উপনীতা হইলেন। দীপশিখার অঙ্কুর ক্ষীণ হইয়া গেলে সুসজ্জিত গৃহশোভা যেমন অন্ধকারে আবৃত হয়, পতির মরণে লীলারও সেই দশা হইল—লীলা শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন। প্রবাহের অভাবে ক্ষারবিবর্ণা স্রোতস্বিনীর ন্যায় বালা লীলা ক্ষণকাল মধ্যেই বিরস-বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃশভাব ধারণ করিলেন। বিয়োগিনী লীলার শোক তখন নানারূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি কখন সহসা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কখন বা হঠাৎ মৌনাবলম্বনে মূক হইয়া রহিলেন; আবার কখন কখন বা মানিনী চক্রবাকীর ন্যায় মরণে কৃতনিশ্চয়া হইতে লাগিলেন।

অনন্তর জলহ্রদের শোষণে শফরী বিহ্বল হইয়া পড়িলে প্রথমপতিত বর্ষণ-ধারা যেমন তাহাকে আপ্যায়িত করে, সেইরূপ অতিমাত্র শোকাতুরা লীলাকে তখন আকাশসম্ভবা দয়াবতী সরস্বতী অনুগৃহীতা করিলেন। অর্থাৎ লীলার প্রতি তৎকালে এক দৈববাণী হইল।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

সরস্বতী লীলাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—বৎসে! তোমার স্বামীর ঐ মৃতদেহ তুমি পুষ্পপুঞ্জে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা কর; পুনরায় তোমার স্বামি-সম্মিলন ঘটিবে। তুমি অচিরেই দেখিবে,—পতির মৃত-দেহোপরি যতগুলি পুষ্প নিক্ষেপ করিবে, তাহার একটীও ম্লান হইবে না। আর তোমার স্বামীর এই মৃতদেহও নষ্ট হইবে না। স্বামী তোমার পুন-র্ব্বার উজ্জীবিত হইয়া অচিরেই ভর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। তোমার পতির আকাশবৎ স্বচ্ছ জীবাত্মা এই অন্তঃপুরস্থ মণ্ডপ হইতে সহসা নির্গত হইয়া অন্যত্র কোথাও যাইবে না।

বিশালনয়না লীলা তৎকালে আকাশবাণী শ্রবণে আশ্বাসিতা হইলেন। তদীয় বন্ধুবর্গও তাঁহাকে আসিয়া সান্ত্বনা দান করিলেন। জলসঙ্গিনী পদ্মিনীর ন্যায় লীলা তখন প্রফুল্ল হইলেন। অনন্তর সেই দৈববাণীর প্রেরণায় তিনি স্বামীর মৃতদেহ পুষ্পপুঞ্জে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন এবং গুপ্তধনের প্রতীক্ষায় কিঞ্চিৎ আশান্বিতা দরিদ্রার ন্যায় দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ দিন অর্দ্ধরাত্রে যখন পরিজনবর্গ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইল, তখন লীলা সেই অন্তঃপুরস্থ মণ্ডপ মধ্যেই দুঃখভরে ধ্যানযুক্ত-মানসে জ্ঞপ্তিরূপিণী ভগবতী সরস্বতী দেবীকে আহ্বান করিলেন। সরস্বতী তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎসে! কেন তুমি

আমাকে স্মরণ করিয়াছ আর কেনই বা এত শোকভার বহন করিতেছ? এই সংসার যে শুধুই ভ্রান্তির বিলাস—মৃগতৃষ্ণিকায় জলের ন্যায় একান্তই মিথ্যা, ইহা কি তুমি জানিতেছ না! লীলা তৎশ্রবণে বলিলেন,—মাতঃ! আমার স্বামী কোথায় আছেন? তিনি কিরূপ অবস্থায় কি করিতেছেন? আমাকে আপনি তাঁহার সমীপে লইয়া চলুন। আমি স্বামী বিনা একাকিনী তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।

সরস্বতী কহিলেন,—অয়ি বরাননে! প্রথম চিত্তাকাশ, দ্বিতীয় চিদাকাশ এবং তৃতীয় আকাশ, এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে চিদাকাশকে প্রথম ও তৃতীয় হইতে শূন্যতর বলিয়া জানিও। অর্থাৎ ঐ চিদাকাশেরই নামান্তর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। বাসনাময় চিত্তাকাশ ও ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ আকাশ বা মহাকাশ, এই উভয় আকাশই চিদাকাশে বিলীন হয়। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সকলই চিদাকাশে হয়। ইহ-পরলোকও চিদাকাশেই জানিবে। তোমার স্বামীর অবস্থানস্থান এক্ষণে সেই চিদাকাশ-কোণেই বিরাজমান। অতএব তুমি তন্ময় হইয়া ঐ চিদাকাশের ভাবনা কর; তাহা হইলেই অচিরে তোমার স্বামীর অবস্থান-স্থান অবলোকন করিতে পারিবে এবং ইচ্ছা হইলে সেখানে গিয়া তুমি সমস্ত তত্ত্ব অনুভব করিতেও সক্ষম হইবে। অয়ি বরবর্ণিনি! নিমেষ কালের মধ্যে চিত্ত, মহাকাশ ভেদ করিয়া দেশ হইতে দূর দেশান্তরে চলিয়া যায়,—যতদূর যায়, তাহাই চিদাকাশ এবং তাহারই নাম সম্বিৎ বা জ্ঞান বলিয়া বিদিত হও। যদি চিত্তের সমস্ত সঙ্কল্প পরিহার করিয়া তুমি চিদাকাশে অবস্থিতি-লাভে সক্ষম হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার সেই সর্ব্বাত্মক পরম পদ প্রাপ্তি ঘটিবে। তত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারে দৃশ্য জগতের আত্যান্তিক অভাব অনুভব হইলে অর্থাৎ দ্বৈত দর্শন ঘুচিয়া গেলেই ঐ পদ লাভ করা যায়, অন্যথা তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অয়ি সুন্দরি! তত্ত্বজ্ঞান অতি দুঃসাধ্য হইলেও আমার বরে তুমি তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! দেবী সরস্বতী এই কথা কহিয়া স্বীয় স্বর্গীয় আবাসে গমন করিলেন। এ দিকে মহিষী লীলাও সরস্বতীর কথায় অবলীলায় নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করিলেন। বিহঙ্গমী যেমন নিজ নীড়

পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়, লীলাদেবীও সেইরূপ নিমেষ মধ্যে আপন অন্তঃকরণ-পঞ্জর-পরিবৃত স্থূলদেহ পরিহার করিয়া চিদাকাশে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন,—সেই স্বীয় ভর্ত্তা পৃথ্বীপতি পদ্ম সেই চিদাকাশ-বাসে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সিংহাসনে সমাসীন। অন্যান্য বহু রাজন্যবর্গে তাঁহার অস্থানমণ্ডপ আবৃত। চারি দিক্ হইতে 'জয়' 'জীব' ইত্যাদি শব্দে সগৌরবে ও সসম্মানে তিনি সংস্তুত হইতেছেন। সমস্ত রাজগণ ও প্রধান প্রধান ভৃত্যবর্গ তাঁহার কার্য্য সম্পাদনার্থ তদীয় আদেশ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছে। তদীয় রাজধানীর সর্ব্বত্র পতাকারাজি বিরাজিত রহিয়াছে। তন্মধ্যস্থ প্রাসাদে তিনি অবস্থিত। রাজপুরীর পূর্ব্বদ্বারে সংখ্যাতীত মুনি ও ব্রহ্মর্ষিগণ অবস্থান করিতেছেন। দক্ষিণদ্বারে অসংখ্য রাজা ও রাজাধিরাজগণ এবং পশ্চিমদ্বারে অসংখ্য মহিলামণ্ডলী অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন উত্তর দ্বার—হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি অসংখ্য যান-বাহনে সমাকুল।

লীলা দেখিতে লাগিলেন, কোন ভৃত্য আসিয়া পৃথ্বীপতি পদ্মের নিকট দক্ষিণাপথের যুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণন করিতেছে, কোন বার্ত্তাবহ আসিয়া কর্ণাটাধিপতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বদেশ আক্রমণের আয়োজনবার্ত্তা বিবৃত করিতেছে; কোন সংবাদবাহক আসিয়া সৌরাষ্ট্রাধিপতি-কৃত উত্তরাপথস্থ ম্লেচ্ছদিগের বশ্যতার বিবরণ ব্যক্ত করিতেছে; এবং কোন কোন সংবাদদাতা আসিয়া মালবাধিপতি কর্ত্তৃক পাশ্চত্য ভূখণ্ডের সমস্ত তঙ্গণদেশ আক্রমণের সংবাদ নিবেদন করিতেছে। লীলা আরও দেখিলেন, দক্ষিণ সাগরের তটভূমি হইতে লঙ্কাদ্বীপের দূত আসিয়া মহারাজের নিকট তত্রত্য সংবাদ বর্ণন করিলেন; পূর্ব্বসাগরের তটবর্ত্তী মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে জনৈক তাপস আসিয়া গঙ্গার সহস্রমুখে বিস্তার প্রভৃতি বিচিত্র বার্ত্তা ব্যক্ত করিলেন। উত্তর সাগরের তটভূমি হইতে প্রত্যাগত জনৈক দূত আসিয়া গুহ্যকগণের অবস্থা বর্ণন করিলেন; পশ্চিম সাগরতীরের জনৈক পরিদর্শক আসিয়া অস্তময় পর্ব্বতের বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। লীলা দেখিলেন, শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য ভূপালবর্গের দেহপ্রভায় রাজপুরীর প্রাঙ্গণ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। যজ্ঞাগারে দ্বিজগণ অত্যুচ্চ বেদধ্বনি করিতেছেন; তাহাতে উৎকট তূর্য্যাদি বাদ্য-

যন্ত্রের নিঃস্বনও পরাভূত হইতেছে। কোথাও বন্দিগণ সোল্লাসে কোলাহল করিতেছে; কোথাও বনকুঞ্জরেরা তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে; কোন কোন স্থান হইতে গীত ও বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইয়া গগনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; হয়, হস্তী ও রথরাজির চলাচলে ধূলিপটল উত্থিত হওয়ায় গগনপ্রাঙ্গণ মেঘাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে; শৈলসন্নিভ রাজপ্রাসাদ পুষ্প, ধূপ ও কর্পূরাদি বিবিধ গন্ধদ্রব্যের গন্ধে আমোদিত হইতেছে; কোথাও ভৃত্যগণ নানাদেশীয় মণ্ডলাধিপতিগণের নিকট হইতে বিবিধ উপঢৌকন আনিয়া গৃহপ্রকোষ্ঠ পূর্ণ করত পদ্ম মহারাজের শাসন পালন করিতেছে; অত্যুচ্চ অতিশুভ্র অম্বরস্পর্শী রাজপ্রাসাদ সকল ধবলতায় মহারাজের যশোরাশিরূপ কর্পূরপূরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং তথাবিরাজিত ধবলিত গগনস্পর্শী স্তম্ভরাজি যেন মহারাজের অখণ্ড প্রতাপরূপে অর্কমণ্ডলকে ধিক্কার দিতেছে; কোন কোন স্থানে অধীনস্থ রাজন্যবর্গ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের জন্য একান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন এবং কোথাও কোথাও সুদক্ষ শিল্পিগণ নানারূপ নগরনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

অনন্তর ব্যোমরূপিণী লীলা অম্বর হইতে পতিত নীহারকণার ন্যায় পদ্ম-মহারাজের সেই মহাড়ম্বরপূর্ণ ব্যোমময়ী সভায় প্রবেশ করিলেন। তিনি ঐ সভামণ্ডপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাকার কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কেননা, তাঁহার দেহ সঙ্কল্পমাত্রে রচিত। ফলতঃ সঙ্কল্পমাত্রে কল্পিত কোন কামিনীকে কোথাও কি কোন পুরুষ নেত্রগোচর করিতে পারে? যেমন অন্যের কল্পনায় কল্পিত কোন নগরী অন্যের নয়নপথে পতিত হয় না, তেমনি সেই লীলা পুরোভাগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেও কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ব্যোমবপু লীলা দেখিলেন,—সেই ভৃত্য, সেই অমাত্য, সেই পারিষৎ, সেই পরিচারক, সেই সভা, সেই সভ্য, সেই রাজ্য, সেই রাজা, সকলই সেই—সকলই প্রাক্তন।—যেন তাঁহার পতি পদ্ম-মহারাজ একরাজধানী হইতে অন্য রাজধানীতে আসিয়া রাজত্ব করিতেছেন। লীলা আরও দেখিলেন,—সেই সেই দেশ, সেই সেই আচার, সেই সেই আচার-সম্পন্ন বালক-

বালিকা ও যুবক-যুবতী, সেই সেই ভূপালসকল, সেই সেই সভাসদ্ পণ্ডিত-মণ্ডলী, সেই সেই রহস্যজ্ঞ বয়স্যবর্গ, সেই সেই ভৃত্য ও আত্মীয়স্বজন; সকলই পূর্ব্বতন, সকলই তথায় বিদ্যমান। লীলা এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অদৃষ্ট-পূর্ব্ব পণ্ডিতবর্গ, পৌরগণ, সুহৃদ্‌গণ ও অন্যান্য অনেক আচার ব্যবহারও তখন প্রত্যক্ষ করিলেন। লীলা আরও দেখিলেন, সেই ত মধ্যাহ্নকাল, সেই ত দাবদগ্ধ দিঙ্মণ্ডলী, সেই ত অন্তরীক্ষ, সেই ত চন্দ্র, সেই ত সূর্য্য, সেই ত মেঘ, সেই ত প্রাক্তন পবন-নিঃস্বন, আর সেই সেই মহীরুহ, সেই সেই নদ-নদী, সেই সেই শৈলাবলী, সেই সেই পুর-পত্তন, সেই সেই নানা নগর, সেই সেই জঙ্গল-জাল এবং সেই সেই প্রাণিসমূহের সমাবেশ; পরন্তু পতি পদ্মরাজ কেবল প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া ষোড়শ বর্ষীয় নব যুবরাজরূপে বিরাজমান।

লীলা সেই সকল প্রাক্তন জনতা ও প্রাক্তন গ্রাম ও জনপদবাসী-দিগকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—তবে কি সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব নগরবাসীরা সকলেই মৃত্যু কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছে? লীলার চিন্তা কিয়ৎকাল এই-রূপই রহিল। পর মুহূর্ত্তেই সরস্বতীর প্রসাদ-জনিত জ্ঞানে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার তিনি পুর্ব্বতন আপন অন্তঃপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। লীলা যখন আসিলেন, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সেই রাত্রিতেই তিনি আবার পুরবাসীদিগকে অবলোকন করিলেন, দেখিলেন,—সকলেই নিদ্রায় আক্রান্ত।

অনন্তর লীলা সুপ্ত সখীগণকে শয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, সখীগণ! আমার বড় কষ্ট হইতেছে; আমাকে তোমরা রাজকীয় সিংহাসন সমীপে লইয়া চল। আমি সেখানে স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া যদি রাজসভাস্থ সভ্যদিগকে দেখিতে পাই, তবেই আমি বাঁচিব; অন্যথা আমার প্রাণপাত সুনিশ্চিত।

লীলা এই কথা কহিলে রাজপরিবারস্থ সকলেই নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ব্যগ্রভাবে লীলার অভীপ্সিত কার্য্য সমাধার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। যষ্টিধারী ভৃত্যবর্গ রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ পৌরগণ ও সভাসদ্‌গণকে আনিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। ভৃত্যগণ যত্ন সহকারে আস্থানমণ্ডপ মার্জ্জিত করিতে

লাগিল। মনে হইল, যেন শরৎকালের বাসরসকল বর্ষাকালের মেঘ-মলিন গগনমণ্ডল পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজভবনের প্রত্যেক প্রাঙ্গণে দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল; অন্ধকাররূপ জলরাশি দীপালোকে পীত হইয়া নিঃশেষিত হইল। তখন রাজভবনের আশ্চর্য্য-কার্য্য দেখিবার জন্যই যেন নক্ষত্রপংক্তি গগনপ্রাঙ্গণে আসিয়া দেখা দিল। যেমন প্রলয়-শুষ্ক সাগর সকল জনসৃষ্টির প্রাক্‌কালে জলবর্ষণে পূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি সেই রাজকীয় চত্বরভূমি তখন জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মন্ত্রিগণ, সামন্ত-গণ এবং উচ্চপদস্থ অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই আসিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। মনে হইল, যেন ত্রৈলোক্যের নবাভ্যুদয়ে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আসিয়া স্ব স্ব বিভিন্ন দিক্ অধিকার করিলেন। তখন কর্পূর-প্রকরের ন্যায় ঘন-হিম-সম শীতল অনিল প্রফুল্ল কুসুমসমূহের আন্দোলনে সুবহু সৌরভ লইয়া মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল। প্রতীহারবর্গ শুভ্র বসন পরিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল; মনে হইল, যেন ঋষ্যমূকের শৈলশিখরে সমুদিত তপনের তাপে তাপিত হইয়া মেঘবৃন্দ আসিয়া হিমবৎপ্রভৃতি পর্ব্বত-পৃষ্ঠ আশ্রয় করিল। প্রলয়ের প্রচণ্ড বাত্যায় বিধ্বস্ত তারকা-নিকরের ন্যায় রাশি রাশি পুষ্পপুঞ্জ স্বীয় শুভ্র প্রভায় তমঃপুঞ্জ পান করিতে করিতে আকাশতল হইতে ভূতলে পতিত হইল। আস্থানমণ্ডপের সর্ব্বত্র ফুল্ল পুষ্পে পূর্ণ হইয়া গেল। মহীপতিগণের অনুচর-সহচরগণ তখন সরোবর-ব্যাপ্ত হংসরাজির ন্যায় সেই স্থান সমাকীর্ণ করিয়া তুলিল। রাজকীয় সিংহাসনের সমীপে একখানি নবনির্ম্মিত স্বর্ণ-খচিত আসন ছিল, রতিপতির চিত্তে রতির ন্যায় অথবা কামার্ত্ত ব্যক্তির অন্তরে শৃঙ্গারচেষ্টার ন্যায় মহিষী লীলা তাহাতে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বতন সর্ব্ব স্বজন-বর্গই রহিয়াছেন। সেই নৃপগণ, সেই গুরুগণ, সেই আর্য্যগণ, সেই সখি-গণ, সেই সভ্যগণ, সেই সুহৃদ্‌গণ, সেই সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ, সকলেই যথাযথ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। লীলা দেবী সকলকেই পূর্ব্ববৎ যথাযথ দেখিতে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, নরপতি ব্যতীত নরপতির রাষ্ট্রীয় জন সকলেই কুশলে জীবিত আছেন।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! 'এইরূপ রাজসভা দেখিয়া আমি আমার দুঃখিত চিত্ত বিনোদন করিতেছি' লীলা আভাসে—ইঙ্গিতে সভাস্থ ভূপালগণকে এই কথা বুঝাইয়া সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তথা হইতে অন্তঃপুরস্থ মণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্পপুঞ্জ-পরিবৃত পতির মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো, কি বিচিত্র মায়া! এই ত মদীয় পুরবাসী মানবেরা বাহিরে অবস্থান করিতেছে; আমি ত অন্তরেও চিদাকাশে পতির ব্যোমদেহ-পার্শ্বে ইহাদিগকে এইরূপই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানেও যেমন তালী, তাল, তমাল ও হিন্তালাদি-তরু-পরিবৃত শৈলমালা অবলোকন করিতেছি, সেখানেও ত এইরূপই সকল দেখিয়া আসিয়াছি। অহো! মায়ার কি অসীম শক্তি! একই পর্ব্বত যেমন দর্পণের অন্তরে বাহিরে উভয়ত্রই অনুভূত হয়, সেইরূপ আন্তরিক চিন্ময়-দর্পণে ও বাহিরে ত এই সৃষ্টি সমানই অনুভব করিতেছি! কিন্তু আমি বুঝিতেছি না, কোন্ সৃষ্টি ভ্রান্তিময় এবং কোন্ সৃষ্টিই বা ভ্রমশূন্য? যাহা হউক, এক্ষণে আমি এ সম্বন্ধে দেবী বাগীশ্বরীর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি; তাহা হইলেই আমার সংশয় নিরাস হইবে।

লীলা এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তৎকালে দেবী সরস্বতীর অর্চ্চনা করিলেন এবং অবিলম্বেই দেখিলেন, ভগবতী বাণী কুমারীরূপিণী হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর লীলা পরম শক্তিশালিনী দেবীকে ভদ্রাসনে উপবেশন করাইয়া তদীয় পুরোভাগে ভূতলে অবস্থানান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লীলা কহিলেন,—দেবি! আপনিই সৃষ্টির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু এই সৃষ্টি-ব্যাপারের চিন্তায় চিন্তায় আমার বড়ই একটা উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। হে পরমেশ্বরি! আমি বিনীতভাবে আপনার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি,

আপনি তাহার উত্তর দানে মদীয় সন্দেহ নিরাস করুন। আপনি এইরূপ করিলেই আমার প্রতি আপনার যে দয়াদৃষ্টি আছে, তাহা নিশ্চয় ফলবতী হইবে। দেবি! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, জগতের আদর্শ অর্থাৎ জগৎ যাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আকাশ হইতেও নির্ম্মল এবং কোটি কোটি যোজন-বিস্তৃত এই দৃশ্য জগৎও তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্র। বেদোদিত মহাবাক্যে তিনিই জ্যোতির্ম্ময়, অকঠিন, সূক্ষ্ম ও সুশীতল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি কাহারও প্রকাশ্য নহেন; কিন্তু তিনিই সকলের প্রকাশক। তাঁহার কোনই আবরণ নাই;—তিনি ভেদ-বর্জ্জিত। তিনি সূক্ষ্মাত্মা,—সকল ব্যবহারেরই অগ্রে অগ্রে তাঁহার পরিস্ফুরণ। দিক্, দেশ, কাল, আকাশ, তাঁহাতেই সকলের প্রকাশ। তিনিই নিয়তি বা পরিণাম-পরম্পরার নির্দ্দেশক। তাঁহাতেই সমস্ত বস্তুজাত প্রতিবিম্বিত এবং তাঁহাতেই পরম পরিণতি প্রাপ্ত। ত্রিজগতের প্রতিবিম্বলক্ষ্মী সেই চিদাদর্শেরই অন্তরে বাহিরে সংস্থিত। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, ঐ উভয়গত প্রতিবিম্বের কোন্‌টী কৃত্রিম এবং কোন্‌টীই বা অকৃত্রিম?

দেবী কহিলেন,—সুন্দরি! সৃষ্টির কৃত্রিম ভাব কি এবং অকৃত্রিম ভাবই বা কিরূপ? তাহা তুমি আমার নিকট যথাযথ প্রকাশ করিয়া বল।

লীলা বলিলেন,—দেবি! এই যে আমি এখানে রহিয়াছি আর আপনি এখানে রহিয়াছেন, ইহাকেই অকৃত্রিম সৃষ্টি বলিয়া জানি। এতদ্ভিন্ন অধুনা আমার পতি যথায় রহিয়াছেন, তাহাই কৃত্রিম সৃষ্টি। আমার এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, তাহা শূন্য এবং দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন।

দেবী কহিলেন,—যাহা অকৃত্রিম সৃষ্টি, তাহা হইতে কৃত্রিম সৃষ্টি জন্মিতে পারে না। কেন না, কারণ হইতে কদাচ তাহার বিসদৃশ কার্য্য জন্মে না।

লীলা বলিলেন,—মাতঃ! কারণ হইতে যে বিসদৃশ কার্য্য জন্মে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একটা দৃষ্টান্ত দেই—ঘটের কারণীভূত মৃৎপিণ্ড জলধারণে অসমর্থ; কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন যে ঘট, সে ত জলধারণের যোগ্য।

দেবী কহিলেন,—লীলা! সহকারী কারণের সহায়তায় যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতে মুখ্য কারণের কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তুমি বল দেখি, তোমার সেই স্বামীর সৃষ্টিব্যাপারে এমন কি একটা কারণবিশেষ আছে, যাহাতে তিনি এখানে একরূপ এবং সেখানে আর একরূপ হইতে পারেন? অয়ি বরাননে! তুমি কি মনে কর, এই বর্ত্তমান সৃষ্টির ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতবর্গ তোমার ভর্ত্তার সৃষ্টির কারণ আর তাহারই ফলে তাঁহার বৈলক্ষণ্য? আর বাস্তবিকই যদি তাহাই হয়, তাহাতেও বৈলক্ষণ্যের কোন কারণ দেখি না। কেন না, সেখানেও যে ভূমণ্ডল ও ভূতভৌতিক, এখানেও ত তাহাই। অতএব জানিও, এই ক্ষিতি-প্রভৃতি পঞ্চভূত তোমার সেই ভর্তৃসৃষ্টির কারণ নহে। তবে যদি তুমি বল যে, এইস্থানে জন্মিয়া তিনি তথায় গিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই ভূমণ্ডলই বা কোথায় আর এখানকার ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতাদি তথায় যায় কি না? ফলে কিন্তু, এরূপ ভূত-গতি অসম্ভব অথচ না যাইলেও সেখানে তদনুরূপ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব জানিতে হইবে, তোমার ভর্ত্তার সৃষ্টিব্যাপারে ভেদপ্রকারক কোনই সহকারী কারণ নাই এবং তাহা নাই বলিয়া ইহাই স্থির বা অনুমান করা উচিত যে, কারণান্তর না থাকিলেও যাহার যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির কাম-কর্ম্ম-বাসনা প্রভৃতিই পর পর সৃষ্টির কারণ। মনঃসন্নিবেশ করিলে এই কারণরহস্য সকলেরই অনুভবগম্য হইতে পারে।

লীলা বলিলেন,—দেবি! এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার স্বামীর এই উভয় সৃষ্টিরই কারণ জন্মান্তরীয় স্মৃতি অর্থাৎ জ্ঞান-সংস্কার। তথাবিধ জ্ঞান-সংস্কারই সেখানে সেরূপে স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন।

দেবী কহিলেন,—লীলা, স্মৃতি বা জ্ঞানসংস্কার আকাশস্বরূপ। সুতরাং তোমার ভর্ত্তার সৃষ্টি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া অনুভূত হইলেও উহা ব্যোমরূপিণী বলিয়াই জানিবে।

লীলা বলিলেন,—দেবি! আপনার কথায় বুঝিলাম, ঐ স্মৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহা আকাশময়। আমার স্বামি-দেহের এখনকার উৎপত্তিও সেইরূপই অর্থাৎ আকাশস্বরূপ। ইহাতে ধারণা হয়, এই দৃশ্যমান সৃষ্টিও

আকাশ বা শূন্যস্বরূপ। এই সৃষ্টি যে আকাশ বা শূন্যাত্মক, আমার স্বামীর ঐ সৃষ্টিই তাহার নিদর্শন।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! তুমি যাহা বুঝিয়াছ, তাহাই সার কথা। আমি দেখিতেছি, তোমার ভর্ত্তার যেমন অসৎ সৃষ্টি, তেমনি এই দৃশ্যমান সমস্ত সৃষ্টিই প্রতিভাত।

লীলা বলিলেন,—দেবি! এই অমূর্ত্ত আকাশস্বরূপ সৃষ্টি হইতে যেরূপে আমার স্বামীর সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে, মদীয় জগদ্‌ভ্রম নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহা বর্ণন করুন।

দেবী কহিলেন,—অয়ি লীলা! যেরূপে পূর্ব্বস্মৃতি হইতেই স্বপ্ন-ভ্রমের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া এই ভ্রমমাত্রস্বরূপ পরসৃষ্টি প্রকাশ পায়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। চিদাকাশের কোন এক অজ্ঞানাবৃত অংশে সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তঃকরণ ভাগে সংসারমণ্ডপ বিরাজিত আছে। ঐ মণ্ডপ আকাশরূপ কাচ-খণ্ডে সমাচ্ছাদিত। উহার স্তম্ভস্থানীয় সুমেরুশৈলে লোকপালগণের অধিষ্ঠান। লোকপালদিগের রমণীরূপিণী শালভঞ্জিকা সকল উহাতে বিরাজমান। তদ্ভিন্ন চতুর্দ্দশ ভুবন ঐ সংসারমণ্ডপের অন্তর্গৃহ। উহার গহ্বর—ত্রিভুবন-বিবর; সূর্য্য—দীপ; প্রাণিগণ—কোণগত বল্মীকরাশি; শৈলকুল—লোষ্ট্রস্বরূপ এবং বহু পুত্রসম্পন্ন প্রাচীনতম প্রজাপতি ঐ মণ্ডপের ব্রাহ্মণ। জীবগণ ঐ মণ্ডপে কোশকার কীটের ন্যায় আপনা হইতে আবদ্ধ। ব্যোমার্দ্ধতল উহার ধূমকালিমা। অন্তরীক্ষবিহারী সিদ্ধসম্প্রদায় ঐ মণ্ডপ-গত ঘুঞ্জুম-নিনাদী মশকশ্রেণী। সংসার-মণ্ডপের কোণদেশ জলদাবলীরূপ ধূমরাশিতে পরিবৃত। বায়ুমার্গ-সমূহ উহার মহাবংশ। সমস্ত বিমানবিহারীরা উহাতে কীট-প্রায়। এই সংসার-মণ্ডপ দেবাসুরাদিরূপ দুরন্ত বালকবৃন্দের কোলাহলে নিরন্তর পরিপূর্ণ। লোকান্তর, নগর কিম্বা গ্রামসমূহ ঐ মণ্ডপের ভাণ্ডস্বরূপ। উহার ভূভাগ সাগররূপ সরোবরের সলিল-সিঞ্চনে সিক্ত। পাতাল, ভূতল ও স্বর্গ-ভাগ উহার ভাস্বর কোটর। ঐ মণ্ডপের কোন এক শূন্যগর্ভ কোটরের কোণদেশে শৈলরূপ লোষ্ট্রের তল ভাগে একটী গিরিগ্রামরূপ ক্ষুদ্র গর্ত্ত বর্ত্তমান।

বৎসে! সেই নদী-নগ-বন-সঙ্কুল দেশে এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি সাগ্নিক, পুত্রবান্, নীরোগ, ধার্ম্মিক ও অতিথি-সেবায় তৎপর। তাঁহার প্রচুরতর পয়স্বিনী গাভী ছিল। কদাচ তিনি রাজভয়ে ভীত ছিলেন না।

অষ্টাদশসর্গ সমাপ্ত॥ ১৮

ঊনবিংশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—লীলা! ঐ যে ব্রাহ্মণের কথা কহিলাম, উনি বিত্ত, বয়স, বেশ, বিদ্যা ও কর্ম্ম—সকল বিষয়েই বশিষ্ঠের সমকক্ষ ছিলেন। বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের পৌরোহিত্য কার্য্যের ভার লইয়া রামচন্দ্রকে শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ কেবল তাহাই করেন নাই। নতুবা তাঁহারও নাম বশিষ্ঠ ছিল। তিনিও ইন্দু-সুন্দরকান্তি অরুন্ধতী নাম্নী ললনার পাণি পীড়ন করেন। এই ব্রাহ্মণবনিতা অরুন্ধতীও বিত্ত, বেশ ও বয়সাদিতে সর্ব্বাংশেই সেই বশিষ্ঠ-বনিতা সুবিখ্যাতা অরুন্ধতীর অনুরূপা। তবে উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, বিখ্যাতা বশিষ্ঠ-বনিতা স্বর্গাকাশে বিরাজিতা আর এই ব্রাহ্মণ-বনিতা অরুন্ধতী ভূম্যাকাশে অবস্থিতা। এই বিলাস-মন্দ-গামিনী চারু-হাসিনী অরুন্ধতীর প্রতি ব্রাহ্মণের অকৃত্রিম প্রেম ছিল। অরুন্ধতী ব্রাহ্মণ-সংসারের সর্ব্বস্ব ছিলেন।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ তথাকার হরিততৃণ-সমাকীর্ণ শৈলসানু দেশে বসিয়া নিম্নদিকে নেত্রপাত করত দেখিলেন, জনৈক রাজা সমগ্র পরিজনবর্গের সহিত মৃগয়া করিবার জন্য যাইতেছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্য-গণের গভীর নির্ঘোষ যেন সুমেরু-শৈলের বক্ষ বিদারণ করিবার জন্যই উত্থিত হইতেছে। রাজকীয় চামর ও পতাকাশ্রেণী যেন লতাবনকে চন্দ্রাংশুময় করিয়া তুলিয়াছে। সমভিব্যাহারী শ্বেতাতপত্র-মণ্ডলে আকাশতল যেন রজত-সৌধে সমাকুল করিয়াছে। অশ্বখুরোৎখাত ধূলিপটলে অম্বরতল

আবৃত হইয়াছে। হস্তিগণের পৃষ্ঠস্থিত আস্তরণগৃহে রবিকর ও বায়ুগতি রোধ করিয়াছে। সেই স্বর্ণ, রজত ও মুক্তাময় মণ্ডপের মধ্যভাগে রাজা সুরক্ষিতরূপে বিরাজ করিতেছেন। সৈন্যগণের মহাকোলাহলে ভূতবর্গ যেন দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়াই দিগ্দিগন্তে ধাবিত হইতেছে। উজ্জ্বল মণিখচিত হেমহার ও কেয়ূরাদি অলঙ্কার-নিকরে নরপতি অতি শোভিত হইতেছেন।

তখন ব্রাহ্মণ, রাজাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—অহো, সর্ব্ব-সৌভাগ্য-শোভিত নৃপত্ব কি রমণীয়! আহা, কত দিনে আমি এইরূপ রাজা হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, পতাকা, ছত্র ও চামরাদি দ্বারা দশদিক্ আচ্ছাদিত করিব? কবে—কত দিনে কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধি গন্ধবহ-হিল্লোলে আমার অন্তঃপুর-বিহারিণী রমণীবৃন্দের সুরত-শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু-রাজি অপনয়ন করিবে? কবে আমি কর্পূর চন্দনাদি দ্বারা পুরকামিনীগণের মুখমণ্ডল এবং যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করত পূর্ণচন্দ্রোদয়ের ন্যায় প্রকাশিত করিব?

সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই অবধি যত দিন জীবিত ছিলেন, নিরন্তর ঐরূপ সঙ্কল্প-কল্পনাতেই কাল কাটাইতে লাগিলেন। অর্থাৎ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম, সমস্তই কামানাতে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ জরা আসিয়া ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিল। হিম-রূপ অশনি-পাতে সলিলস্থ কমলকুলের ন্যায়, জরার আক্রমণে ব্রাহ্মণ দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তদীয় ভার্য্যা অরুন্ধতী অতীব ম্লান হইয়া পড়িলেন। তাহাতে মনে হইল, যেন বসন্ত কালের লতিকা নিদাঘের ভয়ে ভীতা হইয়া ম্লানভাব ধারণ করিল।

অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ-বনিতাও তোমার ন্যায়, অমরত্ব দুর্লভ জানিয়া আমাকে আরাধনা করিয়া এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবি! আমার স্বামীর মরণের পর তাঁহার জীব যেন এই গৃহ হইতে অন্যত্র কুত্রাপি গমন না করে। আমি তখন ব্রহ্মাণপত্নীর প্রার্থনা বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম। পরে ঐ ব্রাহ্মণ কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার জীবাকাশ পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিপুল বাসনা-বলে সেই গৃহাকাশেই রহিল। পূর্ব্বতন অনল্প সঙ্কল্প বশতঃ তিনি সেই আকাশদেশেই অসীম শক্তি-সম্পন্ন রাজা হইলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রভাবে পৃথিবী জিত হইল;

প্রতাপে দেবভূমি আক্রান্ত হইল, এবং কৃপালুতায় পাতালতল পালিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি ত্রিভুবনবিজয়ী রাজা হইলেন। ঐ রাজা অরি-রূপ তরুর প্রলয়-পাবক, কামিনীকুলের কামদেব, বিষয়-বায়ুর সুমেরু, সাধুরূপ সরোজসমূহের সবিতা, সর্ব্বশাস্ত্রের আদর্শ, অর্থিবর্গের কল্পবৃক্ষ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের পাদপীঠ এবং অমৃতাকর নিশাকরের পূর্ণতিথিরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ঐ ব্রাহ্মণ ভৌতিকদেহ পরিহার করত স্বকীয় গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশে চিদাকাশময় দেহ ধারণ করিলে তদীয় বনিতা অরুন্ধতী স্বামীকে শবাকারে পরিণত দেখিয়া শোকভরে অতীব কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় যেন শুষ্ক মাষ-শিম্বীর ন্যায় দ্বিধাভূত হইয়া গেল। তখন তিনিও সেখানে শবীভূত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন এবং আতিবাহিক দেহ ধারণান্তে স্বীয় স্বামীর অনুগমন করিলেন। নদী যেমন অম্বুরাশির অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি তিনিও স্বামীর সমীপে গিয়া শোকশূন্যা হইলেন এবং বাসন্তী লতিকার ন্যায় প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন। আজ আট দিন অতীত হইল, সেই দ্বিজদম্পতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেই গিরিগ্রামে তাঁহাদিগের সেই সেই গৃহ, ধন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই পড়িয়া আছে। দ্বিজদম্পতীর জীব তাঁহাদের উক্ত স্বগ্রামস্থ স্বীয় ভবনের অভ্যন্তরেই স্থূলদেহ পরিহার করিয়া অবস্থান করিতেছে।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! যে ব্রাহ্মণের কথা কহিলাম—যিনি আজ আট দিন হইল রাজত্ব পাইয়াছেন; সেই ব্রাহ্মণই তোমার স্বামী আর তাঁহার যে অরুন্ধতীনাম্নী ভার্য্যার কথা কহিয়াছি, হে অঙ্গনে! তুমিই সেই ভার্য্যা। হরগৌরীর ন্যায় তোমরাই সেই এই দম্পতী ভূতলে জন্মিয়াছিলে,

এক্ষণে চক্রবাক্-মিথুনের ন্যায় বিযুক্তভাবে রাজত্ব করিতেছে। লীলা! পূর্ব্বসৃষ্টি যেরূপে ভ্রমময়, তাহা তোমার নিকট কহিলাম। ভ্রমবশে ব্রহ্মাকাশই জীবস্বারূপ্য গ্রহণ করেন। এই ভ্রম হইতেই চিদাকাশে ভ্রম প্রতিবিম্বিত হয়। আত্মদৃষ্টিতে ইহা অসত্য বা আশ্রয় দৃষ্টিতে সত্য, এ রহস্য যখন স্থির হইয়া যাইবে, তখন আর কিছুই থাকিবার নয়। সুতরাং কেই বা ভ্রমময় আর কেই বা ভ্রম-বিরহিত, ইহা বুঝিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টিই একান্ত অনর্থ বোধ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অর্থাৎ কি ইহলোক, কি পরলোক, সমস্তই ভ্রান্তির বিলাস।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! লীলা বহুক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে সরস্বতীর ঐরূপ মনোজ্ঞ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুমধুর পদ-বিন্যাসে বিনীত ভাবে বলিলেন,—দেবি! আপনার বাক্য আমি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না। এরূপ ঘটনা কিরূপে ঘটিল? কোথায় সেই ব্রাহ্মণের জীব তদীয় ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে নিবদ্ধ, আর আমরাই বা কোথায় আজ এই বিস্তৃত দেশে বিরাজিত। বিশেষতঃ আমি সমাধি-যোগে যে ভর্তৃরাজ্য দেখিয়া আসিয়াছি, যেখানে থাকিয়া আমার স্বামী রাজত্ব করিতেছেন, তাদৃশ লোকান্তর, তথাবিধ ভূমি এবং সেই সেই শৈলরাজি ও দিঙ্মণ্ডলের সন্নিবেশ, ঐ ক্ষুদ্রায়তন ব্রাহ্মণভবনে কেমন করিয়া সম্ভাবিত হইবে? সর্ষপের অভ্যন্তরে কি মত্ত ঐরাবতকে বাঁধিয়া রাখা যায়? ক্ষুদ্র কোটরের ভিতর মশকের সহিত মহাসিংহের যুদ্ধ কি কখন সম্ভব? ভৃঙ্গ-শাবক কি কখন পদ্মচক্রস্থিত সুমেরু শৈলকে গলাধঃকরণ করিতে পারে? আর স্বপ্নে মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া ময়ুরেরা কি কদাচ নৃত্য-ব্যাপারে লিপ্ত হয়? ফলতঃ উল্লিখিত সকল কথাই যেমন অসম্ভব ও অদ্ভুত, হে সর্ব্বেশি! এইরূপে ঐ ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র গৃহমধ্যেও পৃথ্বী ও শৈলাদির সামঞ্জস্য একান্তই অযুক্ত ও অসম্ভব। অতএব হে দেবেশি! আপনি আমাকে অমল ও অসংশয় বুদ্ধি-জনক বাক্যে উপদেশ করুন। দেখুন, উদারচেতা ব্যক্তিরা অনুগ্রহযোগ্য ব্যক্তির অযথা প্রশ্নেও কদাচ বিরক্ত হয়েন না।

সরস্বতী দেবী কহিলেন,—সুন্দরি! আমি এ সম্বন্ধে কিছুই মিথ্যা বলি নাই। যাহা হউক, পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা নিয়তি

বা নিয়ম লঙ্ঘন কদাচ করি না। 'মিথ্যা কথা কহিতে নাই' এরূপ নিয়ম ত আমরাই স্থাপন করিয়াছি। ঐ নিয়ম অন্যে লঙ্ঘন করিলে আমরাই তাহা আবার স্থাপন করি; সুতরাং আমাদের দ্বারাই সে নিয়মের ব্যত্যয় হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ আমরা যদি সেই সত্য মর্য্যাদা নষ্ট করি, তবে অন্যে তাহা পালন করিবে কেন? অয়ি লীলা! গিরিগ্রামস্থ সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মা আকাশরূপে গৃহাকাশে থাকিয়া পূর্ব্ব সংসার বা পূর্ব্ব জন্মাদি ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি রাজবাসনায় উপহিত—চিদ্ব্যোমাত্মায় তথাবিধ ব্যোমরূপ মহারাজ্য সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাইতেছেন। স্বপ্নাবস্থায় যেমন জাগ্রদবস্থার স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ মরণ হইলে পূর্ব্ব সংসারের স্মৃতি আর কিছুই থাকে না; সুতরাং তোমরাও যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদম্পতী ছিলে, অধুনা তোমাদের তাহা স্মরণ হইতেছে না। স্বপ্নে ও সঙ্কল্পে ত্রিভুবন দর্শন এবং মরুস্থলীতে জল অবলোকন যেমন, সেই গৃহাকাশে গৃহাকাশস্থ ব্রাহ্মণের সশৈল-বন-পত্তনা পৃথ্বী-দর্শনও সেইরূপ। অতি ক্ষুদ্র আদর্শে অতি বৃহৎ বস্তু এবং অতি সূক্ষ্ম অন্তঃকরণে অতি বড় একটা বৃহৎ জগদ্দর্শন যেমন মিথ্যা, অর্থাৎ উহা মাত্র স্বচ্ছতার প্রতিফলন ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ তথাকার পৃথ্বীপ্রভৃতিকেও সেই সত্যস্বরূপ চিদ্ব্যোমের প্রতিফলন ব্যতীত অপর কিছুই বলা যায় না। অতএব এইরূপে উহার রহস্যজ্ঞ হইতে হইবে যে, সুবিমল ব্যোমাকৃতি পরমাত্মার অভ্যন্তরে সমগ্র অসত্য সৃষ্টি সত্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হয়, এবং এই যে জগৎ, ইহাকে যে সত্য বলিয়া ধারণা জন্মে, সে সত্যতা চিদাত্মার—উহা জগতের নহে। পঞ্চ কোষের অন্তর্ব্বর্ত্তী চিদাত্মার যে সত্যতা, তদারোপিত জগতে তাহাই মাত্র প্রতি-ফলিত হয়। দেখ, মরীচিকানদীর তরঙ্গ সৎ নহে, এইরূপ স্মৃতি অসত্য, তাহা হইতে উৎপন্ন যে পৃথ্বীপ্রভৃতি, তাহাও সৎ হইতে পারে না। এই ত তোমার গৃহ এবং গৃহাকাশের মধ্যে এই যে তুমি, আমি ও অন্যান্য যত কিছু বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে, এতৎসমস্তই সেই চিদ্ব্যোম। চিদাকাশ ব্যতীত—এতৎসকলকে আর কিছুই বলা যায় না। অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তু বোধের পক্ষে দীপ যেমন প্রধান কারণ, তেমনি জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞানের প্রতি স্বপ্ন, সম্ভ্রম, সঙ্কল্প ও স্বানুভূতি প্রভৃতিই প্রবল প্রমাণ। পদ্ম-

পুষ্পের একদেশ-স্থিত ভ্রমরের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণের জীব ব্রাহ্মণের গৃহাভ্যন্তরে চিদাকাশেই অবস্থান করিতেছে। বন-সাগর-শালিনী পৃথিবীও তথায় অবস্থিত। ভ্রমবশতঃ অম্বরতলে নীলকুঞ্চিত কেশদামের অস্তিত্বের ন্যায় সেই আকাশের কোন এক কোণদেশেই এই নগর-দেহাদি সর্ব্বপদার্থই বর্ত্তমান। অয়ি বৎসে! বুঝিয়া দেখ, ত্রসরেণুর অভ্যন্তরে যখন জগদ্বৃন্দ বিরাজ করিতে পারে, তখন সেই এই ব্রাহ্মণের ভবনাকাশে তাদৃশ নগরাদি থাকিবার অসম্ভাবনা কি? ফলে প্রতি চিন্ময় পরমাণুর অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় মনের অন্তরে অন্তরে যখন অনন্ত জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তখন ইহাতে আর তোমার আশঙ্কার বিষয় কি?

লীলা কহিলেন,—পরমেশি! অদ্য অষ্টম দিন হইল, সেই ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ত এখানে বহুবর্ষ বাস করিতেছি। হে মাতঃ! তবে ঐ কথা সম্ভব হইবে কিরূপে?

দেবী কহিলেন,—বৎসে! দেশের দীর্ঘত্ব বা হ্রস্বত্ব নাই। এইরূপ কালেরও দীর্ঘতা বা অল্পতা নাই। আমি ইহা যথান্যায়ে কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে জগৎসৃষ্টি, ইহা কেবল জ্ঞানের একটা প্রতিভাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এইরূপ ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত কালই বোধ-প্রতিভাস মাত্র। অর্থাৎ মাত্র ভ্রান্তিবশেই দেশ, কাল ও দেশ-কালের হ্রাস-দৈর্ঘ্য অনুভূত হয়। স্বপ্নকালে অল্পক্ষণও বহুশত বর্ষ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। এইরূপ যখন ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন অল্পক্ষণও দীর্ঘকাল বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। ক্ষণাদি কল্পান্ত কাল, নিখিল জগৎ এবং তথাগত তুমি ও আমি, এ সকলই একটা আত্মোৎপন্ন প্রতিভাস বা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। যেরূপে উহা সংঘটিত হয়, এক্ষণে আমি যথাযথভাবে সে ক্রম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।—

হে সুব্রতে! জীব ক্ষণমাত্র মিথ্যা মরণ-মোহ অনুভব করিয়াই প্রাক্তন সংস্কার ভুলিয়া যায় এবং অন্য এক প্রকার সংসার ভাব অনুভব করে। তখন ঐ চিদাকাশে চিদাকাশরূপী জীব পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কারাদির উন্মেষণ হেতু এইরূপ বিবেচনা করিতে থাকে যে, এই আমি আধেয়,—এই আধারে অবস্থান করিতেছি। এই যে হস্তপদাদি-সম্পন্ন দেহ, ইহা

আমারই বটে। আমি এই পিতার পুত্র হইয়া এত বর্ষ যাপন করিলাম। এই আমার স্নিগ্ধ বন্ধুবর্গ, এই আমার রম্য নিকেতন। আমি জন্মিয়াছি, জন্মিবার পর বালক ছিলাম ; তৎপরে ঈদৃশ বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছি। এই ত আমার সেই সকল বন্ধুবান্ধবেরা পূর্ব্বের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। লীলা! দেহভাবাপন্ন চিত্ত ও আত্মাকাশের এক মাত্র বলবৎ অধ্যাসবশেই ঐ সকল বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও আপনার বলিয়া প্রতিভাত হয়। চিদাকাশের প্রভাব হেতু আপনাতেই উল্লিখিতরূপ ভ্রম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ, পরলোকাবস্থাতেও সেইরূপই ঘটিয়া থাকে ; এই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমস্তই সেই চিৎ। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে ঐ সকল কিছুই নহে ; কেবল নির্ম্মল ব্যোম মাত্র। সেই একমাত্র সর্ব্ব-গামিনী চিৎশক্তিই স্বপ্নাবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ চিৎ স্বপ্নে যেমন সমুদিত হয়েন, পরলোকেও সেইরূপ সমুদিত হয়েন। আবার পরলোকে যেমন, ইহলোকেও সেইরূপই সমু-দিত হইয়া থাকেন। জল, বীচি ও তরঙ্গ এই তিনের যেমন প্রভেদ নাই, ইহলোক, পরলোক ও স্বপ্নলোক এই তিনেরও তেমনি ভেদসম্ভাবনা নাই। ভ্রান্তি বশেই ইহাদের প্রভেদ বোধ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। জগদ্ভাব—ভ্রান্তি বিশেষের একটা ক্রীড়ামাত্র ; সুতরাং উহার অস্তিত্ব নাই। অস্তিত্ব নাই বলিয়াই উহা অজাত এবং অজাত বলিয়াই অবিনাশী। এইরূপে সমস্তই স্বরূপতঃ চিৎ। চিদ্ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। চিৎ সর্ব্বাবস্থাতেই আকাশ-স্বরূপ। এই জন্যই চিত্তের সহিত ব্যোমরূপ মনের অভিন্নতা।

বৎসে! সমস্ত দৃশ্যই দ্রষ্টাতে আরোপিতরূপে অবস্থিত। উহা-দিগের সৎস্বরূপ্য নাই ; সুতরাং আরোপিত দৃশ্যে চিদাকাশেরও বিকৃতি ঘটে না। যেমন জল হইতে তরঙ্গ অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ আরোপিত সৃষ্টিকেও চিদাকাশের অতিরিক্ত বলা যায় না। যেমন জল ভিন্ন তরঙ্গ নাই—'জল ভিন্ন তরঙ্গ' এই কথাটাই যেমন নিত্য মিথ্যা, তেমনি চিদাকাশ হইতে ভিন্ন সৃষ্টি নাই,—'সৃষ্টি চিদাকাশ ভিন্ন' এই কথাটাই একান্ত অসত্য। ফলতঃ একমাত্র চিদাকাশই আপনার প্রভাবে জগদাকারে পরিস্ফুরিত বলিয়া প্রতীত হয়েন। এই কারণেই বারম্বার বলিয়া আসিতেছি, পরমার্থতঃ

দৃশ্য পদার্থ একটা কিছুই নাই; সুতরাং দ্রষ্টৃ ও দৃশ্য বোধও যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। মৃত্যুরূপ মোহের পর নিমেষ মধ্যে জীবের দেশ, কাল, আরম্ভ, উৎপত্তি, বয়স ও জ্ঞান প্রভৃতি সংসারে যাবতীয় দৃশ্যশ্রী প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই দৃশ্যশ্রীর প্রকাশ জীবের পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে জীব যেরূপ দেশ, যেরূপ কাল, যেরূপ আরম্ভ ও যেরূপ ক্রমে জগৎ দর্শন করিয়াছিল এবং পূর্ব্বে জনক, জননী, আত্মীয়, বন্ধু, ভৃত্য, জ্ঞান, স্থান, বয়স, চেষ্টা, ক্ষয়, উদয় প্রভৃতি যেমন যেমন হইয়াছিল, চিদ্বপু অবস্থায় জীব ঐ সকল সেই সেইরূপই অনুভব করিতে থাকে। আমি জন্মিয়াছি, এই আমার মাতা-পিতা, আমি বালক, ইত্যাদি বোধ জীবের পূর্ব্বস্মৃতি বশেই ঘটিয়া থাকে। অনুভূত বা অননুভূত যে স্মৃতিময় ক্রম, তাহা যখন পুষ্প হইতে ফলের উদ্ভবের ন্যায় পশ্চাৎ আসিয়া সমুদিত হয়, তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র যেমন একরাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বোধ করিয়াছিলেন এবং প্রিয়াবিরহী পুরুষেরা যেমন এক দিনকে এক বর্ষ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ সেই জীবের নিকট এক নিমেষ-পরিমিত কাল একটা কল্প বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। অভুক্ত ব্যক্তির কখন কখন ভোজন ভ্রম এবং ভুক্ত ব্যক্তির যেমন অভোজন ভ্রম হয়, তেমনি ঐ জীবের তখন আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা মাতা, ইত্যাকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে [ভোজন ও অভোজন ইত্যাদি ভ্রম মুগ্ধ জনেই দৃষ্ট হয়]। তৎকালে শূন্যময় স্থান জনমানব-সঙ্কুল, বিঘ্ন-বিপদ উৎসবামোদময় এবং বঞ্চনা-প্রতারণা লাভ-লভ্য বলিয়া জ্ঞান জন্মে। মরীচ-বীজকণার অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণতা এবং স্তম্ভ মধ্যে অনুৎকীর্ণ পুত্তলিকা, এই উভয়ের ন্যায় ভ্রমপরিপূর্ণ সমস্ত দৃশ্যই সেই জন্ম-বর্জ্জিত শাশ্বত পুরুষে অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু সে সকলের পৃথক্ সত্তা নাই। সে সমস্তই ব্রহ্মের স্বাশ্রিত ও স্বীয় অজ্ঞানের বিলাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

সরস্বতী কহিলেন,—বৎসে। নয়নদ্বয় উন্মীলন করিবামাত্র যেমন নানাবিধ রূপ অবলোকন করা যায়, তেমনি জীবের মরণ-মোহের পরক্ষণেই অনন্ত জগৎ প্রতিভাত হয়। তদীয় চিদাত্মায় তখন দিক্, দেশ, কাল, আকাশ, ধর্ম্মকর্ম্মময়ী সৃষ্টি ও কল্পান্তস্থায়ী অনন্ত বস্তুনিচয় পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। জীব যাহা কখন অনুভব করে নাই ও যাহা কখন দেখে নাই, তৎসমস্ত আমি করিয়াছি বলিয়া স্বপ্নে স্বীয় মরণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ জীবের স্মৃতি-পথে সমুদিত হয়। এই অনন্ত ভ্রান্তিই কল্পনা-কলিত ভিত্তিবিহীন নগরীর ন্যায় মায়াকাশে বিকাশ পায়। তৎকালে পূর্ব্বস্মৃতিই 'এই জগৎ, এই সৃষ্টি, ইহা দূর, ইহা নিকট, ইহা ক্ষণ, ইহা কল্প, ইহা মাস পক্ষ ও বৎসর' এবম্বিধ ভ্রমরূপে পরিণত হইয়া পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। অনুভূত ও অননুভূত এই দ্বিবিধ স্মৃতিই চিৎস্বরূপে অবস্থিত ও চিৎস্বরূপে প্রবর্ত্তিত। যাহা কস্মিন্ কালেও অনুভূত হয় নাই, তাহাতেও অনুভূতের ন্যায় ভ্রম জন্মিতে দেখা যায়। এ স্থলে স্বপ্ন-ভ্রমাদি অথবা অপর কাহাকেও পিতার ন্যায় দেখিয়া পিতৃস্মরণ হওয়াই দৃষ্টান্ত।

এই যে সঙ্কল্পরূপ সংসার, ইহা সৃষ্টি সময়েও প্রজাপতির কল্পনারূপেই ছিল। তৎপরে উহাই স্থূলাকারে পরিণত হইয়া বিভক্তরূপে প্রকাশ পায়। হে কৃশাঙ্গি! এই যে ত্রিভুবনাদি দৃশ্যবর্গ রহিয়াছে, ইহা কাহারও স্মৃতিতে অনুভূত এবং কাহারও বা স্মৃতিতে অননুভূত আকারে অবস্থান করে এবং কাহার কাহারও বা স্মৃতি কিম্বা সংস্কার বিনাই কাকতালীয় ন্যায়ে অনুভূত হইয়া থাকে। ফল কথা, যে পদার্থ অনুভূতপূর্ব্ব, তাহাই স্মৃতির আকারে প্রতিভাত হইবে, পরন্তু যাহা অনুভূত নয়, তাহাও যে দেখা যাইবে না, এমন কোন একটা নিয়ম নাই। যিনি প্রজাপতি, তাঁহার আপন প্রজাপতিত্ব পূর্ব্বে কখন অনুভূত হয় নাই অথচ যখন সৃষ্টির উপক্রম হয়, তৎসমকালে তিনি স্বীয় প্রজাপতিত্ব অনুভব করেন।

লীলা! এই যে বাসনাময় অলীক সংসার, ইহার যে একান্ত বিস্মৃতি,

তাহাই মোক্ষনামে অভিহিত। সুতরাং এই সংসারে কোন ব্যক্তিরই কোন পারমার্থিক প্রার্থনীয় বা অপ্রার্থনীয় কিছুই নাই। সংসার নাই, ছিল না এবং থাকিবেও না, এই প্রকার জ্ঞানের অভ্যাসবশেই ইহার আত্যন্তিক বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে। অহংজ্ঞান এবং দৃশ্যজগৎ, এই উভয়ের প্রতিষ্ঠার মূল অবিদ্যা; অতএব সেই অবিদ্যা বা আত্মবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানের একান্ততঃ উচ্ছেদ ব্যতীত এই নিত্যসিদ্ধ মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই। সর্প শব্দ এবং সর্প শব্দের অর্থ যতক্ষণ পর্য্যন্ত রজ্জুতে ভ্রমরূপে থাকিবে, ততক্ষণের মধ্যে সর্পভয় শান্ত হয় না। এইরূপে এই সংসার এককালে বিস্মৃত না হইলে মুক্তিলাভ একান্ত পক্ষে অসম্ভব। যোগাদি দ্বারা যে শান্তি লাভ হয়, তাহাকে প্রকৃত বা পূর্ণ শান্তি বলা চলে না; কেন না মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি যেমন এক পিশাচের পর অপর পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সেইরূপ সমাধি হইতে উত্থিত হইলে যোগী জনেরও পুনরায় সংসার-ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান-যোগের সহায়তায় কদাচ ঐরূপ ঘটে না; অতএব তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র সোপান। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবামাত্র ধারণা হয়,—এ সংসার পরমপদের বিবর্ত্ত-মাত্র। এই অসীম সংসার-বিকাশ সমস্তই সেই পরব্রহ্ম। সংসারের উপাদান—অজ্ঞানের উচ্ছেদ ঘটিলেই এইরূপ নিশ্চয় হয়।

লীলা বলিলেন,—দেবি! আপনার কথায় বুঝিলাম, প্রাক্তন সংস্কারই সমস্ত সৃষ্টির কারণ। কিন্তু অধুনা যে ব্রাহ্মণদম্পতীর সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার কোথা হইতে আসিল? কৈ আমি ত ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ সৃষ্টি আর কখন অনুভব করি নাই?

দেবী কহিলেন,—লীলা! মরণ-মোহের অবসানে জীবের যে দৃশ্য-দর্শন ঘটে, ঐ দৃশ্য দর্শনের প্রতি জীবের যে কেবল পূর্ব্বসংস্কারই কারণ হয়, এরূপ নহে। সৃষ্টিকর্ত্তার স্মৃতিও তাহাতে কারণ হইয়া থাকে পরন্তু পূর্ব্বকল্পীয় ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় তদীয় পূর্ব্ব সৃষ্টির স্মৃতি পরকল্পীয় সৃষ্টির প্রতি কারণ হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে, যে মায়ায় পূর্ব্বকল্পীয় ব্রহ্মার দেহপ্রভৃতি আবৃত ছিল, তথাবিধ মায়ার প্রভাব বশতঃই সোপহিত চৈতন্য অভিনব পদ্মজন্মা ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়েন। এইরূপে

এক প্রজাপতি হইতে অপর প্রজাপতির আবির্ভাব হয়। তদীয় দৃষ্টিতে তাঁহার ও সৃষ্টির সত্যতা পরিস্ফুরিত হয় না। 'আমি প্রজাপতি ছিলাম' এইটুকুমাত্র প্রতিভা তাঁহার থাকে। কিন্তু এতন্মধ্যে কাহারও কাক-তালীয়বৎ যাবতীয় স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার বিকাশ হয়। এইরূপে সমস্ত সৃষ্টি মিথ্যাভাবেই চৈতন্যাকাশে সমুদিত ও দৃষ্ট হয়। পরন্তু সত্য-স্বরূপে কখন কোন কিছুই হয় না। পূর্ব্বানুভব-জনিত সংস্কারসম্ভবা স্মৃতি আর অনির্ব্বচনীয় অনাদি ব্রহ্মার অবিদ্যাশক্তি-নামিকা মূল বাসনা, এই উভয়ের কারণ একমাত্র মায়াময় মহাচৈতন্য বা পরব্রহ্ম। অর্থাৎ স্থূল কথা এই যে, পূর্ব্বানুভব হইতে যে সংস্কার জন্মে, তদীয় প্রভাবে পূর্ব্বতন সদৃশ দর্শন ঘটে আর মূল মায়ার মাহাত্ম্যে ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দম্পতীরূপ সৃষ্টি যে তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বানুভব-জনিত সংস্কারমূলক, এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। ঐ সৃষ্টিদর্শন ভবদীয় আত্মাশ্রিত মূল অজ্ঞানেরই প্রভাব বলিতে হইবে। মূলে যদি আত্মভ্রান্তি থাকে, তাহা হইলে যে কত শত শত অননুভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বস্তু নেত্রপথে পতিত হয়, তাহার কি একটা সীমা আছে?

লীলা! উল্লিখিত পরব্রহ্মই কার্য্য এবং কারণের স্বারূপ্য আশ্রয় করিয়া চিদাকাশে বিরাজ করিতেছেন। এই কার্য্য, এই কারণ, এরূপ ভাব মায়ান্বিত ব্রহ্মেই বিরাজমান। বিশুদ্ধ ব্রহ্মে এ ভাবের সম্পর্ক নাই। তাহাতে সকল কল্পনার অভাব অবলোকিত হয়। অবিচারময়ী মায়ার তিরোধানে কার্য্য, কারণ ও সহকারী কারণ সকলই এক হইয়া যায়। কার্য্য-কারণের অভেদ বোধ ব্যতীত শান্তি হইবার উপায়ান্তর নাই। লীলা! তুমি পূর্ব্বস্মৃতিকেই মহাচিৎরূপে জানিও। কার্য্য-কারণতা শব্দ তাহাতেই; পরন্তু তাহা নামমাত্রে;—বস্তু-গত্যা নাই। এই কারণে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এখনও কহিতেছি, এই জগদাদি যে কিছু দৃশ্য, ইহার কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। কেবল পরমাত্মস্বরূপ চিদাকাশেই চিদাকাশ বিরাজিত। অন্য কিছুই নাই।

লীলা বলিলেন,— দেবি! আপনার প্রসাদে আমার অত্যাশ্চর্য্য দিব্য দৃষ্টি প্রকাশ পাইল। প্রভাতে সৌরালোকের সাহায্যে স্থূল চক্ষু

যেমন বহির্জগৎ দেখিতে পায়, তেমনি আমি পরম জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া সকলই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু হে দেবি! অভ্যাস ব্যতীত যাবৎ আমার এই জ্ঞানদৃষ্টি সুদৃঢ় না হয়, তাবৎ আপনি আমার এই একটা উৎকণ্ঠা অপনয়ন করিয়া দিন। অধুনা আমি সেই ব্রাহ্মণদম্পতীকে দেখিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব সেই ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক যথায় অবস্থান করিতেছেন, আপনি আমাকে সেই গিরিগ্রামে লইয়া চলুন। আমি তাঁহাদের সেই সৃষ্টি—সেই বাসভূমি দেখিব।

দেবী কহিলেন,—লীলা! অগ্রে তুমি সমাধিযোগে এই স্থূলদেহ বিস্মৃত হইয়া অহম্ভাবনাহীন চিদ্রূপময়ী পবিত্র দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মল হও। এইরূপ হইতে পারিলে, কল্পনাবলে মর্ত্ত্যস্থ জীবের অন্তরীক্ষে নগর দর্শনের ন্যায় তুমিও চিদাকাশস্থ ব্যোমাত্মস্বরূপ সৃষ্টি দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ হইলে তখন তুমি আমি উভয়েই আমরা সেই সৃষ্টি দেখিতে পাইব। অন্যথা দেখিবার উপায় নাই; কেন না এই বর্ত্তমান স্থূল দেহই ঐ প্রকার দর্শনের মূর্ত্তিমান্ মহাবিঘ্ন-স্বরূপ।

লীলা বলিলেন,—দেবি! কি নিমিত্ত এই স্থূলদেহেতেই অন্যতর জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যুক্তি সহকারে উপদেশ করুন।

দেবী কহিলেন,—লীলা! এই যে দৃশ্য জগৎ, ইহা প্রকৃতই মূর্ত্তিবর্জ্জিত। তবে যে ইহা মূর্ত্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়, সে কেবল মিথ্যাজ্ঞানেরই প্রভাব। সুবর্ণ বলিয়া জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে যেমন তোমরা অঙ্গুরীয় বলিয়া অবগত হও, মূর্ত্তিহীন জগৎকে মূর্ত্তিমৎ বলিয়া জ্ঞান করাও সেইরূপ। অঙ্গুরীয়াকার সুবর্ণে যেমন বস্তুতঃ অঙ্গুরীয়কতা বলিয়া একটা কিছুই নাই, সেইরূপ জগৎ-রূপ পরব্রহ্মে জগতের সত্তাও নাই। ফল কথা, এই জগদাকাশ যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সমস্তই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। তবে কথা এই, সাগ-রেও যেমন প্রতিবিম্বধূলি দৃষ্ট হয়, তেমনি মূর্ত্তিবর্জ্জিত ব্রহ্মেও মিথ্যা জগন্মূর্ত্তি দর্শন ঘটিয়া থাকে। প্রপঞ্চ মাত্রই মিথ্যা এবং আমিই অদ্বয় ব্রহ্ম, ইহাই সত্য। এ বিষয়ে বেদান্তবাক্য, বেদান্ত-তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা গুরু-সম্প্রদায় এবং স্বীয় অনুভবই প্রধান প্রমাণ। ব্রহ্মাই ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

যিনি ব্রহ্ম নহেন, তিনি ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন না, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানযোগ হইলেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। যাহার এই জ্ঞান নাই, যে ব্যক্তি আমি ও ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিই বদ্ধ; তাহার ব্রহ্ম দর্শন হয় না। ব্রহ্মের স্বভাব এই যে, তিনি স্বীয় কল্পিত সৃষ্টি জগদাদি নামে প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার যে স্বরূপসত্তা, তাহা যদি মায়ার আবরণে আবৃত হয়, তবেই তাঁহাতে সৃষ্টিপ্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ব্রহ্মে কোনও রূপে জগতের প্রকৃত কার্য্য বা কারণের উদয় নাই; কেন না তাঁহাতে সর্ব্ববিধ সহকারী কারণের অভাব বিদ্যমান।

অয়ি লীলা! অভ্যাস যোগ অবলম্বনে যাবৎ না তোমার ভেদজ্ঞান বিদূরিত হয়, তাবৎ তুমি এই শরীরে কখনই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবে না। অভ্যাস বলে অস্মদাদি ব্যক্তিরা সকলেই যদি ব্রহ্ম বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগেরও সেই পরম পদ দর্শন ঘটিতে পারে। বৎসে! এই যে আমার দেহ দেখিতেছ, ইহা সঙ্কল্পিত নগরের ন্যায় শুদ্ধ আকাশময়; সুতরাং এই দেহের অভ্যন্তরে আমি পরম পদ ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। ইহা ভিন্ন কমলযোনি প্রভৃতির দেহও বিশুদ্ধ জ্ঞানময়; এইজন্য তাঁহারাও ব্রহ্মস্বরূপ জগতে থাকিয়া ব্রহ্ম দর্শনের অধিকারী। অয়ি বালে! অভ্যাসের অভাব আছে বলিয়াই তোমার দেহ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও তোমার অন্তঃকরণে জীবভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ তুমি এখনও নিজেকে ক্ষুদ্র ও জীব বলিয়া মনে করিতেছ; এই জন্যই তুমি সেই ব্রহ্ম বা সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতীর আবাস গিরিগ্রাম দেখিতে পাইতেছ না। তুমি যখন আপন দেহে আপন সঙ্কল্প নগর দেখিতে পাইতেছ না, তখন কিরূপে অপর দেহ আশ্রয়ে অপরের সঙ্কল্পিত নগর নেত্রগোচর করিবে? হে কার্য্য-কুশলে! এইজন্যই তোমায় বলি, তুমি এই দেহাভিমান পরিহার করিয়া চিদ্ব্যোম-রূপ আশ্রয় কর; তাহা হইলেই অবিলম্বে ঐ সঙ্কল্প-নগর নয়নগোচর করিতে পারিবে। সঙ্কল্পিত নগরের ব্যাবহার বা উপভোগ বিষয়ে সঙ্কল্পই সত্য অর্থাৎ অর্থক্রিয়া-সমর্থ। অপর ব্যাবহার প্রভৃতি কিছুই নহে—তুচ্ছ।

ফলে মানসনগর দর্শন, মানস দেহেই হয়; উহা পার্থিব দেহে হইবার নহে। সৃষ্টির প্রথম সময় হইতে এই জগদ্ভ্রান্তি যেরূপে হইতে এখন পর্য্যন্ত একই নিয়তি, ঈশ্বরেচ্ছা বা মায়াশক্তি বশে সেইরূপে নিরূঢ় আছে।

লীলা বলিলেন,—দেবি! আপনি বলিয়াছেন, আপনি এবং আমি উভয়েই আমরা সেই দ্বিজদম্পতীর নিবাসস্থলে যাইব। কিন্তু হে মাতঃ! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, কিরূপে আমরা সেখানে গমন করিব? বুঝিলাম, আমি না হয় এইখানে দেহ রাখিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ চিন্মাত্রের অবলম্বনে সেইস্থানে যাইব, কিন্তু দেবি! আপনি তথায় যাইবেন কেমন করিয়া?

দেবী কহিলেন,—বৎসে! মনে কর, তুমি তোমার অন্তরে একটা বৃক্ষ কল্পনা করিলে; ঐ কল্পিত বৃক্ষ যেমন থাকিলেও নাই অর্থাৎ শূন্য-স্বরূপ, সেইরূপ মদীয় দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও নাই; ইহাকে আকাশময় বলিয়াই জানিও। দেখ, কুড্যের ন্যায় মূর্ত্ত পদার্থই কুড্যকে রোধ বা ভেদ করিতে পারে; পরন্তু যাহা মূর্ত্তিহীন, তাহা মূর্ত্তিহীনের প্রতি-বন্ধক হইতে পারে না। আমার এই দেহ কেবল শুদ্ধ সত্ত্বগুণে নির্ম্মিত এবং ইহা সেই চিৎস্বরূপেরই প্রতিভাসমাত্র; সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত ইহার প্রভেদ অতি সামান্য এবং তথায় যাইতে হইলে আমার এই দেহ পরিত্যাগ করিবারও প্রয়োজন নাই। আমি এই দেহেই অভী-প্সিত স্থানে যাইতে পারিব। বায়ু গন্ধের সহিত, জল জলের সহিত, অগ্নি অগ্নির সহিত এবং অনিল অনিলের সহিত যেমন মিলিয়া যায়, মদীয় এই মনোময় দেহও তেমনি অন্য মনোময় দেহের সহিত মিলিয়া যাইবে। পার্থিব জ্ঞান এবং অপার্থিব জ্ঞান উভয়ে কখন একত্র মিলিতে পারে না; দেখিয়াছ কি কোথাও কল্পনাময় পর্ব্বত ও প্রকৃত পর্ব্বত, উভয়ের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছে? এই দেহ মূলতঃ আতিবাহিক; কিন্তু তাহা হইলেও দীর্ঘকাল ইহাকে আধিভৌতিক বলিয়া ভাবনা করায় ইহা পার্থিব অর্থাৎ ভৌতিকপ্রায় হইয়া যায়। দীর্ঘ ভাবনার ফলে যে একটা ভাবশরীর হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নে, সুচিরকাল ধ্যানে, ভ্রমে, সঙ্কল্পে এবং গন্ধর্ব্বনগরেই পরিব্যক্ত। সুতরাং লীলা! তোমার বাসনা সকল যৎকালে ক্ষয় হইয়া

যাইবে, তখন তোমার এই স্থূল দেহে পুনরায় আতিবাহিক অর্থাৎ লিঙ্গ বা সূক্ষ্মভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে।

লীলা কহিলেন,—দেবি! সমাধি প্রভৃতির অবলম্বনে যৎকালে আতিবাহিক দেহত্ব-জ্ঞান সুদৃঢ় হয়, তখন এই দেহের দশা কি হয়? ইহা কি বিনষ্ট হইয়া যায়?

দেবী কহিলেন,—লীলা! যাহা প্রকৃতপক্ষে আছে, নষ্ট হওয়া বা না হওয়া, এরূপ একটা ব্যবস্থা তাহাতেই হইতে পারে; কিন্তু যাহা একান্তই নাই, তাহার আবার নাশ হইবে কিরূপে? মনে কর, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইল, পরক্ষণেই সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়া রজ্জু বলিয়া সত্যজ্ঞান জন্মিল। তখন ঐ সর্প কোথায় রহিল কি নষ্ট হইয়া গেল, এরূপ একটা কথাও কি উত্থাপিত হয়? ফলতঃ যেমন যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে, রজ্জুতে আর সর্প দেখা যায় না, সেইরূপ আতিবাহিক জ্ঞান হইবার পর আর আধিভৌতিক ভাব রহে না; সুতরাং সত্যজ্ঞানে রজ্জুগত ভ্রমসর্পের ন্যায় এই আধিভৌতিক দেহের দশা কি হয়, সে কোথায় যায়, এরূপ তর্ক শোভা পায় না। যাহা কল্পনা, তাহার যদি কেহ সমর্থন করে, তবে উপদেশ দিলে তাহা নিবৃত্ত হইতে পারে। দেখ, যে শিলা কখন নাই, তাহার অত্যন্তাভাব আছেই। অর্থাৎ কল্পিত প্রপঞ্চ পূর্ব্বে থাকে বটে, পরে জ্ঞানোদয়ে তাহা সমূলে নিবর্ত্তিত হয়; এই যে ব্যবহার-কল্পনা, ইহাও আপাত-দৃষ্টিতেই হইয়া থাকে; পরন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহারও সম্ভাবনা নাই। বলিতে পার, তবে আপনারা কিরূপে স্বদেহাদি দেখিতেছেন? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আমরা যাহা সত্য, তাহাই দেখিতেছি; এই দেহাদি সকলই সেই পরমব্রহ্মে পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত, এই সত্যই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু হে ভদ্রে! তোমার সেরূপ জ্ঞান নাই; তাই তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না। বলিতে পার, চিৎ হইল অদৃশ্য, তাহা কিরূপে দৃশ্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইল? এ কথার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, আদি সৃষ্টিতে চিৎতত্ত্ব যেরূপ কল্পনায় কল্পিত ছিল, তদবধি সেই এক অদ্বয় ব্রহ্মসত্তাই দৃশ্যের অনুরোধে ভ্রান্তিবশে নিজেই নিজেকে নানা দৃশ্যরূপে দেখিয়া আসিতেছে।

লীলা কহিলেন,—দেবি! যিনি দিক্ ও কালাদিতে বিভাগের অবিষয়ীভূত, সেই শান্তস্বরূপ একমাত্র পরমতত্ত্বই বিদ্যমান, অন্য কিছুই নাই। এক্ষেত্রে কল্পনার অবসর কোথায়?†

দেবী বলিলেন,—বৎসে! যেমন স্বর্ণে কটকত্ব, জলে তরঙ্গত্ব এবং স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে সত্যত্ব নাই, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ নিরাময় পরব্রহ্মে কল্পনা বা সৃষ্টি নাই। অম্বরে যেমন পাংশুপ্রসার থাকে না, পরব্রহ্মেও তেমনি কোনরূপ সৃষ্টিপ্রভৃতির অস্তিত্ব নাই। সেই পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, শান্ত, অজ ও অদ্বিতীয়। এই যাহা কিছু পরিস্ফুরিত হইতেছে; এতৎসমস্তই সেই নিরাময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। এ ক্ষেত্রে মণি হইতে অভিন্ন মণির প্রতিচ্ছায়াই উপমাপদের যোগ্য।

লীলা কহিলেন,—দেবি! তবে আমরা এতকাল কি কারণে দ্বৈতাদ্বৈত বোধে বিমূঢ় হইয়াছি? কে আমাদিকে দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনায় মোহমগ্ন করাইয়া এতদিন ভ্রম জন্মাইয়াছে?

দেবী বলিলেন,—অয়ি তরলে! এই দীর্ঘ কাল তুমি অবিচারবশেই আকুল হইয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলে। ঐ অবিচার স্বীয় স্বভাব হইতে উত্থিত এবং একমাত্র বিচার বলেই উহা বিনষ্ট হয়। বিচারে অবিচার নাশ নিমেষমধ্যেই ঘটে। পরন্তু ঐ যে অবিচাররূপিণী অবিদ্যা, উহাও অনন্ত ব্রহ্ম সত্তার অতিরিক্ত নয়; সুতরাং অবিচার বল, অবিদ্যা বল, বন্ধন বল, আর নিরাবাধ মোক্ষই বল,—এ সমস্তই কিছুই নাই; থাকিবার মধ্যে আছে কেবল—বিশুদ্ধ বোধ বা জ্ঞান, সেই জ্ঞানেই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত। এতকাল তুমি ইহার কিছুই বিচার কর নাই, তাই প্রবুদ্ধ হইতে পার নাই; কেবল বিভ্রান্ত ও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছ। তুমি অদ্য হইতে প্রবুদ্ধা হইলে, তোমার চিত্তে অধুনা বাসনাক্ষয়ের বীজ পতিত হইল। প্রকৃত বিবেক জ্ঞান তোমার জন্মিল; তুমি বিমুক্তা হইলে।

---

† অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সকল কল্পনা কল্পনার অধীন। এখানে লীলা তাহা অনুপপন্ন বলিয়া শঙ্কা করিলেন। তাই লীলার এই প্রশ্নের ভাব এই যে, পূর্ব্বকালের দুগ্ধ উত্তর কালে দধির আকারে পরিণত হয়, দধি হইলে তখন আর দুগ্ধ থাকে না, এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু পরব্রহ্মে কালসম্বন্ধ নাই; তিনি নিত্য বিদ্যমান। তাঁহাতে কল্পনা নামক প্রথম বিকারেরই ত অবসর অসম্ভব।

লীলা! এই সংসারসংজ্ঞক দৃশ্য আদৌ জন্মে নাই; ইহা যখন তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তখন ইহাতে আর তোমার দ্বৈতবাসনা জন্মিবে না। অর্থাৎ এই সংসার একটা কিছুই নয়; ইহাতে আবার বাসনা কি? এই মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, বান্ধব, তুমি, আমি প্রভৃতি সকলকেই নিশ্চয় বিনষ্ট হইতে হইবে অথবা আমরা এককালে সকলেই বিনষ্ট হইয়াই আছি; আমরা যে রহিয়াছি; ইহা ত একটা কল্পনা মাত্র। অতএব আমাদের আবার বাসনা কি? সংসার কি? আশা বা আগ্রহ কি? যাহারা মূঢ়, তাহারাই না জানিয়া আশা করে, আগ্রহ করে, অভিলাষ করে। এইরূপেই তখন বাসনার বিলোপ হয়।

বুঝিয়া দেখ, চিত্ত যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে একমাত্র পরব্রহ্মে সুদৃঢ়-ভাবে সংসক্ত হয়, তখন দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন এ সকল কিছুই থাকে না, সকলেরই অভাব হইয়া যায়। তৎকালে হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনার বীজ কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও রাগদ্বেষাদি ভাব সকল ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়, এই সংসারভাব নির্ম্মূল হয়। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি নিতান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

লীলা! এবম্বিধ নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রতিষ্ঠায় মায়াকাশ ও তৎকার্য্যের অন্তরে অধিষ্ঠানভূত নির্ম্মল আত্মার অবলম্বনে অল্পকাল মধ্যেই তোমার ভবভ্রান্তিকালিমা কাটিয়া যাইবে, তুমি অকলঙ্ক অর্থাৎ তৎ তৎ সংস্কার-কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে। তখন সমস্ত সংসারভ্রান্তি ও তৎকার্য্য বাসনাজাল এবং তৎকারণ অবিদ্যার একান্ত উচ্ছেদকর মোক্ষনামক যে পরম পুরুষার্থ, তুমিই তৎস্বরূপে অবস্থান করিবে।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—লীলা! যখন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান জন্মে, তখন যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তেমনি বাসনার বিলয় হইলে এই যে স্থূলদেহ, ইহা অনুভূত হইলেও অসৎ বলিয়া অবধারিত হয়। জ্ঞানোদয়ের পর যেমন স্বপ্নেদেহ থাকে না, তেমনি এই যে জাগ্রৎ দেহ, ইহাও বাসনা বিলয়ের পর থাকিবার নয়। ফল কথা, বাসনা থাকিলেই দেহাভিমান থাকে, বাসনার অভাবেই দেহাভিমানের অবসান হয়। স্বপ্ন কিম্বা সঙ্কল্প যখন শেষ হয়, তখন যেমন এই দেহ দর্শন ঘটিয়া থাকে, তেমনি যখন জাগ্রদ্ভাবনার অবসান হয় অর্থাৎ স্থূলদেহের অহন্তাব তিরোহিত হইয়া যায়, তৎকালে আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় বাসনার বীজ বিলয় পাইয়া যায়, তখন যেমন সুষুপ্তি আসিয়া সমুদিত হয়, তেমনি জাগ্রদবস্থায় বাসনার বীজ ক্ষয় হইয়া গেলে তখন মুক্ত অবস্থার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাগ্রৎ বাসনার ক্ষয় হইলেই লোকে মুক্ত হয়। জীন্মুক্ত ব্যক্তিগণের যে বাসনা, সে বাসনা—বাসনা নয়; তাহা শুদ্ধ সত্ত্ব নামে অভিহিত—সত্তাসামান্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যে নিদ্রায় বাসনা সমূহ সুপ্ত হয়, তাহা সুষুপ্তি, যে জাগ্রদবস্থায় বাসনাসমূহ সুপ্ত হয়, তাহা মোহ এবং যে নিদ্রায় বাসনাজাল একেবারেই বিলয় পায়, তাহা তুর্য্য নামে নিরূপিত। জাগ্রদবস্থাতেও যখন জ্ঞানবলে বাসনা সকল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া পরম পদ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখনও তুর্য্যভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বৎসে! এই সংসারে যাহারা জীবন ধারণ করিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা এককালেই বাসনাবিহীন হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনস্থিতিকেই জীবন্মুক্তি বলে। ঐ জীবন্মুক্ত অবস্থা সংসারাসক্ত অমুক্ত জনগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হিম যেমন তাপযোগে গলিয়া জল হইয়া পড়ে, তেমনি বাসনা-সকলের ক্ষয় হইয়া গেলে চিত্ত সমাধিপটু হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া উঠে এবং তৎকালে আতিবাহিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তায় জাগরিত

হইয়া আতিবাহিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই জন্মান্তরগত চিত্তান্তর ও সিদ্ধ দেহের সহিত সম্মিলিত হয়।

লীলা! অভ্যাসবশে তোমার অহম্ভাব তিরোহিত হইলে, দৃশ্যজ্ঞান অপগত ও স্বভাবসিদ্ধ চিৎস্বরূপতা আপনা হইতে প্রকাশিত হইবে। তোমার আতিবাহিক জ্ঞান যৎকালে চিরস্থির হইবে, তখন তুমি সঙ্কল্পশূন্য পবিত্র লোক সকল দেখিতে পাইবে। অতএব অয়ি অনিন্দিতে! যাহাতে তোমার বাসনাজাল বিলয় পাইয়া যায়, তাহার জন্য যত্ন কর। তোমার বাসনাক্ষয় পূর্ণরূপে স্থিরতর হইলে তুমি জীবন্মুক্তা হইতে পারিবে। যত দিনে না তোমার বোধরূপ সুশীতল চন্দ্রমা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাবৎ কাল তুমি এই স্থূলদেহ এই স্থানে স্থাপন করিয়া লোকান্তর দর্শন করিতে থাক। বিশদার্থ এই যে, তুমি সমাধি অবলম্বনে স্থূলদেহের অভিমান পরিহার করিয়া চিত্ত মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞাননেত্রে সেই সেই পরলোক প্রত্যক্ষ করিতে থাক। বৎসে! এই যে মাংসময় দেহ, ইহা কখন অমাংস দেহে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না বা সংশ্লিষ্ট হইয়া কোনরূপ ব্যাবহারিক কার্য্য করিবার সামার্থ্য ইহার নাই এবং চিত্তদেহও কোন ব্যাবহারিক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইতে অক্ষম। ফল কথা, মাংসময় দেহের সহিতই মাংসময় দেহের সম্মিলন সম্ভাবিত হয়; তদিতর চিন্ময় দেহের সহিত ইহার সংশ্লেষ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তুমি যদি এমন আশা করিয়া থাক যে, আমার এই দেহের সহিত মিলিত হইয়া লোকান্তরে গমন করিবে, তবে সে আশা ত্যাগ কর।

বৎসে! আমি আমার অনুভব অনুসারেই তোমাকে এই কথা কহিলাম। আমার এই উক্তি আবালবৃদ্ধ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। সিদ্ধ পুরুষদিগের বর ও অভিশাপের ন্যায় ইহাকে তুমি একটা নৈমিত্তিক বাক্য বলিয়া মনে করিও না। অথবা বর ও অভিশাপের ন্যায় আমার কথানুসারেই উল্লিখিত অসম্ভাবিত দেহ-সংশ্লেষ সম্ভাবিত হয় না কেন? এরূপ আশঙ্কাও যদি করিয়া থাক, তবে তাহা হইতেও নিরস্ত হও; কেন না, বর কিম্বা অভিশাপ দিয়া যোগ্য বা সম্ভাব্য বিষয় সমাধা করা যায়; পরন্তু অযোগ্য বা অসম্ভাব্য বিষয় জোর করিয়া সমাধা করা যায় না। অনবরত জ্ঞান অভ্যাসের ফলে যখন সংসারের বাসনারাশি বিলয় পাইয়া যায়, তখন নিশ্চয় এই

দেহেই আতিবাহিক-দেহতা জন্মিয়া থাকে। মরণের পরও জীবমাত্রেই আতিবাহিক-দেহতা লাভ করে। কিন্তু সেই আতিবাহিক দেহকে এই দেহে সমুদিত হইতে কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিই দেখিতে পায় না, লোকে কেবল অজ্ঞান-কল্পিত ভূতমাত্রের অংশময় অজ্ঞান দেহকেই ম্রিয়মাণ অবস্থায় অবলোকন করে; কিন্তু বাস্তব পক্ষে এই দেহের জীবন নাই, বা মরণ নাই। ভাবিয়া দেখিলে জীবন মরণ কথাটাই বা কি? উহা ত কিছুই নহে। স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের ন্যায় জীবন-মরণ একটা ভ্রমমাত্র। অয়ি বৎসে! সঙ্কল্পিত পুরুষের জীবন ও মরণের ন্যায় এই দৃশ্য দেহের জীবন মরণও একান্ত অসত্যরূপেই প্রতিভাত।

লীলা কহিলেন,—দেবি! যাহা কর্ণ-পথে প্রবেশ করিলে দৃশ্য-রূপিণী বিসূচিকা ব্যাধি বিদূরিত হইয়া যায়, আপনি আমাকে তথাবিধ নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে বলিয়া দিন, কোন্ অভ্যাস কিরূপ ভাবে করা কর্ত্তব্য, কিরূপেই বা সে অভ্যাসের পুষ্টিসাধন হইতে পারে এবং অভ্যাস পুষ্ট হইলে তাহাতে কিরূপ ফলই বা সঙ্ঘটিত হইবে? এই সকল বলিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করুন।

দেবী বলিলেন,—বৎসে! যে কোন ব্যক্তি যখন যখন যেরূপে যাহাই করুক না কেন, বিনা অভ্যাসে তাহা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সর্ব্বদা ব্রহ্ম-চিন্তন, পরস্পর ব্রহ্ম-বিষয়ক কথোপকথন, প্রকৃষ্ট বিধানে ব্রহ্মবোধ ও ব্রহ্মের প্রতি একনিষ্ঠতাই ব্রহ্মাভ্যাস। এইরূপ ব্রহ্মাভ্যাসেই তত্ত্বাববোধ উৎপন্ন হয়। যে সকল বিষয়-বিরক্ত মহাপুরুষেরা যত্ন সহকারে জন্মাদি জয়ের জন্য অন্তঃ-করণ হইতে ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন, ত্রিভুবনে তাঁহারাই ধন্য ও জয়যুক্ত। ফলতঃ যত্নের সহিত ভোগবাসনার ক্ষয় করিতে পারিলেই পৃথিবীতে জয়লাভ করা যায়। যাঁহাদের আনন্দ-সন্দোহ-নিষ্যন্দিনী বুদ্ধি বৈরাগ্য বলে সুরঞ্জিত ও ঔদার্য্য গুণরূপ সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হয়, তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী। অথবা যাঁহারা যুক্তি ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহায়তায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর অত্যন্তাভাব অবগত হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও উত্তম ব্রহ্মাভ্যাসী। এই দৃশ্য সৃষ্টির আদিতেও জন্মে নাই, কোন

কালেই উহার অস্তিত্ব নাই; সুতরাং জগৎ নাই এবং তুমি আমি ইত্যাদি কিছুই নাই, ইত্যাকার জ্ঞানই বোধ বা জ্ঞানাভ্যাস নামে অভিহিত। দৃশ্য নাই, দৃশ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব, ইত্যাকার বোধ স্থিরতর হইলে যৎকালে রাগদ্বেষাদি ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন মনোবল দ্বারা যে আত্মরতি আবির্ভূত হয়, তথাবিধ আত্মরতি ব্রহ্মাভ্যাস নামে নির্ণীত। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তই অসম্ভব বা মিথ্যা—এইরূপ জ্ঞান এবং রাগদ্বেষাদির ক্ষয়, এতদ্ব্যতীত যতই তপস্যা করা হউক না কেন, তৎসমস্তই অজ্ঞান ও দুঃখাকর। বস্তুতঃ দৃশ্যের যে একান্ত অভাব বোধ, তাহাই জ্ঞান এবং জ্ঞেয় নামে অভিহিত। এবম্বিধ মহাফল-জনক অভ্যাসই প্রকৃত অভ্যাস এবং তথাবিধ অভ্যাস ফলেই নির্ব্বাণ পদলাভ। বৎসে! এই যেরূপ বলিলাম, তদনুসারে চিত্তে যদি সতত বিবেক বোধাভ্যাসরূপ শীতল সলিল সেক করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীব যে সংসাররূপ কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীতে মোহরূপ নিতান্ত গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছে, বারিধারা পতনে শরৎকালীন মহতী হিমরাজীর ন্যায় তাহার সে নিদ্রা অপনীত হইবে।

মুনিবর বশিষ্ঠ এই সকল কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবা অবসান হইল। সায়ন্তন বিধি নির্ব্বাহের জন্য সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। সভাসদ্গণ সায়ংস্নান সমাহিত করিবার জন্য নমস্কারান্তে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বিভাবরীর অবসান হইল। দিবাকরের কিরণনিকর প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সভাসদ্গণ আবার আসিয়া সভাশোভা সম্পাদন করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বরাঙ্গনা লীলা ও সরস্বতী উভয়েই সেই রজনী-যোগে অন্তঃপুরমণ্ডপে থাকিয়া এইরূপ কথোপকথন করিবার পর দেখিলেন,—পরিজনবর্গ সকলেই বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাসুখ ভোগ করি-

তেছে। সমস্ত গৃহদ্বার ও গবাক্ষ দ্বারগুলি সুদৃঢ় অর্গলে আবদ্ধ রহিয়াছে! কুসুমসমূহের প্রচুরতর মনোহর সৌরভে সে স্থান ভরপুর হইয়া উঠিতেছে। যেখানে লীলার মৃত পতি পদ্মরাজের মৃতদেহ অম্লান মাল্য ও অম্বরে আবৃত ছিল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আসনে গিয়া তাঁহারা উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহাদিগের পূর্ণোদিত নিশাকরনিভ নির্ম্মল মুখশোভায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সমাধিস্থান আশ্রয় করিয়া নিশ্চল দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের আকৃতি স্তম্ভ-সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকা কিম্বা ভিত্তিগত চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তাঁহারা সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। মনে হইল যেন দিবাবসানে দুইটী কমলিনী স্বকীয় শোভা ও সৌরভ-সম্পদ্ সঙ্কুচিত করিয়া লইতেছে। আরও মনে হইল বুঝি বা বায়ুবিহীন শরৎকালে দুইটী স্পন্দন-হীন শুভ্র শীতল মেঘমালিকা গিরিগাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপে তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিলেন। যেমন কমনীয় কল্পলতাদ্বয় বসন্তাদি ঋতুর অভ্যুদয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋতুর রস পরিত্যাগ করে, তেমনি তাঁহারাও উভয়ে নির্ব্বিকল্প সমাধির অবলম্বনে বাহ্য জ্ঞান বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে বাহ্য জ্ঞান তিরোহিত হইলে যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, অন্তঃস্থ অহম্ভাব হইতে বাহ্য জগৎ পর্য্যন্ত যাবতীয় ভ্রম দৃশ্যেরই আদৌ ঐকান্তিক উৎপত্তি নাই, সমস্তই ভ্রমমাত্র—সমস্তই অসত্য, তখনই তাঁহাদের অন্তর হইতে দৃশ্য-পিশাচ দূরীভূত হইয়া গেল। রামচন্দ্র! লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সমাধি অবলম্বনে দৃশ্য বস্তুর ঐকান্তিক অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু সমাধির ন্যায় —সর্ব্বদাই উহার ত্রৈকালিক অসত্তা অনুভব করিতেছি। আমাদের দৃষ্টিতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব মরুমরীচিকায় জলের ন্যায় প্রতিভাত এবং শশশৃঙ্গের ন্যায় একান্তই অপ্রতিভাত বা অলীক। কেন না যাহা আদৌ ছিল না, বর্ত্তমানেও তাহা নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা।

রামচন্দ্র! অনন্তর সেই মহিলাদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী, সমস্ত দৃশ্যদর্শন হইতে মুক্ত হইয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি পদার্থ-পরিশূন্য অন্তরীক্ষবৎ কেবল ও শান্ত

ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন পরম প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন। জ্ঞপ্তিরূপিণী সরস্বতী দেবী জ্ঞানময় দেহে এবং মানুষী লীলা ভৌতিকাভিমান-হীন ধ্যান ও জ্ঞানের অনুরূপ দিব্য দেহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গতি প্রকৃতই তখন দূরতর নভঃপ্রদেশে নহে; তাঁহারা সেই গৃহের প্রাদেশ মাত্র পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানে আরোহণপূর্ব্বক ব্যোমগমনের অনুরূপ চিদাকাশস্বরূপ ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই ললিত-লোচনা ললনাদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী, তাঁহাদের পূর্ব্বতন সঙ্কল্প-সংস্কারের উদ্বোধনে পূর্ব্ববিষয় জ্ঞানের বশবর্ত্তিনী হইয়াই, আকাশমার্গে বহু দূর গমন করিলেন। সত্যই কি তাঁহারা স্থানান্তরে উপনীত হইলেন? না;—তাঁহারা সেইখানে থাকিয়াই চিদ্বৃত্তির সহায়তায় কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরান্তর প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সৌহৃদ্য-সম্পন্না ললনাদ্বয়ের দেহ চিদাকাশময় হইলেও তৎকালে তাঁহারা পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত দৃশ্যানুসন্ধানের সহিত চিত্ত-স্বরূপতা-প্রাপ্ত স্বীয় স্বভাব বশে পরস্পর পরস্পরের আকার অবলোকনপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহ-পরায়ণ হইলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এইরূপে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের হস্তাবলম্বনপূর্ব্বক দূর হইতে দূরান্তরে বিচরণ করিয়া ক্রমশ উচ্চস্থানে গমন করত অত্যাশ্চর্য্য নভোমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—ঐ নভোমণ্ডল একার্ণববৎ বহু বিস্তৃত, অতীব স্ফীত, অতি গম্ভীর এবং নিতান্ত নির্ম্মল ও কোমল। সুকোমল সমীর হিল্লোলে উহা সাতিশয় সুখভোগপ্রদ। এই শূন্য-সাগরে অবগাহন অতীব আহ্লাদকর ও শান্তিজনক। উহা সাধু চিত্ত অপেক্ষাও পরম শুদ্ধ ও প্রসন্নভাবাপন্ন।

এইরূপে তাঁহারা শূন্য সাগরে অবগাহন করিতে করিতে কখন সুমেরুস্থ নির্ম্মল নীরদমণ্ডলের মধ্যগত ও সুবিশাল পূর্ণচন্দ্রের অভ্যন্তরের ন্যায় নির্ম্মল দেব-সৌধ মধ্যে এবং কখন বা দিঙ্মণ্ডলের নানাবিভাগে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কখন চন্দ্রমণ্ডল সমীপে বিশ্রাম করিয়া, কখন বা চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিক্রান্ত হইয়া এবং কখন কখন বা সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের মন্দার মালার মনোহর সৌরভ-বাহী সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিয়া প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা কখন তীব্র নিদাঘতাপের অবসানে রক্তপদ্ম-সন্নিভ সৌদামিনী-সমাকুল জলভারালস জলধরমণ্ডলে সরোবরের ন্যায় স্নান করত তৃপ্ত হইতে লাগিলেন। কখন তাঁহারা নানাদিকে ভ্রমরীর ন্যায় ধীরে ধীরে বহু সরোবরে ভ্রমণ করিলেন। অনেক-ভূতলস্থ হিমাচল কৈলাসাদি মহাশৈলকুল ঐ সকল সরোবরে সমুৎপন্ন মৃণাল-দলের অঙ্কুর কোটিস্বরূপ। তাঁহারা কখন মেঘমণ্ডলরূপ মণ্ডপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মেঘমণ্ডল তখন গঙ্গার ধীর নির্ঝর প্রবাহে বিধৌত ও বায়ু-বিচালিত হইতেছিল; সুতরাং তাঁহাদের মনে ইহা একটী ধারাগৃহ বলিয়াই ভ্রম হইল।

অনন্তর ঐ মধুরগামিনী মহিলাদ্বয় স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পরিশ্রম ও বিশ্রাম করত শূন্য পথে যাইতে যাইতে ভুবন ও ভুবনবাসী জনগণে অতীব মন্থর অপর এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যোম দেশ অবলোকন করিলেন। ঐ ব্যোমতল যদিও জ্ঞপ্তি দেবী সরস্বতী পূর্ব্বে দেখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সহচারিণী লীলার নিকট তাহা একেবারেই অদৃষ্টপূর্ব্ব। তাঁহারা দেখিলেন, পরস্পর কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্গত রহিলেও ব্যোমতল পূর্ণ নহে। চতুর্দ্দশ ভুবনাদি দ্বারা উহার কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত বা পূর্ণ হইয়াছে। অবশিষ্ট অনেকাংশ শূন্য বা অপূর্ণ রহিয়াছে। উহার কোথাও বিচিত্রাভরণাকার ভুবনতল সকল বহুতর বিমান-মণ্ডিত হইয়া উপর্য্যুপরি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট; কোথাও সুমেরুপ্রভৃতি কুলাচলেরা চারি দিকে গগনমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজিত; কোথাও তাহাদিগের পদ্মরাগময় তটপ্রদেশের প্রভাচ্ছটায় উহার অভ্যন্তরভাগ প্রলয়াকালীন পাবকশিখার ন্যায় প্রতীয়মান; কোন স্থান ঐ সকল কুলাচলের মুক্তাময় শিখর হইতে বিচ্ছুরিত কিরণ-পটলে

হিমালয়সানুর ন্যায় সুশোভন ; কোনও স্থান কাঞ্চনাদ্রি-তটের প্রভাপুঞ্জে কাঞ্চনস্থলীর ন্যায়ভাস্বর; কোথাও বা মহামরকত-মণির প্রভা-পাতে হরিতবর্ণ বনস্থলীর ন্যায় নীলকান্তি দেদীপ্যমান ; এবং কোথাও বা দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দ্বয়ে তৎপরতার সহিত সমুৎপন্ন অন্ধকারোত্থিত কালিমার সমাবেশ।

তাঁহারা দেখিলেন, কোথাও পারিজাত-বল্লীর বনোপরি বিলোলিত বিমানগণের কেতন, যেন সমীপ-দৃষ্টিতে বনমঞ্জরিকার ন্যায় এবং দূর-দৃষ্টিতে বৈদূর্য্যময় ভূতলের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে ; কোথাও মনোজব সিদ্ধগণের যাতায়াতে পবনবেগ পরাহত হইতেছে ; কোথাও বিমানগৃহবাসিনী দেব-কামিনীগণের মনোজ্ঞ গীতবাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে ; স্থানবিশেষে কোথাও ত্রিলোকস্থ নিখিল ভূতবৃন্দ বিচরণ করিতেছে, তথাপি উহার অভ্যন্তর দেশ অসঙ্কীর্ণ রহিয়াছে ; উহা এতদুর-পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত যে, অসংখ্য সুরাসুরবৃন্দ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছেন, তথাপি পরস্পর পরস্পরের গতি-বিধি বুঝিতে পারিতেছেন না ; কোথাও পর্য্যন্তপ্রদেশে কুষ্মাণ্ড, রক্ষঃ ও পিশাচ-মণ্ডল অবস্থান করিতেছে ; কোথাও আবহ প্রবহ প্রভৃতি মারুত-গণের মহাবেগে বৈমানিকগণ বাহিত হইতেছেন ; কোথাও বহমান বিমান-বেগের ধ্বনি দ্বারা মেঘধ্বনি পরাভূত হইতেছে ; কোথাও স্থান বিশেষে গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চারে প্রতিনিয়ত জ্যোতিশ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; কোথাও সিদ্ধগণ সূর্য্যসন্নিহিত স্থানে থাকিয়া তপোযোগে কিঞ্চিৎ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে না হইতে আতপ-তাপে দগ্ধ হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন ; এবং কোথাও বা সূর্য্যসন্নিহিত অজ্ঞ বৈমানিকদিগের বিমানবৃন্দ সূর্য্যতেজে দগ্ধ হইয়া সূর্য্যাশ্ব-গণের মুখমারুতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

তাঁহারা আরও দেখিলেন,—কোন কোন স্থানে লোকপাল সকল অপ্সরোবৃন্দে পরিবৃত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, তাহাতে সে স্থান চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ; কোথাও দেবকামিনীগণ অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে ধূপ দগ্ধ করিতেছেন, সেই দগ্ধ ধূপের ধূমপটলে অম্বরতল অম্বুদাবৃতের ন্যায় হই-তেছে ; কোন স্থানে দেব-দয়িতারা দেবগণের আহ্বানে পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়াই, 'আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব' এইরূপ বলিয়া ব্যাগ্রতার সহিত ধাবমান হইতেছেন, তাহাতে গতিবেগে তাঁহাদিগের অঙ্গ

হইতে দিব্য দিব্য অলঙ্কার সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে; কোথাও সিদ্ধসম্প্রদায়ের তেজঃপুঞ্জে অন্ধকারনিকর অপসারিত হইয়া [illegible] কোথাও মহাবল সিদ্ধগণের গমনাগমনবেগে জলধর-পটল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন ভীতভাবে পার্শ্ববর্ত্তী মেরু, মন্দর ও হিমালয়ের অধিত্যকা ভূমিতে অংশুকবৎ আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; কোন স্থান অসংখ্য কাক, উলূক, গৃধ্র ও ভাস প্রভৃতি বিহঙ্গবৃন্দে পরিবৃত রহিয়াছে; কোন কোন স্থানে ডাকিনীরা সাগরতরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছে; কোথাও কাকমুখী, কুক্কুরমুখী, উষ্ট্রমুখী ও খরমুখী যোগিনীরা কৃতমনোরথা হইলেও, অনর্থক শত শত যোজন পরিভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক একত্র সম্মিলিত হইতেছে; কোন স্থানে ধূমান্ধকারাবৃত মেঘমন্দিরে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব-মিথুনেরা লোকপালদিগের সম্মুখেই সুরতোৎসবে মগ্ন হইতেছে; কোন স্থানে পান্থগণ স্বর্গীয় সঙ্গীত ও উদ্দীপক স্তবে উন্মত্ত ও মদনাক্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে; কোথাও অনবরত চালিত জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যাদির গতি বশতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষাদির কাল বিভাগ লক্ষিত হইতেছে; কোথাও বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া আকাশগঙ্গার জল প্রবাহিত হইতেছে, দেবকুমারেরা সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ধাবিত হইতেছেন। কোন স্থানে বজ্র, চক্র, শূল, অসি ও শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা স্ব স্ব অস্ত্র ধারণ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছেন, কোথাও ভিত্তিহীন ভবনরাজি বিরাজমান; কোথাও নারদ ও তুম্বুরু সঙ্গীতালাপে তৎপর; কোথাও মেঘমার্গের উপরি-ভাগে মহামেঘমণ্ডল প্রলয়কালোদিত পয়োদ-পটলের ন্যায় অবিরল জল-ধারা বর্ষণ করিতেছে এবং কোথাও কল্পান্তকালের জলদমণ্ডল চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্ব্যাপার ও নিস্পন্দভাবে রহিয়াছে।

তাঁহারা আরও দেখিলেন,—কোনও স্থানবিশেষে অঞ্জনাদ্রিনিভ সুন্দর অম্ভোধর উৎপতিত হইতেছে; কোন স্থলে নিদাঘ তাপের অবসানে প্রাবৃট্ প্রারম্ভে কনক-নিষ্যন্দের ন্যায় কমনীয় জলদমালা প্রতিভাত হই-তেছে; কোথাও দিগ্‌দাহ-তাপ-তপ্ত অম্বুদমালা অংশুকের ন্যায় ঋষ্যমূক শৈলে বিরাজিত এবং কোথাও বা সুগভীর শূন্যতাময় প্রদেশ নিবাত-নিষ্কম্প নীরনিধির জলরাশির ন্যায় ভাসমান। কোথাও বায়ুপ্রবাহে প্রৌঢ় বিমান-

উত্তপ্ত মারুতে তরুরাজি, শৈলকুল ও জলদজাল দগ্ধীভূত। কোথাও অত্যন্ত শান্ত সমীরণ নিতান্ত নিঃশব্দে প্রবাহিত। কোথাও পর্ব্বতপ্রায় শত শত শৃঙ্গশালী অভ্রবৃন্দ সমুদিত। কোথাও বর্ষাকালীন উন্মত্ত বারিদগণ ঘর্ঘর গর্জ্জনে নিরত।

তাঁহারা আরও দেখিলেন,—কোন স্থানে সুরাসুরগণ রণরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সে স্থান সুদুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও আকাশ-সরসী-বিহারিণী হংসীগণের নিনাদে হংসগণ সমাহূত হইতেছে। কোথাও মন্দাকিনীর পুলিনবিরাজিনী নলিনীর সৌরভ সম্পদ,—অনিল অপহরণ করিয়া লইতেছে। কোথাও গঙ্গাদি সরিতের সন্নিধানে মৎস্য, মকর, কুলীর, শঙ্খ ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তু সকল সশরীরে সমুড্ডীন হইতেছে। কোথাও দিনমণি পাতালগামী হইয়াছেন, তাঁহাতে পৃথিবীর ছায়া পতিত হইয়াছে; সুতরাং কোন কোন মণ্ডলে চন্দ্রগ্রহণ এবং কোথাও বা প্রকারান্তরে সূর্য্যগ্রহণ সম্ভাবিত হইতেছে। কোথাও মায়াময় কুসুম-কানন স্বর্গীয় সমীরে সঞ্চালিত হইতেছে। কোথাও বা উচ্চস্থান হইতে পুষ্প ও হিমকণা সকল শরীরে সম্পতিত হওয়ায় বিমানবিহারিণী অঙ্গনা-গণ সহসা সন্ত্রস্ত হইতেছে।

সেই দুই ললনারত্ন—লীলা ও সরস্বতী দেখিলেন,—এই ত্রিজগতের মধ্যে যাবতীয় ভূতবৃন্দ উডুম্বর-মধ্যগত মশকসমূহের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা তদ্দর্শনে সে স্থান অতিক্রম করিয়া পরে সমুচ্চ নভো-মণ্ডল অতিক্রমপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পৃথিবীতল-গমনে সমুদ্যত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! অনন্তর সেই মহিলাদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী নভোমণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ব্বক গিরিগ্রামস্থ মৃত বশিষ্ঠের গৃহাদি দর্শনে যাত্রা করিয়া ভূমিতল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দেবী সরস্বতী

পূর্ব্ব হইতেই লীলাকে এই অপূর্ব্ব দর্শন করাইবার অভিপ্রায় করিয়া ছিলেন। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—এই ভূমিতল ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরুষের হৃৎ-পদ্মরূপে বিরাজমান। দিক্ সকল ঐ পদ্মের দল। শৈল সকল উহার কেশর। উহা আপনিই আপন আমোদভরে সুশোভন। সরিৎসমূহ উহার কেশররাজির অন্তরশাখা। মধ্যগত হিমকণা উহার মকরন্দ-বিন্দু। রাত্রিরূপ অলিবধূ উহার চারিদিকে ভ্রমণশীল। বিবিধ ভূতবৃন্দরূপ মশক-সমূহে ঐ পদ্ম সতত সমাকুল। উহার অন্তরদেশ নানা গুণগণে পরিপূর্ণ। সুন্দর নালরন্ধ্র রূপ পাতালাদি বিবিধ ছিদ্রে উহ্যমান জলরাশিতে ঐ পদ্ম পরিবৃত। উহা দিবালোকে উদ্ভাসিত এবং নানা রসে আর্দ্রতাবাপন্ন। ভ্রমণশীল দিবাকর উহার হংস এবং যামিনীযোগে উহার সঙ্কোচ। নাগ-রাজ বাসুকি ঐ পদ্মের মৃণালরূপে পাতালপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছেন। সরিৎপতি উহার আশ্রয়স্থল। এই জন্য সাগর সঙ্কলিত হইলে ঐ পদ্মের দিক্‌রূপ দলরাজিরও প্রকম্প উপস্থিত হয়। অধোনালস্থিত দৈত্য-দানবেরা উহার কণ্টকস্বরূপ। ভূধরনিকর উহার মহাজীব। অধো-গত বীজভূত সম্ভোগ-সুকুমারী অসুর-নারীরূপ মৃণালকলিকাদি বল্লরী উক্ত মহাবীজরূপ ভূধরদিগের নাল মূল।

তাঁহারা দেখিলেন, ঐ ভূপদ্মে জম্বুদ্বীপ নামে এক বিপুল কর্ণিকা বিদ্যমান। সরিৎসমূহ ঐ কর্ণিকার নালস্বরূপ। নগর ও গ্রামাদি উহার কেশর। অত্যুচ্চ সপ্তকুলাচলরূপ বীজে ঐ কর্ণিকা সুশোভিত। উহার অন্তর্গত অত্যুচ্চ মহামেরুরূপ বীজ দ্বারা নভঃস্থলী সমাক্রান্ত। সরোবর-সমূহ উহার হিমকণিকা এবং বনজঙ্গল উহার ধূলিকা। ঐ ভূমি-কমল-কর্ণিকার মণ্ডল মধ্যে যে স্থলভাগ আছে, তথাকার জীব সকল উহার অলিশ্রেণী। দিগ্‌বলয়-বেষ্টিত শত. যোজনাকার সাগররূপ ভ্রমরেরা প্রতি পূর্ণিমায় প্রবুদ্ধ হইয়া ঐ কর্ণিকাকে বেষ্টিত করিয়া থাকে। উহার অষ্টদিগ্‌দলে সুর ও সাগররূপ ষট্‌পদেরা বিশ্রাম সুখ অনুভব করে। ভরত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল প্রভৃতি ভ্রাতৃস্থানীয় নয় জন ভূমিপাল উহাকে নবধা বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন।

এই জম্বুদ্বীপরূপ কর্ণিকা লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ এবং রজঃকণায়

আকীর্ণ। ইহাতে যে নানাবিধ জনপদ আছে, তাহা উহার চিরস্থিত তুষার-সীকরবৎ প্রতিভাত। শঙ্খ যেমন হস্ত প্রকোষ্ঠ বেষ্টন করিয়া থাকে, তেমনি এই জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ লবণাম্বুধি বলয়াকারে উহার বহির্ভাগ বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। অতঃপর উহা অপেক্ষাও দ্বিগুণাকার শাকদ্বীপ জগৎ-স্বরূপিণী পদ্মলতিকায় পরিব্যাপ্ত বলয়াকারে বিদ্যমান। এই শাকদ্বীপের চারি দিকে দ্বিগুণপ্রমাণ আরও এক সুস্বাদু শীতল মহাসাগর বিরাজমান। এই সাগর দুগ্ধনীরে পরিপূর্ণ। ইহার নাম ক্ষীর-সাগর। সমগ্র শাকদ্বীপ ক্ষীরসাগরে বেষ্টিত। ইহার পরবর্ত্তী দ্বিগুণাকার কুশদ্বীপ। এই দ্বীপ নানা জনগণে সমাকীর্ণ। ইহার চারি পার্শ্ব ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দধিসাগরে পরিবেষ্টিত। এই সাগর দেবগণের নিত্য তৃপ্তি-জনক। দধিসাগরের পরবর্ত্তী দ্বীপ ক্রৌঞ্চনামে অভিহিত। এই দ্বীপের প্রমাণও পূর্ব্ববৎ দ্বিগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। খাত-রচনায় নরপতির নবনির্ম্মিত নগরীর ন্যায় এই দ্বীপ দ্বারাও জম্বুদ্বীপ নাম্নী কর্ণিকা বেষ্টিত। পূর্ব্ববৎ দ্বিগুণপ্রমাণ ঘৃত সাগর ঐ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ বেষ্টন করিয়া বিরাজমান। ইহার পর শাল্মলী-দ্বীপ। এই দ্বীপ পুষ্পবৎ শুভ্র সুরাসাগরে বেষ্টিত; সুতরাং পাপে পরিপূর্ণ। অনন্ত নাগের দেহ তলতায় নারায়ণমূর্ত্তির ন্যায় সুরাসাগর শাল্মলীদ্বীপ বেষ্টন করিয়া বিরাজমান। ইহার পরবর্ত্তী দ্বীপের নাম গোমেদক। এই দ্বীপও পূর্ব্ববৎ দ্বিগুণ প্রমাণ। ইহাকেও হিমাচল সানু-সম্পর্কিত বিশুদ্ধ ইক্ষুসমুদ্র পূর্ব্ববৎ বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। অনন্তর এতদপেক্ষা দ্বিগুণ পুষ্কর দ্বীপ। ইহারও চারি পার্শ্ব স্বাদূদক সাগরে সমাকীর্ণ। অতঃপর দশ গুণ-পরিমিত এক অতি গভীর নিম্নভূমি ভীষণ গর্ত্তাকারে বর্ত্তমান। উহার প্রসার পাতালতল পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

অনন্তর ঐ সমস্ত হইতে দশগুণ উচ্চ লোকালোক পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত। এই পর্ব্বত আকাশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহার চতুর্দ্দিক্ গর্ত্তময়; এই জন্য উহা অতীব ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয়। লোকালোক পর্ব্বতের উপরিভাগের অর্দ্ধাংশ সূর্য্যালোকে সমুদ্ভাসিত এবং অপরার্দ্ধ প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। উহা অতি দীর্ঘ অতি বিস্তৃত মালার ন্যায় প্রতীত। উহার তমসাচ্ছন্ন অর্দ্ধাংশ দেখিলে মনে হয়, উহা যেন একটা বলয়াকৃতি নীলোৎপলমালায়

মণ্ডিত। উহার শিখরদেশে কত শত শত মণিমাণিক্য ও কত সংখ্যাতীত কুমুদ কহ্লারাদি কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত। লোকালোকাচলের অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্দ্ধাংশ যেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর কেশদামরূপেই বিভূষিত।

ইহার পর ঐ সকল অপেক্ষা দশগুণ প্রমাণ এক অরণ্যপ্রদেশ। এই প্রদেশে প্রাণিমাত্রের সঞ্চারাদি নাই। অনন্তর ঐ সকলের দশগুণ পরিমিত অগাধ অনন্ত অম্বুরাশি নভোমণ্ডলের ন্যায় চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। ইহার পর উল্লিখিত সমস্ত অপেক্ষা দশগুণ প্রমাণ প্রবল পাবক-জ্বালায় পরিব্যাপ্ত। এই পাবকে সুমের প্রভৃতি পর্ব্বত সকল বিদ্রাবিত, এমন কি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত বিশোষিত হইয়া যায়। অতঃপর এতৎ-সমস্তের দশগুণ অধিক মহাবেগবান্ প্রলয় প্রভঞ্জন প্রবাহিত। এই প্রবল বায়ুর প্রবাহবেগে অতি প্রকাণ্ড শৈলেন্দ্রগণও বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং মেরু-প্রভৃতি পর্ব্বত সকল তৃণ-পাংশুর ন্যায় বাহিত হয়। একেবারেই শূন্যময় বলিয়া ঐ বায়ুর কোনই শব্দ নাই। অনন্তর উল্লিখিত সমুদায় অপেক্ষা দশগুণ প্রমাণ ব্যোমমণ্ডলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ঐ ব্যোমভাগ একান্ততঃ শূন্য ও একাকারতায় পরিপূর্ণ। ইহার পর শত কোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ডভিত্তি পরিব্যাপ্ত। উহা ঘনাকার, হেমময় ও দ্বিপর্ব্ববিশিষ্ট।

এইরূপে সেই মানবী রাজমহিষী লীলা সমুদ্র, মহাদ্রি, লোকপাল সকল, সুরপুরী, অম্বরতল ও ভূতল প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত ভুবনোদর অবলোকনপূর্ব্বক ভূতলস্থ স্বকীয় মন্দিরকোটর নেত্রগোচর করিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এইরূপে সেই দুই বরবর্ণিনী লীলা ও সরস্বতী সেই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানই পূর্ব্ববর্ণিত

ব্রাহ্মণের আবাসভূমি। পরে সেই সিদ্ধ মহিলাদ্বয় লোক-লোচনের অদৃশ্যে থাকিয়া তথায় প্রবেশপূর্ব্বক সেই স্বীয় গৃহ—ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর-মণ্ডপ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—তথাকার দাসদাসী সকলেই চিন্তায় একান্ত অবসন্ন। পুরাঙ্গনাগণের মুখমণ্ডল বিগলিত বাষ্পধারায় পরিক্লিন্ন। প্রায় সকলেরই বদনমণ্ডল বিষাদভাবাপন্ন। দেখিলে মনে হয়, যেন শীর্ণপর্ণ অম্বুজদল বিরাজিত। সে পুরীতে উৎসবের লেশমাত্র নাই। অগস্ত্য-পীত সাগরের ন্যায় তথাকার সর্ব্বত্র একটা বিরস-ভাব অভিব্যক্ত। সে পুরীর অবস্থা দেখিলে নিদাঘ-দগ্ধ উদ্যান, বিদ্যুদাহত বৃক্ষ, বাতবিচ্ছিন্ন বারিধর, হিমাহত অম্ভোজ এবং অল্পাবশিষ্ট তৈল-বর্ত্তি প্রদীপের ন্যায় স্বতই একটা দুরবস্থার চিত্র চক্ষুর সমক্ষে প্রস্ফুট হয়। সে গৃহের গৃহপতি নাই; সুতরাং আসন্নমৃত্যু মানবের বিষাদমলিন সকরুণ মুখচ্ছবির ন্যায়, জীর্ণশীর্ণ-তরুপর্ণ বনভূমির ন্যায় এবং বর্ষার অপায়ে ধূলি-ধূসর প্রদেশের ন্যায় গৃহস্বামীর বিরহে সে গৃহ তখন শ্রীভ্রষ্ট, রূক্ষ ও নিতান্ত শোচনীয় দশায় পতিত।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস রাম! নির্ম্মল জ্ঞানের চিরাভ্যাসবশে সুন্দরী লীলা সত্যসঙ্কল্পশালিনী হইয়াছিলেন। দেবতার ন্যায় তাঁহার কামনা স্বাধীন হইয়াছিল। তিনি তৎকালে চিন্তা করিলেন, আমার এই সকল বান্ধবেরা আমাকে এবং এই দেবীকে সাধারণ স্ত্রীজনের ন্যায় অবলোকন করুক। এই প্রকার চিন্তা করিবামাত্র সেই গৃহস্থিত জনগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, সেই মহিলাদ্বয় লক্ষ্মী ও গৌরীর ন্যায় মন্দির-মধ্য সমুদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের আপাদ-বিলম্বিত বিবিধ অম্লান মালার বিলোলনে তাঁহারা অতীব সৌন্দর্য্য-শালিনী হইয়াছেন।—যেন দুইটী বসন্তলক্ষ্মী সমুদিত হইয়া বনস্থলী আমোদিত করিতেছেন! তাঁহাদের দেহপ্রভায় সকল স্থল সুশোভিত হইতেছে।—যেন আহ্লাদ-সুখদ শীতল শশাঙ্কযুগল স্বীয় সুধাংশুধারায় ওষধি, অরণ্য ও গ্রাম সকল প্লাবিত করিয়া সমুদিত হইয়াছেন! তাঁহা-দের লম্বমান অলকদামে লোলিত লোচনালির বিলোকনে যেন কুবলয়-মিশ্রিত মালতীকুসুম সমূহ বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহাদের দেহপ্রভার প্রবাহ

দ্রবীভূত হেমরসধারা-পূরিত সরিৎসদৃশ সাতিশয় মনোহর। তাহাতে তথাকার সমস্ত উপবন যেন কনকীকৃত হইয়াছে। সেই ললনাদ্বয় যেন আপনাদের লাবণ্য-নীরধির তুঙ্গ তরঙ্গরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহাদের লাবণ্য-সাগর যেন নৈসর্গিক দেহশোভার লীলাকল্পিত দোলার ন্যায় বিলসিত হইতেছে। সেই উভয় বরবর্ণিনীর বিলোল বাহুবল্লরী ও অরুণ-বর্ণ পাণিযুগলের বিন্যাস দ্বারা যেন হেমময়ী নব নব কল্পলতিকা সকল বার বার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাঁহাদের পাদযুগল অম্লান পুষ্প-পল্লব-নিভ-সুকোমল এবং স্থল-কমল-দল-মালার ন্যায় সুশোভন। তাঁহারা তাদৃশ পাদযুগ দ্বারা পুনর্ব্বার ভূমিতল স্পর্শ করিলেন। তাঁহাদের অবলোকন-রূপ অমৃত-সেকে পাণ্ডুর বর্ণ শুষ্ক তালী ও তমালখণ্ড সকল যেন বাল-পল্লবে সমলঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

এই সময় মৃত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামক জ্যেষ্ঠপুত্র গৃহস্থিত জনগণের সহিত হস্তে কুসুমাঞ্জলি লইয়া 'বনদেবতাদ্বয়কে নিবেদন করি' এই বলিয়া সেই ললনাদ্বয়ের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন। সেই কুসুমাঞ্জলি তখন পদ্মবল্লীর পদ্মদ্বয়ে হিমকণিকা-পাতের ন্যায় ঐ দেবীদ্বয়ের পাদপদ্মে পতিত হইল।

তখন জ্যেষ্ঠশর্ম্মাপ্রভৃতি বলিলেন,—হে বনদেবীদ্বয়! আপনারা জয়-যুক্ত হউন। আমরা মনে করিতেছি, আপনারা আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক দেখিতে পাওয়া যায়, পরকে পরিত্রাণ করাই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম।

জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতির এই কথার অবসানে দেবীদ্বয় সাদরে বলিলেন, এই সম্মুখস্থ জনগণ বস্তুতই দুঃখিত বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সেই দুঃখ কি, তাহা তোমরা প্রকাশ করিয়া বল।

তখন জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীদ্বয়ের নিকট দ্বিজ-দম্পতীর ব্যসন-জনিত আপনাদের দুঃখবার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদি সকলেই একবাক্যে কহিলেন,—দেবীদ্বয়! এই স্থানে এক দ্বিজদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহারা দীনজনে স্নেহ-পরায়ণ, অতিথিবর্গের পরিচারক এবং ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা রক্ষার আধারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারাই আমাদের মাতা ও পিতা। অনুন্নে

বন্ধু, বান্ধব, পুত্র-পরিজন প্রভৃতি আমাদের সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত সংসার শূন্যময় করিয়া তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহাদের অভাবে আমরাও অস্ত জগত্রয় শূন্যময় বলিয়া মনে করিতেছি। ঐ দেখুন, বিহঙ্গমেরা গৃহোপরি আরোহণ করত প্রতি ক্ষণে পক্ষ প্রসারণ করিয়া তাঁহাদের মৃত দেহের উদ্দেশে ভক্তিভরে করুণকণ্ঠে শোক প্রকাশ করিতেছে। ভূধরগণ গুহামুখে গুরু গুরুধ্বনিতে বিলাপ করিয়া নদীরূপ স্থূল অশ্রুধারা বর্ষণে স্বীয় শোকভার ব্যক্ত করিতেছে। ঐ দিগঙ্গনারা অম্বর ও পয়োধর পরিত্যাগ করিয়া প্রতপ্ত নিশ্বাস পবনে একান্ত বিবর্ণ ও কৃশভাবাপন্ন হইয়া সুরগণেরও অশ্রুপাতের কারণ হইয়াছে। এই গ্রামবাসী লোক সকল অনশনে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে। ভূলুণ্ঠনে উহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উহারা করুণ কণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে এক্ষণে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের নিতান্ত দীন দশা উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন শোকভরে পাদপ সকলের পর্ণগুচ্ছরূপ নয়ন কোটর হইতে নীহার সীকররূপ প্রতপ্ত অশ্রুবিন্দু বর্ষিত হইয়া নিম্নদেশে নিপতিত হইতেছে। ক্ষারধূসরা রথ্যা সকল নিরানন্দা বিধবা বালার ন্যায় বিরল-জন-সঞ্চারা হইয়া শূন্যমনে—শূন্যপ্রাণে অবস্থান করিতেছে। লতা সকল উষ্ণোষ্ণ শ্বাস-পবন ধারণ করিতেছে। বৃষ্টিরূপ বাষ্পপাতে তাহাদের সর্ব্বাবয়ব সমাহত হইতেছে। তাহারা কোকিলকুলের কূজনচ্ছলে অনবরত বিলাপ করত স্বীয় পল্লবপাণি দ্বারা আত্মদেহে আঘাত করিতেছে। ঐ দেখুন, তাপতপ্ত নির্ঝরসকল শতধা বিদীর্ণ হইবার মানসে সবেগে সুবিশাল শিলাতলে আত্মাকে পাতিত করিতেছে। এই গৃহ সকল হইতে হর্ষবার্ত্তা তিরোহিত হইয়াছে। অভ্যন্তরস্থ ভাণ্ডাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং বাস্তবিকই এই সমস্ত এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট, নিস্তব্ধ ও অন্ধতমসে পরিপূর্ণ হইয়া অরণ্যপ্রায় হইতেছে। ঐ যে উদ্যানস্থ কুসুম-সমূহ, উহারা অলিকুলের গুঞ্জনচ্ছলে রোদন করিতেছে। উহাদের অভ্যন্তর হইতে নির্গত সৌরভপ্রবাহ সম্প্রতি পূতিগন্ধময় বলিয়া মনে হইতেছে। চৈত্যতরু সকলের শাখাগুলি প্রতি দিন বিরস-বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছে এবং উহাদের গুচ্ছরূপ নেত্ররাজি ক্রমশ সঙ্কোচভাব ধারণ করিতেছে।

ঐ কলকল-নাদিনী নদীনিচয় নীরনিধির অঙ্গে আপন অঙ্গ ঢালিয়া দিবার জন্যই আকুলভাবে চলিতে চলিতে ভূতলে কলেবর দোলায়িত করিতেছে। ঐ যে অদূরে বাপী সকল, উহারা শোকাবেগে এতদূর নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে যে, মশক-পাত-জনিত সামান্য স্পন্দও উহাদের নিকট অধুনা অতি চাঞ্চল্য বলিয়া মনে হইতেছে। যেখানে গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী ও সুরসুন্দরীরা গান করেন, অদ্য আমার জনক-জননী কর্তৃক নিশ্চয়ই সেই সুখধাম নভোমণ্ডল অলঙ্কৃত হইয়াছে। অতএব হে দেবীদ্বয়! আপনারা আমাদের শোকাপনোদন করিয়া দিন। আমরা জানি, মহৎ লোকের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে।

তখন পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মা এই কথা কহিলে লীলা পাণি দ্বারা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিলেন। মনে হইল, পদ্মিনী বুঝি কিঞ্চিৎ নত হইয়া পল্লব দিয়া আপনার মূলগ্রন্থি স্পর্শ করিল। বর্ষাজলে প্লাবিত হইয়া পর্ব্বত যেমন নিদাঘ তাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, তেমনি লীলার সেই স্পর্শে লীলাতনয় জ্যেষ্ঠশর্ম্মা দুঃখ-দৌর্ভাগ্যাদি অশান্তি-উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইলেন। অনন্তর সেই দেবীদ্বয়ের দর্শন লাভ করিয়া সমস্ত গৃহজন সুধাপায়ী সুরের ন্যায় সর্ব্বদুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া লক্ষ্মীসম্পন্ন হইলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মহর্ষে! জ্যেষ্ঠশর্ম্মা হইলেন লীলার পুত্র। লীলা সেই মাতৃমূর্ত্তিতে পুত্রকে দর্শন দিলেন না কেন? আপনি আমার এই সন্দেহ নিরাস করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস! এই যে পৃথ্ব্যাদিময় মিথ্যা জড়দেহ, ইহাকে যে অজ্ঞানী ব্যক্তি সত্য বলিয়া অবগত হয়, তাহার নিকট ইহা জড়াকারতাই ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার ধারণা অন্য প্রকার; তিনি ইহাকে শুদ্ধ সত্ত্বময় অদ্বিতীয় চিদাকাশ বলিয়াই বিদিত হয়েন। যদি পৃথ্ব্যাদিতে সত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে অসৎ পদার্থও সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। বুঝিয়া দেখ, বেতাল নামে একটা পদার্থ আছে, এইরূপ জ্ঞান যদি না থাকে, তাহা হইলে বালকের মনে কদাচ বেতালমূর্ত্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। হে সৌম্য! স্বপ্ন জগতে

ইহা স্বপ্ন, এইরূপ জ্ঞানের উদয় মাত্র যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়,—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ অলীক বলিয়া মনে হয়, তেমনি জাগ্রদবস্থাতেও যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখনই পৃথ্ব্যাদিরূপে পরিস্ফুট পদার্থও মুহূর্ত্তমধ্যে অকিঞ্চিৎ বলিয়া ধারণা হয়; তখন পৃথ্ব্যাদিতে আর পৃথ্ব্যাদি জ্ঞান থাকে না। পৃথ্ব্যাদি পদার্থে যখন আকাশ জ্ঞান জন্মে, তখন উহা আকাশস্বরূপেই অনুভূত হয়। দেখ নাই কি, যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, ভিত্তিভূমিতেও তাহাদের শূন্য বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে? স্বপ্নাবস্থায় কোন নগর কিম্বা ভূভাগ শূন্য বা খাত বলিয়া ধারণা জন্মে, কিন্তু এ দিকে আবার স্বপ্ন-সম্প্রাপ্ত কামিনী শূন্যময় হইলেও মানবগণের প্রয়োজন সাধন করে। আকাশকে পৃথ্ব্যাদি বলিয়া জ্ঞান কর, উহা মুহূর্ত্তমধ্যে পৃথ্ব্যাদিরূপে প্রতিভাত হইবে। কাহারও কাহারও নিকট মূর্চ্ছাবস্থাতেও পরলোক প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। বালকেরা আকাশকেই বেতাল বলিয়া অবলোকন করে; মরণোন্মুখ মানবেরা অম্বরে অরণ্যসন্নিবেশ দেখে, কেহ আকাশকে কেশোণ্ড্রক এবং কেহ কেহ বা মুক্তাময় বলিয়া মনে করে। ভীত, উন্মত্ত, অর্দ্ধনিদ্রিত কিম্বা নৌকাযানে আরোহী ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই আকাশে বেতাল ও বন-বৃক্ষাদির সমাবেশ সুস্পষ্ট সন্দর্শন ও সম্যক্ অনুভব করে। অতএব বুঝিয়া দেখ, এই যে কিছু পদার্থপরম্পরা, ইহাদের আকার অভ্যাস বশতঃ যেমন যেমন ভাবনা করা যায়, তদনুরূপই প্রতিভাত হইয়া থাকে; প্রত্যুত পার-মার্থিক আকার ইহাদের একটীরও নাই। অর্থাৎ যে যেমন ভাবনা করে, তাহার ফল সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মকে ভাবনা করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি নিশ্চিতই ঘটে। জ্ঞান অসীম প্রভাবসম্পন্ন এবং অজ্ঞানের অপকারিতাও অনন্ত। জ্ঞান যেমন সমস্ত সংসারকে অলীক ও অমূলক বা অকিঞ্চিৎ করিয়া দিয়া মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দেয়, এদিকে অজ্ঞান তেমনি নিখিল দৃশ্যকে সত্যরূপে চিরস্থায়ী করিয়া বারম্বার বন্ধন-ঘটনা করায়। যাহা অজ্ঞান, তাহা অন্ধকারস্বরূপ এবং যাহা জ্ঞান, তাহা আলোকস্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে হৃদয়মন্দির যখন পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন উহাতে পরমাত্মার পরমমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন স্বর্গের সহজ সুগম সোপান, অজ্ঞান তেমনি নিরয়-নিপাত ও বন্ধন-ভোগের প্রশস্ত পথ। মৃত্যুকালে

লোকে যেমন আকাশে অরণ্যাদি অবলোকন করে, মূর্চ্ছাবস্থায় তেমনি পরলোকও প্রত্যক্ষ হয়। ভয়, ক্ষয়, অর্দ্ধনিদ্রা ইত্যাদি কালে যেরূপ অবাস্তব পদার্থসমূহ বাস্তববৎ অনুভূত হয়, পৃথ্ব্যাদির জ্ঞান থাকিলেই তেমনি এই অসৎ দেহও সৎরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সংসারের কিছুই কিছু নহে। অজ্ঞানকৃত অভ্যাস বশেই সমস্ত সত্যবৎ অনুভূত হইয়া থাকে। ভ্রান্তিই বস্তুজ্ঞানের উদ্ভাবয়িত্রী। এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা বস্তুগত্যা শূন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একমাত্র অজ্ঞানই উহার স্বরূপ ও স্থায়িত্বাদি কল্পনা করে; কিন্তু জ্ঞান উহা প্রতিহত করিয়া থাকে। জীবের আবরণ অজ্ঞান, জ্ঞান সাক্ষাৎ প্রকাশ। অজ্ঞানের আবরণ কাটিয়া গেলেই স্বর্গীয় সুখময় পন্থা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এই পৃথিব্যাদি যে কিছুই নহে, একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাহা অবধারিত হইয়া থাকে। এই জন্য জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তি এবং অজ্ঞান মূর্ত্তিমান্ বন্ধন বলিয়া অভিহিত। জ্ঞানযোগে দৃষ্টি যেমন প্রসন্ন পূর্ণভাবাপন্ন হয়, অজ্ঞানের উদয়ে তেমনি উহা মলিন, ক্ষীণ ও দীন দশায় পতিত হয়। যেখানে যেখানে অজ্ঞান, সেই সেইখানেই বিবিধ বিপদ, বিষাদ, দুঃখ এবং সেই সেইখানেই বন্ধনের পর বন্ধন।

এই যে জগৎ ইহা কিছুই নহে; এই প্রকার জ্ঞান দ্বারাই পৃথিব্যাদির শূন্যতা, অসারতা, অবাস্তবতা ও নাস্তিতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। রাজমহিষী লীলাও পৃথিব্যাদির যথাযথ নাস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, একমাত্র চিদাকাশই ভ্রান্তিবশে নানারূপে প্রতিভাত হয়। একমাত্র চিদাকাশ ব্রহ্মই সমস্ত, ব্রহ্মই জগৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ আর কিছুই নহে, এই প্রকার জ্ঞান-যোগসম্পন্ন ঋষিগণের নিকট পুত্র কলত্র ও মিত্রাদি কিছুই নয়; তাঁহারা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাকেও আত্মীয় জ্ঞান করেন না; সুতরাং তাঁহাদের পুত্রাদিই বা কে? আর তাহারা কেমন করিয়া কোথা হইতে কখন আসিয়া সমুদিত হইবে? ফলে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের পুত্রাদি বুদ্ধি একেবারেই থাকে না। দৃশ্য পদার্থের উৎপত্তিই আদৌ নাই; যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, এতৎসমস্তই সেই অজ অনন্ত ব্রহ্ম। যাঁহারা সম্যক্‌দর্শী হয়েন, তাঁহাদের আবার রাগ-দ্বেষ-মমতাদি-দৃষ্টির সম্ভাবনা

কোথায়? অতএব বুঝ, লীলা যে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তক করতলে স্পর্শ করিলেন, তাহা পুত্র-বুদ্ধিতে নহে; কেন না, লীলার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় জ্যেষ্ঠ-শর্ম্মাকে তাঁহার পুত্র বলিয়া বোধই ছিল না। কাজেই তিনি তখন মাতৃভাবে দর্শন দেন নাই; তবে যে মস্তকে হস্তপ্রদান, তাহা কেবল সেই জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্ব-সঞ্চিত সুকৃতির প্রভাবে পরমার্থপ্রতিপাদক চিতির ফল।

হে রঘুনন্দন! যখন তত্ত্ববোধের উদয় হয়, তখন আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সুবিশুদ্ধ ব্রহ্মবস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে। স্বপ্নে কিম্বা সঙ্কল্প-পুরী প্রভৃতিতে যাহা কিছু অনুভূত হয়, সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থই এক-মাত্র ব্রহ্ম।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! উক্ত ললনাদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী, সেই গিরিগ্রামস্থিত ব্রাহ্মণের ভবনমধ্যেই সহসা অন্তর্হিত হইলেন। 'বনদেবীদ্বয় আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন' এই ভাবিয়া সেই গৃহের জনগণ সকলেই সমাশ্বস্ত হইল। তাহাদের শোকতাপ দূর হইলে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব ব্যাপারে নিরত হইল। এ দিকে ব্যোমরূপিণী লীলা সেই মণ্ডপাকাশেই বিলীন হইয়া বিস্ময়ে যেন তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তখন ব্যোম-রূপিণী সরস্বতী তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

এই সময় রামচন্দ্র যেন একটু সন্দিহান হইলেন। ব্যোমদেহ-ধারিণী অদৃশ্য রমণীদের আবার কথাবার্ত্তা কি? এইরূপ একটা সন্দেহের ভাব রামের আকারে স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইল। বশিষ্ঠ সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ংই আবার তৎসমাধানের জন্য বলিতে লাগিলেন, বৎস! দৈবানুগ্রহে, স্বপ্নে কিম্বা সঙ্কল্পে, যেখানে যাহাদের কথোপকথন হয়, সেখানে তাহাদের সে কথোপ-

কথনও যেমন কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, তেমনি লীলা ও সরস্বতী অদৃশ্যভাবে থাকিলেও তাঁহাদের সেই পরস্পর কথোপকথন কার্য্যতঃ পরিণত হইয়াছিল। সেই দুই ললনার পার্থিব দেহ, নাড়ী বা প্রাণাদি কিছুই নাই, তথাপি স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের ন্যায় তাঁহাদের কথোপকথনরূপ চেতনার অভ্যুদয় হইয়া হইয়াছিল! যাহা হউক, সরস্বতী লীলাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন,—লীলা! তোমার যাহা জানিবার, তাহা তুমি নিঃশেষরূপে জানিয়াছ। দৃশ্য পদার্থপরম্পরা যে কি, তাহাও তুমি দেখিয়াছ। অর্থাৎ সংসার যে কিছুই নহে, তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এই ব্রহ্মসত্তা এইরূপই বটে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থাতেই সংসার ভ্রম জন্মে, কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয়ে তাহা তিরোহিত হয় এবং স্বস্বরূপ মাত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক্ষণে তোমায় বলি, তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, তুমি বল।

লীলা কহিলেন,—দেবি! মদীয় মৃত ভর্ত্তা মহারাজের জীব যেখানে রাজত্ব করিতেছেন, আমি সেখানে গিয়াছিলাম। তখন আমায় কেহই দেখিতে পায় নাই কেন? আর এখানেই বা আমার পুত্র আমায় দেখিতে পাইল কিরূপে? ইহার কারণ কি?

সরস্বতী কহিলেন,—বৎসে! দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত না হইলে কখন সত্য-সঙ্কল্প হওয়া যায় না; সুতরাং তুমি যখন স্বামীর সমীপে গিয়াছিলে, তখন তোমার অভ্যাসযোগ তাদৃশ পরিপক্ক হয় নাই, এবং 'আমি রাজমহিষী লীলা' এরূপ দ্বৈত জ্ঞানেরও তখন তোমার সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। হে বরবর্ণিনি! যে ব্যক্তি অদ্বৈতভাবাপন্ন হইতে পারে না, সে কিরূপে অদ্বৈত-কর্ম্মের ফল লাভ করিবে? বুঝিয়া দেখ, যে ব্যক্তি আতপে থাকে, সে কি কখন ছায়াবস্থানের যে কি শৈত্যসুখ, তাহা অনুভব করিতে পারে? তোমার অভ্যাস তেমন ছিল না, তাই তোমার স্বামি-সন্নিধানে অবস্থিতি কালে 'আমি রাজমহিষী লীলা' এরূপ দ্বৈতভাব তিরোহিত হয় নাই; কাজেই তখন তোমার সত্যসঙ্কল্পতাও জন্মে নাই। এক্ষণে তুমি সত্য সঙ্কল্পা হইয়াছ অর্থাৎ তোমার জ্ঞান বিশিষ্টরূপে পরিপক্ক হইয়াছে; তুমি যাহা কামনা কর, তাহাই সুসিদ্ধ হইতে পারে। এইজন্যই 'আমার পুত্র

আমায় দর্শন করুক' তোমার এই কামনা বা সঙ্কল্প এক্ষণে সত্য বা সিদ্ধ হইয়াছে। হে সুন্দরি! এখন যদি তোমার স্বামীর সমীপে যাও, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আবার তোমার পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহারও চলিতে পারিবে।

লীলা কহিলেন,—দেবি! এই যে গৃহাকাশ, এইখানেই সেই বশিষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ আমার ভর্ত্তা হইয়াছিলেন। পরে এইখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুর পর তিনি এইখানেই বসুধাধিপতি হয়েন। সেই এই ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে এই সংসারেই তথাবিধ রাজধানীতে আমি লীলা তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলাম। এই সেই অন্তঃপুরেই আমার পতি ভূপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সেই এই অন্তঃপুরাকাশেই বসুধাপীঠে তিনি নানাজনপদের অধিপতি রাজা হইয়াছিলেন। আমি মনে করি, সম্পুটকের অভ্যন্তরে যেমন সর্ষপসমূহ অবস্থিত, তেমনি এই মণ্ডপাকাশেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভূমি বিরাজিত। মদীয় স্বামীর সংসারমণ্ডলও আমি সন্নিকটেই অবস্থিত আছে বলিয়া মনে করিতেছি। যাহা হউক, আমি যাহাতে তাহা আমার পার্শ্বভাগেই দেখিতে পাই, আপনি তাহার একটা উপায় করিয়া দিন।

দেবী কহিলেন,—অয়ি বৎসে, ভূতলস্থা অরুন্ধতি! তুমি বহুবার জন্মিয়াছ, প্রতি জন্মে তোমার এক এক ভর্ত্তা হইয়া বহু ভর্ত্তা অতীত হইয়াছেন। পরন্তু সকল ভর্ত্তার সন্দর্শন লাভ এক্ষণে অসম্ভব। তবে অদূর অতীত কালের মধ্যে তোমার তিন জন ভর্ত্তার উদ্দেশ আছে। সেই সন্নিহিত ভর্তৃত্রয়ের মধ্যে বশিষ্ঠনামক ব্রাহ্মণ ভস্মীভূত হইয়া এইখানেই পদ্মনামে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই শবদেহ অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্পমাল্যে সমাচ্ছাদিত হইয়া সুরক্ষিত ছিল। তিনিই আবার এই মহীমণ্ডলে তৃতীয় বিদূরথ নামে বসুধাধিপতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার এক্ষণে কঠোর সংসারভাব উপস্থিত। তিনি ঘোরতর সংসারসাগরে পতিত হইয়া একান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল এবং সংসারাব্ধির ভোগ-কল্লোলের কলনায় অতীব বিকল। তাঁহার চেতনা মলিন হইয়াছে ও চিদ্‌বৃত্তি জড়তায় জর্জ্জর হইয়া গিয়াছে। তিনি অধুনা সংসারজলধির কূর্ম্মাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। 'নানাবিধ

কঠিন কঠিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাঁহার এক্ষণে সর্ব্বদাই ব্যগ্রতা। তিনি জড়তায় সুপ্ত আছেন; পরন্তু ভবভ্রমে জাগরিত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহার মনে হইতেছে, আমি সকলের প্রভু, আমি অদ্বিতীয় ভোগী, আমি সিদ্ধিসম্পন্ন, আমি বলবান্, আমি সুখী। এইরূপে শত শত অনর্থপরম্পরা-রূপ রজ্জুতে তিনি আবদ্ধ; সুতরাং তাঁহার কিছুই স্বাতন্ত্র্য নাই। হে বরবর্ণিনি! এই আমি তোমার সন্নিহিত কালের ভর্ত্তৃত্রয়ের কথাই কহিলাম। তুমি অধুনা কোন্ ভর্ত্তার নিকট যাইতে চাও বল; আমি তোমায় সমীরণ কর্ত্তৃক একবন হইতে বনান্তরে সুরভিকণা বহিয়া লইয়া যাইবার ন্যায় সত্বর তথায় লইয়া যাইব।

বৎসে! তুমি তোমার ভর্ত্তার সংসার দেখিতে চাও, সে সংসার অন্যরূপ এবং তাহা অপর ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপের অন্তর্গত। সে সংসারে যে ব্যবহার-পরম্পরা প্রচলিত আছে, তাহাও অন্যরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই সংসারমণ্ডল তোমার পার্শ্বে রহিয়াছে বটে; কিন্তু সংসারদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখিবে তাহা এ সংসার হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত। যদি জ্ঞাননেত্রে দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, ঐ সংসারসমূহের মূর্ত্তি আবার আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে এবং ঐ আকাশ-মূর্ত্তিময় সংসারেই আবার কোটি কোটি মেরুমন্দরাদি ভূধর বিরাজমান। যেমন দিনকর-কিরণে অনন্ত ত্রসরেণু স্ফুরিত হয়, তেমনি মহাচৈতন্য হইতে প্রতি পরমাণুতে পরমাণুতে অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ অপ্রতিহতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ সৃষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা যতই কেন মহারম্ভ ও গুরুত্বগুণশালী হউক না, চিৎসৃষ্টির তুলনায় প্রমাণে উহা ক্ষুদ্র বটবীজের স্থানও অধিকার করিতে পারে না। আকাশে নানা রত্নকিরণ বিচ্ছুরিত হইলে উহা যেমন একটা বন-সন্নিবেশের ন্যায় প্রতিভাত হয়, এই জগতের অবস্থাও সেইরূপ। বাস্তব পক্ষে উহাকে চিতিরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, উহাতে পৃথিব্যাদি ভূতসম্পর্ক একেবারেই নাই। তবে যে জগদ্দর্শন হয়, সেটা কেবল সুদৃঢ় মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবিশেষেরই প্রভাব। ভ্রান্তিই আত্মাতে জগৎরূপে পরিস্ফুরিত হয়; পরন্তু বস্তুগত্যা সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথ্ব্যাদি-সম্পন্ন কোন কিছুরই একটা অস্তিত্ব ছিল না।

সরোবরে তরঙ্গ যেমন বার বার উত্থিত হইয়া বিলয় পায়, তেমনি বিচিত্রাকার কালের অঙ্গ দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস ও বর্ষাদি এবং ভুবনাদি নিখিল দেশ, জ্ঞানরূপ মহাচৈতন্যে বারম্বার উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়া থাকে।

লীলা কহিলেন,—হে জগদম্বিকে! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা এইরূপই বটে। অধুনা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে,—আমার এ জন্ম তামসিক বা সাত্ত্বিক নহে। এ জন্ম আমার রাজসিক। আর ইহাও এক্ষণে আমার চক্ষে স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে, আমি ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া এতাবৎকাল নানাযোনিতে অষ্টাধিক শত জন্ম যাপিত করিয়াছি। সেই সকল জন্ম পর পর আমার স্মৃতিপটে এখনও সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে। দেবি! আমার বিলক্ষণ মনে পড়ে, আমি পূর্ব্বে কোন এক সংসারমণ্ডলে জনৈক বিদ্যাধরের প্রণয়িনী ছিলাম। সেই লোকান্তর যেন একটি পদ্ম, আমি যেন তাহাতে ভ্রমরীর ন্যায় বিরাজ করিতাম। পরে একদা আমার চিত্ত দুর্ব্বাসনায় কলুষিত হইল। আমি মনুষ্য হইয়া জন্মিলাম। পরে অন্য এক সংসারমণ্ডলে আমার জন্ম হয়; সেখানে আমি এক পন্নগরাজের প্রেয়সী হই। অনন্তর আমি কোন এক কৃষ্ণবর্ণা চাণ্ডালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। এই জন্মে আমার পরিধেয় ছিল পত্র-বসন। আমি কদম্ব, কুন্দ, জম্বীর ও করঞ্জবনে বাস করিতাম। বনবাস নিবন্ধন তখন আমার ধর্ম্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না; সুতরাং দুষ্কর্ম্ম সঞ্চয়ে আমি দিন দিন অতীব উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই কারণে পরে আমাকে এক পল্লব-পাণি-শালিনী বনবাসিনী লতা হইয়া জন্ম লইতে হয়। তখন আমি কোন এক পুণ্যাশ্রমের লতা ছিলাম। সুতরাং মুনিগণের সঙ্গ-গুণে আমার দেহ সে সময় পবিত্র হয়। এই পবিত্রতার ফলে আমি কিয়ৎকাল পরে বনাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তথাকার জনৈক মুনিপ্রবরের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। অনন্তর কৃতকর্ম্মের পরিণামে আমি পুরুষ হইয়া জন্ম লই। আমি তখন যে সে পুরুষ ছিলাম না; আমি তৎকালে এক রাজা হইয়াছিলাম। সৌরাষ্ট্র আমার রাজধানী ছিল। আমি অসীম ভাগ্যলক্ষ্মী লাভ করিয়া ঐ জন্মে শত বর্ষ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলাম। সেই

রাজত্ব কালে পাপকর্ম্মের ফলে তালীবনের জলপ্রায় তলদেশে আমাকে এক নকুলী হইয়া জন্ম লইতে হয়। সেই জন্মে গলিতকুষ্ঠ রোগে বিকলাঙ্গ হইয়া নয় বৎসর কাল অতিবাহিত করি।

হে দেবি! অনন্তর মোহবশতঃ ঐ সুরাষ্ট্র দেশেই আমি গোজন্ম প্রাপ্ত হইয়া দুষ্ট দুর্জ্জন মূর্খ গোপাল-বালকদিগের সহিত লীলা ক্রমে আট বর্ষ যাপন করি। পরে কোন বনভূমিতে আমাকে বিহঙ্গী হইয়া জন্মিতে হয়। এই জন্মে এক দিন আমি ব্যাধ-বাগুরায় পতিত হই এবং নিকৃষ্ট বাসনার ন্যায় অতি কষ্টে সেই বাগুরা ছিন্ন করিয়া ফেলি। অনন্তর একটী ভ্রমরী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই জন্মে আমি কমল-কর্ণিকার ক্রোড়-শয্যায় ভৃঙ্গসহ বিশ্রাম করিতাম এবং কমল-মুকুলের কোশ মধ্যে গিয়া একান্তে কিঞ্জল্ক ভোজন করিতাম। অনন্তর এক মনোহর-নয়না হরিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই জন্মে আমি উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গশালিনী রম্য রম্য বনস্থলীতে বিচরণ করিতাম। একদা এক ব্যাধ আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে; তাহাতেই আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই।

অনন্তর আমাকে এক মৎস্যী হইয়া জন্মিতে হয়। পরে সাগর-কল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে কোন এক কূর্ম্মপৃষ্ঠে গিয়া আরোহণ করি এবং দিগ্‌ভ্রম-বশতঃ জনৈক ধীবরসমীপে উপনীত হই। ধীবর আমাকে আঘাত করে; কিন্তু তাহার সে আঘাত কূর্ম্মপৃষ্ঠে পড়িয়া ব্যর্থ হয়। আমি আবার সাগর-জলে পতিত হই। ইহার পর চর্ম্মণ্বতী নদীর তীর ভূমিতে কিরাতী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই জন্মে আমি মধুর স্বরে গান করিতাম এবং কিরাতদের সহিত সঙ্গম সমাধা করিয়া নারিকেল-রসের আসব পান করিতাম।

অতঃপর ঐ জন্মের অবসানে আমাকে এক সারসী হইয়া জন্ম লইতে হয়। প্রেমবতী অলিবধূর ন্যায় আমি তখন কোন এক পদ্মিনীর উপর নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতাম এবং এই অবস্থায় থাকিয়া সীৎকারবশতঃ মধুর স্বর ও বৈর সুরতাদি দ্বারা আমার প্রাণপতিকে প্রীত করিতাম। কখন বা তাল ও তমালকুঞ্জে মদাঘূর্ণিত চঞ্চল-নয়নে কান্তকে আমি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকিতাম। ইহার পর আমি স্বর্গের এক অপ্সরা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তৎকালে আমার কনকস্যন্দ-সুন্দর অঙ্গমাধুর্য্য ছিল।

আমার সেই অঙ্গ-মধুরিমায় আমি তখন সুরগণ-রূপ মধুকর-নিকরের সন্তোষ সাধন করিতাম। এই অবস্থায় কখন সুমেরুশৈলস্থ কল্পপাদপের কাননে এবং কখন বা মণি, মাণিক্য, কাঞ্চন ও মুক্তরাজি-রাজিত ভূভাগে যুবজনের সহিত রতিরঙ্গ-রসে মগ্ন হইতাম। ইহার পর আমি এক কচ্ছপী হইয়া জন্মিয়াছিলাম। এই জন্মে আমাকে কখন সাগরতরঙ্গ-সঙ্কুল জলপ্রায় দেশে এবং কখন কখন বা লতাগুচ্ছময় বেলাভূমিস্থিত বনগুহায় বাস করিতে হইত। ঐ অবস্থায় আমার বহুকাল অতিবাহিত হয়।

ইহার পর আবার আমার জন্ম হয়। সে জন্মে আমি রাজহংসী হইয়া তুঙ্গতরঙ্গসঙ্কুল সরোবরসমূহে বিচরণ করিতাম। তখন পদ্মভ্রমে মদীয় চঞ্চল ছন্দশালী শুভ্র পক্ষপংক্তিতে বসিয়া শত শত অলি সানন্দে আন্দোলিত হইত। অনন্তর একদিন দেখিলাম, একটী শাল্মলীশাখা দুলিতেছে; তাহাতে বহু মশক বসিয়া আছে। তন্মধ্য হইতে একটী মশক বিচ্যুত হইয়া পুনরায় তাহাতে বসিবার চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না; শাল্মলীশাখার ঘন ঘন আন্দোলনে তাহার দীনদশা উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সেই সংস্কারের সহিত আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম। তখন হংসদেহের অবসানে আমার মশকদেহ আবির্ভূত হইল। আমি সেই দেহে দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তৎপরে একটী বেতসলতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম। এই অবস্থায় আমি তুঙ্গতরঙ্গ-সঙ্কুল গিরি-নদীর চঞ্চল তরঙ্গ চুম্বনে নিয়ত ব্যাকুলিত হইয়া রহিতাম। অনন্তর আমি এক বিদ্যাধর কুলে বিদ্যাধরী হইয়া জন্মিয়াছিলাম। তখন গন্ধমাদন ও মন্দার গিরির উপরিস্থিত মন্দির মধ্যে মদনাতুর হইয়া কত বিদ্যাধরকুমার আমার পাদতলে পতিত হইয়াছিল। সেখানে আমি চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রকান্তির ন্যায় কর্পূরপূর-বিকীর্ণ শয়নে শয়ন করিতাম বটে; কিন্তু তখন অধিকাংশ সময় ব্যসনেই আমার অতীত হয়।

দেবি! দুর্ব্বার বাতবেগে হরিণী যেমন বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে, সেইরূপ আমি নানাদুঃখময় নানাযোনিতে জন্ম লইয়া সংসাররূপ দীর্ঘ তটিনীর চঞ্চল তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় কখন উন্নত হইয়াছি এবং কখন বা অবনত হইয়াছি। এই ভাবেই ব্যাকুল দেহে নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইয়াছি।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনে! সেই ললনাদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী কিরূপে কোটী যোজনায়ত বজ্রসার নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! কোথায় ব্রহ্মাণ্ড! কোথাই বা তাহার ভিত্তি! আর তাহার ঐ বজ্রসারতাই বা কোথায়? বস্তুতঃ সে কিছুই নহে। সেই মহিলাদ্বয় অপর কোথাও যান নাই, কোথা হইতে বহির্গতও হন নাই; তাঁহারা সেই অন্তঃপুরাকাশেই ছিলেন। সেই গিরিগ্রামের সেই গৃহাকাশে থাকিয়াই বশিষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ রাজ্যসুখ ভোগ করেন। তিনি রাজা হইয়া সেই শূন্যমাত্র মণ্ডপাকাশেই চতুরুদধি পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল ভোগ অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহারা পতিপত্নী সেই আকাশাত্মক ভূমণ্ডলেই রাজপুরী ও রাজভবন অনুভব করেন। সেই ব্রাহ্মণবনিতা অরুন্ধতীই লীলানামে রাজমহিষী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনিই জপ্তি-দেবীর আরাধনা করেন। অনন্তর তাঁহার সমভিব্যাহারে অত্যাশ্চর্য্য মনোহর নভোমণ্ডল উল্লঙ্ঘন করেন। তাঁহারা যে অন্যত্র কুত্রাপি গিয়াছিলেন, তাহা নহে; সেই প্রাদেশ-পরিমিত হৃদাকাশ মধ্যেই তাঁহারা গৃহাকাশ দেখিয়াছিলেন। সেই গিরিগ্রামস্থিত মন্দির মধ্যে সেই আকাশেই তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডান্তর প্রাপ্তি হয় এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে নির্গত হইয়া সেই স্বগৃহেই তাঁহারা অবস্থান করেন। শয্যাশায়ী পুরুষ যেমন স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হইয়া নানা-দেশ দেশান্তর দর্শন ও ভ্রমণ করে, তাঁহাদের সেই তাৎকালিক অবস্থাও সেইরূপই হইয়াছিল। ফলতঃ এই সমস্তই প্রতিভামাত্র; সকলই আকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড, সংসার, ভিত্তিপ্রভৃতি বা দূরত্ব, এ সমস্ত কিছুই নাই। তাঁহাদের স্ব স্ব চিত্তই কেবল মাত্র বাসনা দ্বারা সমুদায় ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ মনোহর দৃশ্যাকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। নতুবা ব্রহ্মাণ্ডই বা কোথায়? আর সংসারই বা কোথায়? স্পন্দন

হইলে আকাশকেই যেমন বায়ু বলিয়া কল্পনা করা হয়, তেমনি তাঁহাদের কল্পনাতেই এই অনন্ত চিদাকাশ নিরাবরণ ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পিত হয়। সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই এই চিদাকাশ জন্ম-বর্জ্জিত, শান্ত। চিত্ত কল্পনায় স্বয়ংই ইহা আত্মা দ্বারা আত্মাতে জগদাকারে পরিস্ফুরিত হয়। এই রহস্য যিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার নিকট উহা আকাশ অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়। আর ঐ রহস্য বুঝিবার যাঁহার ক্ষমতা নাই, তিনি উহাকে বজ্রসার অচলের ন্যায় কঠিন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। স্বপ্ন দেখিবার সময় গৃহে থাকিয়াই যেমন ভাস্বর নগর নেত্রগোচর করা হয়, তেমনি এই সংসার অসার বা অসৎ হইলেও চিৎ পদার্থেই উজ্জ্বল ও সত্যাকারে স্ফুরিত হইয়া থাকে। মরুস্থলীতে জল জ্ঞান এবং কনকে কটকত্ব জ্ঞানের ন্যায় এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ অসৎ হইলেও আত্মাতে সৎ বলিয়া প্রতীত হয়।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইরূপ কহিয়া আবার কহিলেন,—বৎস! সেই ললিতাকৃতি ললনাদ্বয় পূর্ব্ববর্ণিতরূপে কথা কহিতে কহিতে চারু চরণ বিন্যাস করত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গ্রামস্থ কোন লোকই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। তাঁহারা কিয়দ্দূরে গিয়া সম্মুখেই এক গিরি দর্শন করিলেন। ঐ গিরি যেন গগনের মধ্য ছিদ্র চুম্বন করিয়া, চণ্ডাংশু-মণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। উহার অরণ্যময় প্রদেশে নানাবিধ নানাবর্ণ ফুল্ল কুসুম-শালী তরুলতাবলী বিরাজমান। তাহাতে ঐ গিরি অতীব শোভমান। উহার কোথাও নানাবিধ নির্ঝর-নিনাদ উত্থিত হইতেছে; কোথাও বন-বিহঙ্গমেরা কূজন করিতেছে; কোথাও মেঘমালা মঞ্জরীপুঞ্জে পিঞ্জরাভ হইয়া বিচিত্রাকার দৃষ্ট হইতেছে; কোথাও শুভ্র শুভ্র অভ্রখণ্ড মিলিত রহিয়াছে এবং কোথাও কোথাও গুলুচ্ছলতার অগ্রে বসিয়া সারস পক্ষীরা বিশ্রাম করিতেছে। ঐ গিরির মধ্য দিয়া নানা নদী প্রবাহিত। নদীনিচয়ের তটে তটে অসংখ্য জলবেতস বিরাজিত। উহাদের সুদৃঢ় মূল বিস্তারে ঐ সকল তটভূমি সুরক্ষিত। উহার কোথাও গর্ত্ত হইতে উৎপন্ন নিরবলম্বন লতা-রাজি মারুত কর্ত্তৃক আবর্ত্তিত হইতেছে। কোথাও বিকসিত কুসুম-শোভী ভ্রমরাজি আকাশ-কোণস্থ জলদজাল আবৃত করিতেছে। কোথাও দীর্ঘ নদীস্রোতঃ নিপতিত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় শোভিত হইতেছে। কোথাও

বায়ুভরে বৃক্ষবহুল বনরাজি বিচলিত ও নদীতট বেষ্টনশীল হইতেছে; কোন স্থান নানা বন-বেষ্টিত প্রান্তভাগের ছায়ায় সতত শীতল রহিয়াছে।

অনন্তর সেই মহিলাদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী তথাকার কোন এক স্থানে তৎকালে আকাশচ্যুত স্বর্গখণ্ডের ন্যায় সেই গিরিগ্রাম স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, গ্রাম মধ্যে নানাবিধ জলপ্রণালী রহিয়াছে; ঐ সকল প্রণালী দিয়া জল-নির্গমনের শব্দ হইতেছে। কত স্থানে কত জল-পরিপূর্ণ পুষ্করিণী রহিয়াছে। গ্রামে বহুতর জলপ্রায় গর্ত্ত আছে; গ্রামবাসীরা তাহাতে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ঐ সকল গর্ত্তে বিহঙ্গমেরা কুচ কুচ শব্দে কূজন করিতেছে। গ্রামের কোন স্থান দিয়া গোযূথ গমন করিতেছে, তাহাদের হুঙ্কাররবে কুঞ্জবনগুলি ভয়াবহ হইতেছে। অনেক স্থান কুঞ্জ ও গুল্মখণ্ডে পরিব্যাপ্ত এবং কোন কোন স্থানে ছায়াসম্পন্ন নিবিড় শাদ্বল-ভূমি বিরাজিত। কোথাও বা দিবাকর-কিরণের প্রবেশাধিকার নাই। কোন কোন স্থান শিলা ও নীহার জালে ধূসরাকার। কোথাও তরুশাখা সকল উন্নতাগ্র মঞ্জরী-পুঞ্জে জটার ন্যায় লম্বমান; কোথাও শিলাকুহরে সলিল আস্ফালিত হইতেছে; তাহাতে মুক্তার ন্যায় জলবিন্দু সকল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। উহা দেখিবামাত্রে মন্দরান্দোলিত ক্ষীরোদ-নীরধির রূপশ্রী স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে চত্বরভূমিতে কত শত তরুরাজি বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল তরু ফল ও পুষ্পসম্ভারে সর্ব্বদাই সুশোভিত। মনে হয়, যেন মানবেরা ফল-কুসুম লইয়া পান্থজনের অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। কোথাও রস-পরিপূর্ণ পাদপেরা তরঙ্গ-ঝঙ্কারকারী মারুতবেগে বিধূত হইয়া অর্বিবর্ণে কুসুমসমূহ বর্ষণ করিতেছে। কোথাও বিবিধ বিহঙ্গমেরা নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু তাহাদের কোন শঙ্কা না থাকিলেও শিলাশিখর হইতে যে সকল জল-বিন্দু পতিত হইতেছে, ঐ জল-পতন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহারা কার্ম্মুক-টঙ্কার ভ্রমে শঙ্কিত ও তরুশাখান্তরে বিলীন হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কলরব করিতেছে। কোথাও নদী হইতে উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইতেছে, তত্তৎ-পরিস্থিত হংস সকল শ্রান্ত হইয়া অম্বুকণার আস্বাদনে ব্যগ্র হইতেছে এবং নক্ষত্রের ন্যায় এক দিক্ হইতে অন্য দিকে গিয়া নিপতিত হইতেছে।

কোথাও বালকেরা প্রাতে একবার আহার করিয়াছে, পরক্ষণে আবার আহার করিবার জন্য আমিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছে; কিন্তু অদূরে উন্নত তালতরুতে কাক দেখিয়া পাছে কাকে উহা লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় লুকাইয়া রাখিতেছে। কোথাও গ্রাম্য-বালকেরা ফুলের বসন ও ফুলের ভূষণ পরিয়া বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে খর্জ্জুর, নিম্ব ও জম্বীর বন থাকায় উপান্তভূমি শীতল হইতেছে। কোথাও কোথাও দরিদ্র, অধম, অকর্ম্মণ্য, অলস ব্যক্তিদিগের রমণীরা ক্ষুধায় ক্ষীণাঙ্গী হইয়া পথে পথে বিচরণ করিতেছে। উঁহারা অতসী বল্কলের বসন পরিয়াছে এবং কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী লম্বিত করিয়াছে। গ্রামবাসীরা উহাদিগকে কীটের ন্যায় অবজ্ঞা করিতেছে। কোথাও নদীতরঙ্গের সঙ্ঘর্ষ-কল্লোলরব উত্থিত হইতেছে; তাহাতে জনগণের পরস্পরালাপ কিছুমাত্র শ্রুত হইতেছে না। কোথাও গ্রামস্থ কর্ম্মাক্ষম, ভীত ও অলস ব্যক্তিরা নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে বাস করিবার বাঞ্ছা করিতেছে। কোথাও কতকগুলি উলঙ্গ বালক সর্ব্বাঙ্গ গোময় ও কর্দ্দম-রেখায় অঙ্কিত করিয়াছে এবং হস্তে করিয়া সুন্দর সুন্দর পুষ্পলতা লইয়াছে। তাহাদের মুখ, হস্ত ও স্কন্ধ দধি দ্বারা লিপ্ত হইয়াছে। তাহারা মহাস্ফূর্ত্তিতে চত্বর-ভূমিতে নৃত্য করিতেছে। কোথাও দোলার ন্যায় আন্দোলনময় নদীতরঙ্গে তীরস্থিত তৃণরাশি কম্পিত ও জল প্রবাহে সৈকতময় তীরভূমি রেখাঙ্কিত হইতেছে। কোথাও দধি-ক্ষীরের গন্ধ পাইয়া মত্ত মক্ষিকারা ধীরে ধীরে উড়িয়া যাইতেছে। কোথাও ব্যাধিগ্রস্ত বালকেরা ইচ্ছামত ভোজন করিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বাষ্পভরে আকুল হইতেছে। কোথাও কর্ম্মনিরত কামিনীরা গৃহ লেপন করিতে গিয়া কর ও বলয় গোময়ে লিপ্ত হওয়ায় অপর নারীর উপর ক্রোধ করিয়া আপনার কেশপাশ বন্ধনে ব্যগ্র বা ব্যতিব্যস্ত হইতেছে এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য লোকেরা হাস্য করিতেছে। কোন কোন স্থানে ইন্দ্রিয়জয়ী ঋষিরা বলিকর্ম্ম সম্পাদনার্থ অক্ষতাদি ফেলিয়া রাখিয়াছেন; গিরিশিখরবাসী বায়সেরা তৎসমস্ত ভক্ষণার্থ আগমন করিয়াছে। ঋষিরা পুষ্প ও পত্র নিক্ষেপে তাহাদিগকে নিঃসারিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে গৃহদ্বার ও রথ্যা সকল ক্রূর কণ্টকময় কুরুণ্টক গুল্মে আকীর্ণ রহিয়াছে। কোথাও

গৃহপার্শ্বস্থ কুসুমিতপ্রভ কুঞ্জ হইতে প্রত্যহ প্রাতে প্রাঙ্গণ মধ্যে রাশি রাশি কুসুম পড়িয়া আগুল্‌ফ আকীর্ণ হইতেছে।

গিরিগ্রামের স্থানে স্থানে জঙ্গল আছে। ঐ সকল জঙ্গল মধ্যে চমর ও সারঙ্গ মৃগেরা বিচরণ করিতেছে। কোথাও গুল্মা নিকুঞ্জ মধ্যে ঘাসরাশি সঞ্জাত রহিয়াছে, মৃগশিশুরা তদুপরি শয়ন করিয়াছে। কোথাও বা গোবৎসগণ একান্তে শুইয়া আছে, তাহাদের কর্ণ-সঞ্চালনে মক্ষিকাকুল নিঃসারিত হইতেছে। কোথাও দধিভোজী গোপগণের মুখলগ্ন দধিকণার উপরি ভাগে মক্ষিকা বসিয়া স্পন্দন করিতেছে। কোথাও গৃহস্বামীরা মক্ষিকাকুল তাড়াইয়া দিয়া গৃহমধ্যে মধু আনিয়া সঞ্চিত করিতেছে। স্থানে স্থানে উদ্যান মধ্যে অশোক তরুরাজি ফুটিয়া আছে, তথায় লাক্ষা-রস-রঞ্জিত কাষ্ঠময় ক্রীড়ামন্দির সকল নির্ম্মিত রহিয়াছে। কত স্থানে কত বিকসিত-কুসুম তরুরাজি বিরাজ করিতেছে; জলবিন্দুবাহী গন্ধবহ-হিল্লোলে উহারা আর্দ্রীকৃত হইতেছে। কোথাও গৃহাচ্ছাদন তৃণরাশি কদম্বমুকুলে প্রোত রহিয়াছে। কোন স্থানে লতাজাল কর্ত্তিত হওয়ায় প্রফুল্ল কেতকী কুসুমে পাণ্ডুরবর্ণ হইয়াছে। কোন কোন স্থানে জল-প্রণালী প্রবাহিত হওয়ায় তাহা হইতে গুর্ গুর্ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোথাও কোথাও সৌধ মধ্যে বিশ্রান্ত বারিদবৃন্দ বাতায়ন পথে বহির্গত হইতেছে। স্থানে স্থানে কত জলাশয় রহিয়াছে; তাহাতে পূর্ণচন্দ্রনিভ ফুল্ল পদ্মদল বিরাজিত রহিয়া অতীব শোভা ধারণ করিতেছে। কোথাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাদ্বলভূমি তরুনিকরের ঘনচ্ছায়ায় শীতল হইতেছে। কত স্থানে কত তৃণরাজির উপর বারিবিন্দু পতিত হইয়া তারকানিকরের আকার ধারণ করিতেছে। নিরন্তর তুষার-পাত ও অবিশ্রান্ত কুসুম বর্ষণে কত স্থানে কত মন্দির শুভ্রবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। স্থান বিশেষে বিবিধ তরুরাজি বিরাজ করিতেছে; বিচিত্র পুষ্পমঞ্জরী ও অনন্ত ফল পত্রে ঐ সকল তরু সমধিক সমুদ্ভাসিত হইতেছে। কোথাও গৃহকক্ষের অভ্যন্তর মেঘসকলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; সুবাসিনী কামিনীরা তদুপরি সুখে শয়ন করিতেছে। কোথাও সৌধ মধ্যে মেঘ খণ্ড প্রবেশ করিয়াছে। ঐ মেঘস্থিত বিদ্যুতের দীপ্তিচ্ছটায় সেখানে আর প্রদীপের প্রয়োজন

হইতেছে না। কোথাও গিরিগুহাগত মারুতের ঝঙ্কার রব উত্থিত হইয়া মণ্ডপসমূহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোথাও মন্দিরসমূহের চারিদিক্ দিয়া চকোর, হারীত ও হরিণীগণ ছুটাছুটি করিতেছে; তাহাতে ঐ মন্দির-গুলি দর্শনীয় হইয়াছে। কোথাও বিকসিত কন্দলী কুসুম মর্দ্দিত করিয়া মৃদুমন্দ সুগন্ধ মারুত বহিতেছে, তাহাতে পাদপরাজির পল্লবদল আন্দোলিত হইতেছে। কোথাও গ্রাম্য ললনাকুল নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া লাবকাদি বিবিধ বিহঙ্গের পরস্পর আলাপ শ্রবণ করিতেছে। স্থানে স্থানে কাক, কোকিল ও দ্রোণ-কাকেরা কোলাহল করিতেছে। কোথাও শাল, তাল ও তমালাদি নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে এবং কোথাও বা তরুদল লতাবলয়ে বেষ্টিত হইয়া সুন্দরাকারে শোভিত হইতেছে।

তাঁহারা দেখিলেন, গিরিগ্রামে যে সকল মন্দির আছে, ঐ মন্দিরগুলি নানারূপে অতীব শোভা ধারণ করিতেছে। উহাদের চতুষ্পার্শ্ব দিয়া যে সকল পথ নানাদিকে উপনীত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থান বিলোল পল্লব-লতায় অবরুদ্ধ রহিয়াছে। মন্দির বৃন্দের পার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থানে কন্দলী ও শিলীন্ধ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধ্য বিস্তার করিতেছে। কোথাও তালী ও তমাল-লতাদি দ্বারা নানামণ্ডপ নির্ম্মিত রহিয়াছে। কোথাও উদ্যান সকল ফুল্ল পুষ্পময় পাদপশ্রেণীর ছায়াবাহুল্যে শীতল হইতেছে। স্থানে স্থানে গোমুখ জল হইতে হম্বারবে উত্থিত হইতেছে। কোন স্থান আনীল শস্য ও কুসুম-সমূহে সমুদ্ভাসিত হইতেছে। কোথাও তীর-তরুর ঘন-সন্নিবেশে নদীবেগ রুদ্ধ হইতেছে। কোথাও ঘন ফুল্ল লতাজাল বিতানশ্রী ধারণ করিতেছে। কোথাও উদ্যান-মধ্যগত ফুল্ল কুসুমবৃন্দের মকরন্দ গন্ধ উত্থিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কমলকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে; গন্ধে অন্ধ হইয়া অলিকুল তাহার উপরিভাগ আবৃত করিয়াছে। অত্রত্য মন্দির বৃন্দের এমনই সৌন্দর্য্য যে, তাহাতে পুরন্দর-পুরীরও সৌন্দর্য্য নিন্দিত হইতেছে। কত স্থানে কত শত শত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে; তাহাদের বায়ু-বিচালিত রজঃপুঞ্জে অম্বরদেশ অরুণিমা ধারণ করিতেছে। কোথাও বেগপ্রবাহিত গিরিনদীগণের ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোন কোন স্থান কুন্দাবদাত জলদজালের প্রভাপটলে প্রভাসিত হইতেছে।

কোথাও সৌধোপরিস্থিত প্রফুল্ল লতাগৃহ সকল উল্লসিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কলকণ্ঠকুল লীলা সহকারে বিলোলিত হইতেছে। কোথাও পুষ্পদলের আস্তরণে যুবকেরা সোল্লাসে শয়ান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিলাসিনী কামিনীরা অবস্থান করিতেছে, তাহাদের পদতল পর্য্যন্ত মাল্য-দাম বিনম্বিত রহিয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই সুন্দর সুন্দর নবাঙ্কুর সকল সুশোভিত আছে। কোথাও শরস্তম্ব সকল লতাজালে জড়িত হইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থান কোমল লতা ও উৎপল সমূহে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে পয়োদপটল পটের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে নীহার-বিন্দুসকল নিপতিত রহিয়াছে, তাহাতে অবিকল হারগুচ্ছের শোভা অনুকৃত হইতেছে। কোথাও সৌধমধ্য-গত মেঘের বিদ্যুদ্বিস্ফুরণে অঙ্গনাগণ চকিত ও আকুলিত হইতেছে। নানাস্থান হইতে নীলোৎপল দলের সৌরভ আসিয়া তত্রত্য মন্দিরবৃন্দ আরও সুন্দর ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। কোন কোন স্থানে মনোহর হম্বারব করিতে করিতে গোযূথেরা হরিত-তৃণ-শ্রেণী ভোজন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া চলিয়াছে। কোথাও গৃহপ্রাঙ্গণে মুগ্ধ মৃগেরা বিশ্রব্ধভাবে বিশ্রাম করিতেছে। কোথাও ময়ূরেরা ঘন সীকরবর্ষী নির্ঝর নিনাদ শ্রবণ করিয়া স্তনিত ভ্রমে নৃত্য করিতে উদ্যত হইয়াছে। কোথাও সুগন্ধ মারুত প্রবাহিত হইতেছে; তাহাতে জনগণের ইন্দ্রিয়বৈরস্য বিদূরিত হইয়া যাই-তেছে। কোথাও বপ্র-দেশে বিবিধ ওষধি আছে। ঐ সকল ওষধির দীপ্তিচ্ছটায় সেখানকার জন-সাধারণ দীপালোকের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বিহঙ্গমদিগের অসংখ্য কুলায় আছে, ঐ সকল কুলায় পক্ষিকুলের কলরবে সর্ব্বদাই সমাকুল রহিয়াছে। নানাস্থানে পর্ব্বত নির্ঝর নিপতিত হইতেছে; ঐ নির্ঝর নিচয়ের কল কল নিনাদে তত্রত্য জনগণের পর-স্পরালাপ কর্ণ-গোচর হইতেছে না। কত স্থানে কত মুক্তাফলনিভ সুন্দর সুন্দর বিন্দু পড়িতেছে; তাহাতে তরু, লতা, তৃণ, পল্লব, সকলই সুশীতল হইতেছে। ঐ স্থানের যাবতীয় তরুলতা সতত প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, গিরিপ্রান্ত ও তথাকার মন্দিরবৃন্দের অতুল সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যিনি শমদমাদি-সাধন-সম্পন্ন আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহাতে যেমন ভোগ ও মোক্ষ উভয়শ্রী আসিয়া সমুদিত হয়, তেমনি সেই দেবীদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী তৎকালে সেই অন্তঃশীতল গিরিগ্রামে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। লীলা এতকাল জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই ফলে তাঁহার দেহ বিশুদ্ধ জ্ঞানময় হইল; তাই তিনি ত্রিকাল-দর্শিনী হইলেন। জ্ঞানাভ্যাস ফলেই পূর্ব্বতন জনন-মরণ প্রভৃতি সমস্ত সংসার-গতি অনায়াসে তাঁহার স্মৃতি পথে সমুদিত হইল।

লীলা বলিলেন,—দেবি! আমি ভবদীয় প্রসাদেই এই দেশ দর্শন করিলাম। যাবতীয় প্রাক্তন ব্যাপার এক্ষণে আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইল। আমার স্মরণ হইতেছে, এইখানেই আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপত্নী ছিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত ছিল। আমি কৃশা, জীর্ণশীর্ণা এবং মলিনা ছিলাম। শুষ্কদর্ভের তীক্ষ্ণাগ্রভাগে এইখানেই আমার কর-তলাদি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। আমি দোহন পাত্র এবং মন্থন দণ্ড ধারণ করিয়া ভর্ত্তার কুলকরী ভার্য্যা হইয়াছিলাম। আমার অনেক পুত্র ছিল। আমি পুত্রদিগকে স্নেহ করিতাম এবং আর্থিবর্গের প্রিয়ানুষ্ঠান করিতাম। দেব, দ্বিজ ও সাধুজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। প্রত্যহ রন্ধন ও অতিথি ভোজনাদি ব্যাপারে আমার অঙ্গ ঘৃত ও গোরসে সদাই সিক্ত থাকিত। ভর্জ্জন পাত্র, চরুস্থালী ও কুম্ভাদি গৃহের যে কিছু উপকরণ, সমস্তই আমি নিজ হস্তে পরিস্কার করিতাম। আমার করপ্রকোষ্ঠে একগাছী মাত্র কাচ বলয় ছিল, তাহাতে নিত্যই অন্নকণা লাগিয়া থাকিত। আমি জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা প্রভৃতিকে যথাযোগ্য পূজা করিতাম। যত কাল আমি বাঁচিয়াছিলাম, দিবারাত্র গৃহকর্ম্মেই কাটাইয়াছি। আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া পুত্রবধূ ও দাসদাসীদিগকে বলিতাম, গৃহকর্ম্ম সত্বর সমাধা কর, কেন বিলম্ব করিতেছ?

আমি যেমন ছিলাম, আমার পতিও তেমনি গৃহাসক্ত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও অবিশুদ্ধ ছিল। তিনি অজ্ঞ শ্রোত্রিয় ছিলেন। তখন আমি কে? সংসার কি? এ সকল কথা স্বপ্নেও আমার উদয় হয় নাই। আমার দেহ শিরাব্যাপ্ত এবং গাত্র কৃশ ছিল। আমি একটা মলিন কম্বল বেষ্টন করিয়া থাকিতাম এবং সমিধ, শাক, গোময় ও ইন্ধন সংগ্রহে সর্ব্বদা তৎপর রহিতাম। আমি সেকালে বৎসগণের কর্ণকীট নিষ্কাশনে অধিকাংশ সময় যাপন করিতাম। আমার গৃহসন্নিধানে যে সকল শাকক্ষেত্র ছিল, আমি কর্পরহস্তা পরিচারিকার ন্যায় তাহাতে ক্ষিপ্রহস্তে জল-সেক করিতাম। তখন নদীতীরে অনেক নীলবর্ণ তৃণ জন্মিত, আমি তাহা আনিয়া কখন কখন গোবৎসগণের তৃপ্তি সাধন করিতাম। প্রতিক্ষণ গৃহদ্বার লেপন ও তাহাতে রঙ্গবল্লী রচনা করিতাম। আমি স্বয়ং কখন সাগর-বেলার ন্যায় মর্য্যাদা নিয়ম হইতে বিচ্যুত হইতাম না। গৃহ-ভৃত্যদিগকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবার জন্য কখন কখন তাহাদিগকে নিন্দাবাদ করিতাম। এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। পরে আমার দেহ জীর্ণপর্ণের ন্যায় হইয়া উঠিল। বার্দ্ধক্যে শিরঃকম্প হইত, শিরঃকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে দোলার ন্যায় কর্ণদ্বয়ও কাঁপিত। তৎকালে যষ্টি-প্রহার-ভয়ে ভীত ব্যক্তির ন্যায় আমি জরার আক্রমণে ভীত হইয়া পড়িতে ছিলাম। ক্রমে আমার সর্ব্ব-প্রকার বার্দ্ধক্য চিহ্ন ব্যক্ত হইয়া ছিল।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—লীলা এই সকল কথা কহিতে কহিতে সেই গিরিগ্রামের অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গিনী দেবী সরস্বতীকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া কহিলেন,—দেবি! এই দেখুন, আমার পুষ্পবাটিকা পাটলাখণ্ডে মণ্ডিত রহিয়াছে। এই আমার অশোকবাটিকা কুসুমাকীর্ণ উদ্যান-মণ্ডপে সুশোভিত হইতেছে। ঐ যে আমার পুষ্করিণী-তীরের তরুতলে বৎসতরীটা ঈষৎ আবদ্ধ আছে, ওটী আমারই কর্ণিকা-নাম্নী বৎসতরী। ও এক্ষণে আমারই বিয়োগে কাতর হইয়া পর্ণাহার ত্যাগ করিয়াছে। এই আমার সেই জলবাহিকা অলসা ধূলিধূসরা দীনা পরিচারিকা, আজ আট দিন পর্য্যন্ত বাষ্পাকুল-নয়নে নিরন্তর রোদন করি-তেছে। দেবি! আমি এইখানে খাইতাম, এইখানে বসিতাম, এইখানে

থাকিতাম, এইখানে শয়ন করিতাম, এইখানে পান করিতাম, এইখানে দান করিতাম এবং এইখানে থাকিয়াই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতাম। এই আমার পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মা মন্দির মধ্যে রোদন করিতেছে। এই আমার দুগ্ধবতী গাভী জঙ্গলে জঙ্গলে নবতৃণোপরি বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখুন, আমার বসন্তকালের অগ্নিরুদ্ধ ভস্মধূসর গবাক্ষশালী গৃহদ্বারপ্রকোষ্ঠ। ইহা আমার দেহের ন্যায় অতীব প্রিয়। এই আমার স্বহস্ত-রোপিত বহুবিস্তৃত তুম্বীলতা, ইহা এক্ষণে পুষ্ট হইয়া অনেক স্থান বেষ্টন করিয়াছে। এই আমার রন্ধনশালা, ইহা এক সময় আমার দ্বিতীয় দেহের ন্যায় ছিল। সংসারের বন্ধনস্বরূপ ঐ আমার বান্ধবেরা মদীয় বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আরক্তনেত্র হইয়াছে এবং গাত্রাভরণ ফেলিয়া দিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করত মরিবার জন্য অনল ও ইন্ধন আহরণ করিতেছে। ঐ আমার গৃহমণ্ডপ গ্রামের কৃত্রিম নদীতে বেষ্টিত রহিয়াছে। ঐ নদীতীরে যে সকল তরু আছে, উহাদিগের অবনত শাখাগুচ্ছগুলি শিলাসমাকীর্ণ জলপ্রায় দেশে জলতরঙ্গের আঘাত পাইয়া সতত আস্ফালিত হইতেছে। এইখানে তরুরাজির নম্রাগ্র শাখাগুলিকে এক একবার জলতরঙ্গে ঢাকিয়া ফেলিতেছে এবং আবার উহারা তীরভূমি স্পর্শ করিতেছে। ঐ দেখুন, ঐ কৃত্রিম নদীর তট-প্রান্তস্থিত শাদ্বলভূমি ও সুন্দর সুন্দর লতাগুলি জলকণায় পরিপূরিত হইতেছে। স্থানে স্থানে জলতরঙ্গ সকল শিলাফলকে আহত হইয়া চারিদিক্ ফেনিল ও উৎপলবাসিত সীকরময় করিতেছে। ঐ নদীতীরগত তরুগুলির শাখাসমূহ তরঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইতেছে; তাহাতে মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ড-কিরণও শীতল হইয়া যাইতেছে। তীরস্থিত তরুরাজির প্রফুল্ল পুষ্পসমূহে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতেছে; তাহাতে মনে হইতেছে, তরুরাজি যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে রাশি রাশি কিংশুক কুসুম ফুটিয়া আছে; তাহাতে বিদ্রুমাবলীর ন্যায় শোভা হইয়াছে। ঈদৃশ অপূর্ব্ব কুসুম-সমূহ-সমুদ্ভাসিনী দ্রুমাবলী দ্বারা ঐ কৃত্রিম নদীর তটভূমি সকল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ঐ দেখুন, নদী দিয়া কত ফল ভাসিয়া যাইতেছে; গ্রাম্য বালকেরা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। এই গ্রাম্যকুল্যা বা কৃত্রিম নদী মহাকলকলাবর্ত্তে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উহা দ্বারা আমার গৃহমণ্ডপ

পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। গ্রাম্যকুল্যার জলাস্ফালনে মণ্ডপের তলস্থিত উপল-গুলি ধৌত হইয়া যাইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট তরুপত্রে সমাচ্ছন্ন বলিয়া মণ্ডপতল ছায়াবাহুল্যে সতত শীতল রহিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রফুল্ল বল্লী সকল মণ্ডপটী বেষ্টন করিয়া আছে; তাহাতে উহা কতই সুন্দর দেখাইতেছে। ঐ দেখুন, মণ্ডপের গবাক্ষগুলি ফল ও পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছন্ন হইয়া কেমন শোভার আধার হইয়াছে।

দেবি! এইখানে আমার ভর্ত্তা জীবাকাশত্ব-বশতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও চতুরুদধিমালা-মেখলা-মণ্ডিতা মেদিনীর অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অধুনা আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, আমার ভর্ত্তা 'আমি অচিরেই রাজা হইব' তীব্র অধ্যবসায়ের সহিত এইরূপ একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা করিয়া-ছিলেন। হে পরমেশি! এক্ষণে তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাদৃশ অধ্যবসায় ও আকাঙ্ক্ষার ফলে আট দিনের মধ্যেই চিরাভীষ্ট সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করিয়াছেন। আকাশে বায়ু আছে, অনিলে সৌরভ আছে; কিন্তু তাহা যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি এইখানে আমার ভর্ত্তার সেই জীবাকাশ গৃহাকাশে রাজা হইয়া বিরাজ করিতেছে; কিন্তু দেখা যাইতেছে না। এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমিত আকাশদেশেই মদীয় ভর্তৃরাজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; কিন্তু ভ্রান্তিবশতই যোজন-কোটি-বিস্তৃত একটা প্রকাণ্ড রাজ্য অনুভূত হইতেছে। হে মহেশি! আমরা পতিপত্নী উভয়েই চিদাকাশ এবং আমার সেই যে ভর্তৃরাজ্য, তাহাও চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। তথাপি এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার এমনি চমৎকার প্রভাব যে, ঐ ভর্তৃরাজ্য যেন সহস্র সহস্র শৈলসঙ্ঘে পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, দেবি! আমার ঐ ভর্তৃরাজ্য দেখিবার জন্য আবার সাধ হইয়াছে। অতএব আসুন, আমরা উভয়েই তথায় যাই। ঐ রাজ্য দূরস্থ হইলেও আমাদের অগম্য নহে, কেন না দৃঢ় অধ্যবসায়ী-দিগের আবার দূর কি?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! লীলা এই কথা কহিয়া দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিলেন এবং সত্বর সেই মণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক সরস্বতী সহ বিহঙ্গীর ন্যায় সুশাণিত-তরবারি-তুল্য স্বচ্ছ আকাশ মণ্ডলে উড্ডীন হইলেন। অনন্তর

তাঁহারা ভিন্নাঞ্জনের, নারায়ণাঙ্গের ও ভ্রমর পৃষ্ঠের ন্যায় শ্যামল ও নির্ম্মল মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া মেঘমার্গ উল্লঙ্ঘন করিলেন। অতঃপর সেই মহিলাদ্বয় কর্ত্তৃক যথাক্রমে বায়ুলোক, সৌরলোক ও চন্দ্রলোক অতিক্রান্ত হইল। পরে তাঁহারা ধ্রুবলোকে উপনীত হইলেন। ধ্রুবলোক হইতে সাধ্যলোকে গেলেন। সেখান হইতে পরে সিদ্ধলোক অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সিদ্ধলোক হইতে ভূলোকে এবং ভূলোক হইতে স্বর্গমণ্ডলে উপনীত হইলেন। এইস্থান হইতে ব্রহ্মলোকে গিয়া পরে সদাসন্তুষ্ট সাধুগণের লোক—বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক এবং সদেহ ও বিদেহরূপে শিব সারূপ্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের লোকদ্বয় অতিক্রম করিলেন। লীলা দূর হইতে দূরান্তরে যাইতে যাইতে আপনার অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপতা ভুলিয়া গিয়া ঈষৎ প্রবুদ্ধা হইলেন এবং পশ্চাৎ দিকে যে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তৎপ্রতি অবলোকন করিলেন; কিন্তু তিনি তখন অধোদিকের চন্দ্র, সূর্য্য বা তারকা প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন,—কেবল একার্ণবাকার, স্তিমিত গম্ভীর, দিগ্দিগন্তব্যাপী, পাষাণোদরবৎ প্রগাঢ় অন্ধকারপুঞ্জ বিদ্যমান।

লীলা তদ্দর্শনে সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! অধোদিকে সেই যে দিবাকর, নিশাকর ও তারকানিকর প্রভৃতির তেজ ছিল, তাহা এক্ষণে কোথায় গেল? আর কোথা হইতেই বা এই পাষাণজঠরবৎ নিস্পন্দ নিবিড় অন্ধকারপুঞ্জ আসিয়া উপস্থিত হইল? তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

সরস্বতী কহিলেন,—বৎসে! তুমি এই আকাশপদবীর এতদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ যে, তাহাতে নিম্নস্থিত সূর্য্যাদি তেজ কিছুই নেত্রগোচর হইতেছে না। মনে কর, অতি বড় এক অন্ধকূপের অভ্যন্তরে একটী খদ্যোত থাকিলে তাহা যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি সুদূর ঊর্দ্ধদেশগামী লোকের পক্ষে এখান হইতে অধঃস্থিত সূর্য্যাদি তেজ অবলোকন করা অসম্ভব।

লীলা কহিলেন,—অহো কি আশ্চর্য্য! আমরা এত অধিক দূরবর্ত্তী

পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, নিম্নদেশস্থ দিবাকরকে অণুকণিকার ন্যায় একটুমাত্রও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। হে মাতঃ! ইহার পর অপর আর কি পথ আছে? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার? কেমন করিয়াই বা সেখানে যাওয়া যাইবে? হে দেবি! এ সকল আমাকে বলিয়া দিন।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! ইহার পরেই ব্রহ্মাণ্ড-পুটের খর্পর তোমার সম্মুখবর্ত্তী হইবে। চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কবৃন্দ ঐ খর্পর হইতে উত্থিত ধূলিকণার অনুরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই মহিলাদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অবিলম্বে ব্রহ্মাণ্ড খর্পরে উপনীত হইলেন। মনে হইল, যেন দুইটী মধুকরী নীরন্ধ্র গিরি-গাত্রে প্রবেশ করিল। অনন্তর তাঁহারা শূন্যের ন্যায় তথা হইতে অনায়াসে নির্গত হইলেন। তাঁহাদের তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইল না। প্রকৃত কথা এই, যাহা অজ্ঞ-দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া সুনিশ্চয় হয়, তাহাই বজ্রসারবৎ কঠিন বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা মিথ্যারূপে সুনিশ্চিত থাকে, তাহা শূন্য বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং তাহা ভেদ করা জ্ঞানীর পক্ষে কিছু মাত্র কষ্টকর নহে।

অনন্তর সেই নিরাবরণ-বিজ্ঞানা ললনারা ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের পারে অত্যাশ্চর্য্য অতি বিস্তৃত জলাদি-আবরণ অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের দশগুণ অধিক জলরাশি অক্ষোটবীজের পৃষ্ঠত্বকের ন্যায় চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া প্রথম আবরণরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহার পর এতদপেক্ষা দশগুণ অধিক হুতাশন-রূপ দ্বিতীয় আবরণ বিরাজমান। তৎপরে ঐ সমস্তের দশগুণ অধিক সমীরণ এবং তাহার পর তদপেক্ষা দশগুণাধিক বিশুদ্ধ চিদাকাশ।

রাম! ঐ শেষোক্ত পরম আকাশে বন্ধ্যাপুত্রের কথার ন্যায় কোনরূপ আদি, মধ্য বা অন্ত কল্পনা নাই। ঐ শান্ত, শুদ্ধ, অনাদি, অনন্ত, অমধ্য, বিশাল পরমাকাশ কেবল মহান্ আত্মাতেই অধিষ্ঠিত। কোনরূপ অবিদ্যা-ভ্রম উহাতে নাই। বলা বাহুল্য, যদি কল্পকাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদেশ হইতে অতিবেগে শিলাখণ্ড অধোদিকে পতিত হয়, বিহঙ্গরাজ গরুড় যদি অতিবেগে

কল্পকাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদেশে উৎপতিত হয়, কিম্বা সমীরণ যদি কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রবল বেগে উহার অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়, তথাপি উহাদের মধ্যে কেহই ঐ পরমাকাশের অন্ত সীমা পাইবার অধিকারী নহে। ফলতঃ ঐ অনাদি অনন্ত অমধ্য শুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমাকাশ কেবল আপনি আপনার অপার মহিমাতেই অধিষ্ঠিত।

ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস! লীলা সরস্বতীর সহিত ক্ষণকাল মধ্যেই সেই ব্রহ্মাণ্ড খর্পরে উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমরূপ আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ প্রমাণহীন পরমাকাশ অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, ঐ পরমাকাশে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ জগৎ এবং অন্যান্য অণুপ্রমাণ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে। যেমন শূন্যে সৌরালোকে কোটি কোটি ত্রসরেণু স্ফুরিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি উল্লিখিত পরমাকাশে সলিলাদি অবারণ-সম্পন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

তাঁহারা দেখিলেন,—মহাকাশরূপ মহাসাগর মধ্যে মহাশূন্যস্বরূপ জলরাশি রহিয়াছে। তাহাতে মহাচিত্তের দ্রব ভাব হইতে উত্থিত সংখ্যাতীত বুদ্বুদাকার ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা ভাসমান। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের কতকগুলি অধোদিকে পড়িয়া যাইতেছে, কতকগুলি ঊর্দ্ধদিকে চলিয়াছে, কতকগুলি তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করিতেছে, কতকগুলি শুদ্ধভাবে রহিয়াছে। এই যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, উহারা সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবের সম্বিদনুসারেই প্রতিভাত হইতেছে। যে যে ক্ষেত্রে যাহার যাহার সম্বিদ্‌ যে যেরূপে স্ফুরিত হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে তাহার তাহার নিকট তত্তদাকার রূপই প্রতিভাত হইয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধ নাই, অধঃ নাই এবং ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের গমনাগমনও নাই। তাঁহারা দেখেন,

বাক্য ও মনের অগোচর দিগ্বিভাগাদি নিখিল দ্বৈতভাবহীন একমাত্র পরম পদ বিরাজমান; সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত যে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, সে সকল কেবল অজ্ঞানদৃষ্টিতে দেহপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ে অভিহিত। বালকের কল্পনা-জালের ন্যায় সম্বিদের স্বভাব বশতই ঐ পরম পদে এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল আপনা হইতে উৎপন্ন হয় এবং স্বীয় সঙ্কল্পবলে আপনা হইতেই বিলয় পাইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই ব্রহ্মাণ্ডাধারে যদি ঊর্দ্ধ, অধঃ বা তির্য্যগ্‌ভাব না-ই থাকে, তবে এই স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডে তথাবিধ কল্পনা কেমন করিয়া হইতে পারে? এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবই বা কাহাকে বলা যায়? আমাকে ইহা বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! যাহার দৃষ্টি তিমির-দোষে দূষিত, সে যেমন আকাশে কেশোণ্ড্রক দেখিয়া থাকে, তেমনি অবিদ্যাবশেই অনন্ত মহৎ পদে এই নিখিল সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেখ, যত কিছু পদার্থ আছে, তাহাদের কাহারও কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই; তাহারা সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলিয়া থাকে। ঈশ্বর-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের পার্থিবাংশই অধঃপ্রদেশ এবং তাহার বিপরীত অংশই ঊর্দ্ধদেশ। শাস্ত্রে বলে, আকাশে বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্রের পৃষ্ঠে পিপীলিকা রহিলে, তাহার পাদসংলগ্ন ভাগ—অধঃ এবং পৃষ্ঠ ভাগ—ঊর্দ্ধ। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে বৃক্ষ ও বল্মীকবেষ্টিত কেবল ভূতল বিরাজমান। উহাতে জনমানবের বস-বাস নাই। পরন্তু উহার ব্যোম ভাগ দেব, দৈত্য ও কিন্নরগণে পরিবৃত। শক অক্ষোট ফল যেমন ত্বকের সহিতই সম্ভূত হয়, তেমনি কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কল্পই কল্পনা-ত্মক জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী, গ্রাম, নগর ও নগাদির সহিত সমুৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে। বিন্ধ্যাচলের কোন কোন অরণ্য ভাগে যেমন হস্তী জন্মিয়া থাকে, তেমনি পরমাত্মার মায়াসমন্বিত অংশবিশেষেই ত্রসরেণু-তুল্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্ভূত হয়। যত কিছু পদার্থ-পরম্পরা, সমস্তই সেই চিদাকাশে জাত, চিদাকাশে অবস্থিত এবং সুতরাং চিদাকাশই সর্ব্বময়রূপে প্রতিভাত। উক্ত শুদ্ধবোধময় চিদাকাশ-

রূপ সাগরে বিবিধ ব্রহ্মাণ্ড-নামধেয় অসংখ্য তরঙ্গমালা অজস্র আবির্ভূত হইতেছে, আবার তাহাতেই বিলয় পাইতেছে। ঐ চিদাকাশরূপ মহাসাগরের অভ্যন্তরে এমন অনেক ব্রহ্মাণ্ড-নামক তরঙ্গ আছে, যাহারা এখনও জন্মে নাই; কিন্তু সেই সকল তরঙ্গ ভাবী কালে আবির্ভূত হইবে। তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি তরঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড আছে; উহারা সঙ্কল্প ক্ষয় বশতঃ অন্ধকারময় হইয়া সুষুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ঐ সকল তরঙ্গ অনুমান বলেই বোধগম্য। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড-তরঙ্গের মধ্য হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত ঘর্ঘররব প্রবৃত্ত রহিয়াছে; কিন্তু মোহবশে বিষয়ানুরাগে আকুল হইয়া অপর কেহই তাহা শুনিতেছে না বা বুঝিতেছে না।

এতদ্ভিন্ন সলিল-সিক্ত বীজকোষের অভ্যন্তরে যেমন শুভ্র অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রথমারব্ধ কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের বিশুদ্ধ ভূবিভাগে বিশুদ্ধ জীব-পরম্পরা জন্মিতেছে। ঘনীভূত হিম যেমন তাপ-যোগে গলিয়া যায়, তেমনি এই বর্ত্তমান সময় মধ্যেই কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাতে রবিরশ্মি, বিদ্যুৎ ও পর্ব্বত প্রভৃতি গলিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড নিরাধার হইয়া আকল্প অধোদিকে পতিত হইতেছে। ঐ অবশ্য সকল ব্রহ্মাণ্ডেরও যে পতনাদি সম্ভাবনা নাই, এমন মনে করা অনুচিত; কেন না, সমস্তই যখন বাসনাময় সম্বিৎ, তখন যে কোন কল্পনাই হউক, কিছুই অসম্ভব নহে। কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড আবার স্তব্ধভাবে রহিয়াছে। বায়ুর স্পন্দন ও আকাশে কেশোণ্ড্রক দর্শনের ন্যায়ই উল্লিখিতরূপ সম্বিদ্ সমুদিত হয়। সৃষ্টির ক্রমপদ্ধতির কোন একটা নিয়ম-বন্ধন নাই, উহার বৈচিত্র্য অশাস্ত্রীয় বা অসম্ভাবিত নহে; কেন না, যিনি প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ আচার দ্বারা কল্পাদিতে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিধাতা হয়েন, তাঁহার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অন্য ব্রহ্মাণ্ড বিধাতার ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির বৈলক্ষণ্য হওয়া অসম্ভব নহে এবং তাদৃশ বৈলক্ষণ্য অশাস্ত্রসঙ্গতও বলা যায় না।

উল্লিখিত বিধানে কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণু এবং কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের অপর প্রজাপতি। এতদ্ভিন্ন এমন কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড আছে, যাহাদের নেতা কেহই নাই; সে সকল নানা-

জন্তুতে পরিপূর্ণ। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের নেতৃত্ব বিচিত্র অর্থাৎ সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টিকর্ত্তা বহু। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহাদের অভ্যন্তর কেবল পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিতে পরিব্যাপ্ত। কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড একার্ণবে পরিপূর্ণ। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিই আদৌ নাই। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পাষাণ খণ্ডে আকীর্ণ। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড কৃমিকুলে সঙ্কুল। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল দেবগণেরই বাস। কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড কেবল মানবদিগেরই বাসস্থান। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার-প্রিয় পেচকাদি জন্তুর লীলাস্থলী। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত প্রকাশময় এবং প্রকাশপ্রিয় জীবগণের আলয়। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড কেবল মশকসমূহে পরিপূর্ণ। উহারা মশকব্যাপ্ত উডুম্বর ফলের ন্যায় বিরাজিত। কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগ শূন্যময়। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড স্পন্দহীন জন্তুগণে পরিপূর্ণ।

এইরূপ এবং অন্যরূপ আরও যে কত বিবিধ স্থষ্টি-সম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহা যোগী জনেরও কল্পনার বহির্ভূত। এই সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যোমব্যাপ্ত অচলের ন্যায় একমাত্র মহাকাশই বিরাজমান। বস্তুতঃ ঐ সকলই এক বিস্তৃত মহাকাশ। বিষ্ণু প্রভৃতি সুরগণ যদি আজীবন ধাবিত হইতে থাকেন, তথাপি ঐ মহাকাশের পরিমাণ নিরূপণ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। কটকে যেমন রত্ন পরিব্যাপ্ত থাকে, তেমনি উল্লিখিত প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের ভূতাকর্ষণকর পার্থিব ভাব স্বীয় স্বাভাবিকতায়ই অধিষ্ঠিত।

হে মহামতে! এই জগদ্‌বৈভব বর্ণন করিবার পক্ষে আমাদের যতদূর ধীশক্তি, তদনুসারে তোমার নিকট বর্ণিত হইল। ইহার পরের জগদ্‌বৃত্তান্ত আমার বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে; সুতরাং তাহা বর্ণনে আমি অক্ষম। ফল কথা এই, ঘোর গভীর অন্ধকার-পরিপূর্ণ অতি বিস্তৃত অরণ্যে যেমন যক্ষগণ উন্মত্তভাবে নৃত্য করে; পরন্তু পরস্পর কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, তেমনি এই অতি বহু বিস্তৃত পরমাকাশের অভ্যন্তরে কত যে সংখ্যাতীত মহাজগৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা অবর্ণনীয়।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! লীলা ও সরস্বতী পরস্পর এইরূপ কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রাক্তন জগৎ হইতে বহির্গত হইয়া উল্লিখিতরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্য নেত্রগোচর করত তদন্তর্বর্ত্তী কোন এক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সহসা প্রবেশ করিয়া সেই অন্তঃপুরমণ্ডপ দর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তথায় বহুকাল রহিলেন না, সত্বরই সে স্থান হইতে নির্গত হইলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখেন, সেখানে পদ্ম মহারাজের মৃতদেহ কুসুমসমূহে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে এবং রাজমহিষী লীলার দেহও সমাধিমগ্ন অবস্থায় ভর্ত্তার শবদেহ পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। গৃহস্থিত পরিজনগণ সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ধূপ, চন্দন ও কুসুমের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে।

লীলা সেই অন্তঃপুরের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া পরে অপর ভর্ত্তার অপর সংসারে যাইবার জন্য যত্নবতী হইলেন এবং স্বীয় আতিবাহিক দেহে তৎকালে সেই অন্তঃপুরাকাশেই উৎপতিত হইলেন। এ বারেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড খর্পর ও সংসারের আবরণ ভেদ করিয়া ভর্ত্তার সেই নীতিবিস্তৃত সঙ্কল্প-সংসারে প্রবেশ করিলেন। দেবী সরস্বতী লীলার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। লীলা তাঁহারই সহিত পুনরায় আর এক আবরণান্বিত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ প্রাপ্ত হইয়া সবেগে তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং পঙ্কিল পল্বলের ন্যায় স্বীয় ভর্ত্তা বিদূরথের সঙ্কল্পসংসার দেখিতে পাইলেন। অন্ধকার-পঙ্কিল শৈল কুহরে যেমন, সিংহীমুখ অথবা পদ্ম বিবরে যেমন পিপীলিকাদয় প্রবেশ করে, তেমনি সেই ব্যোমদেহা দেবীদ্বয় সেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত লীলাপতির সঙ্কল্পময় জগতে অক্লেশে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহারা কত লোকান্তর, কত পর্ব্বত, কত অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিলেন; পরে শৈল-সাগর-সঙ্কুল ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। তথায় গিয়া পরে তাঁহারা সুমেরু-সমলঙ্কৃত নববর্ষময় জম্বুদ্বীপে গমন করিলেন।

অনন্তর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া লীলাপতি বিদূরথ রাজার রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন।

যৎকালে লীলা ও সরস্বতী বিদূরথ রাজার রাষ্ট্রমণ্ডলে উপনীত হয়েন; তখন সেখানকার সর্ব্বত্র রাষ্ট্রবিপ্লবের বিভীষিকা উপস্থিত। ঐ সময় সিন্ধুরাজ কতিপয় সামন্ত নরপতির সহায়তায় বলদৃপ্ত হইয়া সসৈন্যে বিদূরথরাজের রাষ্ট্রমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছেন। তাহাতে উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। সংগ্রাম দেখিবার জন্য ত্রিভুবনের যাবতীয় প্রাণী আগমন করিয়াছে। তাহাদের আগমনে ব্যোমমণ্ডল সমাকীর্ণ হইয়াছে। সেই সংগ্রাম-সন্দর্শনে দেবীদ্বয় কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে আকাশে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—নভোমণ্ডল নভশ্চরগণে সমাকীর্ণ হওয়ায় যেন জলদমালায় আবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, ও বিদ্যাধরগণ অবস্থান করিতেছেন। স্বর্গবাসিনী বারাঙ্গনাগণ নভোমণ্ডলে থাকিয়া সংগ্রাম-হত-বীর পুরুষদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে। রুধির-মাংস-লোলুপ ভূত, [illegible] নৃত্য করিতেছে। [illegible] নিক্ষেপ করিবার জন্য [illegible] হস্তে কুসুমরাশি ধরিয়া রাখিয়াছে। বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ডগণ কৌতুহলবশতঃ যুদ্ধ দেখিতে আসিয়া অস্ত্রপাত-ভয়ে পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। নভোমণ্ডলের যে যে অংশে অস্ত্রবর্ষণ হইতেছে, তাহা হইতে ভূতবর্গ [illegible] পলায়ন করিতেছে। সমরাসক্ত বীরগণ স্ব স্ব পুরুষকার প্রতিষ্ঠার অভিলাষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতেছে; তাহাতে দর্শকমণ্ডলী আনন্দিত হইতেছে। সেই ভয়াবহ সংগ্রাম-সন্দর্শনে বহু দর্শক, অনেক অতীত বীরগণের বীরত্ব-বার্ত্তা মনে করিয়া পরস্পর আলাপ করিতেছে। অনেক সুরসুন্দরী সলীল হাস-বিলাসে [illegible] হইয়া চামরহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অনেক যোগানুষ্ঠায়ী শ্রেষ্ঠ মুনিগণ [illegible] অদৃশ্যে থাকিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য বেদস্তুতি পাঠ করিতেছেন। অধিক কি, তৎকালে সিদ্ধিসম্পন্ন লোকপালগণের [illegible] স্তব পাঠে নিরত হইয়াছেন। যে সকল শূর স্বর্গ-বাসের যোগ্য, তাহাদিগকে আনিবার জন্য ইন্দ্রদূতেরা ব্যগ্র হইয়াছে। এমন কি সমরাহত শূরগণকে আনিবার জন্য কোন কোন

ভূত ঐরাবত প্রভৃতি বারণবৃন্দকেও সমলঙ্কৃত করিয়াছে। স্বর্গ-গমনোন্মত্ত শূরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছে। বীরানুরাগিণী সুরকামিনীরা সুন্দর সুন্দর বীর পুরুষের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। বীরবৃন্দের দোর্দণ্ড আলিঙ্গন করিবার জন্য লম্পট ললনাকুল ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়াছে। শূরগণের জয়লাভ-জন্য শুভ্র যশে দিবাকর যেন সুধাকর হইতেছেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! কোন্ শ্রেণীর যোদ্ধাকে শূরনামে অভিহিত করা যায়? কোন্ শূরের আগমনে স্বর্গভূমি অলঙ্কৃত হয়? আর কেই বা স্বর্গে যাইবার অযোগ্য হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! যিনি শাস্ত্রাচার-পরায়ণ প্রভুর নিমিত্ত রণ-ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন অথবা বিজয়ী হয়েন, তাদৃশ ব্যক্তিই শূরনামে অভিহিত এবং মৃত্যুর পর তিনিই শূরজন-ভোগ্য স্বর্গ ধামে উপনীত হইবার যোগ্য। যে প্রভু শাস্ত্রাচারের বিরোধী, তাহার রক্ষা বা তদীয় স্বার্থ সাধ-নার্থ যে ব্যক্তি রণাহত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাদৃশ বীরের নরকবাস নিশ্চিত। যে প্রভু শাস্ত্রোপদেশ পাইয়াও অবৈধ আচরণ করেন, তাঁহার জন্য রণক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিরও অক্ষয় নরকভোগ নির্দ্দিষ্ট। যিনি যথাসম্ভব শাস্ত্র ও লোকাচারের অনুবর্ত্তন করিয়া ন্যায়নিষ্ঠ প্রভুর জন্য ন্যায়তঃ যুদ্ধ করেন, তথাবিধ যোদ্ধাকে ভক্ত শূর আখ্যায় অভিহিত করা হয়। যে বীর গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, ও শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহার দ্বারা স্বর্গভূমি অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। যে নরপতি অবশ্য-প্রতিপাল্য স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর, তাঁহার কার্য্যে যাহারা জীবন বিসর্জ্জন করে, সেই সকল বীরেরা বীরলোকে উপনীত হইয়া থাকে। যিনি প্রজার প্রতি অত্যাচার-পরায়ণ, তিনি রাজা হউন বা অন্য কোনরূপ প্রভুই হউন, তাঁহার নিমিত্ত যাহারা সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা-দিগের নরক ভোগ নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা যথাশাস্ত্র কার্য্য করেন না, তাঁহারা রাজাই হউন বা অন্য কেহই হউন, তাঁহাদের জন্য যে সকল লোক রণাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারাও নরকবাসে উপনীত হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, যদি ধর্ম্মসঙ্গত

যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে স্বর্গবাস সুনিশ্চিত। আর যদি অধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত হইলেও স্বর্গবাসের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে পরলোকের ভয় না করিয়া ঘোরতর অধর্ম্ম যুদ্ধেও উন্মত্ত হইবে এবং শত্রুদিগকে সংহার করিবে। শূরগণ সংগ্রাম করিয়া যে যেখানে নিহত হউন, তাঁহাদের স্বর্গবাস সুনিশ্চিত; এই যে একটা প্রবাদ, ইহাকে প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। ফলতঃ যাহারা ধর্ম্মার্থ বা ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়, তাহারাই শূর এবং তাহারাই স্বর্গবাসের যোগ্য, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন।

যাঁহারা সদাচারশীল ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য অসিধারা সহ্য করেন, তাঁহারাও শূর নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন অপর সকল বৃথা আত্মঘাতী। যাঁহারা ধর্ম্মতঃ যুদ্ধ করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমবিহারিণী সুর-সুন্দরীরা উৎকণ্ঠিত-মনে বলিতে থাকেন 'আহা আমরা এই মহারণশালী শূরগণের প্রণয়িনী হইব!'

রাম! পূর্ব্বে যে সংগ্রামের কথা কহিয়াছি, তদ্দর্শনার্থিনী বিদ্যাধরীরা আকাশে থাকিয়া মৃদু মধুর গান করিতে লাগিল। সুরবালাগণ বীরের কণ্ঠে অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে মন্দার মাল্য গাঁথিবার জন্য ব্যগ্র হইল। সুর ও সিদ্ধগণের দর্শনীয় বিমানশ্রেণী নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময় অম্বরতল যেন একটা উৎসব জন্য অত্যুন্নতশ্রী ধারণ করিয়া বিরাজ করিল।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যেখানে বীরশ্রেষ্ঠগণের সমাগম-উৎকণ্ঠায় অপ্সরা সকল নৃত্য করিতেছে, সরস্বতী সহ লীলা সেই ব্যোমমণ্ডলে থাকিয়া ভূতলের দিকে দৃষ্টি দিয়া দেখিলেন, তদীয় ভর্ত্তৃ-পালিত রাষ্ট্রমণ্ডল সৈন্যশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় ভীষণাকার কোন একটা

অতি বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে উভয় পক্ষীয় সমবেত সেনাগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। হে সৌম্য! লীলার নিকট সেই উভয় পক্ষস্থ সৈন্যদল যেন দুইটা অম্ভোধির ন্যায় প্রতীত হইল। তাঁহারা দেখিলেন, উভয় পক্ষের উভয় রাজাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। সৈন্যগণ মহাড়ম্বরে পরিপূর্ণ এবং রণমদিরায় উন্মত্ত হইয়া অবস্থিত। তাহারা সকলেই রণসাজে সজ্জিত ও চর্ম্ম-বর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত। তাহাদিকে দেখিলেই যেন এক একটা অপূর্ব্ব উজ্জ্বল অগ্নি বলিয়া মনে হয়। যোধগণ অক্ষুব্ধনেত্রে পরস্পর পরস্পরের প্রথম প্রহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কোন কোন যোদ্ধা খড়্গ উত্তোলন করিয়া জলধারার ন্যায় ধারণ করিতেছে। রণক্ষেত্রের নানাদিকে প্রাস, পরশু, ভিন্দিপাল, যষ্টি ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পক্ষিরাজের পক্ষপাতে বিক্ষুব্ধ বনস্থলীর ন্যায় সেই রণক্ষেত্র বীর-পদ-ভরে, কম্পিত হইতেছে। দিবাকরের-কিরণ-নিকরের ন্যায় যোধগণের কনক-কঞ্চুকের কান্তিচ্ছটা চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া কোপভরে স্ব স্ব আয়ুধ উত্তোলিত করিতেছে। কতকগুলি যোদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। উভয় সৈন্যদলের মধ্যভাগে যে সুদীর্ঘ সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন যোদ্ধাই যুদ্ধারম্ভ করিতেছে না। সেই বিশাল বাহিনীদ্বয়ের মধ্য হইতে অনর্গল সিংহনাদ উত্থিত হইতেছে; তাহাতে অন্যান্য জনের পরস্পরালাপ শ্রুত হইতেছে না। কোথাও কতকগুলি যোদ্ধা যুদ্ধমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; তাহাতে বাদকেরা বহুক্ষণ বিস্ময়-বশে দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে না। সুদক্ষ সেনানীগণ অগ্রে প্রধান সৈন্য, তৎপশ্চাৎ তদপেক্ষা অপ্রধান সৈন্য, এইরূপ ক্রমে সেনাসন্নিবেশ করিতেছে। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে মাত্র দুই ধনুপ্রমাণ স্থান ব্যবধান বা শূন্য রহিয়াছে, তাহাতে সে সমরাঙ্গণ যেন কল্পান্ত-বাত্যায় বিতত উদ্বেলিত একার্ণবের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

তখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধাড়ম্বর দেখিয়া উভয় পক্ষীয় অধিনায়কই যুদ্ধ জয়ে চিন্তিত হইলেন। শব্দায়মান ভেকের কণ্ঠ-ত্বকের ন্যায় ভয়ে ভীরুগণের

হৃদয়কন্দর গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই বিশাল সৈন্যব্যূহের মধ্য হইতে অসংখ্য সৈন্য স্ব স্ব প্রাণ-সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইল। কোথাও ধনুর্দ্ধারী সেনাগণ স্ব স্ব শরসমূহ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বিপক্ষদলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। কোথাও সংখ্যাতীত সৈনিকেরা অবিচল-নেত্রে অস্ত্রাঘাত ও শরপাত অবলোকন করিতে লাগিল।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি যোদ্ধা যুদ্ধ করিবার উৎকণ্ঠায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধভরে ভীষণ ভ্রূভঙ্গী করিতেছে। সেনাগণের পরস্পর গাত্র-সজ্ঘর্ষে পরস্পরের কঞ্চুক হইতে কঠোর টঙ্কার-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বীর যোদ্ধাপুরুষদিগের বাক্যানলে দগ্ধ হইয়া অনেক ভীরু যোদ্ধা গিরিগর্ত্তে গিয়া আশ্রয় লইবার অভিপ্রায় করিতেছে। দুর্ব্বলপ্রকৃতি সৈনিকেরা উভয় পক্ষীয় সেনাসন্নিবেশ দেখিবামাত্র স্ব স্ব জীবনে সন্দিহান হইতেছে। রণক্ষেত্র হইতে ধূলিপটল উত্থিত হইয়া গজ ও নরগণের গাত্রে এরূপভাবে সংলগ্ন হইয়াছে, যেন তাহাতে তাহারা উন্নতাঙ্গবৎ প্রতিভাত হইতেছে।

তখন প্রথম প্রহার-পাতের প্রতীক্ষায় সৈন্যগণের প্রাণ ব্যাকুল হওয়ায় সহসা সমস্ত সেনাকল্লোল নিবৃত্ত হইয়া গেল; যেন রণক্ষেত্র নিদ্রা-নিস্তব্ধ নগর-শ্রী ধারণ করিল। তৎকালে শঙ্খরব, তূর্য্যধ্বনি, দুন্দুভি-নির্ঘোষ, সকলই একে একে নিবৃত্ত হইল। প্রচুর ধূলিপটল উত্থিত হইয়া পয়োধরবৎ ভূতল ও গগনতল ঢাকিয়া ফেলিল। ভীরু-স্বভাব সৈনিকেরা সেনা পরিচালকদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া পলায়ন করিল। অবশিষ্ট বীরগণ চারিদিকে মৎস্য ও মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তখন সেই সমরভূমি যেন একটা সাগরবৎ শোভা ধারণ করিল। রণাঙ্গনের নানাদিকে সমুচ্ছ্রিত শত শত পতাকারাজি গগন-গত নক্ষত্রপুঞ্জ ঢাকিয়া ফেলিল। মাতঙ্গগণ স্ব স্ব শুণ্ডাদণ্ড উত্তোলিত করিয়া নভোমণ্ডল কাননাকার করিয়া তুলিল। সৈন্যগণের হস্তস্থিত আয়ুধ-নিচয়ের তরলাকার প্রভাপুঞ্জ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় উহারা যেন পক্ষ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন অগণিত দুন্দুভিপ্রভৃতির ধমদ্ধমিত শব্দে ও সুগভীর শঙ্খ-নিনাদে গগনতল আপূরিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর এক পক্ষের সমস্ত সৈন্য চক্রব্যূহে অধিষ্ঠিত হইয়া অপর পক্ষীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল; তখন ঐ আক্রান্ত সেনাদল দানবাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবসেনাবৎ প্রতিভাত হইল। কোথাও যোধগণ গরুড়ব্যূহে অধিষ্ঠিত হইয়া শত্রুপক্ষীয় নাগগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে অপরপক্ষীয় সৈন্যগণ শ্যেনব্যূহে বিরাজিত হইয়া প্রতিপক্ষীয় সেনাসন্নিবেশ ভেদ করত গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। যোধগণের পরস্পর বাহ্বাস্ফোটে অসংখ্য সৈন্য ধরাশায়ী হইল। সমরাঙ্গণে বিবিধ ব্যূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল ব্যূহ হইতে নির্গত বীরেন্দ্রগণের গভীর নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানে বীরগণ কর দ্বারা মুদ্গরনিকর উত্তোলিত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথাও কৃষ্ণবর্ণ আয়ুধসমূহের অংশুজালরূপ অম্বুদগণে দিনকরমণ্ডল শ্যামীকৃত হইয়া উঠিল। কোথাও শরনিকর হইতে বাতাহত তৃণসমূহের ন্যায় 'সূৎ সূৎ' শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যব্যূহ প্রলয়ঙ্কর পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘমণ্ডলের ন্যায়, প্রলয় প্রভঞ্জন-ক্ষুব্ধ একার্ণবের ন্যায়, সম্ভশ্ছিন্ন মহামেরুর পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, বিক্ষুব্ধ বায়ু-বিলোড়িত কজ্জল-শৈলের ন্যায় এবং পাতালকুহর হইতে উত্থিত ক্ষুব্ধ অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে প্রতিভাত হইল। সেই সমরক্ষেত্র দেখিয়া মনে হইল, যেন নরকনিচয় ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ লোকালোক পর্ব্বত বিরাজমান আর তদীয় তটভূমি সকল উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য-পরায়ণ।

সেই রণক্ষেত্রে তৎকালে কুন্ত, মুষল, পরশু ও অসি প্রভৃতি অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের অংশুপটলে শ্যামায়মান দিনকরকিরণ সকল অগাধ অনন্ত জলপ্রবাহরূপে পরিণত হইয়া এই ভুবনকোষ যেন অচিরেই একার্ণব করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! এই সমর-বিবরণ আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন; কেন না, এই সমরসংক্রান্ত কথাগুলি বড়ই শ্রুতিমধুর বলিয়া বোধ হইতেছে।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—অতঃপর সেই দেবীদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী, সেই সংগ্রাম-ব্যাপার দেখিবার জন্য সঙ্কল্প-কল্পিত কমনীয় বিমানে আরোহণ করত আকাশে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় উভয় পক্ষীয় যোধগণ ঘোরতর সম্মুখ সংগ্রাম আরম্ভ করিল। তখন প্রতিপক্ষীয় সৈন্যব্যূহ হইতে জনৈক যোদ্ধা প্রলয়কালীন প্রচণ্ড সাগরকল্লোলের ন্যায় নির্গত হইয়া নির্ভয়ে লীলাপতি বিদূরথকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে পরাভূত করিতে অক্ষম হইয়া পর্ব্বতের সানুদেশে শিলা-ক্ষেপের ন্যায় তদীয় বক্ষে মুদ্গর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রলয়-পয়োধির ন্যায় বেগসহকারে উভয় সৈন্যদলে শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ হইল। যোধগণের পাবক-প্রতিম শর-নিকরে বিদ্যুচ্ছটা নিষ্কাশিত হইতে লাগিল। সুশাণিত অস্ত্রসকল অনবরত নিক্ষিপ্ত হইয়া, তরল ধারাগ্রে নভো-মণ্ডলে যেন রেখাপাত করিতে আরম্ভ করিল। শরসমূহ অগ্রে 'ক্ষণ ক্ষণ' শব্দ করত মধ্যভাগে গিয়া টঙ্কাররবে চারিদিক্ প্রতিনাদিত করিয়া তুলিল। কোথাও বীরগণের হুঙ্কারধ্বনি-মিশ্রিত ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। দিবাকরের কিরণপটল শরধারাসমূহে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিতানশ্রী ধারণ করিল। যোধগণের পরস্পর খড়্গাঘাতে শব্দিত বর্ম্ম হইতে টঙ্কার-ধ্বনি সহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। পরস্পর-নিক্ষিপ্ত শরসকল পরস্পরাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া খগশ্রেণীর ন্যায় অম্বরদেশ আবৃত করিল। যোধগণের দোর্দ্দণ্ডরূপ বৃক্ষ-বিক্ষেপে অম্বরতল অরণ্যবৎ প্রতিভাত হইল। যুদ্ধ দেখিবার জন্য বিমানচারীদিগের অঙ্গনাগণ উপস্থিত ছিলেন; কার্ম্মুকের ক্রেঙ্কার-রবে ভীত হইয়া তাঁহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন ঘনাবলীর গভীর নিনাদ তিরস্কৃত করিয়া সৈন্যসমূহের ভয়াবহ কোলাহল-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। যেমন নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ ব্যক্তি পরমাত্ম-ভাবনায় বিভোর হইয়া বাহ্য শব্দাদি কিছুই শুনেন না, তেমনি তখন যোধগণের নিরবচ্ছিন্ন ঘোর কোলাহল ভিন্ন অন্য কোন ধ্বনিই শ্রুত হইল না। সুতীক্ষ্ণ নারাচাগ্রের দারুণ আঘাতে শূরগণ ছিন্নবাহু ও ছিন্নশির হইয়া দলে দলে পতিত হইতে লাগিল। পরস্পরের অঙ্গ-সঙ্ঘট্টন হেতু যোধগণের বর্ম্ম-সমূহ হইতে 'রণ রণ' ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া রণস্থল ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিল। বীরগণের ঘোরতর হুঙ্কাররবে তাহাদের অস্ত্রটঙ্কারধ্বনি প্রতিহত হইল। নিক্ষিপ্ত শস্ত্র সকলের তরলতর ধারাতরঙ্গে দিক্‌সকল যেন দন্তুর হইয়া উঠিল। অস্ত্রসকলের পরস্পর সঙ্ঘট্টনে 'ঝন্ ঝন্' শব্দ এবং বাহ্বাস্ফোটনকারী বীরগণের আস্ফোটনে অনবরত চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। খড়্গ সকলের নিষ্কাশন কালে লৌহময় কোষ ও ঐ সমস্ত খড়্গ পরস্পর সংঘর্ষপ্রাপ্ত হইয়া সীৎকার সহকৃত শন্ শন্ শব্দে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিস্তার করিতে লাগিল। কার্ম্মুক-নির্গত শর-নিকর আকাশে প্রসর্পিত হওয়ায় মধ্যপথে 'থর্ থর্' ধ্বনি উত্থিত হইল।

এইরূপে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কত শত শত শূর পতিত, অর্দ্ধমৃত ও মৃত হইতে লাগিল। শূরগণের কণ্ঠদেশ ছিন্ন হওয়ায় প্রাণ বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'থক্ থক্' শব্দে শোণিতধারা উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। কত শত শত ছিন্ন বাহু ও ছিন্ন শির অনবরত ইতস্তত নিপতিত এবং সতত চক্রালিত অসিখণ্ডে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইল। বীরগণের বর্ম্মে বর্ম্মে পরস্পর সঙ্ঘর্ষ হওয়ায় যে সকল বহ্নিজ্বালা উত্থিত হইতেছিল, তাহাতে কাহার কাহার কেশপাশ দগ্ধ হইতে লাগিল। সশব্দে সম্পতিত অসি-সমূহ হইতে বীরদেহ উৎফুল্ল করিয়া 'ঝন্ ঝন্' শব্দ সমুত্থিত হইল। কুন্তাহত মাতঙ্গবৃন্দের শোণিততরঙ্গ সবেগে লোহিতাকারে প্রবাহিত হইল। গজেন্দ্রগণ পরস্পর দন্তসজ্ঘর্ষে অত্যুচ্চ কঠোর চিৎকার করিতে লাগিল। পরস্পর মহামুষলের আঘাতে নিষ্পিষ্ট হওয়ায় যোধবৃন্দের স্বর কষ্টোচ্চারিত ও বিকৃত হইয়া উঠিল। সঙ্কলিত শূরগণের শিরঃশ্রেণীরূপ সরোজমালায় অম্বরদেশ আবৃত হইল। সৈন্যসমূহের ব্যোম-বিক্ষিপ্ত বাহুদণ্ড সকল

ভুজগেন্দ্রবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। রণস্থল হইতে অনর্গল ধূলিজাল সমুত্থিত হওয়ায় জলদমালা সমাচ্ছাদিত হইল। রণোন্মত্ত শূরগণের হস্তস্থ অস্ত্র-সমস্ত ছিন্ন হওয়ায় বৈরপ্রতিঘাতনের জন্য পরস্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিয়া তুমুল সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ করিল। কতকগুলি যোদ্ধা পরস্পর খরতর নখর প্রহারে পরস্পরের নাসা, কর্ণ, চক্ষু ও কন্ধর ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কতকগুলি মহামল্ল ছিন্নধনু হইয়া পরস্পর তিরস্কার সহকারে ক্রীড়া করণ্ড বিশিষ্ট বাহু-যুদ্ধ দ্বারা জয়ভূমি-লাভে প্রয়াসী হইল। মদমত্ত মাতঙ্গ-সকল শরাবৃত হইয়া সবেগে নিপতিত হওয়ায় পৃথ্বীতল কম্পিত হইতে লাগিল। রথবেগ-বিধ্বস্ত রণোন্মত্ত অসংখ্য সৈন্যের শোণিতধারা সরিদাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র সংগ্রামভূমি প্লাবিত করিল। সমুত্থিত ধূলিজালে আকাশদেশ নীহারাবৃতের ন্যায় প্রতিভাত হইল। স্ফুরিত আয়ুধনিচয় দীপ্তিচ্ছটা ধারণ করিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল সংক্ষোভিত সাগরের ন্যায় সুগম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। অজস্র অসংখ্য লোক নিপাতিত হইতে দেখিয়া মনে হইল যেন স্বয়ং মৃত্যু আসিয়া বিকট হাস্য করিতে করিতে জীবনিবহ চর্ব্বণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন অত্যুন্মত্ত গিরীন্দ্রনিভ গজেন্দ্রগণ স্ব স্ব ঔরত্যে এবং গর্বিত গর্জ্জনে মেঘগর্জ্জন তিরস্কৃত করিতে লাগিল। রণোন্মত্ত যোধমণ্ডলী হইতে যে সকল চক্র, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদগরাস্ত্র ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বৃক্ষ, গর্ত্ত ও তটভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শরসমূহরূপ উর্ণাতন্তু দ্বারা যোধগণরূপ শৈলমেখলা সমাবৃত হইল। সৈন্যগণের পতাকা-পট ও চামর-নিকর মেঘাক্রমণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। ক্ষেপণী যন্ত্র হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পাষাণ ও চক্র সকল আকাশে উৎপতিত হওয়ায় খচরগণ দূরে অপসারিত, মরণোন্মুখ যোধবৃন্দের ক্রন্দন-ধ্বনিতে ঘর্ঘর শব্দ সমুত্থিত এবং কুঠারসমূহের কঠোর প্রহারে সৈন্যগণের মস্তক-নিচয় চূর্ণিত হইতে লাগিল। খড়্গ সকল ঊর্দ্ধে বহুদূর উৎপতিত হওয়ায় নভোমণ্ডল যেন তারকাময় হইল। গজগণ শক্তি-অনুসারে নির্ম্মুক্ত শক্তিসমূহ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরামণ্ডল আবৃত করিল। বেতাল-বনিতাগণ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তদুপরি মুদগর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। শূরগণের সমুৎক্ষিপ্ত তোমর-

সকলে আকাশমণ্ডল যেন তোরণ-ময় হইয়া উঠিল। ভুশুণ্ডী-ভগ্ন খড়্গ সমূহের অসংখ্য খণ্ডে ব্যোমমণ্ডল যেন কুন্তল-রাশিময় হইল। শূন্যপথে সমুত্থিত কুন্তসমূহ কান্তিচ্ছটায় বেণু-বন-বিস্তৃত আবরণবৎ প্রভা ধারণ করিল। উভয় পক্ষীয় রাজগণ অগ্র সৈনিকদিগের রক্তাক্ত ও কুর্চিবর্মগের নৈপুণ্যে সর্বাঙ্গে তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ শূন্যহস্ত মৃতপ্রায় শূরগণকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। পুলকরূপ নীহার পাতে কেয়ূরশালী ভটগণের মুখারবিন্দ বিশীর্ণ হইতে লাগিল। প্রাসাস্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া কতিপয় যোদ্ধা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। নিক্ষিপ্ত চক্র ও ক্রকচের আঘাতে অশ্ব গজ ও মনুষ্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্তত নিপতিত হইল। পরশু প্রহারে মাতঙ্গগণ অনবরত ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। উৎকটযোধী ভটগণ বৃহৎ বৃহৎ যষ্টি লইয়া প্রবল পরাক্রমে লম্ফ দিয়া নিপতিত হইল। যন্ত্র ও পাষাণ প্রভৃতির আঘাতে রথ ও ধ্বজ সকল নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। করবাল প্রহারে যোধবৃন্দের শিরঃপঙ্কজ ও ছত্র প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়ায় রণস্থল পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষেপণাস্ত্রের নিক্ষেপণে উভয় পক্ষীয় সৈন্যসমূহ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু রণোন্মত্ত যোদ্ধারা তাহা লক্ষ্যও করিল না। রথারোহী বীরগণকে নিগৃহীত করিবার অভিপ্রায়ে বহু যোদ্ধা লম্ফ দিয়া উৎপতিত হইতে লাগিল; কিন্তু মধ্যপথে সহসা মস্তক ছিন্ন হওয়ায় কবন্ধ হইয়াও বাহুবেষ্টনে বন্ধন করত রথীদিগকে ভূপাতিত ও স্বয়ম্পতনে পার্শ্বস্থদিগকে নিষ্পিষ্ট করিল। হস্তিগণ হস্তিচালক-দিগের অঙ্কুশাঘাতে আহত হইলেও যোধগণ তাহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিল। অনবরত পরশুপাতে অসংখ্য মদমত্ত বারণ ভূপতিত হইল। পাশাস্ত্র-প্রয়োগ-পটু বীরগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া পরিবেদনা-পুরঃসর ঘোরতর সমর-ব্যাপারে লিপ্ত হইল। ক্ষুরিকাঘাতে অসংখ্য যোদ্ধা কুক্ষি ও ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূমিতল আশ্রয় করিল। বীরেন্দ্রবৃন্দ ত্রিশূল-হস্তে শঙ্করের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধর যোধমণ্ডলী কি এক-প্রকার অব্যক্ত মধুর ধ্বনি সহকারে ধাবিত হইল। কতকগুলি যোদ্ধা দিক্পালরূপ কেশরসকল সমুন্নত করিয়া নৃসিংহবেশী নটের ন্যায় সগর্ব্বে হুঙ্কার ও সক্রোধে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ঐ দারুণ যুদ্ধে কতকগুলি যোদ্ধা বজ্রমুষ্টির আঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া ধরাশায়ী হইল। শত্রুসংহার-পটু পট্টিশ সকল প্রবলবেগে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় আকাশে উৎপতিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বীরশ্রেষ্ঠগণ এবং রথ, অশ্ব, গজ ও ধ্বজ সকল বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে [illegible] লাগিল। পরস্পর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ-প্রবৃত্ত যোধগণের ক্ষতাহত দেহস্তূপ [illegible] কুলাচলবৎ উন্নত হইয়া উঠিল। তালতরুর ন্যায় প্রাংশুকায় পুরুষেরা প্রয়োজন মত উত্তাল কুদ্দাল দ্বারা রণভূমি উন্মূলিত ও সমীকৃত করিতে লাগিল। সমর-সঞ্চারের সৌকার্য্যের জন্য পরস্পর শরদ্বয়ের প্রপাতস্থল যাবৎ লোক সকল অপসারিত ও শিলাখণ্ড সকল কর্ত্তিত হইল। ক্রকচাস্ত্রের উভয় পার্শ্বের ঘর্ষণে মত্ত মাতঙ্গগণের বিপুল দেহ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। যেরূপ উলুখলে তণ্ডুলসকল চূর্ণ হয়, তদ্রূপ সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্যদল মুষলপাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। যেমন ব্যাধগণ বিহঙ্গমদিগকে জাল দ্বারা আবদ্ধ করে, তদ্রূপ যোধগণ বিপক্ষীয় বীরগণকে অস্ত্র শৃঙ্খলায় বন্ধন করিতে লাগিল এবং তীক্ষ্ণ তরবারিধারী যোধগণ কর্ত্তৃক নিস্ত্রিংশ প্রহারে যমসদনে নীত হইতে লাগিল। শ্বাপদগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হতাহত যোধগণকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আহত, অর্দ্ধমৃত, ভূলুণ্ঠিত যোধবৃন্দ মর্ম্মভেদী চিৎকার করিতে লাগিল। কতিপয় যোদ্ধা তীক্ষ্ণনখান্বিত অঙ্গুষ্ঠসাহায্যে শর সকল উদ্ধৃত করিয়া বিপক্ষপক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ নিক্ষিপ্ত বাণগণের 'রণ রণ' রবের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শব্দ মিশিয়া গিয়া মরীচমিশ্র ব্যঞ্জনবৎ কেমন এক মধুর হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের নিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া যোধগণের অনেকে মৃত এবং অনেকে বিপক্ষদলে আয়ুধ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। কোথাও কোথাও সৈন্য-নিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্নিদগ্ধ যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র সকল সশব্দে পতিত হইতে লাগিল। কোথাও সৈন্যেরা কুম্ভস্থ তপ্তাঙ্গাররাশি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে কত শত যোদ্ধার চক্ষুমধ্য দগ্ধ হইয়া গেল। কোথাও বা সেনাগণ কুম্ভস্থিত বিষবারি নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষসৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল।

এইরূপে ঐ যুদ্ধ উত্তরোত্তর ভয়ঙ্করাকার ধারণ করিল। কত যে হত ও আহত হইতে লাগিল, তাহার আর ইয়ত্তা রহিল না। জল-

ধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, বীরগণ তদ্রূপ রাশি রাশি নারাচ-নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে কবন্ধগণ মেঘসন্দ্রমে মত্ত ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। বেগ-বিক্ষুব্ধ পর্ব্বতপ্রতিম মাতঙ্গগণ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র তখন কল্পান্তকালের ন্যায় ভয়াবহ দৃশ্যে পরিণত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! অনন্তর রণাভিলাষী রাজগণ, সেনাগণ, মন্ত্রিগণ এবং এতদ্ভিন্ন নভোমণ্ডলস্থিত দর্শকবৃন্দ, সকলেই বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—দেখ দেখ, রণভূমির নভঃপ্রদেশ শূরগণের মস্তক-পরম্পরায় সমাকীর্ণ হইয়া যেন তারকামালায় মণ্ডিতের ন্যায় এবং বিলোল-কমল-কুল-সমাকুল, অবিরত পতিত বিহগশালী সরোবরের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, বীরগণের শোণিত-শীকর-সম্পর্কে সিন্দূরবৎ অরুণবর্ণ সমীরণ প্রবাহিত হওয়ায় মধ্যাহ্নকালীন জলধর ও ভাস্কর-নিকর সন্ধ্যা-কালীন লোহিতাভা ধারণ করিতেছে।

ইতিমধ্যে কোন দর্শক, কোন অভিজ্ঞের নিকট জিজ্ঞাসিল,—ভগবন্! এই নভোমণ্ডল সহসা কেন পলাল জালে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অভিজ্ঞ উত্তর করিলেন,—এ সকল পলাল নহে, ইহারা বীরগণের শরসমাচিত বাহু-রাজি। অতঃপর দর্শকেরা বীরবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল, এই রণভূমির যত রেণু রুধির-রঞ্জিত হইবে, তত সহস্র বর্ষ বীরগণ স্বর্গভোগ করিবেন। অতএব হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইও না, উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ কর। ঐ দেখ, ঐ যে নিস্ত্রিংশ-নিচয় রহিয়াছে, উহারা নিস্ত্রিংশ নহে। ফলতঃ উহারা কেবল বীরাবলোকিনী বিজয়লক্ষ্মীর নীলোৎপল-দল-নিভ নয়ন-বিভ্রম। সুরসুন্দরীরা বীরবৃন্দকে আলিঙ্গন করিবার জন্য

একান্ত ব্যাকুলিত, কুসুমায়ুধ তাহাদের মেখলাজাল শ্লথ করিতে সমুদ্যত। তোমাদের স্বর্গাগমনের প্রত্যাশায় চঞ্চল ভুজলতাশালী, মঞ্জুলাম্বরধারিণী দেবতারা, নন্দনোদ্যানের মধ্যে গিয়া মঞ্জরীর ন্যায় মত্তনেত্রে মধুরালাপে প্রাণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ কহিল,—ঐ দেখ, সেনাপতিরূপিণী কামিনী যেন কঠোর কুঠাররূপ কটাক্ষপাতে প্রতিযোদ্ধগণ প্রণয়ীর প্রাণ বিদারণ করিতেছে। আহা! কাল যেমন রাহুকে রবির নিকট লইয়া যায়, তেমনি মদীয় পিতার ঐ উজ্জ্বল কুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক সূর্য্য-সমীপে নীত হইতেছে। ঐ দেখ, জনৈক ঊর্দ্ধবাহু যোদ্ধা, পাদবিলম্বিত শৃঙ্খলায় বদ্ধ স্থূলাকার চিত্রদণ্ডাখ্য চক্রাস্ত্র ঘূর্ণন করিতে করিতে বেগসহকারে বৈবস্বতের ন্যায় দক্ষিণ দিক্ হইতে আগমন করিতেছে এবং ইতস্ততঃ সেনাসকল সংহার করিতেছে! অতএব আইস, আমরা যে দিক্ হইতে আসিয়াছি, সেইখানে গমন করি। কেহ কহিল,—ঐ দেখ, তালতরুর ন্যায় সমুন্নত কবন্ধগণ রণাঙ্গনে নৃত্য করিতেছে। উহাদের সদ্যঃকর্ত্তিত মস্তক-গর্ত্ত কঙ্কপক্ষিকুলে সমাকুল হইয়াছে।

অনন্তর সুরগণের সভাতেও কোন্ বীর কবে কিরূপে কোথা হইতে লোকান্তরে উপনীত হইবেন, পরস্পর এইরূপ বহু আলোচনা হইতে লাগিল। তাঁহারা আরও বলিতে লাগিলেন,—ঐ দেখ, স্রোতস্বতীর ন্যায় সেনাগণ মৎস্য-মকরব্যূহে বিরাজিত হইয়া আগমন করিতেছিল, সহসা সাগরসদৃশ প্রতিপক্ষীয় সেনারা উহাদিগকে গ্রাস করিল। অহো! সৈনিক জীবন কি বিষম! ঐ দেখ, করিগণের গণ্ডমণ্ডলে নিরন্তর নারাচ-নিচয় নিপতিত হইতেছে; তাহাতে মনে হয়, যেন শৈলেন্দ্রশিখরে বারিধারা বর্ষণ হইতেছে। কাহারও মস্তক কুন্তাগ্রে ছিন্ন হইলে, সে বলিল—হায়, আমার মস্তক কুন্তাগ্রে ছিন্ন হইয়া গেল! এই কথা কহিতে কহিতে সখেদে আকাশ পথে স্বর্গে সমুড্ডীন হইল এবং সেখানে স্বর্গীয় মহোৎসব সন্দর্শনে সেই শোক বিস্মৃত হইয়া সানন্দে বলিল,—আহা! আমি মস্তক দিয়া জীবিত হইলাম। আমার মস্তক হয় নাই।—যেন গগনতলে বিহঙ্গরবের ন্যায় এই কথাই উচ্চারিত হইল।

এদিকে সেনানীরা আদেশ করিতেছেন, ঐ যে সেনারা আমাদিগের উপর মত্ত পাষাণ বর্ষণ করিতেছে, উহাদিগকে বলপূর্ব্বক বন্ধন কর।

সুরসম্প্রদায় সকলেই বলিতে লাগিলেন, বীরপত্নীগণ মরণান্তে অপ্সরা হইয়া জন্মিয়া থাকে এবং তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপতিদিগকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও এই সকল বীর যোধগণের প্রিয় পত্নীগণ পতি নিহত হইবার পূর্ব্বেই স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে আসিয়া অপ্সরা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বীর পতিরা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গীয় দেহে আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া, ইহারা তাহাদিগকে সাদরে পরিগ্রহ করিতেছে। ঐ দেখ, মৃত পতিত বীরগণের রমণীরা অধুনা সুরপুরের সুন্দরী হইয়া স্ব স্ব স্বামীর অন্বেষণ করিতেছে। স্বর্গ পর্য্যন্ত সমুৎক্ষিপ্ত এই সকল কুন্তায়ুধ, বীরবৃন্দের স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ শোভিত হইতেছে। ঐ যে কামিনীকে কমনীয় কাঞ্চনাঙ্কিত বীর-ভর্ত্তার বক্ষস্থলে মৃতাবস্থায় পতিত দেখিয়াছিলাম, সে অধুনা সুরসুন্দরী হইয়া স্বর্গে আসিয়া স্বামীর অন্বেষণ করিতেছে।

সেনাপতিরা ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন, যেমন মহাপ্রলয়কালীন কল্লোলমালায় সুমেরুশৈল সমাহত হয়, তেমনি বিপক্ষ পক্ষের সমুদ্ধত মুষ্টিপ্রহারে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যসকল হত ও পতিত হইতেছে। অতএব ওহে মূঢ় সেনাগণ! তোমরা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ কর। অর্দ্ধমৃত সৈন্যদিগকে রণভূমি হইতে অপসারিত কর। ওহে নিষ্ঠুরেরা! এই স্বপক্ষীয় আহত সৈন্যদিগকে পদ-দলিত করিও না।

নভশ্চরেরা বলিতে লাগিলেন,—ঐ দেখ, মৃত পতিত বীরগণ দিব্য দেহ ধারণ করিয়া কবরী-বন্ধন-বিলোলা অতীব উৎকণ্ঠিতমনা অপ্সরাগণের পার্শ্ব দেশে বিরাজ করিতেছে। অপ্সরাগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,—ওহে, ইনি ক্রূর সমরক্ষেত্র হইতে স্বর্গে আসিয়াছেন, ইঁহাকে এই প্রফুল্ল কনক-কমল-কলিত সুরতটিনীর ধীর সমীর-সেবিত ছায়াময় তটদেশে শীতল সলিলাসিক্ত করিয়া বিনোদিত কর। ঐ দেখ, যোধগণের বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে বিচূর্ণিত সংখ্যাতীত নরকঙ্কাল নভঃপ্রদেশে সমুত্থিত হইয়া 'কন কন' শব্দে দূরবিসর্পিত তারকা-নিকরের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, আকাশে কেমন সারকরূপ সলিলশালিনী জীবনবাহিনী স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। উহাতে পতিত পর্ব্বত সকল ধূলিকণায় পরিণত হইয়া পঙ্কিলভাব ধারণ

করিতেছে। যোধ-নিক্ষিপ্ত ঘূর্ণিত চক্র উহার আবর্ত্ত। গ্রহপথে ভ্রমমাণ বীরবৃন্দের মস্তক উহার পদ্ম। আয়ুধপরম্পরার প্রভাজাল ঐ পদ্মের মৃণাল, খড়্গ উহার দল, অন্যান্য শস্ত্রসমূহ উহার কণ্টক এবং কেতু পট্টাদি উহার কুসুম-লাঙ্গ দল ও তদুপরি বাণরূপ ভ্রমর সকল ভ্রমমাণ। ঐ স্রোতস্বিনী বায়ুবেগ-বিকম্পিত পদ্মরাজি-বিরাজিত সরসীর ন্যায় গ্রহমার্গে বহমান। গিরিগাত্রে পিপীলিকার ন্যায় এবং কান্ত-বক্ষে কামিনীর ন্যায়, ঐ দেখ ভীরু সৈনিকেরা রণক্ষেত্র-পতিত মৃত মাতঙ্গের অন্তরালে লুকায়িত হইতেছে। ঐ দেখ, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন প্রণয়ী জনের সঙ্গম-সমাখ্যায়ী সমীরণ বিদ্যাধর-সুন্দরীগণের অলকাবলী উল্লাসিত করিয়া ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। কত শত শত ছত্র নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া শশাঙ্কশোভা ধারণ করিতেছে। মনে হয়, যেন বিজয়ী বীরগণের যশোরাশিরূপ চন্দ্রমা দ্বারাই গগনতল ঐরূপ শ্বেতাতপত্রে সমাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, নিহত বহু বীর মরণমূর্চ্ছার অপগমে অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বপ্নলব্ধ পুরীর ন্যায় স্ব স্ব কর্ম্মরূপ শিল্পী কর্ত্তৃক সুরচিত অমর-দেহ লাভ করিতেছে। সমরে অনবরত শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও চক্র প্রভৃতি বর্ষণ হইতেছে; উহাতে আকাশ-সাগর যেন চঞ্চল মৎস্য-মকর-সঙ্কুলের ন্যায় শোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, শ্বেতচ্ছত্র সকল শরনিকরে কর্ত্তিত হইয়া কলহংসমালার ন্যায় আকাশে উত্থিত হওয়ায় আকাশ যেন লক্ষ লক্ষ পূর্ণোদিত শশাঙ্কনিকরে সমাবৃত হইতেছে। চারুনিনাদী চামর-নিচয় গগনপথে উড্ডীন হইয়া বায়ু-বিচালিত ঊর্ম্মিমালার অনুকরণ করিতেছে। বীরগণের ছত্র, চামর ও কেতু-সকল অস্ত্রাঘাতে বিদলিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বৃষ্টি হয়, যেন আকাশরূপ ক্ষেত্রোপরি যশোরূপ শালি-ধান্যরাশি বপিত হইতেছে।

কোন দর্শক অপর দর্শককে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে সজ্জন-মিলন! ঐ দেখ, কত শত শক্তি অস্ত্র আকাশপথে আসিতেছিল, পতঙ্গ কর্ত্তৃক শস্যসম্পদের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঐ শক্তিগুলি শরবর্ষণে সংহারদশায় উপনীত হইতেছে। যোধগণ স্বীয় স্বীয় দোর্দণ্ড প্রসারিত করত বিপক্ষ সেনার বর্ম্মাবৃত দেহ তরবারি দ্বারা আহত করিতেছে; উহাতে যে 'ছটাৎ ছটাৎ' শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, মনে হয় উহা যেন মৃত্যুরই কটু কঠোর হুঙ্কার নাদ। ঐ দেখ, এই ভয়াবহ জনসংহার-

কালে বিদীর্ণ-দেহে ভূধরগণের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। আহা! ঐ রথ সকল রথী, সারথি ও অশ্বের সহিত রুধিরময় মহাহ্রদে মগ্ন ও রুদ্ধগতি হইয়া কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। অনবরত আয়ুধ প্রহারে যোধগণের কর ও বর্ম্ম হইতে নিঃসৃত টঙ্কার নিনাদ যেন কৃত্য-নিরত কালরাত্রির রণবীণার ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে। রণক্ষেত্রে নিহত অশ্ব, মনুষ্য, গজ ও গর্দ্দভদিগের যে সকল রুধিরধারা নির্গত হইতেছে, ঐ দেখ, তাহাদের বিন্দুজালে সংসিক্ত সমীরণ কর্ত্তৃক দশ দিক্ অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আয়ুধপরম্পরার কিরণচ্ছটায় নভোমণ্ডল ঘনঘটাময় ও রূপবতী কালীর কেশপাশবৎ শ্যামায়মান হইয়াছে। শরসমূহরূপ কোরক-নিকরের মালায় মেঘমণ্ডলে যেন বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইতেছে। নিখিল ধরাতল ও অস্ত্রজাল অনন্ত রুধিরপ্রবাহে রঞ্জিত ও বিশীর্ণ হওয়ায় সমগ্র জগৎ যেন অগ্নিলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। পরস্পর সমর-নিরত যোধগণের করনিকর হইতে ভুশুণ্ডী, শক্তি, শূল, অসি, মুষল ও প্রাসাদি সকল পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানাদিকে নিপতিত হইতেছে।

রাম! স্বপ্নের ন্যায় সে যুদ্ধ আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোথাও কতকগুলি যোদ্ধা চরণ-চালনে অক্ষম হইতেছে; অন্য এক পরাক্রান্ত যোদ্ধা ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতেছে। মনে হইতেছে, উহা যেন অবিকল রাক্ষসী মায়া। রণাঙ্গন হইতে নিরন্তর পরস্পর প্রহার-নিবন্ধন 'ঝন্ ঝন্' শব্দ সমুত্থিত হইতেছে; যেন জন-ক্ষয়ে রণ-ভৈরব হৃষ্ট হইয়া গান করিতেছে। ঐ দেখ, রণসাগর পরস্পর সমরহেতু তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ খড়্গচূর্ণে পূর্ণ হইয়া যেন বালুকাময় হইয়াছে আর ছিন্ন ভিন্ন অশ্বসকল তরঙ্গের ন্যায় ঐ রণসাগরে শোভিত হইতেছে। চারিদিক্ হইতে রণভেরীর মধুর নিনাদ উত্থিত হইয়া দিক্‌পালদিগের লোক পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ করিয়াছে। এই রণপর্ব্বত প্রলয়কালে পরস্পর প্রতি-কূলভাবে প্রেরিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণরূপ পক্ষবলের সাহায্যে যেন আকাশে উৎপাতিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

তখন কতিপয় বীর বলিতে লাগিল, হায়, হায়! আমাদের নারাচ সকল শত্রুগণ হইতে ক্রেঙ্কার নাদে নিঃসৃত হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের কঠিন

চর্ম্মে পতিত হইল ; কিন্তু তাহা ভেদ করিতে না পারিয়া অতীব কঠোর উপলখণ্ডে প্রতিহত ও তদ্‌বিনির্গত তড়িচ্ছটাতুল্য বহ্নিকণায় অতিমাত্র উত্তপ্ত হইয়া তত্তৎ উপল খণ্ড ভেদ করত সপক্ষে বহিতেছিল। কোন রণশ্রান্ত সৈনিক তথাবিধ অপর কোন বন্ধুকে বলিল,—

রণশ্রান্ত মিত্র! আইস, ঐ প্রজ্বলিত পাবকমিশ্রিত শর সকল আসিয়া আমাদের দেহ ভেদ করিবার পূর্ব্বেই আমরা রণে ভঙ্গ দিয়া সত্বর পলায়ন করি। এই দেখ, এই ভীষণ জন-সংহারের বাসরও অবসান হইয়াছে।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রঘুনন্দন! অতঃপর ঐ রণার্ণব একান্ত ভীষণ ও উদ্বেল হইয়া উঠিল। আকাশে উৎপতনশীল তুরঙ্গমগণ ঐ রণার্ণবের তরঙ্গ-ভঙ্গ, ছত্র সকল ফেনপুঞ্জ, শুভ্র শুভ্র শরসমূহ শফরীশ্রেণী, অশ্বারোহী সৈন্যদল উদ্ধত মহাকল্লোল, নানাবিধ আয়ুধশ্রেণী নদীনিচয়, ঘূর্ণমান সৈন্যগণ আবর্ত্ত, মত্ত মাতঙ্গগণের কুম্ভসকল চলাচল কূর্ম্মকুল, শত শত নিপতিত ঘূর্ণিত চক্রচয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত এবং নিহত সেনানায়কগণের ছিন্ন মুণ্ড সকল ঐ আবর্ত্ত সমূহের মধ্যস্থিত ভ্রমমাণ তৃণ। ঐ রণার্ণবে ধূলিরূপ জলদমালা সকল উত্থিত হইয়া অনবরত খড়্গ-প্রভারূপ জলরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্ত মকরব্যূহের মধ্যে পড়িয়া যোধগণরূপ রণতরী সকল ইতস্ততঃ ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর গুড়ু গুড়ু নাদে গগন-গর্ভ প্রতিধ্বনিত হইল। মীনব্যূহ সকল ভেদ করিয়া শরবীজরূপ সর্ষপরাজি নিকাশিত হইতে লাগিল। খড়্গরূপ ভীষণ তরঙ্গে আহত হইয়া পতাকারূপ লহরী সকল ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

ঐ রণার্ণবের শস্ত্ররূপ জলরাশি জলদসদৃশ চঞ্চল ভূতাকার প্রবৃত্ত-

রূপে প্রতিভাত হইল। ক্রোধোন্মত্ত সৈন্যগণ তিমি ও তিমিঙ্গিলবৎ চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণবর্ণ লৌহকবচধারী সৈন্যগণের সঞ্চালনে ঐ রণার্ণব ভীষণ হইয়া উঠিল। কবন্ধরূপ আবর্ত্ত সেনাসমুদ্রের সৈন্যাদির ভূষণপরম্পরা স্ফুরিত হইতে লাগিল। নারাচ শীকরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। রণার্ণবের ভীষণ নির্ঘোষে অপর কোন শব্দ শ্রুত হইল না; সুতরাং সর্ব্বত্র যেন একই বুদ্ বুদ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ রণার্ণব হইতে যোধগণের ছিন্ন মুণ্ড সকল শীকর-নিকরের ন্যায় অবিরত পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। চক্রব্যূহ সমূহ আবর্ত্তবৎ প্রতিভাত হইতেছিল, ভটরূপ কাষ্ঠখণ্ড সকল তন্মধ্যে ঘূর্ণমাণ হইতে লাগিল। যোধগণ কঠোর টঙ্কারনিনাদী কোদণ্ডরূপ কুণ্ডলীর কায়চ্ছেদনে নিরত হইল। অপার সৈন্যোচ্ছ্বাস দর্শনে মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই পাতালতল হইতে ঐ রণার্ণবে সেনারূপ ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইতেছে। অসংখ্য পতাকা ও ছত্রশ্রেণীর চলাচলে রণার্ণব ফেনিল হইয়া উঠিল। রুধির-নদীর প্রবাহবেগে রথরূপ দ্রুমরাজি ভাসিতে লাগিল। গজগাত্র হইতে সমুদ্গত প্রচুরতর মহারুধিরপুঞ্জ ঐ রণার্ণবের বুদ্ বুদবৎ বিভাত হইল। সৈন্যরূপ প্রবাহ মধ্যে হয় ও হস্তিরূপ জলজন্তুগণ বিচরণ করিতে লাগিল। দর্শকদিগের নিকট ঐ সংগ্রাম তখন গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় অতীব আশ্চর্য্যজনক হইয়া উঠিল।

তখন প্রলয়-ভূকম্পে পর্ব্বত সকলের ন্যায় ঐ রণস্থল কম্পিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গরূপ তরঙ্গমালা প্রবাহিত, গজঘটা-রূপ গিরি-তট-শ্রেণী প্রপতিত, ভীরু সেনারূপ মৃগগণ বিত্রাসিত, নির্ভীক যোদ্ধৃগণের গর্জ্জন জাত ঘুর ঘুর ধ্বনি উত্থিত, চঞ্চল তুরঙ্গরূপ শরভ সকল ইতস্ততঃ ধাবিত, এবং শরশীকররূপ অরণ্যভূমি বিরাজিত হইল। প্রচলিত মধুকরকুলের ঝঙ্কাররবে কুঞ্জরনিচয় প্রতিধ্বনিত হইল। যোধগণরূপ মেঘ ও সিংহ সকল চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। ধূলিরূপ জলদজাল প্রসর্পিত হইল। যোধগণরূপ গিরিসকল বিগলিত হইতে লাগিল। মহারথসমূহের অঙ্গ সকল নিপতিত, খড়্গ সকল প্রচলিত, যোধগণের শররূপ পুষ্পরাশি প্রচ্যুত, পতাকা ও ছত্র সমূহরূপ অম্বুদমণ্ডল উত্থিত এবং রুধিরনদীর প্রবাহে বারণগণ সশব্দে

[illegible]-প্রান্তে সমুদ্যত হইল। ধনু, ধ্বজ, পতাকা [illegible]
হইয়া নানাদিকে নিপতিত হইতে লাগিল। উজ্জ্বল ও [illegible]
সকল ইতস্ততঃ পতনকালীন অগণিত প্রদীপ্ত প্রভাকরবৎ প্রতিভাত [illegible]
রণাহত বীরগণের কঠিন প্রাণভাগে সমগ্র সেনামণ্ডলীর [illegible]
হইয়া উঠিল। যোধগণের কোদণ্ডস্বরূপ পুষ্কর ও আবর্ত্তাখ্য [illegible]
হইতে অবিরল শরসমূহরূপ বারিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। খড়্গাপুঞ্জের
শিলাশাণিত তীক্ষ্ণাগ্র সকল অম্বরদেশে বিদ্যুদাকারে বিস্ফুরিত হইতে
লাগিল। আহত যোধগণের উচ্ছলিত রুধির-সাগরে কত শত শত [illegible]
কুলাচল পতিত হইল। স্থূলাকার রক্তবিন্দুরূপ নক্ষত্র সকল অম্বর [illegible]
বিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডলে ঘূর্ণিত আবর্ত্ত [illegible]
চক্রপরম্পরারূপ সরিৎসমূহে নভোমার্গ ও মেঘমালা পরিপূর্ণ হইয়া [illegible]
যোধসকল অস্ত্ররূপ প্রলয়পাবকে দগ্ধ হইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিতে
লাগিল। ভূতল ও ভূধরগণ অস্ত্রবর্ষণরূপ অশনি-পাতে সমাচ্ছন্ন হইল;
গজেন্দ্ররূপ গিরীন্দ্রগণের পরিপতনে জনগণ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। [illegible]
নিকর ও অবিরল অবস্থিত সৈনিক সমূহরূপ মেঘমণ্ডলে নভস্তল ও ভূতল
আচ্ছাদিত হইল।

এইরূপে মহাসৈন্য-সাগরের ভীষণ সংক্ষোভে মহাসমর উপস্থিত
হইল। উভয় পক্ষ-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে
উদ্যত হইল। অবিরত অগণিত শরপাতে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। [illegible]
হইল, যেন প্রলয়ের প্রচণ্ড প্রভঞ্জনপ্রবাহে জলমধ্যগত ভূধরগণ [illegible]
সমুৎপতিত হইয়া সাগরস্থ শৈলতটের আশ্রয় লইল। যোধগণ সত্বরে শূল,
শক্তি, চক্র, গদা, ভুষণ্ডী ও প্রাস প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে
লাগিল। ঐ সকল প্রভাময় অস্ত্র শস্ত্র পরস্পর পরস্পরকে বিদলিত করত
সশব্দে দশ দিকে বহুবার পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রলয়-বায়ু-বিবর্ত্তিত [illegible]
পরম্পরার ন্যায় প্রতিভা ধারণ করিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই সমরক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় যোধগণের পতিত স্তূপীকৃত মৃত দেহসকল শৈলশৃঙ্গবৎ প্রতিভাত হইল। ভীরুস্বভাব সৈনিকেরা রণে ভঙ্গ দিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গজগণের শররূপ শৈলশ্রেণীতে অম্বুদগণ বিশ্রাম করিল। যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচেরা রুধিরসাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সময়ে সমরে অপরাঙ্মুখ, ধর্ম্ম-শীল-বল ও সত্ত্ব-সম্পন্ন, কুলোজ্জ্বলকর বীরগণ পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া উভয় দিক্ হইতে আগত নদীপ্রবাহের ন্যায় সম্মিলিত হইলেন। সাগরে যেমন উভয় দিকের সমুদ্গত তরঙ্গরাজি পরস্পর ঘোররবে সম্মিলিত হয়, তেমনি সেই সমরাঙ্গনে মাতঙ্গ মাতঙ্গের সহিত এবং তুরঙ্গ তুরঙ্গের সহিত পরস্পর গভীর গর্জ্জন করিয়া সবেগে মিলিত হইল। মনে হইল, যেন কোন কানন-পরিবৃত পর্ব্বত, প্রতিদ্বন্দ্বী পর্ব্বতের সহিত সবলে মিলিয়া গেল। তখন গজে গজে অশ্বে অশ্বে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক নরসৈন্যের সহিত নরসৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন বায়ু-বিধুত বেণুবনশ্রেণী পরস্পর পরস্পরের মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইল। যেমন সমুড্ডীন আসুর নগর দৈব নগরের সঙ্ঘর্ষে দলিত হয়, তেমনি সেই সময়ে রথীগণের রথরাজি দ্বারা রথসমূহ ও জনসঙ্ঘ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। বীরগণের ধনুর্বিনির্ম্মুক্ত বাণপরম্পরা আকাশপথে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব পয়োদপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিল। ধনুর্দ্ধর যোধগণের পতাকাবাহী সেনাদল আকাশতল আবৃত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোমলচিত্ত যোদ্ধাগণ তৎকালে সেই বিষম আয়ুধযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে অগত্যা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।

এই সময় অতি ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সমররূপ কল্পাগ্নি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যোদ্ধৃসম্প্রদায় পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হইল।

তখন চক্রযোধী চক্রযোধীর সহিত, ধনুর্দ্ধারী ধনুর্দ্ধারীর সহিত, খড়্গধারী খড়্গধারীর সহিত, ভুষণ্ডীযোদ্ধা ভুষণ্ডীযোদ্ধার সহিত, মুষলযোধী মুষলধারীর সহিত, কুন্তাস্ত্রধারী কুন্তাস্ত্রধারীর সহিত, ঋষ্টি যোদ্ধা সকল ঋষ্টিধারী-দিগের সহিত, প্রাসহস্ত যোধগণ প্রাসধারীদিগের সহিত, মুদ্গরপ্রহারী যোদ্ধারা মুদ্গরধারীদিগের সহিত, গদাযোধী গদাযোধীর সহিত, শক্তি-প্রহারী শক্তিধারীর সহিত, শূলযুদ্ধপটু যোদ্ধাগণ শূলধারীদিগের সহিত, পরশুপ্রহারপটু পরশুধারীর সহিত, লকুটধারী লকুটধারীর সহিত, শিলা-যোধিগণ শিলাযোধিগণের সহিত, পাশাস্ত্রপ্রহারী পাশধারীর সহিত, শঙ্কুপাণি যোধগণ শঙ্কুধারীদিগের সহিত, ক্ষুরিকাযোধী ক্ষুরিকাধারীর সহিত, ভিন্দিপালধারী ভিন্দিপালযোধীর সহিত, বজ্রপাণি বজ্রপাণির সহিত, অঙ্কুশযোধী অঙ্কুশযোধীর সহিত, হলযোধিগণ হল-যোদ্ধাদিগের সহিত, ত্রিশূলধারী ত্রিশূলপাণির সহিত এবং শৃঙ্খলাজালযোধিগণ শৃঙ্খলা-ধারীদিগের সহিত, ক্ষুভিত প্রলয় পয়োধির প্রচণ্ড ঊর্ম্মিমালার ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

তখন ভূতল ও নভস্তলের অন্তরালস্থিত সেই সমররূপ মহাসাগর অমরগণেরও দুস্তর হইয়া উঠিল। ঘূর্ণমাণ চক্রনিচয় ঐ সমর-মহাসাগরের আবর্ত্ত। উভয় পক্ষ-নিক্ষিপ্ত শরনিকর উহার শীকর-পরম্পরা। ভ্রমণ-পরায়ণ অস্ত্র সকল উহার মকরশ্রেণী। উজ্জ্বল আয়ুধবৃন্দ উহার কল্লোলরাশি এবং উৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড সকল উহার জলজন্তুরাজি। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলই তুল্য অর্দ্ধভাগে অবস্থিত। উভয় পক্ষেই বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, শৌর্য্য, অস্ত্র, অশ্ব, রথ ও ধনু এই অষ্টবিধ সংগ্রামসহায় অপ্রতিহত এবং উভয় পক্ষীয় বীরগণই পরস্পর পরস্পরের প্রতি কুপিত। সিন্ধু-রাজ ও বিদূরথ উভয় ভূপতিই তখন স্ব স্ব সৈন্যদলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত।

রামচন্দ্র! ঐ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লীলাপতি বিদূরথের সাহায্য করিবার জন্য নানাদিক্‌স্থিত যে সকল জনপদ হইতে যে সকল বীর আগমন করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর।

কোশল, কাশী, মাগধ, মিথিলা, উৎকল, মেকল, কর্কর, মুদ্র,

সংগ্রামশৌণ্ডক মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বাজিমুখ, ও অম্বষ্ঠবাসী পুরুষাদকগণ, বর্ণকোষ্ঠ, সবিশ্বোত্র, আমমৎস্যাশী, ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত, সৌবীর, একপাদকগণ, মাল্যবান্, শিবি, আঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পদ্মান্য এবং উদয়গিরি, এই সকল দেশবাসী বীরগণ পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি পর্ব্বতের অধিবাসিগণ এবং চেদি, বৎস, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, জঠর, বিদর্ভ, মেকল, শবরানন, শবরবর্ণ, কর্ণ, ত্রিপুরপূরক, কণ্টকস্থল, পৃথক্‌দ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র, চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেমকুড্য, শ্মশ্রুধর, বলিগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা, ও নালিকেরীনিবাসী বীরগণ, পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্ হইতে আগমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর লীলাপতির সাহায্যের জন্য দক্ষিণ দিক্ হইতে যে যে দেশীয় যে সকল নরপতি আসিয়াছিলেন, বলিতেছি। বিন্ধ্য, কুসুমাপীড়, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মলয়, সূর্য্যবান্, সমৃদ্ধ গণরাজ্য, অবন্তী, শাম্ববতী, দশপুর, রেষিক, আতুর, কচ্ছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি, নাগর, দণ্ডক, গণরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, সাহা, শৈব, ঋষ্যমূক, কর্কোট, বনবিম্বিল, পম্পাবাসী কৈরক, কর্কবীরক, স্বৈরিক, যাসিক, ধর্ম্মপত্তন, পঞ্জিক, কাসিক, তৃষ্ণখল্লুল, যাদ, তাম্রপর্ণক, গোনর্দ্দ, কনক, দীনপত্তন, তাম্রীক, দন্তুর, কীর্ণ, সহকার, এণক, বৈতুণ্ডক, তুম্ববন, লাজীন দ্বীপ, কর্ণিক, কর্ণিকাভ, শিবি, কৌঙ্কণ, চিত্রকূটক, কর্ণাট, মণ্টবটক, মহাকটকিক, আন্ধ্র, কোলগিরি, অচলান্তক, বিচেরিক, চণ্ডায়ত্ত, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলাক্ষারোদ, ভোনন্দ, মর্দ্দল ও মলয় প্রভৃতি নানাদেশীয় নরপতি এবং লঙ্কাস্থিত রাক্ষস-বীরগণ বিদূরথের পক্ষে যোগদান করিয়া ছিলেন।

অনন্তর যাঁহারা পশ্চিম দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন, রাজ্যসহ সেই সকল রাজার নাম কীর্ত্তন করি। মহারাজ্য সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, সৌবীর, শূদ্র, আভীর, দ্রবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ড, কালিরুহ, হেমগিরি, রৈবতক, জয়কচ্ছ, যবনাধ্যুষিত ময়বর, বাহ্লীক, মার্গণ, আবন্ত, ধূম্র, তুম্বক, লাজগণ এবং পশ্চিম-দক্ষিণ দিক্‌স্থিত সমস্ত পর্ব্বতবাসী ও সাগরতটবর্ত্তী সংখ্যাতীত বীর রাজা লীলাপতির সাহায্য করেন।

রামচন্দ্র! অধুনা, যে সকল জনপদবাসী লীলাপতির প্রতিপক্ষে যোগদান করিয়া ছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। মণিমান্, কুরার্পণ, বনোকহ, মেঘভব, চক্রবাড়, এই সকল পশ্চিম দিক্স্থিত মহাগিরি। ঐ মহাগিরিসমূহের অধিবাসী বীরগণ এবং পঞ্চজন, কাশ, ব্রহ্মচয়, অন্তক, ভারক্ষ, পারক, শান্তিক, শৈব্য, রমরক, ছায়া, গুহুক, নিয়ম, হৈয়ক, মুহুগায়, তাজিক, হূনক, কতকদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী কর্ক ও গিরিপর্ণ-নিবাসী, ধর্ম্মমর্য্যাদা-পরিত্যাগী নিকৃষ্ট ম্লেচ্ছজাতি এবং দ্বিশত যোজন-বিস্তৃত জনপদভূমি, পরবর্ত্তী মহেন্দ্রগিরি, মুক্তমণিময় ভূভাগ, শতপর্ব্বত-পরিবৃত রথাশ্বগিরি, ভীষণ মহাসাগর ও সাগরতটস্থিত পরিপাত্র পর্ব্বতের অধিবাসী বীরগণ সিন্ধুরাজের সহায় হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন পশ্চিমোত্তর দিকে যে সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ অবস্থিত, তথা হইতে বেণুপতি, নিত্যোৎসবসম্পন্ন নরপতি ফাল্গুনক, মাণ্ডব্য, অনেক-নেত্রক, পুরুকন্দপার, ভানুমণ্ডল, ভাবন, বম্মিল, নলিনদেশীয় ও দীর্ঘদেশ-বাসী দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ, অঙ্গ ও বাহুশালী এবং রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ ও লুহদেশীয় ও গোবৃষাপত্যভোজী অনুপম স্ত্রীরাজ্যবাসী বীরগণ সিন্ধুরাজের পক্ষে যোগদান করেন।

অনন্তর উত্তর দিক্ হইতে যে সকল বীর আসিয়া ছিলেন, বলিতেছি। হিমবান্, ক্রৌঞ্চ, মধুমান্, কৈলাস, বসুমান্ ও মেরুপর্ব্বতবাসী বীরগণ এবং ঐ সকল পর্ব্বতের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থিত জনগণ, মদ্রবার, মালব ও শূরসেন-নিবাসী যোধগণ, অবল, প্রথল, শাক, ক্ষেমধুর্ত্তি, দশধান, ধানদ, সরক, বাটী-ধানক, অন্তরদ্বীপ, গান্ধার, অবন্তীপুর, তক্ষশিলা, উবীলগোধনী, পুষ্করাবর্ত্ত, যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহকনগর, সুরভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গল ও পাণ্ডব্যবাসী যমুনাতীরবাসী যাতুধানকগণ, অঙ্গন ও হেমতালদেশস্থ স্বস্বমুখ জনগণ, হিমবান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ ও কৈলাস-শৈলের অধিত্যকাবাসী বীরগণ এবং অশীতি শত যোজনবিস্তৃত অন্য জন-পদবাসী বীর যোধগণ ঐ যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর পূর্ব্বোত্তর দিকের যে সকল জনপদ হইতে যোধগণ আসিয়া-ছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। কালুতা, ব্রহ্মপত্র, কুণিন্দ, খদিন, মালব,

রন্ধ্র রাজ্য, বনরাজ্য, ফেড়বস্তু, সিংহপুত্র, সাবাক, আপালবহ, কাশ্মীর, দরদ, অভিসাদ, জার্ব্বাক, পলোল, কুচিকৌতুক, কিরাত, যামুপাত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবন, ভূমিভাগ, শ্রীমান্ বিশ্বাবসুর সুন্দর মন্দিরভূমি, কৈলাস-প্রদেশ, তদনন্তর মঞ্জবন পর্ব্বত এবং বিদ্যাধর ও দেবগণের বিমানতুল্য ভূবিভাগ। এই সকল জনপদ হইতেও যোধগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই নিরন্তর নিহত নর-বারণ-সঙ্কুল ভীষণ সমরে অহমহমিকায় অগ্রসর ঐ সকল এবং অন্যান্য আরও বহু যোদ্ধা পরস্পর স্পর্দ্ধমান ও জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া প্রজ্বলিত পাবক-প্রবিষ্ট পতঙ্গসমূহের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া গেল। মধ্যদেশবাসী যে সকল বীর লীলাপতির স্বপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে আমি তাঁহাদিগের কথা কীর্ত্তন করি নাই, অধুনা তৎসমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তদ্দিহিকা, শূরসেন, গুড়, অশ্বাদ্যনায়ক, উত্তম জ্যোতিভদ্র, মদমধ্যমিকাদি, শালুক, কোদ্যমাল, দৌর্জ্জেয়, পিপ্পলায়ন, মাণ্ডব্য, শাণ্ড্যনগর, সৌগ্রীব, গুরুগ্রহ, পারিযাত্র, সুরাষ্ট্র, যামুন, উডুম্বর, রাজ্যাহ্ব, উজ্জিহান, কালকোটি, মাথুর, পাঞ্চাল, ধর্ম্মারণ্য, ধর্ম্মারণ্যের উত্তর ও মধ্যস্থ জনপদ সকল, পঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র ও সারস্বত জনপদের অধিবাসী বীরগণ যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন।

তখন অবন্তীদেশীয় বীরগণের স্যন্দন-শ্রেণী কুন্তি ও পাঞ্চনদবাসী বীরগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কম্পিত, ইতস্ততঃ বিদ্রুত এবং পর্ব্বত-প্রপাতে গিয়া পতিত হইতে লাগিল। বস্ত্রবতীবাসীরা কোশ ও ব্রহ্মবসান-বাসীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও মত্তমাতঙ্গ সহায়ে বিমর্দ্দিত করিয়া ভূতলে পাতিত

করিল। বাণক্ষিতিবাসীরা দশপুরবাসী বীরদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক শস্ত্র-প্রহারে ছিন্নোদর ও ছিন্নস্কন্ধ করিয়া যোজনায়ত হ্রদমধ্যে নিমজ্জিত করিল। পিশাচগণ নিশাযোগে তাহাদের উদরাভ্যন্তরের অন্ত্রতন্ত্রী সকল চর্ব্বণ করিতে লাগিল। রণাধ্বর-দীক্ষিত ভদ্রগিরিবাসী বীরগণ গভীর গর্জ্জন পুরঃসর মরগবাসীদিগকে কচ্ছপ সকলের ন্যায় সবেগে ভূগর্ত্তাদিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দণ্ডিকদেশবাসী যোধগণ মহাশক্র সকল বিদ্রাবিত করিতেছিল, সহসা হৈহয়গণ তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিল। তাহারা রুধিরাক্ত-দেহে বাতপ্রমী মৃগপালের ন্যায় পলায়ন করিল। দরদদেশীয় বীরেরা শত্রুদলনে প্রবৃত্ত হইলে, বিপক্ষ-চালিত মাতঙ্গগণ দন্তপ্রহারে তাহাদিগকে বিদারিত করিল। তাহারা রুধির-মহানদীর মহাবেগে তরুপল্লব-দলের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। চীনদেশবাসীরা প্রতিপক্ষের নারাচপ্রহারে ক্ষত-বিক্ষত ও জীর্ণ-জর্জ্জরিত হইয়া যেন ভারভূত দেহ সকল জলধিজলে বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নলদ-দেশবাসী বীরগণ কর্ণাটবাসী সুদক্ষ ভটগণের কুন্তাস্ত্রপ্রহারে ছিন্নমুণ্ড হইয়া নক্ষত্রনিকরের ন্যায় ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল।

ও দিকে দশক ও শকদেশবাসীরা বিপক্ষদলের প্রধান প্রধান মাতঙ্গ ও মকরব্যূহের বেগে ব্যর্থশস্ত্র হইয়া পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। পাশ-দেশীয় বীরগণ শৃঙ্খলাজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, দশার্ণগণ তাহাতে ভীত হইয়া বেতস-বন-সমাশ্রয়ী তিমি মৎস্যবৎ রক্তজম্বালে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। তঙ্গণদেশবাসী বীরেরা অনবরত শত শত অসি ও শঙ্কু প্রহারে গুর্জ্জরদেশীয় যোধগণকে বিনষ্ট করিয়া গুর্জ্জরীদিগের কেশপাশ কর্ত্তন করিয়া দিল। নিগরদেশ-বাসীরা জলধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন শস্ত্ররূপ বারিধারা-বর্ষণে গুহদেশবাসী বীরদিগকে অরণ্যের ন্যায় অভিষিক্ত করিল।

তখন বিপক্ষদল ভুশুণ্ডী অস্ত্রসকল সমুদ্যত করিলে, আভীরগণ শ্যাম-বর্ণীকৃত সূর্য্যস্বরূপ উৎপাত শঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িল। শত্রুগণ, হরিত-তৃণক্ষেত্রোপরি বৃষগণের ন্যায় তাহাদের উপর আপতিত হইল। তাম্রাখ্য যবনবাহিনীরা কমনীয় কাঞ্চনালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল। গৌড়দেশীয়

ভটগণ নায়কের ন্যায় নখাঘাতে ও কেশাকর্ষণে নায়িকার ন্যায় তাহাদিগকে উপভোগ করিতে লাগিল। ভাসকবাসী বীরেরা সমরক্ষেত্রে বৃক্ষ-পর্ব্বত-ভেদী অসংখ্য চক্রাঘাতে তঙ্গণবাসীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গৃধ্র কঙ্ক প্রভৃতির অভিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গৌড়বাসীদিগের উদ্ভ্রান্ত লগুড়সমূহের ভয়ঙ্কর গুড়্ গুড়্ ধ্বনিতে গান্ধারবাসীরা বলীবর্দ্দদিগের ন্যায় দূরে বিদ্রাবিত হইল। শকগণ নীলাম্বরধারী এবং পারসীকেরা শুক্লাম্বরপরিধায়ী; সুতরাং অম্বরগামী অম্বুনিধির ন্যায় শকদেশীয় যোধগণকে শৈলগাত্রে হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া পারসীকদিগের নৈশ অন্ধকার বলিয়া ভ্রম জন্মিল। উভয় পক্ষীয় যোধগণের বিনিক্ষিপ্ত আয়ুধজাল ক্ষীরোদ-মধ্যস্থ মন্দরকাননের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এই সময় শস্ত্রসকল মেঘমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে লাগিলে নভশ্চরেরা দেখিলেন, যেন সাগরমধ্যে চঞ্চল তরঙ্গমালা প্লুত-গতিতে ভ্রমণ করিতেছে। আকাশরূপ কানন, শ্বেত ছত্রে শত চন্দ্রময়, শরসমূহে শলভব্যাপ্ত এবং শক্তি অস্ত্রে নীরন্ধ্রীকৃত দৃষ্ট হইল। কেকয়গণের কটকাস্ত্র প্রহারে অরাতিকুলের ছিন্ন মস্তক সকল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আহত শত্রুদল বিকট চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অঙ্গদেশীয় বীরেরা কল কল রব করিতে করিতে কিরাত-সেনা-রূপ কন্যাদিগের অঙ্গহানি করিয়া ভৈরবগণের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাশবাসী বীরেরা মায়াবলে চঞ্চলপক্ষ পক্ষিরূপ পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া তদ্দিহিকবাসী বীরদিগকে আক্রমণ করিল; মনে হইল, যেন পবনবেগে পাংশুরাশি উড়াইয়া লইয়া চলিল। পরিহাসপটু রণোন্মত্ত নার্ম্মদগণ শত্রুসমূহের প্রতি শস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিয়া হাস্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ সৈন্যের কিঙ্কিণীজাল কণিত হইতে লাগিলে শাল্বগণের বাণরূপ বায়ুবেগে সে সকল খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিন্দু বিন্দুরূপে পরিণত হইল। শৈব্যগণ কুন্তীদেশবাসী বীরগণের কুন্তাস্ত্র প্রহারে বিঘট্টিত, খণ্ডিত, বিনষ্ট ও স্বর্গে সমুপনীত হইয়া বিদ্যাধরদিগের ন্যায় দর্শনীয়াকৃতি ধারণ করিল। অহীন-জনপদজবাসী সেনারা রণক্ষেত্রে আক্রমণে দক্ষ, তাহারা বীরভাবে সোল্লাসগমনে পাণ্ডুনগরবাসী বীরদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক ভূলুণ্ঠিত

করিল। পঞ্চনদবাসী বলোন্মত্ত বীরেরা মাতঙ্গ-সমাক্রান্ত দ্রুমদলের ন্যায় কুন্ত, গজদন্ত ও দ্রুমযুদ্ধ-নিপুণ তদ্দেহবাসী বীরদিগকে বিদলিত করিতে লাগিল। নীপদেশীয়েরা ব্রহ্মবৎসানক-বাসীদিগকে ক্রকচ-কর্ত্তিত কুসুমিত তরুসকলের ন্যায় চক্রাস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন করিলে তাহারা দলে দলে অশ্বসহ পতিত হইতে লাগিল। জঠরবাসীরা কুঠারপ্রহারে শ্বেত কাকবাসীদিগের মস্তক সকল দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল। পার্শ্বস্থ ভদ্রেশগণ শরানলে উহাদিগকে আবার দগ্ধ করিতে লাগিল।

তৎকালে মতঙ্গদেশবাসী বীরগণরূপ মাতঙ্গেরা কাষ্ঠযুদ্ধ-কুশল যোধরূপ মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া প্রদীপ্ত পাবক-মধ্যস্থ ইন্ধনচয়ের ন্যায় বিলয় পাইল। ত্রিগর্ত্তবাসী বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া মিত্রগর্ত্তবাসী বীরেরা তৃণপরম্পরার ন্যায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ও ঘূর্ণিত হইয়া যেন পলায়ন করিবার জন্য অধোমস্তকে পাতালান্তে প্রবিষ্ট হইল। বনিলবাসী বীরেরা, মন্দ-পবনান্দোলিত অম্বুধিপ্রতিম মাগধবলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পঙ্কমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। চেদিদেশীয় যোধগণ রণাঙ্গনে তঙ্গণবাসীদিগের চেতনা অপহরণ করিল। মনে হইল, আতপতাপ বুঝি পথি পতিত পুষ্পরাশির সৌকুমার্য্য লুঠিয়া লইল। অন্তকপ্রতিম কোশলবাসীরা পৌরবগণের গভীর গর্জ্জন এবং গদা, প্রাস, শর ও শক্তি প্রভৃতির অতিবর্ষণ কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইল না, ভল্লাস্ত্রে তাহাদের করচরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ত্তিত হইয়া গেল অথচ শত্রুপক্ষের পরাক্রম দর্শনে তাহারা কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হইল না; সুতরাং কোশলবাসীরা তৎকালে রুধির-চর্চ্চিত-দেহে তরুণ তপনবৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত অদ্রিমধ্য-স্থিত বিদ্রুম-দ্রুমসমূহের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, মুহূর্ত্তমধ্যে রাশি রাশি নারাচাস্ত্র পাতরূপ মারুতবেগে বিকম্পিত হইয়া ভ্রমর-নিকর-সমুদ্ভাসিত জলদজালের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন মনে হইল, যেন শরধারাধারী মেঘবৃন্দ, কিম্বা শররূপ ঊর্ণাপূর্ণ মেষপাল অথবা শরপত্র-পরিবৃত দ্রুমরাজি ভ্রমণ করিতেছে এবং গজগর্জ্জনবৎ গর্জ্জন করিতেছে।

তখন বনরাজ্যবাসী বীরগণ কন্দোকস্থল-নিবাসী গজ ও মনুষ্য প্রভৃতিকে জরার ন্যায় জীর্ণশীর্ণ ও সবলে আকৃষ্ট সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তাহাদের রথচক্র সকল গর্ত্তে নিরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হইলে সেই সেই রথের আরোহী জনগণ বনাদ্রিমধ্যে মেঘের ন্যায় পরস্পর প্রহার-প্রবৃত্ত শত্রুগণমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। যোধগণ শাল-তালাদি তরুবনের ন্যায় জনতাপরিপূর্ণ রণরূপ বন আশ্রয় করিয়া পরস্পর পরস্পরের হস্ত ও মস্তক কর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে সে এক অতি ভয়ঙ্কর কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইল; যেন সেই রণরূপ মহাবন উচ্চ উচ্চ স্থাণুসমূহে সুশোভিত হইয়া উঠিল।

রাম! সমরে প্রাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বীরগণ স্বর্গে গিয়া সুরবালাদিগের প্রণয়ি-পদে বরিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বীরপ্রণয়িনী উদ্যাম যৌবন-শালিনী নন্দনোদ্যানচারিণী সুন্দরীরা সুমেরুশৈলের বন ও উপবন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করত নানালাপে কাল কাটাইতে লাগিল।

এ দিকে যতক্ষণ না পরপক্ষরূপ কল্পান্ত বহ্নির সংযোগ সংঘটিত হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই সেই সুবিশাল সৈন্যকানন সিংহনাদে সুশোভিত হইতে লাগিল। দশার্ণবাসী বীরেরা কামরূপবাসী পিশাচগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ভূত-বৃন্দ তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ করিয়া লইল। তখন নিরস্ত্র অবস্থায় তাহারা তর্ণকবৎ পলায়ন-পরায়ণ হইলে পথিমধ্যে তাহাদিগের কর্ণ সকল বিপাটিত হইয়া পতিত হইল। কাসীদেশ-নিবাসী বীরগণ হতস্বামিক হইয়া তাম্রিগীষ বনদেশীয় যোধগণের বীর্য্যবলে নিদাঘ-শুষ্ক স্রোতস্বিনীর কমল-কুলের ন্যায় কান্তিহীন হইয়া পড়িল। কটকচ্ছলনবাসী বীরগণ শর, শক্তি, অসি ও মুদ্গরপাতে পরিব্যাপ্ত ও নরকনিবাসী বীরগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইল। প্রস্থবানস্থ যোধ সমস্ত কৌন্তক্ষেত্রদিগকে আক্রমণ করিলে মনে হইল খলজনাক্রান্ত গুণগণের ন্যায় তাহারা যেন স্পষ্টতই শক্তিহীন হইয়া পড়িল। দ্বিপি-যোধগণ ভল্লাস্ত্র প্রহারে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহ্‌ধানগণের মস্তক-পরম্পরা কমলশ্রেণীর ন্যায় ছেদন করিয়া সত্বর পলায়ন করিল। প্রকৃত পণ্ডিতেরা যেমন বিচার-বাদে উদ্বিগ্ন বা পরাজিত হয়েন না, তেমনি সরস্বতী-তীর-সমুৎপন্ন বীরবৃন্দ উদয়াস্ত যুদ্ধ করিয়াও উদ্বিগ্ন বা পরাজিত হইল না। ক্ষুদ্র খর্ব্বাগগণ যদিও সমরে বিদ্রাবিত হইল, কিন্তু লঙ্কানিবাসী

রাক্ষসগণের সহায়তায় ইন্ধনপ্রাপ্ত প্রশান্তপ্রায় পাবকবৎ পুনরায় প্রবল তেজে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

রামচন্দ্র! আমি এই যুদ্ধ ব্যাপার সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণন করিলাম। আমার মনে লয়, ব্যগ্র বাসুকি স্বীয় সহস্র জিহ্বাতেও এই যুদ্ধকাণ্ড সম্পূর্ণ বর্ণন করিয়া উঠিতে পারেন না।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! উল্লিখিত রূপে ঐ যুদ্ধ অতি সঙ্কুল হইয়া উঠিল। বীরগণের বাহ্বাস্ফোটে ভীরুদিগের চিত্ত ভয়াকুল হইল। নিরন্তর শরনিকর-নিক্ষেপে প্রভাকর-কর প্রতিচ্ছন্ন হইয়া গেল। বীরগণের বিদীর্ণ বর্ম্ম হইতে রুধিরক্লেদ-জল প্রবাহিত হইয়া সরিদাকারে পরিণত হইল। অনবরত পাষাণ-বর্ষণে ঐ নদীজল কোথাও উৎপতিত ও কোথাও বা নিপতিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় যোধগণের বিনির্ম্মুক্ত শর-ফলাগ্রের পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল প্রাদুর্ভূত ও শরনদী-প্রবাহ বহুদূর গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। ব্যোম-রূপ মহার্ণব যোধগণের ছিন্ন মস্তকশ্রেণীরূপ কমলমালায় অলঙ্কৃত, চক্ররূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত এবং হেতিরূপ মন্দাকিনীর প্রবাহ-পরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হইল। কচ্ছ-প্রদেশস্থ কপিগণের কামপীড়াকর নিবিড় জলদ-জালের ন্যায়, সমীরণবেগে শব্দায়মান শস্ত্রজাল গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। সিদ্ধসম্প্রদায় প্রলয় সম্ভাবনা মনে করিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন। দিবসের অষ্টম ভাগে প্রভাকর যেন শস্ত্রাঘাতে হীনপ্রভ যোধগণের ন্যায় ক্ষীণপ্রতাপ হইয়া উঠিলেন। যখন উভয় পক্ষীয় গজাশ্ব সকল পরিশ্রান্ত হইল, হেতিসমূহের দীপ্তিচ্ছটা পরিম্লান হইয়া গেল এবং দিবসের সঙ্গে সঙ্গে সেনামণ্ডলীর প্রতাপ পরিক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন উভয়

সেনার অধিনায়কদ্বয় স্ব স্ব মন্ত্রিগণের সহিত বিচার আলোচনা করিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

তখন শ্রম বশতঃ উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণেরই যন্ত্র, শস্ত্র ও পরাক্রম মন্দীভূত হইয়াছিল; কাজেই বীরগণ সকলেই এই যুদ্ধ-ভঙ্গের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে উভয় পক্ষের এক এক জন সামরিক পুরুষ, মহারথের উত্তুঙ্গ ধ্বজপ্রান্তে আরোহণপূর্ব্বক সুধাংশুধবল অংশুকখণ্ড সর্ব্বদিকে ভ্রামিত করিয়া, যুদ্ধনিবারণার্থ যোধগণকে সঙ্কেত করিল। সঙ্কেত করিবা মাত্র প্রলয়কালীন পুষ্করাবর্ত্তকবৎ উভয় পক্ষের দুন্দুভি সকল গভীর নির্ঘোষে দিম্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। মানস সরোবর হইতে সরিৎসকল যেমন অবাধে নিম্নাভিমুখে নিপতিত হয়, তেমনি অস্ত্রাদিরূপ নদীগণ সুবিস্তৃত গগনপথ হইতে অনায়াসে নিম্নে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ভূমিকম্পের অবসানে অরণ্য ও মহার্ণব যেমন ক্রমে ক্রমে স্পন্দনশূন্য হয়, তেমনি যোধগণের ভুজরূপ তরুসঞ্চার ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া গেল। প্রলয় কালে জলরাশি যেমন সবেগে সর্ব্বদিকে ধাবিত হয়, উভয় পক্ষীয় যোধগণ সেইরূপ সংগ্রামস্থান হইতে নির্গত হইতে লাগিল। মন্থনের পর মন্দরভূধর উৎসারিত হইলে ক্ষীর-সাগর যেমন ক্রমশ নিশ্চলভাব ধারণ করে, তেমনি সেই ভীষণ সৈন্যাবর্ত্তও ধীরে ধীরে প্রশান্ত হইল। অগস্ত্যপীত সমুদ্র যেমন শূন্য হইয়াছিল, সেই বিকট ভীষণ রণভূমি তেমনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই শূন্যভাব ধারণ করিল।

এই সময় দেখা গেল, রণাঙ্গণের অনেক স্থান স্তূপীকৃত শবরাশিতে পরিপূর্ণ, কোথাও শোণিতনদী প্রবাহিত এবং কোথাও কোথাও আহত-গণের আর্ত্ত চীৎকার সমুত্থিত। দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন নিরবচ্ছিন্ন ঝিল্লীঝঙ্কারে পরিপূর্ণ এক ভীষণ অরণ্য! তখন রুধিরনদী সকল তরঙ্গ-মালার ঘোরতর ঘর্ঘর নির্ঘোষ সমুত্থিত করিয়া সবেগে প্রবাহিত হইল। অর্দ্ধমৃত যোধগণ রোদন করিতে করিতে সজীবগণকে অহ্বান করিতে লাগিল। মৃত ও অর্দ্ধমৃত যোধগণের দেহোদগত শোণিতধারা কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইল। অনেক সজীব মনুষ্যের পৃষ্ঠোপরি বহু মৃতদেহ পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সজীব মনুষ্য স্পন্দিত হওয়ায় সেই সকল

মৃত দেহও সজীব বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল। গজেন্দ্রগণের রাশীকৃত মৃতদেহের শিখরদেশে মেঘমালা বিলম্বিত হইল। বিশীর্ণ স্যন্দনসমূহ বায়ুবেগ-বিচ্ছিন্ন মহারণ্যবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। শর, শক্তি, ঋষ্টি, মুষল, গদা, প্রাস ও অসি প্রভৃতি শস্ত্রসঙ্কুল শোণিতনদীর প্রবল প্রবাহে হয় ও হস্তী প্রভৃতি প্রবাহিত হইয়া চলিল। পর্য্যাণ, সন্নাহ ও কবচ প্রভৃতিতে ভূমিতল আচ্ছাদিত হইল। কেতু, চামর ও পট্টাদি দ্বারা মৃতদেহ সকল সমাবৃত হইল। ফণি-ফণার ন্যায় সমুন্নত সচ্ছিদ্র তূণীর মধ্যে বায়ু প্রবেশে রেণুরন্ধ্র-গত বায়ুর ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। পিশাচ-গণ শবরাশিরূপ পলাশ শয্যায় শয়ান হইল। হতাহত রাজন্যগণের চূড়া-মণি ও অঙ্গদ সকলের বিচ্ছুরিত প্রভাচ্ছটায় চারিদিকে যেন ইন্দুধনু-বন প্রতিভাত হইল। কুক্কুর ও শৃগালেরা শবসমূহের উদর হইতে অন্ত্ররূপ দীর্ঘ রজ্জু সকল নিষ্কাশিত করিতে লাগিল। শোণিতময় রণক্ষেত্রে মৃত-প্রায় যোধগণ বিকট দন্ত বিকাশিত করত চীৎকার করিতে লাগিল। সজীব মানবরূপ ভেক সকল রক্তপঙ্কে মগ্নপ্রায় হইয়া রহিল। যুদ্ধ-মৃত যোধগণের উৎপাটিত অসংখ্য অক্ষিমালা বিচিত্র কঞ্চুকবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

তখন সেই ভয়াবহ শত শত শোণিতনদীতে ছিন্ন বাহু ও ছিন্ন ঊরু সকল কাষ্ঠখণ্ডবৎ প্লবমান হইল। কত মৃত ও অর্দ্ধমৃত মানবগণকে বেষ্টন করিয়া তদীয় বন্ধু-বান্ধবেরা ক্রন্দন করিতে লাগিল। কত সংখ্যাতীত শর, আয়ুধ, রথ, অশ্ব, হস্তী ও পর্য্যাণ প্রভৃতিতে রণস্থল পূর্ণ হইল। নৃত্যপায়ণ কবন্ধগণের দোর্দণ্ড-মণ্ডলে নভোমণ্ডল আনমিত হইল। গজ-মদ, মেদ ও বসা প্রভৃতির ঘ্রাণপীড়ন-কর উৎকট গন্ধে নাসারন্ধ্র আর্দ্রপ্রায় হইল। উদ্ধতালু ও অর্দ্ধমৃত হয় ও হস্তিগণের বিমর্দ্দনে অল্পপ্রাণ প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। পতিত দুন্দুভি সকল প্রবহমাণ শোণিতনদীর তরঙ্গ-তাড়নে বাদিত হইতে লাগিল। শত শত রুধির-নদীর প্রবাহবেগে কত মৃত হয়, হস্তী ও মকর সকল ভাসিয়া চলিল। ম্রিয়মাণ মানবগণের মুখমণ্ডলে ফুৎকার দ্বারা শোণিত-প্রণালী প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। মুমূর্ষুপ্রায় মানবগণের মুখ প্রদেশ

শর-পরিপূর্ণ হওয়ায় ক্রন্দনধ্বনি রুদ্ধ হইয়া গেল। মৃত প্রাণিগণের বাম কুক্ষিস্থ মাংসগ্রন্থি ও বসাসমূহের গন্ধময় বায়ুসংস্পর্শে শোণিত-রাশি ঘনীভূত হইতে লাগিল। অর্দ্ধমৃত ঊর্দ্ধশুণ্ড হস্তিগণ কবন্ধদিগকে কর দ্বারা আক্রমণ করিল। চালকহীন উচ্ছৃঙ্খল হয় ও হস্তি-গণ উচ্চ উচ্চ কবন্ধদিগকে পাতিত করিতে লাগিল। চিৎকারকারী মৃত পতিত জীব-গণের দেহ-সংক্ষোভে শোণিতপ্রবাহ সমুচ্ছলিত হইতে লাগিল। কুল-কামিনীরা মৃত ভর্ত্তার গলদেশ ধারণ করিয়া শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। স্ব স্ব প্রভুর আদেশে সংস্কার-যোগ্য শবসকল আনয়ন করিবার জন্য ভৃত্যবর্গ সেনাশিবির হইতে নির্গত হইয়া একাকী রণভূমি প্রবেশে ভয়বশতঃ বহু-পান্থ মিলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে স্ব স্ব আত্মীয় জনের শবরাশি পরীক্ষা করিতে লাগিল। শবানয়ন-ব্যগ্র মানবেরা স্ব স্ব ইষ্ট জনের অন্বেষণার্থ সহৃদয় ভৃত্যবর্গকে কর দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তৎকালে সেই সময়ে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-সঙ্কুল শত শত শোণিতনদী মৃত যোধগণের কেশরূপ শৈবালদল, মুখরূপ কমল ও চক্ররূপ আবর্ত্তে পরিপূর্ণ হইয়া ঘোরাকারে পরিণত হইল। অর্দ্ধমৃত পতিত মানবেরা স্ব স্ব অঙ্গ-লগ্ন আয়ুধ উত্তোলনে ব্যগ্র হইল। কোন কোন লোক বিদেশমৃত স্বজনগণের তীব্র শোকে সমাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের যান, বাহন ও ভূষণাদি বিতরণ করিতে লাগিল। যোধগণ মৃত্যুসময়ে স্ব স্ব মাতা, পিতা ও পুত্র প্রভৃতি ইষ্ট জনের এবং কেহ কেহ আরাধ্য দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। আত্মজনের মূর্ত্তি স্মৃতিপটে অঙ্কিত হওয়ায় তাহাদের মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃসহ যন্ত্রণা আবির্ভূত হইল। চতুর্দ্দিকেই হা হা! হী হী! ইত্যাকার মর্ম্মভেদী কাতরধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য দর্শনে—সে ধ্বনি শ্রবণে, সকলেরই মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ ও ঘোর ব্যথায় অভিভূত হইয়া পড়িল। পরাক্রম প্রকাশের পূর্ব্বেই মরণোন্মুখ হওয়ায় বীরগণ স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিল। গজযুদ্ধে অসমর্থ ব্যক্তিরা তদগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক গজদন্তের নিষ্পেষণ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পদ প্রার্থনা করিতে লাগিল। পতিত মৃত শত্রুসৈন্যের উপর প্রচণ্ড পদাঘাতাদি

অবস্থা দর্শনে ভীরুগণ পলায়ন-পথ আশ্রয় করিল। উহারা পলায়নের ব্যগ্রতা বশতঃ ভীষণ শোণিতনদীর আবর্ত্তস্থানে যাইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। মর্ম্মভেদী শরসমূহের দারুণ প্রহারে সৈন্যগণের স্মরণপথে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি সকল সমুদিত হইল। বেতালদল বলপূর্ব্বক পলায়মান কবন্ধগণের স্কন্ধ-বিগলিত শোণিত পানে প্রবৃত্ত হইল।

তখন সেই সমরক্ষেত্র শোণিতময় অষ্টম মহার্ণবের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তাহাতে রাশি রাশি ধ্বজ, চামর ও ছত্ররূপ পঙ্কজপঙক্তি ভাসিতে লাগিল। রুধির প্রবাহ মধ্যে সান্ধ্য রাগ প্রতিফলিত হওয়ায় অরুণবর্ণ তেজঃস্বরূপ রক্তপদ্মদল দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত বলিয়া প্রতীত হইল। রথচক্র ও পর্ব্বত সকল আবর্ত্তরূপে ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। পতাকা-রাজি ফেনপুঞ্জের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। সুচারু চামর সকল বুদ্বুদাকারে শোভিত হইল এবং বিপর্য্যস্ত রথ সকল ভূ-কর্দ্দম-মগ্ন পুরের ন্যায় প্রতীত হইল। উৎপাত-বাত-বিধুত দ্রুমরাজি-রাজিত অরণ্যের ন্যায়, সৈন্যগণ সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল।

রাম! সেই জনবানব-শূন্য সমরক্ষেত্র তখন প্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যায়, অগস্ত্যপীত সাগরের ন্যায় এবং অতিবৃষ্টি-বিনষ্ট দেশের ন্যায় প্রতিভাত হইল। উহার নানাস্থান ভূষণ ও অস্ত্রাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ভূশুণ্ডীমণ্ডলে সমাকীর্ণ এবং শত শত মত্ত মাতঙ্গসমূহের ন্যায় শবস্তূপ ও অসংখ্য সর্পাকৃতি তোমর ও মুদ্গরগণে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিল। শোণিত-নদীর তীর-জাত কুন্তরূপ দ্রুমদল উর্দ্ধোন্নতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। যেন সে স্থান শৈলশিখর-জাত তালতরুময় দৃষ্ট হইল এবং গজগণের অঙ্গসংলগ্ন হেতিসমূহ-রূপ তরুনিকরের কিরণরূপ কুসুমরাশিতে সমাকুল হইল। কঙ্কগণ মৃত যোধগণের অন্ত্র ও রসনাসকল নিরন্তর আকর্ষণ করায় অম্বর যেন জাল-ব্যাপ্ত হইল। রুধিরহ্রদের উর্দ্ধস্থিত পতাকাসকল নলিনীদলের ন্যায় শোভিত হইল। নরগণ রক্তপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান করিতে লাগিল।

তখন গতপ্রাণ গজেন্দ্রগণের পতনে জনগণ ভগ্নদেহ হইয়া কিঞ্চিৎ অপসরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কবন্ধ-

গণকে দেখিয়া শস্ত্রছিন্ন বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। রুধির নদীতে প্লবমান্ গজগণের গণ্ডস্থল ও পর্য্যাণবস্ত্র নৌকাশ্রেণীর ন্যায় প্রতীত হইল। রক্তস্রোতে ভাসমান শুক্লবস্ত্র সকল ফেনপুঞ্জবৎ প্রতিভাত হইল। প্রভু-নিযুক্ত ভৃত্যগণ ক্ষিপ্রতার সহিত সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে পতিত যোধগণের মধ্যে কে কে জীবিত এবং কে কে বা মৃত, তাহার তত্ত্ব লইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে কবন্ধাকার নব নব দানব সকল নিপতিত হইল। ঊর্দ্ধীভূত বৃহৎ ছিদ্রসম্পন্ন চক্রনিচয়ে সৈন্যগণ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মৃতপ্রায় মানবগণের রুধির নির্গমোত্থিত নিঃস্বনের সহিত ভাঙ্কার ও ফেৎকার রব উত্থিত হইতে লাগিল।

এই সময় কঙ্কাদি পক্ষিগণ স্ব স্ব পক্ষদ্বয় বিধূননপূর্ব্বক ধূলিজাল উত্থাপিত করিয়া শিলীমুখ-লগ্ন রক্তধারা পান করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। উত্তাল বেতালদল তালসহকারে তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইল। সজীব যোধগণ বিধ্বস্ত রথসমূহের কাষ্ঠখণ্ডে অর্দ্ধাচ্ছাদিত হইয়া গেল। অন্তর্গত জীবিত যোধগণের স্পন্দন-দর্শনে অন্যান্য লোকের ভয় জন্মিতে লাগিল। রক্তকর্দ্দমে লিপ্তবদন অল্পাবশিষ্ট-জীবন যোধগণ কৃপালু জনের আনুকুল্যে অন্যত্র নীত হইতে লাগিল। ঈষদবশিষ্টপ্রাণ ব্যক্তিগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া দুঃখের সহিত কুক্কুর ও বায়সাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। একই আমিষখণ্ডের জন্য লালায়িত ক্রব্যাদ্‌গণের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব কোলাহল আরম্ভ হইল। এইরূপ দ্বন্দ্বে তাহাদিগের মধ্য হইতে অনেকে মৃত্যুগ্রস্ত হইল। সেই সকল মৃতদেহ দ্বারাও যুদ্ধভূমি পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে মৃত, পতিত, সংখ্যাতীত হয়, হস্তী, নর ও উষ্ট্র প্রভৃতি প্রাণিগণের কণ্ঠদেশ হইতে নিঃসৃত রুধিরপ্রবাহ সরিদাকারে পরিণত হইল। শোণিত-সেকে আয়ুধলতা সকল পল্লবিত হইয়া উঠিল। তখন সেই রণ-ক্ষেত্র প্রলয়-বিধ্বস্ত সশৈল নিখিল জগতের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া যেন মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর উদ্যানরূপে বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইল।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অনন্তর দিবাকর রণাহত বীরের ন্যায় রক্তশ্রী ধারণপূর্ব্বক যেন অস্ত্রতেজে পরিম্লান স্বীয় প্রতাপ জলধিগর্ভে বিসর্জ্জন করিলেন। যেন সূর্য্যরূপ অশ্বসাদীর মস্তক ছিন্ন ও সে জন্য প্রথমতঃ ব্যোম-দর্পণে রক্তচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এক্ষণে ব্যোমতল তাহার সে রক্ত-চ্ছবি ফেলিয়া দিল। ক্ষণমধ্যেই সন্ধ্যালেখার আবির্ভাব হইল।

তখন রজনীর অভ্যুদয়ে রণক্ষেত্র অতি ভয়ঙ্করাকার ধারণ করিল। সে দৃশ্য যে কি লোমহর্ষণ, তাহা অবর্ণনীয়। ভূতল, পাতাল, নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল হইতে প্রলয়াব্ধির জলপ্রবাহের ন্যায় দলে দলে বেতালগণ করতাল-ধ্বনি করিতে করিতে বলয়াকারে রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধ-কাররূপ তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা দিবসরূপ দ্বিরদ-শির দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সন্ধ্যারাগে অরুণবর্ণ তারা-নিকর যেন গজমুক্তার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। যোধগণের হৃদয়রূপ কমলদল হইতে প্রাণরূপ মরাল-শ্রেণী চলিয়া গেলে, সে সকল এক্ষণে মোহান্ধকারে আবৃত হইয়া সঙ্কুচিত হইল। কত রণাহত যোদ্ধৃপুরুষ দুর্ব্বিষহ মৃত্যুযন্ত্রণায় এক এক বার গ্রীবাদেশ উন্নমিত করিতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই নিমীলিতাক্ষে মহা-নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। শবাঙ্গ-বিদ্ধ সপক্ষ শরসকল যেন কুলায়-প্রবিষ্ট পক্ষি-গণের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। উদয়োদ্যত সুধাকরের সুন্দর আলোক-মালাতুল্য কুমুদাদি কুসুমশ্রেণী বীরপক্ষীয় বিজয়লক্ষ্মীর ন্যায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। সেই সায়ং সময়ে সমরভূমি যেন সরোজিনীর ন্যায় শোভিত হইল। হতাহত প্রাণিগণের শোণিতরাশি ঐ সরোজিনীর সলিল, অঙ্গপ্রবিষ্ট বাণগণ উহার ভ্রমরনিকর এবং নিহত বীরগণের বক্ত্রপরম্পরা উহার সায়ংসঙ্কুচিত পদ্মরাজি। ঊর্দ্ধ দিকে ব্যোমরূপ সরোবরে তারাগণরূপ কুমুদ সকল ফুটিয়া উঠিল, অধোদিকে জলাশয়সমূহে কুমুদরূপ নক্ষত্রনিচয়

বিকসিত হইল। সেতু ভাঙ্গিয়া গেলে জলরাশি যেমন সবেগে নানাদিকে ছুটিয়া চলে, তেমনি নির্ভীক ভূতগণ পরস্পর এক একবার মিলিত হইয়া আবার অন্ধকারে দিক বিদিকে ধাবিত হইল।

তৎকালে সেই রণাঙ্গনে বেতালগণ দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে লাগিল এবং কণ-কণায়মান নরকঙ্কালসকলের ক্রোড়ে থাকিয়া কঙ্ক ও কাকোল প্রভৃতি পক্ষিগণ কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় মৃত বীরগণের প্রবল চিতানল প্রজ্বলিত হইয়া সুবিশাল শিখাজাল বিস্তার-পূর্ব্বক তারকাময় অম্বরতল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল এবং পচ পচ শব্দে মেদ ও মাংসরাশি দগ্ধ করিতে লাগিল। অগ্নিদগ্ধ শবাস্থিসমূহের বিষম স্ফোটনধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। বেতালরমণীরা জললীলা করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুক্কুর, কাক, যক্ষ, বেতাল ও ভূতবৃন্দের করতাল ও কোলাহল শব্দে রণস্থল তখন বিষম বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। ভূত-গণ নানা দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ভূতগণের গমনাগমনে সে রণস্থল সমুড্ডীন বনের ন্যায় প্রতীত হইল। ডাকিনীরা রক্ত, মাংস, বসা ও মেদো-রাশি অপহরণ করিতে ব্যগ্র হইল। পিশাচেরা রক্ত, মাংস ও বসা চর্ব্বণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে রুধিরাদির ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে চিতানল জ্বলিত হইলে, পিশাচেরা সে আলোকে রুধিরাক্ত শবদিগকে দেখিয়া লইতে লাগিল।

এই সময় অনেক পূতনা আসিয়া যোগদান করিল। তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শবসকল স্ব স্ব স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিল। প্রচণ্ড তাণ্ডবাসক্ত ঘোরাকার কুষ্মাণ্ডেরা দলে দলে বিচরণ করত তথাকার রণস্থলের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত ভীষণ করিয়া তুলিল। চিতাগ্নি-শিখায় দগ্ধ হইবার কালে শবসমূহের মুখোচ্চারিত প্রলাপের ন্যায় ছমিচ্ছমিৎ শব্দ হইতে লাগিল। মেদ ও রুধিরের আর্দ্রীকৃত ধূমপুঞ্জে অম্বরতল অম্বুদময় হইল। ভূতপ্রেতাদি খেচরদিগের পাদপ্রদেশ শোণিতনদীর প্রবাহ মধ্যে মগ্ন হওয়ায় তাহারা তখন ভূচরবৎ প্রতিভাত হইল। বেতালেরা কঙ্কালরাশি আহরণ করিল। কাকোল পক্ষীরাও তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিল। বেতাল-বালকেরা মৃত মাতঙ্গদিগের উদর-পেটিকায় শুইয়া রহিল।

সেই নির্জ্জন রণাঙ্গনে রাক্ষসেরা রক্ত পান করিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। বেতালেরা চিতাঙ্গার লইয়া পরস্পর উন্মত্তভাবে কলহ করিতে লাগিল। সেখানকার সমীরণও বসা ও রক্ত-মিশ্রিত গন্ধে পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইল। পূতনাদিগের পেটিকাগুলির রট রট রব উত্থিত হইতে লাগিল। যক্ষগণ অর্দ্ধদগ্ধ শবের আস্বাদে লুব্ধ হইয়া পরস্পর কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রিঞ্চর বিহঙ্গেরা উন্নতকায় বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঙ্গ ও তঙ্গণ-দেশীয় বীতপ্রাণ বীরগণের অঙ্গসংলগ্ন হইয়া রহিল। পূতনাগণের হাস্য-কালীন মুখ বিবর হইতে নক্ষত্রপাতবৎ এক প্রকার জ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। বেতালেরা রক্তপিচ্ছিল স্থলে পতিত হইলে রক্তপ্রিয়া পূতনারা মধ্যে থাকিয়া হাস্যাদি উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। পিশাচেরা যোগিনীগণের নায়ক-দিগকে নিকটে ডাকিয়া কাণে কাণে কি যেন কহিতে লাগিল। মৃত যোধ-গণের অন্ত্রগুলি পিশাচাদি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অনেকাংশে বীণা-বাদ্যের অনুকরণ করিতে লাগিল। পিশাচ-বাসনায় অভিভূত হইয়া অনেক মানুষও পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইল। অনেক জীবিত যোদ্ধা পূতনা দর্শনের আকস্মিক ভয়ে আকুল হইয়া অর্দ্ধমৃত হইল। কোথাও কোথাও বেতাল ও রাক্ষসেরা মিলিত হইয়া কণ্যাণোৎসবে ব্যাপৃত হইল। কোথাও রাক্ষসীদিগের স্কন্ধ হইতে শব-পতনে রাক্ষসেরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কোথাও ভূতগণের অপূর্ব্ব পেটিকা সকল আকাশে সংঘট্টিত হইয়া সঙ্কট করিয়া তুলিল। কোথাও মৃত মনুষ্যরূপ আমিষখণ্ড সকল অতি যত্নে অপহৃত হইতে লাগিল। বহু পিশাচ শব-ভক্ষণার্থ লালায়িত হইল, তাহাদের পক্ষভুক্ত পিশাচেরা তাহাদিগকে আনিয়া রাশি রাশি শব সমর্পণ করিতে লাগিল। রক্তাক্তদেহ মানবেরা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উত্থিত হইয়া শিবাগণের বদন-বিনির্গত অনলশিখায় চতুর্দ্দিকে উড্ডীয়মান নবীন অশোক-পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় দেখিতে লাগিল। বেতাল-বালকেরা কবন্ধদিগের স্কন্ধদেশে ভূ-পতিত ছিন্ন মুণ্ড সকল যোজনা করিতে ব্যগ্র হইল। যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচ প্রভৃতির হস্তস্থিত জ্বলদঙ্গার সকল আকাশে দীপ্তি পাইতে লাগিল।

রাম! সমস্ত অম্বর, ভূধর, ভূধরগত নিকুঞ্জপুঞ্জ ও কন্দরাভ্যন্তর, পিণ্ড-সম্মিত নিবিড়তর অন্ধকাররূপ জলদজালে আচ্ছাদিত হইলে, রণস্থল

তখন চঞ্চলস্বভাব ভূতবৃন্দের মহাসমারোহে সমাকুল হইয়া কল্পবাত-বিক্ষুব্ধ ব্রহ্মাণ্ডোদরের ন্যায় ভয়ঙ্করাকার ধারণ করিল।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মানুষেরা দিবসে যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করে, নিশাচর, পিশাচ ও যমদূতেরা সেই ঘন ঘোর অন্ধকার রাত্রে সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে হস্তগ্রাহ্য প্রকাণ্ড তমঃ-পিণ্ডরূপ ভিত্তি-মণ্ডিত নিশামণ্ডপে ভূতগণ ভক্ষ্যসমৃদ্ধি লাভে আনন্দিত হইয়া উলঙ্গ হইল। তাহাদের যাচ্ঞা-দৈন্য তিরোহিত হইয়া গেল। তাহারা ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বস্থান অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বত্র নীরবতা বিরাজিত এবং সর্ব্বদিকে প্রাণিগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন উদারচেতা লীলানাথ বিদূরথ কিঞ্চিৎ খিন্নমনে মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত প্রাতঃকালীন যুদ্ধাদি কর্ত্তব্য-কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়া, চন্দ্রো-দরনিভ সুন্দর গৃহে শশাঙ্কসদৃশ শীতল শয্যায় নয়নকমল নিমীলিত করত মুহূর্ত্তকাল নিদ্রাসুখ ভোগ করিলেন। অনন্তর সেই ললনাদ্বয়—লীলা ও সরস্বতী আকাশদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু যেমন অলক্ষ্যে কমল-মুকুলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম রন্ধ্রযোগে বিদূরথের ভবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো, বাক্যাভিজ্ঞগণের বরেণ্য! আপনি বলুন, সেই দেবীদ্বয়ের অতি বড় স্থূল দেহ কিরূপে সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দেহ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এই যে দৃশ্যমান কর-চরণাদি-বিশিষ্ট মাংসসমষ্টি দেহ, ইহার নাম স্থূল দেহ। এই স্থূলদেহ আধিভৌতিক দেহনামে অভিহিত।

ইহাতে যাহার অভিমান আছে, সে ব্যক্তি কখন ঐরূপ অণুরন্ধ্র দিয়া গমন করিতে সমর্থ নহে। 'আমি এই স্থূল শরীরে নিরুদ্ধ রহিয়াছি, আমার স্থূল দেহ এই সূক্ষ্ম আয়তনে মানাইবে না, আমি এই ছিদ্রে যাইতে পারিব না' ইত্যাকার বুদ্ধি যাহার পূর্ব্ব হইতেই আছে, সেই ব্যক্তি যে আপনার তথাবিধ স্থূলদেহত্ব অনুভব করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া যাইতে পারিবে না, ইহা সকলেরই অনুভব-গম্য। কিন্তু স্থূল নরদেহে যাহার অহংবুদ্ধি নাই; পরন্তু স্বীয় সূক্ষ্ম আতিবাহিক-দেহত্ব নিশ্চয় আছে, তাদৃশ পুরুষ সেই পৌর্ব্বকালিক সুদৃঢ় সংস্কারের প্রভাবে সূক্ষ্মতম গন্তব্য পথেও যাতায়াত করিতে পারে। আমি অবরুদ্ধস্বভাব নহি; সুতরাং সূক্ষ্মতম ছিদ্র দিয়া যাতায়াত করিবার আমার সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, ঈদৃশ অনুভব পূর্ব্বে যে পুরুষ বহুবার করিয়াছে, তাহার জীবচৈতন্যে তাদৃশ স্বভাবের আবির্ভাব হয়; তৎকালে সে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি অবলম্বন করিতে পারে। অন্তরের ন্যায় বাহিরেও সেই একই ভাব দৃষ্ট হয়। যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, সে সেইরূপই হইয়া থাকে। দেখ, জল কখন ঊর্দ্ধে গমন করে না এবং পাবকও কখন অধোগতিশীল হয় না। যে শক্তি যে চৈতন্যে আবির্ভূত হয়, সে চৈতন্য সেইরূপভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। সম্যক্‌রূপে পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হইলে কোন দুঃখই কাহারও অনুভব হয় না। ছায়ায় উপবেশন করিলে তাপানুভব হইবে কোথা হইতে?

সত্য বটে, চিত্ত সংবিদের অনুগামী; কিন্তু জ্ঞানবল সহায় হইলে রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম তিরোহিত হইয়া প্রকৃত রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ চেষ্টাবিশেষ দ্বারা সম্বিৎ পদার্থে ভ্রম-বিজৃম্ভিত চিরনিরূঢ় স্থৌল্যের অন্যথাপত্তি সংঘটিত হয়। এদিকে আবার চিত্ত যেমন সংবিদের অনুগামী, চেষ্টাও তেমনি চিত্তের অনুসারিণী, ইহা বালকেরও অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং কে না ইহা অনুভব করিয়া থাকেন? স্বপ্ন, সঙ্কল্প-পুরুষ কিম্বা আকাশের ন্যায় যাহার প্রকৃত আকার, কে তাহাকে কিরূপে রোধ করিতে পারে? যাহা চিত্তমাত্রাকৃতি, সেই আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহ কিছুতেই রুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ মনে করিয়া দেখ, তুমি এইখানে বসিয়া

আছ; কিন্তু তোমার মন আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া এই মুহূর্ত্তেই সমগ্র ভুবন ভ্রমণ করিয়া আসিতে সমর্থ। এই চিত্তবলে বহু দিনের অতীত ঘটনাগুলিও প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে পুরুষ চিত্তের এইরূপ প্রসরণ-শীলতা পরিজ্ঞাত, তাঁহার পক্ষে কি না করা সম্ভাবিত?

জানিও, হৃদ্গত জ্ঞানের প্রভাবেই ভৌতিক দেহ ঐরূপ আতিবাহিক বা সূক্ষ্মভাবে পরিণত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তির অভিমতি অনুসারেই এই ভৌতিক দেহের উদয় ও বিলয় হয়। স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান বা কর্ম্ম বলে সমুৎপন্ন ক্ষিত্যাদি ভূতবর্গের যে একতা, তাহাই পঞ্চীকরণ বা স্থূলদেহের কারণ। ভাবনা বশতঃ চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ, এই আকাশত্রয় অভিন্নস্বরূপ; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৎস! জানিবে, চিত্তমাত্রাকৃতি সূক্ষ্ম শরীর সকল বস্তুতেই সমানভাবে আবির্ভূত হয়। ঐ চিত্তশরীর অতীব সূক্ষ্ম। উহা এত দূর সূক্ষ্ম যে, ত্রসরেণুর অভ্যন্তরেও উহার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। উহাই গগনগর্ভে অবস্থান করে, অঙ্কুরোদরে বিলীন হয় এবং পল্লবে রসাকারে পরিণত হয়। উহাই আবার জলে তরঙ্গাকারে উল্লসিত, শিলাভ্যন্তরে বিলম্বিত, অম্বুধর হইয়া বারিবর্ষণে ব্যাপৃত, শিলাকারে বিরাজিত, অম্বর প্রদেশে যথেষ্ট প্রসর্পিত এবং শৈলসমূহের জঠরদেশেও উপগত হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীর অনন্ত আকাশস্বরূপ ধারণ করিয়াও পুনরায় পরমাণুত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কখন উহা অম্বরচুম্বী অধোমূল ধরাধররূপে বিরাজমান এবং কখন দেহের অন্তরে বাহিরে বনরূপ তনুরুহ ধারণ করত স্বপ্নে ও ইন্দ্রজালাদিতে অদ্রি হইয়া বিদ্যমান। সমুদ্রের আবর্ত্তরচনা যেমন সমুদ্র হইতে অভিন্ন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরচনাও তেমনি চিত্তস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত। এই চিত্তদেহই সৃষ্টির প্রাক্কালে উদ্বেগশূন্য বিশুদ্ধ বোধরূপে বিরাজ করিয়া থাকে। আবার মায়াবলে আকাশরূপী ও মহান্ হইয়া, কর্ম্মানুসারিণী প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মরুমরীচিকায় অসত্যই যেমন জলত্ববুদ্ধিবলে সমুদিত হয় এবং 'এই বন্ধ্যাপুত্র বর্ত্তমান' স্বপ্নে যেমন এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তেমনি ঐ আকাশাত্মাও আত্মনিষ্ঠ অসত্য বুদ্ধিবলে মহান্ ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিস্তৃত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আমাদের প্রত্যেকের চিত্তই কি ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট? কেনই বা আমাদের চিত্ত সদ্রূপ নহে? আর এক কথা, আমাদের প্রত্যেকের চিত্তেই কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভূত হয়? অথবা কি এক অভিন্ন জগৎ অবলোকন করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! প্রত্যেক চিত্তই ঐ প্রকার শক্তি-বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক চিত্তেই ভিন্ন ভিন্ন জগদ্ভ্রম সমুদিত হইয়া থাকে। যেরূপ ক্রমে অনন্ত জগৎ সমুদিত ও বিলীন হয় এবং 'মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি' এ প্রবাদ যেরূপে সুসঙ্গত হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

হে সুমতে! যে মরণাদিময়ী মূর্চ্ছা মহাপ্রলয়ের যামিনীস্বরূপ, জানিও—জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহা অনুভব করিতে হয়! সেই প্রলয়যামিনী প্রভাতা হইলে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি বিস্তার করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম, সে সেইরূপ সৃষ্টি দেখে ও অনুভব করে। ফলে, বিকারগ্রস্ত রোগীর চিত্তমোহে পর্ব্বত-নর্ত্তন দর্শনের ন্যায় অনাদি অবিদ্যার প্রভাবেই সংসারসৃষ্টি অনুভূত হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়-যামিনীর অবসানে সমষ্টি মনঃস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ যেমন সমষ্টি ভোগপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তদ্রূপ ব্যষ্টিমনঃস্বরূপ জীবও মরণের অব্যহিত পরে স্ব-স্ব-ভোগ্য স্বপ্নাদি ব্যষ্টি প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ব্যষ্টিমনঃস্বরূপ জীব যেমন মরণের পরক্ষণেই স্বীয় স্মৃতি সহায়ে স্বকৃত সৃষ্টি অনুভব করেন, সমষ্টিমনঃস্বরূপ হিরণ্যগর্ভও তেমনি প্রলয়-পর্য্যবসানে পূর্ব্বস্মৃতিবলে অতি বিপুল সৃষ্টি-প্রপঞ্চ অনুভব করিয়া থাকেন; অতএব এই বিশ্ব অকারণ অর্থাৎ বিশ্বের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্যকারণতা নাই, এ কথা বলা চলে না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে; কেন না, ভাবিয়া দেখুন, হিরণ্যগর্ভ সত্যস্বরূপ ও অভ্রান্ত, তাঁহার স্মৃতিও সত্যস্বরূপ। সেই সত্যস্বরূপ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও ত সত্য বৈ আর কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে হরিহরাদি সকলেই বিদেহমুক্ত হয়েন; সুতরাং তখন তাঁহাদের জগৎস্মৃতির সম্ভা-বনা কোথায়? দেখ, অস্মাদাদি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাও যখন অবশ্যই মুক্ত

পুরুষ হইব ; তখন কমলযোনি প্রভৃতি দেবতারা মুক্ত হইবেন না কেন? ফলে তাঁহাদের মুক্তি নিশ্চিতই। তবে কথা এই, তোমার ন্যায় অন্যান্য যে সকল জীব অপ্রবুদ্ধ, মোক্ষলাভ হয় নাই বলিয়া স্মৃতি অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কার তাহাদেরই জন্মমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারাই মুক্ত জীব আর তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মুক্তি না হইলেই জগৎস্মৃতি-বশে বারবার সংসারে যাতায়ত হইয়া থাকে। মরণ-মূর্চ্ছার অবসানে জীবের অন্তরে যে অল্প বা অবিস্পষ্ট সৃষ্টির ভাব সমুদিত হয়, পুরাণাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তাহাই সৃষ্টির প্রকৃতি বলিয়া উল্লিখিত। ঐ প্রকৃতিই ব্যোমপ্রকৃতি নামেও নিরূপিত এবং উহা জড়, অজড়, উভয় আখ্যাতেই প্রখ্যাত।

ঐ প্রকৃতিই ভবোদয়ে সৃষ্টি ও প্রলয়ের আদ্যন্ত অবধি। উহাতে যখন অহম্ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন তন্মাত্রপঞ্চক, দিক্, কাল, ও ক্রিয়া প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবগুলি উহাতে প্রস্ফুরিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরে তাহাই কিঞ্চিৎ স্থূলাকারে পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয়পঞ্চকরূপে প্রতিভাত হয়। এই বোধময় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়পঞ্চকই জীবের আতিবাহিক দেহ। এই আতিবাহিক দেহ দীর্ঘকালের প্রত্যয়ে 'আমি স্থূল' ইত্যাকার কল্পনায় পরিপুষ্ট হইয়া আধিভৌতিক ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন বায়ুর স্পন্দন-ক্রিয়ার ন্যায়, স্থূলদেহাশ্রিত চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির বশবর্ত্তিতায় তত্তৎ দেশ-কাল-গত পদার্থপরম্পরা তাহারই অধীনভাবে তাঁহাতেই মিথ্যারূপে উদ্ভূত হইয়া থাকে ; সুতরাং ঈদৃশ ভুবনভ্রান্তি বৃথাই বর্দ্ধিত হয় ; বস্তুতঃ স্বপ্নস্ত্রী-সঙ্গমের ন্যায় এ সকল অনুভূত হইলেও অসত্য বৈ আর কিছুই নহে।

রাম! জীব যেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হউক, সেইখানেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ উল্লিখিতরূপে জ্ঞান আসিয়া আশ্রয় করে। সেইখানেই জীবের এই ভুবনাভোগ-দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। বৎস! জীব উল্লিখিত-রূপে আকাশবৎ সূক্ষ্ম। বাস্তব জন্ম-মরণাদি জীবের নাই। তথাপি সে আগন্তুক দেহাদি ভাবনায় বিভোর হইয়া 'আমি জন্মিয়াছি, আমি জগৎ দেখিতেছি' ইত্যাকার বিবিধ ভ্রম অনুভব করিয়া থাকে। দেখ, নভো-

মণ্ডলের নির্ম্মলতা স্বভাবসিদ্ধ, অথচ অজ্ঞ লোকেরা তাহাতেই গন্ধর্ব্ব-নগর ও কেশোণ্ড্রক প্রভৃতি কত কি কল্পনা করে ও দর্শন করিয়া থাকে। অজ্ঞের নিকট বিবিধ জগদ্ভ্রম সমুদিত হয়। সে ভ্রমের সংখ্যা করা দুরূহ। যথা—স্বর্গ, স্বর্গের অধিবাসী সুরেন্দ্রাদি সুরসমাজ, সুরেন্দ্রের নিবাসনগরী অমরাবতী; সুমেরু প্রমুখ শৈলশ্রেণী এবং সেই সেই শৈল-প্রদক্ষিণ-কর্ত্তা সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কনিচয়। এতদ্ভিন্ন এই মর্ত্ত্য, এই মর্ত্ত্যের লোকসম্প্রদায়; জরা, মরণ, বৈক্লব্য, ব্যাধি ও বিবিধ সঙ্কটে সংসার সমাকুল। অনুকূল বিষয়ে উদ্যমশীল ও প্রতিকূল বিষয়ে পরাঙ্মুখ,—ঈদৃশ স্থূল, সূক্ষ্ম, চর ও অচরাদি কত অনন্ত প্রাণীর এখানে সমাবেশ। ঐ অব্ধি, অদ্রি, উর্ব্বী, নদী, নরপতি, দিন, রাত্রি, ক্ষণ, কল্প ও ক্ষয়ের বিলাস। এই আমি জন্মিয়াছি, ঐ পিতা আমায় এইখানে জন্ম দিয়াছেন। আপ্ত জন ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন। এই আমার মাতা, এই সকল আমার ধনসম্পত্তি, ইত্যাদি কত শত বাসনা রাশির আবির্ভাব। এই আমার সুকৃত, এই আমার দুষ্কৃত, এবম্বিধ নানাবিধ কৃত্য-কল্পনা এবং আমি বালক ছিলাম, অদ্য আমি যুবক হইয়াছি, ঈদৃশ বহুবিধ ভাব-বিলাস।

রাম! উল্লিখিতরূপ জগদ্ভ্রম প্রত্যেক জীবই হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকে। জীব-সংসার একটী নয়—অনন্ত। প্রত্যেক জীবসংসারই এক এক অরণ্যখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত। তারা সকল ঐ অরণ্যখণ্ডের কুসুমরাশি, নীল নীরদবৃন্দ উহার চঞ্চল পল্লব-দল, গমনাগমনশীল জনগণ উহার মৃগ সকল এবং সুর ও অসুরগণ উহার বিহঙ্গস্বরূপ। বিকীর্ণ আলোকচ্ছটা ঐ অরণ্যখণ্ডস্থ কুসুমসমূহের পরাগ-পরম্পরা; অন্ধকারপুঞ্জ উহার গহনকুঞ্জ, সাগর উহার সরোবর, মেরুমন্দরাদি ভূধরনিকর উহার লোষ্ট্ররাশি, চিত্ত উহার পুষ্করবীজ এবং তদন্তর্লীন সংস্কারাত্মক অনুভব সকল অপরাপর সংসারারণ্যের অঙ্কুরশ্রেণী। জীব যেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইখানেই সেই মুহূর্ত্তেই উল্লিখিত সংসাররূপ অরণ্যখণ্ড অবলোকন করে। এইরূপে প্রত্যেক জীবের সমক্ষে কত অনন্ত জগৎ-খণ্ড আবির্ভূত হইতেছে। কত কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বায়ু; বিবস্বান্; অদ্রি, অব্ধি ও দ্বীপ এবং ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ তত্তদবলোকনকারী লোক-

স্বীয় সঙ্কল্প বলে পার্শ্বস্থ নিদ্রিত রাজমন্ত্রীকে প্রবোধিত করিলেন। মন্ত্রী প্রবুদ্ধ হইয়া সেই দিব্য রমণীদ্বয়কে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহাদের পাদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি সমর্পণান্তে নম্রভাবে সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তখন দেবী সরস্বতী রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন,—রাজন্! আপনি কে? কাহার পুত্র? কবে কিরূপে আপনি এখানে জন্মিয়াছেন? দেবী সরস্বতীর এই প্রশ্ন শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন,—দেবীদ্বয়! আপনাদের ন্যায় দিব্য রমণীর সমক্ষে আমি যে কথা কহিবার অধিকারী হইলাম, ইহা বাস্তবিকই আমার প্রতি আপনাদের বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। যাহা হউক, আপনারা এক্ষণে মদীয় প্রভুর জন্ম বিবরণ শ্রবণ করুন।

পুরাকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সুন্দরথ নামে এক শ্রীমান্ রাজা ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ছিল। তিনি নিজ ভুজ-চ্ছায়ায় দীন দরিদ্রাদির সন্তাপ নিবারণপূর্ব্বক অবনীমণ্ডল পালন করিতেন। তাঁহার ভদ্ররথ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ভদ্ররথের পুত্র বিশ্বরথ, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিন্ধুরথ, তৎপুত্র শৈলরথ, শৈলরথের পুত্র কামরথ, তৎপুত্র মহারথ, মহারথের পুত্র বিষ্ণুরথ। বিষ্ণুরথের এক পুত্র হয়, তাহার নাম নভোরথ। এই আমাদের প্রভু বিদূরথ সেই নভোরথের পুত্র। ইনি ক্ষীরাব্ধি-সম্ভূত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রজাদিগকে অমৃতাভিষিক্ত করেন এবং অসীম পিতৃপুণ্যে গৌরীর গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় সুমিত্রা নাম্নী জননীর গর্ভে সমুৎপন্ন হয়েন। ইহাঁর পিতা ইহাঁকে দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বন গমন করেন। ইনি তদবধি পিতার প্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে সমগ্র পৃথিবী পালন করিতেছেন। যাহা হউক, অদ্য আমাদের পুণ্য-পাদপ ফলবান্ হইয়াছে; কেন না, দীর্ঘকাল তপস্যা করত শত শত ক্লেশকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও যাঁহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না, অদ্য সেই দেবীদ্বয়ের আমরা দর্শন লাভ করিলাম। হে দেবীদ্বয়! অদ্য আপনাদের প্রসন্নতায় এই বসুধানাথ বিদূরথ পরম পবিত্র হইলেন, সন্দেহ নাই।

রাজমন্ত্রী এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। এদিকে রাজা নম্র-বদনে কৃতাঞ্জলি-করে বদ্ধপদ্মাসনে সমাসীন। তখন সরস্বতী কহিলেন, রাজন্! তুমি বিবেকবলে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ কর। এই কথা কহিতে কহিতে কর দ্বারা তিনি রাজার মস্তক স্পর্শ করিলেন।

তখন সরস্বতীর হস্তস্পর্শে ভূপতির হৃদয়স্থ সমস্ত অন্ধকার অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল। জীবের আবরক মায়ানামক তমস্তোম ক্ষয় পাইয়া গেলে, তদীয় হৃৎপদ্ম বিকসিত ও প্রাক্তন জন্মপরম্পরা স্মৃতিপদে সমুদিত হইল। তিনি পূর্ব্বজন্মে সম্রাট্ ছিলেন। লীলানামে তাঁহার এক মহিষী ছিল। তিনি পৃথিবীর একাধিপত্যতা ও স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন। জ্ঞপ্তরূপিণী সরস্বতী ও স্বপ্রণয়িনী লীলার যাবতীয় কার্য্যকলাপ এবং নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার জ্ঞানগোচর হইলে, তিনি যেন বিস্ময়-সাগরে ভাসমান হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এ সংসার মহতী মায়ায় আচ্ছন্ন, আমি এক্ষণে দেবীদ্বয়ের প্রসাদে ইহা স্পষ্টতই পরিজ্ঞাত হইলাম।

অনন্তর রাজা প্রকাশ্যে কহিলেন,—হে দেবীদ্বয়! এ কিরূপ! অদ্য একদিন হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এস্থানে থাকিয়া আমি সপ্ততিবর্ষ অতিবাহিত করিলাম। পূর্ব্বজন্মে আমার যিনি প্রপিতামহ ছিলেন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত আমার স্মরণ হইতেছে। আমি যে তখন বহু বন্ধু ও মিত্রাদি পরিবারবর্গ লইয়া বাল্য যৌবন অতিক্রান্ত ও বহু কার্য্য করিয়াছি, তৎসমস্তই এক্ষণে আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে।

জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতী কহিলেন,—হে রাজন্! আপনার মরণ-মূর্চ্ছার পরক্ষণেই ভবদীয় এই গৃহে ভবদধিষ্ঠিত চিদাকাশ মায়াবরণে তিরোহিত হইলে সেই গিরিগ্রামস্থ ব্রাহ্মণের ভবনাদি, সেই পদ্মভূপতির রাজ্য, রাজধানী, তদন্তর্গত প্রধান গৃহ ও গৃহাকাশ, ইত্যাদি সকলই আপনার অন্তরাকাশে প্রতিরঞ্জিত হয়। আপনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন বা অনুভব করিতেছেন, সে সকলই উক্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে ব্যতীত অন্য কোথাও নহে। সেই ব্রাহ্মণের জগৎই যে কেবল ঐরূপ ভাবে প্রতিভাত, তাহা নহে; প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জগৎই ঐরূপ। সেই আকাশেই ভবদীয় জীব

মন্ত্রপাসক হইয়া তথাবিধরূপে প্রথিত হইয়াছিল। আপনার জীব যেখানে ছিল, সেইখানেই সেই পদ্মভূপতির পৃথ্বী, সেই পৃথ্বীতেই তদীয় রাজভবনাদি, তাহারই মধ্যে এই সংসারমণ্ডল এবং সেইখানেই আপনার এই মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন গৃহ বিরাজমান। নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও অতীব নির্ম্মল ভবদীয় চিদাকাশে এই সকল ভ্রান্তিমাত্রময় ব্যবহারপরম্পরা প্রতিভাত হইয়াছে। যথা,—এই আমার নাম, এই আমার ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম হইয়াছে। মদীয় পিতৃ-পিতামহগণ পূর্ব্বে অমুক অমুক নামে প্রথিত ছিলেন। আমি জন্মিয়াছি। আমি বালক ও যুবা ছিলাম। আমার দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরিব্রাজক-বেশে বন গমন করিয়াছেন। তাহার পর আমি দিগ্বিজয় করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করত এই সকল মন্ত্রী ও পৌরজনের সহিত বসুন্ধরা পালন করিতেছি এবং বহুতর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে তৎপর রহিয়াছি। সম্প্রতি আমি বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছি। আমার বয়ঃক্রম অধুনা সপ্ততি বর্ষ অতীত হইয়াছে। এই শত্রুবল সমুপস্থিত। ইহাদের সহিত আমার দারুণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। আমি যুদ্ধ করিয়া গৃহে আসিয়াছি। এই সময় এই দেবীদ্বয় আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আমি ইহাঁদিগকে যথাযোগ্য পূজা করি। কেন না, দেবতারা পূজিত হইলে অভীষ্ট ফল অর্পণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মধ্যে এই এক দেবী, সৌর-করে পদ্ম-বিকাশের ন্যায় মদীয় জাতি-স্মৃতি-প্রদ জ্ঞান বিকাশ করিয়া দিয়াছেন। অধুনা আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। আমার সর্ব্বসংশয় অপগত হইয়াছে। নিখিল দুঃখের উপশমে আমি শান্তিলাভ করিয়াছি। নিরতিশয় সুখ-সম্পদে আমার পরম নির্বৃতি হইয়াছে। আমি কেবল সুখময় হইয়াই অবস্থান করিতেছি।

জ্ঞপ্তি দেবী এইরূপ কহিয়া আবার কহিলেন,—রাজন্! উল্লিখিত-রূপে লোকান্তরসঞ্চারিণী নানাচার-বিহারময়ী বহুবিধ ভ্রান্তিই ভবদীয় সমীপে বিস্তৃত হইতেছে। আপনি পূর্ব্বে যে মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আপনার হৃদয়ে ঐ প্রকার ভ্রম আপনা হইতে-বদ্ধমূল হইয়াছে। যেমন নদীর প্রবাহ এক আবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া

অপর আবর্ত্ত আশ্রয় করে, জ্ঞানপ্রবাহও তেমনি এক দৃশ্য পরিহার-পূর্ব্বক অপর দৃশ্য প্রকাশিত করিয়া থাকে এবং কোন কোন আবর্ত্ত যেমন অপর আবর্ত্তের সহিত মিশিয়া গিয়া প্রবৃত্ত হয়, তেমনি সৃষ্টিসম্পদ্‌ও মিশ্র ও অমিশ্র উভয় ভাবেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রাজন্! আপনার মরণ-মুহূর্ত্তে এই জগজ্জাল চিৎসূর্য্যের সান্নিধ্যে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল; বস্তুতঃ উহা অসৎ বা মিথ্যাময়। যেমন স্বপ্নযোগে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে শত সম্বৎসর-ভ্রম উৎপন্ন হয়, সঙ্কল্প-কল্পনায় পুনঃপুনঃ যেমন জীবন ও মরণ ঘটিয়া থাকে, গন্ধর্ব্ব নগরে যেমন ভিত্তি ও তদ্গত চিত্রাদি দৃষ্ট হয়, নৌকাদির গমন বশতঃ যেমন তীরস্থ বৃক্ষাদির গতি প্রত্যক্ষ হয়, অথবা বাতপিত্তাদির সংক্ষোভ বশতঃ বৃক্ষপর্ব্বতাদির যেমন অপূর্ব্ব নর্ত্তন দৃশ্য হইয়া থাকে; কিম্বা স্বপ্নে যেমন আপনার মস্তকাদি কর্ত্তন অনুভূত হয়, সেইরূপ এই অতি বিস্তৃতরূপিণী ভ্রান্তি সমুদিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। উহার কিছুই সত্য নহে। ফল কথা এই, আপনার জন্ম নাই, কিম্বা কদাচ মৃত্যু নাই। আপনি সেই শুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ শান্ত আত্মাতেই নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। এই নিখিল বিশ্ব দেখিতেছেন, অথচ আপনি কিছুই দেখিতেছেন না। সর্ব্বাত্মকত্ব বশতঃ নিত্য আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হইতেছেন। এই যে মহামণিপ্রতিম উজ্জ্বল ও ভানু প্রভৃতির ন্যায় ভাস্বর ভূপীঠ, বস্তুতঃ ইহা ভূপীঠ নহে। আর আপনিও প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নহেন। এই যে সকল গিরি, গ্রাম ও গ্রামস্থ লোক, ইহারাও কিছুই নহে আর আমরাও কিছুই নহি। সেই যে গিরিগ্রামবাসী ব্রাহ্মণের মণ্ডপাকাশেই লীলা ও লীলা-পতির সহিত ভাস্বর জগৎ প্রতিভাসিত হইতেছে, সেই যে গৃহাকাশস্থ আকাশদেশে লীলার রাজধানী মণ্ডপে মণ্ডিত রহিয়াছে, এই যে তদন্তর্গত আকাশে সেই এই জগৎ স্ফুরিত হইতেছে; আমরা যে সেই এই জগতে এই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছি, এ সকলই সেই মণ্ডপাকাশ। মণ্ডপাকাশ আর কিছুই নহে; উহা কেবল সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম। ঐ মণ্ডপে মহী নাই, পত্তন নাই, বন নাই, শৈল, সরিৎ, সাগর, মানব, পার্থিব বা পর্ব্বত প্রভৃতি কিছুই নাই। কেবল চিন্মাত্রপূর্ণ সেই ব্রহ্মে—মিথ্যা গৃহে মিথ্যা জনগণ

বিহার করিয়া থাকে। তাহাদিগের সেই বিহার ও পরস্পর দর্শনাদি যে কিছু, তৎসমস্তই মিথ্যা। ফলতঃ সকলই চিন্মাত্র ব্রহ্ম।

বিদূরথ কহিলেন,—হে দেবি! যদি কিছুই কিছু নহে, তবে আমার এই অনুচরগণও কি আত্মাতে জন্মিয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছে? অথবা অন্য কিছুতে রহিয়াছে? এই জগৎ যদি স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় হয়, তবে ত তদ্গত নর-নারীও স্বপ্নানুভূত পদার্থবৎ কিছুই নহে। সুতরাং যে সকল বস্তু কিছুই নহে, তাহারা কিরূপে আত্মাতে সত্যস্বরূপে অবস্থিতি করে? আর কিরূপেই বা এ সমস্ত অসত্য? তাহা আমাকে বলুন।

সরস্বতী কহিলেন,—যাঁহারা চিদাকাশস্বরূপ ও শুদ্ধ বোধৈকরূপ এবং বেদ্য বিষয় বিদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জাগতিক বস্তুমাত্রেই অসৎরূপে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা শুদ্ধ বোধাত্মা, তাঁহাদের আবার জগদ্ভ্রম কোথায়? রজ্জুগত সর্পভ্রম ঘুচিয়া গেলে তাহাতে কি আর সর্পভ্রম থাকে? তেমনি জগতের অসদ্ভাব বুঝিতে পারিলে, তাহাতে আর জগদ্ভ্রম রহিবে কিরূপে? মৃগতৃষ্ণার উপশম হইলে, পুনরায় তখন জলভ্রম হইবে কেন? স্বপ্নকালে প্রবোধবলে স্বীয় জীবস্বরূপ বুঝিতে পারিলে, স্বপ্নদৃষ্ট স্বীয় মরণ কিরূপে সত্য হইবে? যে মৃত নহে, স্বীয় স্বপ্নে স্বপ্ন-মরণ-ভয় তাহারই জন্মিয়া থাকে। হে রাজন্! যিনি বুদ্ধ এবং শুদ্ধ, শরৎকালীন নির্ম্মল নভঃশ্রীর ন্যায় যাঁহার অন্তঃকরণ স্বচ্ছ, অবদাত এবং অতি বিস্তৃত, তাঁহার নিকট 'এই আমি, এই জগৎ,' ঈদৃশ কুশব্দার্থ শোভা পায় না। তিনি উহা একটা বাগাড়ম্বর বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন।

মুনিবর বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবা অবসান হইল। সায়ন্তন বিধি নির্ব্বাহের জন্য সূর্য্যদেব অস্তাচল গমন করিলেন। সভাসদ্‌গণ সায়ং স্নান সমাহিত করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। এদিকে ক্রমশঃ বিভাবরীর অবসান হইল। দিনকরের কর-নিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সভাসদ্‌গণ আবার আসিয়া সভায় যোগদান করিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! মোহবশে যে জন আপন মন পরম পদে দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারে নাই, তথাবিধ অবুদ্ধ ব্যক্তিরই এই অসৎ জগৎ বজ্রসারবৎ দৃঢ় ও সৎ বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। বেতাল যেমন বালককে আজীবন দুঃখ দেয়, তেমনি মূঢ়মতি লোকেরাই এই অসত্য জগৎকে সত্যস্বরূপ বোধ করিয়া পদে পদে দুঃখগ্রস্ত হইয়া থাকে। মরুভূমিতে প্রতিফলিত সৌরকর যেমন মুগ্ধ মৃগগণের বারিভ্রম জন্মাইয়া দেয়, তদ্রূপ মূঢ়মতি মানবের নিকটই এই অসত্য জগৎ সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হয়। স্বপ্ন-দৃষ্ট মৃত্যু যেমন সর্ব্বথা মিথ্যা হইলেও সত্যবৎ শোক-রোদনাদির কারণ হয়, তদ্রূপ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিই এই জগৎকে সত্য জ্ঞানে অনর্থক অর্থক্রিয়ার উপযোগী করিয়া লয়। যাহারা কখন স্বর্ণের স্বরূপ জানে না, তাহারা স্বর্ণনির্ম্মিত কটককে কদাচ কটক ভিন্ন স্বর্ণ বলিয়া বোধ করে না। তদ্রূপ অজ্ঞ লোকেরাই এই জগৎ, এই জগদন্তর্গত পুর, গ্রাম, গৃহ, নগ ও নগবর, ইত্যাদি অসৎ দৃশ্য-দৃষ্টি ভিন্ন পরমার্থ দৃষ্টির অনুসরণ করে না। যেমন নভোমণ্ডলগত মুক্তাবলী, পিচ্ছ ও কেশোণ্ড্রক প্রভৃতি অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি এই অসৎ জগৎ অতত্ত্বদর্শী লোকের ধারণায় সত্যরূপে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

রাম! এই অহন্তাবাদিময় বিশাল বিশ্বকে একটা দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায়ই মনে করিও। এই বিশ্বের পুরুষগণ স্বাতিরিক্ত স্বপ্ন-দৃষ্ট পুরুষপ্রায় বিরাজমান। ঐ সকল পুরুষের সত্যতা কতদূর, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একমাত্র পরমাকাশ বিস্তৃত আছে, সে আকাশ সর্ব্বাধিষ্ঠান, শান্ত, শুচি, নিরতিশয় সত্য, অচেত্য ও চিন্মাত্রস্বরূপ। উঁহাই স্বয়ং সর্ব্বগামী, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ও সর্ব্বাত্মক। উনি আপন সর্ব্বাধারতায় ও সর্ব্বশক্তিমত্তায় যে যেখানে যে যেরূপ অর্থক্রিয়ার উপযোগী হইয়া আবির্ভূত হয়েন, সেই সেইখানে সেই সেইরূপ ক্রিয়া-কলাপাদি প্রকটিত হইয়া থাকে।

সুতরাং এই স্বপ্ন-পুরসদৃশ বিশ্বে দ্রষ্টা পুরুষ যেইমাত্র যে সকল পুরবাসীকে নর বলিয়া মনে করে, তৎক্ষণাৎ তাহারা সেই দ্রষ্টার সমক্ষে নরাকারে প্রতিভাত হয়। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য স্বপ্নাকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ঐ চৈতন্য স্বপ্ন দ্রষ্টার বাসনা অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে বাসনাধার চিত্তের সহিত অভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে; তাহারই প্রভাবে সে নিজেকে নর বলিয়া মনে করে। এইজন্য চিদ্বলে স্বপ্ন এবং জাগরণ কিম্বা অধ্যস্ত ও তদ্ধর্ম্ম উভয়েরই সত্যতা প্রথিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে! যদি মায়ামাত্রস্বরূপ স্বপ্নেতে স্বপ্ন পুরুষ একান্তই অসত্য হয়, তবে তাহাতে দোষ কি, প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! পুরবস্তু প্রভৃতি স্বপ্নকালেও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ, তদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ম্ভু স্বয়ং স্বপ্নসদৃশ আভাস ও অনুভবাত্মক হইয়া প্রকাশিত হয়েন; সুতরাং তদীয় সঙ্কল্পের ফলভূত এই বিশ্ব স্বপ্নতুল্য। বৎস! এইরূপে এই বিশ্বের স্বপ্নোপমতা প্রসিদ্ধ। ইহাতে তুমি যেমন আমার নিকট সত্য; অন্যান্য নরেরাও অন্যান্য নরের নিকট সেইরূপ সত্য। স্বপ্নদৃষ্ট নগরের অধিবাসীরা যদি কোনওরূপে সত্য না হয়, তবে তদাকারযুত তুমিও আমার নিকট কিছুমাত্র সত্য নহ। তোমার কাছে আমি যেমন সত্যস্বরূপ আবার আমার নিকট সকলই সেইরূপ সত্যাত্মা। এই স্বপ্নোপম সংসারে পরস্পর সিদ্ধিসাধনের ঈদৃশ নিদর্শনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই বিপুল স্বপ্ন-সংসারে তোমার নিকট আমি যেমন, তুমিও আমার নিকট তেমনি সত্য। ইহাই হইল স্বপ্নের ক্রম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কথায় আমার ধারণা হয়, স্বপ্নদর্শক যদি বিনিদ্র হয়েন, তাহা হইলে তিনি স্বপ্নে যে যে গ্রাম নগরাদি দেখেন, সকলই সদ্রূপ বলিয়া সে সমস্তও তত্তদাকারে বর্ত্তমান থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! তুমি যাহা ধারণা করিয়াছ, তাহাই স্থির বটে। ফলে, যিনি স্বপ্নদর্শী, তাঁহার জাগ্রদবস্থাতেও স্বপ্ন দৃষ্ট পুর-নগরাদি প্রতিভাত হয়; পরন্তু ঐ সকলের যে অংশ সত্য, তাহাই তদাকারে

প্রকাশিত থাকে। আকাশবৎ বিশদাকার দর্শনাধার আত্মচৈতন্যই পরম সত্যস্বরূপ; স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুনিচয়ের অস্তিত্ব তন্মাত্রেই বিদ্যমান থাকে; মিথ্যাংশের অপলাপ ঘটে। জাগ্রদবস্থায় যাহা তোমার অনুভূত হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই অনুভূত হইয়া থাকে। স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু যে জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টের ন্যায় স্বপ্নান্তরে দৃষ্ট হয় না, জানিবে—দেশ ও কালাদির প্রভেদ বা পরিবর্ত্তনই তৎপক্ষে কারণ।* এইরূপে এই সকল দৃশ্য কিছুই সত্য নয়, তবে সমস্তই সেই পরম সত্যে থাকে বলিয়া সেই সত্যের সত্যতায় সকলই সত্যবৎ প্রতিভাত। স্বপ্নকালীন স্ত্রীসম্ভোগ যেমন মিথ্যা হইলেও সত্য, ঐ সকল মিথ্যা হইলেও উহাদের সত্যতা সেইরূপই। উল্লিখিতরূপে দেহের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র সকলই বিদ্যমান এবং যিনি সর্ব্ববেত্তা, তিনিই মায়াশক্তির প্রভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকাশমান। যেমন ধনাগারে ধন থাকে, যাহার চক্ষে পড়ে, সে তাহা লাভ করিতে পারে। এইরূপ চিদাকাশে সকলই ভাসমান রহিয়াছে; পরন্তু সেই চিদাকাশ যাহা দেখাইয়া দেয়, দর্শক তাহা দেখিয়াই তৃপ্ত হয়।

অনন্তর ভগবতী জ্ঞপ্তিরূপা সরস্বতী বোধরূপ অমৃতসেক-পুরঃসর লীলাপতি বিদূরথের বিবেকরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি লীলার প্রীতি-সাধনার্থ আপনার নিকট এই জ্ঞান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। আপনার অভিলষিত সুসিদ্ধ হউক। আমরা অধুনা চলিলাম।

বশিষ্ঠ পুনরায় বলিলেন,—বৎস! সরস্বতী মধুরবর্ণশালিনী বাণী-বিন্যাসে নরপতিকে ঐরূপ কহিলে, নরনাথ ধীমান্ বিদূরথও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দেবি! আপনি স্বভাবতই মহাফল-প্রদায়িনী; সুতরাং অর্থিজনের নিকট মাদৃশ ব্যক্তিরও দর্শন যখন নিষ্ফল হয় না, তখন আপনার

---

* রামচন্দ্রের মনোভাব এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুনিচয় যদি সত্য হয়, তবে জাগ্রৎকালে তাহা না থাকে বা দৃষ্ট না হয় কেন? বশিষ্ঠের অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট ও জাগ্রদ্দৃষ্ট উভয়ই তুল্য। স্বপ্নকালে জাগ্রদ্দৃষ্টের অবিদ্যমানতার ন্যায় স্বপ্নদৃষ্টও জাগ্রদ্দশায় থাকে না। সুতরাং যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা পরিবর্ত্তনস্বভাব বলিয়া মিথ্যা। পরন্তু তন্মধ্যে যে অপরিবর্ত্তনশীল আত্মচৈতন্য, তাহাই ত্রিকালব্যাপী ও সত্য।

দর্শন লাভ আমার পক্ষে বিফল হইবে কেন ? হে দেবি ! আপনি বলুন, কবে আমি স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর প্রাপ্তির ন্যায় এই বর্ত্তমান দেহ পরিহার করিয়া মদীয় প্রাক্তন দেহ লাভ করিব ? হে মাতঃ ! আমি প্রণত শরণাগত ; আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সত্বর আমায় উপদেশ দানে কৃতার্থ করুন। হে বরদে ! ভক্ত ব্যক্তিকে অবহেলা করা মহৎ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। দেবি ! আমার প্রতি এইরূপ দয়া প্রকাশ করুন যে, আমি যে প্রদেশে যাইব, আমার এই মন্ত্রী ও এই বালা কুমারীও যেন সেখানেই গমন করিতে পারে।

সরস্বতী কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি স্বচ্ছন্দে আগমন করুন এবং লীলার ভক্তি ও ভাগ্যোচিত অর্থ-বিলাসময় মনোহর রাজ্য নিঃশঙ্কচিত্তে ভোগ করিতে থাকুন। জানিবেন—আমাদের নিকট প্রার্থী জনের কোন-রূপ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহা কেহই কখন প্রত্যক্ষ করে নাই।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ;

সরস্বতী কহিলেন,—রাজন্ ! এই মহাসংগ্রামে তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পরে তোমার প্রাক্তন রাজ্য তুমি লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, অচিরেই সমস্ত তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। তোমার কুমারী ও মন্ত্রীর সহিতই তুমি তোমার প্রাক্তন পুরে যাইবে এবং সেখানে গিয়া তোমার সেই শবীভূত দেহ পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। আমরা যেমন আসিয়াছি, সেই-রূপেই সেখানে যাইব। তুমি তথায় বায়ুরূপে অর্থাৎ আতিবাহিক দেহে গমন করিবে। তোমার মন্ত্রী ও কুমারীও তোমারই সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এই আতিবাহিক দেহের গতি মনোরথসম্বন্ধীয় গতির ন্যায় মণ্ডপান্তর্গত আকাশেও বহু দূরবৎ সম্ভাবিত। পরন্তু অশ্বাদির গতির ন্যায় তোমাদের

এ গমনে দেশ-বৈপুল্যের প্রয়োজন নাই। দেখ, অশ্বের গতি একরূপ; গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের গতি অন্যরূপ, আর মদ-ধৌতগণ্ড মাতঙ্গের গতি অপর একপ্রকার।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! নরনাথ বিদূরথ ও দেবী সরস্বতী উভয়ের যখন পরস্পর ঐরূপ মধুর আলাপ চলিতেছিল, এমন সময় প্রাসাদশিখর-স্থিত জনৈক পরিদর্শক, সসম্ভ্রমে সেখানে আসিয়া কহিল, মহারাজ! প্রলয়-কালীন একার্ণববৎ সমুদ্ধত বিষম বিপুল বিপক্ষবল শর, চক্র, অসি, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে আসিয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা অদম্য উৎসাহ ও অসীম উল্লাস সহকারে প্রলয় পবন-প্রক্ষিপ্ত কুলাচলশিলার ন্যায় অসংখ্য গদা, শক্তি ও ভুশুণ্ডী-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং পর্ব্বতবৎ সমুন্নত প্রাসাদময় নগরের নানাস্থানে রাশি রাশি তৃণকাষ্ঠ স্থাপনপূর্ব্বক সে সকলে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। সেই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভয়ঙ্কর হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া চট-চটাশব্দে সমগ্র সুরম্য পুরী দগ্ধ করত ভূমিসাৎ করিতেছে। কল্পান্তকালীন ঘন-ঘটার ন্যায় ঘোরাকার ধূমপুঞ্জরূপ মহাদ্রি সকল গরুড়ের ন্যায় সবেগে আকাশে উড্ডীন হইতেছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সংবাদদাতা, সংসম্ভ্রমে অতিকঠোর চীৎকার করিয়া ঐ সংবাদ বলিতে বলিতে, মুহূর্ত্তে শক্রসৈন্যের ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও বহির্দ্দেশে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। সহসা সবলে সমাকৃষ্ট শরবর্ষী ধনুঃসকলের টঙ্কার, মদমত্ত বেগবান্ কুঞ্জরকুলের বৃংহণ, পুরদহন-প্রবৃত্ত পাবকের চট চটাশব্দ, পুরবাসী দগ্ধ নর-নারীগণের মহান্ হলহলারব, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহ্নিখণ্ডের টঙ্কারনাদ এবং প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ধগ্ ধগ্ ধ্বনি, একত্র মিলিয়া গিয়া এক ভয়াবহ কর্ণকঠোর রব উদ্ভূত হইল।

অনন্তর সেই মহানিশায় মহীপতি বিদূরথ, মন্ত্রী, লীলা ও সরস্বতী সকলেই বাতায়ন-বিবর দিয়া সেই কোলাহলময়ী মহাপুরীর তাৎকালিক অবস্থা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, শক্রসৈন্য প্রলয়-বহ্নি-বিক্ষুব্ধ পরি-পূর্ণ একার্ণবের ন্যায় একান্ত উদ্বেল ও ভীষণ হেতিরূপ মেঘমালায় তরঙ্গিত হইয়া রাজপুরীকে পরিব্যাপ্ত ও রুদ্ধ করিয়াছে। সেই পুরী চারিদিকে

প্রজ্বলিত প্রবল হুতাশনের অম্বরস্পর্শী মহাজ্বালা-মালায় দহ্যমান হইয়া প্রলয়-বহ্নি-বিগলিত মহামেরুর আকার ধারণ করিয়াছে। লুণ্ঠন-পরায়ণ দস্যুগণ ভীতি উৎপাদনের জন্য পরের প্রতি মহামেঘবৎ ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে এবং বিপক্ষ-পক্ষের বিষম কলকলারব উত্থিত হইতেছে। তাহাতে সে পুরী অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করার্ত্ত মেঘতুল্য ধূমপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া অম্বরদেশ আবৃত করিয়াছে এবং উড্ডীয়মান কনক-প্রতিম পাবকস্ফুলিঙ্গ সমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাশি রাশি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড সকল প্রজ্বলিত শিখাবিস্তার করত অম্বরতলে উত্থিত হইয়া উল্কাবৎ প্রতিভাত হইতেছে। প্রজ্বলিত গৃহ সকলের অগ্নিশিখাপুঞ্জ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আগ্নেয় গিরির আকার ধারণ করিয়াছে। হতাবশিষ্ট অসংখ্য সৈন্য পুরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মেঘরন্ধ্র সকল যেন উৎক্ষিপ্ত অঙ্গারপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

তখন অগ্নিদগ্ধ লোক সকল কর্কশ ক্রন্দনধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। দাহকারী শত্রুসৈন্য গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সমুত্থিত কৃশানু-খণ্ডে ও নারাচ-নিকরে অম্বরতল নিরন্তর আকীর্ণ হইল। প্রভূত হেতি ও প্রচুরতর শিলাজালে দগ্ধদেহ পুরবাসীরা ভূপতিত হইতে লাগিল। রণমত্ত মাতঙ্গগণের সঙ্ঘট্টনে বহু বিখ্যাতবীর্য্য বীরগণ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। পলায়নপ্রবৃত্ত তস্করগণের মস্তকচ্ছেদনে তাহাদের অপহৃত ধনরাশি নানা পথে বিকীর্ণ হইল। জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি মধ্যে নিপতিত নর-নারীগণ কঠোর ক্রন্দন করিতে লাগিল। বহ্নিব্যাপ্ত কাষ্ঠরাশি চট-চটাশব্দে স্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। জ্বলন্ত উল্মুক সকল নভস্তলে শত শত সূর্য্যের ন্যায় শোভিত হইল। তুঙ্গায়মান জ্বলদঙ্গারপুঞ্জে সমগ্র বসুধাতল সমাকীর্ণ হইল। দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডরাশির ক্রেঙ্কার-রবের সহিত জ্বলন্ত বেণু-শ্রেণীর ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। অগ্নিদগ্ধ জনগণের ঘনঘোর ক্রন্দনে নির্ম্মম সৈনিকেরাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রচণ্ড হুতাশন ধূলিমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া রাজশ্রী দগ্ধ করত প্রবৃদ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইল। হুতাশনরূপ মহাশন যেন সমগ্র গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইল। দস্যুদল এই অবকাশে নিশাযোগে নির্ভাবনায় নিদ্রিত গৃহস্থগণের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে

লাগিল। তাহাতে গৃহস্থদিগের চিৎকারে ও গৃহসংলগ্ন দুর্ব্বার অগ্নির প্রকোপে গৃহ সকল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। অসংখ্য লোকের ধান্যাদি ভোজ্য অন্নরাশি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, অবশিষ্ট বস্তুগুলি অনেকে গৃহ হইতে বাহির করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা বিদূরথ, দগ্ধ পুত্র-কলত্রাদিকে দেখিবার জন্য ধাবমান যোধগণের মুখোচ্চারিত নিম্নোক্ত কথা সকল শ্রবণ করিলেন,—হায় হায়! প্রচণ্ড প্রভঞ্জন আজ আমাদিগের আতপ-তাপ-হর গৃহগুলিকে উন্নত পাদপ-সমূহের ন্যায় উন্মূলিত করিবার জন্য খর-খর রবে প্রবাহিত হইতেছে। হায় হায়! আমাদের পুত্র-কলত্রাদিরা পূর্ব্বে শীতার্ত্ত ছিল, এক্ষণে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মহতের মনে শম-শীতল বিজ্ঞানবাণীর ন্যায় মাতঙ্গগণের দেহাভ্যন্তরে বিলীন হইতেছে। হা তাত! হেতিরূপ হুতাশনগণ বীরগণরূপ বায়ু দ্বারা বিধূত হইয়া তরুণীদিগের কবরীরূপ তৃণপুঞ্জে সংলগ্ন হইলে, সে সকল যেন শুষ্ক পর্ণরাশির ন্যায় দহ্যমান হইতেছে। ঐ দেখ, ধূমরূপিণী যমুনা ঊর্দ্ধ-দেশে তরঙ্গভঙ্গিমা ধারণ করিয়া নদীর ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ আবর্ত্ত পরিচালন-পুরঃসর আকাশগঙ্গার দিকে ধাবিত হইতেছে! ঐ দেখ, ঊর্দ্ধগামিনী ধূম-নদীতে জ্বলন্ত অঙ্গারকাষ্ঠ সকল ভাসিয়া চলিয়াছে! কৃশানুকণা সকল বুদ্বুদাকারে বিভাসিত হইতেছে! সে নদীর সংস্পর্শে বৈমানিকেরা অন্ধ হইয়া পড়িতেছে!

কেহ কেহ তখন কোন হতভাগিনী রমণীকে দেখাইয়া নিজ কন্যাকে সম্বোধিয়া কহিল, বৎসে! ঐ গৃহবাসিনী রমণীর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, জামাতা, এমন কি স্তন্যপায়ী শিশুটী পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে! রমণী নিজে অনলে দগ্ধ হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে বিনা অনলে শোকে উহাকে দগ্ধ করিতেছে। কেহ কহিল, আহা! তোমরা কে কে আছ, শীঘ্র নির্গত হও; এই জ্বলদঙ্গারময় মন্দির এখনই প্রলয়-কালীন সুমেরুশৈলের ন্যায় নিপতিত হইবে। কেহ কহিল, অহো! এই সকল শর, শিলা, শক্তি, কুন্ত, প্রাস ও অসি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পতঙ্গপালের ন্যায় বাতায়নপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অহো! অর্ণব হইতে জলপ্রবাহ যেমন প্রদীপ্ত বাড়বানলে প্রবেশ করে, তেমনি অধুনা অস্ত্র-সমূহ এই পাবক-পরিব্যাপ্ত

পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছে! ধূমরাশি মহামেঘমধ্যে বিলীন হইতেছে। বহ্নিশিখা সকল প্রাসাদশিখরের অত্যূর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। রসময় বাপী ও উদ্যান প্রভৃতি রাগাকৃষ্ট জনের হৃদয়ের ন্যায় হুতাশন-তাপে শুষ্ক হইতেছে।

কেহ কহিল, এই সকল দন্তীরা ক্রোধভরে চিৎকার করিয়া কট-কটারবে বন্ধনস্তম্ভ-ভ্রমে বৃক্ষাবলী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। এই সকল গৃহ-সন্নিহিত ফলপুষ্পশালী দ্রুমরাজি দগ্ধসর্ব্বস্ব গৃহস্থের ন্যায় ভ্রষ্টশ্রী হইয়া দীনদশায় উপনীত হইয়াছে। ঐ দেখ, পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত রথ্যা-পতিত বালকগণ ভিত্তি-পতনে চূর্ণ হইয়া গেল! ঐ দেখ, জ্বলদঙ্গারময় হস্তিশালা সকল বাত-বিদ্রাবিত ও পতিত হওয়ায় তথাকার হস্তিগণ ভীত হইয়া বিকট চিৎকার করিতেছে। হায় কি কষ্ট! ঐ পুরুষের স্কন্ধ অস্ত্রাহত হইয়াছে, তদুপরি জ্বলন্ত উল্কা পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার বজ্রোপম যন্ত্র পাষাণ পতিত হইল! ঐ দেখ, গো, অশ্ব, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, কুক্কুর, শৃগাল ও মেষপালেরা আকুল হইয়া মার্গ অবরোধ করত যেন যুদ্ধ করিতেছে। অহো! কত কামিনী অগ্নিশিখার আক্রমণভয়ে জলার্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। উহারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপ পদ্মমালায় মণ্ডিত এবং পট পট শব্দে পতিত জলবিন্দুরূপ অলিজালে মালিত। ঐ দেখ, করভগণ কর্ত্তৃক আস্বাদনার্থ অবলম্বিত তরুশাখার ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল অবলাগণের অলকাবলী অবলম্বন করিয়া অশোক-কুসুমের শোভাসম্পদ বিস্তার করিতেছে। হায় হায়! হরিণাক্ষীদিগের ভ্রমরপক্ষ-নিভ অক্ষিলোমে কত কৃশানুকণা পড়িয়াছে। অহো! প্রাণী-দিগের স্নেহপাশ কি দুশ্ছেদ্য! নরগণ দগ্ধ হইতেছে, তথাপি পত্নী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। ঐ দেখ, এক প্রকাণ্ড হস্তী জ্বলদঙ্গারময় বন্ধনবৃক্ষ সবেগে ভগ্ন করিয়া স্বীয় শুণ্ডাগ্র দগ্ধ হওয়ায় পলায়ন-পূর্ব্বক পুষ্করপূর্ণ সরোবরে নিমগ্ন হইল। ধূমপুঞ্জ, অম্বুদপদে অধিরোহণ করিয়া বিলোল বহ্নিশিখারূপ তড়িল্লতা অন্তরে ধারণ করিতেছে এবং রাশি রাশি জ্বলদঙ্গার ও অসংখ্য নীবার-নিকর বর্ষণ করিতেছে।

তখন কোন লোক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—দেব! ধূমপুঞ্জ

নভঃপ্রদেশে বহ্নিকণারূপ আবর্ত্ত ও শিখারূপ তরঙ্গরাজি বিস্তার করিয়া রত্নপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এদিকে অগ্নিশিখার তেজঃপুঞ্জে নভঃপ্রদেশ পীতবর্ণ হওয়ায় মনে হইল, মৃত্যু বুঝি জীব-হিংসারূপ উৎসবে অধুনা দিগঙ্গনাদিগকে কুঙ্কুমাক্ত পেটিকা প্রদান করিতেছেন!

অহো, কি দারুণ দুর্নীতি! কি বিষম দুশ্চরিত্রতা! দেখ, দেখ, রাজরমণীদিগকেও শস্ত্রধারী বৈরীরা ধরিয়া লইতেছে। অহো! ঐ দেখ, অর্দ্ধদগ্ধ কবরীভারে কত কামিনীর বক্ষ ও স্তনমণ্ডল আকীর্ণ হইয়াছে। উহাদের মাল্যদাম ও কুসুমভূষণ এখনও বিদ্যমান। সে সকলে রাজপথ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। অহো! ঐ সকল রাজবনিতার পরিধান বসন আলোলিত হওয়ায় উহাদের নিতম্ববিম্ব স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে। রাজ-রমণীগণের মণিমাণিক্যময় বলয় সকল হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। উহাদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হারলতা হইতে নির্ম্মল মুক্তাফল সকল বিগলিত হইয়া পতিত হইতেছে। রাজললনাগণের কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্ট স্তনমণ্ডলের পার্শ্ব হইতে কনকচ্ছবি বিচ্ছুরিত হইতেছে। কুররীগণের ন্যায় উহাদিগের কঠোর ক্রন্দনে রণধ্বনিও মন্দীকৃত হইয়াছে। উহারা নিরন্তর এত ক্রন্দন করিতেছে যে, তাহাতে উহাদের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ এবং নিজেরাও বিচেতন হইতেছে। শোণিত-পঙ্ক ও বাষ্পজলে উহাদের পরস্পর গ্রথিত বসন সকল ভিজিয়া যাইতেছে। শত্রুপক্ষীয় লোকেরা হস্ত দ্বারা উহাদের হস্ত আকর্ষণ করিয়া সবলে চলিয়াছে। 'কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে' এই বলিয়া রাজরাণীরা যখন কাতরনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তখন ধারণা হয় যেন উৎপলমালা বর্ষিত হইতেছে; সে দৃশ্য দর্শনে নির্ম্মম সৈনিকেরাও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি-তেছে না। ঐ নারীগণের মৃণালবৎ কোমল ও নির্ম্মল উরুমূল সকল স্বচ্ছ সূক্ষ্ম অম্বর মধ্য দিয়া লক্ষিত হওয়ায় মনে হয় উহারা যেন এক একটী আকাশনলিনী বিরাজ করিতেছে।

ঐ রাজরমণীদিগের মাল্য, বসন, ভূষণ ও অঙ্গরাগ সকল শ্লথ হইয়াছে। সমস্ত অলকবল্লরী বাষ্পভরে আকুল, চঞ্চল ও ইতস্তত প্রসৃত হইতেছে।

উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয়, উহারা যেন আনন্দরূপ মন্দরাচল দ্বারা নিয়ত মথিত মন্মথাব্ধি হইতে সমুত্থিত এক একটী রাজলক্ষ্মী।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ইত্যবসরে মত্তযৌবনা ভয়বিহ্বলা রাজমহিষী; দাসী ও বয়স্যাগণ সমভিব্যাহারে রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল লক্ষ্মী যেন পঙ্কজগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজমহিষীর তখন মাল্য ও বস্ত্র আলুলিত, গলবিলম্বিনী হারলতা বিপর্য্যস্ত এবং হৃদয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আকুলিত। সেই চন্দ্রবদনা, স্বচ্ছদেহা, তারকাকারদর্শনা রাজমহিষী তৎকালে শ্বাসোচ্ছ্বসিত পয়োধরভার বহন করত মূর্ত্তিমতী গগনাধিদেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজমহিষীর জনৈক বয়স্যা, সুরেন্দ্রসমীপে অপ্সরার ন্যায় রাজার নিকট সমারব্ধ মহাসংগ্রামের বিষম বার্ত্তা নিবেদন করিতে লাগিল। বয়স্যা বলিল,—মহারাজ! বাত-বিহতা লতা যেমন মহাদ্রুমের আশ্রয় লয়, তেমনি অধুনা এই প্রধান মহিষী আমাদিগের সহিত অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া ভবদীয় আশ্রয় লাভার্থ আগমন করিয়াছেন। রাজন্! বলিব কি, মহাসাগরের ঊর্ম্মিমালা যেমন তীরগত তরুলতা সকল সবলে টানিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার অন্যান্য অন্তঃপুরিকা প্রণয়িনীদিগকে শস্ত্রধারী সবল শত্রু-পক্ষীয়েরা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। হঠাৎ প্রবৃত্ত প্রভঞ্জন যেমন অতি বড় দ্রুমদিগকেও বিধ্বস্ত করে, তেমনি অদ্য বলদৃপ্ত শত্রুপক্ষ অতর্কিতভাবে আপতিত হইয়া আপনার সমস্ত পুররক্ষীদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছে। বর্ষাকালীন নৈশ বারিবর্ষণে বিলুণ্ঠিত কমল বনের ন্যায় দূরাগত নিঃশঙ্কমনা শত্রু-সেনা কর্ত্তৃক আমাদের অন্তঃপুরের যথাসর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। ধূমরাশি উদ্গিরণকারী ভয়ঙ্কর জ্বালামালাময় লেলিহান

হুতাশন এবং পরপক্ষীয় অগণিত যোধগণ ভীষণ নিনাদে আমাদিগের অন্তঃপুর আক্রমণ করিয়াছে। ধীবরেরা যেমন কুররীদিগকে নিগৃহীত করিয়া লইয়া যায়, তেমনি শত্রুসেনারা পরিজন-পরিবৃতা ক্রন্দন-কারিণী অন্তঃপুর-বিলাসিনী দেবীদিগকে কেশাকর্ষণ করত বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। হে দেব! আমাদিগের এই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় বহুল বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিপৎপাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই বিদ্যমান।

রাজা সেই বয়স্যার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দেবী লীলা ও সরস্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেবীদ্বয়! সম্প্রতি আমি যুদ্ধার্থ যাত্রা করিব; অতএব আপনারা ক্ষমা করিবেন। আর আমার এই যে শরণার্থিনী ভার্য্যা, এ এক্ষণে আপনাদেরই পাদপদ্মের ভ্রমরী হইয়া রহিল; অর্থাৎ আপনারাই ইহাকে রক্ষা করিবেন। এই কথা কহিয়া রাজা বিদূরথ কোপ-কষায়িত-নেত্রে মত্ত মাতঙ্গবিদারী কন্দর-নিষ্ক্রান্ত কেশরীর ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর যিনি প্রবুদ্ধ লীলা, তিনি আদর্শতলাগত আপনার আকৃতির ন্যায় সুন্দরদর্শনা সমাগতা বিদূরথ-মহিষী লীলাকে দেখিতে লাগিলেন এবং পরে তিনি সরস্বতীকে সম্বোধিয়া কহিলেন,—দেবি। এ কি? ইনি আমার সদৃশী হইলেন কিরূপে? আমি প্রথমে যেরূপ ছিলাম, ইহাঁকেও ত অবিকল সেইরূপ আকারেই অবস্থিত দেখিতেছি! আপনি বলুন, ইহার কারণ কি? কেন এমন ঘটিল! আর এক কথা, এই যে মন্ত্রিগণ, পৌরগণ ও সবলবাহন যোধগণ, ইহাঁরাও ত আমার সেই প্রাক্তন রাজ্যের লোকাদির অবিকল অনুরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। হে দেবি! ইহাঁরা যদি সত্য সত্যই সেই সকল হয়েন, তাহা হইলে কিরূপে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন? তবে কি ইহাঁরা আমার মুকুরগত প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে বাহিরে অবস্থিত? যদি তাহাই হয়, তবে কি ইহাঁরা সচেতন? দেবি! এ সকল কথা যথাযথ বলুন।

দেবী কহিলেন,—অন্তরে যেরূপ জ্ঞপ্তি সমুদিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেই-রূপই উহার অনুভব হইয়া থাকে। চিত্ত যেমন স্বপ্নদশায় জাগ্রদনুভূত

পদার্থের আকার ধারণ করে, চিৎশক্তিও তেমনি চিত্তের আকার প্রাপ্ত হয়। সেই চিত্তে ও চৈতন্যে যেমন সংস্কারাত্মক জগৎ প্রতিফলিত হয়, উদ্বোধকালে সেইরূপই সমুদিত হইয়া থাকে। সে বিষয়ে দেশ-কালের অল্পত্ব ও দৈর্ঘ্য অথবা পদার্থের বৈচিত্র্য, ইহাদের কেহই প্রতিবন্ধক হয় না। উল্লিখিত ক্রমে অন্তঃস্থিত আত্মচৈতন্যে জগৎ অধ্যস্ত ও অধিষ্ঠিত রহিলেও ঐ কথিত কারণে বাহিরে আছে বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে স্বপ্নার্থই নিদর্শন। স্বপ্ন-রচিত ও সঙ্কল্প-কল্পিত পুরী যেমন অন্তরে কল্পিত ও অবস্থিত রহিলেও বহিঃস্থিতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, অন্তঃ-পরিকল্পিত জগৎও তেমনি চৈতন্যের সর্ব্বব্যাপিতা-নিবন্ধন বহিঃস্থিতবৎ বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই অন্তরুদীয়মান মিথ্যা জগৎ দীর্ঘ অভ্যাসবশে বহির্দ্দেশে নির্ব্বাধে স্পষ্টতই সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তোমার সেই ভর্ত্তা তৎকালে যে পুরে যে ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি সেইখানে সেইকালে সেইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হয়েন। ফল কথা, তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পর হইতেই তৎকর্ত্তৃক তত্তৎ সৃষ্টি অনুভূত হইয়া আসিতেছে। এই যে সকল মন্ত্রী প্রভৃতি রহিয়াছেন, ইহাঁরা আকৃতিগত সাদৃশ্যে ভবদীয় পূর্ব্ব-মন্ত্রী প্রভৃতির অনুরূপ হইলেও তাঁহাদের সহিত অধুনা ইহাঁদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব বিরাজমান। আরও দেখ, এই রাজার যাহা অনুভব হইতেছে, তাহাও তদীয় চিৎসত্তার সত্যতায় সৎস্বরূপ। চিৎসত্তার সত্যত্ব ভিন্ন অন্য কাহারও সত্যত্ব অসম্ভব। স্বচৈতন্যে স্বীয় অজ্ঞানে কল্পিত বলিয়া অন্য সকলই অসত্য। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়ের বৈলক্ষণ্য এই যে, জাগ্রদনুভূত বস্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারদশায় তত্ত্ববৎ অবিসংবাদী। যাহা ব্যবহার-দশায় অবিসংবাদী, তাহাই যে সত্য হইবে, এমন নহে। ইন্দ্রজালাদিতে কত পদার্থ প্রদর্শিত হয়, তাহাও সকলের চক্ষে একইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া অবিসংবাদী; সুতরাং সে সকল কি সত্য? এ দিকে দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু উত্তর কালে ভঙ্গুরস্বভাব বলিয়া তাহার অলীকত্ব সকলেরই অঙ্গীকৃত; সুতরাং বল, তাহার সত্যতা হইবে কিরূপে? ফলে, এ সকলই এইরূপ অর্থাৎ ইহাতে নাস্তিতার অধিক কিছুই নাই। বুঝিয়া দেখ, জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নের যেরূপ নাস্তিত্ব, আবার স্বপ্নদশায়ও জাগ্রতের নাস্তিত্ব সেইরূপই। এ ক্ষেত্রে নাস্তিত্বের

ভেদ-ভিন্নত্ব অল্পমাত্রও নাই। এইরূপ জন্মকালে মৃত্যু যেমন অসৎস্বরূপ, মৃত্যুকালেও জন্ম তেমনি অসৎস্বরূপ হয়।

হে রাঘব! নাশকালে বস্তু সকল অবয়ব ধ্বংসপূর্ব্বক অভাব প্রাপ্ত হয়, আবার বাধকালে তদ্বিষয়ক অনুভবের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। এইরূপে এই জগৎ সৎও নয় এবং অসৎও নয়; ইহা কেবল একটা ভ্রান্তিমাত্র বিজৃম্ভিত। হে অনঘ! এই ভ্রান্তি মহাকল্পের আরম্ভ হইতে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বহু যুগ পর্য্যন্ত ভাসমান। যাহা কস্মিন্ কালেও নাই, তাহা কখন সত্য হইতে পারে না; কিন্তু তৎকল্পনার অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্মই আছেন; সুতরাং তিনিই এই জগৎ। তাঁহারই মধ্যে এই সৃষ্টিনামিকা ভ্রান্তিজাল বিরাজমান। আকাশে কেশোণ্ড্রক-সমূহের ন্যায় ঐ সকল বাস্তবরূপে বিভাসিত নহে। জলধিতে যেমন তরঙ্গ-রাজি, তেমনি পরব্রহ্মে এই সৃষ্টিপরম্পরা। প্রবল বায়ুপ্রবাহে ধূলিরাশি যেমন বার বার উত্থিত হইয়া বিলয় পায়, তেমনি এই সৃষ্টিপরম্পরা এক এক বার উৎপন্ন হয় আবার বিলীন হইয়া যায়। অতএব 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি প্রকার বিভাগাত্মা কেবল ভ্রান্তিময় আভাসমাত্র মিথ্যা। মরুমরীচিকা-জলের ন্যায় এবং দগ্ধ বসন-ভস্মপ্রায় এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চে আবার কি আস্থা হইতে পারে? ইহা ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যাহাতে কোনও প্রকার ভ্রান্তি সম্ভাবনা নাই, তাহাই পরম পদ।

দেখ, গাঢ় অন্ধকারপুঞ্জে বালকদিগের যক্ষ বলিয়া ভ্রম জন্মে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা যক্ষ নহে, তাহা অন্ধকারই। অতএব এই জগৎ কেবল জনন, মরণ, অজ্ঞান ও মোহমাত্রময়-রূপেই বিস্তৃত। মহাকল্পের সহিত এই যাবতীয় দৃশ্য জগতের শান্তি হইয়া গেলে তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম অপেক্ষা জগৎ অতিরিক্ত সত্য নহে। ব্রহ্ম-ময়ত্ব হেতু এই দৃশ্যজাত একান্ত অসত্যও নহে। অথবা সত্য ও অসত্য এই উভয়ধর্ম্মিত্ব এক পদার্থে অসম্ভব। এই কারণে দৃশ্য জগৎ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপের আবরণ মাত্র বলিয়াই অবধারিত হয়। প্রপঞ্চের কল্পনা-মাত্রত্ব সর্ব্বত্রই সম্ভাবিত। আকাশে পরমাণুর অভ্যন্তরে এবং দ্রব্যাদির অণুক মধ্যে যে যেখানে জীবাণু বিদ্যমান, সেই সেইখানেই জগৎ তাহার

স্বীয় স্বারূপ্য বিদিত হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন আপন ভাবনাবশে আপনার উষ্ণতা পরিজ্ঞাত হয়, বিশুদ্ধ চিদাত্মাও সেইরূপ এই জগৎকে স্বীয় আত্মভূতরূপে দেখিয়া থাকেন। প্রভাকরের উদয়ে তদীয় কিরণ-জাল গৃহমধ্যে পতিত হইলে তত্রত্য ত্রসরেণুগুলিকে যেমন ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পরমাকাশে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ ত্রসরেণু প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। বায়ুতে যেমন স্পন্দনের ও আমোদের বিদ্যমানতা এবং আকাশে যেমন শূন্যতার সদ্ভাব, তেমনি পরমাত্মাতে এই বিশাল বিশ্ব সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত। আবির্ভাব, তিরোভাব, গ্রহণ, উৎসর্জ্জন এবং স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর জগৎ, এতৎসকলই নিরবয়ব ব্রহ্মের অংশ মাত্র। অতএব অধুনা তুমি এই সাবয়ব বিশ্বকেও নিরবয়ব আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই বিদিত হইবে। এই বিশ্ব পরমাত্মার আপন মায়িক ভাবনায় সমুদিত; সুতরাং পূর্ণব্রহ্মে অবস্থান নিবন্ধন ইহা অর্থশূন্য নহে। কেন না, বিশ্ব শব্দের পর্য্যবসান পূর্ণার্থত্বে—পূর্ণেরও আবার শূন্যতাযোগ অসম্ভব। ফল কথা, বিশ্ব শব্দ পূর্ণ ব্রহ্মের একটা নাম মাত্র। রজ্জুগত সর্পভ্রমের ন্যায় বিশ্ব সত্যও নয়, অসত্যও নয়, ইহা অনির্ব্বাচ্য। যাহা ভ্রান্তি-দৃষ্ট, তাহা অসত্য আর যাহা পরীক্ষিত, তাহা সত্য; এই যুক্তি-দ্বয়ে বিশ্বের অনির্ব্বাচ্যতাই পরিজ্ঞেয়। ফল কথা, বিশ্ব পরমাত্মার ন্যায় সত্য আর রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এ দুয়ের কিছুই নহে। রজ্জু-সর্প সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, উহা অনির্ব্বাচ্য। কেন না, যদি সত্য হইত, তবে বাধ হইত না, আর যদি মিথ্যা হইত, তবে প্রত্যক্ষ হইত না। চৈতন্য অনির্ব্বচনীয় স্বীয় মায়ায় নিহিত হয় বলিয়াই পরম কারণ জীবরূপে প্রকাশ-মান। এই জন্য জীবত্বেরও নির্ব্বাচন অসম্ভব। চিরকাল অনুভব হেতু স্পষ্টতই জীবত্ব লাভ হইয়া থাকে। তাহাতে জগতে স্বীয় সত্যতা অধ্যস্ত হওয়ায় জগৎ সত্যরূপে প্রতীত হয়। ফলে, এই জগৎ সত্য বা অসত্য, যাহাই হউক, চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কোনখানেই নাই। জগ-দ্দর্শন চিদাকাশেই হয়। জীবের ভোগেচ্ছাই সংসারের উৎপাদক কারণ। সে বিষয়ে সত্য অসত্যের উপযোগিতা নাই। বিষয় সত্য মিথ্যা, যাহাই হউক, তাহার অনুরঞ্জনাই হইল সংসারের উদ্ভব-স্থিতির মূল কারণ। জীব

প্রথমতঃ স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ানুভূতিতে রঞ্জিত হয়, অনন্তর সেই পূর্ব্ব পূর্ব্বানুভূত বিষয়রাশি পুনর্ব্বার অনুভব করে। অনুভূতির মাহাত্ম্য এতদূর বৈচিত্র্যময় যে, তাহা কখন কখন পূর্ব্বানুভূতির অবিকল মূর্ত্তি অবলোকন করায় এবং কখন কখন বা অসমান ও অর্দ্ধসমান অনুভাব্য বিষয় উপনীত করিয়া বারম্বার সে সকলের অনুভব করায়। কিন্তু প্রাজ্ঞনেত্রে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তত্তাবৎ অনুভব সকলই অসত্য এবং একমাত্র জীবাকাশে প্রকট। সম্প্রতি তোমার পূর্ব্ববাসনা সর্ব্বাংশে তুল্যাকারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাই তুমি অনুভব করিতেছ যে, সেই কুল, সেই কুলক্রমাগত আচার, জন্ম ও চেষ্টাদি-সমন্বিত মন্ত্রী ও পৌরজন প্রভৃতি এইখানে আমার দৃষ্টিপথে বিদ্যমান। ফলে কিন্তু এ সকলই তোমার আত্মাতে; অন্যত্র আত্মবহিঃপ্রদেশে নহে। দেশ, কাল ও আচার বিষয়ে উহারা সমশীল হইলেও আত্মভাবে সত্যস্বরূপে অবস্থিত। সর্ব্বগামী আত্মস্বরূপ প্রতিভার স্থিতি ঐরূপই।

বৎসে! রাজার আত্মাকাশে যেমন সর্ব্বসত্যময়ী প্রতিভার উদয় হইতেছে, অব্যাকৃত আকাশস্বরূপ ঈশ্বরে সেইরূপ সত্যসঙ্কল্প-স্বরূপিণী প্রতিভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণেই তোমার বোধ হইতেছে, এই লীলা তোমার ন্যায় শীল, কুল, আচার ও আকার-সম্পন্ন। সর্ব্বগামী সংবিদাদর্শে উক্তরূপেই প্রতিভা প্রতিবিম্বিত হয়। যেখানে যেরূপ, সেখানে সতত সেইরূপই প্রতিভা সমুদিত হইয়া থাকে। অন্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতিভা জীবাকাশের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরে বাহিরেও প্রকাশিত হয়। চিদাদর্শে প্রতিবিম্ব বশতই উহা এইরূপে অবস্থিত।

বৎসে! এই তুমি, এই আমি, ঐ আকাশ, এই আকাশ-মধ্য-গত ভুবন, পৃথ্বী ও রাজা, এ সকলই প্রতিভাতমাত্র বা চিন্মাত্রস্বভাব। এইজন্য সকলই অহন্তাবে স্ফুরিত। এইরূপে অন্যান্য তত্ত্বদর্শীরাও এই সকলকে চিদাকাশরূপ বিশ্বের জঠর বলিয়া বিদিত হয়েন। লীলা! তুমিও এ সকল চিদাকাশ বলিয়া বিদিত হও। তাহা হইলে তুমিও যথাস্বভাবস্থিতা হইয়া কেবল অমল শান্তরূপে বিরাজ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

সরস্বতী কহিলেন,—লীলা! তোমার স্বামী এই নরনাথ বিদূরথ উপস্থিত যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পুনরায় সেই অন্তঃপুরে উপনীত হইয়া আপনার সেই পদ্মরূপী প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইবেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই দ্বিতীয়া অপ্রবুদ্ধা লীলা, সরস্বতী দেবীর ঐ কথা শ্রবণানন্তর বিনয়-বিনম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমি ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীকে নিত্যই অর্চ্চনা করিয়াছি। হে দেবি! তিনি আমাকে নিশাযোগে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া থাকেন। হে দেবেশি, অম্বিকে! আমি স্বপ্নাবস্থায় তাঁহাকে যেরূপ দেখি, আপনাকেও সেইরূপই দেখিতেছি। অতএব হে বরাননে! কৃপণ জনের প্রতি কারুণ্যবশতঃ আপনি আমাকে বরদানে অনুগৃহীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দ্বিতীয়া লীলা এই কথা কহিলে জ্ঞপ্তি দেবী, তদীয় ভক্তির বিষয় স্মরণ করিয়া প্রসন্না হইলেন এবং তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।

দেবী কহিলেন,— বৎসে! তুমি আজীবন অনন্যমনে আমার প্রতি অবিচল ভক্তি করিয়া আসিয়াছ, সেজন্য আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর।

দ্বিতীয়া লীলা বলিলেন,—দেবি! আমার পতি যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া যেখানে গিয়া অবস্থান করিবেন, আমি যেন এই বর্ত্তমান দেহেই সেখানে তাঁহার অঙ্গনা হইয়া থাকিতে পারি।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! তুমি পুষ্প-ধূপাদি বিবিধ উপকরণ যোগে বহুদিন পর্য্যন্ত অনন্যমনে আমার আরাধনা করিয়াছ। তাহারই ফলে তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেবীর বরদানপ্রভাবে দ্বিতীয়া লীলা আনন্দে উৎফুল্লা হইলেন। তখন সেই পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রবুদ্ধা লীলা সন্দেহাকুলমনে সরস্বতী দেবীকে নিম্নোক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব লীলা বলিলেন,—দেবি! আপনাদের ন্যায় যাঁহারা সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাদৃশ ব্রহ্মরূপী ব্যক্তিদিগের অভিলাষ অচিরাৎ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব হে ঈশ্বরি! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আমাকে কেন সেই স্থূল শরীরে এই লোকান্তরে ও সেই গিরিগ্রামে উপনীত করেন নাই? অর্থাৎ সমাগতা লীলাকে স্থূল শরীরে ভর্তৃলোকে যাইবার অনুমতি দিলেন আর আমাকে কেন আমার স্থূলদেহ ত্যাগ করাইয়া তথায় গমনে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বলুন।

দেবী কহিলেন,—বরবর্ণিনি! আমি স্বয়ং কাহারও কিছুই করি না। জীব আপনি আপনার অভীষ্ট কার্য্য-কলাপ সমাধা করিয়া থাকে। আমি জ্ঞানমাত্রের অধিদেবতা। প্রাণিগণের আকাঙ্ক্ষিত ভাবী শুভকে আমি বরদান দ্বারা প্রকাশিত করিয়া দেই। প্রাক্তন কাম, কর্ম্মসংস্কার ও জ্ঞানাদিময়ী চিদাত্মক জীবশক্তিরূপিণী তত্তৎকার্য্যবীজভূতা মায়া-সম্বলিতা চিচ্ছক্তি প্রত্যেক জীবেই বর্ত্তমান। সেই শক্তিই জীবদিগের ফলবিধায়িনী। যে যে জীবের যে যে শক্তি যে যেরূপে সমুদিত হয়, সেই সেই জীবের সেই সেই শক্তি সর্ব্বদা তত্তদনুরূপ ফলদান করিয়া থাকে। আমাকে তুমি যখন আরাধনা করিয়াছিলে, তখন তোমার জীবশক্তি 'আমি চিরমুক্ত হইব' এই প্রকারেই সমুদিত হইয়াছিল। আমিও তোমাকে তখন সেই সেইরূপেই প্রবোধিত করিয়াছি। হে বরবর্ণিনি! তোমারই সেই যুক্তিতে তোমাকে আমি অমলভাবে উপনীত করিয়া দিয়াছি। তুমি এইরূপ ভাবনাতেই তৎকালে চিরবোধিত হইয়াছিলে এবং সর্ব্বদা স্বীয় চিৎশক্তির প্রভাবে সেই অর্থই প্রাপ্ত হইয়াছ। বলা বাহুল্য, চিরকাল হইতে যাহার যেরূপ স্বীয় চিদবচ্ছিন্ন প্রযত্ন, যোগ্যকালে তাহার সেইরূপ ফলই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তপস্যা কিম্বা দেবতা আর কিছুই নহে, আপনার যে চিৎশক্তি—তাহাই তপস্যা বা দেবতা হইয়া আকাশফলবৎ ফলদান করে। ফল কথা, স্বীয় সম্বিৎ প্রযত্ন ভিন্ন অন্য কোন ফলদানকর্ত্তা নাই। ইহা জানিয়া শুনিয়া যেরূপ ফল পাইবার ইচ্ছা, প্রথম হইতে তদনুরূপ কর্ম্মই আচরণ করিবে।

বৎস! অন্তরাত্মা চিৎসত্তাই বিহিত বা নিষিদ্ধ যে কোন কর্ম্মে প্রযত্ন প্রকাশ করে, উত্তর কালে তাহারই ফলরূপিণী শ্রী আবির্ভূত হয়। অধুনা

আমার উক্তিগুলি বিচার করিয়া দেখ আর যাহা পবিত্র, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদন্তরে বিরাজ করিতে থাক।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! তৎকালে সেই মহিলাত্রয় গৃহমধ্যে ঐরূপ কথোপকথনে নিরত রহিলে, বিদূরথ সক্রোধে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কি করিয়াছিলেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! রাজা বিদূরথ স্বভবন হইতে বহির্গত হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় মহাসেনা-সমবায়ে পরিবৃত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চর্ম্মবর্ম্মে সম্বদ্ধ হইল। তিনি হার-ভূষণে ভূষিত হইয়া সুরেন্দ্রের ন্যায় মহাজয়জয় নাদে নির্গত হইলেন। রাজা তদীয় যোধগণকে আদেশ দান, সেনাগণের সন্নিবেশক্রম শ্রবণ এবং বীরবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতে করিতে রথারোহণ করিলেন। তিনি যে রথে আরোহণ করিলেন, তাহা পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ সমুচ্চ, মুক্তা ও মাণিক্যজালে মণ্ডিত এবং পঞ্চ পতাকায় পরিব্যাপ্ত। উহার চক্র ও ভিত্তি কাঞ্চনকীলকে সম্বদ্ধ; দেখিলে মনে হয়, সে রথ যেন স্বর্গীয় বিমানবৎ প্রতিভাত। ঐ রথে উচ্চজাতীয় আটটী অশ্ব যোজিত। অশ্বগুলি সুলক্ষণ, সুগ্রাব, প্রশস্ত ও উত্তম গতিশীল। উহারা প্রবলবেগে হ্রেষারব করিতে করিতে রথ লইয়া ছুটিয়া চলিল। অশ্বগুলি দ্রুত বেগে যাইতে লাগিল, যেন বোধ হইল, সুরগণকে অন্তরীক্ষ পথে লইয়া । উহাদের দ্রুততর গমনভঙ্গী দর্শনে মনে হয়, উহারা যেন নিজ নিজ বেগাধিক্যে বায়ুবেগও সহিতে পারিতেছে না। উহাদের সম্মুখ ভাগের গতি বশতঃ বোধ হয় যেন পশ্চার্দ্ধ বহন করিয়া উহারা আকাশ পান করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। উহাদের গলদেশে চামর সকল বিলম্বিত রহিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুভ্র শোভা ধারণ করিতেছে।

অনন্তর গভীর দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল। ঐ ধ্বনিতে উদ্দাম গজ-ঘটার বৃংহণরূপ মেঘ-নির্ঘোষ মিশিল এবং শৈলভিত্তিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উহা তখন অতীব ভীষণ হইয়া উঠিল। রণোন্মত্ত সৈন্যগণের কলকল-রবে দিক্ সকল পরিব্যাপ্ত হইল। আয়ুধশ্রেণীর সঙ্ঘট্টন-জনিত ঘন ঘোর শব্দের সহিত কিঙ্কিণীসমূহের তীব্র নিক্কাণ উত্থিত হইল। কোথাও ধনু-র্গুণের চটচটাশব্দ ও শরসমূহের সীৎকার ধ্বনি, কোথাও যোধমণ্ডলীর পরস্পর অঙ্গসঙ্ঘর্ষণে বর্ম্মশ্রেণীর ঝন্ঝনা রব, কোথাও জ্বলদগ্নিশিখার টন্ৎকার নাদ, কোথাও আর্ত্তজনের ক্রন্দন-শব্দ, কোথাও ভটগণের পরস্পর আহ্বান, কোথাও বীরবৃন্দকে সমুৎসাহিত করিবার জন্য বন্দিগণের উচ্চ উৎসাহ-বাণী এবং কোথাও বা যুদ্ধ-ক্ষত পীড়িত জনগণের রোদন-ধ্বনি সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। তখন রণক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার ধ্বনি একীকৃত হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকুহর যেন শিলাবৎ ঘনীকৃত করিয়া তুলিল।

তখন দশদিক্-পরিপূরণকারী ঐ সকল ধ্বনি এতদূর ঘনঘোর হইয়া উঠিল, যেন উহা হস্তগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর ধূলিপুঞ্জ-চ্ছলে ভূপৃষ্ঠই যেন আদিত্য-পথ নিরোধ করিয়া অম্বরদেশে উড্ডয়ন করিতে উন্মুখ হইল। সেই ধূলিপুঞ্জে সেই মহাপুরী যেন গর্ভবাসে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইল। রজোগুণের আধিক্যে যৌবনে যেমন স্বাভাবিক অজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি অন্ধকার তখন নিবিড়তা প্রাপ্ত হইল। দিবসা-গমে তারকারাজির ন্যায় দীপশ্রেণী তখন কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল! চঞ্চল-স্বভাব রাত্রিঞ্চর ভূতবৃন্দ তখন বলবীর্য্যশালী হইয়া উঠিল।

তৎকালে সেই লীলাদ্বয় ও বিদূরথরাজের সেই দুহিতা, ইহাঁরা তিন জনে দেবীদত্ত প্রশস্ত দৃষ্টি লাভ করিয়া যেন অতি প্রফুল্লহৃদয়ে সেই মহাযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একার্ণবজলের উচ্ছ্বাস-রণতঃ বাড়বানল সকল যেমন প্রশান্ত হইয়া যায়, তেমনি আয়ুধ-নিচয়োত্থিত কটকটারব সকল নিবৃত্ত হইয়া গেল। নরনাথ বিদূরথ স্বীয় সেনাসকল সমা-কর্ষণ করত সিন্ধুরাজের বল ও নিজের বল, উভয় বলের তারতম্য বুঝিতে পারিলেন না; না বুঝিয়াই তিনি একার্ণবে মেরুর ন্যায় পরপক্ষীয় সৈন্যব্যূহে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর চটচটাধ্বনি করিয়া বিষম ধনুগুর্ণধ্বনি উত্থিত হইল। পরস্পরপক্ষীয় সৈন্যেরা অস্ত্রাংশুময় অম্ভোদমালা বিরচিত করত বিচরণ করিতে লাগিল। নানাবিধ হেতিরূপ বিহঙ্গমেরা অম্বরদেশ আশ্রয় করিয়া চলিতে লাগিল। শস্ত্রসমূহের দীপ্তিচ্ছটা যেন পরপ্রাণ অপহরণ করিয়া পাপে মলিন হইয়াই অপগত হইল। উল্মুকসমূহের অগ্নিশিখার ন্যায় শস্ত্রসঙ্ঘট্ট-জনিত জ্বলনসকল প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। বীররূপ বারিদবৃন্দ শরধারা-নিকর বর্ষণ করিতে করিতে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্রকচের ন্যায় ক্রূরতর হেতিসকল বীরগণের গাত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অবিরত খড়্গপ্রহারে অম্বরে পটপটারব উৎপতিত হইল। শস্ত্রানল-দীপে তমোরাশি আশু উপশান্ত হইয়া গেল। সেনাসকল গাত্রবিদ্ধ নারাচ-নিকরে যেন নব নব রোমশ হইয়া উঠিল। কবন্ধসঙ্ঘ-রূপ নটগণ যেন যম-রাজের যাত্রোৎসবে উত্থিত হইল। পিশাচীরা রণোৎসবের অলঙ্কাররূপিণী তরুণীর ন্যায় রণ-বিবরণ গান করিতে লাগিল। দন্তিগণের দন্তসঙ্ঘট্ট-জনিত টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইল। ক্ষেপণ ও পাষাণময়ী মহানদী সকল নভস্তলে প্রবাহিত হইল। অতিবাত-বিক্ষিপ্ত শুষ্ক বনপর্ণরাশির ন্যায় শব সকল পতিত হইতে লাগিল। প্রাণিগণের মরণ-বর্ষণে প্লাবিত রণাদ্রি হইতে শোণিতনদী সকল নির্গত হইতে লাগিল। শস্ত্রানলে তমোরাশির ন্যায় রুধিরপ্রবাহে পাংশুরাশি প্রশমিত হইল। যুদ্ধে তন্ময় হওয়ায় বীরগণের পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ নিবৃত্ত হইল। আপন আপন মরণ নিশ্চয় জানিয়া বহুপ্রাণী ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

তখন নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধারম্ভ হইল। সে যুদ্ধে আর কোন শব্দ বা সম্ভ্রম রহিল না। খড়্গসমূহের দীপ্তিচ্ছটা বিদ্যোতিত হওয়ায় ঐ যুদ্ধ নিবাত-নিষ্কম্প অম্বুবাহের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। শরসমূহ খদ-খদ রবে নির্গত হইতে লাগিল। ভুষণ্ডী সকল টকটকিত রবে পতিত হইল। মহাস্ত্র সকল ঝন্ ঝন্ রবে পরস্পর সম্মিলিত হইল। তখন তিমি-তিমি রবানুকারী রণস্থল অতি দুস্তর হইয়া উঠিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই ভয়াবহ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেই উভয় লীলা ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। লীলা-দ্বয় কহিলেন, হে দেবি! আপনি প্রসন্ন আছেন; তথাপি এই ঘোর সমরে আমাদের ভর্ত্তা বিদূরথ কি নিমিত্ত বিজয়ী হইতে পারিতেছেন না?

সরস্বতী কহিলেন,—হে পুত্রীদ্বয়! এই বিদূরথ-নৃপতির শত্রু সিন্ধু-রাজ এই যুদ্ধে জয়লাভার্থ বহুদিন আমাকে আরাধনা করিয়াছেন; কিন্তু ভূপতি বিদূরথ সেরূপ কোন কামনা করিয়া আমার আরাধনা করেন নাই। সেইজন্য সিন্ধুরাজই জয়লাভ করিতেছেন আর বিদূরথ পরাজিত হইতেছেন। আমি সর্ব্ব-প্রাণীর মনোমধ্যগত সম্বিৎ। যে ব্যক্তি যখন যেরূপে স্ব স্ব কামকর্ম্ম-বাসনার প্রভাবে আমাকে ফলদানে উন্মুখী করিয়া লয়, আমি সে সময়ে সত্বর তাহার সেই ফল বিধান করিয়া থাকি। আমার স্বভাবই এই যে, যে আমাকে যেরূপ কার্য্যে প্রেরণ করে, আমি তাহার সেই কার্য্যেরই ফলস্বরূপা হইয়া অবস্থান করি। আমার এই স্বভাব কখন অন্যথা হইবার নহে। দেখ, বহ্নির স্বভাব উষ্ণতার কি কখন ব্যত্যয় হইয়া থাকে? 'আমি মুক্ত হইব' এইরূপ কামনায় বিদূরথ আমাকে প্রতিভা-রূপে ভাবিত করিয়াছেন, তাই তাঁহার প্রতিভায় আমি মুক্তিবিধানকর্ত্রী হইয়াছি; সুতরাং তিনি অচিরেই মুক্ত হইবেন। আর বিদূরথের শত্রু সিন্ধু-রাজ 'আমি সংগ্রামে জয়ী হইব' এইরূপ কামনায় আমার আরাধনা করি-য়াছেন; সেইজন্য আমিও তাঁহার জয়দাত্রীরূপে সমুদিত হইয়াছি। অতএব বিদূরথ, দেহ-পরিত্যাগের পর তুমি ও ইনি এই উভয় ভার্য্যার সহিত কালক্রমে মুক্ত হইবেন এবং এই বিদূরথ-শত্রু বিজয়ী সিন্ধুরাজ ইঁহাকে নিহত করিয়া এতদীয় রাজ্যের অধিপতি হইবেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেবী সরস্বতী এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে তপনদেব যেন উভয় পক্ষীয় যোধগণের আশ্চর্য্য যুদ্ধ ব্যাপার দেখিবার জন্যই

উদয়াচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদূরথের শত্রুরূপী যে তমোরাশি সন্ধ্যাকালীন তারকা-নিকরের ন্যায় রাত্রিকালে রাক্ষস-পিশাচাদি ভূতবর্গকে স্বপক্ষীয় সৈন্যসমূহবৎ আবির্ভূত করিয়াছিল, তপনের প্রতাপে তাহারা তিরোহিত হইল। কন্দর, অম্বর, অদ্রি ও অবনীদেশ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্ধকার অপনীত হইলে বোধ হইল, এই ভুবন যেন কজ্জলাব্ধি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। কনক-নিষ্যন্দবৎ সুন্দর রবিরশ্মি সকল শৈলসমূহের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন রণক্ষেত্রে বীরেন্দ্রগণের গাত্রে রক্তচ্ছটা আসিয়া পতিত হইল। রণস্থল বীরগণের বাহুশ্রেণীতে ভ্রান্ত-ভুজগ-রাজির ন্যায় লক্ষিত হইল। ব্যোমতল দিবাকরের করনিকরে কাঞ্চনকান্তিতে পরিব্যাপ্ত হইল। পতিত ও উৎপতিত কুণ্ডলমণ্ডল দ্বারা যেন রত্নরাজি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। বীর-গণের পতিত বা পতনোন্মুখ শিরঃশ্রেণী পঙ্কজাবলীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। নিরন্তর আয়ুধনিচয়ের নিপাতনে রণস্থল যেন খড়্গী মৃগগণে পরিব্যাপ্ত হইল। শরসমূহ শলভ-শোভা ধারণ করিল। বিচ্ছুরিত রক্তপ্রভা যেন অবিচলিত সন্ধ্যা-কান্তিতে পরিণত হইল। শবসমূহ সমাধিমগ্ন সিদ্ধপুরুষের ন্যায় শোভিত হইল। নিপতিত হারশ্রেণী সর্প-নির্ম্মোকবৎ প্রতিভাত হইল। পতাকাপঙক্তি লতার ন্যায় বিলসিত হইল। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঊরু সকল তোরণ-কান্তি ধারণ করিল। ছিন্ন ভিন্ন হস্তপদাদি পল্লবাকারে প্রতিভাত হইল। শরসকল শরবনের আকার ধারণ করিল।

তখন রণস্থল শস্ত্রাংশুরূপ শাদ্বলে শ্যামায়মান হইল, পতিত শস্ত্র-সমূহে যেন কেতকীময় হইয়া উঠিল, আয়ুধজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া উন্মত্ত ভৈরবাকারে প্রতিভাত হইল এবং শস্ত্রসঙ্ঘট্ট-জনিত অনলচ্ছটায় প্রফুল্ল অশোকবন-শোভা ধারণ করিল। জলধি-গর্জ্জনবৎ ঘোর ঘুঙ্ঘুমশব্দে সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দও পলায়ন করিলেন। নবোদিত দিবাকর-করের ন্যায় সমুজ্জ্বল আয়ুধচ্ছটায় রণক্ষেত্র সুবর্ণময় নগরের ন্যায় প্রতিভাত হইল। প্রাস, শক্তি, চক্র, ঋষ্টি ও মুদ্গরাস্ত্রের নিনাদে অম্বরতল ধ্বনিত হইল। শোণিতনদীর প্রবাহবেগে শবসমূহ বাহিত হইতে লাগিল। ভুশুণ্ডী, শক্তি, কুন্ত, অসি, শূল ও পাষাণ সমূহে রণস্থল সঙ্কুল হইয়া উঠিল। শূল ও

শস্ত্রাঘাতে কবন্ধ সকল নানাস্থানে নিপতিত হইতে লাগিল। তাণ্ডবোন্মত্ত বেতালদল হলহলারব করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রণাঙ্গন জনশূন্য হইয়া পড়িল। তখন কেবল নরনাথ বিদূরথ ও সিন্ধুরাজের রথদ্বয় নভঃস্থিত রবিশশীর ন্যায় দীপ্তাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই উভয় নৃপতির উভয় রথই চক্র, শূল, ভুশুণ্ডী, ঋষ্টি, প্রাস ও অন্যান্য আয়ুধজালে সমাকুল। ঐ রথদ্বয়ের চারি পার্শ্ব সহস্র সহস্র বীরে পরিবৃত। রথদ্বয় গভীর নির্ঘোষে মণ্ডলগতিতে বিচরণশীল। উহাদের মহাচক্রের নিষ্পেষণে বহুলোক সচীৎকারে মৃত ও অর্দ্ধমৃত। উহারা মত্ত মাতঙ্গের গতি-লীলাক্রমে রক্তনদী মধ্যে ভাসমান। মৃত ব্যক্তিবর্গের কেশপাশ ঐ রক্তনদীর শৈবালদল এবং চক্র সকল উহার চক্রবাক ও জল-বিম্বিত ইন্দুমণ্ডল। রথচক্রের আঘাতে কত মৃত পতিত বারণগণ ঐ রক্তনদী দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। মণিমুক্তাসমূহের ঝনৎকারের ন্যায় রথকুবর হইতে আরাব উত্থিত হইতেছে। বাতাহত পতাকারাজি হইতে পটপটারব নির্গত হইতেছে। প্রচুরতর ভীরু সৈন্য লইয়া মহাবীরগণ কুন্ত, ধনু, শক্তি, প্রাস, শঙ্কু ও চক্র মাত্র ধারণপূর্ব্বক রথদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

অতঃপর সেই রথদ্বয় ক্ষণমধ্যে মণ্ডলাকার-গমনে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইলে, তথাস্থিত ভূপদ্বয় যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তাঁহারা নারাচাদি নানাবিধ শরধারা বর্ষণ ও পাষাণাদি নিক্ষেপ করিতে করিতে মত্ত অব্ধি ও মত্ত মেঘের ন্যায় পরস্পর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই দুই মর্ত্ত্য নরসিংহ পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, পাষাণ ও মুষলাকার বাণসকল ব্যোমতল সমাচ্ছাদিত করিল। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত বাণগণের মধ্যে কতকগুলি করবাল-বক্ত্র, কতকগুলি মুদ্গর-মুখ, কতিপয় শিতচক্র-বদন, কতকগুলি পরশু-বক্ত্র, কতকগুলি শক্তি-মুখ, কতকগুলি শূল ও শিলা-মুখ, কতকগুলি ত্রিশূল-বক্ত্র এবং কতকগুলি মহাশিলার ন্যায় স্থূলাকার।

রাম! ভূপতিদ্বয়ের শিলীমুখ সকল প্রলয়-পবন-পাতিত শিলা-সমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাজদ্বয়ের সেই সম্মিলন যেন প্রলয়-ক্ষুব্ধ সাগরসম্ভ্রমের ন্যায় প্রতিভাত হইল।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা বিদূরথ বল-গর্ব্বিত সিন্ধুরাজকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কল্পান্তকালের পবনাস্ফোট যেমন মেরুগিরির তটদেশ আস্ফালিত করে, সেইরূপ তিনি তখন দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধনুর্ম্মণ্ডল আস্ফালন করিতে লাগিলেন। বলদৃপ্ত বিদূরথ তূণীররূপ পদ্ম মধ্যে নিবদ্ধ শিলীমুখপরম্পরা তথা হইতে উত্তোলিত করিয়া শত্রু সিন্ধুরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন প্রলয়-সূর্য্য প্রখর কর-নিকর বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ধনুর্গুণ হইতে একটী মাত্র বাণ বিনির্গত হইয়া দেখিতে দেখিতে আকাশমণ্ডলে সহস্র সহস্র সংখ্যায় পরিণত ও পতন কালে লক্ষ লক্ষ রূপে আলোকিত হইতে লাগিল। সমরে সিন্ধুরাজেরও সামর্থ্য ও ক্ষিপ্রকারিতা বিলক্ষণ লক্ষিত হইল।

রাম! বিদূরথ ও সিন্ধুরাজ উভয়েই বরদাতা বিষ্ণুর বরে ধনুর্যুদ্ধে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পর নির্ম্মুক্ত মুষলাকার বাণ সকল প্রলয়কালীন বজ্রধ্বনিবৎ ভীষণ শব্দ করিয়া আকাশদেশ আচ্ছাদিত করিল। সুবর্ণময় নারাচাস্ত্র-নিচয় সশব্দে আকাশে উত্থিত হইয়া প্রলয়বায়ু-বিচালিত তারকারাজির ন্যায় পুনঃপুনঃ পতিত হইতে লাগিল। তখন সাগর হইতে তরঙ্গরাজির ন্যায়, সূর্য্য হইতে রশ্মি জালের ন্যায়, প্রচণ্ড পবন-চালিত মহাতরু হইতে পুষ্পরাশির ন্যায়, উত্তপ্ত আহত অয়ঃপিণ্ড হইতে কণাসকলের ন্যায়, বারিদ হইতে বারিধারার ন্যায়, নির্ঝর-নিকর হইতে শীকরসমূহের ন্যায় এবং সেই পুরদহনকারী অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ-সমষ্টির ন্যায় ভূপতি বিদূরথের প্রচণ্ড কোদণ্ড হইতে অজস্র শরসকল সম্পতিত হইতে লাগিল।

তৎকালে সেই নৃপতিদ্বয়ের কোদণ্ড হইতে উত্থিত চটচটা শব্দ শ্রবণ করিয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরাই নির্ব্বাক্ হইল ও প্রশান্ত সাগরের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করিল। বিদূরথ-কর-নিক্ষিপ্ত শরনিকর প্রলয়-পবনের

ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর শব্দে সিন্ধুর অভিমুখে গঙ্গাপ্রবাহবৎ নভোদেশে প্রধাবিত হইয়া পশ্চাৎ সিন্ধুরাজের দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। তদীয় ধনুর্ম্মণ্ডলরূপ মেঘমণ্ডল হইতে অনবরত কনক-ময় নারাচনিচয় ও অপরাপর শর সকল শর শর শব্দে বর্ষিত হইতে লাগিল।

তখন সেই পুরবাসিনী লীলা বাতায়ন-বিবর দিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বামীর বাণরূপ মন্দাকিনীপ্রবাহ সিন্ধুবৎ সিন্ধুরাজের দিকে যাই-তেছে। সেই বাণপরম্পরা দেখিয়া লীলা স্বীয় ভর্ত্তার জয়াশা করিলেন। আনন্দে তাঁহার মুখপঙ্কজ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—দেবি! আপনার জয় হউক; ঐ দেখুন, ভর্ত্তা আমাদের বিজয়ী হইতেছেন। অধিক কি, তিনি যে এই শরজাল নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে সুমেরুশৈলও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

বিদূরথপত্নী লীলা প্রগাঢ় স্নেহভরে আকুল হইয়া এইরূপ কথা কহিতে লাগিলে, সেই যুদ্ধদর্শনার্থ ব্যগ্রচিত্ত দেবীদ্বয় তাহার কথায় মনে মনে হাস্য করিলেন। ইত্যবসরে সিন্ধুরাজরূপ বাড়বানল শর-সন্তাপরূপ অগস্ত্য দ্বারা বিদূরথ-বিক্ষিপ্ত অনন্ত শরসাগর সহসা পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিন্ধু-রাজ বাণ-বর্ষণে বিদূরথরাজের বাণরূপ মহামেঘ-মালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলির আকারে পরিণত করতঃ গগন-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। যেমন দীপ নির্ব্বাপিত হইলে সে দীপ কোথায় যায়, তাহা জানা যায় না, সেইরূপ সেই বাণগণ কোথায় গেল, বুঝা গেল না। সিন্ধুরাজ সবলে শত শত শর-সমাচিত শত্রুপক্ষীয় সায়কধারা সকল ছেদন করিয়া ব্যোমমণ্ডলে বহুবাণ নিক্ষেপ করিলেন। কল্পান্তকালীন পবন যেমন সাধারণ মেঘখণ্ড সকল অনায়াসে সঞ্চালিত করে, বিদূরথ রাজা সেইরূপ শত্রু-পক্ষের সমস্ত শর উত্তম উত্তম শর বর্ষণে নিরস্ত করিলেন। উভয় ভূপতিই এইরূপে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই প্রতীকার-পরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের শর-পরম্পরা ব্যর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিন্ধুরাজ কোন এক গন্ধর্ব্বের সহিত মিত্রতা করিয়া মোহনাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে একমাত্র বিদূরথ ব্যতীত অপরাপর সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইল। মোহগ্রস্ত যোধগণের পরিধান বসন খসিয়া পড়িল,

অস্ত্রশস্ত্র বিপর্য্যস্ত হইল, বদন ও ঈক্ষণ বিষাদে ম্লান হইল এবং তাহাদের মুখ দিয়া আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহারা মৃতের ন্যায় অথবা চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতিভাত হইল। বিদূরথ ভিন্ন অন্যান্য যোধগণ যে মুহূর্ত্তে মোহগ্রস্ত হইল, বিদূরথ সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের মোহ অপনয়নের জন্য প্রবোধাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর প্রভাতকালীন সরোজিনীর ন্যায় বিদূরথের সেনাশ্রেণী অবিলম্বে প্রবোধ প্রাপ্ত হইল। তখন, পুরাকালে মন্দেহ-নামধেয় রাক্ষসের প্রতি দিবাকর যেমন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সিন্ধুরাজ সেইরূপ বিদূরথ নরপতির প্রতি সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পাশবৎ বন্ধনকারী ভীষণ নাগাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবামাত্র পর্ব্বতপ্রতিম শত শত ভুজঙ্গম দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। সরোবরে যেমন মৃণালদল শোভিত হয়, ভুজঙ্গগণ ভূমিতলে সেইরূপ বিরাজ করিতে লাগিল। সমস্ত পর্ব্বতপ্রদেশ তৎকালে কৃষ্ণসর্পে সমাচ্ছাদিত হইল। সমস্ত বস্তু তীব্র বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। পর্ব্বত, অরণ্যানী, পৃথিবী, সমস্তই বিষাবেশে বিবশ হইয়া পড়িল। বহ্নিশিখা-সদৃশ রূক্ষ উষ্ণ নীহারসম্পৃক্ত সমীরণ, বিষ-জনিত বৈষম্য প্রকাশিত করত ভস্মাঙ্গার বর্ষণপুরঃসর প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন মহাস্ত্রবেত্তা বিদূরথ গরুড়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রপ্রভাবে সহসা চতুর্দ্দিকে অদ্রিতুল্য গরুড় সকল উড়িতে লাগিল। ঐ গরুড় সকল দেহপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল কাঞ্চনীকৃত করিয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। তাহাদের পক্ষরূপ পর্ব্বতের প্রচণ্ড সঙ্ঘট্টনে যেন প্রলয়-পবন আবির্ভূত হইল এবং নাসিকা হইতে নির্গত বায়ুবেগে সর্পসমূহ সমাকৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। গরুড়গণের উৎকট ঘুর ঘুর রবে সমুদ্র পর্য্যন্ত পরিপূরিত হইল। অগস্ত্য যেমন সাগর-সলিল পান করিয়াছিলেন, গরুড়গণ সেইরূপ ভূ-ব্যাপ্ত সর্পদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। পৃথিবী তখন সর্পাবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পূর্ব্বশোভা ধারণ করিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন বসুন্ধরা বরাহকর্ত্তৃক সমুদ্ধৃত হইয়া জলপ্লাবন হইতে নির্গত হইল। পবনপ্রবাহে দীপ যেমন নির্ব্বাপিত হয়, শরদাগমে মেঘ যেমন পলায়ন করে, বজ্রভয়ে পক্ষবান্ পর্ব্বতগণ যেমন

লুকায়িত হয় এবং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ ও সংকল্প-কল্পিত নগরাদি যেমন জাগ্রদবস্থায় তৎক্ষণমাত্রেই বিলয় পাইয়া যায়, সেইরূপ সেই গরুড় সকল তখন কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল!

তখন সিন্ধুরাজ ঘন ঘোর অন্ধকারজনক তামসাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে অতীব কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারপুঞ্জ আবির্ভূত হইল। ঐ অন্ধকার ভূতল ও নভস্তলের অন্তরালে ভূগর্ভবৎ প্রতিভাত হইল। সর্ব্বত্রেই অন্ধকার; সর্ব্বত্রেই একার্ণবাকার। সেনা সকল এই একার্ণবের মৎস্য-পরম্পরা এবং তারকা-নিচয় উহার মণিরাজি। ঐ অতীব সান্দ্র অন্ধকার দর্শনে বোধ হইল, দিঙ্মণ্ডল যেন কৃষ্ণবর্ণপঙ্কে মগ্ন হইল অথবা অঞ্জনাদ্রির উপাদানীভূত রেণুরাজির সহিত সমুদ্ভূত প্রলয়-পবনে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। লোক সকল যেন অন্ধকূপে পতিত হইল। তখন মনে হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকের ব্যবহার-পরম্পরা যেন কল্পান্তে শান্ত হইয়া গেল।

এদিকে মন্ত্রজ্ঞগণের অগ্রণী ভূপতি বিদূরথও ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের প্রদীপ-স্বরূপ মার্ত্তণ্ড অস্ত্র আবির্ভূত করিয়া বিনা মন্ত্রণায় সেই মুহূর্ত্তেই জগতের যাবতীয় চেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর নির্ম্মল শরৎকাল যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডল পান করে, তেমনি সেই সূর্য্যরূপী অগস্ত্য স্বীয় কর প্রসারিত করিয়া সমগ্র অন্ধকার-সাগর পান করিয়া ফেলিলেন। সুন্দর পয়োধর-শালিনী কামিনী যেমন ভূপতির অগ্রে সুশোভিত হয়, তেমনি তখন সেই রম্য পয়োধরবতী নির্ম্মল দিক্ সকল অন্ধকাররূপ বসন-বিরহিত হইয়া রাজসমীপে বিরাজিত হইল। তৎকালে নিখিল বনরাজির অভ্যন্তর ভাগ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যেন সাধুপুরুষের বুদ্ধি লোভরূপ কজ্জল-জাল হইতে মুক্ত হইল।

অনন্তর সিন্ধুরাজ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়জনক মন্ত্রময় রাক্ষসাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন নানাদিক্ হইতে দলে দলে তীক্ষ্ণস্বভাব ভীষণ বন-রাক্ষসেরা আবির্ভূত হইল। তাহাতে বোধ হইল, যেন মহার্ণব সকল পাতল-তলস্থ দিগ্‌গজগণের ফুৎকারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ঐ রাক্ষসগুলির দীর্ঘ দীর্ঘ জটাজাল কপিলবর্ণ এবং কাহারও কাহারও জটা ধূম্রবর্ণ। উহাদিগের লম্বমান দীর্ঘ জিহ্বা সকল যেন সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য বহির্গত

হইতে লাগিল। ঐ রাক্ষসেরা ভীষণ লিলিহান জিহ্বাযুত আর্দ্র ইন্ধনদাহী অগ্নিসমূহের ন্যায় চটচটারব করত ধূম্রাকারে লক্ষিত হইতে লাগিল। পুরদহন কালে হুতাশনের নিবিড়তর ধূমপুঞ্জ যেমন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ সর্ব্বদিক্ অন্ধকারে আবৃত করিয়া উহারা কঠোর চিৎকার করিতে করিতে নভোমণ্ডলে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিল। উহাদের মুখমণ্ডল দংষ্টারূপ মৃণালদলে পরিব্যাপ্ত, চক্ষুরাদি পঙ্কে পরিলিপ্ত এবং দেহ কর্দ্দমাক্ত ও লোমরূপ শৈবালদলে সমাচিত। অতএব উহারা যেন তখন অসংস্কৃত অতি প্রাচীন জলাশয়তটের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। উহাদের জটাজাল তড়িৎপুঞ্জবৎ প্রতিভাত হইল। উহারা যেন সজল জলদজালের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে ধাবিত হইল। মনে হইল, ঐ রাক্ষসরূপ জলধরগণ যেন জগৎ গ্রাস করিবার জন্যই উদ্ভূত হইয়াছে।

তখন লীলানাথ বিদূরথ সেই দুষ্টপ্রকৃতি ভূতবৃন্দকে নিবারিত করিবার জন্য নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাপ্রভাব অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র রাক্ষসাস্ত্র সকল প্রশমিত হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন প্রভাকর-করে অন্ধকারনিচয় নিঃশেষিত হইল! শরদাগমে জলদজাল অপনীত হইলে নভোমণ্ডল যেমন নির্ম্মলাকার ধারণ করে, রাক্ষসদল অপসৃত হইলে ত্রিভুবন তেমনি নিরুপদ্রব হইয়া শান্তিতে পরিণত হইল।

অনন্তর সিন্ধুরাজ আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। তাহাতে অম্বরদেশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং প্রলয়-পাবকে দগ্ধ হইবার ন্যায় দিক্সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ধূমপুঞ্জরূপ জলদভারে সর্ব্বদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। মনে হইল, যেন পাতালতল-নিবদ্ধ তিমিররাশি আসিয়া দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার করিল। তখন জ্বলিতগাত্র গিরিসকল যেন কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিল। অথবা সমগ্র পর্ব্বত প্রদেশ যেন ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রফুল্ল চম্পক-বনে পরিপূরিত হইল। আকাশ, অদ্রি ও দিক্সকল অগ্নির জ্বালামালায় সমাকুল হইয়া রক্তপ্রভা ধারণ করিলে মনে হইল ঐ সকল যেন মৃত্যুর উৎসব-ব্যাপারের কুঙ্কুমাক্ত মাল্যরাশি সুশোভিত হইতেছে। ভূতল, নভস্তল সর্ব্বত্রই প্রজ্বলিত পাবকে পরিব্যাপ্ত হইল। লোক সকল শঙ্কিত হইয়া মনে করিল,

বুঝি সাগরের বাড়বানল সহস্র সহস্র জলযানে পরিচালিত হইয়া সর্ব্বত্র অগ্নিময় করিয়া তুলিল।

তৎকালে বিদূরথ আগ্নেয়াস্ত্র প্রশমিত করিয়া যাহাতে সত্বর শত্রু সংহার করা যায়, এরূপ ভাবে অর্চ্চনাপুরঃসর বরুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন তমস্তোমের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ হইতে সলিলরাশি সমাপতিত হইল। মনে হইল, যেন অধঃ ও ঊর্দ্ধ দিক্ হইতে অদ্রি সকল দ্রবাকারে পরিণত হইয়া পতিত হইতে লাগিল, শর-সমাচিত অম্বরপথে অম্বুদগণ যেন বদ্ধগতি হইল, মহার্ণব সকল যেন ঊর্দ্ধে উঠিল, কুলশৈলসমূহের শিলা সকল ও তমালতরুর বনরাজি যেন উড়িতে লাগিল, সমস্ত সময় যেন রাত্রিময় হইয়া উঠিল, লোকালোক পর্ব্বতের তটদেশ হইতে যেন কজ্জলরাশি উদ্ভূত হইল এবং রসাতলগত গুহাসকল যেন মহা-ঘুর-ঘুর রবে সবেগে স্ফীতমূর্ত্তি হইয়া ব্যোমমণ্ডল দেখিবার জন্যই আগমন করিল।

এই সময় কৃষ্ণপক্ষীয় রজনী যেমন অতিশীঘ্র সন্ধ্যাকাল অপনীত করে, সেইরূপ সেই ভুবনব্যাপিনী জলধারা মুহূর্ত্তে সেই অগ্নিরাশি প্রশমিত করিয়া ফেলিল। নিদ্রা যেমন প্রথমে নয়নে আসিয়া পরে সর্ব্বাঙ্গ পরি-ব্যাপ্ত ও অবসাদগ্রস্ত করে, তেমনি সেই সলিলসমৃদ্ধি অগ্রে অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত করিয়া ক্রমশঃ সকল ভূভাগ প্লাবিত করিল। এইরূপে বিরুদ্ধ-অস্ত্রবিদ্‌গণ উত্তরোত্তর বিবিধ অস্ত্রমোহ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্র পরস্পর মিথ্যা বা মায়াময় হইলেও জনগণ উহার শত্রু-ধ্বংসনাদি নানা ফল দর্শন ও অনুভব করিতে লাগিল। বিদূরথ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সলিলাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সিন্ধুরাজের অস্ত্রশস্ত্র, সেনা, সেনাপতি ও রথাদি বল-বাহন তৃণরাশির ন্যায় ভাসিয়া চলিল।

ইত্যবসরে সিন্ধুরাজ শোষণাস্ত্র স্মরণ করিলেন এবং অবিলম্বে আপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহা শররূপে নিক্ষেপ করিলেন। ভাস্করের অভ্যুদয়ে নিশার যেমন অবসান হয়, তেমনি সেই শোষণাস্ত্রে জলময়ী মায়া বিলীন হইল। যাহারা মরিয়াছিল, তাহারা মরিয়াই রহিল; অধিকন্তু এই শোষণাস্ত্রে সমগ্র ভূভাগ শুষ্ক হইতে লাগিল। অনন্তর ক্রোধ যেমন

মূর্খকে সন্তাপিত করে, সেইরূপ সেই অস্ত্রতাপ প্রজামণ্ডলীকে পরিতাপিত করিয়া শুষ্ক পর্ণসমাকীর্ণ বনবিস্তারে কর্কশ হইয়া উঠিল। তৎকালে সেই কনক-নিষ্যন্দবৎ প্রভা-পরিব্যাপ্ত অস্ত্রতাপ রাজরমণীগণের অঙ্গরাগের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সিন্ধুরাজের বিপক্ষসৈন্যেরা তৎ-প্রভাবে নিদাঘ-কালীন দাবদগ্ধ মৃদু পল্লবদলের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত-দেহে মূর্চ্ছিত হইল।

এই সময় বিদূরথ ধনুর্গুণে টঙ্কার দিয়া কোদণ্ড কুণ্ডলীকৃত করিলেন এবং অবিলম্বে শত্রুসৈন্যের প্রতি পর্জ্জন্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তৎপ্রভাবে জলভর-মন্থর তমালবনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সমগ্র জগৎ অন্ধকারে আবৃত করিল। দেখিয়া মনে হইল, যেন একত্র বহুরাত্রির সমাবেশ ঘটিল। ঐ জলভারানত মেঘ সকল ভয়ঙ্কর গর্জ্জন-পুরঃসর মন্দ মন্দ পরিভ্রমণ করত সমগ্র দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল। সীকর ও নীহারভারে সুখস্পর্শ সমীরণ সেই মেঘাড়ম্বর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। তখন সুবর্ণবর্ণ সর্প-নিঃসরণের ন্যায় বিদ্যুৎ-পুঞ্জ স্বর্গীয় কামিনীগণের কটাক্ষ-বিক্ষেপবৎ বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। ঐ মেঘমণ্ডল রোষপ্রচলিত মাতঙ্গ, সিংহ ও ভল্লুক প্রভৃতির ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর গর্জ্জন করত দুর্গম শৈলকন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া সমগ্র দিক্ আপূরিত করিল। মহামুষল-ধারায় অবিরাম জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কৃতান্তের কঠোর দৃষ্টির ন্যায় ঐ জলধারা কষ্টকর করকাপাতের টঙ্কারে কঠিন হইয়া উঠিল। এই অম্বুদবৃন্দের যুদ্ধে পাতালতল হইতে অনলবৎ উষ্ণবাষ্প সমুত্থিত হইল।

অনন্তর আত্মসাক্ষাৎকাররূপ আনন্দ-রসের প্রবাহে যেমন সংসার-বাসনা তিরোহিত হয়, তেমনি নিমেষমধ্যেই আতপতাপ প্রশমিত হইয়া গেল। সমগ্র ভূমণ্ডল পঙ্কজালে পরিব্যাপ্ত হইল। তাহাতে জনগণের গমনাগমন অসম্ভব হইয়া উঠিল। জলধারায় সিন্ধু যেমন, তেমনি সেই সিন্ধুরাজ মেঘাস্ত্রের বারিধারায় আচ্ছন্ন হইলেন।

এইবার সিন্ধুরাজ বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে আকাশ-কোটর পরিপূর্ণ হইল এবং ঐ বায়ুব্যূহ যেন কল্পান্তকালীন মৃত্যোন্মত্ত

ভৈরবের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিল। জনগণ ঐ বায়ুপ্রবাহে অশনি-পাতবৎ পীড়িতাঙ্গ হইল। শিলাখণ্ড সকল দলিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু তখন প্রলয়কাল সূচনা করিয়া ভটগণের শিলাঘাত-জনিত ধ্বনির সহিত টঙ্কযুত হইয়া প্রবাহিত হইল।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎকালে সেই নীহারকণবাহী বায়ু প্রবাহিত হইলে বনপল্লব সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বৃক্ষরাজি কম্পিত হইতে লাগিল। পাংশুরাশি অবলীলাক্রমে লোকসকলের শিরোভূষণরূপে বিরাজ করিল। বৃক্ষগণ পক্ষিবৎ আকাশে ঘূর্ণিত হইল। যোধগণ পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। অট্টালিকাশ্রেণী চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং অভ্রপটল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর বেগবতী নদী যেমন জীর্ণ শীর্ণ পল্লবদল বহন করে, সেইরূপ সেই প্রচণ্ড সমীরণ কর্ত্তৃক বিদূরথরাজের রথও বাহিত হইল। তখন মহাস্ত্রনিপুণ বিদূরথও পর্ব্বতাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, ঐ অস্ত্র যেন মেঘজলের সহিত ব্যোমমণ্ডল গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইল। তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষণে চৈতন্যের মায়ালক্ষণ কারণ শান্তি হইয়া গেলে বিরাট-প্রাণ সমীরণ যেমন শান্ত হয়, তেমনি সেই পর্ব্বতাস্ত্রে প্রতিহত হইয়া প্রচণ্ড বায়ু শমতা প্রাপ্ত হইল। বায়ুবেগে অন্তরীক্ষগত বৃক্ষসকল কোটি কোটি কাকের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠস্থিত নানাজাতীয় শবসমূহোপরি পতিত হইল। চারি দিক্ হইতে যে সকল পুর, গ্রাম, বন ও বল্লী প্রভৃতির সূৎকার, লুণ্ঠননাদ, ভাঙ্কার ও উৎকার উত্থিত হইতেছিল, নিরর্থক বাক্যের ন্যায় তৎসমস্ত তখন নিবৃত্ত হইয়া গেল।

অনন্তর সাগর যেমন উৎপক্ষ মৈনাকাদি শৈলগণকে নিজের উপর

উৎপতিত হইতে দেখিয়াছিল, সিন্ধুরাজ সেইরূপ আকাশ হইতে গিরিসমূহকে ইতস্ততঃ পতিত হইতে দেখিলেন। তখন তিনি প্রদীপ্ত বজ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বজ্র সকল প্রচলিত হইল। অনল যেমন ইন্ধনরাশি গ্রাস করে, বজ্রগণ সেইরূপ শৈলেন্দ্ররূপ অন্ধকারপুঞ্জ পান করিল। প্রচণ্ড পবনপ্রবাহে তরু হইতে ফলসকলের ন্যায় ঐ বজ্রাস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বতগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ভূপতি বিদূরথ এইবার বজ্রাস্ত্র নিবারণের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাস্ত্র এবং বজ্রাস্ত্র উভয়ই এককালে প্রশান্ত হইয়া গেল।

অতঃপর সিন্ধুরাজ অন্ধকারময়ী রজনীর ন্যায় প্রগাঢ় শ্যামবর্ণ পিশাচাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে অতীব ভয়াবহ পিশাচদল আবির্ভূত হইল। সন্ধ্যা সমাগমে দিবস যেমন শ্যামবর্ণ হয়, এক্ষণে পিশাচভয়েই যেন দিবস সেইরূপ শ্যামবর্ণ হইল। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ন্যায় পিশাচ সকলে সমগ্র ভুবন ভরিয়া গেল। পিশাচদল অসংখ্য দগ্ধ স্তম্ভের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাহারা তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদের আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর হইলেও তাহারা কাহারও হস্তগ্রাহ্য হইল না। এই সকল পিশাচ মধ্যে কেহ কেহ কৃশাঙ্গ, কেহ কেহ শ্মশ্রুল, কেহ কেহ কৃষ্ণাঙ্গ, কেহ কেহ দরিদ্র জনের ন্যায় মলিনাঙ্গ, কেহ কেহ আকাশচারী, কেহ কেহ ঊর্দ্ধকেশ, কেহ কেহ ভীতিগ্রস্ত, কেহ কেহ মুগ্ধদৃষ্টি, কেহ কেহ চঞ্চলপ্রকৃতি, কাহারও কাহারও হস্তে অস্থি ও কপালাদি, কেহ কেহ দৈন্যগ্রস্ত, কেহ কেহ বজ্র ও অসিধারী, কেহ কেহ ক্রূরপ্রকৃতি এবং কেহ কেহ গ্রাম্য জনের ন্যায় দীনভাবাপন্ন। এই পিশাচেরা রথ্যা, কর্দ্দম, শূন্যগৃহ ও ও বৃক্ষাদির উপর অবস্থান করিতে অভ্যস্ত। উহাদের সৃক্কণী সকল বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, আকৃতি প্রেতবৎ ভয়াবহ ও কৃষ্ণবর্ণ। এই সকল পিশাচেরা উন্মত্ত হইয়া হতাবশিষ্ট শত্রুসৈন্য সকল গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তখন বিদূরথের সৈনিকদল ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষুব্ধচেতন হইয়া পড়িল। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ও চর্ম্ম বর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। তাহাদের প্রাণ ত্রাসান্বিত ও গতি অতি স্খলিত হইতে লাগিল। হস্ত, পদ, নেত্র, বক্ত্র ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শনে তাহাদিগকে ভূতাবিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। পিশাচদল

কৌপীন বসন পরিত্যাগ করিল এবং কেহ কেহ ঊর্দ্ধ ও অধো ভাগের অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ পিশাচ দল যৎকালে রাজা বিদূরথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, তখন সেই বিচক্ষণ রাজা সেই পৈশাচী মায়া বুঝিতে পারিলেন। ভূপতি পূর্ব্ব হইতেই পিশাচ-সংগ্রামকরী মায়া জানিতেন; তিনি সেই মায়া দ্বারা পিশাচসৈন্যকে পরসৈন্যে নিযুক্ত করিলেন। তখন বিদূরথের স্বপক্ষীয় সৈন্যদল কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল। ওদিকে পরপক্ষীয় যোধগণ পিশাচাবিষ্ট হইয়া পড়িল। অনন্তর বিদূরথ ক্রোধভরে ঐ পিশাচ-সৈন্যের সাহায্য করিবার জন্য অন্য এক পূতনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধ-মূর্দ্ধজ-বিশিষ্ট পূতনারা দলে দলে ভূতল ও ব্যোমতল হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ পূতনাগণের করাল নয়ন কোটরমগ্ন। উহারা চলিতে লাগিলে উহাদের গতিবেগে পয়োধর ও নিতম্ববিম্ব কম্পিত হইতে লাগিল। উহাদের কতকগুলি নবযৌবনা, কতকগুলি বৃদ্ধা, কতকগুলি পীবরাঙ্গী এবং কতকগুলি জীর্ণাকৃতি। ঐ সকল পূতনার জঘনদেশ মণ্ডলাকার, নাভিমণ্ডল বিকটাকার এবং যোনিমণ্ডল বিস্তৃতাকার। উহারা হস্তে করিয়া রুধির ও নরমুণ্ড সকল ধারণ করিতেছিল। উহাদের দেহপ্রভা সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণবর্ণ। উহারা সশব্দে রুধির পান ও মাংস চর্ব্বণ করিতেছিল। উহাদের সৃক্ক হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত মাংস-শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদাই চেষ্টাশীল। উহারা সর্ব্বপ্রকার উন্নত বস্তু অবনামিত করিতে সমর্থ। উহাদের বক্ত্র, ঊরু, কটি, পার্শ্ব ও কর প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শিলার ন্যায় কঠিন এবং ভুজঙ্গবৎ বক্র। শিশুগণের মৃতদেহ উহাদের গল-বিলম্বিত নরমালা। উহারা হস্ত দ্বারা শবদেহের অন্ত্রসকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের বদন কুক্কুর, কাক ও উলূকের ন্যায় এবং বক্ত্র, হনু ও উদর, অতীব নিম্ন।

তখন পূতনারা, দুর্ব্বল ও দুর্নীতিপরায়ণ শিশুদিগের ন্যায় উল্লিখিত পিশাচদিগকে পতিত্বে বরণ করিল। এই সময় পিশাচ ও পূতনা-

সৈন্য একত্র মিলিয়া গেল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের কর ধারণ করিয়া ধাবিত হইল এবং নৃত্য ব্যাপারে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উন্নত বদন, নয়ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ঘূর্ণন করিতে লাগিল। উহাদের দীর্ঘ দীর্ঘ জিহ্বা সকল নিষ্কাশিত হইল। উহারা নানাবিধ মুখভঙ্গী করিতে লাগিল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রীতির জন্য ধরাধরি করিয়া রাশি রাশি শব আহরণ করিল। উহারা রুধিরজলে বারম্বার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হওয়ায় উহাদের গাত্র বহিয়া রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। পিশাচ ও পূতনা দল সকলেই লম্বোদর, লম্বহস্ত, লম্বকর্ণ ও লম্বনাসিক। উহারা তখন রক্ত-মাংসময় মহাপঙ্কে মগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন দান অভ্যাস করিতে লাগিল।

তৎকালে মন্দর-মথিত দুগ্ধাব্ধির ন্যায় ঘোর কলকল নাদ উত্থিত হইল। রাজা বিদূরথ সিন্ধুরাজের প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ মায়াসঞ্চার করিয়াছিলেন, সিন্ধুরাজ তাহা বিদিত হইয়া সত্বর তাহার নিবারণকল্পে বেতালাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বেতালাবেশে সঞ্চলিত হইয়া বহুসংখ্যক শব সমুত্থিত হইল। ঐ শবসমূহের মধ্যে কতকগুলি শব মস্তক-বিশিষ্ট এবং কতকগুলি মস্তক-বিহীন। অনন্তর পিশাচ, বেতাল ও পূতনা প্রভৃতি একত্র সম্মিলিত হইল; তাহাতে মনে হইল যেন সেই ভীষণ সৈন্যদল সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিতেও সক্ষম।

ইত্যবসরে ভূপতি বিদূরথ সিন্ধুরাজ-প্রেরিত মায়ার সংহার সাধন করিয়া তৎপ্রতি ত্রিলোকগ্রাসদক্ষ রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন সর্ব্বদিক্ হইতে পর্ব্বতাকার স্থূলদেহ রাক্ষসসকল আবির্ভূত হইল। মনে হইল, যেন নরক-নিচয় দেহ ধারণপূর্ব্বক পাতালতল হইতে নিক্রান্ত হইল। সেই ভীষণ সৈন্যদল আবির্ভূত হইয়া সুরাসুরগণেরও ভয় উৎপাদন করিতে লাগিল। গর্জ্জন-পরায়ণ রাক্ষসদিগের ঘোর নির্ঘোষরূপ বাদ্যধ্বনির সহিত কবন্ধগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসদল মেদ ও মাংস চর্ব্বণে নিরত এবং রুধিররূপ আসবপানে উন্মত্ত। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে কুষ্মাণ্ড, বেতাল ও যক্ষদল মত্ত হইয়া প্রচণ্ড তাণ্ডব করিতে লাগিল। কুষ্মাণ্ডগণের উদ্ভট তাণ্ডবকালীন শোণিত তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। তাহাতে ভূতগণ

সিক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালীন শ্যামল ঘনঘটার ন্যায় রঞ্জিত হইল। বোধ হইল, উহারা যেন সেনাসাগরের শোণিত-স্রোতে নিবদ্ধসেতু হইয়া রহিল।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎকালে সেই বিষম সংগ্রাম-সম্ভ্রম সমুপস্থিত হইলে উদারবীর্য্য সিন্ধুরাজ অত্যধিক ধৈর্য্য সহকারে স্বীয় সৈন্য রক্ষা ও পরসৈন্য বিনাশার্থ কালরুদ্রবৎ সংহারকারী অস্ত্রশ্রেষ্ঠ অসাধারণ বৈষ্ণবাস্ত্র স্মরণ করিলেন। অনন্তর এক ভীষণ শর বৈষ্ণবাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বিপক্ষাভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই শরের ফলাপ্রান্ত হইতে উল্মুকাদি বিবিধ অস্ত্র নির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে নিপতিত সংখ্যাতীত নিশিত চক্রনিচয় শত শত সূর্য্য-সমুদ্ভাসিত দিক্তটের ন্যায় প্রতীত হইল। নির্গত গদারাজি গগনতলে শত শত বংশদণ্ডবৎ প্রতিভাত হইল। শতধার বজ্রসকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া অম্বর যেন তৃণ-নিচয়ে পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিল। পদ্ম-মুকুলাকার বহুশাখা-সমন্বিত পট্টিশসমূহ প্রসর্পিত হইয়া আকাশতল যেন ছিন্ন পাদপে পরিপূরিত করিল। শিতধার শরসমূহে অম্বরতল যেন কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত হইল। শ্যামলাঙ্গ খড়্গ সকল সঞ্চালিত হওয়ায় গগন যেন পত্ররাশিতে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর রাজা বিদূরথ বৈষ্ণবাস্ত্র প্রশমনার্থ শত্রুর পরাক্রমানুরূপ অপর এক বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে শত্রুপক্ষীয় অস্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া এক ভয়াবহ শস্ত্রনদী প্রাদুর্ভূত হইল। শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশপ্রভৃতি ঐ শস্ত্রনদীর সলিলাকরে প্রবাহিত হইল। তখন গগনতলে সেই শস্ত্রাস্ত্রনদীর বিষম সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই সঙ্ঘর্ষের ফলে দ্যাবাপৃথিবী নীরন্ধ্র হইয়া উঠিল। কুশশৈল সকল বিদারিত হইতে লাগিল। শর হইতে পতিত শূল, অসি ও খড়্গাঘাতে পট্টিশ

সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। মুষল সকলের পতনে এবং প্রাস ও শূল-সমূহের সঙ্ঘট্টনে শক্তিসকল শাতিত হইতে লাগিল। মুদ্গররূপ মন্দরাচল শররূপ সাগরমন্থনে মত্ত হইল। দুর্ব্বার অস্ত্রধারী যোদ্ধার ন্যায় অসিসকল গদার অগ্রভাগে সঙ্ঘট্টিত হইতে লাগিল। স্বপক্ষীয় সৈন্য সংহাররূপ অরিষ্ট প্রশমনার্থ কুন্তাস্ত্ররূপ ইন্দুমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রাসাস্ত্র সকল জন-বিনাশোদ্যত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় প্রসর্পিত হইল। সর্ব্বায়ুধ-বিধ্বংসী ঊর্দ্ধগামী অস্ত্রসকল চক্রাস্ত্রনিচয়ে কুণ্ঠিত ও খণ্ডিত হইল। শস্ত্রাস্ত্রসমূহের সঙ্ঘর্ষ-জনিত মহাশব্দে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ স্ফুটিত হইল এবং শস্ত্রাঘাতে কুলশৈল সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। আমি যেমন বিশ্বামিত্রাস্ত্র নিবারণার্থ সচেষ্ট হইয়াছিলাম, সেইরূপ পরস্পর যুধ্যমান উভয় নারায়ণাস্ত্র হইতে নির্গত বজ্রদ্বারা পর্ব্বতসকল জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। শূল ও শিলাসমূহের সূৎকার-শব্দ শঙ্খশব্দে পরাভূত হইল। ভুশুণ্ডী বর্ষণে উদ্দণ্ড ভিন্দিপাল সকলের অগ্রভাগ হতপ্রভাব হইল। সর্ব্ব-সংহারক রুদ্রের ন্যায় এক এক আয়ুধ, রুদ্রের শূলসদৃশ এক এক শূলাঘাতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। নির্গমনমাত্র খণ্ডিত আয়ুধ সকল কুটিল ও বিষমগমনে পতিত হইয়া শত্রুসৈন্যের গতি প্রতিহত করিতে লাগিল। উহাদের সুস্পষ্ট চটচটাস্ফোটে আকাশগঙ্গার প্রবাহবেগ রুদ্ধ হইল। চূর্ণীকৃত অস্ত্রশস্ত্রের সমষ্টি দ্বারা আকাশপথ যেন মহাধূমজালে আবৃত হইল। আকাশে অস্ত্রসমূহের পরস্পর সঙ্ঘট্ট বশতঃ নির্গত অগ্নিশিখা বিদ্যুতের ন্যায় বিস্ফুরিত হইল। উহাদের সঙ্ঘট্ট শব্দে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ স্ফুটিত এবং আঘাতে কুলাচল সকল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল।

তৎকালে সিন্ধুরাজ বিদূরথের সৈন্যবল অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বিদূরথ ভীষণ বজ্রধ্বনির ন্যায় ঘোরনাদে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই অস্ত্রতেজে শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় সিন্ধুরাজের রথসহ সৈন্যদল দগ্ধ হইতে লাগিল। আকাশে আর অবকাশ রহিল না; অস্ত্রে শস্ত্রে সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এক রাজা সসন্নাহ প্রাবৃটের ন্যায় এবং অপর রাজা পয়োদ-বর্দ্ধিত তটিনীর ন্যায় শরজাল বর্ষণ ও বহন করিতে লাগিলেন। কেহই

নিরস্ত হইলেন না। এইরূপে উভয় রাজার নিক্ষিপ্ত নারায়ণাস্ত্রদ্বয় পরস্পর কিছুক্ষণ দারুণ যুদ্ধ করিয়া প্রশান্তভাব ধারণ করিল। ইত্যবকাশে বিদূরথ-বিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র সিন্ধুরাজের রথ ভস্মীভূত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বোধ হইল, যেন দাবানল বনভূমি দগ্ধ করিয়া কন্দর-নিক্রান্ত মৃগেন্দ্রকে বেষ্টন করিল। সিন্ধুরাজ তৎক্ষণাৎ বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রশমিত করিলেন এবং রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গহস্তে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিমেষ মধ্যেই করবাল প্রহারে মৃণালের ন্যায় বিদূরথরাজের রথাশ্ব-খুর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা বিদূরথও বিরথ হইয়া খড়্গমাত্র ধারণপূর্ব্বক ধরণীপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যোৎসাহী এবং উভয়েই সমান আয়ুধধারী হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর প্রহারে পরস্পর উভয়ের খড়্গই ক্রকচের ন্যায় তীক্ষ্ণধারাগ্র হইল।

ইত্যবসরে বিদূরথ খড়্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শক্তি অস্ত্র ধারণ করিয়া সিন্ধু-রাজের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। সেই শক্তি উচ্ছসিত সিন্ধুসলিলের ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর রবে মহোৎপাত-সূচক অশনির ন্যায় অবিচ্ছিন্নবেগে সমাপতিত হইয়া সিন্ধুরাজের বক্ষস্থল আহত করিল। কিন্তু প্রণয়িনী যেমন আপন প্রিয়তমের অপ্রিয় আচরণ করে না, সেই শক্তিও সেইরূপ সিন্ধুরাজের প্রাণান্তকর কোন অনিষ্ট অনুষ্ঠান করিল না; সিন্ধুরাজ সেই শক্তিপ্রহারে মরণমুখে পতিত হইলেন না। শক্তি প্রহারে এইমাত্র হইল যে, হস্তী যেমন শুণ্ডসাহায্যে সলিল উদ্গার করে, সিন্ধুরাজ সেইরূপ রুধিরধারা বমন করিলেন।

এই সময় সেই সমাগতা অপ্রবুদ্ধ লীলা, চন্দ্রকরাহত অন্ধকারের ন্যায় সেই সিন্ধুরাজকে সমাহত সন্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদের সহিত পূর্ব্বতন প্রবুদ্ধ লীলাকে কহিলেন,—দেবি! ঐ দেখুন, আমাদের ভর্ত্তা পুরুষসিংহ বিদূরথ কর্ত্তৃক শক্তিপ্রহারে শত্রু-সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন ভগবান্ নৃসিংহ নখরপ্রহারে দৈত্যরাজকে নিহত করিয়াছেন। ঐ দেখুন, জলাশয়-মধ্য-গত নাগেন্দ্রের শুণ্ড হইতে ফুৎকৃত বারি-বিনির্গমের ন্যায় সিন্ধুরাজের নিষ্পিষ্ট বক্ষস্থল হইতে চুল্ চুল্ রবে রুধিরস্রাব হইতেছে।

হায় কি কষ্ট! পুষ্করাবর্ত্ত মেঘ যেমন সুবর্ণময় সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ করে, ঐ দেখুন, সিন্ধুরাজ আবার সেইরূপ এক পুনরানীত রথে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। দেবি! ঐ আরও দেখুন, যেমন পার্থশরাঘাতে নিবাত-কবচদিগের সুবর্ণপুরী চূর্ণিত হইয়াছিল, তেমনি এক্ষণে মুদ্গরাঘাতে ঐ রথ চূর্ণ হইয়া গেল। আহা কি কষ্ট। ঐ আমার পতি পুনরানীত অপর এক রথে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্রকৃত বজ্র-বিক্ষেপের ন্যায় সিন্ধুরাজ তদুপরি মুষল নিক্ষেপ করিলেন। ঐ দেখুন, মদীয় পতি বিদূরথ পুনরায় মুষলপাণি সিন্ধুরাজকে কৌশলে প্রতারিত করিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক সবেগে ধাবিত হইয়াছেন। পতি আমার হরিদ্বর্ণ দ্রুমের ন্যায় সমুন্নত অন্য এক নূতন রথে আরোহণ করিয়াছেন; কিন্তু কি কষ্ট! ঐ সিন্ধুরাজ আবার ক্ষিপ্রতার সহিত আর্য্যপুত্রকে শরবর্ষণে পীড়িত করি-তেছেন। হায় হায়! আর্য্যপুত্র অধুনা ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, ছিন্নাশ্ব, ছিন্ন-সারথি, ছিন্নকার্ম্মুক ও ছিন্নবাণ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বাণাঘাতে বিদীর্ণ হওয়ায়, বিকল হইয়া পড়িয়াছেন। হায় কি সর্ব্বনাশ! সিন্ধুরাজ আবার আর্য্য-পুত্রের শিলাপট্ট-সম সুদৃঢ় বক্ষ ও মস্তক বজ্রোপম বাণপাতনে বিদারিত করিয়া তাহাকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। আহা! আর্য্যপুত্র অতি কষ্টে পুনরায় চেতনা পাইয়া সত্বর সমানীত অপর এক রথে আরোহণ করিতে-ছিলেন; কিন্তু হা ধিক্, হা কষ্ট! ঐ দেখুন, সিন্ধুরাজ ইঁহার স্কন্ধ-দেশ খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিলেন! অহো কি দারুণ দুঃখ! মদীয় ভর্ত্তার ছিন্ন স্কন্ধ হইতে পদ্মরাগ-গিরির ন্যায় রক্তিমাভ রক্তধারা নির্গত হইতেছে। হায় কি কষ্ট! ঐ সিন্ধুরাজ এক্ষণে ক্রকচ দ্বারা পাদপের ন্যায় নিশিত খড়্গ-ধারায় আর্য্যপুত্রের জঙ্ঘাদ্বয় কর্ত্তিত করিলেন! হায় হায়! আমি হত হইলাম, দগ্ধ হইলাম, মরিলাম, আমার সর্ব্বনাশ হইল! আহা! আমার ভর্ত্তার জানুদ্বয় মৃণালবৎ কর্ত্তিত হইল!

অপ্রবুদ্ধ লীলা এই কথা কহিয়া ভর্ত্তার অবস্থাদর্শনে ভয়বিহ্বলা হই-লেন এবং কুঠারকর্ত্তিতা লতার ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। এদিকে বিদূরথ ছিন্নজানু হইয়াও শত্রুকে প্রহার করিতে করিতে ছিন্ন-মূল পাদপের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথের অধোভাগে পতিত হইলেন। বিদূরথ

পতিত হইবামাত্র তদীয় সারথি অমনি অবিলম্বে তাঁহাকে রথে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব সিন্ধুরাজ সেই মুহূর্ত্তেই তদীয় কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিলেন। রবি-কর যেমন পদ্মে প্রবেশ করে, বিদূরথ সেইরূপ অর্দ্ধছিন্ন স্কন্ধেতেই স্যন্দন সাহায্যে স্বীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সিন্ধুরাজও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; কিন্তু মত্ত মশক যেমন অগ্নিশিখা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সিন্ধুরাজ সেইরূপ সরস্বতীর মাহাত্ম্যময় সেই গৃহে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না।

তৎকালে খড়্গাঘাত-ছিন্ন কণ্ঠ-দেশ হইতে অবিরলধারে রুধিরধারা গলিত হইয়া বিদূরথের বস্ত্র, তনুত্র ও সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল। সারথি তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ভগবতী সরস্বতীর সম্মুখস্থ মরণ-যোগ্য সুকোমল তল্পতলে শয়ন করাইল। শত্রু সিন্ধুরাজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অনন্তর সর্ব্বত্র এইরূপ একটা ধ্বনি উঠিল যে, রাজা বিদূরথ আর নাই, তিনি যুদ্ধে সিন্ধুরাজ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। এই ধ্বনি শুনিয়া সমস্ত রাজ্য মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িল। নগরবাসীরা স্ব স্ব গৃহের দ্রব্য সামগ্রী এবং স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া শকটারোহণে পলায়ন করিতে লাগিল। অবলাগণ ভয়ে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। নাগরিকগণের ছুটাছুটিতে গন্তব্যপথ দুর্গম হইয়া উঠিল। কুলবধূগণ কাঁদিতে কাঁদিতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। দুর্ব্বৃত্ত শত্রুদল তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। লোকসকল পরস্পর পরস্পরের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের অত্যাচার আশঙ্কায় মহাভীত হইল। পররাষ্ট্রীয় সৈন্যদল জয়োল্লাস ধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। আরোহি-বিহীন হস্তী ও অশ্ব এবং অন্যান্য বীরগণের উদ্দামগমনে কত লোক পথিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। গৃহসকলের কপাট পাটন এবং ধনাগার

ধ্বংসন, এই দুই ব্যাপারে বিষম ঘর্ঘররব উত্থিত হইল। ধনরক্ষক ভটগণকে পরাভূত করিয়া উচ্ছৃঙ্খল লুব্ধ যোধগণ ধনাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

এই সময় দস্যু তস্করাদির উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। চোরগণ মৃত নরপতির গৃহাঙ্গনাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছুরিকাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াও অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতে লাগিল। রাজার পবিত্র অন্তঃপুরে চণ্ডাল ও শ্বপচপ্রভৃতি নীচজাতীয় লোকেরাও প্রবেশ করিয়া নির্ভাবনায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিল। নরাধম পামরেরা রাজগৃহ হইতে রাজভোগ্য অন্নপান অপহরণপূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্তে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। লুব্ধ যোধগণ হেম-হারলোভে শিশুদিগকে পদাহত করিয়া তাহাদের কণ্ঠহার কাড়িয়া লইতে লাগিল। সহায়হীন শিশুগণ কেবল রোদন করিতে লাগিল। অপরিচিত যুবকেরা দলবদ্ধ হইয়া দুষ্ট অভিপ্রায়ে অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীদিগের কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল। চোরগণের হস্ত হইতে কত অমূল্য রত্ন পথিমধ্যে পতিত হওয়ায় পথ সকল যেন কিঞ্চিৎ উন্নত বলিয়া বোধ হইল। সামন্ত রাজগণ স্ব স্ব হয়, হস্তী ও রথসকল আনয়ন-পূর্ব্বক একত্র সম্মিলনার্থ ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রিগণ মৃত বিদূরথ রাজার সিংহাসনে সিন্ধুরাজকে অভিষিক্ত করিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজনের আদেশ দিতে লাগিলেন। নূতন করিয়া রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রধান প্রধান স্থপতিগণ কার্য্যারম্ভ করিলেন। সিন্ধুরাজের প্রেয়সীগণ নব নগরের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনার্থ কারুকার্য্যখচিত বাতায়ন বিবরে প্রবিষ্ট হইলেন। সিন্ধুরাজ অভিষিক্ত হইলে শত শত জয়ধ্বনি নির্ঘোষিত হইয়া তদীয় প্রভাবাতিশয্য প্রকটিত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজের অধীনস্থ রাজন্যবর্গ তদীয় রাষ্ট্রস্থিতি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদূরথ-রাজের বিশ্বস্ত ও প্রিয় রাজপুরুষগণ গ্রামান্তরে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও বিপক্ষদল কর্ত্তৃক সেখানেও তাঁহারা আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে যত গ্রাম ও নগরাদি ছিল, সে সকলের সর্ব্বত্রই প্রায় অবাধ লুণ্ঠন চলিতে লাগিল। বহুসংখ্যক চোর দল-বদ্ধ হইয়া চৌর্য্য কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে পথ অবরোধ করিলে, সে পথে লোকের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল।

এদিকে মহানুভব বিদূরথরাজের বিরহ-বেদনায় দিবসের আতপ-তাপও যেন নীহারময় হইয়া মন্দীভূত হইল। যুদ্ধে এবং দস্যু তস্করাদির হস্তে অনেক বন্ধু বান্ধব নিহত হইয়াছে; সেই শোকে কত লোক কাঁদিতে লাগিল। অন্য দিকে বিপক্ষ পক্ষের আনন্দসূচক তূর্য্যধ্বনি উত্থিত হইল। হয়, হস্তী ও রথ সমূহের শব্দের সহিত ঐ ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এরূপ ঘন ঘোর হইয়া উঠিল, যেন তাহা হস্তগ্রাহ্য পিণ্ডবৎ প্রতীত হইতে লাগিল।

অনন্তর 'ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র সম্রাট্ সিন্ধুরাজ জয়যুক্ত হউন' এই বলিয়াই প্রত্যেক নগরে নগরে ভেরী সকল বাদিত হইতে লাগিল। যুগান্তে এক মনুর অবসান ঘটিলে প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্য যেমন অপর মনু আসিয়া জগৎ অধিকার করেন, উন্নতস্কন্ধ সিন্ধুরাজ সেইরূপ সম্প্রতি রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তখন অম্বুরাশি মধ্যে রত্নরাজির ন্যায় দশদিক্ হইতে রাজ-কর সকল আসিয়া সিন্ধুরাজভবনে প্রবেশ করিল। মন্ত্রিবর্গ অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বদিকে রাজনামাঙ্কিত চিহ্ন, শাসন ও নিয়মাদি স্থাপন করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যেই প্রজার ধন, মান ও প্রাণ রক্ষার্থ দেশে দেশে, নগরে নগরে, যমরাজের নিয়মের ন্যায় রাজকীয় কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। যেমন উৎপাতবায়ু প্রশমিত হইলে তৃণপর্ণাদি পদার্থ-পরম্পরার আবর্ত্তনাদি নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি তখন নিমেষ মধ্যে কঠোর রাজনিয়ম প্রচারিত হইবামাত্র দেশের যাবতীয় উপদ্রব উপপ্লব প্রশান্ত হইয়া গেল। মন্থনাবসানে মন্দরাচল উত্তোলিত হইলে ক্ষীরাব্ধি যেমন প্রশান্তভাবে পরিণত হইয়া ছিল, তৎকালে দশ দিকের দেশ সকল সেইরূপ সৌম্য ভাব ধারণ করিল। জলকণবাহী সমীরণ সিন্ধুদেশীয়া ললনাদিগের মুখকমলের মধুকরায়মান অলকাবলী মৃদুমন্দ সঞ্চালিত এবং সন্তাপ ও দুর্গন্ধাদি অপনীত করিয়া ধীরে ধীরে সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই সময় প্রবুদ্ধ লীলা দেখিলেন, তাঁহার ভর্তা সম্মুখভাগে মূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি তদ্দর্শনে সরস্বতীকে কহিলেন,—দেবি অম্বিকে! এই দেখুন, মদীয় ভর্তা অধুনা দেহত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন।

জ্ঞপ্তিদেবী কহিলেন,—বৎসে! যদিও ঈদৃশ মহাড়ম্বরময় অপূর্ব্ব সংগ্রাম ও ঘোর রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি বলা যায় যে, রাষ্ট্র কিম্বা মহীতল, এই উভয়েরই কোনই অনিষ্ট ঘটে নাই অথবা কিছুই নষ্ট হয় নাই। কেননা, এই যে স্বপ্নস্বরূপ ভাসমান জগৎ, ইহার প্রকৃত স্থিতি কুত্রাপি নাই; সুতরাং যে বস্তু নাই বা কিছুই নহে,—শূন্যমাত্র, তাহার আবার অনিষ্ট বা ধ্বংস কি? অয়ি পাপ-পরিহীনে! তোমার ভর্ত্তার এই পার্থিব রাজ্য পদ্মভূপতির অন্তঃপুরগত গৃহাকাশে এবং পদ্ম ভূপতির তথাবিধ রাজ্যও সেই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহাকাশে বিরাজ করিতেছে। সেই গিরিগ্রামস্থ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহমধ্যগত শব-সন্নিহিত স্থানে এই জগৎ এবং এই জগদভ্যন্তরে এই বিদূরথ-ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়ই অবস্থান করিতেছে। তুমি, আমি, এই লীলা, এই বিদূরথ, এই সাগর-সমন্বিতা অবনি, ইত্যাদি মহারম্ভশালী মিথ্যা জগত্রয় সেই গিরিগ্রামবাসী ব্রাহ্মণের ভবনাভ্যন্তরগত গগনকোশে বিরাজিত রহিয়াছে। ফলতঃ স্বীয় আত্মাই কখন উল্লিখিতরূপে বৃথা প্রকাশিত হয়েন এবং কখন বা অপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহার উৎপত্তি বা বিনাশ এ দুয়ের কিছুই নাই। তাঁহাকেই পরমপদ বলিয়া জানিবে। সেই শান্ত স্বপ্রকাশ নিরাময় পরমাত্মাই সেই মণ্ডপাভ্যন্তরে আপনিই আপনাতে স্বীয় চিন্মাত্রস্বভাবে সমুদিত রহিয়াছেন। উল্লিখিত উভয় মণ্ডপের অভ্যন্তরে যে ভূতাকাশ আছে, তাহা শূন্যমাত্র; জগদ্ভ্রম তাহাতে নাই। জগৎ যখন ভূতাকাশেও নাই, তখন শুদ্ধ চিদাকাশে থাকা যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। মনে কর, ভ্রমদ্রষ্টা যদি না

সত্য পরম পদ। দৃশ্য বলিতে দ্রষ্টার ব্যাপারস্কন্ধের [illegible] যায়। কাজেই কোনও দ্রষ্টা আপমাতে আপনার ব্যাপার আহিত করিতে পারে না। কেন না, একত্র কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব এই উভয়ের বিদ্যমানতা অসম্ভব। সুতরাং দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের দৃষ্টক্রম, অদ্বৈতবাদের ভূষণ।

লীলা! দৃশ্যভ্রমের অবসান ঘটিলে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়েরই অভাব হইয়া থাকে। যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভাব ঘটে, তখন একমাত্র অদ্বয় পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। জানিবে, সেই পরমাত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। তিনি স্বয়ং আভাত, শান্ত, আদ্যভূত ও অনাময়। এইরূপ অল্পতর প্রদেশে যে বৃহত্তরের সমাবেশ, তাহাও দৃশ্যেরই ভূষণ;—সর্ব্বাধিষ্ঠান চৈতন্যের নহে। সুতরাং সেই মণ্ডপ গৃহের অভ্যন্তরে লোক সকল স্ব স্ব ভাবে সমুদিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবস্থানুসারেই বিহার করিতেছে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টিতে তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই অনুভূত হয় না। সেই কারণ জগৎ অজ ও আকাশস্বরূপ; পরন্তু অনুভবাত্মক প্রত্যক্ষ প্রমাণে অহম্ভাবের সাক্ষীভূত যে চিদাকাশ, তাহাই অজ্ঞ দৃষ্টিতে জগৎরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। সুমেরু শৈল প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্যনিচয়, সমস্তই শূন্যাত্ম-বিজ্ঞান। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরীর ন্যায় ঐ সকলের যে স্থূল-দৃশ্যতা, তাহা কিছুই নহে—অলীক। লোক সকল স্বপ্নাবস্থায় তাহাদের কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত প্রাদেশ-পরিমিত স্থানে সেই প্রদেশাবচ্ছিন্ন যে আত্ম-চৈতন্য, তাহাতেই লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতাদির অধিষ্ঠান অনুভব করিয়া থাকে। অণুপরিমিত স্থানে বা পরমাণুপ্রায় মনে শৈলাদিময় বহুল জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হয়। ঐ সকল জগৎ কদলীত্বকের ন্যায় নানাবেশে স্তরে স্তরে অসংখ্যরূপে বিরাজমান। স্বপ্নময় পুর-নগরাদির ন্যায় চিদণুর অভ্যন্তরে ত্রিজগৎ বিদ্যমান। সেই ত্রিজগতের মধ্যে চিদণু সকল এবং সেই সেই চিদণুর মধ্যে আরও এক একটি জগৎ বিরাজিত।

হে শুভে! সেই সকল জগতের মধ্যে যে জগতে পদ্মভূপতির শবদেহ অবস্থান করিতেছে। তোমার সপত্নী এই লীলা পূর্ব্বেই সেখানে

উপস্থিত হইয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে তোমার সম্মুখে এই লীলা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ইনি ভর্ত্তা পদ্মভূপতির মৃত দেহের নিকট উপনীত হইয়াছেন।

লীলা বলিলেন,—দেবি! ইনি তথায় কিরূপে দেহধারিণী হইয়াছিলেন? আমিই বা কেমন করিয়া ইহাঁর সপত্নী হইয়াছি এবং সেই পদ্মভূপতির ভবনস্থিত জনগণই বা ইঁহার কিরূপ আকার প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও ইহাঁর সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করিতেছেন, এই সকল আমার নিকট সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন।

দেবী কহিলেন,—লীলা! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি সংক্ষেপেই তাহা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। এই আত্মবৃত্তান্ত শ্রবণে তোমার সমস্ত দৃশ্য-দুর্দ্দশা অপনীত হইবে। তোমার এই ভর্ত্তা বিদুরথরূপী সেই পদ্মভূপতি, সেই শবাধিষ্ঠান গৃহমধ্যে সেই সেই নগরাদি ভাবে বহুলীভূত জগন্ময়ী ভ্রান্তি অবলোকন করিতেছেন। এই যে যুদ্ধ, ইহাও ভ্রান্তিযুদ্ধ। এই সকল লোকও লোক নয়—সকলই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। মরণও ভ্রান্তির খেলা; ফলে এ সংসার সকলই ভ্রমাত্মক। লীলা যে পদ্মভূপতির দয়িতা, তাহাও ভ্রান্তির ক্রম বা বিলাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। হে বরাঙ্গনে! তুমি এবং এই লীলা, তোমরা উভয় বরবর্ণিনীই স্বপ্নস্বরূপ। তোমরা যেমন পদ্মভূপতির স্বপ্নমাত্ররূপে প্রতিভাত, তেমনি তোমাদের নিকট ভূপতিপদ্ম এবং স্বয়ং আমিও স্বপ্নরূপেই প্রতিভাত হইতেছি। এইরূপেই এই জগৎ-শোভা প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহাই দৃশ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে যখন বিশেষ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন আর দৃশ্যত্ব থাকে না;—জ্ঞানের উদয়ে দৃশ্য শব্দার্থ পরিত্যক্ত হইয়া যায়। একমাত্র আত্মাই পূর্ণস্বভাব। এই জন্য তুমি, তোমার সপত্নী লীলা, আমি ও এই নৃপতি প্রভৃতি সমস্তই ভ্রান্তিমাত্র। এইরূপে এই সংসারস্থিতি সকলই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। এই ভূপতি প্রভৃতির, আমাদের এবং অন্যান্য সকলের যেরূপে সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে আবির্ভাব ঘটিয়াছে,—যিনি মনোহর হাস-বিলাসে সুশোভিত হইতেছেন, যাঁহার সর্ব্বাবয়ব নবযৌবনে পরিপূর্ণ, যিনি লীলা-বিলোল-বদনে

সমুদ্ভাসিত, যাঁহার ব্যবহার কোমল ও মধুর, যিনি মধুর অথচ উদারভাষিণী যাঁহার আলাপ কোকিলের কণ্ঠঝঙ্কারের অনুরূপ, যিনি মদ ও মন্মথাবেশে অলস, যাঁহার নয়ন নীলোৎপলনিভ, যিনি পীন পয়োধরশালিনী, যাঁহার দেহ কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ ও অধর পক্ক বিম্বফলের সমান, এই সেই রাজমহিষী লীলাও সেইরূপেই আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই যে তোমার সপত্নী, ইনি তোমারই মনঃকল্পিত ভর্ত্তার মনোবৃত্তিময়ী।

বৎসে! যৎকালে তোমার ভর্ত্তার চিত্ত লীলামূর্ত্তির বাসনায় বাসিত হয়, তখনই চমৎকারস্বভাব চৈতন্যাকাশে এই তোমার সমান অবয়বশালিনী লীলা দৃশ্যত্বে পরিণতা হয়েন। যে কালে তোমার ভর্ত্তার মৃত্যু ঘটিল, সেই কালেই তিনি এই বাসনাময়ী ও ভবৎ-প্রতিবিম্বরূপিণী লীলাকে দেখিতে পাইলেন। চিত্ত যখন স্বয়ং আধিভৌতিক ভাব অনুভব করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট আধিভৌতিকভাব সৎস্বরূপ এবং আতিবাহিক ভাব কল্পিতরূপে প্রতীত হয়। আর চিত্ত যে কালে আধিভৌতিক ভাবকে অসৎ বলিয়া জ্ঞান করে, তখন আতিবাহিক সঙ্কল্প তাহার নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। উল্লিখিত কারণে তোমার এই সপত্নী লীলা বাসনাময়ী হইলেও তোমার স্বামী ইহাকে বাসনাময়ী বলিয়া বুঝেন নাই; তিনি ইহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং এই কারণেই তিনি মরণমূর্চ্ছার অবসানে পুনর্জ্জন্মময়ী ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া এই বাসনাময়ী লীলার সহিতই সম্মিলিত হইয়াছিলেন; অতএব এই সেই লীলাও তুমি ভিন্ন আর কেহই নহে।

লীলা! চিদাত্মার সর্ব্বগতত্ব হেতু তুমিও স্বীয় বাসনাময় শরীরান্তর দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিতে পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এ সকলই ভবদীয় বুদ্ধিস্থিত বাসনার বিলাস বৈ আর কিছুই নয়। যে কালে যেখানে যে বাসনা সমুদিত হয়, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তৎকালে সেইখানে বিক্ষেপশক্তি-বশে তদনুরূপ দৃশ্যে পরিণত হয়েন। সুদৃঢ় অভিনিবেশ-বাসনায় যখন যে শক্তি সমুদ্রিক্ত হয়, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিশালী আত্মা তৎকালে তদনুরূপে অবস্থিত ও প্রকাশিত হয়েন। এই দম্পতি পূর্ব্বে স্ব স্ব মরণানুকূল মূর্চ্ছার অব্যবহিত পর ক্ষণেই প্রতিভাস বশতঃ

স্ব স্ব হৃদয়ে নিম্নোক্তরূপ অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই আমাদের পিতা মাতা, এই আমাদের দেশ, এই আমাদের ধন সম্পদ্, এই আমাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্ম, এই আমরা পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক্ষণে একমন—একপ্রাণ হইয়াছি; এই আমাদের পরিজন সকল, ইত্যাদি। লীলা! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—স্বপ্নানুভূতি। নিদ্রার উন্মেষ হইবামাত্রই জাগ্রদ্-বাসনা যেমন দেশদেশান্তর দর্শন করায়, তেমনি মরণ-মূর্চ্ছার পরক্ষণেও পূর্ব্ববাসনার উন্মেষে জীব স্বীয় বাসনানুরূপ সৃষ্টি দর্শন করিতে থাকে। তোমার পূর্ব্ব বাসনা যেরূপ ছিল, স্বপ্নদর্শনের ন্যায় তুমি তদনুরূপ দৃশ্যই দর্শন করিতেছ। এই লীলা এইরূপ ভাবে আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং আমি যেন বিধবা না হই, এইরূপ প্রার্থনা আমাকে জানাইয়াছিলেন। আমি ইহাঁকে সেই বরই দিয়াছিলাম; এইজন্যই এই লীলা ভর্ত্তার মরণের পূর্ব্বেই মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি বালিকা। আমি তোমাদের চেতনাংশের চেতনধর্ম্মিণী কুলদেবতা; সুতরাং সর্ব্বদাই তোমাদের পূজনীয়া। ঐরূপ কার্য্য আমি স্বভাবতই করিয়া থাকি। যাহা হউক, অতঃপর সেই লীলার জীব দেহ হইতে প্রাণবায়ুরূপে বদনপথে বহির্গত হইল। লীলা মরণ-মোহের অবসানে এই গৃহে স্বীয় সঙ্কল্প-কল্পিত বুদ্ধিরূপ আকাশে বক্ষ্যমাণ প্রকার ভাব সকল অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভাবনা বশতঃ সুধাংশুমুখী মৃগাক্ষীমানিনী লীলা পূর্ব্বদেহ স্মরণপূর্ব্বক যেন স্বপ্ন-মধ্যগতার ন্যায় দিবাকর-করোল্লসিত নলিনীবৎ বাসানানুরূপ বিকাশ পাইয়া স্বীয় মনোহর কান্তকে উপভোগ করিবার জন্য পূর্ব্বস্মৃতির সহায়তায় পদ্মভূপতির ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের অভ্যন্তরে গমন করত ভর্ত্তার সহিত সম্মিলিত হইলেন।

•

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অতঃপর লব্ধবরা লীলা তথাবিধ বাসনাময় শরীরে স্বীয় পতি পদ্মভূপতিকে পাইবার নিমিত্ত নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন। তিনি চিন্তাবশে যেন দেহাদি ভাবে পরিণত হইয়াই পতিসঙ্গ লাভ করিবেন, এই উৎসাহে উৎফুল্লা ও কামাতুরা হইয়া বিহগীর ন্যায় লঘুদেহে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এদিকে জ্ঞপ্তিদেবী তাঁহার কন্যাকে অগ্রেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। লীলা সেখানে সেই স্বীয় কুমারীকে প্রাপ্ত হইলেন। বোধ হইল, সেই কুমারী যেন লীলার সঙ্কল্পরূপ মহাদর্পণ হইতে অগ্রেই নির্গতা হইয়াছেন।

কুমারী লীলাসমীপে গিয়া কহিলেন,—হে মাতঃ, জ্ঞপ্তিসহচরি সুন্দরি! আমি আপনার দুহিতা। আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? আমি আপনারই প্রতীক্ষায় এই নভোমার্গে অবস্থান করিতেছি।

লীলা সেই কুমারীকে দেবীজ্ঞানে কহিলেন,—হে দেবি নীরজ-নয়নে! আপনি আমাকে আমার স্বামি-সমীপে লইয়া চলুন। আপনা হইতে আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে; কেননা, মহৎ ব্যক্তির দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কুমারী তখন লীলাকে আর কিছুই না কহিয়া 'আসুন আমরা উভয়েই সেখানে গমন করি' এই বলিয়া আকাশে পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভবিষ্যৎ শুভাশুভের লক্ষণস্বরূপ বিধাতৃ-বিহিত কররেখা যেমন নির্ম্মল করতল প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই লীলাও তদীয় কন্যার অনুগামিনী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের ছিদ্রভূত অম্বরতলে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা মেঘপথ অতিক্রম করিয়া বায়ুস্কন্ধে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে ক্রমে সূর্য্য-মণ্ডলে, তথা হইতে তারাপথে, অনন্তর তারাপথ হইতে অনায়াসে বায়ু, ইন্দ্র ও অন্যান্য সুরগণ ও সিদ্ধগণের লোকে গিয়া পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

মহেশ্বরলোকে গমনপূর্ব্বক সেই সেই লোক লঙ্ঘনান্তে একেবারে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডখর্প্পর প্রাপ্ত হইলেন। যেমন কুম্ভ ভিন্ন না হইলেও তদন্তর্গত হিমশৈত্য বহির্গত হয়, সেইরূপ সেই সঙ্কল্পসিদ্ধা লীলা ব্রহ্মাণ্ডখর্পরেরও বাহিরে গমন করিলেন। লীলার তাৎকালিক দেহ স্বীয় চিত্তমাত্রময়; তিনি আপনার সঙ্কল্প-সম্ভূত ঐ সকল বিভ্রম স্বীয় অন্তরেই অনুভব করিতে লাগিলেন।

লীলা এইরূপে ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডখর্পরে উপনীত হইবার পর ব্রহ্মাণ্ডের পার-গতা হইলেন এবং জলাদি নিখিল আবরণ ভেদ করিয়া সম্মুখে সেই অসীম অপার মহাচিদাকাশ অবলোকন করিলেন। বলা বাহুল্য, শত কোটি কল্প অতিবেগে ধাবিত হইয়া গরুড়ও ঐ চিদাকাশের পরপার দর্শনে সক্ষম হয় না। লীলা তখন তথাবিধ মহাচিদাকাশের অন্তরে দেখিলেন, যেমন মহারণ্যে অসংখ্য ফল থাকিলে সে সকল ফল গণিয়া উঠা যায় না, সেইরূপ সেখানে সংখ্যাতীত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি-বহির্ভূত। অনন্তর লীলা অলক্ষ্যে বদর ফল মধ্যে কীটের ন্যায় সেই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী এক বিপুল আবরণশালী ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু প্রভৃতির যে সকল লোক ছিল, লীলা একে একে সেই সেই প্রভাপুঞ্জময় লোক পুনর্ব্বার অতিক্রম করিয়া নক্ষত্র পথের নিম্নভাগে পদ্মভূপতির সেই শ্রীসম্পন্ন মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই মহীমণ্ডলস্থ সেই পুরী ও পুরীর মধ্যবর্ত্তী সেই মণ্ডপে উপনীত হইয়া সেই কুসুমসমাচ্ছাদিত শবদেহ সমীপে অবস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে বরাননা লীলা সেই কুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না; পরিজ্ঞাত মায়ার ন্যায় সে কোথায় চলিয়া গেল, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি তখন শবরূপী স্বীয় ভর্ত্তার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাবলে এইরূপ স্থির করিলেন যে, "এই আমার ভর্ত্তা, সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া এই বীরলোকে আগমন করিয়াছেন এবং এক্ষণে এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আমি

দেবীর প্রসাদে এইস্থানে সশরীরে আগমন করিয়া এই ভর্ত্তৃশব প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহাতে এক্ষণে আমি ধন্য হইলাম। আমার ন্যায় ভাগ্যবতী রমণী ধরণীমধ্যে আর কে আছে? লীলা এইরূপে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া হস্ত দ্বারা চারু চামর গ্রহণপূর্ব্বক ভর্ত্তার শব বীজন করিতে লাগিলেন।

প্রবুদ্ধ লীলা জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসিলেন,—দেবি! পদ্মভূপতির সেই ভৃত্যগণ ও দাসীগণ আছে এবং স্বয়ং ভূপতিও রহিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁদের মধ্যে এই সমাগতা লীলাকে কে কিরূপ বুঝিবে এবং কে কি প্রকার কহিবে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।

দেবী কহিলেন,—সেই রাজা, সেই লীলা ও সেই ভৃত্যবর্গ ইহাদের সকলেই চিদাকাশের একতাবেশ, আমাদিগের উভয়ের প্রভাব, মহাচিত্তের প্রতিভাস এবং মহানিয়তির প্রেরণা বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়া বুঝিতেছে না। সকলেই পরস্পর প্রতিবিম্বিত হইয়া স্ব স্ব সম্বন্ধ সহ সকলকে দেখিতেছে। সেই জন্যই রাজা নিজে এই আমার স্বাভাবিক ভার্য্যা, এই আমার স্বাভাবিক সখী, এই আমার ভৃত্য, এই আমার মহিষী, ইত্যাদিরূপ অনুভব করিতেছেন। পরন্তু লীলা! তোমায় বলা বাহুল্য, এই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে কি, তাহা তুমি, আমি ও এই বিদূরথপত্নী লীলা ভিন্ন অন্য কেহই যথাযথরূপে বুঝিতে পরিতেছে না। কেননা উহাদের অজ্ঞানাবরণ তখনও উন্মুক্ত হয় নাই।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন,—দেবি! আপনি বর দান করিলেন, অথচ ললিতবাদিনী লীলা কি হেতু এই স্থূল দেহেই পতির সমীপে যাইতে পারিল না?

দেবী কহিলেন,—ছায়া যেমন আতপতাপে গমন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহাদের বুদ্ধি অপ্রবুদ্ধ, তাহারা কখন পুণ্য-পরিপাক-লব্ধ সিদ্ধ লোকে সশরীরে উপনীত হইতে সমর্থ হয় না। সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সৃষ্টির আদি কাল হইতে এইরূপ একটা ধর্ম্মমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন যে, যাহা সত্য তাহা কখন অলীকের সহিত সম্মিলিত হইবার নহে। বুঝিয়া দেখ, বালকের মনে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেতাল বলিয়া ধারণা

থাকে, ততক্ষণের মধ্যে কিরূপে তাহার নির্ব্বেতাল বুদ্ধির উদয় হইবে? আরও দেখ, যতকাল পর্য্যন্ত আত্মাতে অবিবেকরূপ জ্বরের উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে, ততকালের মধ্যে কিরূপে তাহাতে বিবেকরূপ সুধাকরের শীতলতা সমুদিত হইবে? আমি পৃথিবী প্রভৃতি ভূতময় স্থূলদেহধারী, আকাশপথে আমার বিশিষ্ট গতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, তাহার পক্ষে উহা ভিন্ন অপর সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা হইবে কিরূপে? অতএব জ্ঞান, বিবেক, পুণ্য-বিশেষ ও বরপ্রভাবে যদি কোন জন তোমার ন্যায় দেহ ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তিরই ঈদৃশ পরলোকে আগমন সম্ভব হইতে পারে—অন্যের নহে। যেমন শুষ্কপর্ণ জ্বলদঙ্গারে পতিত হইলে সহজেই দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি এই স্থূলদেহও অহম্ভাব-বাসনামাত্রময় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশীর্ণদশায় পতিত হয়। বর এবং অভিশাপ উভয়ই প্রাক্তন বাসনা কর্ম্মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। ফল কথা, পূর্ব্বে যেমন যেমন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদনুসারেই বরলাভ ও অভিশাপ সাফল্য ঘটিয়া থাকে। বর এবং অভিশাপ সেই সেই ফলোন্মুখ কর্ম্মের সূচনা করিয়া দেয়। যখন কর্ম্মফল ফলিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বর প্রাপ্তি ও অভিশাপ সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। মনে কর, যেমন কোন পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় ভুলিয়া যাইবার পর পুনরায় তাহা স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইল অথচ তাহা স্মরণ হইল না; কিন্তু কেহ যদি স্মরণ করাইয়া দিল, তখনই তাহা স্মরণ হইল। বর এবং অভিশাপও ঐ প্রকারে পূর্ব্ববাসনাজাত কর্ম্ম সকল স্মরণ করাইয়া দেয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সত্য; কিন্তু সেই ভ্রমসর্প কি প্রকৃত সর্পের কার্য্য করিতে পারে? এইরূপ যাহা আত্মাতে বিদ্যমান নাই অর্থাৎ যাহা মূলেই ভ্রান্তিনিদান, তাহার আবার কার্য্যকারিতা কি? 'ইহা মরিয়াছে' এই যে জ্ঞান, ইহা একটা মিথ্যা অনুভব মাত্র। পূর্ব্ব পরিপুষ্ট অভ্যাসবশেই ঐরূপ অনুভব হইয়া থাকে। স্বানুভূত জগজ্জালে সংসৃতিভ্রম সহজেই ঘটে। বর ও অভিশাপাদির দানকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই ঈদৃশ সৃষ্টি প্রভৃতি অভ্যাস সম্যক্ কল্পিত হইয়াছে; পরন্তু অস্মদ্ বাসনাদি-নিরপেক্ষতায় রচিত হয় নাই। যাহা-

দের জ্ঞাতব্য বিষয়ে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, তাদৃশ অজ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিরাই অন্তরে এই সংসার অনুভব করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা জলমধ্যগত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বাহিরে প্রতিভাত বলিয়া প্রতীত হয়।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

দেবী কহিলেন,—যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ ও যোগাভ্যাস-জনিত পরম ধর্ম্মের অনুসারী, তাঁহাদেরই আতিবাহিক লোক লাভ হইয়া থাকে; অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। আধিভৌতিক বা স্থূলদেহ মিথ্যা ভ্রান্তিমাত্র। সুতরাং যাহা মিথ্যা, তাহা কিরূপে সত্য বস্তুতে থাকিতে পারে? ছায়া কি কখন আতপে অবস্থান করে? আমাদের এই লীলা, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং যোগাভ্যাস-জনিত পরম ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন, কেবল সেই কারণেই ইনি ভর্ত্তৃ-কল্পিত নগরে গমন করিয়াছেন।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন,—আপনি লীলার গমন বিষয়ে যেরূপ বর্ণন করিলেন, আমি তাহা অনুপপন্ন বলিয়া মনে করি না। কিন্তু হে অম্বিকে! এই দেখুন, আমার এই ভর্ত্তা প্রাণ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অধুনা কিরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করুন। আমি জিজ্ঞাসা করি, দেহাদির সুখ-স্বস্তি ও দুঃখ-দুর্ভাগ্য প্রভৃতি ভাবাভাব বিষয়ে পূর্ব্বে কিরূপে নিয়তি আসিয়া উপস্থিত হয়? কিরূপেই বা আবার জনন-মরণাদি-সূচিত অনিয়তির আগমন হইয়া থাকে? কিরূপে স্বভাবসিদ্ধি সঙ্ঘটিত হয়? সত্তা কিরূপে ঘটপটাদি পদার্থগামিনী হয়? অনলাদিতে উষ্ণত্ব, পৃথিব্যাদিতে স্থিরত্ব এবং হিমাদিতে শৈত্য এই সকল কিরূপে ঘটিয়া থাকে? কাল ও আকাশাদির অস্তিত্ব কিরূপে অনুভূত হয়? কিরূপে ভাব ও অভাব সকলের গ্রহণ ও উৎসর্জ্জন হইয়া থাকে? অর্থাৎ ভাব—সত্য-রজতাদি আর অভাব—শুক্তি-রজতাদি, এই দুই বিষয়ের গ্রহণ-

বর্জ্জন কিরূপে সিদ্ধ হয় ? কিরূপে বস্তু সকলের স্থূলত্ব সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি নিয়ম নিচয় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং কিরূপেই বা তৃণ, গুল্ম, লতা ও মনুষ্যাদির উচ্চ নীচ ধর্ম্ম সংসিদ্ধ হয় ?

দেবী কহিলেন,—বৎসে ! মহাপ্রলয় সজ্ঘটিত হইলে কিছুই থাকে না, সকল পদার্থই বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল একমাত্র অনন্ত আকাশস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় তুমি যেমন আকাশ-গমনাদি অনুভব করিয়া থাক, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম চিৎস্বরূপতাবশতঃ 'আমি তেজঃকণ' এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। শুদ্ধ চিৎপরিব্যাপ্ত বলিয়া ভাস্বর সূক্ষ্ম ভূতকেই তেজঃকণ শব্দে অভিহিত করা হয়। ঐ তেজঃকণভূত আত্মা আত্মভিন্নত্বরূপে কল্পিত জলাদি আবরণে কল্পনাবশতঃ অন্তঃস্থূলত্ব লাভ করিয়া থাকেন। সেই যে স্থূলরূপ, তাহাই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ড অসত্য হইলেও সত্যাকারে স্ফুরিত হইতেছে। ব্রহ্ম আপনার কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া 'আমি হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মা' এইরূপ অনুভব করত মনোরাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার যে সেই সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ মনোরাজ্য, তাহাই এই জগৎ। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মের স্বীয় ইচ্ছানুসারে যেরূপে যে প্রকার নিয়মে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা কোন কালেই নাই। অদ্যাপি সে নিয়ম স্থিরভাবে বিদ্যমান। চিত্ত যে যেরূপে স্ফুরিত হয়, আত্ম-চৈতন্যও স্বয়ং তত্তদনুসারে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতের কোন ব্যাপারই অনিয়তভাবে সমাহিত হয় না। বিশ্বস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের কোন বস্তুই ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম সর্ব্ববস্তু হইতে শূন্য, এ কথা একেবারেই অযুক্ত। বস্তুতঃ স্বর্ণ কি কখন কটক, রুচক ও পিণ্ডত্ব প্রভৃতি নিখিল সংস্থান ত্যাগ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে ? সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং চিৎ যেরূপে শীত উষ্ণাদি স্বভাবে আত্মাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই স্বভাবেই নিয়ত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। অতএব মায়াশবলিত ব্রহ্ম কদাচ স্বীয় স্বাভাবিক সত্তা ত্যাগ করেন না ; সুতরাং চিতের অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া নিয়তিরও নাশ হয় না। সৃষ্টির আদিতে এই ব্যোমরূপী ক্ষিতি প্রভৃতি যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, অদ্যাপি তথাবিধ নিয়তিবশে সে

সকল সেইরূপই রহিয়াছে; কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মরণ নিয়তি দ্বারা জীবন নিয়তির ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে; কিন্তু ঐ উভয় নিয়তিই উল্লিখিত কারণে বিপর্য্যস্ত হয় না। ভূতগণ ঐ নিয়তি বা স্বভাব বশে সুখ দুঃখাদি অনুভব করে। এখানে কথা হইতে পারে যে, এই সমস্তই ত মায়িক দৃষ্টিতে বর্ণিত; পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে জগৎই ত আদৌ নাই; সুতরাং নিয়তির আক্ষেপ কোথায়? এরূপ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতই এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। তবে এই যাহা অনুভূত হইতেছে; ইহা স্বপ্ন-স্ত্রী-সঙ্গমের ন্যায় মিথ্যা অথচ চিদাকাশের বিকাশ মাত্র। বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও জগৎ যে বর্ণিত প্রকারে অবস্থান করিতেছে ও জনন-মরণাদি পদার্থাকারে অনুভূত হইতেছে, এই অবস্থান ও অনুভব উভয়ই স্বভাবেরই সম্পত্তি। এইরূপে প্রস্ফুরণশীল যে যে সম্বিৎ সৃষ্টির আদিতে যে যে প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অদ্যাপি সেই সেই ভাবেই অবিচলিতরূপে আছে। এই যে অবিপর্য্যস্ত ভাব, ইহাই নিয়তি নামে অভিহিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে সেই চিদাকাশই ব্যোমসম্বিৎ স্বীকার করিয়া ব্যোমাকারে প্রকাশ পাইয়াছেন, কালসম্বিৎ গ্রহণ করিয়া কালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জলসম্বিৎ অঙ্গীকার করিয়া জলভাব লাভ করিয়াছেন। লোকে যেমন স্বপ্নাবস্থায় আপনাতেই জলভাব প্রত্যক্ষ করে, সেই চিৎ-শক্তিও সেইরূপ আপনাতে আকাশাদি ভাব অবলোকন করিয়া থাকে। মায়ার চাতুর্য্য এমনই অপূর্ব্ব যে, যাহা অসত্য, তাহাই সত্য বলিয়া বিতর্ক উত্থাপন করে। আকাশ, জল, পৃথ্বী, অনল, অনিল এ সকলেরই সত্তা অসৎ বা অনিত্য হইলেও চিতি স্বীয় অন্তরে স্বপ্ন ও সঙ্কল্প ধ্যানাদির ন্যায় ঐ সকলের অবস্থান অনুভব করিয়া থাকে। মরণের পর জীবগণের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলানুভূতি হয়। আমি অধুনা তোমার সর্ব্বসন্দেহ ভঞ্জনার্থ সেই কর্ম্মফলানুভবের ক্রম কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে মৃত্যুকালে কল্যাণ সাধিত হয়।

বৎসে! সৃষ্টির প্রারম্ভ কালেই এই প্রকার নিয়তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, মনুষ্যদিগের আয়ুষ্কাল সত্যযুগে চারি শত বৎসর, ত্রেতাযুগে তিনশত বৎসর, দ্বাপরে দ্বিশত বর্ষ এবং কলিযুগে এক শত বৎসর হইবে।

এই নিয়তিরও আবার অবান্তর নিয়তি নির্দ্দিষ্ট আছে। সে নিয়তি পুরুষ পরমায়ুর হ্রাস বৃদ্ধির কারণ। যাহা হউক, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, এই কয়েকটী পুরুষ-পরমায়ুর নিমিত্তস্বরূপ এবং ইহারাই সেই আয়ুর ন্যূনাতিরেক বিধান করে। স্বীয় বিহিত কর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে আয়ুরও হ্রাস বৃদ্ধি সংঘটিত হয় এবং তাহার অনুষ্ঠানাদি সমভাবে রহিলেই আয়ুর সমভাব সাধিত হইয়া থাকে। ফল কথা, যথাযথভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন করিয়া গেলে, যে যুগের যে আয়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ভোগ হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় মৃত্যুজনক কর্ম্ম করিলে বালককালেই মৃত্যু হয়, যৌবনে মৃত্যুজনক কর্ম্ম করিলে, যৌবন কালেই মৃত্যু ঘটে এবং বার্দ্ধক্যে মৃত্যুজনক কর্ম্ম করিলে বৃদ্ধাবস্থাতেই মরণ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাদৃশ শ্রীমান্ ব্যক্তিই শাস্ত্রোল্লিখিত পরমায়ু লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। আয়ুর অবসানে যখন অন্তিম অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন জন্তুমাত্রেরই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে মর্ম্মন্তুদ যাতনা অনুভূত হইয়া থাকে।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন,—হে দেবি চন্দ্রাননে! আপনি আমার নিকট সংক্ষেপতঃ মরণ-বিবরণ বর্ণন করুন। আমি জিজ্ঞাসা করি, মরণ দুঃখ কি সকলেরই সমান? অথবা কাহারও কাহারও কি উহাতে সুখও হইয়া থাকে? আর মরণের পরেই বা কি হয়? তখন কি সকলেরই তুল্যগতি হইয়া থাকে?

দেবী কহিলেন,—সংসারে তিন প্রকার লোক আছে;—মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। অর্থাৎ যাহারা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বিষয় সুখে মগ্ন এবং অসার সংসার ব্যাপারে সংসক্ত, তাহাদিগকে মূর্খ বলে। যিনি প্রাণ ও মনকে প্রতি-নিয়ত নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করেন, তাঁহাকে ধারণাভ্যাসী এবং যিনি যোগবলে নাড়ীদ্বারবিশেষে প্রবেশ ও নির্গমন দ্বারা পরশরীরে প্রবেশ-কৌশল পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাকে যুক্তিমান্ বলে। এই তিন প্রকার মুমূর্ষু লোকের মধ্যে ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্ এই দ্বিবিধ ব্যক্তিবর্গ দেহত্যাগ করিবার পর সুখানুভব করেন। যাহার ধারণাভ্যাস নাই এবং

যে ব্যক্তি যুক্তিমান্‌ও নহে, তথাবিধ মূর্খ লোকের মৃত্যুকালে দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপ যাহারা বাসনার বশীভূত এবং সেই জন্য যাহাদের মন স্বাধীন নহে, তাহারা মৃত্যু সময় ছিন্ন পদ্মের ন্যায় নিরতিশয় দৈন্যদশায় উপনীত হয়। বুদ্ধি শাস্ত্রানুশীলনে সংস্কৃত না হইলে ও সতত অসাধুজনের সংসর্গ করিলে, মৃত্যুকালে বহ্নিপতিতবৎ দারুণ অন্তর্দাহ অনুভব করিতে হয়। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কণ্ঠে যখন ঘর্ঘরধ্বনি উপস্থিত ও দৃষ্টির বিরূপতা সংঘটিত হয়; তখন ঐ অবিবেকী ব্যক্তির অন্তঃকরণ একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তৎকালে তাহার নিকট দিবস অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলোকশূন্য ও তারকাসম্পন্ন, দিঙ্মণ্ডল মেঘমণ্ডলাকীর্ণ এবং আকাশ-মণ্ডল শ্যামবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন তাহার দারুণ মর্ম্মবেদনার আবির্ভাব হয় এবং দৃষ্টিমণ্ডল একেবারেই ভ্রমপূর্ণ হইয়া যায়। তখন সে, কখন পৃথিবীকে আকাশের ন্যায়, কখনও আকাশকে পৃথিবীর ন্যায়, কখন দিঙ্মণ্ডলকে আবর্ত্তের ন্যায় ঘূর্ণমান এবং কখন আপনাকে যেন অর্ণবে উহ্যমান, কখন যেন আকাশে নীয়মান, কখন যেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূয়মান, কখনও যেন অন্ধকূপে পতমান এবং কখন কখন বা যেন শিলান্তরে যোজ্যমান বলিয়া বোধ করে। তাহার তখন বর্ণোচ্চারণ-ক্ষমতা লোপ পায় এবং হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে কখন যেন আপনাকে নভোমার্গ হইতে পতিত, কখন যেন তৃণাবর্ত্তের ন্যায় ঘূর্ণিত, কখন যেন দ্রুতবেগে রথে অধিরূঢ় এবং কখন যেন তুষারবৎ গলিত বলিয়া বোধ করে।

তখন তাহার নিজের দৃষ্টান্তে অপরকে যেন সে, সংসারের দুঃখবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করে, বন্ধুবান্ধবকে স্পর্শ করিয়াও যেন করিতে পারে না, কখন আপনাকে যেন ক্ষেপণযন্ত্রে নিক্ষিপ্ত, কখন উৎক্ষিপ্ত এবং কখন কখন বা যেন বায়ুযন্ত্রে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করে, আবার কখন যেন ভ্রমিযন্ত্রে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে, কখন যেন আপনাকে রজ্জুদ্বারা আকৃষ্ট বলিয়া বোধ করে। সে কখন যেন জলাবর্ত্তে ঘূর্ণমান হয়, কখন যেন শস্ত্রযন্ত্রে নিপাতিত হইতে থাকে, কখন প্রচণ্ড পর্জ্জন্যপবনে তৃণবৎ বাহিত এবং কখন যেন জলপ্রবাহ-সহ সাগরে নিপতিত হয়; কখন আপনাকে আকাশে, গর্ত্তে ও আবর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করে; আবার সে, কখন কখন সাগর, পৃথিবী ও আকা-

শাদি সকলের বিপর্য্যস্তভাব অনুভব করে। কখন তাহার বোধ হয়, সে যেন অনবরত পতিত ও ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইতেছে। আবার কখন কখন যেন স্বীয় নিঃশ্বাস ধ্বনি শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে এবং কখন মনে করে, যেন তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্রণজন্য বিষম বেদনায় অভিভূত হইয়াছে।

দিবাকর অস্তাচল গমনে উন্মুখ হইলে, আলোকচ্ছটা মন্দীভূত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল যেমন শ্যামায়মান হইয়া উঠে, মৃত্যুকালে লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সেইরূপ ক্রমে ক্রমে শ্যামলতা বা মালিন্য ধারণ করে। তৎকালে স্মৃতি-শক্তির ক্ষয় হওয়ায় পূর্ব্বাপর জ্ঞান তাহাদের কিছুই থাকে না। সন্ধ্যাসময় সমাগত হইলে অষ্টদিকে যেমন দৃষ্টি নষ্ট হয়, মুমূর্ষুর দৃষ্টির অবস্থাও তেমনি তখন ঘটিয়া থাকে। মোহের আবির্ভাবে মুমূর্ষুর কল্পনাশক্তি ও বিবেকশক্তি বিদূরিত হইয়া যায়; সুতরাং ক্রমশ তাহার মহামোহ-জনিত অভিভব দশা উপস্থিত হয়। প্রাণ বায়ু দ্বারা যাবৎ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্তব্ধভাবাপন্ন না হয়, তাবৎ ঈষৎ মূর্চ্ছাবস্থায় পতিত থাকে; কিন্তু যখন প্রাণবায়ুর সঞ্চার রুদ্ধ হয়, তখন মহামোহের আবির্ভাব ও সেইজন্য অভিভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন,—দেবি! শির, পাণি, পাদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট হইলেও এই দেহ কি নিমিত্ত ব্যথিত, বিমোহিত, মূর্চ্ছিত, ভ্রান্ত, ব্যাধিত ও চেতনাবিরহিত হইয়া থাকে?

দেবী কহিলেন,—ক্রিয়াশক্তিময় পরমেশ্বর এইরূপ কর্ম্ম সঙ্কল্প বিধান করিয়াছেন যে, আমা হইতে অভিন্ন জীব বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে অমুক অমুক প্রকার দুঃখ ভোগ করিবে। সত্য সঙ্কল্প পরমেশ্বরের ঐ সঙ্কল্প স্বভাব ও নিয়তি নামে অভিহিত। স্বকল্পিত তরুগুল্মাদি যেমন স্বীয় দুঃখাদি অনুভবের হেতুস্বরূপ হয়, সেইরূপ সেই হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্প-সমুৎপন্ন যে উপাধি, তাহাতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবে বিরাজমান হয়েন বলিয়াই উপাধি-ঘটিত দুঃখাদি তদীয় দুঃখাদিবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে; অতএব একমাত্র চিত্ত-বিজৃম্ভণ বা চিত্ত-বিকাশই ঐ দুঃখের কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কারণ নাই।

যৎকালে ক্রিয়াশক্তিময় পরমেশ্বরের সংস্থাপিত নিয়মানুসারে নাড়ী

সকল প্রতপ্ত পিত্তাদি রস-পূর্ণতা বশতঃ ব্যথিত হইয়া তজ্জন্য সঙ্কোচ ও বিকাশ সহযোগে ভুক্ত অন্ন ও পান-রস গ্রহণ করে, তখন শরীরস্থ সমানবায়ু ভুক্ত অন্ন পানীয়াদির সমীকরণরূপ নিজস্থিতি পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সমস্ত বায়ু নাড়ীমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক বিনির্গমন করিলে অথবা বিনির্গত হইয়া আর প্রবিষ্ট না হইলে নাড়ীব্যাপারের অবরোধ ঘটিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের স্পন্দনাদি যাবতীয় কার্য্য স্থগিত হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান এক কালেই তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপে অপান বায়ু দেহপ্রবেশে সমর্থ না হইলে এবং প্রাণবায়ু মুখ ও নাসিকাযোগে নির্গত হইলে, সমস্ত নাড়ীব্যাপার রহিত হয়। জীবের এই অবস্থাকেই মৃত্যু কহে।

বৎসে! 'আমি জন্মিব ও এতকালের পর মরিব' এই প্রকার যে প্রাক্তন চিৎসঙ্কল্পরূপা নিয়তি, তাহাই মৃত্যুর কারণ। 'আমি এইস্থানে এই প্রকার হইব' ইত্যাদিরূপ যে চিৎসঙ্কল্প আদি সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই সঙ্কল্প মায়াশক্তির স্বভাব—অবিনাশী। তাহার কখন নাশ নাই বা তাহা কখন বিশ্লেষ হইবার নহে। আদি সৃষ্টি-সমুৎপন্ন সম্বিৎ-সংজ্ঞিত জ্ঞান স্বভাব হইতে অভিন্ন এবং স্বভাবরূপ সংবিদ্ হইতে জন্ম ও মরণ এ উভয়ও ভিন্ন নহে। অতএব যাবৎ না জ্ঞানবলে মুক্তি হয়, তাবৎ জীবের জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি হয় না। নদীর জল যেমন কখন আবর্ত্তশালী, কখন কালুষ্যময় এবং কখন কখন নির্ম্মল, সেইরূপ ঐ জীবচৈতন্যও কখন সাধনাদি দ্বারা নির্ম্মল এবং কখন কখন জীবধর্ম্ম রাগদ্বেষাদি দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে। যেমন দীর্ঘ দীর্ঘ লতার মধ্যে মধ্যে গ্রন্থিসকল বিদ্যমান, তেমনি ঐ চেতনসত্তারও জন্ম ও মৃত্যু গ্রন্থিস্বরূপ। এতৎসমস্তই অজ্ঞানীর নিয়তি উক্ত হইল; পরন্তু পরমার্থদর্শীর দৃষ্টিতে এ সকলই মিথ্যা বা অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া প্রতিভাত। তাঁহারা এই প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত আছেন যে, চেতনপুরুষ বা চিদাত্মা কখন জন্মেন না বা কখন মরেন না। তিনি ঐ জন্ম-মৃত্যুরূপ কাল্পনিক ভাবদ্বয় কখন কখন স্বপ্নবৎ অনুভব করিয়া থাকেন, এই মাত্র। চেতনা-মাত্রই পুরুষ। সে পুরুষের কখন বিনাশ নাই। চেতনা ব্যতীত অপর কোন বস্তু দ্বারা পুরুষকার-সমুচিত কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। এইজন্য চেতনা ভিন্ন অন্য কেহ কখন পুরুষপদ-বাচ্য হইতে

পারে না। ফলে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা চিত্ত ঐ সকলের কেহই পুরুষ নহে, সকলই জড়; সুতরাং যাহা জড়, তাহার দৃশ্য-প্রকাশ বা দৃশ্যানুভবের সামর্থ্য কখন হইতে পারে কি? বস্তুতঃ চেতনামাত্রই পুরুষ, এই সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত। অতএব সাক্ষী বা প্রমাণ নাই বলিয়াই চেতনের মরণ অসিদ্ধ। জিজ্ঞাসা করি, তুমি বলিতে পার এই সংসারে অদ্য পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কখন চৈতন্যের মৃত্যু দেখিয়াছে কি? ফলে, প্রতি নিয়ত লক্ষ লক্ষ দেহই মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে; পরন্তু চৈতন্য যেমন অক্ষয়, তেমনই রহিয়াছেন। আর যদি চৈতন্যের মরণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে একই চৈতন্য যখন সকল জীবে বিরাজমান, তখন এক ব্যক্তির চৈতন্য নাশ পাইলে অন্যের অবস্থান অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলে, জীবের জীবন-মরণ কথাটা বাস্তব কিছুই নহে; উহা কেবল বাসনার বৈচিত্র্য মাত্র। নামমাত্রেই কেবল জীবের জন্মমৃত্যু পরিকল্পিত। বাস্তবিক পক্ষে জীবের জন্ম-মৃত্যু কিছুই নাই। জীবগণ কেবল স্ব স্ব বাসনাগর্ভেই বারম্বার বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

বৎসে! সুদৃঢ়-বিচার-সহায়তায় যখন বুঝিতে পারা যায় যে, দৃশ্যবস্তু মাত্রেই একান্ত বিনশ্বর, তখনই বাসনার বিলয় হইয়া থাকে। বাসনার অবসানে দৃশ্যসত্যতা আর থাকে না। বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন অধিকারী জীব, সদ্‌গুরুর উপদেশাবলী শ্রবণ ও অভ্যাসাদি দ্বারা বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে যেইমাত্র এইরূপ অনুধাবন করে যে, এই ভ্রম-বিজৃম্ভিত জগৎ-প্রপঞ্চ বিদ্যমান রহিলেও সর্ব্বথা অবিদ্যমান বা অনুদিত, তৎক্ষণ মাত্রেই তদীয় দ্বৈতবাসনা ক্ষয় হয় এবং তৎসহকারে জীব ভবভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই বিমুক্ত আত্মস্বরূপই সংসারে সত্য বস্তু; অন্য কিছুই সত্য নহে।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

লীলা কহিলেন,—দেবি! মদীয় বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় জন্তুগণের এই জনন-মরণ-বিবরণ কীর্ত্তন করুন।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! নাড়ীর গতি নিরুদ্ধ হইলে যখন জীবের প্রাণবায়ু স্পন্দন-হীন হয়, তখন তদনুগত চেতনাও যেন প্রশান্ত হইয়া যায়। ফলে কিন্তু চেতন শুদ্ধ ও নিত্যস্বরূপ; তাঁহার উদয় বা ক্ষয় কোন কালেই নাই। তিনি স্থাবর, জঙ্গম, গগন, পবন, অনল, অচল, সর্ব্বত্রই বিরাজমান। শরীরসঞ্চারী বায়ুর নিরোধ ঘটিলে শরীরের স্পন্দন-ব্যাপার যখন তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই ঐ জড় দেহকে মৃত বলিয়া অভিহিত করা হয়। শরীর শবরূপে পরিণত হইলে প্রাণবায়ু যখন মহাবায়ুতে মিশিয়া যায়, তখন জীবচেতনা পূর্ব্ব-সঞ্চিত বাসনার সহিত পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু পুনর্জ্জন্মের মূলকারণ বাসনার সহিত মিলিত থাকে বলিয়া ঐ সূক্ষ্মস্বরূপ চেতনা পৃথক্ না হইলেও পৃথকের ন্যায় ব্যবহারগোচর হইয়া জীবনামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জীব স্বস্থানে থাকিয়াই বাসনা-বশতঃ পরলোকে গমনাদি অনুভব করে; বস্তুতঃ গমনাদি করে না। এ সম্বন্ধে সেই শবগৃহাভ্যন্তরের আকাশে তোমার সেই ভর্ত্তৃজীবের অবস্থান ও বাসনানুসারে তদীয় পরলোক-গমনাদির অনুভবই দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, ব্যবহারিগণ ঐ অবস্থায় সেই শরীরাভিমানত্যাগী জীবকে প্রেত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বৎসে! বায়ুতে যেমন সুগন্ধ বিরাজিত, চেতনে তেমনি জীববাসনা বিজড়িত। জীব যৎকালে প্রাক্তন দেহাদি দৃশ্য পরিহারপূর্ব্বক দেহান্তরাদি অন্য দৃশ্য দর্শনে প্রবৃত্ত হয়, তখন আপনিই আপনাতে স্বপ্নের ন্যায় স্বীয় স্বীয় বাসনার অনুরূপ পরলোক গমন ও তথাকার ভোগাদি অনুভব করে এবং সেই প্রদেশেই আবার পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় স্মৃতিসম্পন্ন হয় ও পুনরায় মরণমোহ অনুভব করিয়া দেহান্তর অনুভব করিয়া থাকে। এক আকাশ,

অথবা আকাশ ও পৃথিবী এই উভয় কিম্বা রবি-শশি-গ্রহ-নক্ষত্রময় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, এ সকলই মায়ার অঘটনঘটন-সামর্থ্যে অনন্ত আত্মার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিলেও আকাশ ও পৃথ্বী অথবা সমগ্র বিশ্ব মৃত পুরুষের আত্মায়ও আকাশগত মেঘঘটার ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু অপর লোকে তাহা অবলোকন করিতে পারে না। তাহারা কেবল আকাশ বা গৃহাকাশেরই অস্তিত্ব অবলোকন করে।

অয়ি লীলে! আমি অধুনা বিবিধ প্রেতের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রেত ছয় প্রকার; সামান্য পাপী, মধ্যপাপী ও স্থূলপাপী এবং সামান্য ধার্ম্মিক, মধ্যম ধার্ম্মিক ও উত্তম ধার্ম্মিক। এই সকল প্রেতের মধ্যেও আবার অবান্তর ভেদ আছে; যথা—সামান্য পাপী, সামান্যতর পাপী এবং সামান্যতম পাপী ইত্যাদি। উল্লিখিত পাপাত্মাদিগের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী পাষাণের ন্যায় জড়ীভূত ও নিবিড় মোহতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া সম্বৎসর যাবৎ মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিতে থাকে। অনন্তর কালবশে জাগরিত হইয়া চিরকাল বাসনাজঠর-সমুদিত অক্ষয় নরক দুঃখ অনুভব, শত শত যোনিতে সমুদ্ভব ও বহুল দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। তারপর ভোগাবসানে কদাচিৎ কেহ কেহ এই সংসাররূপ স্বপ্নসম্ভ্রম-ব্যাপারের শান্তি লাভ করে। অথবা মরণান্তর শত শত জড়দুঃখ-সমাকুল বৃক্ষাদি যোনিতে পতিত হইয়া পুনঃপুনঃ তদবস্থা ভোগ করে। তৎপরে নরকে গিয়া স্বীয় বাসনানুরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিবার পর ভূতলে আসিয়া বহুকাল বহুযোনিতে জন্ম লইতে থাকে।

বৎসে! যাহারা মধ্যপাপী, মরণ মূর্চ্ছার পর কিয়ৎকাল তাহাদের শিলাজঠরবৎ জাড্য দশা ভোগ হইয়া থাকে। অনন্তর কালান্তরে অথবা সেই কালেই তাহাদের সেই দশার অবসান হয়। তাহারা তখন কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইয়া তির্য্যগাদি নানাযোনিতে পুনঃপুনঃ জন্ম লইয়া থাকে। সামান্য পাতকী সকল মৃত্যুর পরই পুনরায় স্ব স্ব বাসনানুরূপ সুসম্পন্ন অক্ষত মনুষ্যাদি দেহ অনুভব করিতে থাকে এবং স্বপ্ন ও সঙ্কল্পসদৃশ তাদৃশ দেহানুভূতির সমকালীন জননমরণাদির স্মৃতিও তাহাদের সমুদিত হয়। যাঁহারা মহাপুণ্যবান্ মহাপুরুষ, মরণমূর্চ্ছার পর্য্যবসানে তাঁহাদের স্মৃতিতে

স্বর্গীয় বিদ্যাধরপুর অনুভূত হইতে থাকে। অনন্তর অন্যত্র অন্য কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিয়া পরে মনুষ্যলোকে পরম শ্রীসম্পন্ন সজ্জনবংশে সমুৎপন্ন হয়েন।

যাঁহারা মধ্যম ধার্ম্মিক লোক, তাঁহারা মরণ-মোহের পর গগন-পবনে পরিচালিত হইয়া ওষধিপল্লবময় নন্দনকাননাদিতে কিন্নর কিম্পুরুষাদি দেহ লাভ করেন। সেখানে সুন্দর স্বকর্ম্ম ফল ভোগের পর বায়ু-বৃষ্ট্যাদি দ্বারা ভূমিগত ব্রীহিযবাদিতে প্রবেশপূর্ব্বক অন্নভূত হইয়া ব্রাহ্মণাদির হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ রেতোনিষেকক্রমে জাতিক্রম-সমুচিত নারীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। প্রেতগণ মরণমূর্চ্ছার পর ক্রমেই হউক আর অক্রমেই হউক, স্ব স্ব বাসনানুসারে উল্লিখিত ব্যবস্থারই বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। ছয় প্রকার প্রেতের মধ্যে চতুর্থ প্রেতের গতিও উক্তরূপে ব্যবস্থিত। ফল কথা, মরণ-মোহের অব্যবহিত পরক্ষণে সকলেই চেতনালাভান্তে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে ক্রমে বা অক্রমে স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের ন্যায় ভাবী দেহ ও ভোগ্যাদি বস্তু অনুভব করে; অবশেষে তদনুরূপ দেশ ও দেহাদি লাভের পর পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রেতগণ মূর্চ্ছাভঙ্গের পর প্রথমে এইরূপ মনে করে যে, আমি মরিয়াছি। অনন্তর দাহাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ হইবার পর পুত্রপ্রভৃতিরা পিণ্ডদানাদি সমাধা করিলে মনে করে, আমার দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর যমালয়ে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়া অনুভব করে যে, এই সকল কালপাশধারী যমদূতেরা আমাকে যমপুরে লইয়া চলিয়াছে। আমি যমদূতগণের নেতৃত্বে ক্রমে পাথেয়স্বরূপ মাসিক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তর্পিত হইয়া সম্বৎসরে সে পুরে প্রয়াণ করিতেছি।

বৎসে! পুণ্যাত্মগণ স্ব স্ব কর্ম্মলব্ধ সুশোভন উপবন ও বিচিত্র বিমান-পরম্পরায় পুনঃপুনঃ বিহার করিয়া থাকেন। পাপাত্মারা স্ব স্ব দুষ্কৃত-কর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ ফলস্বরূপ শিশিরপূর্ণ গর্ত্ত, কণ্টক ও শস্ত্রসমাকুল অরণ্য প্রভৃতিতে পতিত হয়। মধ্যম পুণ্যাত্মাগণ এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন যে, এই আমার গতিসুখপ্রদ পন্থা; ইহা নব নব শীতল তৃণগুচ্ছে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই পথ ধরিয়া স্বচ্ছন্দ পদবিন্যাসে যমলোকে গমন করা যায়। আমার সম্মুখে সুন্দর বাপিকা ও স্নিগ্ধ ছায়া অবস্থান করি-

তেছে। এই আমি যমপুরে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই সেই ভূত-পতি যমরাজ সম্মুখে রহিয়াছেন। রাজসভাস্থ চিত্রগুপ্ত এই আমার কৃত কর্ম্মের বিচার করিতেছেন।

এইরূপে মরণের পর প্রত্যেক প্রেতেরই ভিন্ন ভিন্ন পারলৌকিক অনুভব হইয়া থাকে। পরন্তু সকলেই এই বিবিধ কল্পিত ব্যবহারময় আপাত প্রকাশশীল বিশাল সংসারকে সত্য বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু তাহাদের স্বরূপ দৃষ্টি থাকিলে, তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিত, একমাত্র অমূর্ত্ত শূন্যাত্মাই সতত জাগরিত রহিয়াছেন। দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দৈর্ঘ্যাদি দ্বারা প্রকাশমান এই জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই নহে।

অনন্তর যমনগর-নীত ব্যক্তিগণ এইরূপ অনুভব করিতে থাকে যে, এই আমি স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যমরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলাম। অধুনা এই যমপুর হইতে স্বর্গে কিম্বা নরকে প্রস্থান করিলাম। যমরাজ আমার সম্বন্ধে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই আমি তদনু-সারে সুখ-সংবিধায়ক স্বর্গ অথবা দুঃখ-নিদান নিরয় ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই আমি যমরাজের আদেশ অনুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগের যোগ্য যোনি লাভ করিলাম। এই ত আবার আমি মানবীয় সংসারে প্রাদুর্ভূত হইলাম। এই সকল অনুভব করিবার পর তাহারা পৃথিবীস্থ শস্যাদি মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর এই আমি শালিরূপে পরিণত হইলাম; ক্রমে কাণ্ড, পত্র ও গর্ভমঞ্জরী হইয়া শেষে এই ফল হইয়া রহিলাম। ইত্যাদিরূপ বোধ তাহাদের হইয়া থাকে। অবশ্য ঐ শালি-প্রভৃতি ভাব তৎকালেই তাহাদের অনুভবসিদ্ধ হয় না; কেন না, তখন ইন্দ্রিয়গণ লুপ্ত বা মূর্চ্ছিত থাকে বলিয়া বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে উত্তরকালীন মনুষ্যাদি দেহে যখন শ্রুতি-পুরাণাদি শ্রবণে বোধ উপস্থিত হয়, তখনই আপনাদিগের ঐ সকল ভাব উপলব্ধি করিতে পারে।

অনন্তর জীব ফলরূপে ভুক্ত অন্নাদি যোগে পিতৃশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক রেতোভাব প্রাপ্ত ও যোনিদ্বারে গলিত হইয়া মাতৃশরীরে গর্ভরূপে অবস্থান করে। পরে সেই গর্ভই প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সুখ-সৌভাগ্যাদি-

শালী সাধুস্বভাব কিম্বা দুঃখ দৌর্ভাগ্যাদি-সম্পন্ন দুঃশীল বালকরূপে সমুৎপন্ন হয়। অনন্তর চন্দ্রের ন্যায় উপচয় ও অপচয়স্বভাব চঞ্চল অথচ মনোজ্ঞ মদনোদ্দীপক যৌবন কাল অনুভব করিতে থাকে। তার পর পদ্মের মুখে হিমরূপ অশনিপাতের ন্যায় দুর্জ্জয় জরার আক্রমণে সে যৌবন নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর বিবিধ বিষম ব্যাধির বশীভূত হইয়া পুনরায় মরণ-মূর্চ্ছা অনুভব করিতে হয়। শেষে বন্ধুগণ আবার ঔর্দ্ধ-দেহিক পিণ্ড প্রদান করে। সেই পিণ্ডের সাহায্যে স্বপ্নের ন্যায় দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার যমলোকে উপনীত হয় এবং পুনঃপুনঃ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ ভ্রমপরম্পরা অনুভব করিতে থাকে। ব্যোমরূপী আত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হইবার পর হইতে যে পর্য্যন্ত না মোক্ষলাভ হয়, ততকাল ঐ ব্যোমদেশেই ঐ প্রকার চমৎকার পরিবর্ত্তন বারম্বার অনুভব করিতে থাকেন।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন,—হে দেবি! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যেরূপে এই ভ্রম প্রবর্ত্তিত হইতেছে, আপনি প্রসন্নমনে মদীয় বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় তাহা কীর্ত্তন করুন।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! এই পর্ব্বত, পাদপ, পৃথ্বী, আকাশ, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সকলই পরমার্থঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধচৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মায়ার প্রভাবে এই সকল মায়িক প্রতিভাস বিশুদ্ধ চৈতন্যেই সমুদিত হয়। চেতনাময় পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী; তিনি যখন যে যেখানে যেরূপ আকারে আবির্ভূত হয়েন, তখন সেই সেইখানে সেইরূপ আকারেই প্রথিত হইয়া থাকেন। সেই ঈশ্বরই স্বপ্ন-সঙ্কল্পয়িতা পুরুষের ন্যায় জীবসমষ্টি আকারে আদি প্রজাপতি হইয়া সৃজ্য সঙ্কল্পস্বরূপে ভূরাদি সপ্তলোকক্রমে বিবর্ত্তিত হয়েন। তদীয় সৃষ্টিকালীন সেই যে সঙ্কল্প, তাহা অদ্যাপি একইরূপে রহিয়াছে। ঐ আদি প্রজাপতি মায়াসম্বলিত ব্রহ্মের প্রথম সাঙ্কল্পিক রূপ এবং নিখিল পদার্থপরম্পরার প্রতিবিম্বস্বরূপ। তথাবিধ প্রজাপতি হইতে যাহা কিছু বিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সকল অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বৎসে! দেহের যে বাতযন্ত্র স্থান আছে, তাহাতে অনিল প্রবেশ

করিয়া অঙ্গসমূহ সঞ্চালিত করিলে, দেহকে জীবিত নামে অভিহিত করা হয়। এই জীবিতই জঙ্গম নামে পরিচিত। পাদপ প্রভৃতির চৈতন্য থাকিলেও তাহারা চেষ্টাশূন্য—নিস্পন্দ; তাই তাহাদিগকে স্থাবর নামে নির্দ্দেশ করা হয়। চেতন হইলেও তাহাদের এই অচেতন স্থাবরনাম প্রথমাবধিই নিরূপিত হইয়া আসিতেছে। পরাৎপর পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে এই প্রকার চেতনা বিভাগস্থিতি স্থাপন করিয়াছেন। যে চিদাকাশ কর্ত্তৃক জীব ও অজীব এই দ্বিবিধ বিভাগ কল্পিত হইয়াছে, তাঁহার আপনার যে অংশে জীববিভাগ বিহিত, সেই চিদাকাশকেই সম্বিদ্ বলা হয়। এই সম্বিদের কোন কালেই শেষ নাই। চিৎস্বরূপ পরমাত্মা বুদ্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট ও ঔপাধিক নরদেহরূপ পুরপ্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদি গোলকস্থান প্রাপ্তির পর চাক্ষুষাদি বুদ্ধিবৃত্তি যোগে বাহ্যার্থ প্রকাশিত করিয়া দেন। ঐ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল স্বয়ং চেতন নহে; কেন না, সৃষ্টির কিছুই চেতন বা জীবিত নহে। সুতরাং জানিতে হইবে, একমাত্র চিৎসঙ্কল্পই সমস্ত বস্তুর এই প্রকার ব্যবস্থিতি বিধান করেন। তাঁহা হইতেই বিশ্বের সর্ব্বস্বব্যবস্থা নিষ্পন্ন। সেই শূন্যাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ, ভূম্যা-কার চিৎসঙ্কল্পই ভূমি এবং জলশক্তিযুক্ত চিৎসঙ্কল্পই জল। অর্থাৎ চিৎই আকাশ সঙ্কল্প দ্বারা আকাশ, ভূমি সঙ্কল্পদ্বারা ভূমি এবং জল সঙ্কল্প দ্বারা জল হইয়া স্থিত। চিৎই স্থাবর সঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর এবং জঙ্গম সঙ্কল্প দ্বারা জঙ্গমস্বরূপ পরিগ্রহ করেন। এইরূপে তিনি বৃক্ষশিলাদি বিবিধরূপে আবি-র্ভূত হয়েন। চিৎ যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তখন সেইরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। বৃক্ষাদি যে সকল জড় পদার্থ যে প্রকার ভাবনায় অব-স্থিত ছিল, সেই বৃক্ষ, শিলা ও তৃণপ্রভৃতি অদ্যাপি সেইরূপেই ভাবিত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুগত্যা জড় বা চেতন নামে পৃথক্ পদার্থ কিছুই নাই। সৃষ্টির আদি হইতেই জড়ের সহিত চেতনের সত্তাসামান্যতঃ ভেদ বিদ্যমান নাই। বৃক্ষ ও উপলাদিরও অভ্যন্তরে যে স্বসম্বিদ্ নিহিত রহিয়াছে, উহা বুদ্ধ্যাদি-কল্পিত,—বাস্তব নহে। বৃক্ষাদির নাম ও রূপাদি সমস্তই তৎকৃত অর্থাৎ তাহারই কল্পনা-সম্ভূত। তথাবিধ সম্বিদন্তর্গত স্থাবরাদির বৃক্ষ, শৈল ইত্যাদি নাম সঙ্কেত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কৃমি, কীট ও পতঙ্গাদির

অন্তঃস্থিত সম্বিদই তাহাদের বুদ্ধি প্রভৃতি। এই বুদ্ধি প্রভৃতি বিকারভেদেই তাহাদের ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা হইয়া থাকে। মনে কর, যেমন কেহ জানাইয়া না দিলে, উত্তর সাগরতীরস্থ জনগণ দক্ষিণ সাগরতীরবাসী লোকসকল আছে কি নাই, সে সংবাদ জানিতে পারে না, সেইরূপ সম্বিদ্ ব্যতীত এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের কোন কিছুই সত্তাস্ফূর্ত্তি লাভে সমর্থ নহে। স্থাবর জঙ্গম সকলেই স্ব স্ব চৈতন্যসাক্ষিক জ্ঞান লইয়া অবস্থান করিতেছে; এই কারণেই অন্য বুদ্ধির কল্পনা তাহাদের অবিদিত। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে, নিখিল ব্যবহারই পরস্পর পরস্পরের বুদ্ধি সঙ্কেত অপেক্ষা করে। অপিচ সদ্রূপ পরব্রহ্মে বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থের প্রকৃত সত্তা না থাকিলেও উহারা যে কাল্পনিক সত্তায় অনুস্যূত এবং উহা যে উল্লিখিত কারণে অসম্ভব নহে, ইহাও বুঝিতে হইবে। ফলে, প্রস্তরমধ্যবর্ত্তী মণ্ডূক ও তদ্বহিস্থিত মণ্ডূক, ইহারা যেমন পরস্পর পরস্পারের কল্পনায় অন্তঃসম্বেদ-শূন্য ও জড়, স্থিতিশীল যাবতীয় পদার্থসম্বন্ধেই সেইরূপ একই অবস্থা পরিজ্ঞেয়। অর্থাৎ প্রস্তর এবং বৃক্ষের অংশবিশেষ মধ্যে ভেক অবস্থান করে। ঐ সকল ভেক কূপমধ্যস্থিত ভেকদিগকে জানিতে পারে না এবং কূপমধ্যে যে সকল ভেক থাকে, তাহারাও প্রস্তরমধ্যস্থিত ভেকদিগকে জানে না; সুতরাং ঐ উভয় স্থানস্থিত ভেকই উভয়ের বিষয়ে সম্বেদন-শূন্য বা জড়। এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধি যাহা কল্পনা করে, তাহাই তাহার নিকট আছে এবং সে যাহা কল্পনা করে না, তাহা তাহার বোধে নাই বলিয়া স্থির থাকে। এই অনুসারে সমস্ত দৃশ্যই বুদ্ধির কল্পনা; কাজেই সে সকল অসৎ।

বৎসে! যাহা এই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা, মহাপ্রলয়ে মায়ার অন্তরে বিলীন সেই সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত সমষ্টিচিত্ত পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রত্যক্ চৈতন্যাখ্য চিদাকাশ দ্বারা যেরূপে যে যে ভাবে চেতিত বা অনুভূত হইয়া ছিল, অদ্যাবধি সেইরূপে ও সেই ভাবেই তাহা চেতিত হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহা স্পন্দনস্বভাব বায়ুরূপে চেতিত বা প্রথিত ছিল, এখনও তাহা সেইরূপেই রহিয়াছে। যাহা সুষিরস্বরূপে চেতিত হইয়াছিল, তাহা আকাশ আখ্যায় প্রখ্যাত হইতেছে এবং এই আকাশে অদ্যাপি স্পন্দন-

স্বরূপ বায়ু বিরাজ করিতেছে। সমীরণ সর্ব্বব্যাপী হইলেও তদীয় সঞ্চালনে প্রস্তরাদি গুরু বস্তু স্পন্দিত না হইয়া শুষ্ক তৃণাদি লঘু বস্তু সকলই স্পন্দিত হইয়া থাকে।' এইরূপ চিত্ত সর্ব্বগামী ও সর্ব্বস্থানস্থ হইলেও শরীরগত সমীরণের প্রচলন ও অপ্রচলন বশতঃ স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই বিশেষ ভাবই তৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়।* জঙ্গমে বায়ুর স্পন্দন আছে। স্থাবরে বায়ুর স্পন্দন নাই। অর্থাৎ স্থাবরে প্রাণযন্ত্রের অভাব নিবন্ধন শরীরস্থ প্রাণ-বায়ুর স্পন্দনসামর্থ্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপে আদি সৃষ্টিকালে সেই সম্বিৎচৈতন্যে ভ্রান্তিময় বিশ্বের যে যে পদার্থ যে যেরূপে কিরণবৎ পরি-স্ফুরিত হইয়াছিল, অদ্য পর্য্যন্ত সেই সেই স্ফুরণ চলিয়া আসিতেছে।

অয়ি লীলে! এই দৃশ্য বিশ্ব পদার্থের স্বভাববিজৃম্ভণ অসত্য হইলেও যেরূপে তাহা সত্যবৎ প্রতিভাত হয়, তাহা তোমার নিকট কহিলাম। এক্ষণে অবলোকন কর, এই বিদূরথ রাজা প্রায় অস্তগত হইয়াছেন। তিনি প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুষ্পমালাপিহিত শবীভূত সেই ভবদীয় ভর্ত্তা পদ্মভূ-পতির হৃৎপদ্মে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন,—দেবেশি! ইনি এক্ষণে কোন্ পথ দিয়া সেই শবমণ্ডপে প্রবেশ করেন, আসুন, আমরা উভয়ে গিয়া সত্বর তাহা সন্দর্শন করি।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! 'আমি দূরস্থ অপর লোকে যাইতেছি' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঐ চিন্ময় জীব অন্তরস্থ বাসনাময় পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক চলিয়াছেন। আইস, আমরাও এই পথ ধরিয়া গমন করি। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। পরস্পরের মনোমিলন না হইলেই সৌহার্দ্দ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; অতএব চল, এক্ষণে যাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সরস্বতী ঐরূপ বাক্যাবলী বলিলে, নর-পতিনন্দিনী লীলার মন নির্ম্মল হইল; অন্তরের সর্ব্বসন্তাপ দূরে গেল এবং

---

* বৃক্ষাদি স্থাবর জীবে চৈতন্য আছে। কেবল প্রাণ তাহাতে নাই। প্রাণ নাই—অর্থে প্রাণ ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির কার্য্য করিবার যন্ত্র স্থাবর দেহে নাই। এইজন্য বৈজ্ঞানিক বুধগণ বলেন, প্রস্তর প্রভৃতিতেও চেতনা আছে; কিন্তু যথাযোগ্য আধারের অভাবে সে চৈতন্য ব্যক্ত নহে।

তদীয় জ্ঞানসূর্য্য সমুদিত হইল। এই সময়ে চিত্ত বিগলিত ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে রাজা বিদূরথ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! এই সময়ে রাজা মূর্চ্ছিত হইলে, তাঁহার চক্ষুর তারা পরিবৃত্ত হইতে লাগিল, অধরদেশ শুষ্ক ও শুভ্র হইল। তিনি কেবল সূক্ষ্ম প্রাণমাত্রে অবশিষ্ট রহিলেন। তৎকালে তাঁহার দেহ জীর্ণ পর্ণবৎ বর্ণবিশিষ্ট ও মুখচ্ছবি ক্ষীণ ও পাণ্ডুপ্রভ হইল। অনন্তর তদীয় নাসারন্ধ্র হইতে ভ্রমর কূজনবৎ ধ্বনি সহকারে নিশ্বাস বায়ু বহিতে লাগিল। মরণ-মোহরূপ গভীর অন্ধকূপে তাঁহার মন যেন মগ্ন হইল এবং চক্ষুরাদি নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপার অন্তরে বিলীন হইয়া গেল। সর্ব্বাবয়ব নিস্পন্দ হইল। তিনি অচেতন অবস্থায় চিত্রার্পিত বা প্রস্তরসমুৎকীর্ণের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। অধিক বলা বাহুল্য, পতনোন্মুখ বৃক্ষ ছাড়িয়া পক্ষী যেমন অন্তরীক্ষে উৎপতিত হয়, অল্পক্ষণ মধ্যেই তেমনি তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু আকাশে প্রস্থান করিল।

তখন সেই দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন মহিলাদ্বয় রাজকীয় দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত সেই নভোগত প্রাণময়ী জীবসম্বিদ্‌কে অবলোকন করিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন, ঘ্রাণজ ব্যাপারে উপহিত সংবিৎ বায়ুগত সূক্ষ্ম গন্ধ অনুভব করিতে লাগিল। সেই রাজকীয় সম্বিৎ গগনপথে পবন সহ মিলিত হইয়া বাসনানুসারে সুদূর আকাশপথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর বায়ু-সংলগ্ন গন্ধলেশের অনুসরণকারিণী দুইটী ভ্রমরীর ন্যায় সেই মহিলা-দ্বয় রাজকীয় জীবসম্বিদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর মুহূর্ত্ত মধ্যে মরণমোহ কাটিয়া গেলে সেই জীবসম্বিদ্ বায়ু-বাহিত, গন্ধলেখার ন্যায় অম্বরতলে অনুভবসম্পন্ন হইয়া স্বপ্নবৎ বোধ

করিতে লাগিল।—যেন বন্ধু-বান্ধবেরা পিণ্ড প্রদান করিয়াছে, তাহাতে স্বীয় শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। কতকগুলি যমদূত আসিয়া সেই শরীর লইয়া চলিয়াছে। পরে যাহা বহু দূরে অবস্থিত, যেখানে বিচারফলে প্রাণিগণের কৃত কর্ম্মের ফলাফল প্রকাশ পাইতেছে এবং যে স্থান বিবিধ বিচার্য্য জীবগণে পরিবৃত, সেই যমনগরে সে শরীর উপনীত হইল। তখন যমরাজ সেই যমপুরানীত জীবকে দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ বলিয়া জানিলেন এবং স্বীয় দূতগণকে আদেশ করিলেন যে, এই নবাগত জীব কদাচ পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। ইঁহা কর্ত্তৃক নিত্যই মঙ্গলময় বিশুদ্ধ কর্ম্মসকল আচারিত হইয়াছে। ভগবতী সরস্বতীর বরে ইনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর শবীভূত প্রাক্তন দেহ গৃহাকাশে কুসুম-সমূহে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। অতএব ইহাঁকে পরিত্যাগ কর। ইনি সেই শবীভূত দেহে গিয়া প্রবেশ করুন।

অনন্তর ক্ষেপণীযন্ত্র-নির্ম্মুক্ত উপলখণ্ডের ন্যায় সেই জীবকলা যমদূত-গণ কর্ত্তৃক নভোমার্গে পরিত্যক্ত হইল। এদিকে লীলা ও সরস্বতী তৎ-প্রতীক্ষায় আকাশপথে অবস্থান করিতে ছিলেন। রাজকীয় জীব যখন আকাশপথে যাইতে লাগিল, তখন তাঁহারাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। লীলা ও সরস্বতী আকৃতিমতী হইলেও বিদূরথজীব তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। মহিলাদ্বয় সেই অতি সূক্ষ্ম জীবের অনুসরণ করিতে করিতে নভোমণ্ডল ও অন্যান্য লোক সকল লঙ্ঘন করিয়া সে জগদালয় হইতে সত্বর নির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দ্বিতীয় জগতে উপনীত হইয়া তদন্তর্গত ভূমণ্ডলে গমন করিলেন। সেখানে সেই সঙ্কল্পরূপিণী মহিলা-দ্বয় সেই সূক্ষ্ম জীবের সহিত মিলিত হইয়া পদ্মভূপতির ভবনে উপনীত হইলেন। অনন্তর বায়ুলেখা যেমন অম্বুজাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সৌরকর যেমন পদ্মে গিয়া পতিত হয় এবং সৌগন্ধ্য যেমন পবনে মিশিয়া যায়, তেমনি তাঁহারা ক্ষণমধ্যে লীলার অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ইতঃপূর্ব্বে আপনার কথায় জানিয়াছি, বিদূরথমহিষী মৃত লীলার জীব তদীয় দুহিতার সাহায্যে পথ চিনিয়া পদ্ম-ভূপতির পূরে গমন করিয়াছিল; পরন্তু বিদূরথ-জীবের পথ পরিচয়

কেমন করিয়া ঘটিল, পূর্ব্বে তাহা আপনার মুখে শুনি নাই; এই জন্য এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে সেই বিদূরথজীব পদ্মভূপতির শবগৃহ-সমীপে গমন করিল, কেমন করিয়া তাহার পথ পরিচয় ঘটিল এবং কি প্রকারেই বা সেই মৃত দেহ সজীবতা প্রাপ্ত হইল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই বিদূরথ-জীবের অন্তঃস্থিত বাসনায় পদ্মভূপতির দেহাভিমান নিহিত ছিল; সুতরাং তদীয় বুদ্ধিতে পথ প্রভৃতি প্রস্ফুরিত হইবার কোনই বাধা ছিল না বলিয়া সহজেই সে পথাদি পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতে পারিয়াছিল। বটবীজ যেমন আপন অন্তরে সূক্ষ্মস্বরূপে অবস্থিত বটবৃক্ষকে যথাকালে যথাকারণ-যোগে পরিপুষ্টাকারে অবলোকন করে, সেইরূপ জীবোপাধি সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে বাসনাত্মক অসংখ্য ভ্রম-কল্পিত সূক্ষ্ম জগৎ অবস্থিত থাকে। পরন্তু ঐ সকল জগতের মধ্যে যখন যাহা উদ্বোধক দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তখনই সে তাহা অনুভব করিয়া থাকে। সজীব বীজ যেমন আপন অন্তরে অঙ্কুরোদ্গম অনুভব করে, চিদণু জীবও সেইরূপ স্বীয় হৃদয় বা বুদ্ধিতে সংস্কারীভূত ত্রৈলোক্য অনুভব করিয়া থাকে। মনে কর, কোন লোক বিদেশে আছে; তাহার নিজের দেশ সে দেশ হইতে বহু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। সে যেমন বিদেশে থাকিয়া মনে মনে অনবরত ভাবনায় আপনার দেশের নিখাত ধনাদি সর্ব্বদা অবলোকন করে, সেইরূপ—হউক না শত শত জন্ম পরিবর্ত্তিত, তথাপি জীব স্ববাসনাস্থ ইষ্টানিষ্ট বা শুভাশুভ সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাহাকে পিণ্ড প্রদান করা হয় নাই, তাহার ত পিণ্ড-দানাদি বাসনা হয় না, তবে কিরূপে সে জীব শরীর প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বন্ধুজনেরা পিণ্ডদান করুক আর নাই করুক, মৃত জীব যদি 'আমাকে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে' এইরূপ বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহা হইলেই সে পিণ্ডফল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই বাসনাই তদীয় শরীর সম্পাদন করে। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের অনুভব এই যে, চিত্ত যেরূপ—জীবও তন্ময় বা তদাকৃতি হইয়া থাকে। জীবিতই হউক, আর মৃতই হউক, কোন কালেই ঐ নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটে

না। যাহারা পিণ্ডলাভ করে নাই, তাহারাও 'আমি সপিণ্ড হইলাম' এইরূপ জ্ঞানে সপিণ্ড বা ভোগদেহ-সম্পন্ন হইয়া থাকে আর যাহারা সপিণ্ড, তাহারাও 'আমি নিষ্পিণ্ড বা পিণ্ডপ্রাপ্ত হই নাই' এইরূপ সম্বিদে নিষ্পিণ্ড হইয়া থাকে অর্থাৎ পিণ্ড লাভের যে ফল, তাহা তাহার ঘটে না। এ কথা একান্তই সত্য যে, ভাবনাবলেই পদার্থের সত্যতা অনুভূত হইয়া থাকে; সেই ভাবনাও আবার সেই সেই কারণীভূত পদার্থের কারণ হইতে আবির্ভূত হয়। যেমন ভাবনাবলে বিষও অমৃত হয়, সেইরূপ অসত্য পদার্থও ভাবনাবশে সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। [ইহার দৃষ্টান্ত—গরুড়োপাসকেরা গরুড়াহম্ভাবনায় সর্পাদি-দংশন-জনিত বিষ বিদূরিত করিতে পারে। যোগীরাও ভাবনাবলে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ করিতে পারেন। অন্য দিকে কণ্টকাদি দ্বারা বিদ্ধ ব্যক্তির সর্প দংশন-ভ্রম উৎপন্ন হইলে, তখন সেই অসত্য ব্যাপারও সত্য বলিয়া ভাবনার ফলে, সত্য যে মরণাদি ক্রিয়া, তাহাও ঘটাইয়া থাকে] আবার এ কথাও নিশ্চয় জানিও যে, কারণ ব্যতীত কাহারও কখন কোনও ভাবনার সমুদ্রেক হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই আপনা হইতে নিত্যোদিত; তাঁহার কোনই কারণ নাই। তদ্ব্যতীত অপরাপর যে কিছু কার্য্যপরম্পরা, তাহাদিগকে সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বিনা কারণে কেহই কখন সমুদিত হইতে দেখে নাই এবং কেহ কখন শুনেও নাই। ভাবার্থ এই যে, অনিত্য পদার্থের সত্তা প্রতিপাদন করিতে গেলেই কারণসত্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শিগণের ইহা সিদ্ধান্ত যে, সেই বিশুদ্ধ চিন্মাত্রই বাসনা, তাহাই কার্য্য-কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিবশে জগদাকারে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—'আমার ধর্ম্ম নাই; আমি ধর্ম্মাচরণ করি নাই' প্রেত ব্যক্তি যদি এইরূপ বাসনায় অন্বিত হয়, আর তাহার বন্ধুবর্গ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া যদি তাহার উদ্দেশে সমর্পণ করে, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে কি না? ধর্ম্ম সমর্পণ করিলেও 'আমি ধার্ম্মিক নহি' প্রেতের এইরূপ অসত্য বাসনা এবং 'আমি ধর্ম্মদান করিতেছি' প্রদানকর্ত্তার এই সত্যবাসনা, এই উভয় বাসনার মধ্যে কোন্ বাসনা বলবতী?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শাস্ত্র-বিহিত দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও সম্পত্তি

বলে প্রেত-বন্ধুদিগের বাসনা সমুদিত হইয়া থাকে। ঐ বাসনা প্রেত-বাসনা অপেক্ষা বলবতী হয়; শাস্ত্রানুমোদিত ফলোপধায়িনী ক্রিয়া আর লৌকিক ক্রিয়া, এই উভয় ক্রিয়ার মধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত ফলোপধায়িনী ক্রিয়াই বলবতী। প্রেতবাসনা শাস্ত্রানুমোদিত নহে; কাজেই উহা দুর্ব্বল। সুতরাং যে বিষয়ের উদ্দেশ করিয়া যে বাসনার উদয় হয়, সে বিষয়ে সেই বাসনাই জয়লাভ করে। ধর্ম্মদাতার বাসনায় প্রেতবাসনা পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ 'আমি ধার্ম্মিক' ইত্যাকার বাসনা তাহার জন্মিয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্যে অনুমেয়। বন্ধুবর্গ ধর্ম্মদানাদি করিলে প্রেতের উপকার হয় বটে; কিন্তু প্রেত যদি নাস্তিক বা ধর্ম্মদ্বেষী হয়, তবে সে ক্ষেত্রে প্রেত-বাসনার নিকট বন্ধুবাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই প্রকার প্রবল দুর্ব্বলের পরস্পর জয়-ব্যাপারে প্রবলেরই জয় সুনিশ্চয়। সুতরাং বলা আবশ্যক যে, শুভাভ্যাসেই যত্ন করা কর্ত্তব্য। অশুভ চিন্তা কদাচ মনে স্থান দিবে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! দেশ ও কালাদির উৎকর্ষ বশতই যদি বাসনার সমুদ্রেক হয়, তাহা হইলে মহাকল্পান্তে সৃষ্টির আদিতে দেশ-কালাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা কোথায়? ফলে তখন সে সকল থাকে না; সুতরাং প্রথম সৃষ্টির কারণীভূত বাসনা কিরূপে কোথা হইতে আবির্ভূত হয়? এই দৃশ্য সকল যদি বাসনাকার্য্যই হয়, তবে সৃষ্টি-প্রারম্ভে দেশকালাদি সহকারী কারণের অভাব নিবন্ধন কোথায় কিরূপে বাসনাস্থিতি সঙ্গত হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! তুমি সত্যই বলিয়াছ। মহা-প্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিতে দেশকালাদি কিছুই থাকে না। সহকারী কারণের অভাবে দৃশ্য বস্তু কিছুই জন্মে না বা প্রস্ফুরিত হয় না। দৃশ্য বস্তুর অসম্ভবতা বা অভাব নিবন্ধন যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই সেই একমাত্র সচ্চিৎস্বরূপ অনাময় ব্রহ্ম; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যাহা হউক, এই বিষয়টী আমি বহু যুক্তিসহকারে তোমার নিকট পরে বিবৃত করিব। আমার যে এত প্রযত্ন, তাহা ইহারই জন্য জানিবে। এক্ষণে বর্ত্তমান প্রস্তাব শ্রবণ কর।

অনন্তর লীলা ও সরস্বতী পদ্মভূতির ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, যে ভবনের অভ্যন্তর অতীব মনোহর। তাহার নানাস্থান কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ হওয়ায় বসন্ত কালের ন্যায় সুখশীতল হইয়াছে। রাজধানীস্থ লোক সকল রাজকার্য্য হইতে বিরত হইয়া সেখানে সমবেত হইয়াছে। তথায় পদ্মভূপতির শবদেহ অবস্থিত আছে। ঐ শব মন্দার ও কুন্দপ্রভৃতি কুসুমমাল্যে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই শব-শয্যার শিরোভাগে তাঁহারা পূর্ণ কুম্ভাদি বহু মাঙ্গল্য দ্রব্য দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, তথাকার গৃহদ্বার ও গবাক্ষগুলি কঠিন অর্গলে আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপালোক নির্ব্বাপিত হওয়ায় অমল গৃহভিত্তি শ্যামলাভা ধারণ করিয়াছে। গৃহের একদেশে বহুলোক শয়ান রহিয়াছে। তাহাদের নিশ্বাস বায়ু সমভাবে নিঃসৃত হইতেছে। ভবনের বহির্ভাগ সম্পূর্ণ কলায় সমুদিত সুধাকর-করে কমনীয় এবং অভন্ত্যর ভাগ নারায়ণের নাভিকমলমুকুলোদরবৎ শোভমান। সে ভবনের সৌন্দর্য্যে পুরন্দরপুরী পরাজিত। সেই নির্ম্মল নিশাকরসমুজ্জ্বল ভবন নিঃশব্দ মূকবৎ বিরাজমান।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই অন্তঃপুরমণ্ডপে গিয়া সরস্বতী ও প্রবুদ্ধ লীলা দেখিলেন, তথায় অপ্রবুদ্ধ লীলা ভর্ত্তৃমরণের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া প্রথমে আসিয়া শবশয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বেশ, ব্যবহার, বাসনা, দেহসংস্থান, আকার, অঙ্গসঞ্চালন, রূপসম্পদ্,পরিধেয় বসন ও ভূষণ, সে সকলের কিছুই নূতন নহে। তবে তাঁহার তাৎকালিক বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রাক্তন বিদূরথ ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য পদ্মভবনে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার হস্তে চামর আছে। তিনি তাহা দ্বারা মহীপতিকে বীজন করিতেছেন। চন্দ্রমা সমুদিত হইলে আকাশ

যেমন শোভিত হয়, তদীয় অবস্থানে মহীতল তেমনি শোভমান হইয়াছে। তিনি বামহস্তে বদনেন্দু বিন্যস্ত করিয়া কিঞ্চিৎ নতভাবে মৌনব্রতে অবস্থান করিতেছেন। তদীয় ভূষণরাজির কিরণচ্ছটা কুসুমসমূহের ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছে; তাহাতে তিনি প্রফুল্লাকৃতি বনস্থলীর ন্যায় বিভাত হইতেছেন। তিনি যে যে দিকে দৃষ্টি চালনা করিতেছেন, সেই সেই দিকেই যেন মালতী বা উৎপলসকল বর্ষিত হইতেছে। তদীয় স্বীয় লাবণ্যপ্রবাহে আকাশে যেন শত শত সুধাকর সমুদিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, তিনি যেন নরপালরূপী বিষ্ণুর লক্ষ্মী আসিয়া সমুদিত অথবা যেন পুষ্পসম্ভার হইতে বসন্তলক্ষ্মী আবির্ভূত হইয়াছেন। ভর্ত্তার বদনমণ্ডলে তাঁহার সস্পৃহ দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। তদীয় মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ পরিম্লান হওয়ায় তিনি তখন ম্লানচন্দ্রা নিশার ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। সরস্বতী ও প্রবুদ্ধ লীলা তাঁহাকে দেখিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। কেন না, প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী সত্যসঙ্কল্পা ছিলেন; অপ্রবুদ্ধ লীলার সে সত্য-সঙ্কল্পতা ছিল না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি প্রথমে বলিয়াছেন, পূর্ব্বলীলা ভূপতি পদ্মের অন্তঃপুরমণ্ডপে দেহ স্থাপন করিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতীর সহিত বিদূরথ-ভবনে গিয়া ছিলেন। অধুনা আপনার মুখে আবার শুনিলাম, তিনি সরস্বতী সহ বিদূরথভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পদ্মভবনে আসিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই তথারক্ষিত দেহ কি হইল, কোথায় রহিল বা গেল, এক্ষণে সে সম্বন্ধে ত কৈ কিছুই আপনি বলিলেন না? যাহা হউক, সেই লীলাদেহের গতি-বিধির বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! কোথায় ছিল,—লীলার সে শরীর? তাহার কি সত্যতা আছে? বস্তুতঃ মরুভূমিতে জলবুদ্ধির ন্যায় দেহাদি জ্ঞান কেবল ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়। ফলে, লীলার সে ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছিল, তাই তিনি আর সে ত্যক্ত শরীরের সন্ধান করেন নাই। যাহা নাই—কেবল ভ্রান্তিমাত্র, তাহার আবার অনুসন্ধানে ফল কি?

বৎস! এই যে জগৎ দেখিতেছ, এ সকলই আত্মা; সুতরাং

এ রহস্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবার দেহাদি কল্পনা কিরূপে হইতে পারে ? যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, সমস্তই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ লীলার বোধ ক্রমশঃ যতই পরিপক্ক হইয়াছে, দেহও তেমনি বিগলিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে দেহ আর নাই বলিয়াই তাঁহার নিকট অবধারিত হইয়াছে। অধুনা আতিবাহিক দেহে লীলা যে সকল দৃশ্য দেখিতেছেন, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এ সকল ভূম্যাদি নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আধিভৌতিকরূপে অবস্থিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে আধিভৌতিক নামে কিছুই নাই। শব্দ বা অর্থ ইহার কোনও কিছুই সত্য নয়; শশ-শৃঙ্গের ন্যায় সকলই অসত্য। মনে কর, স্বপ্নাবস্থায় যদি কোন লোকের 'আমি হরিণ' এই প্রকার মতি সমুদিত হয়, তবে সে কি কখন নিজের মৃগত্ব পরীক্ষার্থ মৃগান্তরের অন্বেষণ করিয়া থাকে ? ফল কথা, আতিবাহিকে যদি 'আমি আধিভৌতিক' এই ভ্রম একবার বদ্ধমূল হয়, তবে তখন আর 'আমি আধিভৌতিক কি আতিবাহিক' সে বিচার তাহার থাকে না। রজ্জুতে সর্পভ্রম বিদূরিত হইলে, ভ্রমবান্ ব্যক্তির অন্তরে যেমন 'উহা ভ্রান্তিমাত্র' এইরূপ বোধ আবির্ভূত হয়, তেমনি ভ্রান্ত জনের ভ্রম অপগত হইলে, যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। এই যে কিছু আধিভৌতিক প্রপঞ্চ, এ সকলই অপ্রবুদ্ধ জীবের মনঃসমষ্টি-কল্পিত। যাবতীয় অজ্ঞ জীব স্বপ্ন সন্দর্শনবৎ জগৎস্থৌল্য দেখিতেছে। নৌকাবিঘূর্ণনে বালক কর্ত্তৃক ভ্রমণ অনুভবের ন্যায় প্রত্যেক অজ্ঞ জীব দেহান্তর প্রাপ্তি অনুভব করিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আত্মজ্ঞান আবির্ভূত হইলে, যোগীর দেহ আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়; তখন আর উহা আধিভৌতিক ভাব লাভ করে না। এদিকে আপনি বলিয়াছেন, আতিবাহিক দেহ অদৃশ্য ও অবিনশ্বর। আমি জানিতে ইচ্ছা করি, যদি তাহাই হয়, তবে ঐ আতিবাহিক যোগিদেহ লোকের দৃষ্টিগোচর হয় কিরূপে এবং মুক্তিকালেও ঐ দেহ বিদ্যমান থাকে কি না ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! যেমন পূর্ব্বদেহ পরিত্যক্ত না হইলেও স্বপ্নাবস্থায় দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে, সেইরূপ যোগীদিগেরও পূর্ব্বদেহ ধ্বংস ব্যতীত ঐ আতিবাহিক দেহেই দেহান্তর প্রাপ্তির কল্পনা

সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যতাপে হিমকণা এবং শরদাকাশে শুভ্র শুভ্র মেঘখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইলেও অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি যোগিদেহ যদিও দৃশ্য হউক, তথাপি বস্তুতঃ তাহা অদৃশ্য। ফল কথা, এই যোগিদিগের মরণ দুই প্রকার ; এক হইল—প্রারব্ধ ভোগের জন্য ঐচ্ছিক মৃত্যু ; দ্বিতীয়—প্রারব্ধ ক্ষয়ে দেহ-পরিত্যাগ। এই দ্বিবিধ মৃত্যুর মধ্যে প্রথমোল্লিখিত মৃত্যুতে অবাধে পূর্ব্বদেহের দেহান্তর প্রাপ্তি কল্পনা হইয়া থাকে এবং পশ্চাদুল্লিখিত মৃত্যুতে দেহের আত্যন্তিক অভাব ঘটে। 'সত্বর অদৃশ্য হইয়া যাউক' এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্পের প্রভাবে কোন কোন যোগীর দেহ গগনোড্ডীন বিহঙ্গের ন্যায় এত সত্বর অদৃশ্য হইয়া যায় যে, অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং যোগীরাও তাহা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হয়েন না। লোক সকল যোগীদিগকে জীবদ্দশায় দর্শন করিয়া থাকে ; এই যে দর্শন, ইহা কেবল যোগিগণের সত্যসঙ্কল্পতারই মহিমা। ফল কথা 'লোকেরা আমায় এই ভাবে দেখুক' যোগীরা এইরূপ ইচ্ছা করেন, তাই লোক সকল তাঁহাদিগকে দর্শন করে। কখন কখন কোন কোন লোক যে নিজের সম্মুখে 'এই যোগী মৃত এবং এই যোগী জীবিত' এই প্রকার ধারণায় যোগিদেহ দেখিয়া থাকে, বলা বাহুল্য, উহা কেবল তাহাদের স্ব স্ব বাসনাভ্রম মাত্র। ফলে, যোগীদিগের দেহ কদাচ আধিভৌতিক নহে। যেমন সত্য বোধ হইলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ জন্মে, তেমনি জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহদর্শন ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। তখন মনে ধারণা হয়, দেহই বা কি আর তাহার সত্তাই বা কোথায় ? এবং তাহার আবার ধ্বংসই বা কি ? সকলই ভ্রমের খেলা। ফলে যাহা ছিল, তাহাই আছে ; কেবল অজ্ঞানটুকুই চলিয়া গিয়াছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! যোগীদিগের আধিভৌতিক দেহই কি যোগপ্রভাবে আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়, অথবা ঐ আতিবাহিক পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! তোমাকে আমি এ বিষয় বহু বার বলিয়াছি, তথাপি তুমি তাহা ধারণা করিয়া রাখিতে পারিতেছ না কেন ? এই স্থূল কথা জানিয়া রাখিও, একমাত্র আতিবাহিকই বিদ্যমান ; আধিভৌতিক নাই।

অধ্যাস প্রযুক্তই আতিবাহিকে আধিভৌতিকতা বুদ্ধি সমুদিত হইয়া থাকে। অধ্যাসের যখন উপশম হয়, তখন আবার সেই প্রাক্তন আতিবাহিকতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। মনে কর, স্বপ্নে একটা নগর দেখা গেল, জাগরিত হইলে, সে নগরের কাঠিন্যাদি জ্ঞান কিছুই রহিল না। এইরূপ আতিবাহিক জ্ঞান সমুদিত হইলে এ দেহের আর গুরুত্ব কাঠিন্যাদি জ্ঞান থাকে না, সে সকল বিলীন হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় যেমন 'ইহা স্বপ্ন' এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নের বাধ হইয়া থাকে, তেমনি আতিবাহিক বোধ আবির্ভূত হইলেই আধিভৌতিকতার বাধ ঘটে। আধিভৌতিকের বাধ ঘটিলে, যোগীদিগের দেহ তূলবৎ লঘু হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে 'ইহা স্বপ্ন' এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে দেহ যেমন লঘু হইয়া যায় অর্থাৎ সে দেহের যেমন তখন আর গুরুত্ব অনুভব হয় না, তেমনি বোধ বিকাশ পাইলে এই যোগিদেহ তূলবৎ লঘু হইয়া আকাশ-গমনে সক্ষম হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুকাল ব্যাপিয়া সঙ্কল্পময় দেহে অবস্থান করেন, তাঁহাদের স্থূল দেহ ভস্মীভূত হইয়া যাউক, অথবা শবীভূত হইয়া থাকুক, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহারা সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান অনুভব করেন। পরন্তু যোগীদিগের প্রবোধের আতিশয্য নিবন্ধন জীবিতাবস্থাতেও তাঁহাদের ঐরূপ সূক্ষ্ম দেহানুভব অবশ্যম্ভাবী। স্বপ্নকালে 'আমি স্থূল নহি, আমি সঙ্কল্প-স্বরূপ' এই প্রকার স্মৃতি সমুদিত হইলে জ্ঞানীদিগের দেহ যেরূপ স্বচ্ছন্দে আকাশ-বিহারক্ষম বলিয়া অনুভূত হয়, প্রবোধ বশতও সেইরূপ হইয়া থাকে। রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রমের ন্যায় এই স্থূল দেহানুভব নিরন্তর ভ্রম-রূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু যখন রজ্জুগত ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়, তখন যেমন সে ভুজঙ্গ আর থাকে না, এইরূপ ভ্রান্তি অপগত হইলে স্থূলানুভব থাকিতে পারে না। অতএব যে বস্তু যাদৃশ, তাহাতে ভ্রম সমুদিত হউক; বা না হউক, তাহা তাদৃশরূপেই থাকে। ফলে, যাহা প্রকৃত সদ্বস্তু, তাহার বাস্তব অন্যথা ঘটে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! পূর্ব্বলীলা এবং অভিনব লীলা এই উভয় লীলা পদ্মভূপতির গৃহে আসিবার পর সেই ভবনবাসী জনগণ আতি-বাহিক-দেহধারিণী লীলাকে দৃষ্টিগোচর করিতে না পারিলেও তদীয়

সত্যসঙ্কল্পতা বশতঃ অর্থাৎ 'ইহারা আমায় দর্শন করুক' লীলার এইরূপ সত্যসঙ্কল্পতা হেতু যদি তাহারা লীলাকে নেত্রগোচর করে, তবে লীলার প্রতি তাহাদের কিরূপ বোধ জন্মিবে? তাহারা কি মনে করিবে যে, এই সেই লীলা, ইনি এইখানেই ছিলেন; কিম্বা তাহাদের মনে লইবে যে, ইনি কোন অপূর্ব্ব দেবতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন? না—জেষ্ঠশর্ম্মার ন্যায় তাহারা কি সকলেই এককালে বিস্ময়াপন্ন হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! তথাকার জনগণ তখন এইরূপ মনে করিবে, ইনিই আমাদের সেই রাজ্ঞী এক্ষণে দুঃখিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। আর এই যে ইহাঁর সমভিব্যাহারিণী রমণী [দ্বিতীয়া লীলা] ইনি হয় ত রাজ্ঞীর অপর কোন সহচরী অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে কথা উঠিতে পারে যে, দ্বিতীয় লীলাকে সেই পুরবাসীরা পূর্ব্বে কখন দেখে নাই; সুতরাং এ রমণী সতী কি অসতী, প্রকৃত বা অপ্রকৃত ইত্যাদি সন্দেহ তাহাদের হইল না কেন? এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পুরবাসীদিগের এ বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোনই কারণ নাই। কেন না, বিবেকবিহীন পশুপ্রায় মানবেরা দৃষ্ট বস্তু অনুসারেই ব্যবহার কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে; সুতরাং ইহাদিগের আবার বিচারশক্তি কোথায়? যেমন কোন লোষ্ট্র সজোরে বৃক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, তাহা বৃক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না; অধিকন্তু বৃক্ষে লাগিয়া আপনিই বিচূর্ণ হইয়া যায়, তেমনি বিচারণাও পশুতুল্য অজ্ঞান জনগণের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের শরীর ও কাম কর্ম্ম বাসনা প্রভৃতি পশুবৎই অবস্থিত থাকে; সুতরাং তাদৃশ লোকদিগের যে বিচারোদয় হয় না; এ কথা সুসঙ্গতই বটে। কিন্তু যাঁহারা পদার্থতত্ত্ব বিচার করিতে সক্ষম, ক্রমে তত্ত্ববোধের উদয়ে সন্দেহাদি ত দূরের কথা, তাঁহাদের আধিভৌতিকতা-প্রত্যয়ই থাকে না। যেমন জাগরিত হইলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু কোথায় যায়, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না, তেমনি তত্ত্ব বোধের আবির্ভাবে আধিভৌতিকতা বোধ কোথায় চলিয়া যায়, তাহা স্থির করা অসম্ভব।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! প্রবোধ অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত

কোথায় চলিয়া যায় ? পবন যেমন শারদীয় মেঘ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া দেয়, আপনি তেমনি মদীয় সংশয় ছেদন করিয়া দিউন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—স্পন্দন যেমন পবনেই বিলীন হইয়া যায়, তেমনি স্বপ্ন ভ্রমে কিম্বা সঙ্কল্পক্ষণে যে পর্ব্বতাদি পদার্থ অনুভূত হয়, সে সকল সম্বিদভ্যন্তরেই বিলীন হইয়া থাকে। যেমন অস্পন্দ পবনে সস্পন্দ পবন প্রবিষ্ট হয়, তেমনি তাত্ত্বিকস্বরূপ শূন্য এই স্বপ্ন পদার্থও নির্ম্মল সম্বিদের মলবৎ আবরক হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। স্বপ্নাদি পদার্থের আকারে একমাত্র সম্বিদই প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। যখন তাহা এইরূপ স্ফুরিত না হয়, তখন অদ্বয় আত্মাই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন জল ও দ্রবত্বের এবং স্পন্দন ও পবনের পার্থক্য-সম্ভবনা নাই, তেমনি সম্বিদ্ ও স্বপ্ন পদার্থেরও কদাচ পার্থক্য উপলব্ধি অসম্ভব। সেই স্বপ্ন পদার্থ ও আত্মচৈতন্য এই দুয়ের একত্ব বোধের অভাবই প্রধানতম অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানই সংসার। সম্বিদই ঐ অজ্ঞানের আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া এই মিথ্যাজ্ঞানত্মক সংসার-সংজ্ঞা লাভ করিতেছে। স্বপ্নাবস্থায় সম্বিদ ও স্বপ্ন পদার্থের যে পার্থক্য অনুভূত হয়, সহকারী কারণের অভাবে সে পার্থক্য নিরর্থক। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়ই সমান। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; কেননা, সহকারী কারণ নাই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি যেমন অসৎ, সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে প্রতিভাত এই জগৎও সৎ নহে। কারণ একমাত্র অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভ সম্বিদ্ হইতেই জগৎ আবির্ভূত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত অন্য কোন সহকারী কারণ তখন সৃষ্টিব্যাপারে ছিল না। স্বপ্ন-সমুদিত পদার্থ কোন ক্রমেই সত্য হইতে পারে না, একমাত্র সম্বিদেরই নিত্য-সত্যতা বিদ্যমান; তদ্ভিন্ন সমস্ত স্বপ্নার্থ অসত্য। যেমন জাগরিত হইলে স্বপ্ন-দৃষ্ট পর্ব্বত শূন্যতায় পরিণত হয়, তেমনি বোধাভ্যাস ক্রমে এই আধিভৌতিক দেহাদি আকাশে বা শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সমীপস্থ জনগণ যে আতিবাহিকীভূত পরম পুরুষকে ‘এ মৃত, বা এ উড্ডীন’ ইত্যাকারে অবলোকন করে, এ বিষয়ে তাহাদের স্ব স্ব অজ্ঞানস্বভাবই কারণ বলিয়া কথিত।

বৎস! এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টিই মিথ্যাজ্ঞানে বিজৃম্ভিত। উহা

মোহদৃষ্টি, মায়াদৃষ্টি কিম্বা ভ্রান্তিমাত্র। ফলতঃ স্বপ্নানুভূতির ন্যায় সকলই শূন্যতায় পর্য্যবসিত। ভ্রমপ্রবাহ অনাদি। পুরুষ সেই প্রবাহে পড়িয়া মরণ-মোহের পূর্ব্ব ক্ষণেই আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয় এবং ভ্রমক্রমে ভাবী ভোগের যোগ্য যে যে সৃষ্টিপ্রতিভাস অনুভব করে, সে সকলের কিছুই বাহিরে নয়—সকলই মনোমধ্যে; তবে যে সে সকলকে বহিঃস্থ বলিয়া মনে করে, সে কেবল ভ্রমেরই মহিমা।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যোগী জন যেমন নিজ ইচ্ছায় মনের স্পন্দন রোধ করেন, এই অবকাশে জ্ঞপ্তিদেবী তেমনি স্বীয় সত্যসঙ্কল্প-বলে সেই বিদূরথ-রাজের জীবকে রুদ্ধ করিলেন। ফল কথা, বিদূরথের শবদেহে সে জীবকে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

তখন লীলা সরস্বতীকে বলিলেন,—হে দেবি! এই মন্দিরে মহীপতি পদ্ম শবাবস্থায় পরিণত ও আমি সমাধি-মগ্ন হইলে কত কাল অতীত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবী কহিলেন,—বৎসে! অদ্য একমাস অতিবাহিত হইয়াছে; এই ক্ষুদ্র বাসগৃহ মধ্যে এই দুই দাসী তোমাদিগের শবদেহ রক্ষা করিবার জন্য অবহিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। এক্ষণে ইহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। অয়ি বরবর্ণিনি! তোমার দেহের কি হইয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সমাধি-মগ্ন হইবার এক পক্ষ কালের পর তোমার দেহ ক্লিন্ন হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইয়াছিল। যেমন নীরস পল্লব ভূতলে পড়িয়া থাকে, তেমনি তোমার দেহ নির্জ্জীব অবস্থায় পড়িয়াছিল। তৎকালে সেই শবীভূত দেহ কাষ্ঠকুড্যবৎ কঠিন ও হিমবৎ শীতল হইল। অনন্তর মন্ত্রিগণ আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া সেই অবস্থা

অবলোকন করিয়া স্থির কহিলেন, ইনি মরিয়া গিয়াছেন। তখন তোমার দেহ গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইল। এ বিষয়ে বলা বাহুল্য, ভবদীয় সেই দেহ তাঁহারা চিতানলে নিক্ষেপ করিয়া চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃতাদি সহযোগে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর 'আহা! আমাদের রাজ্ঞী মরিয়াছেন' এই বলিয়া তোমার পরিজনগণ ব্যাকুল ভাবে উচ্চরবে রোদন করিতে লাগিল এবং ভবদীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিল। তুমি সমাধি-মগ্ন হইলে, পঞ্চদশ দিবসের পর এই এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বৎসে! অধুনা যদি এখানকার লোক সকল তোমাকে আবার এ স্থানে সশরীরে সমাগত অবলোকন করে, তাহা হইলে তোমায় তাহারা পরলোক হইতে প্রত্যাগত ভাবিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবে। তুমি অধুনা আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ; তাই মানুষেরা তোমায় দেখিতে না পাইলেও—ভবদীয় সত্যসঙ্কল্পতা-বলে তাহারা তোমার এই বিমল আতিবাহিক দেহ দেখিয়াও বিস্ময়াপন্ন হইবে। অয়ি বালে! ভবদীয় প্রাক্তন দেহের প্রতি যাদৃশ বাসনা সমুদিত হইয়াছিল, তোমার দেহেও তদনুরূপ রূপ-লাবণ্য সমুদ্ভূত হইয়াছে। কেবল তুমি বলিয়া কথা নয়, সংসারের সকলেই স্বীয় স্বীয় বাসনানুসারে সমুদায় দেখিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে বালকদিগের বেতালদর্শন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। হে শোভনে! তুমি অধুনা আতিবাহিক দেহ লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার সেই যে প্রাক্তন বাসনাময় দেহ, তাহা তুমি এখন ভুলিয়া গিয়াছ। ফলে, আতি-বাহিক জ্ঞান সুদৃঢ় হইলে, আধিভৌতিক দেহ প্রশান্ত হইয়া যায়। এই আধিভৌতিক দেহ অপ্রবুদ্ধ জন কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইলেও যাঁহারা প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের চক্ষে ইহা শরদাকাশগত অভ্রখণ্ডের ন্যায় অতি অল্পক্ষণের জন্যই দৃশ্য হইয়া থাকে। যখন আতিবাহিক ভাব বদ্ধমূল হয়, তখন সকল দেহই নির্জ্জল জলধর ও নির্গন্ধ কুসুমের সাম্য ধারণ করিয়া থাকে এবং আতিবাহিক জ্ঞান সুদৃঢ় হইয়া উঠিলে সদ্বাসনা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও যৌবনা-বস্থায় শৈশব বিস্মরণের ন্যায়, আধিভৌতিক দেহ ভুলিয়া যায়। বৎসে! এই একত্রিংশ দিবস সমাগত। অদ্য প্রভাতে আমরা এই মন্দিরাকাশে

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই যে দাসীদ্বয়, ইহাদিগকে আমিই অধুনা নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছি। হে লীলে! এক্ষণে আইস, আমরা সত্যসঙ্কল্প বলে এই অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দর্শন দান করি এবং পরে মানুষোচিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অতঃপর জ্ঞপ্তিদেবী মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই অপ্রবুদ্ধ লীলা আমাদিগকে অবলোকন করুক। চিন্তামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি এবং প্রবুদ্ধ লীলা অতি স্পষ্টাকারে প্রকাশিত হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জে গৃহপ্রাঙ্গণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিদূরথপত্নী লীলা চকিতনেত্রে সে গৃহ অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ যেন চন্দ্রবিম্ব হইতে সমুৎকীর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হইল অথবা সহসা যেন কনক-নিষ্যন্দে ধৌত হইয়া গেল। সরস্বতী ও লীলার শীতল দেহকান্তি-দ্রবে গৃহভিত্তি যেন বিলিপ্ত হইল। অপ্রবুদ্ধ লীলা ঈদৃশ গৃহশোভা অবলোকন করিয়া সম্মুখেই লীলা ও সরস্বতীকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অতি সম্ভ্রমের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া তাহা-দের পদতলে পতিত হইলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে জীবনদায়িনী দেবীদ্বয়! আপনারা মদীয় মঙ্গলার্থই আগমন করিয়াছেন। আপনাদিগের জয় হউক। আমি আপনাদের পরিচারিকা হইয়া পূর্ব্বেই এখানে আগমন করিয়াছি।

অপ্রবুদ্ধ লীলা এই কথা কহিলে, সেই মত্তযৌবনশালিনী মানিনী মহিলাগণ সকলেই আসনে উপবেশন করিলেন। মনে হইল, যেন কয়েকটী লতা মেরুশিখরে বিরাজ করিতে লাগিল।

এই সময় জ্ঞপ্তিদেবী কহিলেন,—অয়ি বৎসে! তুমি কেমন করিয়া এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কোথায় কোন্ পথে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ দৃশ্যই বা তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে? সে সমস্ত প্রথম হইতে প্রকাশ করিয়া বল।

বিদূরথপত্নী লীলা কহিলেন,—হে দেবি! সেই আমি সর্ব্বপ্রথমে দ্বিতীয়া তিথির ইন্দুকলার ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া তৎকালে সেই বিদূরথভবনে যেন প্রলয়-পাবকশিখায় দগ্ধ হইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তখন

আমার কি সম, কি বিষম, কোন জ্ঞানই ছিল না। পরক্ষণেই আমি তরলপক্ষ অক্ষিযুগল নিমীলিত করিয়াছিলাম। হে পরমেশি! অনন্তর মরণ-মোহের অবসানে আমি জাগরিত হইলাম; দেখিলাম—আমি গগনগর্ভে উড্ডীন হইতেছি। পরক্ষণেই পবন-রথে আরোহণ করিয়া গন্ধলেখার ন্যায় এইখানে আসিয়া উপনীত হইলাম। হে দেবি! আমি এখানে আসিয়াই দেখিতে পাইলাম, এই গৃহমধ্য মদীয় স্বামী কর্তৃক সমলঙ্কৃত, প্রদীপ্ত দীপালোকে সমুদ্ভাসিত, এবং মহার্হ শয়নে সমাস্তৃত রহিয়াছে। পরে আমার পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম,—পুষ্পোদ্যানে বিরাজমান বসন্তের ন্যায় পতি আমার কুসুমসমূহে সমাচ্ছিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। অনন্তর মনে করিলাম, ইনি সংগ্রামব্যাপারে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এই মনে করিয়া আমি আর সে নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম না। হে দেবেশ্বরি! ইহার পরক্ষণেই আপনারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হে মদনুগ্রহ-বিধায়িনি, দেবি! আমি যেরূপে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছিলাম, তৎসমস্তই এক্ষণে এই আপনাদের সমীপে নিবেদন করিলাম।

জ্ঞপ্তিদেবী কহিলেন,—অয়ি হংসগামিনি, ললিত-লোচনে, লীলে! তুমি দেখ, এই আমি নরপতিকে শব-শয্যাতল হইতে উত্থাপিত করিতেছি। জ্ঞপ্তিদেবী এই কথা কহিয়া, পদ্মিনী যেমন সুগন্ধ বিকিরণ করে, তেমনি সেই অবরুদ্ধ বিদূরথ-জীবকে পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে সেই বায়ু-স্বরূপ জীব বিদূরথ-রাজের নাসানিকটে উপনীত হইল এবং পবন যেমন বংশবিবরে প্রবেশ করে, তেমনি তদীয় নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। রত্নাকরের অভ্যন্তরে যেমন শত শত রত্ন বিরাজিত, ঐ জীবের অন্তরে তেমনি বহু শত বাসনা নিহিত হইল। অনাবৃষ্টির পর সুবৃষ্টি হইলে পদ্ম যেমন মনোজ্ঞ শ্রী ধারণ করে, তেমনি সেই জীব তাঁহার বদনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই বদন তখন চমৎকার কান্তি ধারণ করিল। ক্রমে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রস-সঞ্চার হইল। তাহাতে মনে হইতে লাগিল, ভূধর যেন বসন্তকালে লতাজালে জড়িত হইয়া প্রতিভাত হইল। অনন্তর রাজা বিদূরথ পূর্ণোদিত নিশাকরের ন্যায় নিজ বদনচন্দ্রের চন্দ্রিকায় ভুবনতল উদ্ভাসিত করত

সুশোভিত হইলেন। বসন্ত যেমন সরসসুন্দর মৃদু পল্লবদল প্রস্ফুরিত করিয়া দেয়, তেমনি তিনি তখন আপনার কোমল কনকোজ্জ্বল সরস অবয়ব সকল সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। জগৎ যেমন রবি-শশি-রূপ নয়ন-দ্বয় উন্মীলিত করিয়া থাকে, সেই রাজা সেইরূপ বিমল-চঞ্চল তারাকাযুক্ত সুন্দর সুবিশাল লোচনযুগল উন্মীলিত করিলেন। অনন্তর বর্দ্ধিষ্ণু বিন্ধ্য-শিখরের ন্যায় মহারাজের দেহ উল্লসিত হইয়া উঠিল। তিনি জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—এখানে কে আছে?

তখন উভয় লীলা তাঁহার অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আমরা আছি; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। অনন্তর রাজা বিদূরথ স্বীয় সম্মুখে সেই লীলাদ্বয়কে আকার, প্রাকার, রূপ, গুণ, বাক্য, স্বর, কার্য্য ও কার্য্যোদ্যোগ, সর্ব্বাংশেই সমান দেখিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন—তুমি কে? আর ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে কি জন্য এখানে আগমন করিয়াছ?

এই সময় লীলা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রাজন্! বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার পূর্ব্বসহধর্ম্মিণী লীলা। বাক্যের সহিত অর্থের ন্যায় আমিই আপনার সহিত চিরমিলিতা রহিয়াছি। আর এই যিনি আমার সঙ্গিনী, ইনিও আপনার মহিষী; ইঁহারও নাম লীলা। ইঁহাকে আমি আপনারই জন্য মদীয় প্রতিবিম্বরূপে সংগ্রহ করিয়াছি। এই যিনি ভবদীয় শিরোভাগে হৈমাসনে সমাসীন রহিয়াছেন, ইনি ত্রিভুবন মঙ্গলময়ী ভগবতী সরস্বতী। রাজন্! বলিব কি, বহু পুণ্যফলে ইনি আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। ইঁহারই কর্ত্তৃত্বে লোকান্তর হইতে এখানে আমরা আনীত হইয়াছি।

তখন নীরজ-নয়ন নরপতি লীলার মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং লম্বমান মাল্য ও অম্বর সংযত করিয়া জ্ঞপ্তিদেবীর পাদপদ্মে পতিত হইলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, —হে সকল-হিত-বিধায়িনি দেবি সরস্বতি! আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে বরদায়িনি! আপনি আমাকে মেধা, দীর্ঘায়ু ও ধন সম্পদ দান করুন।

রাজা বিদূরথ এই কথা কহিলে, জ্ঞপ্তিদেবী তাঁহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন,—বৎস! তুমি অভিমত অর্থ লাভ করিয়া সমৃদ্ধ ভবনে বিরাজ কর। তোমার সমস্ত আপদ বিদূরিত হউক এবং নিখিল দুরিতদৃষ্টি প্রশমিত হইয়া যাউক। তোমার প্রজাগণ সতত মুদিত-মনে কাল যাপন করুক। তোমার রাষ্ট্রে রাজলক্ষ্মী অচলা হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করুন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সরস্বতী রাজাকে ঐরূপ বর দান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন পঙ্কজা-বলীর সঙ্গে সঙ্গে জনমণ্ডলী প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা নিজ মহিষী লীলাকে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমে প্রেয়সী লীলাও পুনরুজ্জীবিত প্রিয়তম রাজাকে পরমানন্দে আলিঙ্গন দিলেন। তখন সেই রাজভবন মদ ও মন্মথাবেশে মন্থর হইয়া উঠিল। জনগণ আনন্দে আত্মহারা হইল। গীত ও বাদ্যরবে সে ভবন মুখরিত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে অনবরত জয়মঙ্গল ও পুণ্যাহ ধ্বনি উত্থিত হইয়া কেমন এক ঘুমুম ও ঘর্ঘর-নির্ঘোষের অনুকরণ করিতে লাগিল। রাজপুরী হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিপূর্ণ হইল। রাজন্যবর্গে রাজকীয় ভবনপ্রাঙ্গণ পরিবৃত হইয়া গেল। সিদ্ধ ও বিদ্যাধর-সম্প্রদায় সহস্র সহস্র কুসুমধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র মৃদঙ্গ, মুরজ, কাহল, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। হস্তিগণ ঊর্দ্ধে বৃহৎ শুণ্ড সকল উত্তোলিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজ-কীয় ভবনপ্রাঙ্গণে অঙ্গনাগণ আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে কত লোক কত উপঢৌকন দ্রব্য আনিয়া রাজপুরী সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল। উপহার-প্রদত্ত কুসুমসম্ভারে সেই স্বভাবসুন্দর রাজ-

সংসার আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। মন্ত্রিগণ, সামন্তরাজগণ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ নানাস্থানে কুসুম, মুক্তা ও লাজাদি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে অম্বরপ্রদেশ যেন পট্টবস্ত্রময় হইয়া উঠিল।

তৎকালে নৃত্যপরায়ণ নর্ত্তকীগণের ঊর্দ্ধপ্রসারিত রক্তাভ কর-নিকরে অম্বর দেশ যেন পদ্মময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হৃষ্ট রমণীগণ আনন্দে অধীর হইয়া চলাচল করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের গ্রীবাদেশে কুণ্ডলদল. আন্দোলিত হইতে লাগিল। পথ-পতিত স্তূপীকৃত কুসুমসমূহ জনগণের অনবরত পদ-পাতে বিমার্দ্দিত হওয়ায় পুষ্পরসে পথ সকল কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। নানাস্থানে শারদ মেঘনিভ পট্টবস্ত্রের চন্দ্রাতাপ সকল সুসজ্জিত হইতে লাগিল। উৎসবার্থ বহু বারাঙ্গনা সম্মিলিত হইল; তাহাদের মুখচন্দ্রে গৃহপ্রাঙ্গণে যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র নৃত্য করিতে লাগিল। 'রাজা ও রাজ্ঞী পরলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন'। দেশদেশান্তরে জনগণ এই অপূর্ব্ব গাথা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। পদ্মভূপতি সংক্ষেপ-বর্ণিত স্বীয় মরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরে চতুঃসাগর হইতে সমানীত সলিল দ্বারা স্নান করিলেন। অনন্তর অমরগণ যেমন নবাভ্যুদিত অমরেন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই নবাভ্যুদয়-প্রাপ্ত রাজাকে বিপ্রগণ, মন্ত্রিগণ ও অধীনস্থ সামন্ত রাজগণ পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন। জীবন্মুক্ত মহামতি উভয় লীলা ও ভূপতি পদ্ম তৎকালে জন্মান্তরীয় বিবরণ বলিতে বলিতে সুরত-সুখবৎ মহানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পদ্ম সরস্বতীর অনুগ্রহ লাভ এবং স্বীয় পৌরুষ প্রকাশে তথাবিধ ত্রিভুবন-শ্লাঘনীয় পুনর্জ্জীবন, রাজ্য, জয়শ্রী ও জ্ঞানাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সরস্বতীর নিকট উপদেশ পাইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। সেই দুই লীলার সহিত পরমানন্দে তাঁহার কালাতিপাত হয়। তিনি অষ্ট অযুত বর্ষ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি সর্ব্বদা প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতিবিধান, বিদ্যাচর্চ্চা ও প্রজারঞ্জনে নিবিষ্ট ছিলেন। কোন প্রকার দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি যশস্বী, ধার্ম্মিক, সুখ-সৌভাগ্যাদি-সম্পন্ন ও সর্ব্বগুণে

সমন্বিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বহুকাল রাজত্ব করত জীবন্মুক্ত, সিদ্ধ-সম্বিদ ও বিদেহমুক্ত হইয়াছিলেন।

উনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, দৃশ্যপদার্থ কিছুই কিছু নয়—সমস্তই মিথ্যা; মনে যখন এইরূপ বোধ সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন মন আর দৃশ্যদর্শন করে না। মন হইতে দৃশ্যজাল অপসারিত হইলেই পরমা শান্তি ঘটে। আমার সেই উক্তি সমর্থন করিবার জন্যই তোমার নিকট পবিত্র লীলোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এক্ষণে এই উপাখ্যান-রহস্য বিদিত হইয়া এই অসত্য জগতের সত্যতা বোধ পরিহার কর। দৃশ্য বস্তুর সত্যতা বোধ পরিহার ব্যতীত দৃশ্য-মার্জ্জনের উপায়ান্তর নাই। দেখ, যাহা সত্য বা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান, তাহারই মার্জ্জন করা ক্লেশকর বটে; কিন্তু যাহা নাই বা অসত্য, তাহার মার্জ্জন করিতে আবার ক্লেশ স্বীকার কি? ফল কথা, এই জগতের অসত্যত্ব বুদ্ধিতে ধারণা করিতে কিছুমাত্র ক্লেশই অনুভব করিতে হয় না। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের নিকট দৃশ্যপদার্থের স্বরূপ আকাশবৎ নিরাকার বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা উল্লিখিত প্রকারে একীভূত এক অখণ্ডরসতা প্রাপ্ত হইয়া নিত্য আকাশবৎ অদ্বয়ভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। স্বয়ম্ভু ক্ষিত্যাদি-বিরহিত চিন্মাত্র-বপুঃ। তিনি আপনাতে যে কিছু বিবর্ত্ত উৎপাদন করিয়াছেন, সে সকলই চিন্মাত্রস্বভাব পরমাত্মার মায়িক আভাস ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সেই চৈতন্যমাত্র-মূর্ত্তি স্বয়ম্ভু যখন যেরূপ যত্ন প্রকাশ করেন, তখন তিনি সেই-রূপেই প্রতিভাত হয়েন। সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞ স্বয়ম্ভু সৃষ্টিপ্রযত্নে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারই স্থিতিপ্রযত্নে স্থিতি হয় এবং প্রলয় প্রযত্নে প্রলয় ঘটিয়া থাকে। এ নিয়মের কখন প্রত্যয় হইবার নহে। ব্রহ্মাত্মরূপ নির্ম্মল

চিদাকাশে যদিও এই জগৎ আভাসিত ও সেই অনুসারে জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু তাহা হইলেও পরমার্থতঃ অপরিচ্ছিন্নরূপে সে বোধ ব্রহ্মবস্তুতে স্থান পায় না। তবে কথা এই, সে বোধ বুদ্ধিবিকার; তাই বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন বা বুদ্ধি-উপহিত জীবে তাহা অবস্থান করে। এতাবতা ইহাই বুঝা যায় যে, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন জীবের প্রযত্নে তাহারই উপভোগ নিমিত্ত ব্রহ্মবস্তুতে ঈদৃশ সৃষ্টি আরোপিত হইয়া থাকে। এই জন্যই বলি, দৃশ্যের নাস্তিত্ব জ্ঞান সুদৃঢ় হইলে তখন আর দৃশ্যদর্শন ঘটে না। ফলতঃ যাহা কেবল বৃথা ভ্রান্তিরই খেলা, বল দেখি—তাহার আবার সত্তা বা বাসনা কি? এবং তাহার আস্থা, নিয়তি ও অবশ্যম্ভাবিতাই বা কি? মায়িক-দৃষ্টিতে এই সমস্ত প্রপঞ্চ যথাযথ দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে এ সকল কিছুই নয়। এই সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্ত মায়ার কার্য্য; পরন্তু মায়া বলিয়া কোন একটা সত্য পদার্থ নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আমি আপনার নিকট পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। ইন্দুকল যেমন দাবদগ্ধ তৃণপুঞ্জের দাহপীড়া প্রশমিত করিয়া দেয়, আপনার প্রদত্ত এই জ্ঞান তেমনি সংসার-তাপ-তপ্ত ব্যক্তিবর্গের শান্তি বিধান করে। অহো! আমি অদ্য বহুদিনের পর অখণ্ড জ্ঞাতব্য বিষয় বিদিত হইলাম। যখন যেরূপ ভাবে যাহা আমার জানিবার বিষয়, তাহা আমার এখন আর কিছুই অজ্ঞাত নাই। হে দ্বিজবর! এই অপূর্ব্ব আখ্যান ও শাস্ত্রব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া তত্ত্ব বিচার করত আমি যেন উপশান্ত বা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইলাম বলিয়াই বোধ করিতেছি। হে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ! আপনার বচনসুধা কর্ণরূপ পাত্রে প্রচুর পরিমাণে পান করিয়াও আমার তৃপ্তি শেষ হইতেছে না, যতই পান করি, ততই পান-স্পৃহা প্রবল হইতে থাকে। এক্ষণে আমার একটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাস করুন। আমি জিজ্ঞাসা করি, বশিষ্ঠ, পদ্ম ও বিদূরথ পর পর এই তিন ব্যক্তি এক এককালে লীলার স্বামী হইয়াছিলেন। ঐ স্বামি-ত্রয়ের সৃষ্টিতে কতকাল অতীত হইয়াছে? ঐ কাল কি এক অহোরাত্রাত্মক? অথবা একমাস কি, বহু বর্ষব্যাপক? আর এক কথা, পূর্ব্বোক্ত কাল কাহারও জ্ঞানে কি অত্যন্ত দীর্ঘ? অথবা কাহারও জ্ঞানে কি ক্ষণমাত্র? কিম্বা কাহারও

জ্ঞানে কি বহুবর্ষ? অপিচ কাহারও জ্ঞানে অপূর্ণ বা পূর্ণ বৎসর কি না? হে ভগবন্! অনুগ্রহ সহকারে আমার নিকট এই সকল বিষয় যথাযথ বর্ণন করুন। দেখুন, শুষ্ক মৃৎপিণ্ডে যদি একবিন্দু জল পড়ে, তবে তাহাতে কি তাহার কোন উপকার দর্শে? ফলে একবার শ্রবণে আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! যে যে লোক যে যে সময়ে যে যে বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করে, সেই সেই লোক সেইকালে সেই বিষয়ে সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকে। দেখ, বিষকে যদি সর্ব্বদা অমৃত বলিয়া ভাবনা করা হয়, তাহা হইলে বিষও অমৃত হইয়া যায় এবং শত্রুকেও সতত মিত্র বলিয়া ভাবিলে, সেও মিত্র হইয়া থাকে। পদার্থ সকল যেভাবে যে আকারে ভাবিত হয়, ভাবনার চিরাভ্যাস বশে সে সমস্ত সেই ভাবেই নিয়তির বশীভূত হইয়া থাকে। সম্বিদ্ স্ফুরণস্বভাব; সে, চিত্তসঙ্কল্প প্রযুক্ত যেরূপে ও যাদৃশ ভাবে স্ফুরিত হয়, সেই আকার ও সেই ভাব তদনুযায়ী অর্থক্রিয়ারও উৎপাদক হইয়া থাকে। এ পক্ষে দৃষ্টান্ত—এক নিমেষ কালকে বহু কল্প বলিয়া জ্ঞান করিলে, সেই নিমেষই বহু কল্পে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই। আবার কল্প-কালকে যদি কেহ ভাবনায় নিমেষ বলিয়া জ্ঞান করে, তবে তাহাও তখন নিমেষ নামে পরিচিত হয়। কেন না, চিৎশক্তির স্বভাবই সেইরূপ। দৃষ্টান্ত দেখ, যে ব্যক্তি দুঃখিত, তাহার নিকট একরাত্রি কল্পকাল বলিয়া বোধ হয়। আর যে ব্যক্তি সুখী, তাহার নিকট সে রাত্রি ক্ষণমাত্র বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অন্যদিকে দেখ, স্বপ্নাবস্থায় ক্ষণও কল্প এবং কল্পও ক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্নকালে 'এই আমি মরিলাম, এই আবার জন্ম লইলাম, আমি বালক ছিলাম, যুবক হইয়াছি, আমি শত শত যোজন পথ পর্য্যটন করিয়াছি' ইত্যাকার অনুভূতি হইয়া থাকে; পরন্তু এই অনুভূতি হয়ত এক ক্ষণের অধিক হইবে না। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র একটি মাত্র রাত্রিকে দ্বাদশবর্ষ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। লবণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক রাত্রিতে শতবর্ষ আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়াছিলেন। আরও দেখ, প্রজাপতির যাহা মুহূর্ত্ত, মনুর তাহা জীবিত কাল। ব্রহ্মার যাহা জীবিত কাল, চক্রপাণি বিষ্ণুর

তাহা এক দিবস। বিষ্ণুর যাহা আয়ুষ্কাল, বৃষভকেতন শিবের তাহা একদিন।

বৎস! যে যোগী পুরুষেরা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের দিবা-রাত্র নাই, দৃশ্য পদার্থও কিছুই নাই এবং এই যে জগৎ, ইহাও তাঁহাদের নিকট নাই। থাকেন—কেবল সত্য আত্মা। তদ্ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের থাকে না। যাহা মধুর, তাহাকে যদি কটুভাবে চিন্তা করা যায়, তবে তাহা কটুত্বেই পরিণত হয়। আবার মধুরভাবে চিন্তা করিলে কটুও মধুরতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এইরূপে শত্রু চিন্তায় মিত্রও শত্রু হয় এবং মিত্রচিন্তায় শত্রুও মিত্র হইয়া উঠে। হে মহাবাহো! এই-রূপে এই জগৎ, সম্বেদনেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রপাঠ, জপ ও উপাসনাদি পদার্থ অনভ্যস্ত থাকিলেও সম্বেদন-অভ্যাসে নিশ্চয়ই তাহারা স্বাধীন বা স্বায়ত্ত হইয়া উঠে। লোকে নৌকায় আরোহণ করিয়া নিতান্ত ভ্রান্তিবশে মনে করে, বুঝি, তীরভূমিও ঘূর্ণিত হইতেছে। এদিকে যে সকল তীরস্থ লোকের ঐরূপ ভ্রম নাই, তাহাদের নিকট আবার ঐ ঘূর্ণন অনুভূত হয় না। সম্বেদন বশতঃ শূন্যও আকীর্ণ বলিয়া প্রতীত হয় এবং উক্ত কারণেই পীত বস্তুও নীল বা শুক্ল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। উৎসব—ব্যসন এবং ব্যসনও উৎসববৎ প্রতীত হয়। বালকেরাই মোহ প্রযুক্ত ঐরূপ অনুভব করে। যাহারা বিবেক-বিরহিত, ক্ষিতিতেও তাহাদের আকাশভ্রম ঘটে। প্রকৃতপক্ষে যক্ষ নাই অথচ সে বিমূঢ়বুদ্ধি বালকদিগের প্রাণ সংহার করে। বেদনবশতঃ স্বপ্ন-সমালোকিত বিনিতা জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় রতিদায়িনী হইয়া থাকে; সুতরাং যাহা যেরূপে চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহার স্থিরত্ব-প্রাপ্তি সেইরূপেই ঘটে। সম্বেদন অসৎস্বরূপ; কিন্তু উহা অলীক নহে—উহা আকাশনিভ। ঐ আকাশরূপ সম্বেদনই স্বাধি-ষ্ঠান চিদাত্মায় মেঘচ্ছায়ায় কল্পিত শত হস্ত দীর্ঘ মিথ্যা নটের অভিনয়-বিশে-ষের ন্যায় জগদাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। জানিও—এই যে জগৎ, ইহা কেবল মনেরই স্পন্দন এবং উহা চিদাকাশেই ভাসমান; সুতরাং ইহাকে পৃথক্ বস্তু বলা চলে না। বালক যেমন মিথ্যাজ্ঞানে পিশাচ কল্পনা করিয়া তদীয় স্পন্দন দর্শন করে, ঐ মনোমাত্রাকৃতি জগৎও সেইরূপেই দৃশ্য হইয়া

থাকে; সুতরাং তত্ত্বদর্শীরা জানেন, এই জগৎ মায়ামাত্রে কল্পিত। ইহার বাস্তব মূর্ত্তি নাই বলিয়া ইহা অপরের অরোধক ও নিজের রোধক পদার্থান্তরে পরিবর্জ্জিত হইয়া স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। এই জগৎ যেন অনিদ্রিত পুরুষের অপূর্ব্ব স্বপ্নস্বরূপেই সমুদিত রহিয়াছে।

রামচন্দ্র! ব্যাপার-বিরহিত স্তম্ভ যেমন আপনাতে শালভঞ্জিকা বা প্রতিমারূপ প্রথিত করাইয়া থাকে, পরমার্থরূপ মহাস্তম্ভও তেমনি আপনি ব্যাপার-বিহীন হইয়াও আপনাতে সৃষ্টিব্যাপার অবলোকন করেন। স্বপ্নকালে মদীয় পার্শ্বস্থ কোন লোক কতিপয় যোদ্ধা কর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইবার পর প্রবুদ্ধ হইলেও সে যেমন সুষুপ্তবৎ অজ্ঞানমাত্র-স্বভাব ব্যতীত বস্তুগত্যা সৎ নহে, ব্রহ্মের সৃষ্টিও তেমনি তদীয় অজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। শীত ঋতু সমাপ্ত হইলে বসন্তকালীন তৃণগুল্ম-লতাময় রস যেমন উপাদানস্বরূপ ভূমিতে অবস্থান করে, এই জগৎ সৃষ্টিও তেমনি পরম পদে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুবর্ণের অভ্যন্তরে যেমন বহিরপ্রকাশিত দ্রবভাব নিহিত থাকে ও পরে বহ্নিসংযোগে তাহা প্রকটিত হয়, এই সৃষ্টিও তেমনি ঐ পরম পদে সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া অনন্তর জীবের অদৃষ্টযোগে প্রকাশ পাইয়াছে। অঙ্গীভূত আত্মা হইতে যেমন অঙ্গসন্নিবেশ পৃথক্ নহে, এই জগৎও তেমনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। মনে কর, কোন লোক স্বপ্নাবস্থায় দেখিল, তাহার সহিত অপর কাহারও যুদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি এই যুদ্ধব্যাপার তখন সত্য বলিয়া বুঝিলেও অপরের নিকট উহা যেমন মিথ্যা, তেমনি মায়িক দৃষ্টিতে এই জগৎ সত্য বলিয়া ধারণা হইলেও যে ব্যক্তি বিশুদ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহার নিকট উহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় অবধি এই জগৎ চিন্মাত্র পরমাত্মার স্বভাবমাত্রেই প্রতিভাত। এতৎকল্পীয় মুক্ত হিরণ্যগর্ভে যদি স্মৃতিকল্পিত অপরকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের সত্তা কল্পিত হয়, তাহাতেও বুঝিতে হইবে—এই স্মৃতিও জ্ঞপ্তি-জনিত সৃষ্টিপ্রবাহে জ্ঞপ্তিমাত্র সত্তাপদার্থই পর্য্যবসিত। ফল কথা, এতৎকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বকল্পীয় বাসনায় যেমন এই জগৎ প্রতিভাত হয়, এইরূপ তৎপূর্ব্বকল্পীয় হিরণ্যগর্ভেরও তৎপূর্ব্বকল্পীয় বাসনা-সঞ্চয়ের অভাব ছিল না। উল্লিখিত ক্রমে এই

সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি এবং সমস্ত সৃষ্টিই চিৎসত্তায় অধিষ্ঠিত, ইহাই পরিজ্ঞেয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সেই বিদূরথ-পুরে বিদূরথের কুল-ক্রমাগত পৌরগণ ও মন্ত্রিমুখ্যগণ সকলেই সমানরূপে প্রতিভাত হইল কেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! যেমন ক্ষুদ্র বায়ুলেখা প্রবল বাত্যা হইতে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ সকল প্রকার সম্বিদই সেই মুখ্যা চিতি হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ চিতির নামান্তর নিয়তি বা সংস্কারপক্ষ-পাতী জীবচৈতন্য। ঈদৃশ জীবচৈতন্যই প্রজা, প্রজাপালয়িতা ও মন্ত্রি-প্রভৃতিরূপে পরস্পর ক্রমে সমভাবে প্রতিভাসিত হইয়াছিল বলিয়াই সকলে ঐ একই-রূপে প্রতিভাত। 'এই আমাদের রাজা। ইনি ঈদৃশ বংশ হইতে জন্মিয়াছেন,' বিদূরথপুরে পুরবাসীরা তখন এই ভাবেই স্ফুরিত হইয়াছিল। কথা হইতে পারে, উদাসীন সম্বিদের অধ্যস্ত বিষয়ের বিস্তৃতিরূপ স্ফুরণে হেতু কি? এ কথায় বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে হেতু অন্বেষণ সঙ্গত নহে। কেননা, ঐরূপ স্ফুরণ স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে। মনে কর, চিন্তামণি একটী রত্নবিশেষ। এই রত্ন স্বয়ং উদাসীন হইলেও অর্থাৎ স্বীয় প্রভা অন্যত্র প্রসারিত করিবার ক্ষমতা উহার না থাকিলেও ঐ প্রভা যেমন স্বভাবতই প্রসারিত হয়, ঐ স্ফুরণের অবস্থাও সেইরূপ। পরন্তু এই চিন্তামণিরত্ন যেমন চিন্তক ব্যক্তির মনোরথানুরূপ স্বভাবে আবির্ভূত হয়, চিত্তসম্পন্ন জীবচৈতন্যও সেইরূপ চিত্তসঙ্কল্পের অনুরূপ স্বভাবে সমুদিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দেখ, রাজা বিদূরথ পূর্ব্বে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি অমুক প্রকার কুলাচারাদি-বিশিষ্ট রাজা হইব। তিনি এই প্রকার চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়াই তৎসংস্কারময় সম্বিদ্ তাঁহার আবির্ভূত হইয়াছিল। কেবল বিদূরথ বলিয়া কথা কি, যে যে জীব যে যে কালে যে যে সৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়, তত্তাবৎ সকলেই চিদ্-বিধাতার সর্ব্বব্যাপিত্ব নিবন্ধন সর্ব্বত্র স্বচিত্ত-সংস্কারের অনুরূপই সমুদিত হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্মাকারশালিনী সম্বিদ্ তীব্র বেগবতী হইয়া বিষয়-দোষে অবিচলিত ও মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত একই রূপে অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই সম্বিদই পরমোত্তম মোক্ষলক্ষণ স্থৈর্য্যলাভ করিতে

পারে; পরন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। জগদাকার ও ব্রহ্মাকার, এই উভয়বিধ সম্বিদের মধ্যে যাহার বলাধিক্য হইবে, তাহারই জয় সুনিশ্চয়। যদি মনে কর যে, জগদ্‌জ্ঞানই চিরাভ্যস্ত বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, ঐরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। কেননা, এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অযত্ন জন্য বেগ অপেক্ষা যত্নজন্য বেগ অত্যন্ত প্রবল এবং সত্য যে বিজ্ঞান, তাহার নিকট মিথ্যা বিজ্ঞান একান্তই দুর্ব্বল; সুতরাং সমধিক যত্নসহকারে যদি ব্রহ্মসম্বিৎ উত্থাপিত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সম্বিদের বেগ নিশ্চয়ই অযত্নসুলভ জগৎ-সম্বিদের বেগ অপেক্ষা উৎকর্ষশালী হইবেই হইবে। আরও দেখ, ব্রহ্মসম্বিদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞান হইল সত্য; সুতরাং উহা সবল এবং জগৎসম্বিৎ হইল মিথ্যা—সুতরাং দুর্ব্বল। কাজেই সাগরগামিনী মহানদী যেমন আপনাতে মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিকে আয়ত্ত করিয়া লয়, তেমনি ঐ সত্য সবল ব্রহ্মসম্বিৎ মিথ্যা দুর্ব্বল জগৎসম্বিৎকে আত্মাধীন করিয়া থাকে। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মাকারশালিনী সম্বিৎ এবং জগদাকারশালিনী সম্বিৎ, এই উভয় সম্বিৎ একই—সমানভাবে সমুদিত হইতেছে, তাহা হইলে তৎকালে এরূপ যত্ন করিতে হইবে—যাহাতে বাহ্য সম্বিদ্ দুর্ব্বল হইয়া যায়। যদি বাহ্য সম্বিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন হইবে।

বৎস! আমার এই বর্ণিত বিষয় সকলই নিয়তির বা চিদ্বিলাসের স্বভাব। পরিচ্ছেদ-ভ্রমে ভ্রমবান্ জীবনিবহের মধ্যে ঐরূপ সম ও বিষম সৃষ্টি স্ব স্ব সঙ্কল্পের বলে সকলেরই অনুভূত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। উল্লিখিতরূপ শত শত সহস্র সহস্র সৃষ্টি হইল, চলিয়া গেল, হইবে এবং বর্ত্তমানেও আছে, কিন্তু কৈ কোন জীবই ত চলিয়া গিয়াও কিছুই পায় নাই, কেহ উদাসীন হইয়াও কোন নূতন কিছুই লাভ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ যে কিছু পাইবে, সে আশাও নাই। ফলে যাহা অলীক বা অবস্তু, তাহার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি এ উভয়ের কিছুই হইতে পারে না। যাহা ছিল, তদতিরিক্ত বাস্তব কিছুই নাই। আছেন কেবল—এই শান্ত চিদাকাশ বিরাজমান। এই যাহা কিছু আভাসিত হইতেছে,

ইহা শুদ্ধ বিবেক-দৃষ্টিহীন জাগ্রৎকালীন স্বপ্ন বৈ আর কিছুই নয়। যখন এই জাগ্রৎ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে, তখন বুঝা যাইবে, যাহা দেখিয়াছিলাম, বা অনুভূত হইয়াছিল—সকলই মিথ্যা। যত্নে সকলই হয়; যত্ন করিলে অবশ্যই একদিন ভ্রমের আশ্রয় আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ ঘটিবেই ঘটিবে এবং এই জগত্তত্ত্ব যে কিরূপ সূক্ষ্ম, তাহাও তখন বুঝা যাইবে। মনে কর, যেমন একই মাত্র বৃক্ষ—পত্র, পুষ্প ও ফলাদি বিবিধরূপে বিরাজিত, তেমনি সেই একই বিভু অনন্ত অখিল শক্তিমত্তায় এই বিচিত্র দৃশ্য বিশ্বাকারে বিরাজ করিতেছেন। এই প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণাদি মায়াময় অনাদি পরম পদ একবার বুঝিতে পারিলে আর তাহা কেহই কখন ভুলে না।

বৎস! মায়িক নানাত্বে কখন পরমবস্তুর বাস্তব নানাত্ব সংঘটিত হয় না; সুতরাং এ ব্যবস্থায় ব্রহ্মবস্তু দিক্ ও কালাদিরূপে বিরাজমান রহিলেও তিনি সদাই অনাদি শুদ্ধ বা অবিকৃতভাবে বিরাজিত। তাঁহার উদয়াস্ত নাই। তিনি অজ্ঞানের প্রকাশক। আদি, মধ্য, অন্ত, কিছুই তাঁহার নাই। মনে কর, জলে যখন তরঙ্গ থাকে না, তখনও তাহা যেমন স্বচ্ছ জল, আর যখন তরঙ্গ থাকে ও অস্বচ্ছ হইয়া উঠে, তখনও তাহা জল ব্যতীত আর কিছুই নয়। আত্মার অবস্থাও এইরূপই। আত্মা ব্রহ্ম; তিনি ব্রহ্মাবস্থাতেও আত্মা আবার যখন তাঁহার জগদবস্থা, তখনও তিনি আত্মা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আরও দেখ, আকাশ হইল শূন্যস্বরূপ। ঐ আকাশের শূন্যতাকেই যেমন তল, মালিন্য, মৌক্তিক, কেশগুচ্ছ ও কটাহ প্রভৃতি নানারূপে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। সেইরূপ যিনি শুদ্ধবোধস্বরূপ, একাদ্বয়, চিদাত্মা, তাঁহারই স্বরূপনিষ্ঠ অবিদ্যার প্রভাবে তুমি, আমি, ইহা, সে, ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্রাকার বিশ্ব বিভাত হইতেছে।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাকার ভ্রান্তি, কারণ বিনাও যাদৃশ কল্পনাক্রমে বা যাদৃশ উপপত্তি বলে সমুদিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় আপনি আমার নিকট যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভ্রান্তি যত প্রকারই হউক, যিনি বোদ্ধা, তিনি সে সকল সর্ব্বদা সম্বিদ্ বা স্বরূপচৈতন্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বুঝিয়া থাকেন; কদাচ সে সকলের কিছুই তাহার বহির্ভূত বলিয়া বুঝেন না। সুতরাং সম্বিদই সকল, সকলাত্মক ও সর্ব্বত্রেই এক। তদীয় সর্ব্বাত্মকতায় বৈষম্য কিছুই নাই। তাহার অভাবে জন্মাদি বিক্রিয়ার উপপত্তি হইতে পারে না; অতএব বুঝিতে হইবে, একমাত্র জন্মাদি-বিরহিত পরমাত্মাই বস্তুতঃ বিদ্যমান; কাজেই কারণ বিনাই জগদ্ভ্রান্তির উদয় হয়, এ কথা সুসঙ্গতই বটে। বৎস! ঘট, পট ও মঠ, ইত্যাদি বিষয়-বোধক শব্দ ও সেই সেই শব্দের অর্থ একই চৈতন্যে অবভাসমান হইয়া থাকে। সত্য বটে, ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলে আপাততঃ মনে হয় যে, জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্; কিন্তু ঘটাদি বিষয় পরিহার করিয়া বুঝিলে জ্ঞান বা সম্বিদের একত্বসিদ্ধি অবশ্যই হয়। চৈতন্যরূপ একই আধার, তাহাতেই ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব আবির্ভূত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সে সকল ভেদ মনোবৃত্তির, পরন্তু চৈতন্যের নহে। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ঐ সকল বৃত্তিজ্ঞান বুদ্ধির অনতিরিক্ত বলিয়াই বুঝা যাইবে। কটক হইতে হেম এবং তরঙ্গ হইতে জল যেমন ভিন্ন নহে, এই জগৎও সেইরূপ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। আবার দেখ, কটকাদি হেমাত্মক হইলেও হেমে যেমন কটকত্ব নাই, তেমনি এই জগৎ ঈশ্বরাত্মক হইলেও ঈশ্বরে জগদ্ভাব নাই। যেমন একই অবয়বীর বহু অবয়ব বিদ্যমান, তেমনি একই নিরাকার চৈতন্যের সর্ব্বাত্মকতা নিবন্ধন তদীয় বহু আকার বিরাজমান। পরন্তু ঐ সকল আকার বাস্তব নহে—মায়িক। বলিতে পার, তবে

এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাদি যে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ নানাত্ব, ইহা কি ? এই কথার উত্তর এই যে, পরব্রহ্মে ব্রহ্মমাত্র স্বরূপের যে অজ্ঞান—যাহা যুগপৎ নিখিল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত, সেই অজ্ঞানই 'এই জগৎ' 'এই আমি' ইত্যাদি নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরে বনরাজির প্রতিবিম্ব-সন্নিবেশ অভিন্ন হইলেও যেমন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি অন্তঃস্থ চৈতন্যে আরোপিত 'এই জগৎ' 'এই আমি' ইত্যাদি নানা প্রতিভাস সেই ঘনচৈতন্য হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নাকারে উপলব্ধ হইয়া থাকে। জলে যেমন তরঙ্গ একবার উত্থিত হইতেছে আবার বিলয় পাইয়া যাইতেছে, অথচ ঐ তরঙ্গ জল ব্যতীত আর কিছুই নহে, তেমনি পরমেশ্বরে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উঠিতেছে ও বিলয় পাইতেছে অথচ পরমেশ্বর হইতে উহা পৃথক্ নহে। উল্লিখিত উপমায় পার্থক্য এই যে, সলিলরাশি সাবয়ব, তাহাতে যে তরঙ্গমালা অবয়বরূপে অবস্থিত, তাহাও সাবয়ব ; কিন্তু পরব্রহ্ম নিরবয়ব, তাঁহাতে এই সৃষ্টি তাঁহার অবয়বরূপে অবস্থান করে না। ফলে এই জগৎ স্পষ্টতই সাবয়ব ; সুতরাং নিরবয়ব ব্রহ্মের কি ইহা অবয়ব হইতে পারে ? কখনই না। অতএব ব্রহ্মে জগৎস্থিতি অবয়বরূপে নহে ; পরন্তু মায়িক প্রতিভাসরূপে তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত। জ্ঞানিগণ দেখেন, সৃষ্টি পরব্রহ্মে অবস্থিত নহে এবং পরব্রহ্মও সৃষ্টিতে অবস্থিত নহেন। অবয়ব ও অবয়বীর ন্যায় তাহাদের একই সত্তা অনবয়বেই বিদ্যমান। পবন যেমন নিজেই নিজের স্পন্দনের কারণ হয় এবং মুখবিরাজিত নয়ন যেমন দর্পণে প্রতিহত ও পরাবৃত্ত হইয়া সেই মুখ দর্শন করে, তেমনি পরমার্থ চিন্মূর্ত্তি পরব্রহ্মও স্বীয় পারমার্থিক রূপ স্বীয় অজ্ঞানে আচ্ছাদিত করিয়া স্বীয় সম্বিত্তি সহকারে আপনাকে প্রপঞ্চস্বরূপে কল্পনা করেন। সেই প্রথম কল্পনাকালে কারণলীন শব্দ-তন্মাত্র আকাশরূপে আবির্ভূত হয়, পরে স্থির পবন যেমন কখন কখন আপন স্পন্দতা অনুভব করে, তেমনি আকাশাভিমানী ব্রহ্মও স্পর্শতন্মাত্র-সংস্কারে আপনার অনিলত্ব অনুভব করেন। তদনুসারে তিনি অনিলাকারে প্রকট হইয়া থাকেন। অনিলরূপতা প্রাপ্তির পর ব্রহ্মই তেজঃপ্রকাশবৎ রূপতন্মাত্র-সংস্কারে তেজোময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শাস্ত্রকারগণের মতে ব্রহ্মের তাদৃশ

প্রকাশই তেজের উৎপত্তি। তৎপরে তেজোভিমানী পরব্রহ্ম আপনাকে রসতন্মাত্র-সংস্কারে জলভাবে অনুভব করেন, তদনুসারে দ্রবতার ন্যায় জলের উদ্ভব হয়। ইহার পর সেই জলাভিমানী ব্রহ্ম আপনাতে গন্ধতন্মাত্র-সংস্কারে পার্থিব ভাব অনুভব করেন, সেই অনুসারে ব্রহ্মসত্তাস্বরূপিণী পৃথিবীর উদ্ভব হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে মনে করিতে পার যে, যেমন চক্ষুর উন্মেষণ হইল, অমনি জগদ্দর্শন ঘটিল; সুতরাং ঐরূপ ক্রমিক আরোপ সঙ্গত হইবে কিরূপে? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ঐরূপ মনে করা উচিত নয়; কেননা, একটী মাত্র নিমেষের একলক্ষ ভাগের এক ভাগ মধ্যেই ব্রহ্মের উপরি-উল্লিখিত তন্মাত্রাদিরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। পরন্তু মায়িক আরোপের প্রভাব ক্রমে এখনও তাহা কোটি কোটি কল্প নামে নির্ণীত হইয়া সৃষ্টিপরম্পরায় প্রথিত হইয়া আসিতেছে। অতি সূক্ষ্ম কালে কল্প-কল্পান্ত ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বপ্ন দশায় ক্ষণকালও কল্প বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

বৎস! ব্রহ্ম বিশুদ্ধ; তিনি বারম্বার বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়েন না; ফলে তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ। তাঁহার অন্তরে সৃষ্টি ও প্রলয় বিরাজিত; উদয় বা অস্ত তাঁহার নাই এবং কোনরূপ আধারে তিনি অধিষ্ঠিত নহেন। সেই বৈষম্য-বিরহিত পরমার্থ সত্তা সৃষ্টি-সমন্বিত হইলেও বোধকালে অপবর্গ-সম্পন্ন বা মুক্ত আর পরমার্থতঃ সৃষ্টিশূন্য হইলেও অবোধকালে তাহা সতত সৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। বোদ্ধাদিগের মধ্যে যিনি যে যেরূপে উক্ত চিন্ময় ব্রহ্মকে স্ব স্ব আত্মায় অবগত হয়েন, ব্রহ্ম সেই সেই রূপেই মায়াবলে আত্মাতে স্ফুরিত হইয়া থাকেন; কেননা ব্রহ্ম বস্তুতে সর্ব্বপ্রকার মায়াশক্তিই নিহিত আছে। এই জন্যই বলিতে হয়, এই জগৎ ব্রহ্মের বিলাসানুভূতি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। মনঃপ্রভৃতি ছয়টী ইন্দ্রিয় বহির্মুখী বৃত্তি সহকারে যাহা যাহা দর্শন করে, শ্রবণ করে এবং অনুভব করে, সে সকল কেবল নাম—কেবল কল্পনা, কাজেই তত্তাবৎ অসত্য বৈ আর কিছুই নয়। বায়ুতে যেমন গতি, পরব্রহ্মে তেমনি জগৎ-স্থিতি। মনে কর, বায়ু যখন সঞ্চরণ করে, তখনই তাহা সত্য অথবা আছে বলিয়া বোধ হয়; আর যখন স্থিরভাবে থাকে, তখন উহা সত্য অর্থাৎ আছে

বলিয়া কাহারও অনুভূত হয় না, এইরূপ জগৎও অজ্ঞানতা বশত সত্য, অর্থাৎ আছে বলিয়া মনে হয়,পরন্তু যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন উহা অসৎ বা নাই বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। দেখ, তেজ ও আলোক এই উভয়কে যদি এক দৃষ্টিতে দেখা না যায়, তবে তাহা অসত্য ; আর ঐ তেজ ও আলোক উভয়কে অভিন্ন ভাবে দেখিলে তাহা যেমন সত্য ; এইরূপ যাহা ভেদ ভাবে দেখা যায়, তাহা ভিন্ন আর অভেদভাবে দেখিলে, তাহা অভিন্ন ; এখানে বুঝিয়া দেখ, তেজঃপদার্থের প্রকারভেদ যেমন আলোক, চিদ্ব্রহ্মের প্রকার ভেদ তেমনি এই বিশ্ব ; সুতরাং দৃষ্টিভেদে এই বিশ্ব সত্যাসত্য উভয়রূপেই প্রতীত হয়। যেমন মৃত্তিকা ও দারু এই উভয় বস্তুতে উনুৎকীর্ণ অবস্থাতেও পুত্তলিকা থাকে এবং মসীতে যেমন বর্ণ বিদ্যমান, তেমনি এককালে এই জগৎসৃষ্টিও পরব্রহ্মে অব্যক্তভাবে বিরাজিত ছিল। এক্ষণে এই ত্রিজগৎরূপ অসত্য মরীচিকা সেই পরব্রহ্মরূপ মরুস্থলীতে সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে। সেই ব্রহ্ম চিন্ময় স্বরূপ ; তিনি কখন ভ্রান্তিবশে জীবরূপে পরিণত হইয়া আপনাকে সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে বিভাবিত করেন, আবার কখন বীজমধ্যে দ্রুমস্থিতির ন্যায় ঐ সৃষ্টিপ্রপঞ্চ আপনাতে লুকায়িত রাখেন। ফলে, ক্ষীরের মধুরিমা, মরীচের তীক্ষ্ণতা, জলের দ্রবতা ও বায়ুর স্পন্দন, এ সকলের সত্তা যেমন অভিন্নভাবে অনুভব হয়, পরন্তু ভিন্ন হইলে অসত্য বা কিছুই নয়, তেমনি ঐ পরব্রহ্ম সৃষ্টির সহিত সম্পৃক্ত আছেন বলিয়াই সৃষ্টির সত্তা আর অসম্পৃক্ত বা পৃথক্ভাবেই উহার অসত্তা বা অসত্যতা। ব্রহ্মরূপ রত্নের যে জগৎরূপে স্ফুরণ, তাহার কোনই কারণ নাই ; কেননা, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। তবে যে বাসনা-চিত্ত-জীবাদির অনুভব হইয়া থাকে, তাহা মন হইতেই আবির্ভূত হয়। জ্ঞানযোগ ও সুদৃঢ় অভ্যাসরূপ পুরুষকার দ্বারা মনের উচ্ছেদ সাধন অর্থাৎ মনকে ব্রহ্মে বিলয় করিতে পারিলেই উহার আর উদয় হয় না। ফলতঃ কদাচ কোথাও কিছুই উদিত বা অস্তমিত হয় না ; কেননা, সকলই শান্ত, অজ, চিদ্ঘন, ব্রহ্ম। তদ্ভিন্ন কিছুই কুত্রাপি নাই। চিত্ত যতকাল থাকিবে, চিত্ত হইতে চিৎকণাত্মক জীবের অন্তরে—পরমাণুর উদরেও ততকালই সহস্র সহস্র সৃষ্টি স্ফুরিত হইতে থাকিবে। পরমাণুর

অভ্যন্তরে সৃষ্টি-পরম্পরার সন্নিবেশ-সংস্থান কি ও কেমন করিয়া হইতে পারে? ফলতঃ উহা কিছুই নয়—সর্ব্বথা অযুক্ত বা মিথ্যা। যেমন জলের অভ্যন্তরে ঊর্ম্মি ও বুদ্বুদাদি কখন গুপ্ত এবং কখন বা ব্যক্তভাবে অবস্থান করে, তেমনি জীবের অন্তরে এই জগৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতিরূপে নিখিল সৃষ্টি-পরম্পরা গুপ্ত ও ব্যক্ত উভয়ভাবেই বিরাজ করিতেছে। বেদ বলিয়াছেন, ভোগ বিলাসের প্রতি জীবের যদি কিছুমাত্র বিরাগ উৎপন্ন হয়, তবে সেই বিরাগ ক্রমে বিবর্দ্ধিত হইয়া ঐ জীবকে পরম পদে উপনীত করিয়া দেয়। স্পষ্টতই দৃষ্ট হয়, জীবের যে যে বস্তুতে বৈরাগ্যোদয় হয়, জীব সেই সেই বস্তু হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্তে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সম্পাদন করিয়া তৎপ্রভাবে দেহাদি বিস্মৃতি ও অহঙ্কারের প্রতি বিরক্তি জন্মিলে, জীব অহম্ভাব হইতে অবশ্যই মুক্তিলাভ করিতে পারে। যদি অহম্ভাব চলিয়া গেল, তবে কে আর জনন-মরণ-ভ্রম অনুভব করিবে বল? চিৎ ঈশ্বর-চৈতন্যাত্মিকা ও জীব-চৈতন্যাত্মিকা; নাম-রূপাত্মক জগৎকল্পনা-উপাধি তাঁহাতে নাই, চরাচর দেহাদিরূপ যে নিকৃষ্ট উপাধি, তাহা হইতে তিনি বর্জ্জিত, তথাভূত জন্মাদি-বিকার-বিরহিত চিতিকে যাঁহারা গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও স্বীয় অনুভব দ্বারা বিদিত হয়েন, তাঁহারাই সংসারসাগর পার হইতে সর্ব্বথা সমর্থ।

বৎস! জলের তরঙ্গ যেমন জল হইতে অভিন্ন, তেমনি জীবচৈতন্য ঈশ্বর চৈতন্য হইতে ভিন্ন নয়; ঐ চৈতন্য অদ্বিতীয় ও স্বপ্রকাশ। উহাই অহম্ভাবাপন্ন হইয়া এই জগৎ ভাব ধারণ করিতেছে। এই পরমাত্মক জগৎ সৎ কিম্বা অসৎ কিছুই নহে। সৎ নয়; কেন না—ইহা ঈশ্বরচৈতন্যাত্মক বলিয়া সৎও পৃথক্ করিতে গেলে অসৎ হইয়া যায়। চিন্ময় ব্রহ্মের যে অহংময়ী ভাবনা, তাহাই সঙ্কল্পভেদে এই বিশ্ব বিস্তার করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ ভাবনাই অন্তর্ম্মুখী হইয়া বিষ্ণুর এক নিমেষের কোটি ভাগের একাংশ কালে দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যক দিব্য যুগান্ত কাল অনুভব করিয়া থাকে। অহো মায়ার কি অপূর্ব্ব বৈভব!

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এক পরমাণু ও এক নিমেষকে লক্ষ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগেই এই প্রকার সহস্র জগৎ ও সহস্র কল্প সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতে পারে। এইরূপ আবার সেই জগতের অভ্যন্তরগত প্রত্যেক পরমাণুতেও উল্লিখিতরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই জন্যই বলি, এই সকলই অনন্ত ভ্রান্তির খেলা। জলরাশির অভ্যন্তরে যেমন স্পষ্টতই আবর্ত্ত-বিবর্ত্তন অনুভূত হয়, তেমনি এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সৃষ্টিপরম্পরা জীবের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। নদী ও তদীয় তীরগত তরুলতা হইতে মহামরুতে যেমন কুসুমবর্ষণ একান্তই অসত্য, এই সৃষ্টিপরম্পরাও তেমনি মিথ্যারূপে প্রতিভাত। অধিক আর কি বলিব, যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট ও ঐন্দ্রজালিক পুরী, ঔপন্যাসিক নগরী ও নগাদি এবং সঙ্কল্প-কল্পিত রাজধানী প্রভৃতি অসত্য হইলেও অনুভবগোচর হয়, সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরা যদিও অসত্য, তথাপি উহা সঙ্কল্পবলে অনুভূতিবিষয় হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে জ্ঞানিপ্রবর! সাধুজনগণ সম্যক্ বিচারবলে ভ্রম-বিরহিত ও পরমাত্মা সহ একীভূত হইয়া সর্ব্বোত্তম নির্ব্বিকল্প বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন অথচ সেই সকল তত্ত্বজ্ঞগণের দেহ থাকে কেন? তাঁহারা কি বলিপ্রভৃতির ন্যায় দৈব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন? তাঁহা-দিগের উপর দৈবের অধিকার কি প্রকার? এ বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এক মহানিয়তি আছেন; তিনিই স্পন্দ-রূপিণী, অবশ্যম্ভাবিনী ও নিখিল সঙ্কল্পগামিনী ব্রাহ্মী চিৎশক্তি। ফল কথা, প্রাণীর অদৃষ্ট, বস্তুশক্তি ও ঐশ্বরিক সঙ্কল্প, এই তিনের সমাবেশের নাম মহানিয়তি বা মহাদৈব। এই মহানিয়তি বশেই জাগতিক যাবতীয় ব্যবহারের অপ্রতিবিধেয় ব্যবস্থা নির্ব্বাহিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের যে লৌকিক ব্যব-

হারের ন্যায় দেহ ধারণ, তাহাও এই মহানিয়তিরই অধীনতায় ঘটিয়া থাকে। 'প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না' নিয়তির ঈদৃশ অবিচল নিয়ম বশতই জ্ঞানীর দেহ কিয়ৎকাল বিধৃত থাকে। সৃষ্টির আদিতে ঐ মহানিয়তিই মঙ্গলময় অক্ষয় পরব্রহ্মের সঙ্কল্পস্বরূপে সমুদ্রিক্তা হয়েন। 'এই বস্তু সতত এইরূপ হউক অর্থাৎ অগ্নি উষ্ণ হউক, উহার স্বভাব ঊর্দ্ধজ্বলন হউক, সলিল দ্রব ও শীতলস্বভাব হউক' ইত্যাকারের সঙ্কল্প, সৃষ্টির আদি কালে তিনিই ধারণ করেন। ঐ মহানিয়তিই মহাসত্তা, মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্ট, মহাক্রিয়া, মহোদ্ভব, মহাস্পন্দ ও মহাত্ম প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; সুতরাং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মই ঐ নিয়তি দ্বারা তৃণসমষ্টির ন্যায় সমস্ত জগৎ পরিবর্ত্তিত করিতেছেন এবং এই দেবগণ, এই দৈত্যগণ, এই নাগগণ, ইত্যাদিরূপে ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা আকল্প কাল একই ভাবে থাকিবে, কখন তাহার অন্যথা ঘটিবে না।

বৎস! ব্রহ্মসত্তার ব্যভিচার কিম্বা আকাশে চিত্রলেপন, এই দুই বিষয়ের অনুমান যদিও কখন সম্ভব হইতে পারে, তথাপি নিয়তির অন্যথা কদাপি হইবার নহে। বিরিঞ্চি প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণ, ব্রহ্ম, নিয়তি ও সর্গ ইহাদিগকে পরস্পর অভিন্ন বলিয়াই বুঝেন। তবে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারে নাই, কেবল তাহাদিগেরই বোধের জন্য তত্ত্বজ্ঞগণ ঐ ব্রহ্মস্বরূপিণী নিয়তি ও সর্গ বা সৃষ্টি নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বলিতে পার, ব্রহ্ম হইলেন অচল, চঞ্চল সর্গ বা সৃষ্টির সহিত তদীয় অভিন্নতা হইবে কেমন করিয়া? এ কথার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম অচল হইলেও অজ্ঞদৃষ্টিতে তিনি চলবৎ প্রতীত হইয়া থাকেন। তিনি অনাদি, অমধ্য ও অসীম হইলেও অজ্ঞ জনের মলিন জ্ঞানে সাদি, সমধ্য, ও সসীমরূপে প্রতিভাত হয়েন। অজ্ঞ দৃষ্টিতে আরও প্রতীত হয়, যেন অম্বরে পাদপ-স্থিতির ন্যায় এই সর্গ অনাদি অমধ্য অনন্ত ব্রহ্মাতেই ব্যবস্থিত রহিয়াছে। বলিতে পার, যেমন যেমন নিয়তি, হিরণ্যগর্ভ তদনুরূপই সৃষ্টি করিয়া থাকেন; কিন্তু এই নিয়তিকে তিনি বুঝেন কিরূপে? এ কথায় বক্তব্য এই যে, যেমন স্ফটিকশিলার অন্তরে বনরাজি প্রতিবিম্বিত হইলে, স্ফটিকের স্বচ্ছতাই তাহাকে প্রকাশিত করিয়া দেয়, প্রজাপতি তেমনি

মায়াশবলিত ব্রহ্মে অবস্থানপূর্ব্বক সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ন-কল্পনাশ্রয় আকাশের ন্যায় ঐ স্বীয় মায়ার অন্তঃস্থ সৃষ্টি-নিয়তি বিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি বিধান করেন। যেমন দেহীর দেহে করচরণাদি বিভিন্নাকারে লক্ষিত হয়, তেমনি ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভভাব আশ্রয় করিয়া চিৎস্বভাববশতঃ স্বীয় অবয়ব-ভূত নিয়তি প্রভৃতিকে স্বাভিন্ন হইলেও ভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন।

রাম! ঐ যে মহানিয়তির কথা কহিলাম, উহাই দৈবনামে অভিহিত। এই দৈবই সর্ব্বকালগামী ও সর্ব্ববস্তুব্যাপী হইয়া বিশুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মচৈতন্য-রূপে অবস্থান করিতেছে। 'এই বস্তু এইরূপে স্পন্দিত হইবে, অমুক সময়ে অমুকের সাহায্যে অমুক বস্তু অমুক প্রকারে উৎপন্ন হইবে' ইত্যা-কার যে জাগতিক নিয়ম বা অবশ্যম্ভাবিতা, তাহাকেও দৈবনামে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এই দৈবই পুরুষস্পন্দ; তৃণ-গুল্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জীব-জন্তুময় জগৎ, কাল, ক্রিয়া, দিবা, রাত্রি, সকলই দৈব বিষয়ী-ভূত বলিয়া বলা যায়। উহা দ্বারাই পুরুষের অদৃষ্টবিষয়ক ফলের অবশ্য-ম্ভাবিতা লক্ষিত হয় আবার ঐ নিয়তির সত্তাও পুরুষের অদৃষ্ট দ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ত্রিভুবন যত কাল আছে, উল্লিখিত ব্যবস্থা তত কালই চলিবে। যখন মহাপ্রলয় ঘটিবে, তখন ঐ পুরুষাদৃষ্ট ও নিয়তি উভয়ই একাত্মরূপে অবস্থান করিবে। অতএব নিয়তি ও পুরুষকার এ উভয়ের অস্তিত্ব জীবের অদৃষ্টমূলক; আবার জীবের অদৃষ্ট ও নিয়তি, এ দুয়ের সত্তা পুরুষকারমূলক। এইরূপ নিয়ম বা ক্রমে নিয়তি অস্তিত্ব লাভ করিয়া রহিয়াছে।

রামচন্দ্র! অধিক আর কি কহিব? তুমি যে আমাকে দৈব ও পুরুষকার নির্ণয় জিজ্ঞাসিবে—ইহাও নিয়তি আর আমি যে তোমায় বলিব, তুমি পুরুষকার প্রতিপালন কর, ইহাও নিয়তি বৈ আর কি? এমন লোক আছে, যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া 'দৈবই আমাকে ভোজন করাইবে' এই বিবেচনায় কোনরূপ কাজ না করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের যে এই নিষ্ক্রি-য়তা, ইহাও নিয়তি-কৃত অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কার-জনিত নিয়তির ফল সন্দেহ নাই। পুরুষ বা জীব যদি কল্পারম্ভ-কাল হইতেই কেবল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রসূত কর্ম্ম এবং কর্ম্ম প্রযুক্ত

ভূতভৌতি বিকার বা আকৃতি প্রভৃতি কোন কিছুই হইত না ; সুতরাং কল্পের প্রারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত যে কিছু পুরুষক্রিয়ামূলক জগৎ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, সে সকলই নিয়তির অধীনতায় ঘটিতেছে। এই অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি যাহা করিবে, তাহা রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণেরও বুদ্ধির অলঙ্ঘনীয়। নিয়তি অবশ্যম্ভাবিনী বটে ; কিন্তু তাহার ফলাফলের মূল পুরুষকার। ফল কথা, যে নিয়তি পুরুষকারে পরিণত হয়, তাহারই ফল উত্তরকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; সুতরাং ধীসম্পন্ন ব্যক্তি এই নিয়তি আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ নিয়তি যাহা করিবে, তাহাই হইবে, এইরূপ ভাবিয়া কদাচ পুরুষকার পরিত্যাগ করিবেন না। কেননা, নিয়তি পুরুষকাররূপেই কর্ম্মফলের নিয়ামক হইয়া থাকে। ঐ নিয়তি যখন পুরুষ প্রযত্নে বিবক্ষিত না হইয়া ঐশ্বরিক সঙ্কল্পমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তখনই উহা নিয়তি আর ঐ নিয়তিই সৃষ্টিফলে উপহিত হইয়া পুরুষকার শব্দে অভিহিত। কাজেই নিয়তি যদি পুরুষকারে পরিণত না হয়, তবে তাহা নিষ্ফল আর যদি পুরুষকারে পরিণত হয়, তবেই তাহা সফল হইয়া থাকে। বলিতে পার, পুরুষকার-বিরহিত অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিলেও ত তৃপ্তি-ফল লক্ষিত হইয়া থাকে। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য বটে—অজগর অতি বড় বিপুলদেহ সর্প ; কোথাও যাতায়াত করিবার শক্তি তাহার নাই। কাজেই তাহাকে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। যখন সম্মুখে কিছু আইসে, তখন সে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে ; কিন্তু এই যে গ্রাস-গ্রহণ, ইহা প্রযত্ন বা মুখব্যাদানাদি চেষ্টা ব্যতীত ঘটে না ; সুতরাং অজগর ব্রতেও কিছু না কিছু পুরুষকার রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঈদৃশ গ্রাস গ্রহণাদিও পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল নিয়তি আশ্রয়ে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করে, সে কখন তৃপ্তিফল পায় না ; পরন্তু তবে যে ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সহ্য করিয়া কিঞ্চিৎ কাল সে জীবিত থাকে, তাহাতেও তাহার প্রাণবায়ু-পরিস্পন্দাদি কোথায় যাইবে ? তাদৃশ প্রযত্ন ত তাহার থাকিয়াই যায়। যদি কেহ এমন কথা বলে যে, যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান হয়, তখন ত প্রাণ-প্রচলনাদিও থাকে না, তখনকার সে অবস্থা সকল-বিশ্রান্তি-দায়িনী ; যত কিছু পুরুষকার, সে অবস্থায় সকলেরই ত বিরাম দেখা যায়। এ কথার উত্তরে আমার

বক্তব্য এই যে, সেই যে নির্ব্বিকল্প অবস্থা, তাহাই হইল সর্ব্ববিধ পুরুষ-প্রযত্নের চরম ফল বা মোক্ষ। যদিও সে কালে সে অবস্থায় সকল পুরুষকারের বিরতি ঘটে, তথাপি বলিতে হইবে—সেই অবস্থার পূর্ব্বে সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন সাধু পুরুষকে প্রাণ-নিরোধাদি পুরুষকার অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; সুতরাং সেই পরমোত্তম মোক্ষ-পদকে কিছুতেই অপৌরুষেয় বলা চলে না, তাহা প্রাণ নিরোধাদি যোগচর্য্যারূপ পুরুষ-কারেরই ফল বলিতে হইবে। অতএব শাস্ত্রাদিষ্ট পুরুষকার অবলম্বন করাই সাধনকালে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ; আর সিদ্ধিকালে তাহার ফলস্থানীয় একান্ত নিষ্কর্ম্মাত্মক মোক্ষই পরম শুভ। সাধ্য ও সাধনরূপ বিবিধ শ্রেয় অবস্থার মধ্যে জ্ঞানীদিগের যে অবস্থা, তাহাই প্রবল। মহাত্মা জ্ঞানীদিগের যে সিদ্ধিরূপা নিয়তি, তাহাতেই দুঃখের লেশমাত্রও নাই; তাই তাহা নির্দ্দুঃখা আখ্যায় অভিহিত। উহাতে অবিদ্যা নাশ হয় বলিয়া উহা প্রবলা। তথাবিধ নির্দ্দুঃখা নিয়তি আর কিছুই নহে, উহা ব্রহ্মসত্তারই স্ফূর্ত্তিভেদ। যদি শাস্ত্রাদিষ্ট পুরুষকারের আশ্রয় লইয়া ঐ নির্দ্দুঃখা নিয়তি চির-স্থির করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় পরমোত্তম পরম শুদ্ধ পদ লাভ হয় এবং তাহা লাভ হইলেই পরমা গতি হইয়া থাকে।

রাম! যেমন তৃণ, লতা, তরু ও গুল্ম প্রভৃতিরূপে ধরাতলস্থ জলেরই দ্রবত্ব স্ফুরিত হইতেছে, সেইরূপ সর্ব্বগামী ব্রহ্মই উল্লিখিতরূপ নিয়তি প্রভৃতি মহাবিলাসে বিলসিত হইতেছেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! ঐ যে ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তিনিই নানারূপে সর্ব্বদা সকল দেশে বিরাজমান। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বপ্রকার আকারসম্পন্ন। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বময়। যিনি

ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। এই আত্মাই সর্ব্বশক্তিমত্তা হেতু কোথাও চিৎশক্তি প্রকাশ করেন, কোথাও সাত্ত্বিক উপাধিতে শান্তি বিস্তার করিয়া থাকেন, কোথাও তামস উপাধিতে জড়শক্তি প্রকটিত করেন, কোথাও রাজস উপাধিতে রাগ-লোভ-প্রবৃত্তি-প্রভৃতিরূপ উল্লাস প্রকাশ করেন, কোথাও কিঞ্চিৎ মিশ্রিতভাব এবং কোথাও বা সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে কিছুই প্রকাশ করেন না। তিনি যে কালে যেখানে যেরূপ ভাবনা করেন, তখন সেখানে তাহাই দেখিয়া থাকেন। ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ব্বশক্তিময়; তাঁহার যে শক্তি যেরূপে সমুদিত হয়, তিনি সেইরূপেই পরিণত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের যে নানারূপিণী শক্তি আছে, ব্যবহার-দৃষ্টিতে সে সকল শক্তি বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়; পরন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিলে, সে সকল স্বভাবতই তদভিন্ন একই আত্মা বৈ আর কিছুই নয়। ধীসম্পন্ন লোকেরা লৌকিক-ব্যবহারের জন্য ঐ চিৎশক্তির ভেদ বিকল্প সকল কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিক আত্মাতে উহার কিছুমাত্র নাই। যেমন সাগরে জল ও তরঙ্গের পরস্পর ভেদ সত্য নয়, যেমন কটকে, অঙ্গদে ও কেয়ূরাদিতে সুবর্ণের ভেদ অবাস্তবিক এবং যেমন অবয়বে ও অবয়বীতে ভেদ অসত্য ও তাহাদের একতাই সত্য, সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি এই উভয়ে ভেদ অবাস্তবিক; উহার অভিন্নতা বা একতাই বাস্তবিক। রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদি জ্ঞানের ন্যায় যাহা যেরূপে বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, তাহা সেইরূপেই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে তাহা সেরূপ হয় না। কেননা, ঐ সর্পাদি রজ্জু প্রভৃতির বাহিরে বা অন্তরে কোথাও সমুদিত নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মতা-নিবন্ধন সর্ব্বত্রই সমভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ফল কথা, তিনি সর্ব্বসাক্ষী; ভ্রান্তি বশতঃ কচিৎ কোথাও তিনি কিঞ্চিৎ দেখেন, সর্ব্বত্র দেখেন না; আবার ঐরূপ দর্শন বাস্তবিকও নয়। একমাত্র ব্রহ্মই এই বিশ্বাকারে বিরাজ করিতেছেন। যাহারা ভ্রান্তবুদ্ধি বা মিথ্যা জ্ঞানবান্, তাহারাই উল্লিখিতরূপে শক্তি ও শক্তিমত্তা এবং অবয়বত্ব ও অবয়বিত্ব কল্পনা করিয়াছে। বস্তুতঃ উহা পারমার্থিক নহে।

রাম! এইরূপে মিথ্যাজ্ঞানে উপহিত চিৎ সৎশাস্ত্রের অনুগুণ অথবা অসৎ শাস্ত্রপ্রতিকূল যাহাই কেন কর্ত্তব্য বলিয়া সঙ্কল্প করেন

না, তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, এবং তদ্বিষয়েই উদ্যুক্ত হইয়া থাকেন। অপিচ অভিনিবেশ সহকারে তদনুরূপ বিহিত বা নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ফল ভোগের সময়ে তাহার ফল দর্শন করেন। ফলতঃ একমাত্র ব্রহ্ম চৈতন্যই প্রকাশমান রহিয়াছেন—তাহাই সত্য ; আর কিছুই নাই।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! যিনি পরমাত্মা, তিনিই মহেশ্বর—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগামী ; তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি স্বচ্ছ, স্বপ্রকাশ ও আনন্দমূর্ত্তি। ঐ শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপ পরমানন্দ পরমাত্মা হইতেই প্রথমে চিত্তবান্ জীব বা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। পরে তাঁহার সেই চিত্ত হইতে জগতের উদ্ভব হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ব্রহ্ম হইলেন নিরতিশয় অপরিচ্ছিন্ন ; তিনি অখণ্ড, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ। এই পরিচ্ছিন্ন সখণ্ড জীব কিরূপে তাঁহাতে পৃথক্ সত্তা লাভ করে?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মিথ্যাভূত দ্বৈতভান হয়। ব্রহ্ম নির্ম্মলাত্মক ; তিনি সর্ব্বব্যাপী। যাঁহারা আত্মদর্শনে অক্ষম, তাহাদের পক্ষে তদীয় চিদাকার অতি ভয়াবহ। তিনি আনন্দময় এবং নিত্য বিরাজমান। তদীয় উপাধি-বিরহিত পরিপূর্ণ সত্ত্বসাম্য অবস্থা যে কি, তাহা প্রকৃত পণ্ডিতেরাও নির্ণয় করিয়া প্রদর্শন করিতে পারেন না। তিনিই শুদ্ধ শান্ত পরমপদ। তাদৃশ পরব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন সম্বিদাত্মক, প্রাণধারণাত্মক ও চলনশক্তিসম্পন্ন যে রূপ উদিত বলিয়া প্রতীত হয়, যাবৎ না শান্তি বা মোক্ষ ঘটে, তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ রূপ জীবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই চিদাকাশমূর্ত্তি পরমাদর্শে অনুভবাত্মক অসংখ্য জগৎ প্রতিবিম্বিত হয়। হে রাঘব! নিবাত নিষ্কম্প নীরনিধির ও প্রদীপের

যৎকিঞ্চিৎ প্রচলন বা স্ফুরণের ন্যায় ব্রহ্মের যে কিঞ্চৎ চাঞ্চল্য বা প্রস্ফুরণ, তাহাকেই তুমি জীব বলিয়া জানিবে।

রামচন্দ্র! ব্রহ্ম নির্ম্মল ও নিস্ক্রিয়; তদীয় প্রাণাধীন প্রচলনের অধ্যারোপে নিস্ক্রিয়ত্ব তিরোহিত হইয়া গেলে, চিদাকাশের যে অল্প সম্বেদন বা পরিচ্ছেদাত্মক 'অহ'মিত্যকার স্বাভাবিক স্ফুরণ,তাহাই জীবনামে নির্দ্দিষ্ট। পবনের চাঞ্চল্য, অগ্নির উষ্ণতা ও তুষারের শীতলতা, এইগুলি যেমন স্বভাবসিদ্ধ, যতকালে না মোক্ষলাভ ঘটে, ততকাল পর্য্যন্ত আত্মার জীবভাবও তেমনি স্বাভাবিক। সেই চিৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বের স্বীয় অজ্ঞান বশতঃ আপনা হইতেই যে যৎকিঞ্চিৎ সম্বেদন বা জ্ঞানস্বরূপের পরিচ্ছিন্নতা, তাহাই জীবনামে নিরূপিত। অণুপ্রমাণ অগ্নি যেমন স্বীয় ইন্ধনাধিক্য-নিবন্ধন আপনার প্রকাশকতা প্রাপ্ত হয় বা উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তেমনি ব্রহ্মের পরিচ্ছেদাত্মক ঐ জীবও প্রগাঢ় বাসনা-বশে ক্রমশঃ অহম্ভাব আশ্রয় করিতে থাকে। বুঝিয়া দেখ, দর্শকের চক্ষুতে আকাশের যতদুর পর্য্যন্ত পতিত হয় কিম্বা তদীয় চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, ততদূর যাবৎই সে, নির্ম্মল নিরাকার নিরীক্ষণ করে; কিন্তু আকাশের যে অংশ সেই দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা নীলিমময় না হইলেও দর্শকের দৃষ্টিতে ভ্রমবশতঃ নীলিমময় বলিয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ জীব অহম্ভাব-বিরহিত হইলেও আপনাতে আত্মদর্শনের অভাব বশতই আপনার অহম্ভাব ভাবনা করিয়া থাকে। অম্বর যেমন এই প্রত্যক্ষ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলশিলাকল্প নিবিড়তা নিবন্ধন নীলবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়, জীব তেমনি উদ্বুদ্ধ পূর্ব্ব-সঙ্কল্প-সংস্কারের, অধ্যাস বশতঃ অহম্ভাব ভাবনা করে। জীবের এই অহম্ভাব দেশ ও কালাদি বিভিন্নরূপে পরিছিন্ন হইয়া আপনার সঙ্কল্পবলে দেহাদি আকার ধারণপূর্ব্বক পবন-স্পন্দনের ন্যায় পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। অনন্তর ঐ অহম্ভাব সঙ্কল্পোন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি প্রভৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। তখন সেই সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত বা ব্রহ্মা স্বীয় সঙ্কল্পপ্রভাবে ভূততন্মাত্র কল্পনা করিয়া আপনার চেতনাত্মক পূর্ব্ব অবস্থা হইতেই স্খলিত হয়েন এবং জড় পঞ্চীভাব আশ্রয় করেন। পরে ঐ চিত্তই ভূততন্মাত্র ও পঞ্চীভাব উপগত হইয়া অজাত জগদা-

কাশে অস্ফুটপ্রভা তারকার ন্যায় তেজঃকণ আকারে পরিণত হয়েন। বীজের অঙ্কুরত্ব প্রাপ্তির ন্যায় ঐ চিত্ত তখন তন্মাত্র-কল্পনায় স্বীয় পরিস্পন্দ প্রযুক্ত ধীরে ধীরে উক্ত তেজঃকণত্ব গ্রহণ করেন। অনন্তর ঐ তেজঃকণ অনন্ত আখ্যায় অভিহিত হয়। উহার অভ্যন্তরে ব্রহ্মা স্ফুরিত হইতে থাকেন এবং উহা কল্পনাপ্রভাবে জলের করকাদি ঘনীভাব প্রাপ্তির ন্যায় অণ্ডতা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে উহার কোন তেজঃকণ দিব্য দেহাদি কল্পনা বলে সহসা দিব্য দেহ লাভ করিয়া নিরহন্তাব বস্তুতে অহন্তাবরূপে ভ্রান্তিগ্রস্ত হয়। অথবা গন্ধর্ব্ব বা অন্য কোন দেবগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে গমন করিয়া থাকে। এইরূপে আপন আপন সঙ্কল্প বশতঃ কেহ স্থাবর-ভাব লাভ করে, কেহ বা জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ বা খেচরাদি-রূপে পরিণত হইয়া থাকে। "সৃষ্টির আদি কালে সঙ্কল্প-সম্ভূত আদি যে জীবদেহ, তাহাই ক্রমশঃ বিরিঞ্চিপদে উন্নীত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করে। ঐ স্বয়ম্ভূ বিরিঞ্চি যে যেরূপ কল্পনা করেন, স্বভাব-নিবন্ধন ক্ষণমধ্যেই তাহা আবির্ভূত হইতে দেখেন। তিনি চিৎস্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বকারণ-স্বরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করিবার পর সকল সংসারের কারণ হইয়া কর্ম্ম-নির্ম্মাণে নিরত হয়েন। জল হইতে ফেনোদ্গমের ন্যায় চিত্ত হইতে চিত্ত স্ফুরণ স্বভাবতই হয়। উল্লিখিত জলজাত ফেনপুঞ্জ যেমন পশ্চাৎ নৌকারজ্জুতেই সংলগ্ন হয়; পরন্তু জল আবদ্ধ হয় না, সেইরূপ ঐ চিত্তও শেষে কর্ম্মপরম্পরাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে; পরন্তু চিদাত্মা উহাতে সংশ্লিষ্ট হয়েন না। লোক যেমন অগ্রে সঙ্কল্পশূন্য থাকিয়া পরে সঙ্কল্পবশে মনে মনে ঘটপটাদি রচনা করিয়া লয় এবং অবশেষে বাহিরে সেই সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকে, জীবও এইরূপ সর্ব্বাগ্রে নিষ্ক্রিয়-ভাবে অবস্থান করে, অনন্তর সঙ্কল্প রচনা করিয়া লয় এবং পশ্চাৎ সঙ্কল্পা-নুরূপ কর্ম্মপরম্পরা বিস্তার করিতে থাকে। অঙ্কুর যেমন অগ্রে বীজমধ্যে সূক্ষ্মাকারে সমুৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পত্র, পুষ্প, ফল, পল্লব, শাখা প্রশাখাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ-জীবের অভ্যন্তরেও জীবনিবহ সূক্ষ্মাকারে বিরাজিত ছিল, অনন্তর সঙ্কল্পবলে ঐ সকল জীব এই এই দৃশ্যমান বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

অন্যান্য ব্যষ্টিভূত জীব সকলও এইরূপে স্ব স্ব বাসনারূপে বিরাজিত দেহাদি আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে বিশেষ এই যে, হিরণ্যগর্ভ জীব-সঙ্কল্পের পূর্ব্বোৎপন্ন যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে ঐ সকল জীব মাতা পিতা প্রভৃতিরূপে যাদৃশ প্রকারে অবস্থিত ছিল, তদনুরূপ দেহাদিই লাভ করিয়া পরে জনন-মরণের কারণস্বরূপ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ ঊর্দ্ধদিকে এবং কেহ বা অধোদিকে প্রস্থান করে। কর্ম্ম কাহাকে বলা যায়? কর্ম্ম চিৎস্পন্দ ব্যতীত অপর কিছুই নয়। ফলতঃ যাহা কর্ম্ম, তাহাই চিৎস্পন্দন এবং যাহা দৈব, তাহাও ঐ চিৎস্পন্দন। এইরূপ শুভাশুভলক্ষণ চিত্তও চিৎস্পন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। দেখ, পাদপ হইতে তদীয় অঙ্গস্বরূপ কুসুমসমূহ পূর্ব্বে একবার জন্মিয়া পরে যেমন আবার জন্ম লয়, তেমনি ঐ প্রথম চিৎস্পন্দ হইতেই বারম্বার অনন্ত জগৎ জন্ম লইতেছে।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম। সেই পরম কারণ হইতে অগ্রে মন উৎপন্ন হয়। যত কিছু ভোগ্যবস্তু, সমস্তই মননাত্মক বা মনোময়। যে কিছু দৃশ্য পদার্থ, মনেতেই সে সকলের স্থিতি। মন তাহার স্বকারণের অতিরিক্ত নহে। মন দোলার ন্যায় নিয়ত নানাদিকে পরবর্ত্তনশীল। ইহা এইরূপ হইবে, ইহা এইরূপ হইবে না, ইত্যাদিরূপ ভাবাভাব বিষয়ে মনই বিলসিত হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বানুভূত গন্ধ পরবর্ত্তী কালে না থাকিলেও মনোরথ দ্বারা স্মরণ করিলে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়, তেমনি এই সদসদাভাস জগৎসৃষ্টি মনেতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই বলি, ভেদ বাস্তবিক কিছুই নাই; যে কিছু ভেদ দেখা যায়, সে সকল মনেরই কল্পিত। যখন সকলই মনের কল্পনা, তখন এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, মন যদি অপগত হয়, তবে এই সমস্ত প্রপঞ্চ বা ভেদ-ভিন্নতাও চলিয়া যায় এবং তখন একমাত্র বস্তুর প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চয়। মন বিলয় পাইয়া গেলে, কোন ভেদ

আর থাকে না; তখন কেবল একাদ্বয় আত্মাই অবস্থান করিতে থাকেন। অপিচ তৎকালে ব্রহ্ম, জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ এ সকল ভেদ কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। স্বয়ং আত্মাই মাত্র জ্ঞানজলময় চিৎ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকেন।

বৎস! স্থৈর্য্য নাই বলিয়া চিত্ত ও জগৎ উভয়ই অসত্য, আবার প্রতিভাস বশতঃ অজ্ঞদৃষ্টিতে উহারা সত্য বলিয়া প্রতীত; সুতরাং চিত্ত ও জগৎকে সদসদাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরন্তু স্বপ্ন যেমন সত্য নয়, তেমনি ঐ চিত্ত ও জগৎ উভয়ই মিথ্যা বা অসম্ভব। এই জন্যই চিত্তের যে জগদ্দর্শন, তাহা এক প্রকারে সত্য এবং অন্য প্রকারে অসত্য বলা যায়। অর্থাৎ অজ্ঞদৃষ্টিতে সৎ এবং বিজ্ঞ দৃষ্টিতে অসৎ। এই যে সংসাররূপ দীর্ঘ স্বপ্ন, ইহা কেবল মনের আসক্তিবলেই স্থায়ী রহিয়াছে। যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি স্থাণুতে পুরুষ প্রত্যয় করে, মনও তেমনি পরমাত্ম-দর্শনের অভাবে এই মিথ্যা জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। বলিতে পার, যদি তাহাই হয়, তবে যিনি আত্মা, তিনি আপনার পূর্ণানন্দভাবের প্রচ্যুতি নিবন্ধন সর্ব্বদুঃখের মূলীভূত যে স্বীয় মনোভাব, তাহার জন্য অনুশোচনা করেন না কেন? এ কথার উত্তর এই যে, মনে কর, কোন বালক মনে মনে বেতাল কল্পনা করিল; সে জন্য তাহার একটা তীব্র ভয় উপস্থিত হইল। এই সময় ঐ ভয়েই তদীয় চিত্ত একান্ত অভিনিবিষ্ট হওয়ায় সেই বালক যেমন তাহার ভয়ের হেতুভূত বেতাল-কল্পনার জন্য আর অনুশোচনা করে না, সেইরূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞান বা আত্মদর্শনের অভাব হেতু আত্মা চিত্তভাবাপন্ন হইয়াও চিত্তভাব-জনিত যে অনর্থ, তাহার জন্য কিছুই অনুশোচনা করেন না। আত্মা আখ্যা-বর্জ্জিত; তিনি সর্ব্বশান্তিময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার যে চেত্যোন্মুখত্ব স্বভাব বা সৃষ্টি প্রবর্ত্তনেচ্ছা, তাহাই সমস্ত অনর্থপরম্পরার মূল। সেই চেত্যোন্মুখতা হেতু চিত্ত, চিত্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহম্ভাব, অহম্ভাব হইতে চিত্তত্ব বা চিত্তবিষয় তন্মাত্রা, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দিয়াদি হইতে দেহাদি, দেহাদি হইতে দেহাদিগত মোহ এবং তাহা হইতে অর্থাৎ 'অহং' 'মম' ইত্যাকার অভিমান হইতে বীজাঙ্কুরবৎ দেহ, কর্ম্ম, বন্ধন, মোক্ষ, স্বর্গ ও নরকাদি বিস্তৃতি

পাইয়াছে। চিদাত্মা [ব্রহ্ম] ও জীব এই উভয়ের যেমন কোনই ভেদ নাই, তেমনি জীব ও চিত্ত এ দুয়েরও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জীব ও চিত্তের প্রভেদ যেমন অসত্য, তেমনি দেহ ও কর্ম্ম এ উভয়ের পরস্পর ভেদও অসম্ভব; সুতরাং কর্ম্মই দেহ, সেই দেহই চিত্ত, সেই চিত্তই অহম্ভাবময় জীব, সেই জীবই ঈশ্বরচৈতন্য এবং তাহাই আত্মা; যিনি আত্মা, তিনিই সর্ব্ব, শিব, শান্ত ও একই অদ্বয়রূপে নির্দ্দিষ্ট।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এইরূপে একই পরমবস্তু নানাকার আশ্রয় করিয়া থাকেন। যেমন একটী প্রদীপ হইতে শত শত দীপের আবির্ভাব, সেই একাদ্বয় পরম বস্তুরও নানাত্ব প্রাপ্তি সেইরূপ। সুতরাং যদি বিচার-দৃষ্টিতে তদীয় অনারোপিতরূপ অবলোকিত হয়, তবে আর অনুশোচনা করিতে হয় না। তখন তাঁহার নাম-রূপাদিহীন যথার্থ রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমাত্মজ্ঞানে চিত্তের জীবত্ব কল্পনা ও তাহার বন্ধন, এই উভয় মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। আত্মজ্ঞ জন সে কালে সর্ব্ব শোক হইতে মুক্ত হয়েন। চিত্তই জীবরূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে; সুতরাং যদি বিচারবলে চিত্তের উপশম হয়, তাহা হইলে আর চিত্তারোপিত জগতের কোনই অস্তিত্ব থাকে না, তখন ঐ জগৎপ্রপঞ্চ প্রশান্ত হইয়া যায়। দেখ, যে অজ্ঞজনের পাদযুগল চর্ম্ম পাদুকায় আবৃত, তাহার নিকট এই সমস্ত পৃথিবীটাই চর্ম্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাহার জ্ঞানে নির্ম্মুক্ত পরমাত্মা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া অবধারিত। কদলী তরু যেমন কতকগুলি পত্র, ত্বক্, কাণ্ড ও মূল প্রভৃতি সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নহে, তেমনি চিত্ত ভ্রমের উপাদান এই জগৎও শুধুই ভ্রমময়; ভ্রম ব্যতীত ইহার স্বরূপান্তর কিছুই নাই। জন্ম হইল, বাল্য আসিল,

যৌবন উপস্থিত হইল, বার্দ্ধক্য দেখা দিল, পরে মরণ ঘটিল, মরণের পর স্বর্গ কিম্বা নরকভোগ হইল, এ সকল কেবল ভ্রমবশতঃ চিত্তেরই নর্ত্তন বা খেলা। যেমন সুরা পান নিবন্ধন নিরাকার আকাশেও অসংখ্য বুদ্বুদমালা দৃষ্ট হয়, অজ্ঞানতাহেতু চিত্তেও তেমনি বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি-পরম্পরা লক্ষিত হইয়া থাকে। নেত্র যদি পিত্তদোষে দূষিত হয়, তবে তাহা যেমন শুভ্র শঙ্খাদিতে পীতবর্ণতা ও শশাঙ্ক প্রভৃতিতে দ্বিত্ব দর্শন করে, জীবচৈতন্যও তেমনি চিত্তের ভ্রান্তিবিধায়িনী শক্তিতে সমাক্রান্ত হইয়া এই সকল সংসারভ্রান্তি দর্শন করিতেছে। মদিরাপানে মত্ত ব্যক্তি মত্ততা বশতঃ কখন কখন যেমন পাদপদিগকেও ঘূর্ণিত হইতে অবলোকন করে, জীবচৈতন্যও তেমনি এই সংসারকে ভ্রান্তিবশে চেতন-বিক্ষুব্ধ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। খেলার সময় বালকেরা ঘুরিতে ঘুরিতে তথাকার সমস্ত ভূভাগকেই যেমন কুম্ভকারচক্রের ন্যায় ভ্রমণশীল বলিয়া বোধ করে, জানিও চিত্তের গতিবশতই এই বিচিত্র দৃশ্য বিশ্ব তেমনি অনুভূত হইয়া থাকে।

বৎস! চিৎ যখন দ্বৈত ভাবনা করে, তখনই তাহার একত্বে দ্বিত্বভ্রম জন্মিয়া থাকে; পরন্তু সে যখন দ্বৈতানুভব করে না, তখনই এই যে কিছু দ্বৈতপ্রপঞ্চ ক্ষয় হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, দ্বৈতানুভূতির ক্ষয় হইলে তখন একইমাত্র অবশিষ্ট থাকে। রাম! চিত্তের অতিরিক্ত বিষয় কিছুই নাই, এরূপ জ্ঞান ও তদুপযোগী সমাধি-অভ্যাস করিলে চিত্তের আর বিষয় দর্শন থাকে না; তাহার তখন বিলোপ ঘটিয়া থাকে। ইন্ধনের অভাবে বহ্নি-যেমন আপনা হইতেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তেমনি অভ্যাসবশে বিষয় দর্শনের অভাবে চিত্তেরও উপশম হইয়া থাকে। তাদৃশ জ্ঞানাভ্যাসে যোগী যখন চিদ্ঘনের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন, তখন তিনি সমাধিলীনই হউন, আর ব্যবহার-নিরতই হউন, তাঁহাকে তৎ-কালে জীবন্মুক্ত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। বলিতে পার, চিদ্ঘনের সহিত একতায় অল্পজ্ঞ চিত্তের সর্ব্বজ্ঞতাই জন্মিতে পারে; পরন্তু নির্ব্বিষয়তা-রূপ সংশান্তি ত তাহার ঘটে না। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বৎস! বুঝিয়া দেখ, সুরাপানে যদি অল্প মত্ততা হয়, তাহা হইলে মানুষের যেমন

অল্পমাত্র চিত্ত-বিক্ষোভ ঘটে, তেমনি চৈতন্যের অল্প উন্মেষণে চিত্তের বিষয়-দর্শন মাত্র হয়, আর যদি মত্ততা অধিক হইয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ যেমন জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, চৈতন্যের প্রকাশাধিক্য বশতঃ বিষয় দর্শনেরও তেমনি বিলোপ ঘটিয়া থাকে। চৈতন্যের যে প্রকাশাধিক্য, তাহা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনেই হয়। সেই অতিপ্রকাশিত নিবিড় চৈতন্যই পরম পদ। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় সে পদে অধিরূঢ় হইলেই চিত্তের স্বরূপ-শূন্যতা ও নির্ব্বিষয়তাদি ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যই চিত্ত নিমিত্ত চেত্যভাব—দৃশ্য অনুভূতিবিষয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি জন্মিয়াছি, আমি জীবিত আছি, আমি দেখিতেছি, আমি সংসারে আছি, ইত্যাদি মিথ্যাভ্রম-পরম্পরা অনুভব করিতে থাকে। যেমন স্পন্দন বিনা পবন-সত্তা নাই, চিত্তও তেমনি চেত্যের অতিরিক্ত নয়। উষ্ণতা অপগমের সঙ্গে সঙ্গে বহ্নির বিলোপ ঘটিবার ন্যায় চেত্য বা বিষয় বিরতির সমকালেই চিত্তেরও অবসান হইয়া যায়, তখন আর তাহার স্বরূপান্তর কেহই অনুভব করে না। চিৎ অর্থে শুদ্ধ চৈতন্য; তদীয় যে কিছু অনুভূত বিষয়, তাহার নাম চেত্য। মিথ্যাজ্ঞানবশে রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গভ্রম ঘটে, অবিদ্যা নিবন্ধন ঐ শুদ্ধ চৈতন্যেও তেমনি চেত্য বা বিষয়ভ্রম হয়; বুধবর্গের ইহাই অভিমত।

রাম! এই যে চিত্ত-মাত্র-স্পন্দনাত্মক সংসার রোগ, একমাত্র সম্বিদ্ বা জ্ঞানই ইহার মহৌষধ। সংসারের অকিঞ্চিৎকরতা ও আত্মার সত্যতা বোধই ঐ জ্ঞান। ঐ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চিত্তের সমাধি ভিন্ন অন্য কোনই আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। যদি সমস্ত বাহ্য দৃশ্য পরিহার করিয়া বাসনাবিহীন-চিত্তে থাকিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি—এই মুহূর্ত্তেও তোমার মুক্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যেমন সুনিপুণ দর্শনে রজ্জু-গত ভুজঙ্গভ্রম বিলয় পায়, তেমনি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানে এই সংসার-ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়। বৎস! যদি সর্ব্বতোভাবে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে মোক্ষলাভ নিশ্চয়ই ঘটে; সুতরাং মোক্ষ বিশেষ দুষ্কর নহে। দেখ, যাঁহারা মহাশয় পুরুষ, তাঁহারা যখন অভীপ্সিত বস্তু লাভের জন্য প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্তও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না; তখন মাত্র অভিলাষটুকু পরিত্যাগ করিতে আর কৃপণতা হয়

কেন? তোমায় আর অধিক বলিব কি? তুমি অভিলাষ ও অভিলষণীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্ক, নিশ্চল ও নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান কর, তাহা হইলেই তোমার কৃতকৃত্যতা হইবে।

রামচন্দ্র! করতলগত বিল্ব ফল, এবং সম্মুখস্থিত পর্ব্বত ও প্রাসাদ, এই সমুদায়ের ন্যায় পরমাত্মার জনন-মরণাদি বিকাররাহিত্য প্রত্যক্ষতই প্রতিভাত। যেমন একই অপ্রমেয় নীরনিধি তরঙ্গভেদে ভিন্নাকারে বিভাত হইয়া থাকে, তেমনি একই পরমাত্মা অজ্ঞদৃষ্টিতে এই বিশাল বিস্তৃত জগদাকারে স্ফুরিত হইতেছেন। তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে তিনি মোক্ষসিদ্ধি সমর্পণ করিয়া থাকেন আর তিনি অজ্ঞাত থাকিলে অর্থাৎ তাঁহাকে না জানিতে পারিলে সংসারে চিরবন্ধন অপরিহার্য্য হইয়া থাকে।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি মন-উপাধিক জীবের কথা কহিয়াছেন; আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এই মন-উপাধিক জীব পরমাত্মার কে হয়েন? তথাবিধ জীব সহ পরমাত্মার সম্বন্ধটা কিরূপ? জীব পরমাত্মাতে কেমন করিয়া জন্মিল? অর্থাৎ জীব কে? জীবকে কি পরমাত্মার অংশ কিম্বা পরমাত্মার কার্য্য অথবা স্বয়ং পরমাত্মা বলিয়াই বুঝিব? জীব যদি স্বয়ং পরমাত্মাই হয়েন, তবেত পরমাত্মাতে জীবের উৎপত্তি, এ কথার সঙ্গতি হয় না। আর যদি জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন, এ কথা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই উৎপত্তি পরিণাম ক্রমে? কি বিবর্ত্তক্রমে? যদি পরিণাম ক্রমে হয়, তবে উহার অনিত্যতা হইয়া পড়ে, আর বিবর্ত্তে বাধক জ্ঞানের বিষয়তা অপরিহার্য্য। তবে যদি জীবকে পরমাত্মার অতিরিক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে জানিতে

চাই, ঐ জীব পরমাত্মার সজাতীয় কি বিজাতীয় ? আপনি আমার এই সকল সন্দেহ পরিহারের জন্য পুনর্ব্বার আমার নিকট জীবের স্বরূপ বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস ! ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সর্ব্বেশ্বর। তিনি অবিদ্যায় উপহিত হইয়া যখন যে শক্তিতে প্রকটিত হয়েন, তখনই আপনাকে সেই শক্তিসম্পন্ন অবলোকন করেন। সেই সর্ব্বাত্মা স্বয়ং অনাদি কাল হইতে যে চেতনরূপিণী শক্তিকে জানিয়া আসিতেছেন, সেই শক্তিই জীবনামে নির্দ্দিষ্ট এবং উহাই বিবিধ সঙ্কল্পের বিধানকর্ত্রী। ঐ চিত্ত-সংস্কার-ময় চিৎশক্তি আপনা হইতে সঙ্কল্পের সমুদ্রেক নিবন্ধন দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হয়েন এবং পরে জনন-মরণাদি নানাভাবে উপহিত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর ! আপনি যেরূপ বলিলেন, জীবস্বরূপ যদি সেইরূপই বুদ্ধিতে ধারণা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, দৈবনামে কাহাকে অভিহিত করা হয় এবং কর্ম্ম ও কারণ এই দুই শব্দই বা কি কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! আকাশে যেমন স্পন্দ ও অস্পন্দ এই দ্বিবিধস্বভাব সমীরণ বিদ্যমান, এই দৃশ্য বিশ্বে তেমনি স্পন্দ ও অস্পন্দ এই উভয় স্বভাবসম্পন্ন চিৎই বিরাজমান। তদ্ভিন্ন এ বিশ্বে আর কাহারই অস্তিত্ব নাই। চিৎ যখন স্পন্দনস্বভাব, তখন তিনি তমোগুণ প্রধান মায়ায় আবৃত, আর যখন অস্পন্দস্বভাব, তখন তিনি শুদ্ধ। এ হেন চিতের যৎকালে স্পন্দনস্বভাব প্রকাশ পায়, তখন তিনি সৃষ্টিব্যাপারে উন্মুখী হয়েন আর স্পন্দের অভাবে কেবল শান্তরূপেই অবস্থান করেন। চিৎ যে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ চিদ্ভাবকে স্ববিষয়ক অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানে চিত্ত বা মন বলিয়া কল্পনা করেন ; অর্থাৎ তিনি যে আপনিই আপনার দৃশ্য হইয়া থাকেন, মনীষিগণের মতে তাহাই চিৎস্পন্দ শব্দের বাচ্য। তথাবিধ চিৎস্পন্দই সংসার আখ্যায় অভিহিত আর চিত্তের যে অস্পন্দ, তাহাই শাশ্বত ব্রহ্ম। তুমি যে জীব, কারণ, কর্ম্ম ও দৈব প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে সকলের সম্বন্ধে কথা এই যে, তাহারা ঐ চিৎস্পন্দের অবস্থা ভেদে এক একটা নামান্তর বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। ফল কথা, প্রাণস্পন্দন

বলিবার অভিপ্রায়ে—জীব, আপন অন্তর্গত কার্য্যপরম্পরার আবির্ভাবরূপ স্পন্দন-কথনে—কারণ, দেহাদির স্পন্দন-বিবক্ষায়—কর্ম্ম এবং তাহারই যে চিরস্থির ফলোন্মুখ সূক্ষ্মাবস্থা, তাহাই হইল—দৈব। ঈদৃশ বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেই চিৎস্পন্দের ঐ সকল জীবাদি নাম নিরূপিত। যিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতিস্বরূপ চৈতন্য, তিনিই উল্লিখিতরূপ চিৎস্পন্দ। জীব, কারণ, কর্ম্ম ও দৈব, এই সকল নাম তাঁহারই এবং তিনিই সংসারের বীজ। চিৎ যখন আপন অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হয়েন, তখন যে চিদাভ্যাসরূপ দ্বৈত-ভ্রম জন্মে, তাহাতেই যথাশাস্ত্র দেহাদির উৎপত্তি হয়; সুতরাং চিৎস্পন্দই স্বাশ্রিত সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টিব্যাপারে বিবিধাকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং পরে সঙ্কল্প বিশেষের অনুসরণে নানাযোনিও প্রাপ্ত হয়েন। সেই সকল যোনিপ্রাপ্ত চিৎস্পন্দ বা জীবের মধ্যে কেহ বহুকালের পর মুক্ত হয়, কেহ সহস্র জন্মে মুক্ত হইয়া থাকে এবং কেহ বা এক জন্মেই মুক্ত হয়েন। চিতের স্বভাবই এই যে, সে যে উপাধির সহিত সংসৃষ্ট হয়, সেই উপাধির আকারেই আকৃতিমান্ হইয়া থাকে, আর সেইজন্যই আপনা হইতে উৎপন্ন দেহ কারণ বা সূক্ষ্মভূতের সহিত একীভূত হইয়া পিতৃদেহ হইতে শুক্রাদিরূপে নির্গত হয়; অনন্তর স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ও বন্ধের কারণস্বরূপ দেহ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং উপাধি-মেলনে পিতা পুত্রের প্রভেদ কিছুই লক্ষিত হয় না; পরন্তু উপাধির পার্থক্যেই তাহাদের ভেদ প্রতীত হয়। এই-রূপে জীবসমূহের যে পরস্পর ভেদ, সে কেবল উপাধিরই ধর্ম্ম; তাহা চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। চৈতন্য একই, কেবল বিভিন্ন দেহাদি উপাধিতেই তিনি ভিন্নাকারবৎ অনুভূত। যেমন একই সুবর্ণ মাত্র আকৃতিগত ভেদ-বাহুল্যে বলয়, কেয়ুর ও কঙ্কণ প্রভৃতিরূপে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি চৈতন্য এক বা অভিন্ন হইলেও চৈতন্যাশ্রিত দেহের পার্থক্য-নিবন্ধনই তাঁহাতে ভেদভ্রম জন্মিয়া থাকে। দেহের উপাদান পঞ্চমহাভূত সর্ব্বদাই নানাবিধ বিকারসম্পন্ন; সেইজন্য তাহার প্রভেদও বহুবিধ। চিৎ বাস্তব পক্ষে অজাত বা নিত্য হইলেও উল্লিখিত কারণে তিনি 'আমি জন্মিয়াছি, আমি রহিয়াছি, আমি মরিয়াছি' ইত্যাদিরূপ বিবিধ ভ্রান্তি

অনুভব করেন। অর্থাৎ ভেদের মিথ্যাত্ব সত্ত্বেও যে জন্মাদি ভেদ প্রতীত হয়, তাহা কেবল মনেরই ভ্রম বৈ আর কিছুই নয়। যেমন ভ্রমবান্ ব্যক্তি আপনার মিথ্যা পতন সত্যের স্থায় মনে করে, তেমনি ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাদি ভ্রান্তি-বিশিষ্ট চিত্তও অশেষ আশায় আকুল হইয়া সেই সেই জনন-মরণাদি মিথ্যা ভাব অনুভব করিয়া থাকে। ফল কথা, ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাকার ভেদকল্পনাই সমস্ত ভেদপ্রত্যয়ের মূল, আর এই যে ভেদকল্পনা, উহার মূল হইল পূর্ণাত্মস্বরূপের অজ্ঞান।

রাম! পুরাকালে মথুরা রাজ্যের জনৈক রাজা বাল্যাবধি কোন এক চণ্ডাল কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাহাতে যেমন তাঁহার আপনাকে চণ্ডাল বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল; চিত্তও তেমনি অবিদ্যায় বিমোহিত হইয়া আত্মাতে জগদ্ভ্রম অনুভব করিতেছে। ফলতঃ সকলই মনোময়; সুতরাং ভ্রান্তিরই বিজৃম্ভণ। যেমন প্রশান্ত বারিধি-বক্ষ হইতে অল্প অল্প তরঙ্গ উল্লসিত হয়, শান্তিময় আদি কারণ পরমাত্মা হইতে তেমনি চেত্যনোন্মুখী চিৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই চিৎ-সলিলময় ব্রহ্ম-সাগরে জীবরূপ আবর্ত্ত, চিত্তরূপ তরঙ্গ ও স্বর্গ-নরকাদিরূপ বুদ্বুদনিচয় উদ্ভূত হয়। হে সৌম্য! দৃশ্য বস্তুমাত্রেই সেই মায়াবন্ধনচ্ছেদী অচিন্ত্যশক্তি পরমাত্মার মায়া বিজৃম্ভণ এবং তাহাই আত্মনিষ্ঠ সম্বিদাভাস জীবরূপে বিরাজমান। চিৎই জীবসঙ্কল্পাত্মক মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মায়া, ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত। মনই তন্মাত্রাদি কল্পনা করত গন্ধর্ব্বনগরবৎ অসত্য জগৎ সত্যবৎ বিস্তার করিতেছে। আকাশ সর্ব্বশূন্য, তাহাতে যেমন মৌক্তিকাদি দর্শন হয় আর স্বপ্নাবস্থায় যেমন ভ্রান্তি দর্শন ঘটে, চিত্তের পক্ষে সংসারদর্শনও সেইরূপ। নির্ব্বিকার নিরঞ্জন আত্মা নিত্য-তৃপ্তের স্থায় সম ও শান্তভাবে বিরাজিত। তাঁহার দেখিবারও কিছুই নাই; তিনি কিছু দেখেনও না বটে; অথচ তাঁহার স্বীয় মায়া-রচিত এই চিত্ত-নামক স্বপ্নভ্রম তিনি দেখিতেছেন অর্থাৎ অনুভব করিতেছেন।

রাম! এই যে মিথ্যা জগদ্দর্শন, ইহা জাগ্রদবস্থা, অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভাব এবং যাহা চিন্মাত্র, তাহা তুর্য্য অর্থাৎ উক্ত অবস্থাত্রয়ের অতীত বলিয়া অভিহিত। যাহা অত্যন্ত শুদ্ধ সন্মাত্র ও

ও পরিণাম-নিরাময়, তাহাই অবস্থাত্রয়ের অতীত পরম পদ। সে পদে অবস্থান করিতে পারিলে পুনরায় আর শোক করিতে হয় না, তখন শোক-দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অসত্য মুক্তা-বলীর ভান হয় এবং তাহাতেই তাহা বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি সেই তুর্য্যে অর্থাৎ পরম পদেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভান হইয়া আবার তাহা-তেই বিলীন হয়। ফল কথা, অসত্য মুক্তাবলীর যেমন সত্তা নাই এবং নির্ম্মল নভোমণ্ডলও যেমন তাহার আধার নহে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও সত্তা নাই এবং সেই যে পরমপদ ব্রহ্ম, তাঁহাতেও উহা অধিষ্ঠিত নহে। মনে করিয়া দেখ, আকাশ কিছু বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করে না, তবে সে, এই মাত্র করে যে, বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তাহার নিবারক বা বাধক সে হয় না; এই জন্য লৌকিক ব্যবহার ও শাস্ত্রবাক্য উভয়ত্রই আকাশ বৃক্ষোন্নতির কারণ বলিয়া কল্পিত। এইরূপ পরমাত্মা কোন কিছুই করেন না অথচ তিনি কিছুরই নিবারক নহেন; তাই এই মায়াকৃত বিশ্বসৃষ্টির তিনিই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া নির্ব্বাচিত। কেবল সন্নিধান মাত্র কারণ বলিয়া আদর্শকে যেমন প্রতিবিম্বের কারণ নির্দ্দেশ করা হয়, সেইরূপ আত্মচৈতন্যকেও সন্নিধান মাত্র কারণেই এই সমস্ত অর্থ-সম্বেদন বা জ্ঞানের কারণ বলা হয়। অঙ্কুর ও পত্রাদিক্রমে বীজ যেমন ফলের উৎপাদন-কর্ত্তা হয়, চিত্ত ও জীবাদিক্রমে চিৎও তেমনি মনের উৎ-পাদক হইয়া থাকেন। জীব যেমন বৃষ্টি-জলকণার সহিত মিলিত হইয়া বৃক্ষ শস্য প্রভৃতিতে প্রবেশ করে, এবং পুনরায় বীজরূপে পরিণত হয় [অর্থাৎ সুকৃত ভোগের পর জীব যখন পৃথিবীতে আইসে, তখন তাহার আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, এই সমস্ত বস্তু অবলম্বনীয় হয়; ক্রমে বৃষ্টিজলের সহিত মৃত্তিকায় উপস্থিত হয়, পরে তথা হইতে শস্যাদি মধ্যে প্রবেশ করে, অনন্তর সেই সেই শস্যাদিভোজী জীবের শুক্র-শোণিত-গত হয়। শাস্ত্র-মতে ইহাই জীবের বীজভাব প্রাপ্তি] সেইরূপ জীববাসনাময় চৈতন্যও প্রলয়প্রভাতে পুনরায় চিত্ত-চেত্যাদি সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন; তিনি বিবর্ত্তিত না হইয়া সুস্থ থাকিতে পারেন না। বীজের বৃক্ষোৎপাদনশক্তি আর ব্রহ্মের বিশ্বোদ্ভাবন শক্তি, এই দুই শক্তি একাংশে

তুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে শক্তিভিন্নতার অস্তিত্ব দেখা যায়। মনে করিয়া দেখ, যদি 'বীজই বৃক্ষ' এইরূপ জ্ঞান হয়, তবে তাহাতে অখণ্ড বোধ জন্মে না অর্থাৎ বীজ ভিন্ন বৃক্ষের অস্তিত্ব বোধ লুপ্ত হয় না; কিন্তু ব্রহ্মই বিশ্ব, এই জ্ঞান যখন জন্মে, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্বের অস্তিত্ব বোধ তিরোহিত হইয়া যায়; ফলে দীপালোকে রূপসম্পদের অভিব্যক্তির ন্যায় তখন অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে যে স্থানে খনন করা হয়, সেই সেইখানেই যেমন আকাশ দেখা যায়, সেইরূপ যে যে দৃশ্যই বিচারারূঢ় হইবে, দেখিবে—সেই সেই দৃশ্য একে একে চৈতন্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। অনভিজ্ঞ লোক স্ফটিকের অভ্যন্তরে বনের প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়া যেমন সত্যই বন বলিয়া বোধ করে, তেমনি ব্রহ্মের উদরেও অবিদ্যামোহিত লোকেরাই জগৎ দর্শন করিতেছে। যেমন স্ফটিকখণ্ড প্রকৃত বনভূমি না হইলেও তরু, লতা, ফল, পত্র প্রভৃতি ও তাহাদের আধার মৃত্তিকাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি অখণ্ডিত একই ব্রহ্ম এই সমস্ত দৃশ্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়েন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—অহো! কি বৈচিত্র্য! এ জগৎ অসৎ হইলেও সতের ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে! ভগবন্! জগৎ যেরূপে বৃহৎ, যেরূপে স্বচ্ছ, যেরূপে প্রস্ফুট ও যেরূপে সূক্ষ্ম, তাহা সকলই শুনিলাম। এই নীহারকণ-নিভ তন্মাত্র-গুণযুত প্রতিভাসাত্মা ব্রহ্মাণ্ড যেরূপে পরব্রহ্মে পরিস্ফুরিত হইতেছে, তাহাও শুনিয়াছি। অধুনা যেরূপে সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহ আবির্ভূত হয় এবং যে প্রকারে সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূলদেহাভিমানী বৈশ্বানর ও বিশ্বের আবির্ভাব ঘটে, আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! বেতাল যেমন বালকের হৃদয়ে নিরাকার হইয়াও আকৃতিমানের ন্যায় প্রতিভাত হয়, জীবের রূপ তেমনি অত্যন্ত অসম্ভব ও একান্ত অননুভূত হইলেও সর্ব্বাগ্রে স্বানুভূতবৎ পরব্রহ্মে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই যে জীবভাব প্রকাশ, পূর্ব্বকল্পীয় জীববাসনার সংস্কার বা সম্পর্ক উহার কারণ। অতএব জীব, বাসনোৎপন্ন হইলেও শুদ্ধ, সত্য হইলেও অসত্য, ভিন্ন হইলেও অভিন্ন এবং উহা পরব্রহ্মেরই স্ফুরণভেদ। পরমাত্মা যেমন জীবকল্পনায় জীবভাব উপগত হয়েন,

জীবও তেমনি মনন-বেদনাদি বা সঙ্কল্প-বিকল্পবলে মনোরূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। অনন্তর ঐ মন তন্মাত্রবিষয়ক মনন করত আপনিই তন্মাত্রারূপে আবির্ভূত হয়েন। তৎপরে সেই বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ মন চিদাকাশে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। যেমন আকাশে সৌরালোকে অগণিত নীহারকণা সমুদ্ভাসিত হয়, তেমনি পূর্ব্বোল্লিখিত চিত্তে বা সমষ্টি মনোরূপ হিরণ্যগর্ভে সংখ্যাতীত ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা ও তত্তদন্তর্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দেহাদি বিচিত্রবৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে। সেইজন্য তৎকালে সেই চৈতন্যস্বরূপ মন তথাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া আপনার বিশেষ কোন পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন না; সুতরাং 'কিমহং'— 'আমি কি?' এইরূপ একটা সম্বিদ বা অস্ফুট জ্ঞান তখন তাঁহার অনুভূত হইতে থাকে। অনন্তর পুরুষার্থ বিচার সহকারে প্রাক্তন সংস্কারের আবির্ভাব হইলে তাহাতে জগত্তত্ত্ব-শব্দার্থ ও সেই সেই বিষয়ক অস্ফুট জ্ঞান সমুদিত হয়। পরে দেহোপরি তাদৃশ অহম্ভাবের প্রস্ফুটতা নিবন্ধন বহির্দিকে রসের ও অভ্যন্তরে রসপ্রবাহক ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জিহ্বার উদ্ভব অনুভূত হয়। এইরূপে বহির্ভাগে রূপ ও দেহে রূপগ্রাহক চক্ষুঃ ইন্দ্রিয় এবং উল্লিখিতরূপে গন্ধ ও গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় নাসিকার আবির্ভাব অনুভব করেন। যত কাল যাবৎ জীব ঐরূপে শ্রোত্রাদি ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন, তত কাল পর্য্যন্ত শব্দাদি দৃশ্য বস্তু সকল উক্তরূপে উপভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। ঐরূপে জীবাত্মা কাকতালীয়বৎ ধীরে ধীরে স্বীয় বাসনানুরূপ দেহিত্ব অনুভব করিতে থাকেন। অনন্তর সেই জীবমূল যদিও অসত্য, তথাপি সত্যবৎ সম্পন্ন হয় এবং সেই সকল ইন্দ্রিয়াদি-ঘটিত সন্নিবেশের যে শব্দ-ভাবৈকদেশ, তাহাকে রসনার্থরূপে, যাহা স্পর্শভাবৈকদেশ, তাহাকে ত্বক্‌শব্দার্থরূপে, যাহা রসভাবৈকদেশ, তাহাকে রসনার্থরূপে, যাহা রূপভাবৈকদেশ, তাহাকে নেত্রার্থরূপে এবং যাহা গন্ধভাবৈকদেশ, তাহাকে ঘ্রাণ বা নাসিকার্থরূপে গ্রহণ করেন অর্থাৎ এ সকল আমার বলিয়া জ্ঞান বা কল্পনা করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবাত্মা ভাবময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভাবময় দেহকে বাহ্য সত্তার প্রকটীকরণক্ষম ইন্দ্রিয়াখ্য রন্ধ্র যুক্ত বলিয়া অবলোকন করেন।

হে রঘুনন্দন! উল্লিখিতরূপে আদি বা সমষ্টি জীব ব্রহ্মার ও অন্যতন বা ব্যষ্টি জীবের ভাবময় আতিবাহিক দেহ আবির্ভূত হইয়া থাকে। যিনি অব্যক্ত পরমাত্মা, তিনিই অজ্ঞানাবৃত হইয়া আতিবাহিক দেহ লাভ করেন আর যখন অজ্ঞান চলিয়া যায়, তখন আর তাহার সত্তা থাকে না। পরমাত্মজ্ঞান আবির্ভূত হইলে যৎকালে প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ এই সকলের কিছুই ভেদ রহে না, তখন আর আতিবাহিক দেহের প্রসঙ্গ কি? সেই যে পরা সত্তা, তিনিই ব্রহ্মভাবনায় ব্রহ্মরূপ এবং অন্য ভাবনায় অন্যরূপে প্রতিভাত হয়েন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ব্রহ্ম চিন্মাত্র, তাঁহাতে অজ্ঞান অবস্থান অসম্ভব; সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব স্বতঃসিদ্ধ। যদি তাহাই হইল, তবে মোক্ষ, মোক্ষপ্রাপিকা বিচারণা ও তদুপযোগিনী জীবাদি ভেদকল্পনা প্রভৃতি ত অনাবশ্যক বলিয়াই বোধ হইতেছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি যোগ্য কালে যোগ্য প্রশ্নই করিয়াছ। যেমন আকালিকী কুসুমমালা শোভাসম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও অমঙ্গলাবহ বলিয়া শোভা পায় না, তেমনি অসাময়িক প্রশ্নও ফলপ্রসূ হয় না। সত্য বটে, অকালে কুসুমের মালা তাৎকালিক উপভোগ সাধনে সমর্থ হয়; কিন্তু ভবিষ্যৎ অনিষ্টের আশঙ্কায় উহা প্রমোদপ্রদ না হইয়া বরং ব্যর্থই হইয়া থাকে। ফলে যোগ্য কালেই সমস্ত বস্তু শোভিত হইয়া থাকে, অসময়ে হয় না; সুতরাং কালানুসারেই যে পদার্থের শোভনতা, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। জীব যোগ্যকালে আপনাতে পিতামহত্ব অনুভব করত উপাসনার পরিপাকে উপাস্যভাবের ফলস্বরূপ স্বপ্নাত্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়েন। সেই হিরণ্যগর্ভ প্রণব উচ্চারণে ও তদর্থসম্বেদনে সর্ব্বপ্রপঞ্চ দর্শন করেন। তৎকর্ত্তৃক যে মনোরাজ্য বিস্তৃত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তন্ময়ই থাকেন। এই শূন্যময় সমষ্টি মনোরাজ্য পরমাত্মায় যেমন অসৎ, এই ব্যষ্টি মনোরাজ্যরূপ অতি বিশাল শূন্য জগৎও তেমনি চিদাকাশে অসদাকার। এ জগতে বাস্তবিক কেহই জন্মে না বা মরে না; একমাত্র ব্রহ্মই গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় মিথ্যা জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। পদ্মযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জীবেরই সত্তা সঙ্

ও অসৎস্বরূপ। অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশে সকলই সৎ বলিয়া বোধ হয় আবার অজ্ঞান কাটিয়া গেলে সকলই অসৎ হইয়া যায়। কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমস্তের উৎপত্তিই তুল্য; তবে কথা এই—ব্রহ্মা বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান, তাই তিনি মহান্ আর কীটাদি জীবপরম্পরা মলিনসত্ত্ব-প্রধান, তাই তাহারা তুচ্ছ। উপাধি যেমন, জীবও সেইরূপ এবং তাদৃশ জীবের পৌরুষও তদনুরূপ। আবার পৌরুষ যেমন, কর্ম্মও তেমনি এবং তাহার ফলানুভূতিও সেই-রূপই। ব্রহ্মার উৎপত্তি সুকৃতের ফলে হয়, আর কীটাদির যে উৎপত্তি, তাহা দুষ্কৃতের ফলেই ঘটে। সুকৃতের চরম উৎকর্ষ হইল—ব্রহ্মত্ব আর দুষ্কৃতের চরম ফল হইল—কীটাদিভাব। ফলাফলের ভেদ-ভিন্নতা যতই দেখা যাউক, সে সকল কেবল চিন্মাত্রতা-জ্ঞানের অভাবেরই ফল। যখন জ্ঞানোদয় হইবে, তখন ঐ সকল ভেদ কিছুই থাকিবে না, সকলই লোপ পাইয়া যাইবে। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এ সকল চিন্মাত্র হইতে অভিন্ন; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ আকাশকমল ও শশবিষাণের ন্যায় অলীক বৈ আর কিছুই নয়। নিজের লালা-দৃঢ়তায় কোষকার কৃমি যেমন আপনার বন্ধন অনুভব করে, তেমনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই ভুবনাদি ভাবের নিবিড়তা নিবন্ধন ভ্রান্ত হইয়া দ্বৈতানুভব করেন। ব্যষ্টি জীবের কর্ম্মানুসারে সমষ্টি মনোরূপ প্রজাপতি যে বস্তুকে যেরূপ ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহার অন্যথা কিছুতেই হইবার নহে; ইহাই নিয়তির নির্দ্দেশ। সুতরাং এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, স্থিতি ও বিনাশ সমস্তই অলীক। যিনি শুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী, একমাত্র ও অনন্ত, আত্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন তাদৃশ ব্রহ্মও অশুদ্ধ, অসৎ, অনেক ও সসীম-রূপে অবধারিত হইয়া থাকেন। অল্পবুদ্ধি লোকেরা যেমন জল ও তরঙ্গকে বিভিন্ন বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ যাহারা অতত্ত্বদর্শী, তাহাদিগেরই বুদ্ধিতে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এই সকল ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। বাস্তব পক্ষে ঐ সমস্ত ভেদ কিছুই নহে। যেমন সম্বন্ধ-ভেদে একই ব্যক্তিতে পরস্পর-বিরোধী শত্রুতা ও মিত্রতা উভয়ই সম্ভব হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্মে পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদাভেদশক্তিও অসম্ভব নহে। এইজন্য ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ ভেদ ও অভেদাত্মক শক্তি দ্বারা অন্বয় ও সম্বয় এই উভয় ভাবে কখন অবিস্তৃত এবং কখন বিস্তৃত হয়েন। যেমন জলে

তরঙ্গ কল্পনা করিয়া লইলে জল ও তরঙ্গ এই দুইটীকে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়.আর সুবর্ণ ও বলয় এই দুইটীকে ভিন্ন ভাবিলে উহারা যেমন ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তেমনি একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেও জগদাদি অবস্তুর আরোপ করিলে ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ই তখন পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং তিনি দ্বৈত, অদ্বৈত, পৃথক্ ও অপৃথক্ সকল রূপেই বিরাজমান। প্রথমে আত্মাই মনোরূপে প্রকাশিত হয়েন, সেই মন হইতেই অহঙ্কারের আবির্ভাব হয়। যেমন নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ, মনও প্রথমে সেইরূপ হইয়া পরে কল্পনার বলে অহম্ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠে। সেই যে অহম্ভাববিশিষ্ট মন, তাহা হইতে পূর্ব্বানুভূত স্মৃতির সহায়তায় তন্মাত্রার সৃষ্টি হয়। ঐরূপ ভূততন্মাত্রা কল্পনা হইলে পর চিত্তাত্মা জীব কাকতালীয়বৎ ব্রহ্মে জগদবলোকন করেন।

এইরূপে মন যাহা কল্পনা করে, তাহাই সে দেখিয়া থাকে। বস্তুতঃ সৎ হউক আর অসৎ হউক, মন দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহাই কেন সৎরূপে ভাবনা করুক না, ভাবনার দৃঢ়তায় তাহা সৎস্বরূপেই অবলোকিত হয় এবং অবলোকনে সত্যের ন্যায় প্রতিভাস প্রাপ্ত হইয়া, সত্যই ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অধুনা আমি উদাহরণস্বরূপ তোমার নিকট এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে কর্কটী নাম্নী এক রাক্ষসী যে সকল জটিল প্রশ্ন করিয়াছিল, এই ইতিহাস সেই সকল প্রশ্নে পরিপূর্ণ।

পুরাকালে হিমাদ্রির উত্তর পার্শ্বে কর্কটী নাম্নী এক রাক্ষসী বাস করিত। তাহার কার্য্য-কলাপ অতি ভয়ঙ্কর ও বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ ছিল। তাহাকে

দেখিয়া বোধ হইত, যেন কজ্জলকর্দ্দমময় অদ্রি হইতে এক প্রতিমা নির্ম্মিতা হইয়াছে। রাক্ষসীর আরও দুই নাম ছিল, যথা—বিসূচিকা ও অন্যায়বাধিকা। রাক্ষসীর কলেবর কৃশ ছিল; আকৃতিগত সাদৃশ্য-দর্শনে তাহাকে বিশুষ্ক বিন্ধ্যাটবী বলিয়াই ভ্রম হইত। রাক্ষসীর দৈহিক বল অসাধারণ ছিল। নয়ন দুইটা উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় ধক্ ধক্ জ্বলিত। তাহার দেহ এত বড় বিশাল ও বিপুল ছিল যে, তাহাতে সে দ্যাবাপৃথিবীর অর্দ্ধভাগ ব্যাপিয়া বিরাজ করিত। রাক্ষসীর পরিধানে নীলাম্বর, দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; সুতরাং তাহাকে এক দেহধারিণী দীর্ঘ যামিনী বলিয়াই মনে হইত। তাহার উত্তরীয় বস্ত্র সজল জলধরের ন্যায় শোভিত ছিল। লম্বমান মেঘবিম্বের ন্যায় নিয়তই রাক্ষসী উল্লসিত হইত। রাক্ষসীর তিমির-তুল্য কেশকলাপ সর্ব্বদা ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত ছিল। তাহার নেত্রদ্বয় অচঞ্চল বিদ্যুদ্বল্লীর ন্যায় উজ্জ্বল, জানুদ্বয় তমাল তরুপ্রায় বিশাল এবং নখরগুলি বৈদূর্য্যবৎ উজ্জ্বল ও শূর্পাগ্রের ন্যায় বিস্তৃত। সেই রাক্ষসী যখন হাস্য করিত, মনে হইত—বুঝি ভস্ম কিম্বা নীহারপটল নিঃসৃত হইতেছে। তাহার গলে নর-কঙ্কাল-মালা লম্বিত ছিল; বোধ হইত রাক্ষসী যেন পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত রহিয়াছে। রাক্ষসীর অন্যান্য অঙ্গসকলও সংগ্রথিত শবসমূহে সমাবৃত ছিল। রাক্ষসী যখন বেতালদলের সহিত নৃত্য করিত, তখন তাহার কর্ণগত কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কালের কুণ্ডল সকল দুলিতে থাকিত। নৃত্যকালীন তদীয় ভীষণ ভুজদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইলে মনে হইত, যেন সূর্য্যকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাক্ষসী উদর-ভরণের যোগ্য আহার পাইত না এবং তাহার কলেবর অতি বিশাল, তাই সেই রাক্ষসীর জঠরাগ্নি সর্ব্বদাই বাড়বানলবৎ অতৃপ্ত ছিল।

সেই মহোদরী রাক্ষসী কদাচ আহারে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। সে একদা চিন্তা করিল, সাগর যেমন নদীনিচয় গ্রাস করে, আমি যদি তেমনি এই জম্বুদ্বীপস্থিত জনগণকে একনিশ্বাসে গ্রাস করিয়া ফেলি, তাহা হইলে মনে হয় বারি-বর্ষণে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় মদীয় ক্ষুধানল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে; কিন্তু কথা এই যে, এককালীন সমস্ত লোক ভক্ষণ করা যুক্তি-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ এরূপ ভাবে যুগপৎ সকলকে ভক্ষণ

করিবার ক্ষমতাও আমার হইয়া উঠিবে না। কেন না, এই সকল লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মন্ত্র, ওষধি, নীতি, দান ও দেবার্চ্চনাদি দ্বারা আত্মদেহ রক্ষা করিতেছে। বিশেষ কথা, যদি একত্র বহু ব্যক্তি নিরাপদে থাকে, তবে তাহাদিগকে কেই বা এককালে বিপন্ন করিতে পারে? সুতরাং যে যুক্তিবলে আপৎকালে জীবন ধারণ করা যায়, তাদৃশ যুক্তিই আমার এক্ষণে অবলম্বনীয়। আমি এখন অন্য কিছুই করিব না; তপস্যাই এক্ষণে আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি এখন হইতে অক্লান্তচিত্তে এমন উগ্র তপস্যা করিব, যাহাতে এই লোক সকল এককালে আমার ভক্ষ্য হইবে। আমার জানা আছে, তপস্যাবলে অতি দুর্লভ বস্তুও সুলভ হইয়া থাকে।

রাক্ষসী এইরূপ চিন্তা করিয়া নিখিল প্রাণীর বিনাশ-বাসনায় তপস্যার্থই স্থিরনিশ্চয় হইল এবং তদ্দণ্ডেই সর্ব্বপ্রাণীর দুরারোহ হিমালয় শৃঙ্গে আরোহণ করিল। তখন মনে হইল, স্থির-বিদ্যুদ্বিলোচনা শ্যামলপ্রভা অভ্রমণ্ডলী যেন গিরিশৃঙ্গে উত্থিত হইল। রাক্ষসী সেখানে গিয়া স্নানান্তে তপস্যাচরণে স্থিরসংকল্প হইল। তাহার চন্দ্রার্কনিভ নয়নদ্বয় নিশ্চল হইল। সে একপদে অবস্থান করিতে লাগিল। তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে দিবস, পক্ষ, মাস ও সমস্ত ঋতু অতিবাহিত হইল। শীত ও আতপ-তাপে রাক্ষসীর দেহ ক্রমশ এতই কৃশ হইয়া পড়িল, বোধ হইল যেন সে, শৈলসহ বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই ঊর্দ্ধকেশী রাক্ষসীর কেশরাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সে তৎকালে তাহার আকৃতি সংস্তম্ভিত করিয়া অভ্র-মালার ন্যায় যেন আকাশ-আরোহণেই উদ্যতা হইল।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা দেখিলেন, রাক্ষসীর দেহ শীত-বাতাতপে জর্জ্জরিত হইয়াছে। তদীয় কৃশ কলেবরে বিলোল চর্ম্ম সকল বল্কলবৎ লম্বিত হইতেছে এবং তাহার ঊর্দ্ধপ্রসর্পিত কেশরাশিরূপ তমস্তোম পবন-চালিত হইয়া তারকারাজিরূপ মৌক্তিক সকল ধারণ করিতেছে। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে তাহাকে বরদানার্থ আগমন করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! রাক্ষসী কর্কটী এইরূপে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিলে ব্রহ্মা কৃপা-পরবশ হইয়া তথায় আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য, অতি কঠোর তপশ্চর্য্যায় বিষ এবং বহ্নিও শীতল হইয়া থাকে।

তখন রাক্ষসী মনে মনে ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক সেইখানেই স্থির হইয়া রহিল এবং অন্তরে চিন্তা করিল যে, আমি আমার ক্ষুধানিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট কোন্ বর প্রার্থনা করিব? কিছুকাল চিন্তার পর স্থির করিল,—হাঁ আমার মনে পড়িয়াছে, আমি এই একটী বর বিভুর নিকট চাহিব যে, আমি যেন অনায়সী অর্থাৎ ব্যাধিরূপিণী জীবসূচী বিসূচিকা ও আয়সী অর্থাৎ লোহময়ী জীবসূচী হইতে পারি। আমি যদি এইরূপ বর পাই, অর্থাৎ যদি বরপ্রভাবে ঐ দ্বিবিধ সূচী হইতে পারি, তাহা হইলে ঘ্রাণাকৃষ্ট সুগন্ধের ন্যায় অনায়াসে অর্থাৎ অলক্ষ্যে মানবগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিব এবং তখন নিজের ইচ্ছানুসারেই সর্ব্ব জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলিব; এইরূপ হইলেই পরম সুখ ঘটিবে।

রাক্ষসী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইতিমধ্যে পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহাকে মেঘগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—বৎসে, কর্কটিকে! তুমি রাক্ষসরূপ কুলাচলসকলের অভ্রমালিকাস্বরূপ। তুমি গাত্রোত্থান কর। আমি তুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর গ্রহণ কর।

কর্কটী কহিল,—হে ভগবন্, ভূতভব্যেশ্বর! যদি আমায় বর দান করিতে অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি যাহাতে অনায়সী ও আয়সী নাম্নী জীবসূচিকা হইতে পারি, আপনি আমাকে এইরূপ বর দান করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! লোকপিতামহ ব্রহ্মা রাক্ষসীকে 'তথাস্তু'

বলিয়া বরদান-পুরঃসর পুনরায় বলিলেন,—বৎসে! তুমি সূচিকা ও সর্ব্ব উপসর্গময়ী বিসূচিকা ব্যাধি হইবে। যাহারা দুষ্টভোজী, দুষ্কর্ম্মরত, মূর্খ ও কুদেশবাসী, তাদৃশ দুষ্ট লোকদিগকে তুমি সূক্ষ্ম মায়া অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা হিংসা করিবে। তুমি বায়বীয় পরমাণু-পরিমিত হইয়া জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের অপান দেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করত হৃৎপদ্ম-সন্নিহিত প্লীহা, যকৃৎ, বস্তি ও শিরাদির পীড়া উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিবে। তুমি বিসূচিকা ব্যাধি হইয়া বাতলেখাত্মিকা হইবে। সেই অবস্থায় সগুণ কিম্বা নির্গুণ, সর্ব্ববিধ ব্যক্তিকেই তুমি আক্রমণ করিতে পারিবে। তবে যাঁহারা শুদ্ধাচার ও গুণবান্, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য আমি এই মন্ত্র বলিতেছি; যথা—হিমাদ্রির উত্তর দিকে কর্কটী নামে এক রাক্ষসী আছে। সেই রাক্ষসীর অপর দুই নাম বিসূচিকা ও অন্যায়বাধিকা। তাহার মন্ত্র এইরূপ;—ওঁঙ্কারাদি-মন্ত্রময়ী বিষ্ণুশক্তিকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবতি! তুমি রোগাত্মিকা বিষ্ণুশক্তিকে হরণ কর—হরণ কর, পচন কর—পচন কর, মন্থন কর—মন্থন কর, উৎসাদন কর—দূর কর। হে রোগশক্তে! তুমি হিমাচলে প্রস্থান কর। হে রোগিন্! তুমি দুষ্কর্ম্মে অভিভূত, রোগে অভিভূত, কিম্বা মৃত্যুপাশে আকৃষ্যমাণ হইয়াছ; মন্ত্র প্রভাবে তুমি জীবিত হইয়া মদীয় ভাবনায় সঞ্জীবন-সমর্থ অমৃতময় চন্দ্র-মণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছ।

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত মহামন্ত্র বাম-করতলে লিখিয়া লইয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ সেই করে মার্জ্জিত করিবেন। অনন্তর চিন্তা করিবেন—যেন রাক্ষসী কর্কটী মন্ত্ররূপ মুদগরে মর্দ্দিত হইয়া রোগীর দেহ হইতে কর্কশ ক্রন্দন করিতে করিতে হিমাচল শৈলাভিমুখে পলায়ন করিল। পরে রোগীর বিষয় এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে, রোগী যেন চন্দ্রমণ্ডলের অভ্যন্তরে সুধা মধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং সর্ব্বব্যাধি হইতে বিমুক্ত ও জরামরণ হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে। সাধক জন শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক সমাহিত-মনে এই সকল বিধির অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্ববিধ বিসূচিকা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ত্রিলোক-প্রতিপালক ব্রহ্মা এই সকল কথা কহিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। গগনগত সিদ্ধগণ তাঁহার নিকট হইতে উল্লিখিত মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা গগনতলাগত পুরন্দর কর্ত্তৃক অভিবাদিত ও সমুজ্জ্বল শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

উনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎপরে সেই গিরিশিখর-সমানরূপিণী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা রাক্ষসী কজ্জল ও অম্বুদলেখার ন্যায় ক্রমে ক্ষীণভাব ধারণ করিতে লাগিল। রাক্ষসী প্রথমে মেঘসদৃশ হইয়া পরে তরুশাখারূপিণী হইল। অনন্তর তদীয় দেহ পুরুষপ্রমাণ ধারণ করিল। পরে ক্রমে হস্তমাত্র প্রমাণ হইল। অনন্তর মাষশিম্বী ও পরে স্থূলসূচীর অনুরূপা হইয়া উঠিল। ক্রমে কৌষেয় বসন-সীবন-ক্ষম সূক্ষ্ম সূচীর আকারে পরিণত হইল। রাক্ষসী এইবার পদ্মকেশরবৎ সুন্দর শোভা ধারণ করিল এবং গিরিশিখরবৎ দেহধারিণী হইয়াও সঙ্কল্প-কল্পিত অদ্রির ন্যায় অণুতা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সেই রাক্ষসী, কৃষ্ণকলেবরা লৌহসূচী ও রোগরূপিণী, জীবসূচী এই উভয়বিধ সূচীর আকার ধারণপুরঃসর বিরাজ করিতে লাগিল এবং ব্যোমগামিনী ও ব্যোমবাসিনী হইয়া পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ মহাভূত, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, এই সকলের সহিত গতিবিধি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রাম! ঐ রাক্ষসীকে সূচীর ন্যায় দেখা গেলেও বাস্তবিক উহাতে লৌহ বলিয়া কোন কিছুই ছিল না। উহা অসংখ্য অনন্ত সম্বিৎভ্রমের অন্তর্গত ভ্রমমাত্র; সুতরাং বস্তুগত্যা কিছুই নয়। তবে সূচীবৎ লক্ষিত, এই মাত্র। যদি বৈদূর্য্যমণির কিরণচ্ছটায় ও চাকচিক্যময়ী রত্নসূচিকায় সৌরকর প্রবেশ

করে, তাহা হইলে যেমন সুন্দর দেখা যায়, তেমনি সেই রাক্ষসীও তখন লক্ষিত হইতে লাগিল। তবে বিশেষের মধ্যে এই যে, তাহাতে মনোমনন ছিল। রাক্ষসী তৎকালে সমীরণ-সমাহৃত কজ্জলময় মেঘকণিকাবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। সূক্ষ্মরন্ধ্রে দৃষ্টি বিনিষ্ট হইলে তাহাতে যেমন একটা মলিন আভা অবলোকিত হয়, রাক্ষসীর দুইটা নয়ন-কণীনিকাও তেমনি দেখা যাইতে লাগিল। রাক্ষসী প্রসন্নমুখে বরদান প্রভাবে একান্ত সূক্ষ্ম সূচীরূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তখন মনে হইয়াছিল, সে যেন নিজ দেহের বিপুলতা-নিবারণের জন্যই সাতিশয় মৌনব্রত উপগত হইয়াছে। পূর্ব্বে দূর হইতে রাক্ষসীর চক্ষুদ্বয় সূক্ষ্ম দীপবৎ লক্ষিত হইত, এক্ষণে তাহার সূক্ষ্ম সূচীদেহ দৃষ্টিপথে পতিত না হওয়ায় আকাশ-সাম্য ধারণ করিল। রাক্ষসীর দেহ মধ্যে যে আকাশভাগ ছিল, দেহ সূক্ষ্ম হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা সূক্ষ্ম হইয়া গেলে, মনে হইল, যেন মনোজ্ঞ মুখসাহায্যে ঐ অন্তর্গত আকাশ উদ্গিরণ করিতেছে। যেমন সদ্যোজাত সদ্যঃস্নাত শিশুর কেশ দৃষ্ট হয়, একাগ্র-মনে নেত্র কুঞ্চিত করিয়া দেখিলেও ঐ দূরবিসারী দীপকিরণবৎ সূক্ষ্মাকৃতি রাক্ষসী তখন সেইরূপই লক্ষিত হইতে লাগিল। মৃণাল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহার মধ্য হইতে যেমন সূক্ষ্ম তন্তু নিঃসৃত হয় এবং সুষুম্নাখ্য সূক্ষ্ম নাড়ী যেরূপ মূলাধার হইতে সমুদ্গত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত সৌর মণ্ডলের অভিমুখে গমন করে, রাক্ষসী এক্ষণে অবিকল সেইরূপই রূপ ধারণ করিল। রাক্ষসীর তথাবিধ সূক্ষ্ম দেহ হইল বটে; কিন্তু সেই দেহেরই মধ্যে যথাযথ প্রদেশে যথাসম্ভব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং যথাযথ জীবনও বিরাজমান রহিল। রাক্ষসী এইরূপে জীবসহ অলৌহ সূচীভাব লাভ করিয়া বৌদ্ধ ও তার্কিকসম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবৎ জনসাধারণের অলক্ষিত হইয়া গেল। অধিক আর কি বলিব? রাক্ষসীর অতি সূক্ষ্ম আকৃতি একান্তই অদৃশ্য; তাই বোধ হইল, যেন শূন্যবাদী সিদ্ধার্থদিগকে রাক্ষসীই প্রসব করিয়াছে। ঐ রাক্ষসী আকাশগর্ভের ন্যায় নীলিমময়ী। নীরবতা সহকারে অদৃশ্য সূচীময় সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে সতত তাহার অবস্থান। ঐ রাক্ষসীর জীবসূচী মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত বাসনামাত্রময় চিদাভাসরূপে সূক্ষ্ম দীপকিরণবৎ অলক্ষ্য অথবা তীক্ষ্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

এ দিকে গ্রাসগ্রহণের সুবিধা বিধানের জন্য রাক্ষসী তপস্যা করিয়া সূচীভাব লাভ করিল সত্য; কিন্তু উদর অভাবে তাহার সে সুবিধা বোধ কিছুই হইল না। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! আমি এ অবস্থায় সূচীভাব পরিগ্রহ করিয়া কি মূর্খতার কাজই না করিয়াছি! এইরূপে রাক্ষসী মনে মনে নিরর্থক গ্রাসের বিষয়ই বারবার ভাবিতে লাগিল; কিন্তু সে যে সূচীভাব লাভ করিয়া অতীব তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, সে কথা একবারও সে ভাবিল না। চিত্তের গতি অভিলষিত বিষয়েই হয়। মূঢ়বুদ্ধি রাক্ষসী কোনরূপ হিতাহিত বিচার না করিয়াই সূচীভাব পরিগ্রহ করিয়াছিল। বস্তুতঃ দুর্ব্বুদ্ধির কখন পূর্ব্বাপর বিচারের ক্ষমতা থাকে না। অনেক সময় কোন এক বিষয়ে অত্যধিক নির্ব্বন্ধও শুভফল-দায়ক হয় না। কেন না, অভিমত বিষয়ে প্রবল প্রযত্নের প্রভাবে কখন কখন তাহা অন্যথা হইয়া যায়। দেখ, অত্যধিক আগ্রহের সহিত দর্পণকে বারম্বার নিজের সম্মুখে আনিলে নিশ্বাসে তাহা মলিন হইয়া যায়; সুতরাং মুখদর্শনরূপ যে অভীষ্টসিদ্ধি, তাহা তাহাতে হয় না।

তৎকালে ঐ রাক্ষসী পীবরদেহ পরিহারপূর্ব্বক সূচীভাব প্রাপ্ত হইলে মহামরণও তাহার নিকট মহাসুখের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অহো, এক বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইলে কি বিষম ফলই না ফলিয়া থাকে! দৃষ্টান্ত দেখ, রাক্ষসী কর্কটী আহারের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিজের বৃহৎ বপুঃ স্বেচ্ছায় তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিল। এক বস্তুতে প্রবল আসক্তি জন্মিলে বিষয়ান্তরের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে এই রাক্ষসীর কথাই উল্লেখযোগ্য। রাক্ষসী নিজের আহার-আস্বাদনের আগ্রহ বিষয়ে অত্যধিক আসক্ত ছিল; সুতরাং তাহার যে দেহ-নাশ ঘটিল, তাহা সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। আবার, একই বস্তুতে যে সকল অজ্ঞ লোক একান্ত অনুরাগী, তাহারা বিনাশেও সুখানুভব করে। দেখ, রাক্ষসী সূচীভাবাপন্ন হইয়া দেহবিহীন হইল, তথাপি সে অসুখ বা অসন্তোষ জ্ঞান করিল না; প্রত্যুত তাহাতে তাহার মনে সুখেরই উদয় হইল।

রামচন্দ্র! ঐ রাক্ষসী অন্যপ্রকার জীববিসূচিকা অর্থাৎ অন্যবিধ

জীবব্যাধি-স্বরূপা হইয়াছিল, তাহার আকৃতি এইরূপ ;—সে সূক্ষ্মস্বভাবা ও লিঙ্গ-শরীরাত্মিকা। প্রত্যক্ষতঃ তাহার কোনই আকার নাই। তাহা কেবল ব্যোমস্বরূপ। ঐ বিসূচিকা সূক্ষ্ম তেজঃপ্রবাহের অনুরূপিণী ও প্রাণসূত্রময়ী। যেমন কুণ্ডলিনী শক্তি, তেমনি উহার আকৃতি। সূর্য্য বা চন্দ্রকিরণের ন্যায় উহা দেখিতে অতি উজ্জ্বল। উহার মনোবৃত্তি পাপীয়সী, অসিধারার ন্যায় ক্রূরা বা লৌহসূচী অপেক্ষাও তীক্ষ্ণা। উহা অয়ঃসূচী হইতে পৃথক্ জীবসূচীরূপে অবস্থিত ছিল। যেমন কুসুম-সৌরভ-কণা নিশ্বাসযোগে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তেমনি ঐ পাপ-মনোবৃত্তিতে সেই পরমাণু অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম বিসূচী লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অতি চতুরতার সহিত হিংসাদি ব্যাপার সমাধা করিত। বিশেষতঃ প্রাণিগণের যাহাতে প্রাণ বিনাশ হয়, ইহাই তাহার মনোরথসিদ্ধি ছিল।

এইরূপে সেই রাক্ষসীর সূচীদ্বয়ময় দ্বিবিধ দেহ হইয়াছিল। ঐ দেহদ্বয় নীহারকণার ন্যায় সূক্ষ্ম এবং কার্পাসসূত্রবৎ কোমল। ক্রূরা রাক্ষসী উল্লিখিত দ্বিবিধ তনু দ্বারাই নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের হৃদয়মর্ম্ম বিদ্ধ করত দশ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

বৎস! স্ব স্ব সঙ্কল্পবলে সকলেই লঘু বা গুরু হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দেখ, রাক্ষসী কর্কটী অতি বিশালবপুঃ ছিল; স্বীয় সঙ্কল্পবলে সে তাহার বিপুল কলেবর পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম সূচীভাব লাভ করিল। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি জীব, অতি বড় তুচ্ছ বিষয়ও তাহাদের প্রার্থনীয় হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ স্থল—এই রাক্ষসী। রাক্ষসী তপস্যা করিয়াও সূচীরূপে পৈশাচী বৃত্তি অঙ্গীকার করিল। সৎকর্ম্ম প্রভাবে শত পবিত্রদেহ হউক, নিজের নীচজাতিত্ব কদাচ বিলুপ্ত হয় না। দেখ, রাক্ষসী তপস্যা করিল, তপস্যা করিয়া পবিত্র হইল, অথচ সূক্ষ্ম সূচীভাব লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই রাক্ষসীভাবই রহিয়া গেল। তাহার সে নিজ নীচজাতীয় ভাব তাহাতে অপগত হইল না।

ক্রমে প্রচণ্ডপবন-চালিত শরদভ্রের ন্যায় রাক্ষসীর সেই স্থূলদেহ বিগলিত হইলে রাক্ষসী সূক্ষ্ম সূচীদেহ লাভ করিয়া দিগ্দিগন্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যে সকল লোক বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিপুলাঙ্গ,

সেই সকল লোকের অন্তরে সেই দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষসীর জীবসূচী বায়ুকণার ন্যায় স্বীয় অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীরে অতি বিসূচিকা ব্যাধিরূপে এবং যাহারা ক্ষুদ্র-কায়, সুস্থ ও সুখী লোক, তাহাদের হৃদয়ে অন্ত-র্বিসূচিকারূপে প্রবেশ করিয়া স্বীয় মনোরথ সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই অবস্থায় সে কখন কখন পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল, আবার কখন কখন যাঁহারা বিজ্ঞ বিচ-ক্ষণ লোক, তাঁহাদের পুণ্য, মন্ত্র, ঔষধ ও তপস্যা নিয়মে প্রতিহত হইতে লাগিল।

এইরূপে রাক্ষসী দ্বিবিধ দেহ আশ্রয় করিলে বহু বর্ষ যাবৎ কখন ভূতলে এবং কখন নভস্তলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ রাক্ষসী ভূতলে ধূলিজালে, হস্তে অঙ্গুলিদলে, আকাশে প্রভাপুঞ্জে ও বস্ত্রে সূত্রসন্তানে তিরোহিত হইতে লাগিল। প্রাণিগণের অন্তঃস্থিত স্নায়ুপথ, ব্যভিচারাদি দোষদুষ্ট যোনি বা উপস্থ, পাংশু-পাণ্ডুরিত শুষ্ক সরিৎখাত, হস্ত-পদাদির রুক্ষ রেখা, সূক্ষ্ম রোম-বিবর, সৌভাগ্য লক্ষণ ও কান্তিহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কদর্য্য স্থান, মক্ষিকাময় অশিব বাতদূষিত দেশ, বিল্ব বৃক্ষাদি-বর্জ্জিত অপবিত্র দেশ, মৃত-পশু-নরাদির অস্থিগ্রন্থি-সম্বলিত স্থান, বাত্যাদি দ্বারা নিত্য কম্পিত দেশ, নীহারবৎ পর-সন্তাপহর আত্মনিষ্ঠ নির্ম্মল সাধুজন-হীন স্থান, অপবিত্র বস্ত্রপরিধায়ী অশিষ্টজনের সঞ্চরণভূমি, মধুমক্ষিকা, কোকিল ও বায়স প্রভৃতির বিশ্রাম স্থান, কর্কশ ধ্বনিকারী বায়ুপূর্ণ স্থান, শাখাময় বৃক্ষবন, শ্রেণীবদ্ধ নীহাররাজির সঞ্চরণ স্থান, লোকসমূহের ক্ষত অঙ্গুলি-বিবর, হিমবিন্দু-সমাচিত দেশ, পুরুষ-পাদ-চিহ্নিত স্থান, বল্মীকস্তূপ, পর্ব্বত, মরুভূমি, ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্য, যূকাকীর্ণ স্থান, ভীত পলায়িত পথিকাধিষ্ঠিত স্থান, কদাকার শুষ্কদেহ পিশাচাদি-বিশিষ্ট শীর্ণ-পর্ণপরিপূর্ণ দুর্গন্ধ জলপ্রায় প্রদেশ, কুল্যাদি তোয়াশয়ের উভয় তীরস্থ শীত সমীর-সেচিত পথিকজনের বিশ্রামস্থল এবং যূকসমূহকে গ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাহাদের উদরগত নর-শোণিতে লিপ্তবদন, লিপ্তনখ ও লিপ্তত্বক বানরাদির অপবিত্র দেহ, এই সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাক্ষসী তখন বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এতদ্ভিন্ন গজ-বাজি-সমাকুল নগরে ও অন্যান্য বহু স্থানে সে যাতায়ত করিতে লাগিল। এইরূপ গমনাগমনে ঐ রাক্ষসী অতি শ্রান্ত হইয়া পড়িল। বলীবর্দ্দ যেমন হৃষ্ট

হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকাস্তূপ ভেদ করে, রাক্ষসীও তেমনি নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে রথ্যা-প্রক্ষিপ্ত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া দেহিগণের জ্বরাদি-তপ্ত দেহবন ভেদ করত তাহাতে প্রবেশ করিতে লাগিল।

তৎকালে সেই সূচীরূপিণী রাক্ষসীকে কোন কোন লোক সীবন-কার্য্য সমাধার জন্য গ্রহণ করিলে, সে যখন সে কার্য্যে লিপ্ত হইয়া শ্রান্ত হইত, তখন বিশ্রামার্থ সীবনকারীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইত ও কোথায় প্রলীন হইয়া অদৃশ্য হইত। সেই রাক্ষসী ক্রূর-প্রকৃতি বটে; কিন্তু কৌতুকবশতঃ যখন সীবন-ব্যাপারে লিপ্ত হইত, তখন সীবনকর্ত্তার হস্তবেধ করিত না। যখন স্বীয় সূচীত্ব-স্বভাব ত্যাগ করিয়া অপসৃত হইত, তখন আর নিজের তীক্ষ্ণতা বাহিরে প্রকটিত করিতে পারিত না। গুরুভার শিলাখণ্ড যেমন নৌকার সহিত ভ্রমণ করে, আশা যেমন পলিত-কলেবরা বৃদ্ধার সহচরী হয়, তেমনি ঐ অয়ঃসূচী জীবসূচীর সহিত মিলিত হইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বায়ু-বিচালিত তুষকণা যেমন নানাদিকে নিক্ষিপ্ত হয়, মনঃসত্তা-সমন্বিত হইয়া সেই সূচী তেমনি দিগ্দিগন্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ রাক্ষসী সূচীভাব প্রাপ্ত হইয়া মুখ দ্বারা পরপ্রযুক্ত সূক্ষ্ম সূত্র গ্রাস করিত; তাই সে পরের সাহায্যে উদর-পূরণ হইয়াছে মনে করিয়াই যেন সহসা স্বস্থচিত্ত হইত। পরহিংসা প্রযুক্ত উদরভরণের বাসনায় ঐ সূচী উৎকট তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াও স্বীয় মন উল্লসিত করিয়াছিল; এইজন্য যেন এক্ষণে পরপ্রেরিত সূক্ষ্ম সূত্র অনবরত মুখে পতিত হইলে সে স্তম্ভিত বা নিশ্চল হইয়া থাকিত। যাহারা দারিদ্র্যাদি বিবিধ বাধায় উৎপীড়িত, ক্রূরস্বভাব লোকেরাও দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, ঐ সূচীভূতা ক্রূর-প্রকৃতি রাক্ষসী, যে সকল বস্ত্রখণ্ড জীর্ণশীর্ণ, তাহাদিগকেও সূত্র দিয়া পূর্ণ করিত। অর্থাৎ রাক্ষসী নিজের জঠর-জ্বালা নিবারণের জন্যই তপস্যা করিয়াছিল; কিন্তু তাহা হইল না, এক্ষণে তাহাকে পরের উদরই পূরণ করিতে হইতে লাগিল। তপশ্চরণ করিয়া রাক্ষসী সূত্রাগ্রের প্রবেশ ও নির্গমযোগ্য হৃদয় অর্জ্জন করিয়াছিল; তাহার যে সেই সূচীরূপে প্রকাশ, তাহাও রবিকরবৎ পরার্থ, অর্থাৎ পটাদিসীবন-ব্যাপারেই পর্য্যবসিত

হইয়াছিল; তাহাতে সে নিজের ভোগযোগ্য কিছুই অর্জ্জন করিতে পারে নাই। তপস্যার ফলে রাক্ষসীর উদর ক্ষীণ হইয়াছিল, সেজন্য সে সূচী অবস্থায় স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য অন্তরে বিশেষ অনুতাপ ভোগ করিয়াছিল; কিন্তু সে অনুতাপে তাহার হিংসাবৃত্তি কমিল না, নদীপ্রবাহ যেমন সমানভাবে চলিতে থাকে, তেমনি তাহার রাক্ষসীভাব ও সূচীভাব এই উভয় ভাবে লোক-বেধন-ব্যাপার অবিরাম একই ভাবে চলিতে লাগিল। মৃত্যুকালে জীবের কলত্রাদি বিষয়ে বাসনারূপ দীর্ঘ তন্তু উদ্ভূত হইয়া তদনুরূপ দেহে যেমন জীবচেতনা সঞ্চারিত করিয়া দেয়, সেই সূচীরূপিণী রাক্ষসী তেমনি চতুরতাসহকারে বস্ত্রে বস্ত্রে সূত্র সঞ্চারিত করিত। সীবনকর্ত্তা ঐ সূচীকে পটে সঞ্চারিত করিলে সে তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে যেন বসনে আপন মুখ গোপন করিয়াই বিদ্ধ করিতে থাকিত। বস্তুতঃ যাহারা দুর্জ্জন, তাহারা কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়াই পরের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ সূচী কখন কখন কামিনীগণের কণ্ঠবসনে বিদ্ধ হইয়া তাহাদের মুখপানে চাহিয়া চিন্তা করিত—আহা! কেমনে ইহাদিগকে বিদ্ধ করিব? ফলে তীক্ষ্ণ-স্বভাব দুর্জ্জনগণের অভীষ্টই ঐরূপ। কোমল কৌশেয়-বসন কিম্বা কঠিন ক্ষৌম বসন, উভয় বসনেই ঐ সূচী সমানভাবে প্রবেশ করিত, গুণাগুণের বিচার তাহার ছিল না। বস্তুতঃ মূর্খলোক কখন কি পদার্থের গুণাগুণ বিচার করে? সূচী যখন সীবনকর্ত্তার অঙ্গুষ্ঠালিতে নিপীড়িত হইয়া বিস্তৃত সূত্র ধারণ করিত, তখন মনে হইত—যেন উহার উদরে অনবকাশ নিবন্ধন থাকিতে না পারিয়া অন্ত্রসকল উদগীর্ণ হইতেছে। ঐ তীক্ষ্ণ সূচীর অন্তঃকরণ হৃদয়হীন ছিল, তাই শুভাশুভ বা ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। এই কারণে সে সূত্রে সংলগ্ন হইয়া সরস ও নীরস সকল বস্তুতে প্রবেশ করিত। সূচী নিষ্ঠুরভাষিণী নয়, অথচ তাহার মুখ সূত্র দ্বারা আবদ্ধ। সে পরসন্তাপিনী বটে; অথচ স্বয়ং অনুতপ্ত। তাহার ছিদ্র আছে সত্য; কিন্তু উদরচ্ছিদ্র নাই। আহা! সূচীর কি বা দুর্দ্দশা! ভাগ্যবিহীনা রাজনন্দিনীর ন্যায় সে এখন আপন বুদ্ধিদোষে দুর্ভাগিনী হইয়াছে। বিনা অপরাধে ঐ তীক্ষ্ণা সূচী জনসাধারণের হিংসা কামনা করিত। অধুনা সেই পাপে নিজের বুদ্ধিদোষে সূত্ররুদ্ধ হইয়া

অভ্যন্তরেও বিলীন হইয়া যাই। আহা! আমার এমন অবস্থায় কে আমায় উদ্ধার করিবে? কেই বা আমায় জানিতে পারিবে? যাহারা উচ্চ পর্ব্বতের অধিবাসী, তাহাদিগের দৃষ্টিতে যেমন গ্রাম, গ্রাম্যপথ ও গ্রাম্য তৃণগুল্ম প্রভৃতি পতিত হয় না; তেমনি বিবিক্তচেতা সূক্ষ্মদর্শী যোগীদিগের চক্ষেও আমার ন্যায় হতভাগ্য জীবের পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কোন সূক্ষ্মদর্শী মহাশয় পুরুষ যে আমায় উদ্ধার করিবেন, সে আশাও আমি করিতে পারি না। আমি অজ্ঞানসাগরে পড়িয়া রহিয়াছি; হায়! আমার অভ্যুদয় ঘটিবে কিরূপে? বস্তুতঃ অন্ধ কি কখন খদ্যোতাবলীর অনুসরণ করিলে বিষয় দর্শন করিতে পারে? অতএব আমি জানিতে পারিতেছি না, কত কাল আমাকে এইরূপ বিপন্ন ও মোহান্ধ হইয়া বিপদ-গহ্বরে বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে?

রাক্ষসী আবার ভাবিতে লাগিল—কবে আমি অঞ্জন মহাশৈলের অঙ্গ-সম্ভবার ন্যায় মহাকায় ধারণ করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমির স্তম্ভরূপে বিরাজ করত প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হইব? কবে আমার এমন দিন আসিবে, যে দিন মেঘমালার ন্যায় আবার আমার ভুজদ্বয় দীর্ঘ হইবে, নয়নদ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইবে, নীহারজালবৎ বসনে আমি আবৃত হইব, ঊর্দ্ধগত কেশরাশি আমার গগনতল স্পর্শ করিবে, আমার লম্বোদররূপ অভ্রদর্শনে শিখিকুল নৃত্য করিয়া উঠিবে, আবার আমি পূর্ণ যুবতী হইয়া লম্বমান লোল স্তনযুগল ধারণ করিব এবং মদীয় শ্বাস-সমীরণে স্তনদ্বয় কম্পিত হইবে? কবে আমি অট্টহাস্যে—ভস্মচ্ছটায় সূর্য্যমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিব? কবেই বা কৃতান্তের ন্যায় ভীষণাকৃতি হইয়া আমি সর্ব্ব-জীবের সংহার সাধনে সমুদ্যত হইতে পারিব? কবে আমি কৃশানুর ন্যায় উদ্দীপ্ত ও উলুখলের ন্যায় অন্তর্নিমগ্ন নয়নদ্বয় ধারণ করিয়া—সূর্য্যবিম্বের ন্যায় মাল্যদামে বিভূষিত হইয়া এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি পাদদ্বয় বিন্যস্ত করত বিহার করিব? কবে আবার সুবিশাল গহ্বরের ন্যায় সেই মহান্ উদর আমার ফিরিয়া আসিবে? কবে আবার আমার সেই শারদীয় মেঘ-মেদুর নখরনিচয় উদ্ভূত হইবে? কবে আমার আবার সেই প্রৌঢ় রাক্ষসদিগের হৃদয়-বিক্ষোভকর ঈষৎ হাস্য বিকশিত হইবে? কবে আমি আপন কটিতট বাদিত করিয়া

মহারণ্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া নৃত্য করিব? কবে আমি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভপূর্ণ বসা, আসব,মাংস ও অস্থিনিচয় অনবরত ভোজন করিয়া মদীয় বিশাল উদরের পূর্ত্তিসাধন করিব? কবে আমি সগর্ব্বে মহাপ্রাণীদিগের রুধির পান করিয়া উন্মত্ত ও আনন্দিত হইয়া পশ্চাৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিব? বহ্নিতে কনক-ভস্মীকরণের ন্যায় আমি আপনারই কুতপস্যানলে স্বীয় বিশাল উজ্জ্বল দেহ ভস্মীভূত করিয়া এই সূচীভাব অঙ্গীকার করিয়াছি। আমার সেই অঞ্জনা-চলনিভ দিঙ্মণ্ডলব্যাপী বিশাল বপুঃ কৈ? আর এই দীর্ঘচরণ লূতার খুরপ্রমাণ তৃণবৎ কোমল সূচীভাবই বা কোথায়? হায় রে বিধি-বিড়ম্বনা! অজ্ঞলোক যেমন মৃত্তিকা জ্ঞানে কনক-কেয়ূর ফেলিয়া দেয়, আমিও তেমনি সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই উজ্জ্বল দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি। হা, আমার বিন্ধ্যাচলের নীহারময় গুহানিভ মহোদর! তুমি এখন আর সিংহ, মৃগ ও গজগণের সংহার সাধন করিতেছ না কেন? হা, আমার বিশাল বাহুদ্বয়! তোমাদের ভয়ে এককালে গিরিশিখর চূর্ণ হইত, এখন তোমরা চন্দ্রাকার নখরপ্রহারে পুরোডাশ জ্ঞানে চন্দ্রকে মর্দ্দিত করিতেছ না কেন? হা, আমার বৈদূর্য্য-মণিময় গিরীন্দ্রতট-সুন্দর বক্ষঃস্থল! এক্ষণে তুমি পূর্ব্ববৎ যূকরূপ সিংহাদিতে পরিবৃত রোমরূপ বনরাজি ধারণ করিতেছ না কেন? হা, আমার কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকার-হর উজ্জ্বল নয়নযুগল! এখন আর তোমরা দর্শনরূপ জ্বালামালায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছ না কেন? হা, মদীয় বন্ধো স্কন্ধ! তুমি নষ্ট হইলে, মহীতলে তোমার স্থান হইল না, কাল তোমায় নিষ্পিষ্ট করিল, তুমি শিলাতলে নিঘৃষ্ট হইলে। হা, আমার প্রলয়ানলদগ্ধ চন্দ্রবিম্বসুন্দর শ্যামশোভাময় মুখ-চন্দ্র! তোমার রশ্মিজাল অদ্য কোথায় গেল! হা, আমার বিপুলাকার হস্তদ্বয়! তোমরাই বা অদ্য কোথায় গিয়াছ? আমি এক্ষণে অতিসূক্ষ্ম মহাসূচী হইয়াছি। একটা মক্ষিকাও যদি আমায় পাদ দ্বারা স্পর্শ করে, তথাপি আমি বিচলিত হই। হা, আমার বিন্ধ্যাদ্রি অপেক্ষা বিপুল অমল নিতম্বমণ্ডল! তুমি সম্প্রতি কোথায় রহিয়াছ?

রাক্ষসী সর্ব্বশেষে বলিতে লাগিল,—আহা! আমার সেই গগন-ব্যাপিনী মহতী আকৃতি কোথায়! আর এই তুচ্ছ নবীন সূচীদেহই বা

কোথায়! আমার সেই দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালনিভ মুখবিবর কোথায় এবং এখনকার এই সূক্ষ্ম সূচীমুখই বা কোথায়! আমি পূর্ব্বে আমার বিপুল মুখে বহুল মাংসভার গ্রাস করিতাম, এক্ষণে এই সূক্ষ্ম সূচীমুখে জলবিন্দু মাত্র পান করিতেছি। হায়, এই দুই বিষয়ের এখন কতই ব্যবধান! অহো, আমি অতীব সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছি। আহা! আমি নিজেই এই আত্মনাশক নাটকের অভিনয় করিলাম।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই শোকাকুলা সূচী এইরূপ বহু বিলাপ করিবার পর মৌনাবলম্বন করিল এবং কিঞ্চিৎ কাল এই বিষয় চিন্তার পর আবার ভাবিল, আমি আমার পূর্ব্ব দেহ লাভ করিবার জন্য পুনর্ব্বার তপস্বিনী হইব।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাক্ষসী প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হইল এবং সেই হিমাচল শৃঙ্গে গমন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। প্রথমে ঐ রাক্ষসী আপনাতে মনঃকল্পিত সূচীত্ব অনুভব করিল। পরে সে প্রাণ-মারুতময়ী হইয়া ঐ সূচীভাবে প্রাণ ও মন মিলাইয়া দিল। তখন আপনাতে মনোময় সূচীভাব অনুভব করিতে লাগিল এবং ঐ প্রাণবায়ুসমন্বিত শরীরে হিমালয় শিখরে চলিয়া গেল। ফল কথা, আত্মা নিষ্ক্রিয়; তাই তাহার গমন সম্ভব হয় না। এ দিকে সূচীরও ইন্দ্রিয় নাই; তাই তাহাতে ক্রিয়াশক্তি অসম্ভব। সুতরাং সূচীরূপিণী রাক্ষসীর হিমালয় গমন কোন মতেই সম্ভবপর নহে। এই হেতু অধুনা কল্পনাবলে সে আপন সূচীদেহে জীবদেহ সন্নিবেশিত করত প্রাণ-মন-ভাবনায় ক্রিয়াশক্তি প্রাপ্ত হইল এবং হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিল।

অনন্তর মহতী ইন্দ্রনীলশিলার ন্যায় আকৃতিমতী রাক্ষসী হিমালয়

শিখরের যে প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিল, ঐ প্রদেশ তৃণবিরহিত, সর্ব্বভূত-বর্জ্জিত, দাবদগ্ধ, শুষ্ক ও ধূলিধূসরিত। দেখিলে মনে হয়, মরুভূমিতে সহসা তৃণাঙ্কুর জন্মিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ রাক্ষসী যদিও সূচীময়ী, তথাপি মানবী তপস্বিনীর ন্যায় দ্বিপদ ভাবনা করিয়া এক পদে ভূতলে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। সে সূক্ষ্ম পাদাগ্রে ভূরেণু বিদ্ধ করিল এবং অগ্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব হইতে সযত্নে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। সত্য বটে, সর্ব্বদিক্ হইতে দৃষ্টি নিবারণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিলে ভূরেণুরাশির উপর অবস্থান অসম্ভব হইয়া উঠে, কিন্তু রাক্ষসীর পক্ষে তখন তাহা অসম্ভব হয় নাই। রাক্ষসীর কৃষ্ণায়সতা, হিংসা নিবন্ধন তীক্ষ্ণতা ও বায়ু ভোজনের অভ্যাস, এই সকল দ্বারা স্থৈর্য্য হইয়া ছিল; সেই স্থৈর্য্য গুণেই ঐরূপ পাদ-বিক্ষেপে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারিয়াছিল। যেমন কোন জলৌকা ক্ষুধাতুর অবস্থায় দূরস্থিত আহার দর্শনার্থ তৃণ-পর্ণাদির অগ্রভাগে মুখ তুলিয়া স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি ঐ সূচীরূপিণী রাক্ষসী ঊর্দ্ধমুখে একপদে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। সূচীর ন্যায় সমানাকৃতি ভাস্করদীধিতি তদীয় মুখবিবর হইতে নির্গত হইলে, বোধ হইল যেন উহা সূচীর সহচরী হইয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতেছে। আত্মীয় জন ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রতি লোকের একটা স্নেহ থাকে, এই যে প্রচলিত কথা আছে, সে কথা সত্য; কেন না, সূর্য্যদীধিতি সূচীকিরণে মিশিয়া গিয়া উহার সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সূচীরূপিণী রাক্ষসীর নিজের যে ছায়া, তাহাও তাহার দ্বিতীয়া তাপসী সহচরীর ন্যায় প্রতিভাত হইল। সে আপনার ন্যায় সেই মলিনা ছায়াকে যেন নিজের পৃষ্ঠরক্ষিকা করিয়া রাখিল। সেই সূচীর বদন-বিনির্গত সূর্য্যদীধিতি, ছায়াসূচীতে মিলিত হইয়া তদীয় নেত্রস্বরূপে প্রতিভাত হইল। তখন ঐ সূচীসম সৌর-দীধিতি ছায়াসূচী ও সূচী, এই তিন সূচী একত্র মিলিত হইলে মনে হইল, যেন পরস্পর সূচীর স্থৈর্য্য-সহায়তারূপ সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তৎকালে সূচীর তপস্যা দেখিয়া সম্মুখস্থিত তরুলতা প্রভৃতিও সদ্বুদ্ধি-

সম্পন্ন হইল। সেই মহাতপস্বিনীকে দেখিলে কাহার না উৎকণ্ঠা উৎপস্থিত হয়? সেখানকার দ্রুম লতা সকল তপস্বিনী সূচীকে স্ব স্ব মনোবৃত্তির ন্যায় উত্থিত ও স্থির ধীরভাবে বদ্ধপদা দেখিয়া মুখবিনির্গত ভাঙ্কাররবচ্ছলে যেন বায়ু ভোজন করাইতে লাগিল। তাহাদের স্ফুট বা অস্ফুট পুষ্পসমূহের পরাগপুঞ্জ যেন তাহারা দেবতাকে না দিয়াও সূচীকে সমর্পণ করত তদীয় মুখ পূর্ণ করিতে লাগিল।

এই সময় মহেন্দ্র সূচীর তপস্যায় বিঘ্ন বিধানের জন্য আমিষকণা প্রেরণ করিলেন। তাহা বাত-বিচালিত হইয়া ঐ সূচীর মুখচ্ছিদ্রে প্রবেশ করিল; কিন্তু সূচী রাক্ষসী তাহা গলাধঃকরণ করিল না। কেন না, তৎকালে তাহার নিকট সে বস্তু অপবিত্র বলিয়া ধারণা ছিল। বাস্তবিক অন্তরে যদি কিছু সার থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র লোকেও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনবহিত হয় না। পুষ্পপরাগ রাক্ষসীর মুখমধ্যে রহিয়াছে অথচ রাক্ষসী তাহা ভক্ষণ করিতেছে না, ইহা দেখিয়া ইন্দ্রপ্রেষিত পবন সুমেরু উন্মূলিত হইলে যতদূর না বিস্মিত হয়েন, ততোধিক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ সূচীরূপিণী রাক্ষসী কখন আপাদ মস্তক পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, কখন প্রবল জলপ্রবাহে পরিপূরিত হইয়া, কখন মহাবাতে বিধূত হইয়া, কখন বনবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া, কখন করকাপাতে ভিন্ন হইয়া এবং কখন কখন বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জ্জনে ক্ষুব্ধ হইয়াও সহস্র বর্ষ যাবৎ চরণাগ্রভাগ ভূতলে বিন্যাস করত সুদৃঢ় নিশ্চয়ে নিশ্চলভাবে তপস্যা করিতেছিল। সমস্ত বাহ্যস্পন্দ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঐ সূচী বহুকাল তপস্যা করিল।

অনন্তর সত্য-জ্ঞানময় আত্মবিচার করিতে করিতে ঐ সূচীর আত্মাতে জ্ঞানময় আত্মা আবির্ভূত হইলেন। সূচী তখন পরাবরদর্শিনী ও নির্ম্মলা হইল। তাহার সূচীভাব চলিয়া গেল, সে পরম পবিত্র হইল। তপোবলে রাক্ষসীর সুবুদ্ধি জন্মিল; রাক্ষসী সেই বুদ্ধিবলেই বেদ্য পদার্থের জ্ঞান লাভ করিল। তপস্যার প্রভাবে তাহার পাপ ক্ষয় হইয়া গেলে সেই সূচীদেহেই তাহার সুখানুভূতি হইতে লাগিল।

এইরূপে সেই সূচী সহস্র সহস্র বর্ষ যাবৎ ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দারুণ তপস্যা করিল। তাহার তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দশ ভুবন সন্তপ্ত হইয়া উঠিল।

তদীয় প্রলয়ানলবৎ ভীষণ তপস্যায় সেই মহাগিরি এমন কি সমগ্র জগৎই যেন প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

অতঃপর সুরপতি বাসব নারদকে জিজ্ঞাসিলেন ;—ভগবন্! কাহার তপস্যায় এ জগৎ আক্রান্ত হইয়া পড়িল? নারদ প্রত্যুত্তরে সূচীর তপস্যা-বিবরণ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, এক রাক্ষসী সূচীরূপিণী হইয়াছিল, সে সপ্ত-সহস্র বর্ষ যাবৎ সুদীর্ঘ তপস্যা করিয়া এক্ষণে বিজ্ঞানদেহা হইয়াছে। তাহারই প্রভাবে এ জগৎ প্রজ্বলিত হইতেছে। নাগনিচয় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। নগ সকল বিচলিত হইতেছে। বৈমানিকেরা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছেন। জলধি ও জলধর সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দিবাকর ও দিঙ্মণ্ডল মলিনী-ভাব ধারণ করিয়াছে। হে সুরেন্দ্র! রুদ্রের জগৎ সংহার শক্তি-সদৃশ সূচীতপস্যাতেই এই সকল ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইতেছে।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বাসব কর্কটীর সেই সকল তীব্র তপস্যা-বিবরণ শ্রবণ করিয়া পুনরায় কুতূহলসহকারে নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করি-লেন,—মুনে! হিম-জাড্য-ময়ী মর্কটীর ন্যায় সেই জড়প্রকৃতি কর্কটী তপঃ-প্রভাবে সূচীত্ব ও পিশাচবৎ অদৃশ্যভাব লাভ করিয়া কি কি ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিল, তাহা আমায় বলুন।

নারদ বলিলেন,—হে ইন্দ্র! সেই কর্কটীর জীবসূচী যখন পিশাচবৎ অদৃশ্যস্বভাবা হইল, তখন কৃষ্ণবর্ণা লোহসূচী তাহার আশ্রয় হইয়া উঠিল। একদা কর্কটী সেই আশ্রয়ভূত লোহসূচী পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যোমগামী বায়ু-রথে অবস্থান করত প্রাণীদিগের দেহাভ্যন্তরে প্রাণ-মারুত-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই রাক্ষসী পাপীদিগের দেহগত অন্ত্রসূত্র, স্নায়ুজাল ও মেদ প্রভৃতির ছিদ্র দিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় গোপনে

থাকিত এবং জীবদিগের যে নাড়ী দিয়া রোগের আশ্রয় বাহুবায়ু প্রবাহিত, সেই বায়ুভরে সেই নাড়ীছিদ্রে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিত। কৈলাস-শৈলস্থ বিপুল বটপাদপের অগ্রভাগে যেমন শিবশূল প্রোথিত, তেমনি সেই রাক্ষসী সেই সেই নাড়ীমধ্যে শূলরোগ উৎপাদন করিত এবং ইন্দ্রিয়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণীদিগের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উদরমধ্যগত ভুক্ত অন্নাদি এবং অবশেষে তাহাদের মাংস পর্য্যন্তও ভোজন করিত।

এ দিকে আবার রাক্ষসী অনেক সময় অনেক মুগ্ধ যুবতীর সহিত শয়ন করিয়া থাকিত। যুবতীরা প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে কপোলপত্র-রচনা সংক্রামিত করিয়া শুইয়া আছে, প্রিয়তমের আশ্লেষে তাহাদের কণ্ঠস্থ কুসুম-মালা মর্দ্দিত হইয়াছে। রাক্ষসী মুগ্ধাঙ্গনাগণের এ হেন সুখও অনুভব করিত। কখন কখন কোন কোন বনবিহঙ্গীর শরীরে প্রবেশ করিয়া কল্পপাদপের কুসুমাপেক্ষা সমধিক সৌরভশালী অম্ভোজশ্রেণীতে এবং কখন বা ক্লেশবিহীন বনবীথিতে বিহার করিয়া বেড়াইত। কখন কখন সুরনিবাস সুমেরু প্রভৃতির বনবিভাগে ভ্রমরীদেহে প্রবেশ করিয়া ভ্রমরসহ কেলি করত সুগন্ধ মন্দার কুসুমের মকরন্দ মধুপান করিত। কখন কোন প্রবীণ শকুনি-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শবদেহসকল চর্ব্বণ করিত। কখন সমরে নিশিত খড়্গধারায় নিলীন হইয়া বীরবপুঃ বিদারণ করিত। ঐ সূচী রাক্ষসী যুগপৎ সর্ব্বদিকে সঞ্চলিত সমীরণলেখার ন্যায় প্রাণীদিগের সর্ব্বাঙ্গে ও সর্ব্বনাড়ীতে একই সময়ে প্রবেশ করিত। কখন কাচবৎ স্বচ্ছাকৃতি ব্যোমবীথিতে উড়িয়া বেড়াইত। যেমন সমস্ত প্রাণবায়ুসমষ্টির স্পন্দন বিরাটবপুঃ ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং সর্ব্বপ্রাণীর দেহে যেমন চিৎশক্তি স্ফুরিত হইয়া থাকে, তেমনি ঐ সূচী দেহরূপ গৃহে স্ফুরিত হইত। আপন গৃহে দীপালোকে আলোকিত গৃহিণীর ন্যায় ঐ সূচী চিৎশক্তিপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। সলিলে দ্রবশক্তির ন্যায় জীবশোণিতে প্রবেশ করিয়া সূচীরূপিণী রাক্ষসী সাগরে আবর্ত্তবৎ প্রাণি-জঠরে বল্গিত হইত। প্রাণীদিগের শুভ্রবর্ণ মেদোরাশির উপর রাক্ষসী শয়ন করিত, মনে হইত বিষ্ণু যেন ফণিরাজদেহে শুইয়া রহিয়াছেন। রাক্ষসী পান সময়ে প্রাণিগণের দেহগন্ধ সুধাবৎ আস্বাদন করিত। যাহাতে প্রাণিবর্গের বল ও আরোগ্য

বর্দ্ধিত হয়, তরুগুল্ম ও ওষধি প্রভৃতির সেই সেই রস ও নির্য্যাসাদি রাক্ষসী বায়ু-রূপে ভক্ষণ করিত এবং প্রাণিহিংসা মনস্থ করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট রস প্রভৃতি ব্যাধিরূপে পরিণত করিয়া দিত। 'আমি জীবময়ী সূচী হইব' এইরূপ স্থির সঙ্কল্পে রাক্ষসী সূচী এক্ষণে তপস্বিনী হইয়া পরম পাবনী চৈতন্যময়ী হইয়াছে।

হে বাসব! পূর্ব্বে ঐ জীবসূচীই অলক্ষিতভাবে পবন তুরগে সমারূঢ় হইয়া লৌহসূচীর সহায়তায় নানাদিকে বায়ুবেগে অবাধে গতিবিধি করিত এবং অগণিত প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দে পান, ভোজন, দান, আহরণ, —নর্ত্তন, গীত, বিলাস, শয়ন ও উপবেশনাদি সমাহিত করিত। ঐ ব্যোমরূপিণী সূচী যখন মন ও পবন দেহে অবস্থান করিতেছিল, তখন অলক্ষিতভাবে না করিয়াছে, এমন কার্য্যই নাই। ঐ সূচী যদিও সকল প্রাণীর সংহার করিতে পারিত, তথাপি মাত্র কতকগুলি লোকের রুধিরাস্বাদে মত্ত হইয়া মদোন্মাদিনী করিণীর ন্যায় কেবল কতিপয় প্রাণীরই আয়ুষ্কালরূপ বন্ধনস্তম্ভ ভগ্ন করিয়াছিল। সূচী, বহুপ্রাণীর দেহবিক্ষোভ করিত, এবং বহুল কল্লোলময় প্রাণি-দেহরূপ নদীতে উন্মত্ত হইয়া মকরের ন্যায় সবেগে ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রচুর পরিমাণে মেদ-মাংস ভোজন করিবার সামর্থ্য সূচীর ছিল না, তাই সে, সময়ে সময়ে ভোজনলোলুপ অথচ ভোজনাক্ষম ধনাঢ্য বৃদ্ধ বা আতুর জনের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিত। রঙ্গস্থলে নর্ত্তনকালে নর্ত্তকীর বলয়াদি অলঙ্কারগুলিও যেমন নাচিয়া উঠে, তেমনি ঐ সূচীরূপিণী কর্কটী যখন ছাগ, উষ্ট্র, হস্তী, হয়, সিংহ ও ব্যাঘ্রপ্রভৃতির দেহে প্রবেশ করিয়া আনন্দে নাচিত, তখন সেই সেই ছাগ প্রভৃতি জন্তুগণও নৃত্য করিত। রোগরূপিণী সূচী গন্ধলেখার ন্যায় বহির্বায়ুতে মিলিয়া গিয়া বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে জনগণের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিত। সূচী সর্ব্বত্র সফলমনোরথ হইত না; সে, কোন কোন দেহে প্রবিষ্ট হইত আর মন্ত্র, ঔষধি, তপস্যা, দান ও দেবার্চ্চনাদি দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই সেই দেহে অবস্থানে অক্ষম হইত বলিয়া গিরিনদীর তুঙ্গ তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় বহির্দ্দিকে ধাবিত হইত।

অনন্তর সূচী সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া দীপপ্রভার ন্যায় অলক্ষ্যে লৌহসূচীতে বিলয় পাইয়া যাইত। জননীর নিকট সন্তান থাকিলে তাহার

যেমন সুখানুভব হয়, সেই রাক্ষসী লৌহ সূচীতে থাকিয়া তেমনি সুখানুভূতি করিত। আপন আপন বাসনানুরূপ আশ্রয় সকলেই লাভ করিয়া থাকে, রাক্ষসী সূচীত্ব আশ্রয় বাসনা করিয়াছিল, তাহারও তাহাই লাভ হইয়াছিল। জড়প্রকৃতি লোক যেমন নানাদিক্ ঘুরিয়া অবশেষে বিপন্ন অবস্থায় আপন আশ্রয় স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ রাক্ষসীর জীবসূচীও সেইরূপ কোথাও প্রতিহত হইলে লৌহসূচীতে আসিয়া তেমনি বিলীন হইত।

এইরূপে সেই রাক্ষসী স্বচ্ছন্দে নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া কেবল মানসী তৃপ্তি পাইয়াছিল, পরন্তু শারীরিক তৃপ্তিলাভ করিতে সে কিছুই কখন পারে নাই। দেখ, গুণের যদি আশ্রয় থাকে, তবেই গুণ থাকে; আর আশ্রয়ের অভাব হইলে গুণ থাকিতে পারে কি? শরীর জন্য যে তৃপ্তি হয়, তাহা শরীরেরই গুণ বলিতে হইবে; কিন্তু শরীর যদি না রহিল, তবে গুণ থাকিবে কিরূপে? অর্থাৎ রাক্ষসীর শরীর ছিল না, শারীরিক তৃপ্তি হইবে কি করিয়া?

অতঃপর রাক্ষসী চিন্তা করিল,—আমি প্রাক্তন দেহের জন্য কঠোর তপস্যা করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে সে তপস্যা স্থান নির্ণয় করিয়া লইল। অনন্তর কুলায়বিহারিণী বিহগী যেমন আপনার কুলায়-বিবরে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি সেই সূচীরূপিণী রাক্ষসী প্রাণ-পবন-পথে কোন এক ব্যোম-চর তরুণবয়স্ক গৃধ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তৎপরে ঐ সূচীসমাবিষ্ট গৃধ্র সূচীর কর্তৃত্বে চালিত হইয়া সূচীরই কাম্য কর্ম্ম-সম্পাদনে সমুদ্যত হইল। সূচীকে অন্তরে লইয়া ঐ গৃধ্র বায়ুবিচালিত বারিধরের ন্যায় অন্তরস্থিত ঐ সূচী দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঐ সূচীরই অভিপ্রেত পর্ব্বতে প্রস্থান করিল। যেমন যোগীপুরুষ সর্ব্বসঙ্কল্প-শূন্য পরমব্রহ্মে নিজ চৈতন্য সমর্পণ করেন, ঐ গৃধ্র তেমনি সেই শৈলমধ্যে নির্জ্জন মহারণ্যে সূচীকে নিক্ষেপ করিল। পরে সেই সূচী সেই পর্ব্বতের একদেশে একপাদে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মনে হইল, সেই গৃধ্র যেন, অদ্রিশিখরে একটী দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিল। সেই গিরি-শিখরের ধূলিকণাস্থিত সূক্ষ্ম পরমাণুর অগ্রভাগে সূক্ষ্মতম চরণাগ্রমাত্র বিন্যস্ত করিয়া ঐ সূচী ময়ূরবৎ উদ্গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ গৃধ্র

স্থাপিত সূচী ঊর্দ্ধমুখে রহিল। জীবসূচী বিহঙ্গের দেহ হইতে বাহির হইতে লাগিল।

অনন্তর সৌরভকণা যেমন বায়ু হইতে ঘ্রাণবায়ুর দিকে ধাবিত হয়, সেই জীবসূচী তেমনি বিহঙ্গদেহ হইতে বহির্গত হইয়া লৌহসূচীকে আশ্রয় করিল। তখন লৌহসূচী চেতনাবতী হইয়া উঠিল। ভারবাহী ব্যক্তি যেমন আপনার মস্তক-ভার অবতারিত করিয়া স্বাস্থ্য বোধ করে, ঐ বিহঙ্গ সেইরূপ সূচী পরিত্যাগ করিয়া ব্যাধিবিহীন মানুষের ন্যায় অন্তরে স্বাস্থ্য লাভ করিল। অনন্তর সে, স্বীয় আবাসে চলিয়া গেল। যদি পরস্পর অনুরূপ পদার্থের যোগ হয়, তাহা হইলেই সৌষ্ঠব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই কারণেই সেই জীবসূচী লৌহসূচীকেই তপস্যার যোগ্য আধার কল্পনা করিয়াছিল। যাহা মূর্ত্তি-বর্জ্জিত, আধার ব্যতীত তাহার ক্রিয়াসিদ্ধি হইবার নহে; এই জন্যই সেই জীবসূচী আধারে থাকিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। পিশাচী যেমন শিংশপা বৃক্ষ ব্যাপিয়া অবস্থান করে এবং প্রবল বায়ু যেমন গন্ধলেখা লইয়া বিরাজ করে, সেই জীবসূচী তেমনি লৌহসূচী ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে লাগিল।

হে সুরপতে! সেই সময় হইতে এই সূচী বহুবর্ষ ব্যাপিয়া মহারণ্যে ঘোর তপস্যা করিতেছে। হে কর্ত্তব্যকোবিদ সুররাজ! আপনি অধুনা সেই সূচীকে বরদান করিতে প্রস্তুত হউন। কেননা, সূচীর তীব্র তপস্যা সম্প্রতি ভবদীয় চির-সঞ্চিত লোক সকল সমূলে ভস্মীভূত করিতেও সমর্থ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম। সুররাজ নারদের নিকট এই সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্র সূচী কোথায় আছে, তাহা জানিবার জন্য সমীরণকে সর্ব্বদিকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সমীরণ সূচীর সন্দর্শনার্থ দিব্য দৃষ্টিতে দশ দিক পর্য্যা-লোচনা করিলেন। অনন্তর তিনি ত্বরান্বিত হইয়া গগনপথ অতিক্রম করত ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেমন পরম ব্রহ্মজ্যোতিঃ অবাধে সর্ব্ব-দিকে গিয়া সর্ব্বপদার্থ নিজগোচর করিয়া লয়, সেই সমীরণের সম্বিৎ বা দিব্য দৃষ্টিরূপ জ্ঞান তেমনি একাংশে সর্ব্বদিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া বিনা বিঘ্নে সর্ব্ববস্তু প্রত্যক্ষ করিল। সমীরণ সন্দর্শন করিলেন,—পৃথিবীস্থ সপ্তসাগরের

পর এক বিপুল কাঞ্চনভূমি বিরাজিত। সে ভূমিতে প্রাণিমাত্রের সঞ্চার নাই। লোকালোক পর্ব্বত সে ভূমির মেখলার ন্যায় বিরাজমান। তাহার পর মণিময় ভূমিপ্রতিম পুষ্করদ্বীপ শোভমান। সে দ্বীপ সাগরবলয়ে বেষ্টিত। ঐ সাগর সুস্বাদু সলিলে পরিপূর্ণ। কত অনন্ত গিরিশ্রেণী ঐ দ্বীপ মধ্যে বিদ্যমান। তৎপরবর্ত্তী গোমেদক দ্বীপ। এই দ্বীপ মদিরাসাগরে বেষ্টিত। এখানে বহুতর জলচর প্রাণীর বাস। নানাবিধ পদার্থপরম্পরায় এই দ্বীপ পরিপূর্ণ। ইহার পরবর্ত্তী ভূভাগ ক্রৌঞ্চদ্বীপ আখ্যায় বিখ্যাত। এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে পরিখার ন্যায় ইক্ষুসাগর বিরাজমান। এখানে গিরিসমূহের সংস্থানক্রম নাই। এখানকার ভূ-ভাগ উর্ব্বর। এখানে সদাই শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার পর শ্বেতদ্বীপের সংস্থান। এই দ্বীপের চারিপার্শ্বে মুক্তাবলয়াকার ক্ষীরসাগর বিরাজমান। এখানকার এক অধিনায়ক আছেন। এখানে বিবিধ প্রাণী বিভাগক্রমে বাস করিতেছে। অনন্তর কুশদ্বীপ বিরাজিত। এই দ্বীপ ঘৃতসাগরে বেষ্টিত। ইহার মধ্যে মধ্যে নানাবিধ নগর ও মন্দির এবং স্থানে স্থানে শৈলশ্রেণী বিদ্যমান। ইহার পর শাকদ্বীপাখ্য ভূভাগ। এই ভূভাগ লবণসাগরে বেষ্টিত। এখানে বহুলোক বাস করিয়া থাকে। তৎপরে জম্বুদ্বীপ বিরাজমান। এই দ্বীপ লবণসাগরে পরিবৃত। এখানে কুলাচল-মধ্যবর্ত্তী সুমেরু পর্ব্বত অধিষ্ঠিত। সেই সুমেরুশৈলে বহু লোকালয় বিদ্যমান।

অনন্তর সেই সমীরসম্বিৎ বায়ুমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া যুগপৎ ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিল। সমীরণ ক্রমে জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি জম্বুদ্বীপে আসিয়া সূচী যেখানে তপস্যা করিতেছিল, সেই হিমগিরি-শিখরে গমন করিলেন। সেখানে সমীরণ এক বিশাল অরণ্যস্থলী প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অরণ্যস্থলী যেন দ্বিতীয় আকাশবৎ বিস্তৃত; তথায় প্রাণীদিগের ক্রিয়াকলাপ কিছুই নাই। উহা সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী বলিয়া তৃণাদি কোন পদার্থই উহাতে জন্মে না। সুবিস্তার সংসার-রচনার ন্যায় ঐ অরণ্যস্থলী কেবলই রজোময়ী। [রজ অর্থে ধূলি বা রজোগুণের বিকার] ঐ স্থানে নদীর ন্যায় সাগর পর্য্যন্ত মরীচিকা ধাবিত হইতেছে। তথায় ইন্দ্রধনুর ন্যায় কত যে মরীচিকানদী রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উহার মধ্যে

যে কত অনন্ত স্থান আছে, লোকপালেরাও তাহা দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। উহার উভয় পার্শ্ব হইতে প্রবল বায়ুবশতঃ কুণ্ডলাকারে ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে। ঐ অরণ্যস্থলী রবিকর-রূপ কুঙ্কুমে পরিলিপ্ত, চন্দ্রকর-রূপ চন্দনে চর্চ্চিত ও সতত বায়ুবেগে শব্দিত হইত বলিয়া, মনে হয়,—উহা যেন কান্ত জনের আলিঙ্গনার্থিনী সূৎকার-শব্দকারিণী গগনরূপ নায়কের নায়িকারূপেই প্রতিভাত হইতেছে।

অনন্তর সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগরময় ভূপীঠ পরিভ্রমণ করিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে পবন অতি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। পরে তিনি অনন্ত দিগন্তব্যাপী বপু ধারণ করিলেও সেই বিশাল বনস্থলী প্রাপ্ত হইয়া সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পবন সেখানে থাকিয়া দেখিলেন, সেই সূচী হিমগিরির ঊর্দ্ধ শৃঙ্গস্থিত মহাবন ভূমিতে ঊর্দ্ধমুখে তপস্যা করিতেছে। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া যেন শৃঙ্গমধ্যবর্ত্তী একটা শিখা বলিয়াই মনে হইল। সূচী একপাদে থাকিয়া তপস্যায় নিমগ্ন। দিনকরের প্রখর তাপে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, যেন বহুদিন সে আহার করে না, তাই তাহার উদরচর্ম্ম শুষ্ক হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। সূচী মুখ ব্যাদান করিয়া এক একবার আতপ ও অনিল লইয়া যেন উদরে রাখিবার অবকাশ নাই বলিয়াই তাহা পরিত্যাগ করিতেছে। সূচীর দেহ সৌরকরে শুষ্ক ও বনবায়ুতে প্রায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সূচী আপনার স্থান হইতে একটুও টলিতেছে না, সে নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে রহিয়াছে। চন্দ্রের রশ্মিজালে সূচী যেন স্নান করিয়া লইতেছে। সূচীর শিরোদেশ অগ্রেই অণুপ্রমাণ রজে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; তাহাতে অন্য রজের

আর স্থান হইতেছে না। ইহাতে মনে হয় সূচী বুঝি, সেই পূর্ব্ব রজ-প্রাপ্তিতে কৃতার্থ হইয়া অপর রজকে অর্থাৎ রজোগুণকে আর আশ্রয় দিতেছে না। সেই শূন্য অরণ্যে সূচীর আকৃতি-দর্শনে তাহাকে আর সূচী বলিয়া মনে হয় না; মনে হয়, সেই অরণ্যস্থলী যেন অন্য অরণ্যকে আপন বিভব অর্পণ করিয়া তপস্যাবলে তথাবিধ সূচীরূপ চূড়া কিম্বা জটাজুট লাভ করিয়াছে।

তৎকালে পবনদেব সূচীকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াকুল-মনে বহুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। পরে প্রণামপুরঃসর ভীত-ভীত-ভাবে তদীয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সূচীর তেজঃপুঞ্জে পবন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন; সুতরাং মহাতপস্বিনী সূচী কি জন্য যে তপস্যা করিতেছে, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; পরন্তু 'অহো! ভগবতী মহাসূচীর কি অপূর্ব্ব মহাতপস্যা!' কেবল ইহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি গগনপথে প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর পবনদেব ক্রমশঃ মেঘপথ ও বায়ুপথ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সিদ্ধলোকে উপনীত হইলেন। সিদ্ধলোক হইতে ক্রমে সূর্য্য পথ অতি-ক্রম করত বিমানপথের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া একেবারে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। তখন সুররাজ সূচী-সন্দর্শনপূত পবন-দেবকে দেখিয়াই আলি-ঙ্গন সহকারে সূচীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর পবন সুর-সমাজ-পরিবৃত সুরেন্দ্রসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—সুররাজ! আমি সমস্তই দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রবণ করুন।

বায়ু এইরূপ বলিয়া বলিতে লাগিলেন,—ভূতলস্থ জম্বুদ্বীপে হিমবান্ নামে এক উন্নত গিরীন্দ্র আছে। সাক্ষাৎ ভগবান্ চন্দ্রশেখর সেই গিরিরাজের জামাতা। সেই গিরিবরের উত্তর দিকে এক মহাশৃঙ্গ আছে। সেই মহাশৃঙ্গের উপরিভাগে থাকিয়া "পরমরূপিণী তপস্বিনী সূচী দারুণ তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন। তাঁহার তপস্যার কঠোরতা সম্বন্ধে অধিক আর কি কহিব, তিনি বায়ুভক্ষণ করিবার জন্য আপনার উদর-বিবর পিণ্ডাকার করিয়া লৌহবৎ কঠিন করিয়াছেন। সেই সূচী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুত মুখকুহর বিকসিত করিয়া তাহাতে অণু-প্রমাণ ধূলি রাখিয়া সে

মুখদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ; মনে হয়, বায়ু ভোজন নিবারণই এইরূপ মুখরোধের উদ্দেশ্য। হে দেবেন্দ্র ! সেই তপঃপ্রভাব এমনই তীব্র যে, হিমাচল তাঁহার নৈসর্গিক শৈত্য ভাব পরিহার করিয়া এখন যেন অগ্নিময় লৌহপিণ্ডবৎ উত্তপ্ত ও দুঃসেব্য হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। দেবরাজ ! গাত্রোত্থান করুন, চলুন,—আমরা সকলে মিলিয়া সূচীকে বরপ্রদানের ব্যবস্থার জন্য পিতামহ সকাশে গমন করি। নতুবা জানিবেন, সূচীর তাদৃশ মহাতপস্যায় আমাদের মহা অনিষ্টই ঘটিবে।

বায়ু কর্ত্তৃক এইরূপে উত্তেজিত হইয়া দেবরাজ বাসব দেবগণসহ ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, প্রভো ! আমি সূচীকে বরদান করিবার জন্য হিমালয়-শিখরে যাইতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা তদুত্তরে ইন্দ্রের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, আমিই তাহাকে বরদান করিতে গমন করিব। ইন্দ্র তৎশ্রবণে ব্রহ্মলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গ-ধামে আগমন করিলেন।

এদিকে সূচী সপ্তসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া সাতিশয় পবিত্র হইয়াছে। তাহার তপঃপ্রভাবে দেব-নিবাসভূমি পর্য্যন্ত তাপিত হইয়া উঠিল। সূচীর মুখকুহর-গত রবিকর-নিকর চারি দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। মনে হইল সূচী যেন সেই সকল কিরণরূপ নয়নদ্বারা আপনার মনোগত তপঃকল্পিত বস্তুজাত অবলোকন করিতেছে। সূচীর স্থৈর্য্যগুণে মেরুভূধর নির্জ্জিত ও লজ্জিত হইয়া নীরনিধিতে নিমগ্ন হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্যই যেন তাহার ছায়া প্রাতে ও সায়ংকালে দীর্ঘাকার ধারণ করিত এবং অপরাপর সময়ে তদীয় গৌরব বর্দ্ধনের নিমিত্তই যেন সেই ছায়াসূচী তাঁহাকে দূর হইতে দেখিত। মধ্যাহ্নকালে ঐ ছায়া যেন তীব্র তাপভয়ে বায়ুমধ্যে বিলীন হইয়া থাকিত। সে ছায়া তৎকালে তাহাকে দেখিত বটে ; কিন্তু বোধ হইত, তাপভয়ে যেন সে তাহার অঙ্গে মগ্ন হইয়া যাইত। ফলতঃ লোক সঙ্কটে পড়িলে গুরুজনের প্রতিও সম্মান করিতে ভুলিয়া যায়।

তৎকালে লৌহসূচী, ছায়াসূচী ও তাপসূচী, এই ত্রিবিধ সূচীর অন্তরালগত ত্রিকোণস্থান যেন তপঃপ্রভাবে বারাণসীর অসি, বরুণা ও গঙ্গা এই তিন তীর্থের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের ন্যায় অতি পবিত্র হইয়াছিল। মূর্ত্তি-বর্জ্জিতা, শ্যামা ও শুক্লা এই ত্রিবিধ বর্ণের সূচীরূপিণী নদীদ্বারা পরিখাযুত ত্রিকোণ-স্থান দিয়া যে বায়ু বা ধূলিজাল যাতায়ত করিত, তাহারাও পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হে রঘুনন্দন! এত কালের পর সূচী সম্প্রতি স্বয়ং প্রত্যগাত্ম বিচার করিতে করিতে পরমকারণ পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। তাহার সেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বিষয়ে কেহই উপদেষ্টা বা গুরু ছিল না। মাত্র আত্মবিচার করিতে করিতেই তাহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ফল কথা, নিজেই যদি আত্মবিচার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর অন্য গুরুর আবশ্যক হয় না। নিজকৃত আত্মবিচারই পরমোত্তম গুরু বলিয়া পরিজ্ঞেয়।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অনন্তর সূচীর তপস্যাকাল আরও এক সহস্র বর্ষ অতীত হইল। তখন ব্রহ্মা নভস্তল হইতে অবতীর্ণ হইয়া সূচীকে কহিলেন,—বৎসে! তুমি বর গ্রহণ কর।

তখন সূচী ব্রহ্মার এই কথার কোনই উত্তর দিতে পারিল না; কেন না, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, সে কেবল জীবকলাতেই অবস্থিত; সুতরাং সে কালে সূচী উত্তর করিতে না পারিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিল,—আমি ত পূর্ণস্বরূপা হইয়াছি। আমার কোন সন্দেহই নাই; সুতরাং বর লইয়া আমি কি করিব? আমি শান্ত হইয়াছি, আমার নির্ব্বাণপদ অধি-

গত হইয়াছে। আমি কেবল নিরবচ্ছিন্ন আত্মসুখেই বাস করিতেছি। যে কিছু জ্ঞাতব্য, সকলই আমি জানিয়াছি। আমার সকল সন্দেহজাল কাটিয়া গিয়াছে। আত্মবিবেক বিকসিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বিষয়ান্তরে প্রয়োজন কি? আমি যেমন আছি, তেমনই থাকিব। আমি পরমার্থ-স্বরূপা হইয়াছি; খাঁটি সত্য ত্যাগ করিয়া অন্য কৃত্রিম বা মিথ্যা বিষয় লইয়া আমার প্রয়োজন কি? স্বীয় সঙ্কল্প-সমুত্থিত বেতাল কর্তৃক বালিকার ন্যায় এত কাল আমি অবিবেক দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে আত্ম-বিচারণায় আমার ঐ অবিবেক প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। অধুনা ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কোন বিষয়েই আমার কোনই প্রয়োজন দেখি না।

সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়-বিরহিতা সূচী উল্লিখিতরূপে স্থিরনিশ্চয় হইয়া তূষ্ণী-ম্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাব-নিয়ামক ঈশ্বর-সঙ্কল্পের সহচর পিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে তথাবিধ বিষয়বিরক্ত দেখিয়া প্রসন্নমনে পুনরায় বলিলেন,—বৎসে! তুমি বর গ্রহণ কর। কিয়ৎকাল ভূতলে থাকিয়া বিবিধ ভোগ উপভোগ করত পরে তুমি পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আমি তোমায় যাহা কহিতেছি, ইহা নিয়তিরই নিশ্চিত অলঙ্ঘ্য নিদেশ বলিয়া বিদিত হইবে। ঐ নিয়তিকে অন্যথা করিবার শক্তি মাদৃশ ব্যক্তিরও নাই। হে উত্তমে! এই তপস্যার বলে তোমার সঙ্কল্প সফল হউক। আবার তুমি হিমাচল-গহনে গিয়া বিশাল রাক্ষসীদেহ ধারণ কর। বৎসে! যে দেহ হইতে তোমার বিয়োগ ঘটিয়াছিল, বীজমধ্য-গত অঙ্কুরের বিশাল বৃক্ষতা প্রাপ্তির ন্যায় তুমি আবার তোমার সেই বিশাল দেহ লাভ করিবে। তুমি অধুনা বীজস্বরূপে বিরাজ করিতেছ; জল-সেকে অঙ্কুর হইতে যেমন লতার উৎপত্তি হয়, তেমনি তোমার এই সূচী-দেহ হইতে বাসনাবলে সেই দেহ জন্মিবে। তুমি যে কিছু বেদ্য বিষয় বিদিত হইয়াছে; এজন্য প্রাণিসমাজের কাহারই কোন বাধা বিধান করিবে না। শারদীয় অভ্রমণ্ডলীর ন্যায় কেবল তুমি অন্তঃ-শুদ্ধা ও স্পন্দবতী হইয়া রহিবে। তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানরূপে অবিশ্রান্ত ধ্যান-নিরতা হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যান-ধারণার আধারস্বরূপে অবস্থান করিয়া বায়ুস্বভাববৎ কেবল দেহ-পরিস্পন্দে বিলসিত হইতে থাকিবে। হে পুত্রি!

যদি তুমি কখন নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে সমুত্থিত হও, তাহা হইলে রাক্ষসজন-সমুচিত অবৈধ হিংসাদি ব্যাপার হইতে সতত বিরত থাকিয়া মাত্র ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য ন্যায়ানুসারে জীবহিংসা করিতে থাকিবে। তুমি জীবন্মুক্ত রহিবে; তাই লোকসমাজে তোমার স্বীয় বিবেকের পালনকর্ত্রী ন্যায়বৃত্তি নিশ্চলা থাকিবে।

ব্রহ্মা সূচীকে এই প্রকার বরদান করিয়া গগনতলে গমন করিলেন। অনন্তর সূচী চিন্তা করিল—তাই ত, ইহাতে আমার ক্ষতি কি? ব্রহ্মা যাহা কহিলেন, আমার তাহাই ঘটুক। কমলযোনির কথা অন্যথা করিবার আমার আবশ্যক নাই।

সূচী এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে আপনার পূর্ব্ব-দেহ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইল। সূচী প্রথমে প্রাদেশমাত্র-পরিমিত দেহ ধারণ করিল। পরে হস্তপ্রমাণ, তৎপরে বাহুদ্বয়-পরিমিত, অনন্তর তরুশাখাসদৃশ এবং সর্ব্ব-শেষে মেঘমালাপ্রতিম হইয়া উঠিল। এইরূপে সেই সূচী নিমেষকাল মধ্যে সঙ্কল্পিত শাখীর বীজাঙ্কুরাদিবৎ ক্রমে ক্রমে বিশাল বপু ধারণ করিল। রাক্ষসীর পূর্ব্বতন দেহে যেমন যেমন ইন্দ্রিয়নিচয় ও সেই সেই ইন্দ্রিয়পুঞ্জের শক্তিসমূহ ছিল, এক্ষণে সে সকল অবিকল আবির্ভূত হইল। সঙ্কল্প-কল্পিত পাদপের পুষ্পরাশির ন্যায় তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও তৎকালে অবিকল সমুৎপন্ন হইল।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বর্ষাকাল আসিলে সূক্ষ্মাকৃতি মেঘলেখা যেমন বিশাল ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই সূক্ষ্ম সূচী পুনরপি বিশাল বিকট কর্কটী রাক্ষসী-তনু ধারণ করিল। ভুজঙ্গের কঞ্চুকপরিহারের ন্যায় রাক্ষসী তখন আত্মসাক্ষাৎকার নিবন্ধন তদীয় পৌর্ব্বকালিক বিপুল রাক্ষস-ভাব পরিত্যাগ করিল। রাক্ষসী বদ্ধপদ্মাসনে থাকিয়া বিশুদ্ধ সম্বিদ্ অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইল এবং সেই হিমগিরিশিখরেই গিরিকূটবৎ নিশ্চল দেহে অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর ছয় মাস কাল অতীত হইবার পর রাক্ষসী তাহার সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইল। মনে হইল, যেন বর্ষাকালীন গভীর জলদ-নিনাদে শিখণ্ডিনী কামাবেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন তাহার বহির্মুখী বৃত্তি প্রকাশ পাইল। তাহাতে রাক্ষসীর ক্ষুধা-ক্লেশ অনুভূত হইতে লাগিল। যতক্ষণ দেহ, ক্ষুধাদি-স্বভাব তত কালই রহিবে, সে কাল মধ্যে সে স্বভাব কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে।

এইবার ক্ষুধাতুর অবস্থায় রাক্ষসীর ভাবনা হইল, আমি এখন কাহাকে গ্রাস করি? আমি ত অন্যায় ক্রমে পরের জীবন ভক্ষণ করিব না। কেননা, যাহা অনার্য্য ও অন্যায়ভাবে উপার্জ্জিত, তাহা ভোজন করা অপেক্ষা দেহীদিগের মরণও আমার নিকট মঙ্গল বলিয়া মনে হয়। আমি যদি ন্যায়ানুমোদিত গ্রাস সংগ্রহ করিতে না পারি, আর তাহাতে যদি আমার মরণও ঘটে, তবে তাহা ন্যায়-বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু অন্যায় ক্রমে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিলে সে খাদ্য বিষে পরিণত হয়। যাহা জন-সমাজ-সম্মত ন্যায়তঃ উপার্জ্জিত নয়, তাহা ভক্ষণে আমার কি ফল সাধিত হইবে? বস্তুতঃ আমার জীবনে বা মরণে ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই দেখি না। কে আমি? আমি ত মনোমাত্র ছিলাম; কিন্তু সে মন এবং দেহপ্রভৃতি ত ভ্রমমাত্র বৈ কিছুই নয়। এদিকে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ভ্রম বলিয়া ত কিছুই একটা থাকে না; সুতরাং জীবন-মরণ-ভ্রম তখন আবার কোথায় রহিবে? বস্তুতঃ সকলই ত অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! রাক্ষসী এইরূপ ভাবিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সেই সময় শুনিতে পাইল, পবনদেব রাক্ষসীর রাক্ষসভাব পরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া গগনতল হইতে তাহাকে বলিতেছেন,—হে কর্কটি! তুমি এক্ষণে প্রস্থান কর এবং যাহারা মূঢ়লোক, তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া সত্বর তাহাদিকে প্রবোধিত কর। জানিও, মোহাচ্ছন্ন লোকদিগের উদ্ধার সাধন করাই মহৎ লোকদিগের কর্ত্তব্য। তুমি প্রবোধিত করিলেও যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইবে না, বুঝিতে হইবে, সে আপনার বিনাশার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিই ন্যায়ানুসারে তোমার ভক্ষ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

রাক্ষসী এই কথা শুনিয়া বলিল,—'আমি অনুগৃহীত হইলাম।' এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং ধীরে ধীরে সেই গিরিশিখর হইতে অবতরণ করিল। অনন্তর সত্বর পার্ব্বত্য অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া উপত্যকাতটে উপনীত হইল এবং নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-পাদদেশস্থ কোন এক কিরাত-নগরে প্রবেশ করিল। ঐ কিরাত-নগরে রাক্ষসী ভক্ষণ করিতে পারে, এরূপ অন্ন, পশু, মানুষ, বনতৃণ, ওষধি, মাংস, মূল, ফল, পানীয়, কীট, পতঙ্গ ও মৃগ প্রভৃতি প্রচুর খাদ্য ছিল। ঐ নগর হিমাচলের পাদদেশে বিরাজিত। অঞ্জনাচলনিভা নিশাচরী যখন সেই প্রদেশে গমন করে, তখন ঘোর রাত্রিকাল। সে রাত্রি নিবিড় তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! রাক্ষসী কর্কটী যখন সেই কিরাত-জনপদে পদার্পণ করিল, তখন রাত্রি ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার এত ঘন, যেন তাহা হস্তদ্বারা বিলক্ষণ ধরিতে পারা যায়। তখনকার সেই কৃষ্ণপক্ষীয় যামিনী যেন নীলবর্ণ মেঘপট পরিধান করিয়াছিল। গগনমধ্য হইতে চন্দ্রমা লুকায়িত হইয়াছিলেন। সে যামিনী এত কৃষ্ণকান্তি, যেন সম্মিলিত ঘন তমালবনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। ঘনতর অন্ধকারে যামিনী যেন পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিল। যামিনীর নেত্রকজ্জল যেন নানাদিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র শ্যামশোভা বিস্তার করিতেছিল। পার্ব্বত্য গ্রামসমূহের মধ্যে মধ্যে নিবিড়তর লতাজাল সন্নিবিষ্ট; তাহাতে অন্ধকারপুঞ্জ আবদ্ধ। সেই অন্ধকার নিবন্ধন যামিনীও যেন মন্থর গতি অবলম্বন করিয়াছিল। নগর মধ্যে প্রত্যেক গৃহে গৃহে—প্রতি চত্বরে চত্বরে দীপালোক জ্বলিতেছিল, তাহাতে মনে হইতেছিল, উহা যেন নবযৌবনা অভিসারিকা যুবতীর বিলাস-বিভ্রমের অনুকরণ করিতেছে। গৃহরাজির গবাক্ষ-বিবর হইতে দীপালোক-

চ্ছটা বাহিরে বিনির্গত হইয়া পুঞ্জীভূত অন্ধকারমধ্যে অপার শোভা ধারণ করিয়াছিল; তখন এত ঘনতর অন্ধকার যে, তাহাতে দীপালোকশ্রেণী মন্দীভূত হইয়াছিল।

তখন সেই অতি ভীষণা তামসী বিভাবরী যেন নিশাচরী কর্কটীর সঙ্গিনী সখীর ন্যায় প্রতিভাত হইল। ঐ সময় পিশাচীরা নানাস্থানে নৃত্য করিতে লাগিল। বেতালদল মত্ত হইয়া নরকঙ্কাল হরণে প্রবৃত্ত হইল। বিভাবরী যেন সেই বেতালগণের উদ্ধত চেষ্টা নিবারণ করিতে না পারিয়াই কাষ্ঠখণ্ডবৎ মৌনভাব অবলম্বন করিল। মৃগাদি জীবগণ যে যেখানে ছিল, সকলেই সুষুপ্ত হইয়া পড়িল। রজনী তখন ঘন নীহার-পটে আবৃত হইল। সর্ব্বত্র মন্দ মন্দ মারুত-সঞ্চারে হিমকণা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেখানে যতগুলি সরোবর ছিল, সে সকল মণ্ডুক-নিচয়ে সমাচিত হইল। বটবৃক্ষগুলি কাক সকলে পরিপূর্ণ হইল। অন্তঃ-পুরের অভ্যন্তরে দম্পতীদিগের রমণকালীন সমালাপ সমাকর্ণিত হইতে লাগিল। জঙ্গল সকল প্রলয়-পাবক-নিভ দাব-দহনে জ্বলিয়া ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষেত্রখণ্ড সমূহে পরিপক্ক শস্যশ্রেণী জলসেকে আর্দ্র হইয়া এবং ক্ষেত্র মধ্যে পতিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিল। নভস্তলে নক্ষত্ররাজি যেন স্পন্দিত হইয়া বিভক্তাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমীরণ সঞ্চারিত হওয়ায় দ্রুমরাজি হইতে বনভূমিতলে পুষ্প ও ফল সকল পতিত হইতে লাগিল। তরুকোটরে পেচককুল শব্দ করিতে লাগিল; সেই শব্দ শুনিয়া ভয়ে বায়স সকল নীরব হইল। গ্রামমধ্যে কোন কোন গৃহস্থ তস্কর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল।

এই সময় বনভূমি কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। পুরবাসীরা সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নগরবিভাগ একেবারেই নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল। বনপ্রদেশে বায়ু বহিতে লাগিল। বিহঙ্গমেরা নীড়নিচয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। গিরিগুহায় সিংহ সকল সুপ্ত হইল। কুঞ্জে কুঞ্জে হরিণগণ নিদ্রাবেশে ঢলিয়া পড়িল। আকাশদেশে হিমকণা সকল পতিত হইতে লাগিল। অরণ্য প্রদেশে রজনী যেন মৌনভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। রজনী তখন কজ্জল-জলদের মধ্যভাগের ন্যায় শ্যামশোভা ধারণ

করিল, কোথাও আবার কাচশৈলের উদরশ্রীর সহিত উপমিত হইতে লাগিল। রজনীর তাৎকালিক অন্ধকার পঙ্কপিণ্ডবৎ গাঢ় হইয়া উঠিল। সে অন্ধকার এত গাঢ়, যেন তাহা খড়্গাঘাতে ছেদন করা যায়। প্রলয়-পবনে বিক্ষুব্ধ হইলে অঞ্জনাচল যেমন শোভা ধারণ করে এবং প্রলয়কালে জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়া গেলে পঙ্কপরিপূর্ণ পর্ব্বত-মধ্যভাগ যেমন সুশোভিত হয়, সেই রজনী তেমনি প্রগাঢ় অন্ধকারে অপার শোভা ধারণ করিল। সে কালে সেই রজনী অঙ্গারকোটরের ন্যায় ঘন শ্যাম-শোভায় শোভিতা, প্রগাঢ় অঞ্জনের ন্যায় সুন্দরচ্ছবি, অজ্ঞান-নিদ্রার ন্যায় নিবিড়তরা এবং ভৃঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় নির্ম্মল নীল কান্তিশালিনী হইয়া উঠিল।

তৎকালে সেই ভীষণ রজনীতে সমস্ত নাগরিক জন প্রসুপ্ত হইলে কিরাত-নগরের বিক্রম নামক কোন এক উদারচেতা রাজা স্বীয় মন্ত্রীর সহিত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দস্যু-তস্করাদির বধ-সাধন-বাসনায় বীরবেশে ঘোরতর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধীরপ্রকৃতি রাজা ও মন্ত্রী সেই ঘন ঘোর অন্ধকার-রাত্রিতে অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বেতাল দর্শনে উন্মুখ হইয়া অরণ্য মধ্যে চলিতে লাগিলেন। রাক্ষসী কর্কটী তখন তাঁহা-দিগের উভয়কে বনে বিচরণ করিতে অবলোকন করিল।

তখন রাক্ষসী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অদ্য আমি ভাগ্য বশতঃ ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হইলাম। এই দুই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূঢ়; আত্মতত্ত্ব বিষয়ে ইহাদের কিছুই অভিজ্ঞতা নাই। ইহাদের দেহ নিশ্চিতই ভারভূত। মূঢ়জন কেবল ইহলোকে আত্মবিনাশের জন্য এবং পরলোকে দুঃখ-ভোগের নিমিত্তই জীবিত থাকে; সুতরাং তথাবিধ ব্যক্তিকে সযত্নে বিনাশ করাই বিধেয়। বিশেষতঃ যাহা অনর্থ, তাহা অধিক দিন পোষণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় জন যখন আপনার আত্মদর্শনে অক্ষম, তখন তাহার জীবন কিম্বা মরণ উভয়ই সমান। বরঞ্চ যদি মৃত্যু ঘটে, তবে তাহাতেই তাহার অভ্যুদয়; কেননা, মরণের পর আর পাপ সঞ্চয় হয় না। আর যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে পাপার্জ্জনেই তাহার প্রবৃত্তি হয়। সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ কমলযোনি এইরূপ একটা নিয়ম করিয়া-

ছেন যে, যাঁহারা আত্মদর্শী মহাপুরুষ, হিংস্রজন্তুগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিবে না; পরন্তু যাহারা মূঢ় জন, তাহারাই হিংস্রদিগের ভক্ষ্য হইবে। অতএব এই দুই মূঢ় ব্যক্তি অদ্য আমার খাদ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাদিগকে অবশ্যই আমি ভক্ষণ করিব। নির্দ্দোষ আহার-সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই তাহা উপেক্ষা করে না। কাজেই আমারও এরূপ খাদ্য উপেক্ষ-ণীয় নয়। তবে কথা এই, যদি ইহারা সত্য সত্যই গুণসম্পন্ন মহাশয় পুরুষই হয়, তাহা হইলে ত ইহাদিগকে বধ করা আমার বিধেয় হইবে না এবং সেরূপ প্রবৃত্তিও আমার কিছুতেই জন্মিবে না; সুতরাং অগ্রে আমি ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লই, যদি সত্য সত্যই ইহারা তাদৃশ গুণশালী হয়, তবে আর ইহাদিগকে আমি কিছুতেই ভক্ষণ করিব না; কেননা, গুণবান্ ব্যক্তিকে হিংসা করা কিছুতেই আমা দ্বারা হইবে না। যিনি অকৃত্রিম সুখ চাহেন, যথার্থ কীর্ত্তি কামনা করেন, কিম্বা অখণ্ড আয়ু আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে গুণী জনগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য; সে অর্চ্চনায় যদি সমস্ত অভিমত বস্তুও অর্পণ করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ। আমার দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাও বরং সুখের মনে করি; কিন্তু তথাপি কখন গুনবান্ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিব না। কেননা, সাধুগণ আমার জীবন অপেক্ষাও চিত্ত-সুখ উৎপাদন করিয়া থাকেন। জীবন দান করিয়াও গুণী জনকে পালন করিতে হয়। গুণবান্ সাধুজনের সংসর্গ এক অপূর্ব্ব মহৌষধির ন্যায় প্রতিভাত; সেই মহৌষধির গুণে মৃত্যু যিনি, তিনিও মিত্র হইয়া থাকেন। আমি একটা সামান্য রাক্ষসী হইয়াও যখন গুণবান্ ব্যক্তির রক্ষা বিধানে উদ্যত, তখন অপর কোন্ লোক না সেই গুণী জনকে বিমল হারের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিবে? যে সকল সাধুপুরুষ উদার গুণে মণ্ডিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিহার করিয়া থাকেন, সেই ধরাতল-সুধাকর সাধুগণের সঙ্গ বশতই এই পৃথ্বী নিত্য নিরতিশয় শীতল হইয়া থাকে। গুণী জনকে তিরস্কার বা অবজ্ঞা করাই মরণ, আর তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করাই জীবন; এই ভূমণ্ডলে বাঁচিয়া থাকিয়া যদি গুণী জনের সঙ্গলাভ করা যায়, তবে তাহা-তেই স্বর্গ ও অপবর্গ ফল ঘটে। যাহা হউক, আমি এই সম্মুখাগত পদ্ম-

পলাশ-নয়ন পুরুষদ্বয়কে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি,—ইহা-দের জ্ঞানের সীমা কতদূর? প্রথমতঃ আমার বিচার্য্য বিষয় এই যে, ইহাদের গুণ আছে, কি নাই? যদি ইহারা গুণবান্ হয়, বা আমা অপেক্ষা অধিক গুণী হয়, তবে ত উত্তমই; আর যদি ইহাদের গুণ না থাকে, তাহা হইলে আমি ইহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব। অত্যধিক গুণের সম্ভাবনা বুঝিলে দণ্ড দান কিছুতেই করা হইবে না।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অনন্তর সেই রাক্ষস-কুল-কাননের মঞ্জরী-স্বরূপিণী রাক্ষসী কর্কটী, সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে মেঘমালার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গর্জ্জনের পর হুঙ্কার করিয়া রাক্ষসী কর্কশ-কণ্ঠে সেই রাজা ও মন্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল, যেন মেঘ-গর্জ্জনের পর তাহা হইতে করকা ও অশনি-পাত হইতে আরম্ভ হইল। রাক্ষসী কহিল,—রে রে মহামোহান্ধকারময় শিলাকোটরের কীটদ্বয়! কে তোরা এই অরণ্যরূপ আকাশের রবি-শশিরূপে আগমন করিতেছিস্? তোরা কি মহাবুদ্ধিশালী? অথবা তোরা দুর্ব্বুদ্ধি; তাই আমার গ্রাস-পথের পথিক হইয়া ক্ষণ মধ্যে মরণদশায় উপনীত হইতে চলিয়াছিস্!

রাজা উত্তর করিলেন,—ওহে ভূতযোনে! কে তুমি, কোথায় থাকিয়া কথা কহিতেছ? তোমার নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাও; নতুবা তোমার বাক্যমাত্রে কে ভয় করিবে? বল দেখি, অলিধ্বনি শুনিয়া কেহ কি কখন ভয় করিয়া থাকে? যাহারা প্রার্থনা-কারী লোক, তাহারা অভীষ্ট অর্থোপরি সিংহের ন্যায় মহাবেগে আপতিত হইয়া থাকে। তাই বলি, তুমি যদি প্রার্থিনী হও, তাহা হইলে বৃথা ক্রোধাড়ম্বর পরিত্যাগ কর এবং স্বীয়

সামর্থ্য প্রদর্শন করাও। হে সুব্রতে! তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ, ব্যক্ত কর; আমি তোমায় তাহা প্রদান করিতেছি! বৃথা ক্রোধ এবং গর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিজে ভীত হইয়াছ? আমি বলি, তুমি মায়াবলে সত্বর নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া মদীয় সম্মুখবর্ত্তী হও। দেখ, যাহারা দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি, তাহাদিগের কেবল বৃথা আত্মক্ষয় ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না।

রাজা এই কথা কহিলে, রাক্ষসী ভাবিয়া দেখিল, তিনি উত্তম কথাই কহিয়াছেন। তখন সে তাঁহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশের জন্য চঞ্চল হইয়া গভীর নিনাদ ও উচ্চ হাস্য করিল। কিঞ্চিৎ পরেই রাজা ও মন্ত্রী দেখিতে পাইলেন, একটা বিকটাকৃতি রাক্ষসী অট্টহাস্যের ঘন প্রভায় নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া ঘোর রবে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। তাহার বিশাল দেহ দেখিয়া বোধ হইল, উহা যেন প্রলয়-পয়োধরের বজ্র-নিষ্পিষ্ট অদ্রি-তটবৎ প্রতিভাত। রাক্ষসীর নেত্রদ্বয় যেন দুইটা বিদ্যুৎ এবং হস্তবলয় যেন বলাকা; সে তৎসমুদায় দ্বারা, অম্বরতল সমুজ্জ্বল করিল। রাক্ষসী তখন সেই ঘন ঘোর অন্ধকার স্বরূপ একার্ণবের মধ্যভাগে বাড়বানলের জ্বালার ন্যায় প্রতিভাত হইল। তাহার অতিপীবর গ্রীবা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ঘনঘটার আটোপের ন্যায় রাক্ষসী তখন গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসীর দশনের কটকটাশব্দে ভীত হইয়া নিশাবিচরণশীল চোর, দস্যু ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হাহাকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসীকে দেখিয়া মনে হইল, যেন ভূতল ও আকাশতলব্যাপী একটা প্রকাণ্ড কজ্জলস্তম্ভ প্রতিভাত হইতে লাগিল। রাক্ষসী ঊর্দ্ধকেশী, শিরালাঙ্গী, কপিলাক্ষী ও অন্ধকারময়ী। তাহার তাৎকালিক সেই আকৃতি যক্ষ, রক্ষ এবং পিশাচগণেরও ভয় ও অনর্থের হেতুভূত হইয়া উঠিল। রাক্ষসীর নিশ্বাস-মারুত যৎকালে নাসারন্ধ্র দিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাহার একটা বিকট ভাঙ্কার রব উত্থিত হইতে লাগিল। সে রবে তাহাকে আরও ভীষণ বলিয়া বোধ হইল। রাক্ষসীর মস্তকে মুষল, উদূখল, লহ ও শূর্প ছিল, সে গুলি তাহার শিরোভূষণরূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

রাক্ষসীকে দেখিয়া মনে হইল, যেন কল্পশেষে একটা বৈদূর্য্যমণিময় শৈল-শিখরস্থলী আবির্ভূত হইল। তদীয় বিকট হাস্যে দানবদল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। বোধ হইল, রাক্ষসী যেন সাক্ষাৎ কালরাত্রির ন্যায় সমুদিত হইল কিম্বা শরতের মেঘমালিনী ব্যোমাটবী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আগমন করিল। অথবা যেন মহামেঘাচ্ছন্ন ঘন কৃষ্ণ বিভাবরী মূর্ত্তিমতী হইয়া আবির্ভূত হইল, কিম্বা রাহু যেন রবি-শশীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শরীর ধরিয়া ধরাপৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসীর অসিতবর্ণ স্তনদ্বয় ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ এবং উহা লম্বমান মেঘযুগলের সহিত উপমিত। উদূখল ও মুষল প্রভৃতি ঐ স্তনদ্বয়োপরি হাররূপে সুশোভিত। রাক্ষসীর বিশাল বপু অঙ্গারকাষ্ঠে লাঞ্ছিত এবং অঙ্গারের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন। রাক্ষসীর বৃক্ষোপম বিশাল শিরাল ভুজযুগল তখন নিশ্চলভাবে বিরাজমান।

তৎকালে সেই বীরদ্বয়—রাজা ও মন্ত্রী, রাক্ষসীর তাদৃশ ভীষণ আকার দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তাঁহারা যথাপূর্ব্ব অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সদসদ্‌বিবেকশালী ব্যক্তির চিত্ত যাহাতে মোহগ্রস্ত হইতে পারে, সংসারে এমন বস্তু কিছুই বিদ্যমান নাই।

অনন্তর মন্ত্রী বলিলেন,—হে মহারাক্ষসি! তুমি যদি মহীয়সীই হও, তাহা হইলে, তোমার এই অত্যধিক সংরম্ভ বা কোপ প্রকাশ কি জন্য? দেখ, যাহারা লঘু ব্যক্তি, তাহারাই অতি সামান্য কার্য্যেও সমধিক সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, তুমি তোমার সংরম্ভ বা কোপ পরিত্যাগ কর; এরূপ ব্যবহার করা তোমার পক্ষে সুসঙ্গত হইতেছে না। দেখ, যাঁহারা ধীসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহারা ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াই স্বার্থ সাধনের জন্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে অবলে! আমাদের ধৈর্য্যরূপ বাতবেগে তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র মশক তৃণপর্ণবৎ কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! যাঁহারা যথার্থ প্রাজ্ঞ জন, কার্য্য সাধনের জন্য তাঁহারা কখন ক্রোধরূপ উপায় অবলম্বন করেন না; তাঁহাদের সমতা-স্বচ্ছ বুদ্ধি ও প্রাজ্ঞ-জনোচিত যুক্তি-তেই স্বার্থ সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যথোচিত ব্যবহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় হউক অথবা নাই হউক, ক্রোধ পরিহার করিয়া সমতা গুণ অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় এবং ইহাই মহানিয়তি নামে নিরূপিত। এ বিষয়ে

ভ্রান্ত জনোচিত ক্রোধের অবসর কৈ? যাহা হউক, তোমার অভিমত বিষয় কি? তুমি কোন্ বিষয়ের প্রার্থিনী, এক্ষণে তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ, বল। জানিও, অর্থী ব্যক্তি স্বপ্নেও কখন আমাদের নিকট হইতে অকৃতার্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

মন্ত্রী রাক্ষসীকে এই কথা কহিলে, রাক্ষসী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, অহো! এই দুই পুরুষসিংহের নির্ম্মল আচার ও অসাধারণ ধৈর্য্য একান্তই অপূর্ব্ব। ইহাদিগকে আমার যে সে লোক বলিয়া মনে হইতেছে না। এই পুরুষদ্বয়ের ব্যবহার আমার নিকট বড়ই চমৎকার বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাদের আলাপ শ্রবণে ও মুখ দর্শনেই অন্তঃকরণ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া দেয়। ভিন্ন ভিন্ন নদীনিচয়ের জলরাশি যেমন পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যায়, তেমনি বাক্য, বক্তৃ ও নয়ন সাহায্যেই ধীমান্‌গণের মনোগত ভাব পরস্পর একীভূত হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, মদীয় মনোগত ভাব প্রায় ইহাঁরা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং আমিও ইহাঁদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। ইহাঁরা কিছুতেই আমার বধ্য নহেন। ইহাঁরা আপনা হইতেই অবিনশ্বর; কেননা, আমার মনে লইতেছে, নিশ্চয়ই ইহাঁরা আত্মজ্ঞ পুরুষ হইবেন। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কদাচ ঈদৃশ মতি জন্মিতে পারে না এবং জনন-মরণ প্রত্যয় অপগত না হইলে কখনই এরূপ নির্ভীকতা হয় না। অতএব আমার যে কিছু সন্দেহ সমুদিত হইতেছে, আমি এক্ষণে ইহাদিগকে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করি। প্রাজ্ঞ জনকে সম্মুখে পাইয়া যাহারা সন্দিগ্ধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া না লয়, তাহারা নিশ্চয়ই নরাধম।

রাক্ষসী এইরূপ চিন্তা করিবার পর অকাল-প্রবর্ত্তিত প্রলয়ের ন্যায় আপনার বিকট হাস্য-রব সম্বরণ করিয়া বলিল,—ওহে বীরবর নিষ্পাপ নরদ্বয়! কে তোমরা? তোমাদের পরিচয় প্রকাশ করিয়া বল। তোমাদিগকে দেখিয়া মদীয় মৈত্রীভাব সমুদিত হইয়াছে; বস্তুতঃ নির্ম্মল-চিত্ত ব্যক্তিবর্গের দর্শন মাত্রে সকলেরই মিত্রতা জন্মিয়া থাকে।

মন্ত্রী উত্তর করিলেন,—অয়ি রাক্ষসি! এই যে আমার সমভিব্যাহারী পুরুষ, ইনি কিরাতদিগের রাজা। আর আমি ইহাঁর মন্ত্রী। আমরা

তোমার ন্যায় দুষ্ট হিংস্র জনগণের নিগ্রহ করিবার জন্য এই রাত্রিযোগে অরণ্যপথে যাত্রা করিয়াছি। রাত্রিদিন দুর্ব্বৃত্ত প্রাণিগণের নিগ্রহ সাধন করাই রাজকীয় প্রধান ধর্ম্ম। যাহারা আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, অনল-ব্যাপ্ত ইন্ধনের ন্যায় তাহাদের বিনাশই বাঞ্ছনীয়।

রাক্ষসী তখন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—রাজন্! আপনি দুর্ম্মন্ত্রী দ্বারা পরিবৃত হইয়াছেন। যে রাজার মন্ত্রী দুষ্টবুদ্ধি, সে রাজা কখন রাজপদের যোগ্য হইতে পারেন না। রাজমন্ত্রী সজ্জন হইবেন। রাজা তাদৃশ সৎস্বভাব-সম্পন্ন মন্ত্রী লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। যিনি রাজা হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে বিবেচনাপূর্ব্বক সৎস্বভাবযুক্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। সুমন্ত্রী দ্বারাই রাজা আর্য্যপদবী লাভ করেন এবং তদীয় প্রজামণ্ডলীও রাজার ন্যায় আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যত কিছু গুণ আছে, তন্মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানই উত্তম গুণ বলিয়া বিখ্যাত। যে রাজা সেই অধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়েন, তিনিই প্রকৃত রাজনামের যোগ্য; আর যিনি অধ্যাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রজ্ঞ। প্রভুত্ব এবং সমদৃষ্টিত্ব, এই দুইটী বস্তু আত্মবিদ্যাবলেই লব্ধ হইয়া থাকে। সেই আত্মবিদ্যায় যিনি অভিজ্ঞ নহেন, তিনি কখনই রাজা বা মন্ত্রী হইতে পারেন না। এক্ষণে কথা এই যে, তোমরা যদি তাদৃশ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাধুস্বভাব হইয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল হইবে, আর যদি তাহার বিপরীত হও, তবে প্রজাবর্গের অনর্থজনক বলিয়া আমি তোমাদিগকে ভক্ষণ করিব। আমার নিকট হইতে তোমাদিগের নিষ্কৃতিলাভের একটী মাত্র উপায় আছে। সে উপায় এই যে, তোমরা যদি সদ্যুক্তি-সঙ্গত উত্তর দিয়া মদীয় প্রশ্ন-পঞ্জর বিদীর্ণ করিতে পার, তবে পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় আমার তাহাতে প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। আমি তোমাদিগকে সসম্মানে ছাড়িয়া দিব।

রাক্ষসী এই বলিয়া উভয়কেই তখন সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে রাজন্! ওহে মন্ত্রিন্! তোমরা আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান কর। আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি। আমার প্রার্থিত বিষয় তোমরা পূরণ করিয়া দাও। আমার প্রার্থনা পূরণ

করিবে বলিয়া পূর্ব্বে তোমরা অঙ্গীকারও করিয়াছিলে; সুতরাং আমি মনে করি, এ পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যিনি অঙ্গীকৃত অর্থ অর্পণ না করিয়া আত্মবিনাশ-কর দোষে লিপ্ত না হইয়া থাকেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! রাক্ষসীর ঐরূপ প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইয়া উহাকে প্রশ্ন করিতে আদেশ করিলেন। রাক্ষসী রাজার অনুজ্ঞা লইয়া রাজাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। হে রঘুনন্দন! রাক্ষসী-কৃত সেই সকল প্রশ্ন তুমি শ্রবণ কর।

রাক্ষসী প্রশ্ন করিল,—হে রাজন্! এক হইয়াও অনেক, ঈদৃশ কোন্ পরমাণুর অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সাগরে বুদ্বুদাবলীর ন্যায় বিলয় পাইতেছে? এরূপ কোন্ বস্তু আছে, যাহা আকাশ অথচ আকাশ নহে? কোন্ বস্তু কিঞ্চিৎ অথচ অকিঞ্চিৎ? আমি কে এবং তুমিই বা কে? তুমি কিরূপে অহম্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ? কোন্ জন গতিশীল হইয়াও গমন করে না? কে স্থিতিশীল না হইয়াও অবস্থান করে? কে চেতন-স্বরূপ অথচ পাষাণবৎ অচেতন? আকাশে যে বিচিত্র চিত্র দেখা যায়, উহা কোন্ ব্যক্তি করিয়াছে? কে বহ্নিত্বধর্ম্মী হইয়াও দাহ উৎপাদন করে না? কোন্ অবহ্নি হইতে সতত বহ্নি জন্মিতেছে?—

হে রাজন্! চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও তারা না হইয়াও কে তাহাদের অবিনাশী প্রকাশক? যাহা নেত্রগোচর নহে, এমন কোন্ বস্তু হইতে প্রকাশ প্রবর্ত্তিত হয়? যাহারা জন্মান্ধ এবং নিরিন্দ্রিয়, সেই সকল লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি এবং ঈদৃশ অন্যান্য বস্তু নিচয়ের উত্তম আলোক কি? এই যে আকাশাদি, ইহাদের জনয়িতা কে? সত্তার যে সত্তা, তাহা কে দিয়া থাকে? এই জগৎ-রত্নের কোশ কি? এই জগৎ কোন্ মণির কোশ?

কোন্ সূক্ষ্ম পদার্থ তমোরূপী অথচ প্রকাশক? কোন্ অণু পদার্থ আছে অথচ নাই? কোন্ সূক্ষ্ম বস্তু দূরে ও অদূরে অবস্থান করিতেছে? কে অণুতম হইয়াও মহাগিরিস্বরূপ? কে নিমেষ হইয়াও কল্প এবং কে কল্প হইয়াও নিমেষ? কি প্রত্যক্ষ অসদ্রূপ? কি চেতন হইয়াও অচেতন? কে বায়ু হইয়াও বায়ু নহে? কে শব্দ হইয়াও শব্দ নহে? কে সমস্ত অথচ কিছুই নহে? কে অহং অথচ অহং নহে? কোন্ বস্তু জন্মে জন্মে লাভ করিয়াও শত শত প্রযত্নে লাভ করিতে হয়? কোন্ বস্তু একেবারেই লাভ করা যায় না? কোন্ বস্তু পূর্ণ অথচ দুর্লভ? কোন্ ব্যক্তি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়াও একেবারেই আত্মা হারাইয়াছে? কোন্ সূক্ষ্মতম পদার্থ সুমেরু শৈলকে, এমন কি ত্রিভুবনকেও তৃণবৎ ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে? কোন্ অণু পদার্থের বিস্তারে শত যোজন পরিপূর্ণ হয়? এমন কোন্ পদার্থ আছে, যাহা অণু হইয়াও শত যোজন মধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না? এই জগৎরূপ বালক কাহার কটাক্ষে নৃত্য করিতেছে? কোন্ অণু পদার্থের উদরে এই ভূমণ্ডল নিখিল ভূধরসহ বিরাজ করিতেছে? কোন্ সূক্ষ্মতম পদার্থ সুমেরু অপেক্ষাও সমধিক স্থূলভাবাপন্ন হইয়াও স্বীয় সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করে নাই? এমন কোন্ অণু পদার্থ আছে, যাহা কেশাগ্রের শতভাগের একভাগস্বরূপ হইয়াও সুবিপুল শৈলের ন্যায় অত্যুন্নত? কোন্ অণু পদার্থ আলোক ও অন্ধকারের প্রকাশজনক প্রদীপস্বরূপ? কোন্ অণুপদার্থের উদরে অসংখ্য বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন জ্ঞানকণা বিরাজমান? কোন্ সূক্ষ্মতম বস্তু অত্যন্ত নিঃস্বাদু হইয়াও সতত অতি সুস্বাদু? কোন্ অণু সমস্ত ত্যাগ করিয়াও সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত? কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করিতে অক্ষম হইয়াও সর্ব্বজগৎ সমাচ্ছাদিত করিয়া বিরাজিত? এই জগৎ প্রলয়ে তিরোহিত হইলেও কোন্ অণু হইতে পুনরায় জন্মিয়া জীবিত হইয়া থাকে? কোন্ অণু অবয়ব-বিহীন হইয়াও সহস্র সহস্র কর-লোচন-শালী? কোন্ নিমেষ মহাকল্প ও কল্পকোটী-শতরূপে বিরাজিত? বীজে যেমন দ্রুমের অধিষ্ঠান, তেমনি কোন্ অণুতে সর্ব্বজগৎ অধিষ্ঠিত? সকল সৃষ্টিকালে সকল বীজ জগদাকারে প্রকটিত হইয়াও কোন্ অণুতে সতত অনুদিত

ভাবে অবস্থিত? এই কল্প বীজবৎ কোন্ নিমেষমধ্যে বিরাজমান? কারক-নিচয়ের ব্যাপার প্রবর্ত্তন না করিয়াও কে কারক হইয়া থাকে? কোন্ নেত্রবিহীন দ্রষ্টা দৃশ্য সম্পাদনের অর্থাৎ ভোগ্য সিদ্ধির জন্য আপন আত্মাকেই দৃশ্যরূপে পরিণত করিয়া বহির্দৃষ্টিতে ঐ আত্মাকেই দৃশ্যরূপে দর্শন করিয়া থাকে? কেই বা আপনার জ্ঞানে দৃশ্য সম্পাদন করিবার অনভিপ্রায়ে আপনাকে দৃশ্যবিহীন অখণ্ডিত দর্শন করিয়া দৃশ্যদর্শনে পরাঙ্মুখ হয়? কে আবার আপনাকে দৃশ্য ও দর্শন উভয়াকারে প্রকাশিত করিয়া থাকে? সুবর্ণে কটকাদি আরোপের ন্যায় কোন্ জন দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই ত্রিবিধরূপে আত্মাকে আরোপিত করে? জলরাশি হইতে ঊর্ম্মি প্রভৃতির ন্যায় কোন্ পদার্থ হইতে কোন কিছুই পৃথক্ নহে? কাহার ইচ্ছানুসারে জলরাশিতে তরঙ্গভাবের ন্যায় এ সকল পৃথগাকারে অনুভূত হয়? দিক ও কালাদিরূপে অনবচ্ছিন্ন অসৎ অর্থাৎ অস্থৌল্য হেতু অসৎকল্প হইয়াও যাহা সৎ, ঈদৃশ কোন্ এক পদার্থ হইতে এই দ্বৈত দৃশ্য জলরাশি হইতে দ্রবত্বধর্ম্মের ন্যায় পৃথক্ নহে? কোন্ ত্রিকালব্যাপী জন আত্মা, দর্শন ও দৃশ্য এই ত্রিবিধ জগৎকে সৎ ও অসৎস্বরূপে বীজবৎ অন্তরে ধরিয়া অবস্থিত? বীজের অন্তরে বৃক্ষের ন্যায় কাহার—কোন্ নিত্য সমরূপী ব্যক্তির অন্তরে এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগৎসমষ্টিরূপ বিশাল ভ্রান্তি বিরাজিত? কোন্ জন অনুদিতস্বভাব হইয়া এবং স্বীয় একরূপতা পরিহার না করিয়াও বৃক্ষ হইতে বীজের এবং বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় উদিত হয়?

হে রাজন্! মেরুপর্ব্বত কাহার নিকট মৃণাল তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, আবার কাহার ইচ্ছায় মৃণালসূত্র সুমেরু অপেক্ষাও সুদৃঢ়? ঈদৃশ কোন্ বস্তু আছে যে, তাহার অভ্যন্তরে তাদৃশ অসংখ্য মেরুমন্দরাদি ভূধরবৃন্দ বিরাজমান? কে এই অনেক চিন্ময় বিশ্বকে বিস্তার করিয়াছে? আর রাজা তুমি, তুমিই বা কোন্ সার-বস্তুতে সারবান্ হইয়া জনসমাজে উচ্চস্থান পাইয়াছ এবং প্রজাপুঞ্জের শাসন ও পালন কার্য্য সম্পাদন করিতেছ? আবার কাহার দর্শনেই বা তুমি বিমলদৃষ্টি লাভ করিতে পারিতেছ না অথবা সততই আত্মশান্তি প্রাপ্ত হইয়া নিত্যই সেই নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপে বিরাজ করিতেছ?

রাক্ষসী উল্লিখিত প্রশ্নগুলির অবতারণা করিয়া পরে রাজাকে আবার কহিল,—রাজন্! আপনি শীঘ্র আমার এই সংশয়গুলি খণ্ডন করিয়া দিউন। স্বাত্মাকার বৃত্তিরূপ চন্দ্রের কলাকলঙ্করূপ আবরণের ন্যায় মদীয় সংশয়রাশি বিগলিত হইয়া যাউক। আমার এই সংশয় সকল যাহার দ্বারা না সমূলে উন্মূলিত হইবে, সে কখনই পণ্ডিত-পদের বাচ্য নহে।

হে বুদ্ধিমান্ রাজন্ ও মন্ত্রিন্! তোমরা যদি আমার এই ক্রমিক প্রশ্নপরম্পরার প্রত্যুত্তর দিয়া মদীয় হৃদ্গত সংশয়রাশি সত্বর খণ্ডন করিতে না পার, তাহা হইলে অচিরেই তোমাদিগকে রাক্ষস-জঠরানলের ইন্ধনত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর তোমাদের এই সমগ্র জনপদও মদীয় উদরসাৎ হইয়া যাইবে। যদি প্রশ্নোত্তর করিতে পার, তাহা হইলে স্বরাজত্ব প্রতি-পন্ন হইবে। যদি না পার, তবে রাজ্যাদি কিছুই থাকিবার নয়। কেননা, আত্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অতিশয় ভোগেচ্ছাই সংক্ষয়ের হেতু হইয়া থাকে।

অনন্তর সেই রাক্ষসী অতি বিকটাকৃতি হইলেও তৎকালে এইরূপ জলদগম্ভীরস্বরে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া নির্ম্মল শারদ-জলদমালার ন্যায় মৌনভাব অবলম্বন করিল।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই মহারাক্ষসী কর্তৃক সেই মহানিশাকালে সেই মহারণ্য মধ্যে সেই সকল মহাপ্রশ্ন উত্থাপিত হইলে পর, রাজার সেই মহামন্ত্রী সেই সমুদায়ের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মন্ত্রী কহিলেন,—হে জলদ-সদৃশরূপিণি! তুমি শ্রবণ কর। কেশরী যেমন মত্ত করীন্দ্রকে বিদারণ করে, আমি তোমার প্রশ্নব্যূহ তেমনি

যথাক্রমে ভেদ করিয়া দিতেছি। অয়ি কমলাননে! তোমার ঐ ক্রমিক প্রশ্নভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলাম, তুমি পরমাত্মার কথাই কহিয়াছ। এ কথা প্রশ্নজ্ঞদিগের দুর্ব্বোধ্য নহে। পরমাত্মা অনাখ্যেয়। তিনি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের অগোচর বলিয়া চিন্মাত্র; সুতরাং তিনিই যথার্থ অণু-পদার্থ এবং তিনিই আকাশ অপেক্ষাও সুসূক্ষ্ম। বীজের উদরে বৃক্ষ-স্থিতির ন্যায় সেই চিৎস্বরূপ পরমাণুর অভ্যন্তরেই এই জগৎ কখন সৎ এবং কখন বা অসৎরূপে পরিস্ফুরিত হয়। অর্থাৎ প্রলয়ে অসৎ এবং সৃষ্টিকালে সৎ হইয়া থাকে। সেই যে সর্ব্বাত্মক অণু পরমাত্মা, তিনিই স্বভাবতঃ সৎস্বরূপ। এই জগৎ তদীয় সত্তার অধীনেই সত্তা প্রাপ্ত হয়। ফল কথা এই যে, জগতের যে সত্তা বা বিদ্যমানতা, তাহা সাক্ষাৎ অনুভব-স্বরূপ চিৎসত্তার অধীন। সেই চিৎসত্তাই প্রকৃত সত্তা। জগতে যে সত্তার উপলব্ধি হয়, তাহার মূল কেবল আত্মচৈতন্য। সেই যে অণুর কথা কহিয়াছি, তাহা বাহ্য-শূন্য বলিয়া আকাশ এবং চিৎস্বরূপতা নিবন্ধন উহা অনাকাশ বলিয়া বিদিত। ঐ অণু ইন্দ্রিয়ের অতীত; তাই উহা অকিঞ্চিৎ বা কিছুই নহে অথচ উহাই আবার অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্নস্বরূপে বিরাজিত। সেই চিদণু আত্মা সর্ব্বাত্মক; তাই তিনি যখন সাক্ষাৎকৃত হয়েন, তখন মাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। ফলিতার্থ এই—যাহা কিছু সমস্তই সেই আত্মা; তদ্ভিন্ন অপর কিছুই নাই। সুবর্ণের অসত্য কটকাদির ন্যায় সেই একাদ্বয় চিদণুর প্রতিভাসই অসংখ্য উপাধিতে অসংখ্যরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক চিদণুর অসংখ্যত্ব আরোপ মাত্র। সুবর্ণের কটকাদি যেমন সুবর্ণই, তেমনি ঐ অণুও একই। সূক্ষ্মতা নিবন্ধন ঐ অণুকেই লক্ষ্য করা দুরূহ এবং উহাই পরমাকাশ নামে নির্ণীত।

ঐ অণু সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বস্বরূপ অথচ উহা মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও অতীত। উনি সর্ব্বাত্মক; তাই উনি সতত অশূন্য। সুতরাং উনি নাই বা নাস্তি, এরূপ বলিলে অসত্য বলা হয়। কেননা, 'আছে' অথবা 'নাই' এ কথা যিনি প্রকাশ করেন বা অনুভব করেন, তিনিও ত সেই আত্মা বৈ আর কিছুই নহেন। এমন কোনও প্রকার যুক্তি নাই, যাহা দ্বারা ঐ সৎ পদার্থের অসত্তা প্রতিপাদিত হইতে পারে। যেমন কোন

পেটিকা দিয়া কর্পূর ঢাকিয়া রাখিলে তদীয় গন্ধ দ্বারাই তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি ঐ সর্ব্বময় আত্মা প্রত্যক্রূপে আচ্ছন্ন রহিলেও প্রত্যক্ষ-গোচর হয়েন। সেই যে চিন্মাত্র অণু, তিনিই মনোরূপে থাকিয়া কিঞ্চিৎ এবং মনঃপরিচ্ছিন্নরূপ বলিয়া সর্ব্ব। যখন তিনি মনঃপরিচ্ছিন্ন হয়েন না, তখনই কিঞ্চিৎ নহেন অর্থাৎ অকিঞ্চিৎ। তখন কেবল নির্ম্মলরূপেই তাঁহার অবস্থান। সেই অণুই এক ও সর্ব্বভূতের আত্মরূপে অনুভূত বলিয়া অনেক। এই ত্রিজগৎ তিনিই ধারণ করিতেছেন; তাই তাঁহাকে জগৎরত্নের কোশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই ত্রিজগৎ চিত্তরূপ মহা-সাগরের ঊর্ম্মি বৈ আর কিছুই নয়; সুতরাং চিত্ত হইতে এই ত্রিজগৎকে পৃথক্ বলা চলে না। দ্রবত্ব বশতঃ সমুদ্রে যেমন আবর্ত্তের উদয় হয়, সেই চিদণুবিশিষ্টতা-বশে চিত্ত হইতে তেমনি প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞানুরূপ জগৎ জন্মিয়া থাকে। তাই এই জগৎ প্রজ্ঞাতেই পৃথক্রূপে প্রতীত হয়। সেই অণু, চিত্ত-ইন্দ্রিয়াদির অলভ্য বলিয়া শূন্যস্বরূপ এবং তিনি ব্যোমরূপী হইয়াও স্বীয় সম্বেদন দ্বারা লভ্য; সুতরাং অশূন্য। দ্বৈত ভানে তিনিই তুমি ও আমি ইত্যাদিরূপে সমুদিত হয়েন। অদ্বৈত ভানে ঐ সকল ভেদ কিছুই থাকে না। তৎকালে সেই একমাত্র বোধময় বৃহদ্বপুঃ আত্মাই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সম্বেদন দ্বারা 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদিরূপ ভেদ বিদূরিত করিয়া দিতে পারিলে, কেবল আত্মাই তখন সর্ব্বভাবে প্রকটিত হয়েন। সেই চিদণু গমন করেন না বটে, অথচ তিনি যোজন শত ব্যাপিয়া গমনশীল হইয়া থাকেন। স্বপ্নবৎ কল্পনাবলে সেই যোজন সকল তাঁহারই অন্তরে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়। সেই চিদণু দেশ ও কালের সত্তা-স্বরূপ আকাশকোশের অন্তরে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি গমন করিয়াও গমন করেন না এবং প্রাপ্ত হইয়াও প্রাপ্ত হয়েন না। যে কিছু গম্যস্থান, সকলই সেই চিদণুর শরীরস্থ; সুতরাং তাঁহার আর গমন করিবার স্থান কোথায়? মনে করিয়া দেখ, মাতা কি আপনার ক্রোড়গত সন্তানকে অন্যত্র কোথাও অবলোকন করিয়া থাকেন? যাঁহার অন্তরস্থ মহাদেশ সকলেরই গম্য, সেই সর্ব্ব-কর্ত্তার অন্তঃস্থ অণু কিরূপে কোথায় যাইবেন? মুখদেশ আবৃত করিয়া কুম্ভকে স্থানান্তরে লইয়া গেলে, সেই কুম্ভ মধ্যস্থ

আকাশের যেমন কোথাও গমন বা স্থানান্তর হইতে আগমন কিছুই হয় না, তেমনি আত্মারও গমনাগমন কুত্রাপি নাই। ঐ অণুতে যখন চেতনের চেতনত্ব ও জড়ের জড়ত্ব উভয়ই অনুভূত হইয়া থাকে, তখন তিনি চেতন ও জড় উভয়ই।

হে রাক্ষসি! চেতন ও পাষাণ, এ উভয় ঐ চিন্ময়াকার একাদ্বয় আত্মারই সত্তা; সুতরাং তিনি চেতন হইলেও তাঁহার পক্ষে পাষাণ হওয়া অসম্ভব নহে। পরমাকাশের আদি নাই, অন্ত নাই; উহাতে যে এই বিচিত্র ত্রিজগৎ-চিত্র, তাহা এই চিন্মাত্র পরমাত্মারই কৃতিত্ব অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃকই কৃত; পরন্তু ঐ জগৎচিত্রে কেবল মিথ্যাজ্ঞানেরই বিস্তৃতি; সুতরাং উহা অকৃতরূপেই প্রতিভাত। বহ্নির সত্তা আত্মসম্বেদনেই অনুভূত। তাই বহ্নিরূপী পরমাত্মা সর্ব্বগামী হইয়াও অদাহক। বহ্নি যেমন প্রকাশক, আত্মসম্বিৎও তেমনি সর্ব্ব-প্রকাশক; এই জন্য সেই বহ্নি দাহক নহে। চিদণু পরমাত্মা অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য-সন্নিভ ও গগন অপেক্ষাও নির্ম্মল। অতি জ্বলন্ত চেতনাত্মা অগ্নি তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হয়েন। সেই একমাত্র চেতন পরমাত্মাই চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রকাশ-পদার্থের অবিনাশী প্রকাশক। এই আত্মপ্রভা মহাপ্রলয়ের অনন্ত জলদাবরণেও আবৃত হইবার নহে। চক্ষুরিন্দ্রিয় ঐ আত্মাকে লক্ষ্য করিতে পারে না; তিনি হৃদয়রূপ গৃহের প্রদীপস্বরূপ, নিখিল বস্তুর সত্তাপ্রদ এবং অনন্ত পরমোত্তম প্রকাশমূর্ত্তি। এই ইন্দ্রিয়াতীত আত্মাণু হইতেই আলোক আবির্ভাব হয়। যিনি লতা, গুল্ম, অঙ্কুর ও অন্যান্য নিরিন্দ্রিয় পদার্থের পোষণকর্ত্তা, সেই অনুভবাত্মক পরমাত্মাই সেই সেই পদার্থের উত্তম আলোক। কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা ও জগৎ প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ, সমস্তই আত্মবেদনে বিরাজিত ও বিজ্ঞাত; সুতরাং একমাত্র আত্মবেদন বা চৈতন্যই স্বামী, কর্ত্তা, পিতা ও ভোক্তা। যে হেতু সকলই আত্মা, সেই হেতু ঐ গগনাদি নিখিল জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্বের কারণ। সেই পরমাত্মরূপ অণু, স্বীয় অণুত্ব পরিহার না করিয়াই জগৎ-রত্নের পেটিকারূপে বিরাজমান। জগৎরূপ সম্পুটে থাকিয়া আত্মা প্রতীতির বিষয় হয়েন, তাই এই জগৎ সেই পরমাত্ম-মণির এবং পরমাত্ম-মণি এই জগতের কোশস্বরূপে বিদ্যমান। তিনি একান্ততই দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং

তিনিই পরম সূক্ষ্ম। পরমাত্মা অতীব দুর্ব্বোধ্য; তাই তিনি তমঃ এবং চিন্মাত্র বলিয়া প্রকাশ। তিনি সম্বিৎস্বরূপী বলিয়াই তদীয় অস্তিত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাপ্ত হয় না; তাই তিনি নাই অর্থাৎ তাঁহার সত্তা উপলব্ধ হয় না। দূরে ও নিকটে তিনিই অবস্থান করেন। অতীন্দ্রিয় বলিয়া দূরে তাঁহার অবস্থান এবং চিৎস্বরূপ বলিয়া অতি নিকটে অর্থাৎ হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান। তিনি অণু বটেন, অথচ সর্ব্ব-সম্বেদনতা বশত তিনি মহাশৈলস্বরূপে বিদ্যমান। সকলেই তাঁহাকে অপরোক্ষভাবে 'অহং' 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞানে পুরোবর্ত্তী মহাশৈলবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে। এই যে প্রকাশমান জগৎ, ইহা তাঁহারই সম্বিত্তি বা জ্ঞান; সুতরাং তাঁহারই অভ্যন্তরে সুমেরু প্রভৃতির অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যে কারণে সূক্ষ্মতম আত্মচৈতন্যের একাংশে মেরুমন্দরাদির অস্তিত্ব অনুভব-গম্য হয়, সেই কারণেই পরম সূক্ষ্ম পরমাত্মা অণু হইয়াও মহামেরু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। তিনি যে কালে নিমেষাকারে প্রভাসিত হয়েন, তখন তিনি নিমেষ। মনোমধ্যে যেমন কোটি-যোজনায়ত মহাপুর দৃষ্ট হয়, কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাসও তেমনি মনোমধ্যেই নিমেষাকারে অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন কোন স্বল্পপ্রসর মুকুরোদরে মহানগর প্রতিভাসিত হয়, কল্প তেমনি নিমেষ মধ্যেও সমুদিত বা প্রভাসিত হইয়া থাকে। নিমেষ, কল্প, শৈল, নগর, সকলই যখন দুর্জ্ঞেয়স্বভাব চৈতন্যের অন্তর্ভূত, তখন আর দ্বৈতই বা কি এবং অদ্বৈতই বা কি? সকলই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বৈ কিছুই নয়। 'আমি ইহা পূর্ব্বে করিয়াছি' মনে এইরূপে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হইয়া থাকে, অতএব কল্পও নিমেষ এবং নিমেষও কল্পাকারে প্রতিভাসিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নবিভ্রম। কাল দুঃখদশায় সুদীর্ঘ এবং সুখাবস্থায় অত্যল্প বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষের ন্যায় অনুভূতির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখা উচিত যে, নিমেষ, কল্প, দূর কিম্বা অদূর, এ সকল বস্তুগত্যা নাই; সকলই সেই চিদণুর প্রতিভাস বৈ আর কিছুই নয়। কনকে যেমন হারকেয়ূর প্রভৃতি, সেই সত্যাত্মায় তেমনি ঐ সকলের অবস্থিতি। চিৎ ও দেহ যেরূপে

পরস্পর অভিন্ন, আলোক ও অন্ধকার, দূর ও অদূর এবং ক্ষণ ও কল্প, এ সকলও সেইরূপে ভেদ-বর্জ্জিত। তিনি ইন্দ্রিয়গণের সার ; সুতরাং তাঁহাকেই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বলা হয়। তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত নহেন ; অতএব তিনি আবার অপ্রত্যক্ষ। অথবা তিনিই দৃশ্যরূপে সমুদিত ; তাই তিনি প্রত্যক্ষ। যেমন যতকাল বলয় জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, ততকাল সুবর্ণজ্ঞান থাকে না, তেমনি যে পর্য্যন্ত দৃশ্যজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ দর্শন বা আত্মচৈতন্য জ্ঞান থাকে না। বলয়জ্ঞান চলিয়া গেলে যেমন কনক-জ্ঞান বদ্ধমূল হয়, তেমনি কল্পিত দৃশ্যসমূহ-জ্ঞানের অভাব হইলেই সেই এক অদ্বয় পরম নির্ম্মল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বত্ব হেতুক সৎস্বরূপ এবং তিনি দুর্লক্ষ্যত্বহেতুক অসৎস্বরূপ। আত্মত্বরূপে সেই আত্মা চেতন এবং জগৎস্বরূপত্ব-রূপে তিনি অচেতন। এই যে বায়ুর ন্যায় চঞ্চল জগৎ, ইহা চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। মৃগতৃষ্ণা যেমন প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণ, চৈতন্যের প্রাচুর্য্য তেমনি অদ্বৈত আর চৈতন্যের প্রচ্ছাদনই জগৎ বলিয়া অভিহিত। দিনকর-কিরণের যে কাঞ্চনকণা নির্ম্মাণ, তাহাতে যেমন অস্তি-নাস্তি এই দ্বিবিধ ভাব বিদ্যমান, তেমনি ব্রহ্মে যে দ্বৈতসৃষ্টি, তাহাও 'অস্তি' 'নাস্তি' এই দ্বিবিধ ভাবে পরিচিত। গগনে কিরণ-কণাগুলিকে অনেক সময় কাঞ্চন-কণা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে, সেই যে ভ্রম তাহার মূল অজ্ঞান। এইরূপে চিন্ময় আত্মায় অজ্ঞানের বিলাসে ভ্রান্তির মহাত্ম্যরূপ সৃষ্টিদর্শন হয়।

হে নিশাচরি! স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্ব-নগর ও সঙ্কল্প-কল্পিত পুরীর ন্যায় এই জগৎ অসৎ। বলিতে কি, ইহা একপ্রকার দীর্ঘ ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। জগতের মিথ্যাত্ববিধায়িনী যুক্তি বিষয়ে যে সকল লোক দক্ষ, তাঁহারা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। অজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের চিদাকাশে আর মিথ্যাসৃষ্টি সমুদিত হয় না। যাঁহাদের চিত্ত যুক্তিদ্বারা নির্ম্মলীকৃত হইয়াছে, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই এবং তাহার স্থায়িত্বও নাই। দর্শন বা জ্ঞানের ভেদক দৃশ্য। দৃশ্যজ্ঞান যখন বিলুপ্ত থাকে, তখন ভিত্তি ও আকাশের ভেদ-ভিন্নতা থাকে না। ব্রহ্ম হইতে সাধারণ তৃণ পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবেরই ইহা অনুভব-গম্য।

বীজের অন্তর্গত বৃক্ষ যেমন অতি সূক্ষ্ম বলিয়া আকাশ-নিভ, তেমনি ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত জগৎও চিদেকরূপতা নিবন্ধন ব্রহ্মসন্নিভ সূক্ষ্ম। এ তত্ত্ব পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ্য।

ওহে রাত্রিচরি! সেই আত্মা শান্ত, সর্ব্বময়, অজাত, অনাদি, অনন্ত, অদ্বয় ও দ্বন্দ্বাতীত। তিনিই সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে আভাসরূপে প্রকাশমান। তিনি ব্যতীত কিছুই আর নাই।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম সর্গ।

রাক্ষসী কহিল,—মন্ত্রিবর! আপনার কথিত পরমাশ্চর্য্য পবিত্র পরমার্থ-কথা শুনিলাম। অধুনা রাজীব-নয়ন রাজা আমার অবশিষ্ট প্রশ্ন-গুলির উত্তর প্রদান করুন।

রাজা কহিলেন,—রাক্ষসি! তত্ত্বদর্শীরা যাঁহাকে জগৎ প্রত্যয়ের নিবৃত্তিস্বরূপ উত্তম প্রত্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাহা নিখিল সঙ্কল্পত্যাগ-স্বরূপ ও নিখিল সঙ্কল্পের বিরতিস্থল, তন্মাত্রনিষ্ঠতারূপ চিত্তসংযমের যাহা ফলস্বরূপ, যাঁহার মায়িক সঙ্কোচ ও মায়িক বিকাশ বশতঃ জগতের উদ্ভব ও অভাব সংঘটিত হইতেছে, যিনি বাক্যের অতীত, বেদান্ত-বচনের চরম লক্ষ্য এবং 'অস্তি' 'নাস্তি' এতদুভয়ের মধ্যগত, অথচ যাঁহার স্বরূপে ঐ উভয় সন্নিবিষ্ট, এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ যাঁহার চিত্তময়ী লীলা এবং যিনি বিশ্বাত্মা অথচ যাঁহার পরিচ্ছিন্নতা অবিলুপ্ত, হে ভদ্রে! আমার ধারণা হইতেছে, তুমি সেই সনাতন ব্রহ্মের কথাই কহিয়াছ। ঐ নিত্য ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম; তাই তিনি অণু। তিনি আপনাকে বায়ুভাবে দেখিয়া মায়ার বিবর্ত্তনে বায়ুরূপে পরিণত হইয়াছেন; সুতরাং উহা অন্যথা জ্ঞানরূপ ভ্রান্তিরই মহিমা বৈ আর কিছুই নহে। ফলে, তিনি পরমার্থ-দর্শনে অবায়ু এবং ভ্রান্তিদৃষ্টিতে বায়ু। বস্তুগত্যা শুদ্ধ চেতন ব্যতীত বায়ু কোন অন্য পদার্থ

নহে। এইরূপ, শব্দসম্বেদন দ্বারা তিনিই শব্দ এবং উহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া অশব্দ। ফল কথা,পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে তিনি অশব্দ। সেই চিদণু সর্ব্ব-স্বরূপ হইয়াও কিছুই নহেন, অর্থাৎ অভিন্ন বা অদ্বৈত। এইরূপ, অহম্ভাব নিমিত্ত তিনি অহং এবং অহম্ভাব-বিরহিত বলিয়া তিনি অহং নহেন। যে কিছু বাস্তব বা অবাস্তব বৈচিত্র্য, তিনিই তৎসমস্তের জনক এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহারই যে অবিদ্যার ভ্রান্তিপ্রতিভা, তাহা অবাস্তবের এবং যাহা নৈসর্গিক প্রতিভা, তাহা বাস্তবের কারণ। শত শত যত্ন করিয়া সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে হয়। তিনি অহংরূপে উপলব্ধ হইয়াও যথার্থ পক্ষে অলব্ধ। তাঁহাকে যে উল্লিখিতরূপে লাভ করা, তাহা অলাভ করার মধ্যেই গণনীয়। যতদিনে না মূলাজ্ঞান-হর বোধের উদয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জন্মরূপ বসন্ত কালের আবির্ভাবে সংসাররূপ ব্রততির বিকাশ হইবেই হইবে। যে অণুরূপ ব্রহ্মের আকার চিৎসত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, সেই অণু সাকারভাব লাভ করিবার পর দৃশ্যসদৃশ হয়েন; এই জন্যই স্বনিষ্ঠ ও জীবিত রহিলেও তাঁহাকে আত্মাহারা বলা যায়। এই যে সম্বিদণু বা সূক্ষ্ম চিদ্ব্রহ্ম, ইনিই ত্রিভুবনকে তৃণ-সন্নিভ ও সুমেরুকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াছেন। ঐ বিমল চিদ্‌ব্রহ্মই আপনাকে বাহিরে ও অন্তরে মায়াময়রূপে দর্শন করেন। ফলতঃ চিদণুর অন্তরে যে যে দৃশ্য রহিয়াছে, বাহিরেও সেই সেই দৃশ্য বিরাজ করিতেছে। ইহার উদাহরণস্থলে অনুরাগী লোকদিগের সঙ্কল্প-কল্পিত অঙ্গনালিঙ্গনের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। সৃষ্টির আদিম অবস্থায় সর্ব্বশক্তিশালী নিত্য চিৎ যে ভাবে সমুদিত হয়েন, পরেও তিনি সেইভাবে লক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যে সেই প্রাথমিক সঙ্কল্প, তাহাই নিয়তিনামে নিরূপিত হয়। চিতের আবির্ভাব যখন যে ভাবে হয়, তখন তিনি সেই বিষয়ই অবলোকন করেন; কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। বালকদিগের মনকেই এ বিষয়ের অন্যতম উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায়। শত যোজন বলিয়া কথা কি, সূক্ষ্মতম চিদণু দ্বারা সমগ্র বিশ্বই পরিপূরিত রহিয়াছে। উল্লিখিত অণু সর্ব্বগামী অনাদি ও রূপাদি-রহিত; লক্ষ লক্ষ যোজনেও তিনি পরিমিত হয়েন না। যেমন শঠ লম্পট লোকেরা কটাক্ষ-বিক্ষেপাদি দ্বারা যুবতীদিগকে বশীভূত করিয়া

লয়, বিশুদ্ধ চিদাত্মা তেমনি উপাধি-চেষ্টানুসারে এই সশৈল তৃণাদিময় সমস্ত জগৎকে নর্ত্তিত করিতেছেন। সেই অনন্ত অণু পরমাত্মা বস্ত্রবৎ আপন সম্বিদে মেরু প্রভৃতিকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছেন। দিক্ কালাদি দ্বারা সেই অণু পরিচ্ছিন্ন নহেন; সুতরাং তিনি মহামেরু অপেক্ষাও বৃহৎ এবং মনোরূপী বলিয়া সূক্ষ্ম। উল্লিখিতরূপে বৃহৎ বলিয়া তিনি স্থূলতমাকৃতি ও উচ্চ এবং জীব বলিয়া কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগ হইতেও সূক্ষ্ম। শৈলের সহিত সর্ষপের যেমন তুলনা হয় না, সেই-রূপ শুদ্ধ সম্বেদনরূপী আকাশাত্মা পরমাত্মার সহিত পরমাণুর তুল্যতা সম্ভবে না। তথাপি তাঁহাতে যে অণু ও পরমাণু শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা গৌণ-ভাবেই হয়—মুখ্যভাবে নহে। পরমাণু একান্তই দুর্লক্ষ্য, আর পরমাত্মাও নিতান্ত পক্ষে লক্ষ্য হইবার নহেন। এইরূপে সেই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মাতে পরিচ্ছিন্ন পরমাণু ও অণুশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পরমাত্মার যে অণুত্ব, মায়াই তাহার স্রষ্টকর্ত্রী। মায়ার পক্ষে সেরূপ করা বিরুদ্ধ নহে। কনকে বলয় সৃষ্টির ন্যায় পরমাত্মায় নানাত্ব সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত পরমাত্মরূপ প্রদীপ আলোক ও অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশকরূপে বিরাজমান; কারণ আত্মা ভিন্ন অন্য কাহারও স্বতঃপ্রকাশের শক্তি নাই। আরও দেখ, আত্ম-প্রকাশের অভাব কোন কালেই নাই। যদি বল—আছে, তাহা হইলে 'আমি নাই' এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতে হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ইহাঁরা সকলেই জড়; সুতরাং আত্মা ব্যতীত নিখিল পদার্থের অসত্তা এবং আত্মার সত্তাতেই সকল পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ আত্মার অভাব প্রমাণ ও অনুভব, এ উভয়ই অসম্ভব। আত্মা শুদ্ধ ও কেবল সৎ। চিত্ত আত্মাতে অবস্থিত। আত্মা তাহারই সাহায্যে অন্তরে বাহিরে আলোক ও অন্ধকারের কল্পনা করিয়া থাকেন। রবি, শশী ও বহ্নি, ইহাদিগের পার্থক্য কেবল শুক্লকৃষ্ণাদি বর্ণে; পরন্তু তেজোভাবে ইহাঁদের কোনই পার্থক্য নাই। আর এক কথা, উহারা সকলেই জড়পদার্থ; কাজেই উহাদের কেহই কোন কিছুরই প্রকাশক নহে। কজ্জলাভ নিবিড় নীহারই মেঘ বলিয়া ব্যপদিষ্ট; সুতরাং মেঘ ও নীহার এই উভয়ে যেরূপ প্রভেদ, আলোক ও অন্ধকারেও প্রকৃতপক্ষে তাদৃশ প্রভেদই কল্পিত। অধিক বলা

বাহুল্য, নিখিল জড়োপলব্ধির নিমিত্তভূত একমাত্র চিদাকার মহান্ সূর্য্য নিয়তই বিরাজমান রহিয়াছেন এবং সমস্ত জড়পদার্থের অস্তিত্বাদির প্রমাণ তিনিই করিয়া দিতেছেন। তিনি যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে, ঐ সকল কিছুই থাকিত না। সেই চিদাকার মহান্ সূর্য্য নিরলসভাবে নিশি দিন সমানরূপে সর্ব্বত্র এমন কি শিলাদির অভ্যন্তরেও আলোক বিতরণ করিতেছেন। ত্রিলোকের প্রকাশ তাঁহা হইতেই হয়। কারণ চৈতন্যের প্রকাশ সর্ব্বত্রই বিরাজমান। বর্ত্তমানেও তাহার দুর্লভতা নাই। অতি কঠিন শিলোচ্চয়ের অন্তরেও সে প্রকাশ পরিস্ফুট। এই যে দেহ, ইহা একান্ততই তমঃ। কিন্তু চৈতন্যালোক ইহার বিনাশ বিধান করে না; বরঞ্চ ইহাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। সে আলোক প্রথমে এই দেহকে এবং পরে এই সমগ্র জগৎকে আলোকিত বা প্রকাশিত করে। প্রভাময় সূর্য্য যেমন পদ্মদলের বিকাশ বিধান করেন, চিত্ত তেমনি প্রকাশ ও তম উভয়কেই প্রকাশিত করিয়া দেয়। অর্থাৎ চিত্ত হইতেই আলোক ও অন্ধকারের অবধারণ হইয়া থাকে। দিবাকর যেমন দিন-যামিনীর সৃষ্টি করিয়া আপন আকার প্রদর্শন করেন, চিৎ-সূর্য্য সেইরূপ সৎ ও অসৎ অবভাসিত করিয়া স্বীয় স্বরূপ দেখাইয়া থাকেন। যেমন বসন্ত-শোভার অভ্যন্তরে নিখিল ফল-কুসুমাদির শোভা সন্নিবিষ্ট, উল্লিখিত চিদণুর অন্তরেই তেমনি সকল জ্ঞান বিরাজমান। যেমন বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয় হইলে, বনপ্রদেশের সৌন্দর্য্য-পরম্পরা পরিস্ফুট হয়, তেমনি যাবতীয় অনুভবই চিদণু হইতে সমুদিত হইয়া থাকে। সেই পরম চিদণুতে রসাদি কিছুই নাই; সুতরাং তিনি নিঃস্বাদু। কিন্তু তথাপি সমস্ত স্বাদুসত্তার আবির্ভাব তাঁহা হইতেই হয়। কাজেই তিনি নিজে নিঃস্বাদু হইয়াও স্বাদ গ্রহণ করেন। জল হইল সকল রসের অধিষ্ঠান; সুতরাং জলই রসস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত। ঐ জলের আবার মূল হইলেন আত্মা; সুতরাং তিনিই মূলরস বলিয়া বিদিত। সেই যে চিন্ময় পরমাণু, তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও সকল পদার্থে বিরাজিত; সুতরাং এ কথা বলা বাহুল্য যে, এই নিখিল জগৎ তাঁহারই আশ্রিত। তাঁহার অস্ফুরণে জগতের অসত্তা, আর স্ফুরণে জগৎ সত্তার বিলোপ ঘটিয়া থাকে। অতএব তাঁহারই স্ফুরণ সর্ব্ব-পদার্থের আশ্রয়।

তিনি আপনাকে গোপন রাখিতে পারেন না; তাই চিদ্রূপ অণু বিস্তার করিয়া তাহা দ্বারা এই জগৎ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। হস্তী যেমন দুর্ব্বাবনে আত্মগোপন করিতে পারে না, ব্যোমাত্মা পরম ব্রহ্মও তেমনি কুত্রাপি অপ্রকাশিত থাকিতে সক্ষম হয়েন না। বাসন্তিক রসের উদ্বোধ ঘটিলে বনাবলী যেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, সেইরূপ প্রলয়ে পরিলীন হইলেও এই জগৎ চিৎপরমাণুকে অবলম্বন করিয়া সজীব হইয়া থাকে। ফলতঃ বসন্তের উদ্বোধনে উল্লসিত বনভুমির ন্যায় একমাত্র চিৎসত্তার প্রভাবেই এই জগৎ সতত সমুল্লসিত হইয়া থাকে। বসন্তকালীন রস হইতে যেমন পল্লব ও গুল্ম অভিন্ন, তেমনি তুমি এই জগৎকে সেই চিন্ময় হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝিবে। চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বভূতের সারভূত; তাই তিনি সহস্র সহস্র কর-লোচনে সুশোভিত। আর তিনি 'সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া নিত্যই নিরবয়ব। সেই যে চিদণু, তিনি নিমেষ এবং কল্প উভয়রূপে বিরাজিত। স্বপ্ন-সমালোকিত বার্দ্ধক্য ও বাল্য যাদৃশ, নিমেষ, মহাকল্প ও কোটি-কল্পও সেইরূপই। যে ব্যক্তি ভোজন করে নাই, তাহার 'আমি ভোজন করিয়াছি' এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় এবং স্বপ্নানুভূত মরণ জ্ঞানের ন্যায় নিমেষকেও কল্প বলিয়া ধারণা হয়। এই জগদ্বৃন্দ প্রলয়কালে চিন্ময় পরমাণুতেই অবস্থান করে। বীজে যেমন বৃক্ষাবস্থান, তেমনি চিৎ-পরমাণুতে এই সমগ্র জগতের অধিষ্ঠান। যাহাতে যাহার অবস্থান, তাহা হইতেই তাহার আবির্ভাব। সাবয়ব বস্তুতেই বিকার দেখা যায়। যে বস্তু নিরাকার বা নিরবয়ব, তাহাতে তাহা থাকে না। বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় এই নিখিল ভূতবৃন্দ সেই চিৎপরমাণুর অন্তরে অবস্থিত। এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালান্বিত জগৎও সেই পরমাণুর উদরে বিরাজিত। তুষাবৃত তণ্ডুলের ন্যায় নিমেষ ও কল্প উভয়ই অত্মরূপ আত্মার একদেশ আশ্রয় করিয়া তদ্বেষ্টিত-ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। আত্মাণু উদাসীনের ন্যায় বিরাজমান। তিনি কোন কিছুতেই সংস্পৃষ্ট হয়েন না; অথচ আপন মায়ায় ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রভৃতি অর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব জগতের কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত রহেন। আত্মরূপ যে পরমাণু, তাহা হইতেই জগতের উদ্ভব হয়। কিন্তু

যাহা বিশুদ্ধ চিৎ, তাহা ভোগ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইয়াই বিরাজমান। প্রকৃত পক্ষে পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তিনি জগতের ভোক্তা বা কর্ত্তা কিছুই নহেন। কিছুই ইহার বিলয় পায় না; সেই চিতের ইহা ব্যবহার-দৃষ্টি ব্যতীত কিছুই বলা যায় না।

হে রাত্রিঞ্চরি! সেই চিদণু জগত্তাহেতুক 'ঘনচিৎ' এই উপশব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। তিনি দৃশ্যভোগ সিদ্ধিহেতু আন্তরিক চিৎচমৎকৃতিকে ধারণ করত অচক্ষু হইয়াও তাহা দেখিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই বটে; কিন্তু সাধকদিগের শিক্ষার্থ 'অন্তঃস্থিত' 'বহিঃস্থিত' ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ পরমাত্মা পূর্ণস্বভাব, তাঁহাতে পদার্থান্তরের সত্তা অসম্ভব; সুতরাং বুঝিতে হইবে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই তিনি। ফল কথা, তিনি নিজেই নিজেকে দেখাইতেছেন; এদিকে তিনি স্বয়ং সদা অপরিচ্ছিন্ন। পরমাত্মায় কিছুরই বিস্তৃতি হয় না; কাজেই বাস্তব দ্রষ্টৃত্ব বা দৃশ্যত্ব এতদুভয়ের কোন কিছুরই প্রাপ্তি তাঁহার ঘটে না। যাহা আত্ম-চৈতন্য, তাহাই প্রকৃত লোচন; পরন্তু চক্ষু তাহার দ্বার মাত্র। সেই চেতনরূপ দৃষ্টি বাসনাভাব-বর্জ্জিত নিজ বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনাপূর্ব্বক দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। পুত্রের অভাবে পিতৃত্ব এবং একত্বের অভাবে দ্বিত্ব যেমন অসম্ভাবিত, তেমনি দ্রষ্টৃত্ব বিনাও কদাচ দৃশ্যত্ব সম্ভাবিত নহে। পিতা ব্যতীত পুত্র এবং ভোক্তা ব্যতীত ভোগ্য যেমন অসম্ভাবিত, তেমনি দ্রষ্টৃত্ব-অভাবে দৃশ্যত্ব সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত। যেমন কনক-শক্তিতে কটকাদির সন্নিধান, সেইরূপ চিৎশক্তি দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সুনির্ম্মাণ। কনকই কটক নির্ম্মাণ করে, পরন্তু কটক কখন কনক নির্ম্মাণ করে না। দৃশ্য সকল জড়ত্ব বশতঃ দ্রষ্টৃনির্ম্মাণে অক্ষম। সুবর্ণে যেমন বলয়-ভ্রম হয়, চিৎই তেমনি জগদ্ভাব-প্রকটনে সমর্থ বলিয়া মোহের মূলীভূত অসৎ দৃশ্যকে সৎস্বরূপে কল্পনা করিয়া লয়। বলয়ত্ব যখন অবভাসিত হয়, তখন যেমন সুবর্ণের সুবর্ণত্ব লুপ্ত হয়, তেমনি দৃশ্যত্ব অবভাসিত হইলে দ্রষ্টৃদেহ প্রকটিত হয় না; কিন্তু যেমন বলয়বুদ্ধি সত্ত্বেও সুবর্ণের সুবর্ণত্ব বুদ্ধির বিলোপ ঘটে না, তেমনি দৃশ্যতার অবস্থানকালেও দ্রষ্টার দ্রষ্টৃভাবের অভাব হয় না। ফলে যখন দ্রষ্টৃত্ব

ও দৃশ্যত্ব এতদুভয়ের যে কোন একটী অবভাসিত হয়, তখন কখনই উভয় সত্তা প্রতিভাসিত হয় না। যৎকালে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তখন যেমন পশু জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ কনকে যখন কটক-জ্ঞানের অভাব হয়, কনকের তখন অকটকত্ব অর্থাৎ কনকত্বই প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। উল্লিখিত উদাহরণে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যজ্ঞান ঘুচিয়া গেলে দ্রষ্টৃসত্তাই ভাসমান হইয়া থাকে। সেই চিদাকৃতি আত্মা দ্রষ্টা হইয়াও দৃশ্য দর্শন করেন। দ্রষ্টৃত্বকালে দৃশ্য দর্শন অবশ্যই হয়। দৃশ্যসমষ্টি দ্রষ্টাতেই প্রতিভাত। যদি দৃশ্যজ্ঞান বিগলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে 'অহং দ্রষ্টা' এ জ্ঞানেরও বিলোপ ঘটিয়া থাকে। 'অহং দ্রষ্টা' এই জ্ঞানের বিলোপ ঘটিলে, 'ইহা আমি দেখিতেছি' এরূপ জ্ঞানও বাধিত বা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। যৎকালে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃ জ্ঞান ঘুচিয়া যায়, তখন বাক্যাতীত স্বনিষ্ঠ তত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে। দীপ যেমন নিজেকে ও অপরাপর দৃশ্য বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সেই চিদাকৃতি পরমাত্মা তেমনি আপনাকে, স্বনিষ্ঠ দ্রষ্টৃত্ব জ্ঞানকে ও দৃশ্যত্বকে প্রকাশিত করিতেছেন। কি আর অধিক কথা কহিব, সেই চিদ্বপুঃ আত্মাণু হইতেই সমস্ত কার্য্য সুসম্পাদিত হইতেছে। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব এই তিনটীই অসৎ ও আগন্তুক; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে উল্লিখিত জ্ঞানত্রয় তিরোহিত হয়। যেমন কোন ভৌতিক পদার্থ জল ও ভূমি প্রভৃতি বস্তু হইতে অভিন্ন, তেমনি সেই স্বতঃসিদ্ধ অণু হইতে কোনও বস্তু ভিন্ন নয়। তিনি সর্ব্বগামী ও সকল অনুভবস্বরূপ; এ জন্য একত্বানুভবরূপ যুক্তি নিবন্ধন আত্মাদ্বৈত নিরূঢ় হইয়া থাকে। ইচ্ছানুরূপ প্রভেদ তাঁহারই ইচ্ছায় ঘটিতেছে। তরঙ্গ যেমন জলরাশি হইতে অভিন্ন, সেইরূপ এ সকল তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সলিলরাশি হইতে তরঙ্গের ন্যায় এই সমস্ত পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয়।

হে রাক্ষসি! কেবল এক পরমাত্মাই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সকলের আত্মা এবং তিনিই সকলের স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সর্ব্বভূতের চেতনরূপে তাঁহারই অধিষ্ঠান। তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের বিষয়ীভূত নহেন। এই নিমিত্ত তিনি সৎ ও অসৎ উভয়ই। তাঁহাকে

চেতনরূপে সৎ এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যভাবে অসৎ বলিয়া অভিহিত করা হয়। তিনিই অসতের প্রকাশক; কেন না, তিনি চিৎস্বরূপ। উল্লিখিতরূপে ঐ মহান্ আত্মাতেই দ্বিত্ব ও একত্ব উভয়ই বর্ত্তমান; কিন্তু কথা এই যে, যদি দ্বিত্ব রহিল, তবেই একত্ব সিদ্ধ হইল, কারণ ছায়া ও আতপের ন্যায় দ্বিত্ব ও একত্ব, ইহারা উভয়েই উভয়ের সাধন বা কারণ। এই নিয়মের ফল এইরূপ দাঁড়াইল যে, যখন দ্বিত্বের অভাব ঘটে, তখন একত্বেরও অভাব হইয়া পড়ে। এ দিকে, একত্বের যদি অসিদ্ধি হয়, তবে যে উভয়েরই অসিদ্ধি, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত; সুতরাং যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, তাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় ধর্ম্মের বহির্ভূত। যাহা উল্লিখিত উভয় ধর্ম্ম-বিরহিত হইয়াও ঐ উভয়ধর্ম্মীর ন্যায় বিরাজমান, জল হইতে দ্রবত্বের ন্যায় তাহা সেই পরম আত্মতত্ত্ব হইতে অভিন্ন। যেমন বীজের অন্তরে বৃক্ষ আছে, তেমনি ব্রহ্মের অভ্যন্তরে ত্রিজগৎ রহিয়াছে। যেমন কাঞ্চন হইতে বলয়ের ভিন্নতা, তেমনি অদ্বৈত হইতে দ্বৈতের পৃথক্‌রূপতা। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন ঐ দ্বৈতভাবও সৎ বলিয়া অনুভূত হয় না। ফল কথা, দ্রবত্ব যেমন জল হইতে, স্পন্দন যেমন পবন হইতে এবং শূন্য যেমন আকাশ হইতে অপৃথক্, তেমনি দ্বৈত ও অদ্বৈত এ উভয় সেই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। ইহা দ্বৈত এবং ইহা অদ্বৈত, এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই অনর্থের প্রকৃত নিদান। যাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় ভাব হইতে বর্জ্জিত; সুতরাং কেবল সত্তা-মাত্রে স্থিত, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই 'পরম ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তথাবিধ পরম বস্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই নিত্য বিদ্যমান। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই সকলই সেই সর্ব্বসাক্ষী চিদাত্ম-রূপ পরমাণুতে কল্পিত বলিয়া বিজ্ঞেয়। পবনাঙ্গে স্পন্দনের ন্যায় এই যে জগদাত্ম অণু, ইহা পরমাণুদেহে বিস্তৃত ও উপসংহৃত হইয়া থাকে। অহো কি ভয়ঙ্করী মায়া! আর তাহার শক্তিই বা কি চমৎকারিণী! পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম চৈতন্যের অভ্যন্তরে এই ত্রিজগতের অবস্থান, ইহা কি অল্প আশ্চর্য্যের বিষয়! আর এই ব্যাপারটাই বা কি আশ্চর্য্য যে, প্রকৃতপক্ষে সত্তা না থাকিলেও চিৎ-পরমাণুতে জগতের সত্তা বিরাজিত। অথবা ইহাকে অসম্ভবই বা বলি কিরূপে? কেন না, মায়ার প্রভাবে সকলই সম্ভব হইয়া থাকে।

এই ত্রিজগৎকে একপ্রকার অপূর্ব্ব সুদীর্ঘ ভ্রম বলিয়াই ব্যাখ্যা করা যায়। ভ্রম যাহা দেখাইতে পারে না, এ ভবে এমন কিছুই নাই। ভাণ্ডমধ্যস্থ বীজে যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিদ্যমান, তেমনি সেই চিদণুর উদরে এই ত্রিজগৎ বিরাজমান। বৃক্ষ যেমন স্বীয় বীজকোটরে শাখা, ফল ও কুসুম সমভি-ব্যাহারে অবস্থিত, এই জগৎ তেমনি চিদণুর উদরে প্রতিভাত। ইহা যে সে লোকে দেখিতে পারে না; তত্ত্বদর্শী যোগীরাই ইহা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। বৃক্ষ আপন পত্র পুষ্পাদিময় দেহ পরিহার না করিয়াই বীজের মধ্যে বিরাজ করে; এই জগৎও নিজের দ্বৈতভাব পরিত্যাগ না করত চিদ-ণুর উদরে অবস্থান করিতেছে। পরন্তু চিৎপরমাণুর অন্তরধিষ্ঠিত যে দ্বৈত-স্বরূপ জগৎ, তাহাকে যিনি অদ্বৈতরূপে অবলোকন করেন, তিনিই যথার্থ দেখিয়া থাকেন। ফল কথা, দ্বৈত বা অদ্বৈত এই উভয়ের কিছুই প্রকৃত তত্ত্ব নয়; ইহা জাত নয়, ইহা অজাতও নয়; ইহার সত্তা নাই এবং ইহার অসত্তাও নাই। ইহা প্রশান্ত নয় এবং ইহাকে ক্ষুব্ধও বলা যায় না। এই গগন-পবনাদি জগত্রয় চিদণুর উদরে নাই। জগৎ নাই আবার জগতের অসত্তাও বিদ্যমান নাই। একমাত্র পরম মঙ্গলময়ী চিৎই বিদ্যমান রহিয়া-ছেন, আর কিছুই নাই। সর্ব্ব-স্বরূপিণী চিৎ যৎকালে যেখানে যে প্রকারে সৃষ্টির প্রভাবে আবির্ভূতা হয়েন, তখন সেখানে সেইরূপেই তিনি ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি পরমাত্মরূপ পরমাণু, তাঁহার স্বভাব অনুদিত হইলেও তিনি প্রতিভাসক্রমে সৃষ্টিরূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। তিনি নিখিল প্রপঞ্চ-বিরহিত ও অভিন্ন, তথাপি তিনিই সকলের অন্তরে আত্মরূপে বিরাজিত। সেই যে পরমতত্ত্ব, তিনিই এই জগৎস্বরূপে সমুদিত হইয়া জনন-মরণাদির বশতাপন্ন হইতেছেন।

হে নিশাচরনন্দিনি! উল্লিখিত পরম তত্ত্ব এই জগদ্‌ভঙ্গীতেই প্রকটিত। সে তত্ত্ব ত্যাগ ও অত্যাগ-স্বরূপে অবস্থিত। তাহা অসঙ্গ-স্বভাব নিবন্ধন সর্ব্বত্যাগী আর সর্ব্বগত বলিয়া অত্যাগী। সে তত্ত্ব নিসর্গতই নির্ব্বিকার। পরমাণুর নিকট মৃণালতন্তু মহামেরুরূপে প্রতিভাত; কেন না, মৃণালতন্তু লক্ষিত হয়; কিন্তু পরমাণুকে লক্ষ্য করা যায় না। অন্যদিকে আবার আত্মা যিনি, তাঁহার নিকট পরমাণু মহামেরু। কেন না,

পরমাণু যদিও দৃষ্টির অগোচর, তথাপি তাহা বুদ্ধিগম্য; কিন্তু পরমাত্মা সেরূপ নহেন, তিনি পরমাণু অপেক্ষাও দুর্লক্ষ্য। তদীয় আত্মরূপ পরমাণুর অভ্যন্তরেই কোটি কোটি মেরুমন্দরাদি বিরাজিত।

ওহে রাত্রিচরি! একমাত্র সেই মহীয়ান্ পরমাণুই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনিই এই জগৎকে বিতত, বিরচিত, উৎপাদিত বা সম্পাদিত করিতেছেন। এই জগৎপ্রপঞ্চ গগনগত গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় নেত্রগোচর হইতেছে। ইহা বিবিধ বৈচিত্র্যময় হইলেও সর্ব্বথা শূন্য বলিয়াই প্রতীত। যৎকালে যথাযথ আত্মতত্ত্বের অববোধ বশতঃ সুষুপ্ত-সদৃশ দ্বৈত-ভাব স্বীয় সুন্দরতররূপ অর্থাৎ অধিষ্ঠান আত্মতত্ত্ব পরিহার না করিয়া স্থিতি-গতাগতি প্রভৃতি হইতে পরিমুক্ত ও একতাপ্রাপ্ত হয়, তখন এই ক্ষুদ্র জগৎ উল্লিখিতরূপে পরমার্থ-পিণ্ডাকারেই প্রতিভাত হইয়া থাকে; সুতরাং আমি সংসারস্বরূপ না হইয়া সর্ব্বদাই অদ্বিতীয় ব্রহ্মৈকস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকি।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই রাত্রিচরী কর্কটী তখন সেই কিরাতরাজ্যের অধিপতির নিকট স্বীয় প্রশ্নপরম্পরার সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদ-বিহত স্বজাতি-চাপল্য পরিত্যাগ করিল। তদীয় সন্তাপ-সন্ততি তিরোহিত হইল। যেমন বর্ষাগমে ময়ূরী ও কৌমুদীর উদয়ে কুমুদিনী অন্তরে শান্তিসুখ অনুভব করে, সেইরূপ সেই রাক্ষসী তখন অন্তঃশীতলতা উপগত হইয়া পরম বিশ্রান্তিপদ লাভ করিল। যেমন জলদ-নিনাদ শ্রবণ করত অন্তসত্ত্বা বক-বনিতার আনন্দোচ্ছ্বাস হয়, রাজার কথায় রাক্ষসীর তেমনি অপার আনন্দ উথলিয়া উঠিল। রাক্ষসী, রাজা ও মন্ত্রীর প্রতি কহিল, ওহে মহাশয়দ্বয়! আহা, এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনাদের মতি অতি নির্ম্মলা; সারবান্ প্রবোধ-প্রভাকরে সদাই তাহা সমুজ্জ্বলা।

সুনির্ম্মল শশিমণ্ডল হইতে শুভ্র শীতল জ্যোৎস্না-ক্ষরণের ন্যায় আপনাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে ক্ষরিত জ্ঞানামৃত-কণা পান করিয়া আমি অধুনা সুশীতল হইয়াছি। আমি মনে করি, ভবাদৃশ বিবেকশালী পুরুষেরাই জগতের পূজনীয় এবং সেব্য। কুমুদিনী যেমন সুধাকর-সংসর্গে আহ্লাদিত হয়, আমিও তেমনি অধুনা আপনাদের ন্যায় সাধুজনের সঙ্গ লাভ করিয়া একান্ত পুলকিত হইলাম। যেমন কুসুম-সঙ্গে সৌরভ লাভ হয়, সাধুজনের সঙ্গগুণে সেইরূপ শুভলাভ হইয়া থাকে। যেমন দিনকর-করের সংস্পর্শে কমলকুলের ম্লানভাব অপগত ও প্রফুল্লতা সমাগত হয়, সেইরূপ মহাপুরুষদিগের সংসর্গগুণেও দুঃখ বিদূরিত ও শান্তিসুখ সমুদিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ হস্তে দীপ-শিখা থাকিলে কখন কোনও জন অন্ধকারে অভিভূত হয় কি? আপনারা ভূতলগত ভাস্করের ন্যায় অদ্য এই বন প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। আপনারা সর্ব্বথা আমার পূজনীয়। আপনাদিগকে অভীষ্ট বস্তু দান করিয়া আপনাদের প্রীতি বিধান করা আমি একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। অতএব আপনাদের বাঞ্ছিত বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন।

রাজা কহিলেন,—হে রাক্ষসকুলকাননের মঞ্জরীস্বরূপিণি রাক্ষসি! এই জনপদের অধিবাসী প্রজাগণ সতত বিষম বিসূচিকারোগে সমাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত সন্তাপ ভোগ করে। সেই হৃদয়বেদনা-কর ব্যাধি কোন ঔষধেই প্রশমিত হয় না দেখিয়া আমরা রাত্রিযোগে বহির্গত হইয়াছি। আমাদের একান্তই অভিপ্রায় এই যে, তোমার ন্যায় ব্যক্তির নিকট ঐ ব্যাধিপ্রশমনের কোন একটা মন্ত্র লাভ করি। আমরা মনে মনে এরূপ বাসনাও পোষণ করিতেছি যে, তোমার ন্যায় যাহারা অজ্ঞলোকদিগের বিনাশক, তাহাদিগকেও বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করি। অতএব তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি আর কখন প্রাণিহিংসা করিও না। হে শুভে! এক্ষণে তুমি যদি আমাদের এই প্রার্থনা-পূরণেও প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলেও আমরা যথেষ্ট কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হই।

রাক্ষসী উত্তর করিল,—হে প্রভো! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, অদ্য হইতে আর কখন আমি প্রাণিহিংসা করিব না।

রাজা কহিলেন,—হে ফুল্লকমল-নেত্রে! পরের দেহ ভোজন করাই তোমার একমাত্র জীবন ধারণের উপায়; সুতরাং আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, যদি তুমি পরদেহ ভোজন হইতে বিরত হও, তাহা হইলে মদভীপ্সিত অহিংসাব্রত গ্রহণে কিরূপে তোমার দেহ রক্ষা হইবে?

রাক্ষসী কহিল,—রাজন্! আমি এই পর্ব্বতোপরি ছয় মাস যাবৎ সমাধিমগ্ন হইয়া ছিলাম। অধুনা আমার সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় আমি তাহা হইতে প্রবুদ্ধ হইলে, আমার ভোজন-লালসা জন্মিয়াছিল। সম্প্রতি পুনরায় আমি গিরিশিখরে গিয়া সমাধি অবলম্বন করিব। সেই সমাধি অবস্থায় যত কাল ইচ্ছা, কাষ্ঠময় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে সুখে আমার কাল কাটিবে। আমি এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে, যতকাল সম্ভব, ধ্যানা-বলম্বনে দেহ ধারণ করিব, পরে যথাকালে এ দেহ পরিত্যাগ করিব। হে ভূপতে! এ দেহ যতদিন থাকিবে, আমি আর পরপ্রাণ হিংসা করিব না। অধুনা মদীয় অন্যান্য কথা শ্রবণ করুন।—

হিমালয় নামে উত্তর দিকে এক মহাগিরি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ গিরি শারদীয় সুধাকর-করের ন্যায় ধবলতায় পরিপূর্ণ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হেমশৃঙ্গ নামে উহার এক শৃঙ্গ আছে। আমি তত্রত্য দরীগৃহে মেঘলেখার ন্যায় লৌহসূচী হইয়া বাস করিতাম। রাক্ষসকুলে আমার জন্ম হইয়াছে। আমি রাক্ষসী কর্কটী নামে বিখ্যাত। একদা জন-বিনাশ-বাসনায় আমি ব্রহ্মার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হই। তাহাতে ব্রহ্মা আমার তপস্যায় প্রীত ও বশীভূত হইয়া আমাকে আমার প্রার্থনা মত পরপ্রাণহারিণী সূচী ও বিসূচী হইবার বর প্রদান করেন। আমি বর লাভ করিয়া বহু বর্ষকাল বিসূচিকারূপে বহুসংখ্যক জীবের প্রাণ বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি। পরন্তু ব্রহ্মা আমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি গুণী জন-দিগকে ভক্ষণ করিও না। আমি তাঁহারই নিয়ম অনুসারে তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিনী হইয়া এ যাবৎ কাল, গুণবান্ জনদিগকে হিংসা করিতে সক্ষম হই নাই। হে রাজন্! আপনি এক্ষণে সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন। সেই মন্ত্রপ্রভাবে সর্ব্ববিধ হৃদয়শূল প্রশমিত হইবে। পূর্ব্বে আমি জনগণের

বক্ষস্থল আক্রমণ করিয়া শোণিত শোষণ করিতাম, তাহাতে তাহাদের নাড়ী-নিচয় রক্তহীন হইয়া বিকল হইয়া পড়িত। আমি রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া যাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম, সেই সকল বিকলনাড়ী-সম্পন্ন জনগণ হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিত, তাহারাও তদনুরূপ রক্তহীন হইয়া থাকিত। ফল কথা, আমার আক্রমণ একান্তই সাঙ্ঘাতিক ছিল; যদি কেহ দৈবাৎ সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত, তাহা হইলেও তাহার সন্তান-সন্ততি রুগ্ন, ভগ্ন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া জন্মিত। হে রাজন্! ক্ষমাশালী মানব-দিগের অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব সেই বিসূচিকা মন্ত্র অবশ্যই আপনি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। হে নরনাথ! সেই নাড়ী-কোশ-গত শূলরোগের প্রশমনের নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা যে মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, আপনি অচিরাৎ তাহা গ্রহণ করুন। রাজন্! আসুন—আমরা নদীতীরে যাই এবং সেখানে গিয়া কৃতাচমন ও সংযত হই। অনন্তর আপনি আমার নিকট হইতে সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই রাত্রিতে সেই নিশাচরী, সেই মন্ত্রী ও ভূপতিকে সঙ্গে লইয়া পরস্পর মিত্রভাবে নদীতীরে উপনীত হইল। রাজা ও মন্ত্রী রাক্ষসীর মৈত্রীভাব বুঝিতে পারিয়া আচমনান্তে তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাক্ষসী ব্রহ্মার নিকট যে বিসূচিকামন্ত্র পাইয়াছিল, স্নেহের সহিত তাহা তাঁহাদিগকে প্রদান করিল। পরে সেই সৌহার্দ্দ-সম্পন্ন রাজা ও মন্ত্রীকে বিদায় দিয়া রাক্ষসী যখন গমনে প্রবৃত্ত হইল, তখন রাজা তাহাকে বলিলেন,—হে মহাদেহশালিনী সুন্দরি! তুমি আমাদের গুরুস্থানীয়া ও বয়স্যা। অতএব আমরা যত্নের সহিত তোমাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি; তুমি প্রীত হইয়া আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা কর। আমরা আশা করি, আমাদের এই প্রণয় কখনই তুমি ব্যর্থ করিবে না। আমাদের বিলক্ষণ বিদিত আছে, সুজনগণের সৌহার্দ্দ দর্শনমাত্রেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব হে ভদ্রে! আমরা এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তুমি যৎসামান্য সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ও অলঙ্কারাদিতে সমলঙ্কৃত হইয়া মনোহর আকার ধারণ করত আমাদের গৃহে আগমন কর এবং সেখানে আসিয়া তুমি যথাসুখে অবস্থান করিতে থাক।

রাক্ষসী কহিল,—রাজন্! বুঝিলাম,—আমি যদি মনোহারিণী মানবীরূপ ধারণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে মানবোচিত অন্ন পানাদি অর্পণ করিতে পারেন। আর আমি যদি এই রাক্ষসী মূর্ত্তিই ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি আমাকে কোন্ বস্তু দিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন? রাক্ষস-দিগের যাহা খাদ্য বস্তু, তাহাতে আমার তৃপ্তি হওয়া সম্ভব; কিন্তু সাধারণ মানবোচিত খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আমার তৃপ্তি হওয়া অসম্ভব; কারণ যতদিন আমার এই দেহ থাকিবে, ততদিনের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধ স্বভাব কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে।

রাজা কহিলেন,—হে অনিন্দিতে। তুমি হেমমাল্যে মণ্ডিত হইয়া কিছু-দিন পর্য্যন্ত রমণীরূপে এইখানে যথেচ্ছ অবস্থান কর। অনন্তর শত সহস্র দুষ্কৃতি-পরায়ণ চোর ও বধ্য ব্যক্তিকে রাজ্য মধ্য হইতে আনিয়া তোমাকে ভোজনার্থ সমর্পণ করিব। তখন তুমি মানবী রমণীরূপ পরিহারপূর্ব্বক রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সকল গ্রহণ করত হিমালয়শৃঙ্গে প্রস্থান করিবে এবং যথাসুখে তাহাদিগকে ভোজন করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ যাহারা অতিভোজী ব্যক্তি, নির্জ্জন স্থানে গিয়া ভোজন করিলেই তাহাদের সুখ হইয়া থাকে। এইরূপে তৃপ্তি লাভ করিয়া কিছুকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিবার পর পুনরায় সমাধিমগ্ন হইবে। শেষে সমাধি হইতে বিরত হইয়া পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক অপরাপর বধ্য লোকদিগকে লইয়া যাইবে। এই-রূপ ভাবে হিংসা করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। ধর্ম্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, স্বধর্ম্মপূর্ব্বক যে হিংসা করা যায়, তাহা করুণার সমান হইয়া থাকে। আমরা আশা করি, তোমার যখন সমাধিভঙ্গ হইবে, তখন তুমি অবশ্যই মৎসমীপে আগমন করিবে। আমরা বিলক্ষণ জানি, অসৎলোকেরও মিত্রতা যদি একবার বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হইলে কখনই তাহা অপগত হয় না।

রাক্ষসী কহিল,—হে সখে, ভূপতে! আপনি যোগ্য কথাই কহিয়া-ছেন। আমি আপনার কথা অবশ্যই পালন করিব। ফলতঃ কোন্ জন সুহৃদ্বাক্য অন্যথা করিয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাক্ষসী এই কথা কহিয়া এক সুন্দর বিলাসিনীবেশ ধারণ করিল। অবিলম্বে হার, কেয়ূর, কটক, পট্টবস্ত্র ও মাল্যদামে তাহার

সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত হইল। সে তখন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—রাজন্! আসুন, আমরা গমন করি।

রাক্ষসী এই কথা কহিলে, রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিকালে রাক্ষসীও তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। অনন্তর রাজধানীতে উপনীত হইয়া এক রমণীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে রাক্ষসী স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা ও মন্ত্রী স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা ছয় দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র হইতে তিন সহস্র বধ্য ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাক্ষসীকে সমর্পণ করিলেন। পরে রাক্ষসী নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা ও ভীষণা হইয়া রাজার অনুমতি-অনুসারে স্বর্ণপ্রাপ্ত দরিদ্রের ন্যায় পরম আনন্দ সহকারে সেই তিন সহস্র বধ্য জনকে ভুজমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া হিমালয়শৃঙ্গে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই সকল লোক-দিগকে ভক্ষণ করিয়া রাক্ষসী পরিতৃপ্ত-চিত্তে তিন দিন পর্য্যন্ত সুখ-নিদ্রায় অতিবাহিত করিল এবং পুনরায় প্রবোধ-পরিনিষ্ঠ হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। শেষে চারি বা পাঁচ বৎসর পরে প্রবুদ্ধ হইয়া রাজভবনে গমনান্তে কিয়দ্দিন বিশ্রম্ভালাপে অতিবাহিত করত পুনর্ব্বার বধ্য গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই রাক্ষসী অদ্যাবধি জীবন্মুক্ত হইয়া সেই গিরিশিখরস্থ অরণ্য মধ্যে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে এবং সমাধি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সৌহৃদ্য বশতঃ কিরাত-ভূপতি-সমীপে আগমন করতঃ বধ্য সংগ্রহান্তে আপনার উদর পরিপূরণ করিতেছে। কালক্রমে কিরাতরাজ সর্ব্ববাসনা ত্যাগ করিয়া বিদেহ কৈবল্যরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলে, তদীয় বংশানুক্রমিক রাজগণের সহিত রাক্ষসীর সৌহৃদ্য-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রহিল এবং সেইরূপ আহারক্রিয়াও যথাযথ কালে চলিতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কিরাত-রাজ্যের সিংহাসনে যে যে রাজা অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই নিশাচরীর সহিত সেই সেই রাজারই মিত্রতা জন্মিয়াছে। রাক্ষসী তদবধি যোগসিদ্ধা হইয়া কিরাতরাজ্যের পিশাচাদি-জনিত যাবতীয় ভয়, সর্ব্ববিধ মহোৎপাত ও নানা-বিধ ব্যাধি নিবারণ করিতেছিল। ঐ রাক্ষসী বহুকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে কিরাতমণ্ডলে উপস্থিত হইত এবং রাজ-সংগৃহীত বধ্যদিগকে স্বহস্তে গ্রহণ করিত। সেই রাজ্যের রাজগণ অদ্যাপি সুহৃদের সম্মানার্থ বধ্যসংগ্রহ করেন। ফলতঃ মিত্রজনের সম্মান রক্ষার্থ কেই বা না যত্ন করিয়া থাকে?

অনন্তর রাক্ষসী চিরকালের জন্য ধ্যাননিমগ্ন হইল। সেইজন্য নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়া গেলেও সে পুনরায় আর কিরাতরাজ্যে আগমন করিতে পারিল না। ইহাতে সে রাজ্যের অধিবাসীরা উদ্বিগ্ন হইয়া স্বদেশের দোষ-প্রশমনের জন্য সত্বর এক গগনস্পর্শী প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে মন্দরা ও কন্দরা এই উভয় নামে রাক্ষসীর এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে। সেই হইতে কিরাতরাজ্যের সিংহাসনে যে যে রাজাই অধিষ্ঠিত হউন, ভগবতী কন্দরার প্রতিমা কালবশে নষ্ট হইয়া গেলে তিনিই তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। যে নৃপাধম কন্দরার প্রতিমা-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী না হয়েন, তাঁহার প্রজাগণ বিবিধ উপদ্রবে ও উপতাপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। জন-সাধারণ তাহার পূজা করিয়া স্ব স্ব বাসনানুরূপ সকল ফল প্রাপ্ত হয়। বধযোগ্য ব্যক্তিদিগকে উপহার দিয়া সেই কন্দরাদেবীর পূজা করা হইয়া থাকে। সেই কন্দরার প্রতিমা অদ্যাপি কিরাতরাজ্যে বিদ্যমান। তিনি চিত্রস্থা ও ফলপ্রদা।

যিনি সকল লোকের বাল, বৎস ও শস্যাদি বিষয়ে মঙ্গল বিধান করেন, অসংখ্য বধ্য ব্যক্তি যাঁহার করাল-কবলে কবলিত হইয়া থাকে, সেই

পরমবোধবতী চির-বিরাজমানা রাত্রিচরী দেবতা কিরাতজনপদে জয়যুক্ত হইয়া এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! হিমালয় পর্ব্বতে যে কর্কটী নাম্নী রাক্ষসী ছিল, এই তাহার মনোহর উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! সেই রাক্ষসী হিমালয়-গহ্বরে অবস্থান করিয়া কিরূপে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল এবং তাহার কর্কটী নাম হইবার কারণই বা কি? আপনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! রাক্ষসদিগের অনেক বংশ বিদ্যমান। তাহারা কেহ কেহ স্বভাবতই শুক্ল, কেহ কেহ কৃষ্ণ, কেহ কেহ হরিত এবং কেহ কেহ বা উজ্জ্বলবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ রাক্ষসীর কৃষ্ণবর্ণতা কুলক্রমাগত এবং কর্কট প্রাণি-প্রতিম কর্কটনামধেয় রাক্ষস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম ছিল কর্কটী। কর্কটী রাক্ষসীরও আকৃতি কর্কটের ন্যায় ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বে অধ্যাত্মকথার প্রসঙ্গে বিশ্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া ঐ কর্কটী-কৃত প্রশ্নপরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক তদীয় আখ্যায়িকা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি।

হে রঘুনন্দন! যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, সেই একমাত্র পরম কারণ পরমপদ হইতে এই অসম্পন্ন জগৎ সম্পন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন জলের মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অনন্ত তরঙ্গশ্রেণী অবস্থান করে, অসংখ্য সৃষ্টিপরম্পরাও তেমনি সেই পরমপদে বিরাজ করিতেছে। কাষ্ঠমধ্যে বহ্নি আছে; সেই বহ্নি যেমন অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেও মর্কটাদির শীত নিবারণ করিয়া দেয়, তেমনি ব্রহ্ম নানাপ্রকার

কর্ত্তার ন্যায় হইয়া নানাবিধ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহার নৈসর্গিক সৌম্যতা তাহাতে অপগত হয় না। কাষ্ঠে যেমন বৃথা শালভঞ্জিকা-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তেমনি এই জগৎ সৃষ্ট না হইলেও সৃষ্টের ন্যায় প্রতীত হয়। বীজ ও অঙ্কুর যদিও একই পদার্থ, তথাপি উহা যেমন বিভিন্নাকারে সমুদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্ত ও চিত্তের জগৎদর্শন-শক্তি এ উভয় এক হইলেও ভিন্নভাবে প্রকটিত হয়। ভেদজ্ঞানের মূল হইল অবিচার; তাই ভেদকে বাস্তব বলা যায় না। যখন সদ্বিচার সমুদিত হয়, তখন সে ভেদ যে কোনরূপেই উৎপন্ন হউক, তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইয়া যায়।

হে রঘুকুলধুরন্ধর! ঐ ভ্রম যেখান হইতে আসিয়াছে, সেইখানেই চলিয়া যাউক। অথবা তুমিই ব্রহ্মকে সবিশেষরূপে বিদিত হইয়া এই ভ্রম পরিহার কর। মদীয় বাক্য শ্রবণে ভবদীয় ভ্রমগ্রন্থি যখন ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন অভেদ-বুদ্ধিবলে তুমি আপনা হইতেই সেই পরম বস্তু কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি আমার বচনাবলী শ্রবণ করিয়া এই চিদুৎপন্ন অনর্থসম্পদ ও তাহার মূল কারণ অবিদ্যাকে অবশ্যই বিনাশ করিতে পারিবে। মদীয় উপদেশ বাক্যে যখন তুমি প্রবুদ্ধ হইবে, তখন তোমার এই প্রকার সুন্দর বোধ জন্মিবে যে, এই নিখিল জগৎ ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত; সুতরাং সকলই ব্রহ্ম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! এই ভিন্নরূপে প্রতীয়মান পাঞ্চ-ভৌতিক জগৎ কিরূপে সেই পরম কারণ হইতে অভিন্ন হইল? সত্যই কি আপনি ইহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে বুঝিয়াছেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! অভেদ কথাটাই প্রকৃত; ভেদ কথাটা কেবল কাল্পনিক। ভেদবোধক শব্দসমূহের সৃষ্টি, মাত্র শিষ্টদিগকে উপ-দেশ দিবার নিমিত্তই হইয়াছে; সুতরাং পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ-ভিন্নতা অবলোকিত হয়, উহা ব্যবহারতই হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে সে ভেদ কিছুই নহে। যেমন উপদেশকগণ বালকদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে বেতালাদির কল্পনা করিয়া থাকেন, উল্লিখিত ভেদও সেইরূপ একটা কল্পনামাত্র বৈ আর কিছুই নয়। ফল কথা এই, যাহাতে দ্বিত্ব বা

একত্ব সংখ্যা কিছুই একটা নাই, তাহাতে আবার সঙ্কল্প-বিকল্পের সম্ভাবনা হইবে কি? যাহারা অনভিজ্ঞ লোক, তাহারাই ভেদজ্ঞান পোষণ করিয়া বহুবিধ বিবাদ করিয়া থাকে। কার্য্য, কারণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, হেতু, হেতুমান্, অবয়ব, অবয়বী, ব্যতিরেক, অব্যতিরেক, পরিণাম, অপরিণাম, বিদ্যা, অবিদ্যা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি করিয়া যতকিছু ভেদ ব্যবহার হয়, সে সকল কেবল অনভিজ্ঞদিগের অসত্য কল্পনা এবং তাদৃশ অজ্ঞদিগেরই বুঝিবার সুবিধার জন্য অনুবাদমাত্র। ফলে উক্তবিধ ভেদ ব্যবহার উপদেশ্য ব্যক্তির অজ্ঞান-দশাতেই ঘটে; পরন্তু প্রবোধ অবস্থায় দ্বৈত বা ভেদজ্ঞান কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যাহা সদ্বস্তু, তাহাতে কোনই ভেদ নাই; তাহা অখণ্ড একমাত্র অদ্বৈত। যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে সকল কলনা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন একমাত্র মৌন বা অদ্বৈতই অবশিষ্ট থাকে।

রামচন্দ্র! যৎকালে তোমার তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, একমাত্র অখণ্ডিত পরমাত্মাই সর্ব্বময়। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, বিভাগ নাই, তিনি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই বিদ্যমান নাই। বৎস রাম! যাহাদের তত্ত্ববোধ নাই, তাহারাই স্ব স্ব মিথ্যা ভেদ-জ্ঞানের প্রশ্রয় বশতঃ উল্লিখিতরূপ ভেদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববোধ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বৈধী-ভাব থাকে না; সে ভাব তাঁহাদের অন্তর হইতে চিরতরে তিরোহিত হইয়া যায়। দ্বৈত মিথ্যা বটে, পরন্তু ব্যবহার-দশায় তাহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফল কথা, তত্ত্ব বোধের পূর্ব্বাবস্থায় শিষ্টদিগকে উপদেশ দিবার জন্যই উহা গ্রহণ করিতে হয়। যেমন অসত্য রজ্জুতে সর্প জ্ঞান জন্মিলে সত্য ভয়কম্পাদি ফলের উদয় হয়, তেমনি অসত্য দ্বৈতের অনুবাদপুরঃসর উপদেশকগণ সত্য ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মাইয়া থাকেন। ব্যবহার-সিদ্ধ দ্বৈতকে অবলম্বন না করিলে অদ্বৈতজ্ঞান উৎপাদন করা যায় না। যাহাদের শব্দশক্তিজ্ঞান নাই, অর্থাৎ ঘটশব্দ ঘটপদার্থের বাচক, ঘটপদার্থ ঘটশব্দের বাচ্য, ইত্যাদি-রূপে অমুক শব্দ অমুক বস্তুর বাচক, অমুক বস্তু অমুক শব্দের বাচ্য, এই এই প্রকার বিধিবোধ যাহাদের নাই, সেই সকল লোকদিগকে কোন বিষয় কিছু

বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। এই জন্যই ব্যবহার-সিদ্ধ দ্বৈতকে গ্রহণ করিতে হয়; নতুবা বিচার-দৃষ্টির সম্মুখে দ্বৈতের অবস্থান অসিদ্ধ। তাই বলিতেছি, হে রঘুনন্দন! শব্দ জন্য ভেদের প্রতি তুমি অনাদর করিয়া অর্থাৎ তথাবিধ ভেদ ব্যবহারকে মিথ্যা বলিয়া বিদিত হইয়া তোমার বুদ্ধিকে মহাবাক্যার্থে নিমগ্ন কর অর্থাৎ চিত্তকে এক অখণ্ড অদ্বৈতাকারে পরিণত করিয়া লও এবং সেই অবস্থায় তুমি আমার ব্যাক্যাবলী শ্রবণ করিতে থাক। এইরূপ হইলে তখন বুঝিবে, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় একটা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হে নিষ্পাপ! যে প্রকারে এই জগন্ময়ী মায়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট আমি দৃষ্টান্ত সহকারে কীর্ত্তন করিতেছি; তুমি শ্রবণ কর। আমার ব্যাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তুমি যদি এই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবধারণ করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার বাসনারাশি বিলয় পাইয়া যাইবে। এই ত্রিজগৎ মনের মননে বা কল্পনাতেই নির্ম্মিত। তুমি যদি উল্লিখিত জগতের অনিত্যতা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পার, তাহা হইলে তোমার আত্মা প্রশান্ত হইবে এবং তুমি আপনিই আপনাতে অবস্থান করিতে পারিবে। অর্থাৎ এই বিনশ্বর বিশ্বসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তুমি নিতান্ত শান্তি সুখভোগে সক্ষম হইবে। রামচন্দ্র! মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত তুমি মদীয় বাক্যে মনোযোগী হও এবং বিবেকরূপ ঔষধের প্রতি সম্যক্ যত্ন প্রকাশ কর। আমি এক্ষণে যে আখ্যায়িকার অবতারণ করিব, তুমি ইহা শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে, সংসারে একমাত্র চিত্তই প্রকাশমান রহিয়াছে; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এমন কি তখন বুঝিতে পারিবে, এই শরীরাদিরও অস্তিত্ব নাই। ফলতঃ রাগদ্বেষাদিতে দূষিত চিত্তকেই সংসার বলা হয়, এবং এইরূপ চিত্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই সংসার-মুক্ত হওয়া যায়। চিত্তই সাধ্য অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের বিধেয়—হেতুদ্বারা নির্ণেয় এবং পালনীয়। ঐ চিত্তই বিচার্য্য, আহার্য্য, ব্যবহার্য্য, সঞ্চার্য্য এবং ধার্য্য। অর্থাৎ যাহা অসিদ্ধ, সাধনপ্রয়োগে তাহাও সাধ্য হইয়া থাকে। সিদ্ধ হইলে তাহা পালনীয় বা রাক্ষণীয় হয়। অসিদ্ধ সাধনের অনেক পথ সত্ত্বেও যে পথ সহজ সরল,

তাহা বিচার করিয়া লইবার নাম বিচার; যাহা তাদৃশ বিচারযোগ্য হয়, তাহাই বিচার্য্য নামে কথিত। যাহা দেশান্তর বা সময়ান্তর-সিদ্ধ, তাহা উপায় প্রয়োগে নিকটে বা বর্ত্তমান কালে সিদ্ধ করিয়া লইলে আহার্য্য, আয়ত্তীকৃত বস্তুকে যথেচ্ছ বিনিয়োগে ব্যবহার্য্য, ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে অশ্বাদি গতিশীল বস্তু সঞ্চার্য্য এবং ভূষণাদি স্থাবর বস্তু ধার্য্য হইয়া থাকে। উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যেই জগতের যাবতীয় পদার্থ সন্নিবিষ্ট। চিত্ত আকাশের ন্যায় অদেহ। সেই চিত্তই আপন অন্তরে জগত্ত্রয় ধারণ করিতেছে। চিত্তই অহম্ভাবে দেহাদিতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। চিত্তের যাহা চৈতন্য অংশ, তাহাই সকল প্রকার কল্পনা কিম্বা কল্পনাশক্তির বীজ আর যাহা জড় অংশ, তাহাই ভ্রমময় জগৎ বলিয়া বিখ্যাত। সৃষ্টির আদিতে এ সকল যখন কিছুই ব্যক্ত ছিল না, তখন ব্রহ্মা এসকল স্বপ্নবৎ দেখিয়াও কিছুই দেখিতেন না। অনন্তর তিনি সুদীর্ঘ সম্বিদে এই প্রপঞ্চ, জড় সম্বিদে পর্ব্বতাদি এবং সূক্ষ্ম সম্বিদে লিঙ্গসমষ্টিস্বরূপ সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ, এই ত্রিবিধ দেহ অনুভব করেন; কিন্তু উল্লিখিত দেহত্রয় শূন্যস্বরূপ; তাই উহারা অবাস্তব। সেই মনোময় আত্মবপু সর্ব্বগামী ও সর্ব্বব্যাপ্তরূপে বিরাজমান। চিত্তরূপী বালক অবোধতা বশতই জগৎকে যক্ষবৎ অপূর্ব্ববস্তুরূপে অবলোকন করিতেছে। পরন্তু যখন ঐ চিত্ত প্রবুদ্ধ হইবে, তখন এই জগৎকে নিরাময় আত্মস্বরূপে অবলোকন করিবে। আত্মা যে ভাবে দ্বিত্ব ও ভ্রমপ্রদরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, আমি বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা দ্বারা তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র! আমি হৃদয়ানুরঞ্জিনী যুক্তি সহকারে মধুর পদ-সম্বলিত অপূর্ব্ব ঐন্দবোপাখ্যান এক্ষণে কীর্ত্তন করিব। হে রাঘব! এই উপাখ্যান-কথা সর্ব্বসন্দেহ নিরাস করিয়া জলগত তৈলের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে শ্রোতার হৃদয় আপ্লুত করিয়া থাকে। যাহাতে উপমা বা দৃষ্টান্ত বিন্যাস নাই, যাহার পদসমষ্টি শব্দশাস্ত্র-সম্মত নয় এবং যাহা স্ফুটরূপে কর্ণে প্রবেশ করে না, এতাদৃশ বাক্যে শ্রোতার হৃদয় অনুরঞ্জিত হয় না, ফলে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা ব্যর্থ হইয়াই যায়। হে সাধো! ভূমণ্ডলে যে কিছু কথা, উপাখ্যান বা বুধজন-মনোরঞ্জক নাটকাদি কিম্বা যে যে বাক্য শব্দ-

সম্পদে ও অর্থগৌরবে কোমল ও শ্রোত্রমধুর, তৎসমস্তই প্রসিদ্ধ প্রমাণদৃষ্টির প্রয়োগে সুধাকরকরে বসুধার ন্যায় সমধিক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! তুমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছ; এই-জন্য পুরাকালে ভগবান্ ব্রহ্মা আমার নিকট যে যে বিষয় বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তোমাকে এক্ষণে বলিতেছি। পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মাকে আমি জিজ্ঞাসিয়াছিলাম যে, হে ব্রহ্মন্! এই সকল সৃষ্টিপরম্পরা কিরূপে সমুপাগত হইয়াছে, তৎশ্রবণে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ঐন্দবোপাখ্যান সহ মহতী কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-কথিত সেই সকল কথা এই,—যেমন একই জল জলাশয়ের মধ্যে বিচিত্র আবর্ত্তাকারে স্ফুরিত হয়, তেমনি একমাত্র মনই জগৎশক্তিযুক্ত হইয়া এই নিখিল জগদাকারে প্রকাশিত হইতেছে। পরে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ওহে বশিষ্ঠ! কোন এক পূর্ব্বতন কল্পের আদিতে আমি প্রবুদ্ধ হইয়া জগৎসৃষ্টি করিবার অভি-লাষ করিলে তৎকালে যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।

একদা মদীয় দিনাবসানে সমগ্র সৃষ্টি সংহার করিয়া আমি স্বস্থ ও একাগ্র-চিত্তে রাত্রি যাপন করিলাম।* অনন্তর যখন নিশাবসান হইল, তখন আমি জাগরিত হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা সমাপনপূর্ব্বক পুনরায় প্রজা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে সুবিশাল আকাশমণ্ডলে মদীয় নয়নদ্বয় নিক্ষেপ করিলাম। তখন দেখিলাম,—একমাত্র অসীম অনন্ত শূন্য আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সে আকাশে আলোক বা অন্ধকার কোথাও কিছুই নাই। তৎকালে আমি মনে

* মনুষ্যদিগের এক কল্পে ব্রহ্মার একদিন হয়। কল্পের অবসান হইতে পুনরায় কল্পোৎপত্তি পর্য্যন্ত ব্রহ্মার একরাত্রি।

মনে স্থির করিলাম যে, আমি সঙ্কল্পবলে ঐ আকাশে সৃষ্টি বিস্তার করিব। এইরূপ স্থির করিবার পর আমি একাগ্রচিত্তে সৃজ্য বস্তুর পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। অনন্তর মনঃসংযোগ করিয়া সেই বিশাল বিস্তৃত অম্বরদেশে দেখিলাম, সেখানে বিষ্ণুপ্রভৃতির শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থায় অবাধে বহু-সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছে। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আরও দশ জন ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের সক-লেরই আকৃতি আমার ন্যায়। সকলেরই কমলকোশে বাস। সকলেই এক এক রাজহংসে সমাসীন। সেই পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেই স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রাণিজাতি উৎপন্ন হইতেছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই বিশুদ্ধ বারিদবৃন্দ বারিবর্ষণ করিতেছে। সাগরের ন্যায় কলকলনাদিনী মহানদী সকল সেখানে প্রবাহিত হইতেছে। আদিত্যগণ কিরণ-বিতরণে কৃপণতা করিতেছেন না। আকাশ-দেশে বায়ু বহিতেছে। স্বর্গে সুরগণ এবং মর্ত্ত্যে মানবগণ ক্রীড়া করিতেছে। পাতালে দানবদল ও সর্প সকল বিচরণ করিতেছে। কালচক্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। ঋতুগণ যথাকালে স্ব স্ব শীতাতপবর্ষাদি-স্বভাব প্রকটিত করত সাময়িক ফলকুসুমে পরিপূর্ণ হইয়া সকল মহীমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই বিহিত আচার অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং নিষিদ্ধ যে কিছু, সমস্তই পরিবর্জ্জিত হইতেছে। প্রাণিগণের মধ্যে স্বর্গ বা অপবর্গ যাহার যাহা অভীষ্ট, সে তাহার প্রার্থী হইয়া যথাকালে প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বত্রই প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী সপ্তলোক, সপ্তসাগর, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তপর্ব্বত পরিস্ফুরিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, প্রলয়ে ইহার সকলই বিলয় পাইয়া যাইবে। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেরই কোথাও কোথাও অন্ধকারপুঞ্জ ক্ষয় পাইয়া যাইতেছে এবং কোথাও বা নিবিড়ভাবে অবস্থান করিতেছে। কুঞ্জমধ্যে তমঃপুঞ্জ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। গিরিগুহা মধ্যে অন্ধকার আছে; উহা বিবরাগত আতপ-রেখায় মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নভো-মণ্ডলরূপ নীলোৎপলের অভ্যন্তরে মেঘরূপ মধুপকুল ভ্রমণ করিতেছে। তারকানিকর উল্লিখিত নভোনীলোৎপলের কেসরস্বরূপে শোভিত হইতেছে, শাল্মলীর ফলকোশের মধ্যগত নির্ম্মল তূলারাশির ন্যায় বিরাজিত, সুমেরুবৎ

সমুন্নত হিমালয়শৈলের অতি শুভ্র নীহাররাশি পতিত রহিয়াছে। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পৃথ্বীদেবী অন্তঃপুরচারিণী অঙ্গনার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। লোকালোকাচল সেই পৃথ্বীরূপিণী অঙ্গনার কাঞ্চীকলাপ, এবং সাগরগর্জ্জন উহার নূপুরধ্বনি। অভ্যন্তরে যে কিছু রত্ন আছে, সে সকল উহার অলঙ্কারের ন্যায় শোভমান। ধান্যাদি শস্যপঙিক্ত ঐ ধরণীরূপিণী রমণীর অধরসুধার ন্যায় প্রতিভাত এবং প্রাণিগণের বাক্যালাপ উহার বাগ্‌বিলাসরূপে প্রথিত। সেই গৌরাঙ্গী ধরণী-রমণী রজনীরাজিরূপ অঙ্গরাগে রঞ্জিত এবং বর্ষপরম্পরা উহার পদ্মোৎপলমালার ন্যায় লক্ষিত। আরও দেখিতে লাগিলাম, সেই সেই ভুবনগত বিবর-বিভাগে বহু-ব্রহ্মাণ্ড পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছে। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে অরুণবর্ণ তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হইতেছে; তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডগুলি পক্ক দাড়িম্ব-ফলবৎ বিলোকিত হইতেছে। ত্রিপথগামিনী মন্দাকিনী ইন্দুকলার ন্যায় নির্ম্মলা এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে প্রবহমাণা হইয়া জগতের যজ্ঞোপবীতবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। দিক্‌রূপ লতাসমূহে তড়িৎপুঞ্জ পুষ্পরাশির ন্যায় এবং মেঘ সকল পল্লবদলের ন্যায় শোভিত হইয়া বায়ুপ্রবাহে বিতাড়িত ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। উহারা এক একবার বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং আবার উদ্ভূত হইতেছে। আমি যে জগৎ দেখিলাম, যাহাতে সমুদ্র, ভূমি ও আকাশ প্রভৃতির সমাবেশ রহিয়াছে, উহা আমার নিকট গন্ধর্ব্বনগরীর উদ্যানগতা লতার ন্যায় প্রতীত হইল। উদুম্বর ফলের মধ্যে যেমন মশকেরা দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করত গুঞ্জন করিতে থাকে, সুর, অসুর, নর ও উরগগণ তেমনি উল্লিখিত ভুবন-গর্ভে একত্র মিলিত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক কলরব করিতেছে। কল্প, যুগ, ক্ষণ, কলা ও কাষ্ঠারূপে বিভক্ত হইয়া কাল সেই ভুবনমধ্যে অলক্ষ্যে সর্ব্ব-নাশ সাধনের জন্য প্রতীক্ষা করত প্রবাহিত হইতেছে। আমি আমার পরম-বিশুদ্ধ চিত্তে এই সকল অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, এ কি! ইহা কিরূপে কি হইল! আমি মাংসময় চর্ম্মচক্ষে যাহা কখন দেখি নাই, সেই অনুপম মায়াজাল অদ্য আকাশ মধ্যে মনে মনে দেখিলাম! এইরূপ বিস্ময় বোধের পর আমি বহুক্ষণ মনে মনে পর্য্যা-লোচনা করিয়া সেই আকাশ-মধ্যগত জগৎসমূহ হইতে একটী সূর্য্যকে

সত্যসঙ্কল্পবলে নিজ নিকটে আনয়নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে অমিতদ্যুতে! দেবদেব ভাস্কর! আপনি এই দিকে আসুন, আপনার শুভাগমন হউক। আমি তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় কহিলাম, হে ভগবন্! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কে? যে জগতে আপনি রহিয়াছেন, এই জগৎ এবং অপরাপর জগৎসমূহ কিরূপে আবির্ভূত হইল? হে নিষ্পাপ! আপনি যদি ইহা অবগত থাকেন, তবে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

তৎকালে আমি তাঁহাকে ঐ কথা কহিলে, তিনি আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং আমাকে নমস্কার করিয়া সুন্দর পদ-বিন্যাসে বলিতে লাগিলেন।

ভানু কহিলেন,—হে ঈশ্বর! এই যে দৃশ্য প্রপঞ্চ, আপনিই ইহার শাশ্বত কারণ। অথচ আপনি ইহা জানিতেছেন না কেন? আমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হে সর্ব্বগামিন্! যদি আমার বাক্য-সন্দর্ভ শুনিবার জন্য আপনার কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আমার অচিন্তিত উৎপত্তি-বার্ত্তা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাত্মন্! যে সকল কলা অবিরত জগৎরচনায় তৎপর, যাহারা সৎ কিম্বা অসৎ নির্ণয়ে মোহ উৎপাদন করে, কখন সৎ, কখন অসৎ এবং কোথাও সৎ ও কোথাও অসৎ ইত্যাকার কাল-দেশ-পরিচ্ছিন্ন জগৎসত্তার প্রদর্শনকৌশলই যাহাদের রূপ, তাহাদের দ্বারা এই জগৎ সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে বটে, ফলে এ সকল মনেরই খেলা বা বিলাস বৈ আর কিছুই নহে। মনই তথাবিধরূপে বিলসিত হইতেছে; ইহাই জানিবেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

অনন্তর পুনর্ব্বার ভানু কহিলেন,—হে মহাদেব! জম্বুদ্বীপের এক-কোণস্থিত কৈলাসশৈলের সমতল প্রদেশে সুবর্ণজট নামে যে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তথায় আপনার মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণ ভবদীয় কল্পনামক অতীত দিবসে এক অতি রমণীয় বহু সুখপ্রদ বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। সেইখানে কশ্যপবংশাবতংস ইন্দুনামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, ব্রহ্মজ্ঞবর ও অতীব শান্তস্বভাব ছিলেন। ব্রাহ্মণ সেই বাসভূমিতে নিয়ত স্বজন-পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তাঁহার এক প্রাণপ্রতিমা ভার্য্যা ছিলেন। মরুভূমিতে তৃণের ন্যায় সে ভার্য্যায় তাঁহার সন্তানসন্ততি কিছুই হইল না। সরলা শস্য-লতা যেমন পত্র, পুষ্প ও ফলের অভাবে শোভিত হয় না, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণ-বনিতা সরলা গৌরবর্ণা ও পূতস্বভাবা হইলেও একমাত্র সন্ততি বিনা সুশোভিত হইতে পারি-লেন না।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণদম্পতি অপুত্রতানিবন্ধন নিতান্ত দৈন্যগ্রস্ত হইয়া তপস্যার্থ কৈলাসপর্ব্বতের কোন এক প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই নির্জ্জন কৈলাসনিকুঞ্জে জলমাত্র আহার করিয়া পাদপবৎ নিশ্চলভাবে ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দিনাবসান হইত, তখন তাঁহারা মাত্র এক গণ্ডুষ জলপান দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করি-তেন। তাঁহারা দিবারাত্র নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

এইরূপে বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণদম্পতি এতকাল অতি-বাহিত করিলেন যে, সেকাল মধ্যে ত্রেতা ও দ্বাপর এই দুই যুগই অতীত হইয়া গেল। অনন্তর ভগবান্ চন্দ্রশেখর সেই ব্রাহ্মণদম্পতির প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আশ্রমসমীপে আগমন করিলেন। মনে হইল, দিনতাপে তাপিত কুমুদ ও কুমুদিনীর প্রতি সুধাকর যেন সদয় হইয়া সমুদিত হইলেন; অথবা যেন সেই তরুলতাময় বনপ্রদেশে সাক্ষাৎ ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। শশী দর্শনে কুমুদ ও কুমুদিনীর

আনন যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনি তখন সেই ভগবান্ চন্দ্রমৌলিকে বৃষবাহনে সমাগত দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণদম্পতির মুখমণ্ডলেও প্রহর্ষচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তাঁহারা নবোদিত নিশাকরের ন্যায় সেই তুষারশুভ্র মহেশ্বরকে দেখিবা মাত্র প্রণাম করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শিব স্বীয় কণ্ঠস্বরে কলকণ্ঠকূজন তিরস্কৃত করিয়া অতি মধুর হাস্য সহকারে সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ওহে বিপ্র! বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার প্রসাদে তুমি বসন্ত-রসাক্রান্ত বৃক্ষের ন্যায় মুদিত হও।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে দেবদেব! যাহারা জন্মগ্রহণ করিলে, ভবিষ্যতে পুনরায় আমি আর শোকাভিভূত না হই, আপনার কৃপায় ঈদৃশ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন দশটী পুত্র আমার উৎপন্ন হউক।

ভানু কহিলেন,—অনন্তর মহাদেব 'এবমস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে অন্তর্দ্ধান করিলেন। মনে হইল, যেন তরঙ্গায়িত বিপুলকায় বারিধর গর্জ্জন করত তিরোহিত হইল। তখন মহেশ ও মহেশী আকাশপথে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণদম্পতিও শিবসমীপে বর লাভ করিয়া সন্তুষ্টমনে স্বগৃহে গমন করিলেন। গৃহে আসিবার পর কিয়দ্দিনে ব্রাহ্মণীর গর্ভসঞ্চার হইল। বারিভরে পূর্ণোদরা মেঘলেখার ন্যায় দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণী পূর্ণগর্ভা হইয়া শ্যামশোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর যথাকালে ব্রাহ্মণী প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় কোমল ও সুন্দর দশটী বালক পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রগণ অল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মণোচিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদের দেহে অসাধারণ তেজ প্রকাশ পাইল। বর্ষাঋতুর অভ্যুদয়ে নবীন অম্বুদগণ যেমন শোভা ধারণ করে, তেমনি সেই ব্রাহ্মণতনয়গণ স্বল্পকাল মধ্যেই সমধিক দেহশোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই তাঁহারা সমগ্র বাঙ্ময় অধিগত হইলেন। নভোগত নির্ম্মল গ্রহগণের ন্যায় তাঁহারা তৎকালে সকলেই তেজঃপ্রকর্ষে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর অনেক কাল অতীত হইলে, তাঁহাদের জনক ও জননী উভয়েই কলেবর পরিহার করত স্ব স্ব কর্ম্মোচিত গতি প্রাপ্ত হইলেন। পিতামাতার

পরলোক প্রাপ্তির পর পুত্রগণ সকলেই অত্যন্ত খিন্ন হইয়া স্বীয় আবাস-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা বন্ধু-বান্ধব-বিরহে সমুদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ সংসারে এমন কি আছে, যাহাতে আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃসাধন হইতে পারে? এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর পরস্পর সকল ভ্রাতা একত্র হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, ওহে ভ্রাতৃগণ! অধুনা কর্ত্তব্য কি? কি উপায়ে দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়? মহত্ত্ব কি? ঐশ্বর্য্যই বা কি? আবার মহাবিভবই বা কাহাকে বলা যায়? সাধারণতঃ লোকের যে ঐশ্বর্য্য দেখা যায়, ইহা ত অতি সামান্য! কেন না, ইহা অপেক্ষা সামন্তগণের ঐশ্বর্য্যই সমধিক বলিয়া বোধ হয়। আবার ভাবিয়া দেখিলে সামন্তগণের সম্পদও তুচ্ছ; কেন না, যাঁহারা রাজা, তাঁহাদিগকেই সমধিক ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে রাজগণের ঐশ্বর্য্যও কিছুই নয়। কারণ সম্রাট্‌গণই প্রকৃত ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন। আবার সম্রাট্ অপেক্ষা মহেন্দ্র-পদ উচ্চ। সে পদ আবার প্রজাপতি-পদের নিকট অকিঞ্চিৎকর। এইরূপে সকলের ঐশ্বর্য্যই পর পর কিছুই নহে; সুতরাং এমন কি পরমৈশ্বর্য্য আছে, যাহা প্রলয়কালেও বিনষ্ট হইবার নহে।

সেই ব্রাহ্মণতনয়েরা পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহাদের মহামতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বযূথদিগকে মৃগপতির ন্যায় গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, ওহে ভ্রাতৃগণ! যত কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, আমার বিবেচনায় তন্মধ্যে যাহা কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবিনাশী থাকে, সেই ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন অন্য কোন ঐশ্বর্য্যকেই ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্যের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করি না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কথা কহিলে, অন্যান্য ইন্দুনন্দনেরা সকলেই সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন এবং কহিলেন,—হে তাত! কিরূপে আমরা সেই সর্ব্বদুঃখ-হর জগৎপূজ্য বিরিঞ্চিপদ প্রাপ্ত হইব? তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুনরায় সেই ভূরিতেজা ভ্রাতাদিগকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—ভ্রাতৃগণ! আমি যাহা বলি, তোমরা সকলেই একবাক্যে তাহা প্রতিপালন কর। 'আমিই সেই পদ্মাসন-স্থিত তেজোময় ব্রহ্মা। তেজোবলে আমিই জগতের সৃষ্টি ও সংহার

সাধন করিতেছি।' ইহাই তোমাদের সকলের নিরন্তর ধ্যানের বিষয় হউক।

জ্যেষ্ঠভ্রাতার এই কথায় সকল ভ্রাতাই সম্মত হইয়া জ্যেষ্ঠসহ ফল-প্রাপ্তির সুদৃঢ় আশা পোষণ করত ধ্যানাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের বুদ্ধি ধ্যান-ব্যাপারে একান্ত সমাসক্ত হইলে, তাঁহারা সকলেই যেন চিত্রলিখিতের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন এবং মনে মনে একাগ্রতা সহকারে ভাবিতে লাগিলেন,—আমিই উৎফুল্লকমলানন উচ্চাসন ব্রহ্মা। আমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজক, সকল শিক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহ, মহর্ষিগণ, সরস্বতী ও গায়ত্রীসমন্বিত বেদ এবং এই নরগণ, সকলেই আমার অন্তরে অবস্থান করিতেছে। লোকপালগণ ও সঞ্চরণশীল সিদ্ধমণ্ডল-পরিপূর্ণ চরমসৌভাগ্য-সম্পন্ন স্বর্গধাম এবং পর্ব্বত, দ্বীপ, জলধি ও কানন-সমলঙ্কৃত ত্রিলোকীর কুণ্ডলস্বরূপ এই ভূমণ্ডল, দৈত্যদানব-পরিবৃত এই পাতাল কুহর, সুরসুন্দরী-গণ-শোভিত গৃহবৎ গগনরাজ্য, যিনি প্রজাবর্গের শোভা-সম্পত্তি দান করেন, একাকী এই ত্রৈলোক্য রাজ্য পালন করেন, এই সেই পবিত্র যজ্ঞহুত-ভোজী সমস্ত নরপতিশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র, যাঁহারা প্রদীপ্ত কিরণ পটলরূপ রশ্মিযোগে দিক্‌সমূহকে আবদ্ধ করিয়া চৈত্রাদি মাসক্রমে একে একে গমন করেন, এই সেই দ্বাদশ আদিত্যগণ, এবং এই সেই ন্যায়তঃ লোকরক্ষক শুদ্ধবৃত্তিশালী লোকপালগণ, ইঁহারা সকলেই আমাতে অবস্থান করিতেছেন। এই যে প্রজাবর্গ, ইহারা জলতরঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন আমাতেই আবির্ভূত, তিরোভূত ও প্রস্ফুরিত হইতেছে। আমিই সৃষ্টি করিতেছি, এবং আমিই আবার সাদরে সংহার করিতেছি। এই আমি আত্মাতেই অবস্থিত রহিয়াছি। আমি ভুবনেশ্বর; আমি শান্ত হইয়াছি। এই ত এক বৎসর কাটিয়া গেল। এই একযুগ অতীত হইল। এই আবার সৃষ্টির সময় আসিল। এই পুন-রায় সংহারকাল উপস্থিত হইল। এই এক কল্প অতিবাহিত হইল। এই ব্রাহ্মী রাত্রি সমাগতা। এই আমি পূর্ণাত্মা ও পরমেশ্বর হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত।

অনন্তর সেই দশজন ইন্দুনন্দন ব্রাহ্মণ উল্লিখিতরূপ ভাবনাময়ী বুদ্ধি

অবলম্বনপূর্ব্বক পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া পাষাণখোদিত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। সেই সকল ইন্দুনন্দনেরা যখন কুশাসনে সমাসীন হইয়া কমলাসন ব্রহ্মার সঙ্কল্প প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের তুচ্ছ মনোবৃত্তি তখন বিগলিত হইয়া গেল। তাঁহারা আপনাকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ভানু কহিলেন,—হে পিতামহ! সেই ইন্দুনন্দনেরা উল্লিখিতরূপে বহু ভাবনায় সমাধিমগ্ন হইয়া আপনার ন্যায় সুদৃঢ় সঙ্কল্পে জগৎ ও জাগতিক জীবনিবহের সৃষ্টি-সংহার-ব্যাপারে সমাসক্ত-চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যাবৎ তাঁহাদের দেহপাত না হইয়াছিল, তাবৎ তাঁহারা সেই-ভাবেই ছিলেন। অনন্তর কালক্রমে তাঁহাদের তপঃকৃশ দেহসকল আতপ-শুষ্ক ও বাতাহত হইয়া শিথিলবৃন্ত জীর্ণ-পর্ণরাশির ন্যায় গলিয়া গেল। তখন বনবাসী হিংস্র জন্তুগণ তাঁহাদের সেই দেহসমূহ ভক্ষণ করিল। মৃত ইন্দুনন্দনগণের এই সময় বাহ্যবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া কল্পাবসান না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যখন কল্পক্ষয়-কাল আসিল, তখন দ্বাদশ সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হইয়া তাপদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুষ্করাবর্ত্তকাদি বারিদবৃন্দ অতি গভীর গর্জ্জনে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রলয়কালীন প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইল। সমগ্র জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়া উঠিল। ক্রমে ভূতবৃন্দ ক্ষয় পাইতে লাগিল। এ হেন ভয়াবহ কালেও সেই ব্রাহ্মণতনয়েরা সেই একই ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে বিভো! অনন্তর আপনি যখন এই

নিখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া ব্রাহ্মী নিশার সমাগমে যোগ-নিদ্রায় অধিরূঢ় হইলেন, তখনও তাঁহারা সেইরূপেই অবস্থিত ছিলেন। এক্ষণে আপনি প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় সংসারসৃষ্টির বাসনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা তদবস্থাতেই রহিয়াছেন। হে প্রভো! সেই ব্রহ্মস্বরূপ দশ জন ব্রাহ্মণেরই চিত্তাকাশে দশটী সংসার বিরাজমান। সেই দশ জন ব্রাহ্মণের দশবিধ ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডের ছিদ্রস্বরূপ আকাশ-মন্দিরে আমি সূর্য্যস্বরূপে অবস্থান করিয়া এই জগতের কাল-বিভাগকর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছি।

হে কমলযোনে! আমি সেই আকাশস্থিত দশ ব্রাহ্মণের দশবিধ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবার্ত্তা আপনার নিকট বিবৃত করিলাম। ঐ সকল ব্রাহ্মণের উৎপত্তিও আকাশ হইতেই হইয়াছে। এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা, করিতে পারেন। হে বরেণ্য! এই যে বিবিধ কল্পনাপ্রসূত আকাশময় নিখিল জগৎ উত্থিত হইতেছে, ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়ের বন্ধনস্বরূপ; আসঙ্গী জনগণের মোহপ্রদ। ফলে ঐ সমগ্র জগৎই সেই ব্রাহ্মণ-গণের স্বীয় স্বীয় চিত্তের বিভ্রমমাত্র। বস্তুগত্যা সে সকল সৎ নহে।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ওহে ব্রহ্মবেদি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ! ভানুদেব আমার নিকট 'সেই দশজন ব্রাহ্মণই দশ ব্রহ্মা' এইরূপ কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। পরে আমি মনে মনে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম, ওহে ভানুদেব! তুমি বল বল—সত্বর বল; এক্ষণে আমি আর কি সৃষ্টি করিব? যেখানে দশসংখ্যক জগৎ বর্ত্তমান, বল দেখি ভাস্কর!—সেখানে আমার আর অপর সৃষ্টিতে প্রয়োজন কি?

হে মহামুনে! আমি ভানুকে এই কথা কহিলে, তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিবার পর মদীয় কথার সমুচিত উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভানু বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি নিরীহ, কোনরূপ ইচ্ছাই আপনার নাই। সুতরাং সৃষ্টি দ্বারা আপনার কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? হে জগতী-পতে! এই যে সৃষ্টিব্যাপার, ইহা ত আপনার একটা বিনোদনমাত্র। প্রভো! সূর্য্য যেমন নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রহিলেও তদীয় মণ্ডল হইতে সলিলে প্রতিবিম্ব-পাত হয়, আপনি তেমনি নিষ্কাম ও নির্ম্মনস্ক হইলেও আপনা হইতে এই সৃষ্টি আপনিই আবির্ভূত হইতেছে। হে ভগবন্! আপনার এই নিষ্কামভাব সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এই শরীর-সন্নিবেশের পরিত্যাগ কিম্বা তাহাতে একটা অহস্তাবের অনুরাগ, এ উভয়ের কিছুই আপনার নাই। এই শরীরের ত্যাগ বা ইহার প্রতি অভিলাষ কিছুই আপনি করেন না। দিননাথ যেমন বারম্বার এই দিনের সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন, আপনিও তেমনি মাত্র বিনোদন-নিমিত্তই নিত্য এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার-ব্যাপারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। মাত্র বিনোদন-নিমিত্ত হইলেও এই জগতের সৃষ্টি-সংহার আপনারই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে আপনার কোন প্রকার আসক্তি বা উদ্যম-চেষ্টা নাই। হে মহেশ! আপনি যদি সৃষ্টিকার্য্য না করেন, তাহা হইলে আপনার নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার করা হয়। এই কর্ম্ম-পরিহারেই বা আপনি কোন্ অপূর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হইবেন? যেমন নির্ম্মল আদর্শ, নিরিচ্ছ বা নিরাসঙ্গ হইয়া বস্তুপরম্পরার প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তেমনি নিত্য বস্তু আত্মাও অনাসক্তভাবে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রশস্তবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহাদের কর্ম্মাচরণ কিম্বা কর্ম্ম পরিত্যাগ এ দুই বিষয়ের কোন বিষয়েই কোনই কামনা নাই। অতএব আপনি সুষুপ্তিসদৃশী নিষ্কাম বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যথোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন।

হে সুরপতে! যদি ইন্দুনন্দনগণের সৃষ্টি-ব্যাপারে আপনি সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলে পরেও ইহাঁরা সৃষ্টিকার্য্য দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন করিতে পারিবেন। আপনি চিত্ত-চক্ষু দিয়াই পরকৃত সৃষ্টি দেখি-তেছেন, পরন্তু চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পাইতেছেন না। যিনি যাহার

সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই স্বীয় কৃত সৃষ্টিতে 'ইহা আমার সৃষ্ট' এইরূপে স্বীয় চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইয়া থাকেন। হে পরমেশ! যিনি মন দ্বারা এই সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন, কেবল তিনিই স্বীয় চক্ষুতে ইহা দেখিয়া থাকেন; অপর কাহারও সেইরূপে দেখিবার ক্ষমতা থাকে না। পূর্ব্বে সেই যে দশজন কমলযোনি ও তাঁহাদের দশটী সংসারের কথা কহিয়াছি, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার শক্তি কাহারও নাই। কেননা, চিত্তের দৃঢ়তা হেতু তাহারা চিরস্থির। কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নাশ করিতে সকলেই পারে; পরন্তু চিত্ত দ্বারা যাহা নিশ্চয় করিয়া লওয়া হয়, তাহা নষ্ট করিতে কেহই পারে না। হে ব্রহ্মন্! জীবের মনোমধ্যে যে নিশ্চয় বদ্ধমূল হইয়া যায়, সেই জীব ভিন্ন সে নিশ্চয় নিরোধ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। বহুকাল ধরিয়া মন দ্বারা অভ্যস্ত হইয়া যাহা দৃঢ়মূল হইয়া যায়, কাহারও অভিশাপে কিম্বা দেহের বিনাশেও তাহা ক্ষয় পাইবার নহে। মনের মধ্যে যে ভাবটা স্থিরভাবে সমুদিত হয়, পুরুষও তদনুরূপই হইয়া থাকে। তাহার কখন অন্যথা হয় না। অতএব মনে হয়, এই সংসার-নিবারণ বিষয়ে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মূঢ়গণের অপর যে কোন উপায়, তাহা পর্ব্বতোপরি জল-সেকের ন্যায় নিষ্ফল।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতম সর্গ।

ভানু বলিলেন,—হে জগদ্বিধাতঃ! এই জগতের প্রকৃত কর্ত্তা মন। মনই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ। মন দ্বারা যাহা করা হয়, তাহাই বস্তুতঃ কৃত আর শরীর দ্বারা যাহা করা হয়, তাহাকে যথার্থ কৃত বলা যায় না। ইন্দুনন্দনেরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াও মনের ভাবনাবিশেষ দ্বারাই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব মনের যে কতদুর শক্তি, তাহা এই ব্যাপারেই অবলোকন

করুন। মন দ্বারা দেহ ভাবনা করিলেই দেহত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যাহার দেহ-ভাবনা নাই, সে কখন দেহধর্ম্মে বাধ্য হয় না। যাহার দৃষ্টি বাহ্য দেহ প্রভৃতিতেই নিবদ্ধ, তাহাকেই নিয়ত সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয়। যোগীরা অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাই তাঁহাদের আত্মদেহে সুখদুঃখাদি বোধ কিছুই হয় না; সুতরাং এই যে বিবিধ বিভ্রমময় জগৎ, একমাত্র মনই ইহার মূল কারণ। এ সম্বন্ধে ইন্দ্র ও অহল্যার বিবরণই একটী প্রধান নিদর্শন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভানো! যাঁহাদের বিবরণ শ্রবণে এই সমস্ত জগৎসৃষ্টি পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, সেই অহল্যাই বা কে? আর সেই ইন্দ্রই বা কে?

ভানু বলিলেন,—ব্রহ্মন্! শুনিয়াছি—পুরাকালে মগধ দেশে পুরাণ-প্রখ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্নের ন্যায় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে অপর এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার এক পদ্মপলাশ-নয়না ভার্য্যা ছিলেন। সেই ভার্য্যার নাম ছিল অহল্যা। চন্দ্রের রোহিণীর ন্যায় অহল্যা মহীপতির অতীব প্রিয়তমা ছিলেন। ঐ মহীপতির রাজধানীতে ইন্দ্রনামে এক ব্রাহ্মণকুমার বাস করিত। ইন্দ্র অতি লম্পট ছিল এবং লম্পটজনোচিত বেশভূষাতেই সর্ব্বদা সে সুসজ্জিত থাকিত।

কোন এক সময় রাজমহিষী অহল্যা পুরাণপ্রস্তাব প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলেন যে, মহর্ষি গৌতমপত্নী ইন্দ্রের অতি প্রিয়তমা ছিলেন। রাজমহিষী অহল্যা এই পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়াই সেই ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হইলেন এবং তিনি সেই হইতে এইরূপ ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন যে, সেই ইন্দ্র আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এক্ষণে কি হেতু আগমন করিতেছেন না? ভাবনার প্রাবল্যে ক্রমে সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন-বনিতা অহল্যা বিরহে বিধুর হইয়া মৃণাল ও কদলীদলের আস্তরণে শয়ন করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার শান্তি হইল না, তিনি ছিন্ন বনলতার ন্যায় বিশুষ্ক ও সন্তাপিত হইতে লাগিলেন। মৎস্যী যেমন নিদাঘতপ্ত স্বল্পসলিলে বিষম যাতনায় অধীর হইয়া উঠে; সেই অহল্যাও তেমনি যাতনাপ্রাপ্ত হইয়া যাবতীয় রাজ-বৈভবেও একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। 'এই ইন্দ্র, এই ইন্দ্র' এইরূপ একটা প্রলাপবাক্য সর্ব্বদাই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে

লাগিল। তিনি একান্ত বিকল হইয়া পড়িলেন। লজ্জা-সরম কিছুই তাঁহার রহিল না। কথায় ও কার্য্যে একেবারেই তিনি নির্লজ্জা হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর রাজমহিষী অহল্যার কোন এক সখী তদীয় অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া স্নেহভরে কহিল,—সখি! তুমি অধীর হইওনা, আমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার নিকট ইন্দ্রকে আনিয়া দিব। সখীর মুখে এই প্রিয়কথা শুনিবা-মাত্র অহল্যার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল। নলিনী যেমন নলিনীর নিম্নে নিপতিত হয়, তেমনি তিনি সখীর পাদতলে পতিতা হইলেন। অনন্তর কোন ক্রমে দিবা অবসান হইল। পরে যখন রাত্রি আসিল, তখন সেই সখী সেই ইন্দ্রনামক ব্রাহ্মণকুমারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে সকল কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইল। ইন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই লম্পট; সুতরাং সখী তাহাকে সেই রাত্রিতে অতি সত্বরই অহল্যার নিকটে লইয়া আসিল। অনন্তর অহল্যা বিবিধ মাল্যচন্দনে বিভূষিতা হইয়া কোন এক গুপ্তগৃহে গমনপূর্ব্বক সেই শৃঙ্গরলম্পট ইন্দ্রের সহিত রতিরঙ্গে নিরত হইল। বসন্ত-সমাগমে বল্লী যেমন রসভরে আবর্জ্জিতা হইয়া পড়ে, সেই তরুণী অহল্যা তেমনি সেই হার-কেয়ূর-শোভী প্রাণ-প্রিয়তমের রতিরস-হিল্লোলে মগ্ন হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে অহল্যা ইন্দ্রের প্রতি এতদূর অনুরাগিণী হইলেন যে, এই সমস্ত জগৎই তাঁহার চক্ষে ইন্দ্রময় হইয়া উঠিল। তাঁহার নিজের স্বামী একজন বিশিষ্ট রাজা এবং তিনি বহুগুণের আধার; তত্রাচ অহল্যা আর সেই হইতে তাঁহার প্রতি কোনই অনুরাগ প্রকাশ করিল না।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে ইন্দ্রের প্রতি অহল্যার অবৈধ অনুরাগের কথা মহীপতির কর্ণগোচর হইল। তত্রাচ মহারাজ অহল্যাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। অহল্যা তাঁহার বদনাকাশের চন্দ্রিকার ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। কিন্তু মহারাজের প্রতি অহল্যার সে ভাব ছিল না। মহারাজকে দেখিলে অহল্যা কিছুমাত্র উৎফুল্ল হইতেন না। পরন্তু যখন ইন্দ্রকে তিনি ধ্যান করিতেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কৈরববৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এ দিকে ইন্দ্রেরও সর্ব্বেন্দ্রিয় রাজমহিষী

অহল্যাতে সমাসক্ত হইয়াছিল। ইন্দ্র অহল্যার বিরহে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিত না। ক্রমে তাঁহাদিগের উভয়ের প্রবল প্রেমব্যবহার প্রকাশ্যতই চলিতে লাগিল। তাহাদের এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহার আরার মহারাজের কর্ণগোচর হইল। মহারাজ ইহাতে নিতান্তই ব্যথিত হইলেন। এবার তিনি উভয়ের প্রগাঢ় প্রণয়ভাব স্বচক্ষেই লক্ষ্য করিলেন এবং বহুবিধ দণ্ড প্রয়োগে তাহাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শীতসময়ে তাহাদের উভয়কে জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র খিন্ন হইল না; বরং তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাহারা উভয়ে হাসিতে লাগিল। মহারাজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে দুর্ম্মতিদ্বয়! তোরা আমার এই কঠোর শাসনেও কষ্ট ভোগ করিতেছিস্ না কেন?

তখন ইন্দ্র ও অহল্যা সেই জলাশয় হইতে উত্থিত হইয়া মহারাজকে কহিল,—রাজন্! আমরা পরস্পর পরস্পরের অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি স্মরণ করিবামাত্র আত্মাকে ভুলিয়া যাই, তৎপ্রতি কি কঠোর দণ্ড হইতেছে বা না হইতেছে, তাহা আমাদের জ্ঞান থাকে না। আপনি যতই কঠোর দণ্ড করুন না, আমরা তাহাতে যে পরস্পর নিঃশঙ্কভাবে একত্র থাকিতে পারি, ইহাই আমাদের অত্যন্ত হর্ষের বিষয় হয়। হে মহীপাল! আপনি যদি অতঃপর আমাদের অঙ্গসমূহ কর্ত্তন করিয়াও দেন, তাহাতেও আমরা কিছুমাত্র ব্যথিত হইব না। রাজা কিন্তু তাহাদের শাসন ব্যাপার হইতে কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে উত্তপ্ত ভর্জ্জনপাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কিছুমাত্র খিন্ন হইল না, অধিকন্তু পরস্পর পরস্পরকে স্মরণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বের ন্যায়ই উত্তর করিতে লাগিল। তৎপরে তাহারা হস্তিপাদতলে প্রক্ষিপ্ত হইলেও অখিন্ন অবস্থায় পূর্ব্ববৎ পরস্পরের স্মরণে সংহৃষ্ট হইয়া রাজাকে উত্তর দিতে লাগিল। অনন্তর কশাহত হইয়াও তাহারা যথাপূর্ব্ব অখিন্নভাবে রাজার সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে এবং আরও নানারূপে রাজা তাহাদের উপর বারবার দণ্ড প্রয়োগ করিতে লাগিলেম; কিন্তু তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। প্রতিবারেই তাহারা অখিন্নচিত্তে রাজার প্রশ্নের

একই রূপ উত্তর করিতে লাগিল। ইন্দ্র কহিল,—রাজন্! এই নিখিল জগৎই আমার নিকট দয়িতাময়; সুতরাং আমার এই দেহের আপনি যতই নির্য্যাতন করুন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইবে না। আর এই অহল্যার নিকটও সকল জগৎই মন্ময় বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং ইহাকে নিগ্রহ করিলেও ইহার কোনই দুঃখ হইবে না। হে রাজন্! আমি ত মনোমাত্র বৈ কিছুই নহি। কেননা, মনই পুরুষ বলিয়া বিদিত। এই যে দৃশ্যমান দেহ, ইহা মনেরই প্রপঞ্চমাত্র; সুতরাং যদি এককালীন সমগ্র দণ্ডও প্রয়োগ করা হয়, তথাপি এই বীর্য্যসম্পন্ন মনের অণুমাত্রও ভেদ হইবার নহে। মহারাজ! অনুভূয়মান বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয়-সম্পন্ন যে মন, সেই মনকে যে সকল শক্তিপ্রয়োগে ভেদ করা যায়, সেই শক্তিরাশি কি প্রকার? আর সে শক্তি কাহারই বা বিদ্যমান? এই দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হউক, আর ক্ষয় পাইয়াই যাউক, মন আপন ভাবনা-গোচর পদার্থে সমাসক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ একই ভাবে অবস্থান করিতে থাকে। হে নৃপ! মন যদি অভিলষিত পদার্থে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহে, তাহা হইলে শরীরস্থ ভাব বা অভাবরাশি তাহাকে কিছুই বাধা দিতে পারে না। হে মহীপতে! মন তীব্রবেগে যে বিষয় লইয়া ভাবনা করে, তাহাকেই সে স্থিরভাবে দেখিতে থাকে; পরন্তু শরীরের ব্যাপার কিরূপ হইল না হইল, তৎপ্রতি তাহার কিছুই লক্ষ্য থাকে না। হে রাজন্! বর প্রদান বা অভিসম্পাত-দান প্রভৃতি করিয়া যতকিছু ক্রিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে এমন কোন ক্রিয়াই নাই, যাহা তীব্রবেগে ইষ্ট বস্তুতে সমাসক্ত মনকে বিচলিত করিতে পারে। যে অভীষ্ট বিষয়ে মন একবার তীব্রবেগে সমাসক্ত হইয়া পড়ে, সেই বিষয় হইতে মনকে বিচলিত করিবার ক্ষমতা কোন পুরুষেরই নাই। পুরুষের পক্ষে সে বিষয়ে চেষ্টা করা, মৃগগণের মহাদ্রি-চালন-চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। যেমন সমুচ্চ দেবমন্দিরে দেবী ভগবতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি এই অসিতা-পাঙ্গী অহল্যা আমার মনোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিতা। এই জীবিতেশ্বরী প্রিয়া আমার সঙ্গিনী হইয়াছেন, এখন আর আমার কোন দুঃখই নাই। মেঘমালা আসিয়া গিরিতটে সংলগ্ন হইলে গিরি যেমন আর গ্রীষ্মতাপ অনুভব করে

না, আমিও তেমনি প্রিয়ার সঙ্গসুখে কোন কিছুই দুঃখ বলিয়া বোধ করিতেছি না। হে রাজন্! অধিক আর কি কহিব, আমি যেখানেই অবস্থান করি অথবা যেখানেই পতিত হই, প্রিয়তমার সঙ্গম-সুখ ব্যতীত সেখানে আর কিছুই অনুভব করি না। সর্ব্বত্রই আমার প্রিয়তমা আর তাহারই সঙ্গমসুখে সদাই আমি আত্মহারা। সে সুখ ব্যতীত আর কিছুই আমার অনুভূতি-বিষয় হয় না। এই অহল্যা নামতঃ আমার দয়িতা বটেন; কিন্তু অধুনা আর সে অবস্থা নাই। এক্ষণে ইনি মন দ্বারা ইন্দ্রনামক মন আকারে পরিণত হইয়াছেন। অর্থাৎ একই মন দুইরূপে দৃঢ়ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহাকে আর স্বভাব হইতে স্বভাবান্তরে লইয়া যাওয়া শত যত্নেরও সাধ্য নয়। হে ভূপতে! ধীর ব্যক্তির মন যদি এক কার্য্যে একান্ত নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহা সুমেরুর ন্যায় অটল হইয়া পড়ে; বর কিম্বা অভিশাপের প্রভাবেও তাহা একটুও বিচলিত হয় না। হে রাজন্! বর ও অভিশাপের প্রভাবে দেহের অন্যথাভাব হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু ধীর স্থির মন তাহাতে টলিবার নয়—সে সদাই বিজিগীষুর ন্যায় একইরূপে বিরাজ করিতে থাকে। হে ভূপতে! এই যে বৃথা-সমুৎপন্ন জীবদেহ-কল্পনা, ইহার একাংশও মনের কারণ নয়। নিখিল বনজাত লতা-সমষ্টি-গত রসের প্রতি যেমন বারিই একমাত্র কারণ, তেমনি এই দেহ-সমূহের প্রতিও মনই প্রধান কারণ। হে মহাত্মন্! জানিবেন—মনই আদ্য শরীররূপে নিরূপিত। এই দেহসমূহ পরে সেই মন দ্বারাই কল্পিত হয়। ঐ মনঃশরীরই আত্মার আদ্য ভোগায়তন। ঐ মন যেখানেই অহন্তাবে আবির্ভূত হয়, সেইখানেই সেই সেই দৃশ্যদেহ উৎপাদন করে। উল্লিখিত উৎপাদিকাশক্তি মন ব্যতীত অপর কাহারও নাই। সুভগ! জানিবেন—মনই আদিতে পুরুষের অঙ্কুরাকারে আবির্ভূত হয়। পরে ঐ মনোরূপী অঙ্কুর হইতে তরুপল্লবের ন্যায় দেহসমূহ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অঙ্কুর যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে পল্লবোদয় অসম্ভব হইয়া উঠে; পরন্তু পল্লব নষ্ট হইলে অঙ্কুর ত নষ্ট হইবার নয়। এইরূপে এই স্বপ্নভূমিতে এই দেহ যদি একবার নষ্ট হয়, তাহা হইলে চিত্ত পুনরায় নানাবিধ নূতন দেহ সত্বর উৎপাদন করিয়া লয়; কিন্তু চিত্ত যদি ক্ষয় পাইয়া যায়, তবে

আর দেহের ক্ষমতা কিছুই থাকিবার নয়। তাই বলিতেছি—মহারাজ! আপনি চিত্তরত্নকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন।

হে রাজন্! এই হরিণাক্ষী প্রেয়সী যুবতী আমার মনঃস্বরূপে বিরাজিত; তাই ইহাকেই আমি সকল দিকে অবলোকন করিতেছি। ইহাতেই আমার অপার আনন্দ আবির্ভূত হইতেছে। আপনি দুঃখ-জনক ও অতি কঠোর ভাবিয়া যে সকল দণ্ড আপনার পুরবাসীদিগের সম্মুখে আমার প্রতি প্রয়োগ করিতেছেন, আমি ক্ষণেকের জন্যও সেই দণ্ডদান-জনিত কোন যাতনাই অনুভব করিতেছি না।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

ভানু কহিলেন,—ব্রহ্মন্! তৎকালে ইন্দ্র এই কথা কহিলে, রাজীব-নয়ন নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন তদীয় পার্শ্ববর্ত্তী ভরতনামধেয় মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মে অভিজ্ঞ। এই দেখুন, এই দুরাত্মা ইন্দ্র আমার দারাপহরণ করিয়াছে, অথচ দেখিতেছি, এই ব্যক্তি মুখে আবার অত্যধিক ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে। অতএব হে মহামুনে! আপনি সত্বরই ইহার পাপের অনুরূপ শাপ প্রদান করুন। আপনি অবশ্যই জানেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, আবার বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপই হইয়া থাকে।

রাজশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদ্যুম্ন ভরতমুনিকে এই কথা কহিলে, তিনি সেই দুরাত্মা ইন্দ্রের পাপকার্য্যের সম্যক্ বিচার করিয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন যে, ওরে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই সত্বরই এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী পাপিনীর সহিত বিনাশদশায় পতিত হ'। তখন মুনিপ্রদত্ত এই অভিশাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ইন্দ্র ও অহল্যা প্রত্যুত্তরে রাজা ও মুনিকে এই কথা কহিল, —অহো, তোমরা একান্তই অজ্ঞান! কেননা, এই শাপপ্রদানের ফলে

তোমাদেরই দুশ্চর তপস্যা ক্ষয় পাইয়া গেল। আমাদের ইহাতে কিছুই অনিষ্ট হইবার নয়। আমরা শুদ্ধ-চিত্তস্বরূপী; সুতরাং দেহ নষ্ট হইলে, আমাদের ত কিছুই নষ্ট হইবে না। কেহ কি কখন চিত্তকে নষ্ট করিতে পারে? কেহই তাহা পারে না। কেননা, সেই চিত্ত সূক্ষ্ম, চিন্ময় এবং দুর্লক্ষ্য।

ভানু বলিলেন,—ইন্দ্র ও অহল্যার মন পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহে সম্বদ্ধ ছিল। তাহারা শাপপ্রভাবে বৃক্ষচ্যুত পল্লবদলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর উহারা বিষয়ানুরাগে একান্ত আসক্তি নিবন্ধন মৃগযোনি লাভ করিল। পরে প্রগাঢ় অনুরক্তিবশে পুনরায় বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমী হইয়া জন্মিল। হে বিভো! অবশেষে সেই পতিপত্নী পরস্পর নিতান্ত প্রণয়াসক্ত হইয়া আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তপঃপরায়ণ মহাপুণ্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-দম্পতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। হে প্রভো! ভরতমুনি যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের মাত্র দেহ আক্রমণ করিতেই সমর্থ হইয়াছিল; পরন্তু সে শাপে তাহাদের মনোনিগ্রহ করিতে পারে নাই। সেই মোহ-সংস্কার বশতঃ অদ্যাবধি তাহারা যে যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সর্ব্বত্রই সেই দম্পতিভাবেই অবস্থান করিতেছে। ভগবন্! অধিক কি কহিব, তাহাদের সেই অনুরাগ অকৃত্রিম প্রেমরসে অনুবিদ্ধ এবং অনির্ব্বচনীয়। সে কমনীয় অনুরাগ দর্শনে অচেতন বৃক্ষগণও প্রেমরসে অনুবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গারচেষ্টায় আকুল হইতে থাকে।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

ভানু কহিলেন,—ভগবন্! ইন্দ্র ও অহল্যার উল্লিখিত বিবরণ অনুসারেই বলিতে হয়, এই মন কিছুতেই দমনীয় হইবার নহে। কোনরূপ অভিশাপাদি দ্বারাও ইহাকে নিগ্রহ বা ভেদ করা যায় না। এই জন্যই

আপনাকে বলিতেছি,—ব্রহ্মন্! আপনি এই ইন্দুনন্দনগণের স্বষ্টিক্রম কিছু-তেই বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ আপনি মহাত্মা, আপনার পক্ষে এরূপ করিতে যাওয়াও সঙ্গত নহে। আপনি সকলেরই নাথ। এই জগতে কিম্বা অপরাপর জগতে এমন কি বস্তু রহিয়াছে, যাহা আপনার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তির খেদের কারণ হইতে পারে?

হে ব্রহ্মন্! একমাত্র মনই এই জগতের কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত। মনই পুরুষপদ-বাচ্য। মনের নিশ্চয়ে যাহা সম্পাদিত হয়, দ্রব্য, ওষধি বা দণ্ড দ্বারা তাহা নিবারিত হইবার নহে। বস্তুতঃ স্বচ্ছ মণিগত প্রতিবিম্ব-দেহ কেহ কি কখন বিনাশ করিতে পারে? তাহা পারে না। এইরূপ মানসস্বষ্টিও নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এই কারণেই আপনাকে কহিতেছি, এই ইন্দুনন্দনেরা সমুদ্দীপ্ত স্বষ্টিভ্রমে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, থাকুন, আপনার ত তাহাতে ক্ষতি কিছুই দেখি না। আপনিও প্রজাস্বষ্টি করিয়া অবস্থিত হউন। স্বষ্টি করিবার স্থানের অভাব নাই; কেননা, বুদ্ধ্যাকাশ অনন্ত। চিত্তাকাশ, চিদাভাসাকাশ ও মহাকাশ, এই আকাশত্রয় সাক্ষিকূটস্থ চিদা-কাশ হইতেই প্রকাশিত; স্থতরাং অনন্ত। অতএব হে জগৎপতে! আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার চিত্তাকাশে এক, দুই, তিন অথবা অনন্ত স্বষ্টি করিতে পারেন। আপনি তাহাই করুন, করিয়া আত্মাতে অবস্থিত হউন। কৈ ইন্দুনন্দনেরা আপনার কি কিছু গ্রহণ করিয়াছে? কিছুই ত করে নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মহামুনে! অনন্তর ভানু এইরূপে ঐন্দব জগদ্বৃন্দের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে আমি বহুক্ষণ চিন্তা করিবার পর এই কথা কহিয়াছিলাম যে, হে ভানো! তুমি উপযুক্ত কথাই কহিয়াছ। এই আকাশ বিস্তৃতই রহিয়াছে। এইরূপে মন এবং চিদাকাশ, ইহারাও বিস্তৃতরূপে বিরাজ করিতেছে। আমি আমার অভিপ্রেত স্বষ্টি ইহাতেই স্থাপনপূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম সমাধা করিব। হে ভাস্কর! আমি সত্বরই বিবিধ ভূতবৃন্দের কল্পনা করিতেছি; পরন্তু হে ভগবন্! আপনিই অধুনা মৎকৃত স্বষ্টির প্রথম মনুরূপে বিরাজিত হউন এবং আমার নিয়োগ অনুসারে আপনি যথেস্ট স্বষ্টি বিস্তার করুন।

অতঃপর সেই মহাতেজা প্রভাকর আমার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া আপন আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। হে তপস্বিবর! সূর্য্য এই ঐন্দব সৃষ্টিতে একভাগ দেহে সূর্য্যস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক অম্বরপথে পরিভ্রমণ করত দিবসপরম্পরা রচনা করিতে লাগিলেন এবং দ্বিতীয় দেহভাগে মনু হইয়া কিঞ্চিৎ কাল মধ্যেই মদভিমত সেই সেই সৃষ্টি সমূহ বিস্তার করিলেন।

হে মুনে, বশিষ্ঠ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা মনের স্বরূপ, সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সকলই কহিলাম। এই চিত্তের যে যে অংশ প্রতিভাস বা চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সেই অংশই প্রকাশিত এবং স্থৈর্য্য ও সাফল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে ঐ ঐন্দব-গণের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখ, ঐ ইন্দুনন্দনেরা সাধারণ ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রতিভাস-বশতই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল; সুতরাং বুঝিয়া দেখ —মনের শক্তি কতদূর! ইন্দুনন্দনেরা যেমন চৈতন্যভাব হইতে চিত্ত ভাব এবং তাহা হইতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমরাও তেমনি উল্লিখিতরূপে আত্মচৈতন্য হইতে চিত্ততা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিভাসপ্রাপ্ত আত্মাই চিত্ত, সেই প্রতিভাসই মন ও দেহ প্রভৃতি; চিত্ত ভিন্ন অপর কিছুতেই দেহপ্রতীতি হয় না। চিত্ত আত্মাতেই কল্পিত হইয়া থাকে। মরিচখণ্ডাদির আস্বাদবৎ তাদৃশ কল্পনা, স্ব স্ব কাম, কর্ম্ম ও বাসনার অনুসারে আপনা হইতেই বিভিন্নরূপে হয়। চিত্তবৎ প্রতিভাত সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহই যৎকালে ভ্রান্তিবলে আপনাতে স্থূল ভাব ধারণ করে, তখন তাহা দেহনামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবার ঐ চিত্তের বাসনা যখন ক্ষীণভাবে থাকে, তখন উহা জীবনামে নিরূপিত হয়। চিত্তের দেহত্রয় কল্পনা যৎকালে শান্ত হইয়া যায়, জানিবে—তখন উহা পরব্রহ্ম-রূপেই প্রতিভাত হয়। হে বশিষ্ঠ! আমি বা অপর কেহই বিভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছি না, একমাত্র বিচিত্র চিত্তই সর্ব্বপ্রপঞ্চরূপে বিভিন্নভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। উহা অসৎ হইলেও ঐন্দবগণের সম্বিদের ন্যায় সত্তা লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয়বশতঃ উহা সদাকারে প্রতিভাত হইতেছে। ঐন্দবগণের মন যেমন ব্রহ্মা, এই আমিও তেমনি ব্রহ্মারূপে বিরাজমান। এই যে ঐন্দবকৃত চমৎকৃত সৃষ্টিপরম্পরা, এ সকলই মদীয় চিত্ত কল্পনা

বৈ কিছুই নয়। চিত্তের বিলাসস্বরূপেই আমি ব্রহ্মা হইয়া বিরাজমান। জানিবে,—পরমাত্মাই সর্ব্ব-প্রপঞ্চশূন্য আত্মাকাশ হইতে পৃথকের ন্যায় হইয়া দেহাদিভাবে প্রতিভাত হইতেছেন। যাহা বিশুদ্ধ চিৎ, তাহা পরমার্থ-স্বরূপ; ভাবনাবশে—স্বীয় মোহের প্রচ্ছাদনে তাহাই জীব এবং সেই জীবই পুনরায় মন হইয়া মিথ্যা দেহাদিভাব অনুভব করিয়া থাকে। আপনার অজ্ঞানশক্তি-জনিত স্বপ্ন যেমন জাগ্রদাত্মস্বরূপে পরিণত হইয়া প্রতিভাত হয়, এই চিদ্বপুঃ পরমাত্মাও তেমনি ঐন্দব সংসারবৎ সর্ব্বস্বরূপ হইয়া প্রকাশমান রহিয়াছেন। দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় এই সমগ্র জগৎ যখন সূক্ষ্মতর বাসনাময় শব্দতন্মাত্রের অধ্যাসপূর্ব্বকই হয়, তখন ইহা যে ঐন্দবগণের চিত্তাকাশের ন্যায় রূঢ়, এইরূপই সম্ভাবনা করা যায়। চিত্ত হইতে সমস্ত হইয়া থাকে। বলিতে পার, যদি উদাসীন চিত্ত হইতেই সমস্ত রূঢ় হয়, তাহা হইলে উহা কেন দেহাদিতে অহম্ভাবের অভিমানে অনুদাসীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঐ যাহা অহম্ভাবময় অভিনিবেশস্বরূপ অনুদাসীন স্বভাব অনুভূত হয়, উহা সৎ নহে এবং উহাকে অসৎও বলা যায় না। যাহা হইতে সত্তা ও অসত্তা উভয়েরই আবির্ভাব, তাহা সৎ ও অসৎ এই উভয়রূপেই বিরাজমান। উহা উপলব্ধি বিষয়, তাই সৎ আবার প্রকৃত বিচারক্ষেত্রে উপলব্ধি বিষয় হয় না বলিয়া উহা অসৎ। এই যে সঙ্কল্পাত্মক বৃহদাকার মন, ইহাকে জড় ও অজড়, এই উভয় বলিয়াই জানিবে। মন ব্রহ্মস্বরূপ, তাই উহা অজড়, আর যেহেতু দৃশ্য, সেই হেতু জড়। যখন দৃশ্যানুভূতি হয়, এই মন তখন দৃশ্য হইয়া থাকে, আর ব্রহ্মানুভূতি সময়ে ইহা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়। সুবর্ণে যেমন সুবর্ণত্ব ও কটকত্ব এই উভয় ধর্ম্মই অধিষ্ঠিত, এই মনেও তেমনি দৃশ্যত্ব ও ব্রহ্মত্ব এই উভয় ধর্ম্মই বিরাজিত। ফল কথা, চিন্ময় ব্রহ্ম যখন সর্ব্বময়রূপে বিদ্যমান, তখন এই নিখিল জড় পদার্থই ঐ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্ময়ই বলিতে হইবে। পাষাণাদি স্থাবর পদার্থকে যদি ঐ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহা চেতন বা জড়, এ দুয়ের কিছুই হইতে পারে না। চৈতন্য ব্যতীতও দারু ও পাষাণাদির উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। কেন না, পরস্পর সাদৃশ্যসম্বন্ধ না রহিলে

উপলব্ধি হয় না। ভাবার্থ এই যে, জ্ঞান-চৈতন্যস্বরূপ পাষাণাদিকে যদি কেবল জড় বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, উহাতে চৈতন্য নাই। চৈতন্য না থাকিলে উহার জ্ঞান হয় না অথচ কাষ্ঠ-পাষাণাদি লোকের জ্ঞানগোচর হয়। সুতরাং সাদৃশ্যবিষয়ে সমভাবাপন্ন বস্তুদ্বয়ের উপলব্ধি যখন হইল, তখন জানিবে—উপলব্ধির বিষয়ীভূত নিখিল পদার্থই অজড়। বস্তুতঃ মহতী মরুভূমিতে যেমন তরুলতা প্রভৃতি কিছুই উৎপন্ন হয় না, তেমনি অনির্দ্দেশ্য যে ব্রহ্মপদ, তাহাতে জড়ত্ব, চেতনত্ব, ভাব ও অভাবাদি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ফল কথা, তাহাকে জড় বা অজড় কিছুই বলা চলে না। তবে কথা এই, চিৎ যখন চেত্যরূপে কল্পিত হইয়া মন-আকারে পরিণত হয়েন, তখন উহার চিদংশ অজড় এবং চেত্য অংশ জড় হইয়া থাকে। ঐ যে চিদংশ উহাই বোধ-অংশ, আর যাহা চেত্য অংশ, তাহা জড়স্বরূপে দৃশ্য। এইরূপে জীব জগদ্ভ্রান্তি দর্শন করিতে করিতে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা বিশুদ্ধ চিৎস্বভাব, তাহাই চিত্ত ও জগৎ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়; সুতরাং চিদেকবুদ্ধিতে সমুপলব্ধ যে নিখিল জগৎ, তাহা সেই চিৎই, আর যাহা দ্বৈতবুদ্ধিতে উপলব্ধ, তাহাও সেই চিৎ বৈ আর কিছুই নয়। ভ্রমবশতই উল্লিখিত চিৎ আপন স্বরূপকে দৃশ্যরূপে দর্শন করেন; তাই তিনি বিভাগ-বিহীন হইয়াও স্বীয় বিভাগ কল্পনা-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। বলিতে পার, ভ্রান্তিটা কি? উত্তরে বলিতে হইবে, ভ্রান্তি নামে কোন একটা পদার্থই নাই। আর পুরুষও যে ভ্রান্ত নহেন, একথাও নিশ্চয়ই। যিনি পুরুষ, তিনি পরিপূর্ণ পয়োধির ন্যায় বিরাজমান। এই চিত্তের সমস্তরূপ যদিও জড়, তথাপি উহা চিৎ বৈ আর কিছুই নয়; কেন না, জড়ভাবেও চৈতন্যাংশের অনুভব হয়। যাহা ইহার বোধাংশ, তাহাই চিদ্ভাগ আর যাহা অহংভাগ, তাহাই জড়তা। জলের তরঙ্গ যেমন জল হইতে ভিন্ন নয়, তেমনি পরম তত্ত্বে, একটু মাত্রও পৃথক্ অহম্ভাব নাই। কেন না, সেই যে পরম তত্ত্ব, তাহাই ত জ্ঞানের সারাংশ। ঐ পরম তত্ত্বে যে অহংরূপে দৃশ্য চেত্য অংশ সমুত্থিত হয়, উহা মরীচিকায় জলের ন্যায় বস্তুত অলীক বৈ আর কিছুই নয়। ঐ যে নিরাময় আত্মবস্তু, উহাকে তুমি অহম্ভাবের আশ্রয় বলিয়া মনে করিও

না। ঘনীভূত শৈত্যই যেমন হিম হয়, তেমনি ঘনীভূত বাসনায় চিৎস্বভাবই অহংস্বরূপ হইয়া থাকে। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হয়। স্বপ্নে যেমন আপনার মরণ দর্শন হয়, তেমনি চিৎ আপনিই জাড্য দর্শন করেন। চিৎ সর্ব্বাত্মস্বরূপ, তাই তিনি সর্ব্ব-শক্তির আবিষ্কারক। জ্ঞানের দৃঢ়তা হইলেই চিৎ সাম্য বা পূর্ণভাব ধারণ করেন, তদ্ব্যতীত সে ভাব তিনি কখন ধারণ করেন না। পূর্ব্বে যে মনের কথা কহিয়াছি, সেই মনই পদার্থপরম্পরার আদিরূপে সর্ব্বস্বরূপ হইয়া বিলসিত হইতেছে। নানাত্মক যে চিত্ত, তাহাই আতিবাহিক দেহ। উহা আকাশবৎ স্বচ্ছ। ঐ চিত্তের যে স্থূলদেহাদি তিনটী দেহ, তাহার যদি প্রতিভাসস্বরূপ পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে চিত্ত যে প্রাতিভাসিক, ইহা স্বয়ংই বিচার্য্য হইয়া উঠে। বিচার বলে চিত্তরূপ তাম্রকে যদি বিশোধিত করিয়া লওয়া যায়-তাহা হইলে পরমার্থরূপ সুবর্ণভাব সমধিগত হয়। তখন তাহাতে প্রতিনিয়ত প্রচুরতর আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেহ ত পাষাণ-খণ্ডস্বরূপে বিদ্যমান, তাহার শোধণ করিতে গিয়া কোন পুরুষার্থই হয় না। যাহা নিত্য বিদ্যমান, তাহাই শোধিত হইতে পারে এবং তাহারই বোধ সফল হইয়া থাকে। দেহাদির বিদ্যমানতা নাই, তাহার শোষণ নিষ্ফল। আকাশকল্পিত পাদপদিগকে শোধন করিতে গিয়া কি দেখা যায়? ফলে কিছুই নয়; আকাশে পাদপ যেমন অলোক, আত্মাতে দেহাদিও তেমনি অলীক বলিয়াই বুঝিবে। যদি দেহাদি অবিদ্যা সত্য হইত, তাহা হইলে তাহার শোধনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা অনুচিত হইত না। অসত্য দেহাদিকে যাহারা আত্মা বলিয়া অভিহিত করে এবং স্ব স্ব মতের পরিপোষক প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দিয়া থাকে, পুরুষের মধ্যে সেই সকল অজ্ঞদিগকে মেষস্বরূপেই বর্ণন করা হয়। এই মূর্ত্তিবর্জ্জিত চিত্ত যেরূপে ভাবিত হয় এবং ক্ষণ-মধ্যেই তদনুরূপ মূর্ত্তি প্রভৃতিভাব ধারণ করিয়া লয়, ইন্দুনন্দনগণ এবং অহল্যা ও ইন্দ্র প্রভৃতির সুদৃঢ় নিশ্চয়ই তাহার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ্য। এই প্রতিভাসিক আত্মস্বরূপ চিত্ত যে যে ভাবে স্ফুরিত হয়, সেই সেই প্রকার দেহ ভাবেই তাহা আবির্ভূত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা দেহ বলিয়া একটা কিছুই নাই 'অহং' বা আমি, ইহারও

পৃথক্ স্বরূপ নাই। তাই বলিতেছি, একমাত্র একরস বিজ্ঞানঘন যে আত্মচৈতন্য, তাহা তুমি অবগত হইয়া নিরীহভাবে অবস্থান করিতে থাক। এই আত্মা কল্পনাবলেই দেহ হয় এবং কল্পনাবলেই এই যাবতীয় ভোগ্য বস্তু সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যদি ঐ কল্পনা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে দেহাদি যে কিছু ভাব, সকলই নষ্ট হইয়া যায়। বালকেরা যক্ষ কল্পনা করিয়াই ভীত হয়; প্রকৃতপক্ষে যক্ষ বলিয়া একটা কিছুই নাই বলিয়া তাহা করায়ত্ত করিত সমর্থ হয় না।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবংশ-নায়ক! সেই ভূতপতি ভগবান্ পদ্মযোনি যৎকালে আমাকে ঐরূপ কথা কহিতেছিলেন, তখন আমি তদীয় কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—হে ভগবন্! আপনি শাপ-মন্ত্রাদির শক্তি-সমূহকে অমোঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অথচ এক্ষণে সে সকল পুনরায় মোঘ বা ব্যর্থ বলিলেন কেন? ইহা প্রত্যক্ষতই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাপ ও মন্ত্রের প্রভাবে জন্তুগণের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ বিমূঢ় হইয়াছে। পবন ও পবনস্পন্দন যেমন অভিন্ন এবং তিল ও তৈল যেমন পরস্পর ভিন্ন নয়, তেমনি এই মন ও দেহকে অভিন্ন বলা যায়। ফল কথা, সেই যে আত্মা, তিনিই দেহ এবং মন। অথবা দেহ নাই। কেবল মনই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়, মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় এবং দ্বিতীয় চন্দ্রদর্শনের ন্যায় ভ্রমবশতঃ বৃথা দেহভাব অনুভব করিতেছে। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে, দেহ ও মন, উভয়ের মধ্যে একের নাশে উভয়েরই নাশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। মন নাশ হইলে দেহ নাশ ত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং হে প্রভো! মন কেন

শাপাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়, আবার কেনই বা শাপাদিতে আক্রান্ত হয় না? হে পরমেশ! এ রহস্য আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এই জগৎকোশে এমন কিছুই বিদ্যমান নাই, যাহা শুভকর্ম্মানুসারী বিশুদ্ধ পুরুষকার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া না যায়। এই জগতে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত যত কিছু জাতি বা যত কিছু শরীরধারী আছে, তাহারা সকলেই সর্ব্বদা দ্বিশরীরী। উক্ত দ্বিবিধ শরীর মধ্যে এক শরীর হইল মনোময় এবং অপর শরীর হইল মাংসময়। তন্মধ্যে মনোময় শরীরই ক্ষিপ্রকারী ও সতত চঞ্চল। আর যাহা মাংসময় শরীর, তাহা স্থূল এবং একান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই শেষোক্ত মাংসময় শরীরে সকলই সঙ্গত হইতে পারে। এই শরীরই অভিশাপ, অভিচার, বিদ্যা, শাস্ত্র ও বিষাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। ইহাই মূকপ্রায়, অশক্ত, দীন, ক্ষণ-বিনাশশীল ও পদ্মপলাশগত সলিলবৎ চঞ্চল এবং ইহাই দৈবাদির বশীভূত হইয়া অবস্থিত। এই ত্রিভুবনে শরীরধারীদিগের যে মনোনামক দ্বিতীয় শরীর, তাহা আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত হয় না। যদি নিয়ত পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা যায়, তাহা হইলে ঐ চিত্তদেহকে দুঃখাদি আসিয়া অভিভূত করিতে পারে না এবং ঐ দুঃখাদি দ্বারা উহা দূষিতও হয় না। দেহীদিগের মনোময় দেহ যে-যেরূপে যত্ন করিতে থাকে, সেই সেইরূপেই উহা স্বীয় নিশ্চয়ের ফলভাগী হয়। পরন্তু মাংসময় শরীরের কোন পুরুষকারই সফল হয় না। মনোময় দেহের যে কিছু চেষ্টা, সকলই সফল হইয়া থাকে। যে চিত্ত সতত পবিত্র বিষয়ের স্মরণ করে, শিলা-নিক্ষিপ্ত সায়কবৎ সে চিত্তে অভিশাপাদি সকলই বিফল হইয়া যায়। মাংসময় দেহ সলিলে, পঙ্কে বা পাবকে যেখানেই পতিত হউক, যেভাবেই থাকুক, মন যাহা অনুসন্ধান করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ মাংসময় দেহের লাভালাভ বা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি মনের অনুসন্ধানক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

হে মুনে! সমুদায় দেহাদিভাবের উপশম হইয়া গেলেও বিনা বিঘ্নে যে প্রযত্নসমূহের ফল লাভ হয়, একমাত্র মনই তাহার হেতু। পূর্ব্বে যে কৃত্রিম ইন্দ্রের কথা কহিয়াছি, মনে করিয়া দেখ,—তিনি সুদৃঢ় পৌরুষবলেই অন্তঃকরণকে প্রিয়াময় করিয়া কোন দুঃখই দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন

নাই। আর দেখ, পুরাকালে মাণ্ডব্য মুনি শূলে সমারোপিত হইলেও আপনার মনকে তিনি পৌরুষবলে বিষয়-বিরত ও বিগতজ্বর করিয়া সর্ব্বক্লেশ জয় করিয়াছিলেন। দীর্ঘতমা নামে কোন এক ঋষি ছিলেন, তিনি পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়া অন্ধকূপে পতিত হয়েন। সেই কূপমধ্যে থাকিয়াই তিনি মানসিক যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক স্বর্গীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে ইন্দুনন্দনগণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা নর হইয়াও পুরুষোচিত অধ্যবসায়ে ধ্যান দ্বারা যে ব্রহ্মপদবী লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা খণ্ডন করিতে অক্ষম। এইরূপ আরও বহু ধীরচেতা সুরগণ ও মহর্ষিগণ চিত্ত হইতে আত্মানুসন্ধান কিছুমাত্রই পরিত্যাগ করেন নাই। পদ্ম নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিলে শিলার যেমন খণ্ডন হয় না, আধি, ব্যাধি, শাপ কিম্বা রাক্ষসদিগের আক্রমণেও চিত্ত তেমনি খণ্ডিত হইবার নয়। তবে যে কোথাও কোথাও শাপাদি দ্বারা অভিভূত হইতে দেখা যায়, সে-সেস্থলে বুঝিতে হইবে, তাহাদের মনই আত্মবিবেকে সক্ষম হয় নাই এবং যথোচিত পুরুষকারও অবলম্বন করিতে পারে নাই। যাহাদের মন সততই সাবধান, তাহারা কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, কোন অবস্থাতেই সংসারে দোষজালে জড়িত হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রাদেশ আছে যে, পুরুষ পুরুষকারযুক্ত মন দ্বারা নিজেই নিজেকে পবিত্র পথে নিয়োজিত করিবে।

হে মুনে! মনে যদি কোন বিষয় কিঞ্চিৎমাত্রও প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে বাল-কল্পিত বেতালবৎ ক্ষণকাল মধ্যেই তাহা মনে চিরনিরূঢ় ও স্থূল হইয়া সত্যবৎ উপভোগ-ক্ষম হইয়া উঠে। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড লইয়া ঘট প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হইলে, মৃৎপিণ্ড তাহার পিণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘটভাব ধারণ করে, তেমনি প্রতিভাসের পর মনও প্রাক্তন ভাব পরিহার করিয়া পরবর্ত্তী নবভাব ধারণ করিয়া থাকে। হে মুনে! জল যেমন স্পন্দন মাত্রেই তুঙ্গ তরঙ্গাকার প্রাপ্ত হয়, মনও তেমনি ক্ষণকাল মধ্যেই ভাবনাবলে অভিনব ভাব্যের প্রতিভাসতা উপগত হইয়া থাকে। অঙ্গুলি দ্বারা দৃষ্টি অবষ্টব্ধ করিয়া রাখিলে লোকে যেমন চন্দ্রবিম্বে দ্বৈতদর্শন করে, মন তেমনি একমাত্র ভাবনাবিশেষ-বলে সূর্য্যমণ্ডলেও যামিনী দর্শন করিয়া

থাকে। মন যাহা দেখে, তাহাই ফলস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ বা বিষাদ-সহকারে ভোগ করিতে থাকে। মন প্রতিভা বা ভাবনাবিশেষ-বলেই চন্দ্রেতেও শত শত অগ্নিশিখাপুঞ্জ দেখিয়া দাহতাপ ভোগ করে এবং দগ্ধ হইয়া পরিতপ্ত হয়। এমন কি, প্রতিভাসবলে ক্ষার বস্তুকেও অমৃতরস জ্ঞানে পান করিয়া পরিতৃপ্ত, বল্গিত ও নর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবার ঐ প্রতিভাস বশেই মন আকাশেও মহারণ্য দেখিয়া ছেদন করিতে উদ্যত হয় এবং ছেদন করিয়া পুনরায় তাহাতে বনরোপণ করে।

বৎস! এইরূপে মন ইন্দ্রজালবৎ যাহা কল্পনা করিয়া লয়, তৎক্ষণাৎ তাহাই দর্শন করে; সুতরাং এই জগৎকে সৎও নয় এবং অসৎও নয়, এইরূপ ভাবে অবগত হও এবং অবগত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ভেদ দৃষ্টি পরিহার কর।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে আমাকে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, আমি অদ্য তোমার নিকট তাহাই প্রকাশ করিলাম। ব্রহ্মের নাম-রূপ কিছুই নাই। প্রথমে তাঁহা হইতেই সর্ব্ব-প্রপঞ্চের সূক্ষ্ম বীজ আবির্ভূত হয়। উহা সূক্ষ্ম বলিয়া নামসম্বন্ধের অযোগ্য, স্পন্দাত্মক ও নির্ব্বিকল্পজ্ঞানের অনুরূপ। কাল ক্রমে সেই বীজই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনন-শক্তিবলে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া মনঃস্বরূপে সম্পন্ন হয়। তৎপরে ঐ মন আপনাতে সূক্ষ্মভূতের কল্পনা করিয়া অবশেষে তৎপ্রভাবে স্বপ্নশরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করিয়া লয়। অনন্তর সেই তেজঃপ্রধান সমষ্টিভূত সূক্ষ্ম শরীর তৈজস পুরুষ হয়। সেই তৈজস পুরুষই আপনার 'ব্রহ্মা' এই-রূপ নাম নির্দ্দেশ করেন। অতএব হে রাম! জানিও—যিনি ব্রহ্মা, তিনিই মন বা মনস্তত্ত্ব! সেই মনস্তত্ত্বাকার ভগবান্ ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়, তাই তিনি

যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই দেখিয়া থাকেন। তিনিই আত্মব্যতিরেকে এই আত্মাভিমানিনী অবিদ্যার কল্পনা করেন। পরে সেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃকই এই গিরি-তৃণ-তোয়নিধিময় বিশাল বিশ্ব ক্রমে ক্রমে কল্পিত হয়। এইরূপে এই সৃষ্টি ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু তার্কিকসম্প্রদায় অনুমান করেন, ইহা জড়প্রধান পরমাণু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে—হে রাম! অর্ণব হইতে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় এই ত্রিলোকমধ্যবর্ত্তী যাবতীয় পদার্থ সেই ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত। এই জগৎ বস্তুতঃ অনুৎপন্ন, ইহাতে যে এই উৎপত্তিপ্রকার ও ব্রহ্মের যে মনোরূপিণী চিৎ বা চৈতন্য, তাহাই সমষ্টি অহম্ভাবরূপ উপাধিতে আবিষ্ট হইয়া পরমেষ্ঠিতা বা ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ উহাই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। অপর যে ব্যষ্টিভূত অহঙ্কারোপাধিক চিদাভাস কল্পিত হয়, তাহাও ঐ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন সমষ্টিভূত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ঐ সকল চিদাভাস অগ্রে অর্থাৎ জগতের স্ফারীভাব ধারণকালে পরমেষ্ঠিরূপ সমষ্টিভূত মনোরূপে সমুল্লসিত হয়। এই যে সমষ্টিভূত মন, ইহাকেই পরিবর্ত্তনশীল অসংখ্য জীব নামে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সেই সকল জীব চিদাকাশ হইতে উদ্ভূত ও মায়া-কোশে ভূতোপাধির সহিত মিলিত হইয়া গগনগত পবনস্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী চতুর্দ্দশ ভুবনের অভ্যন্তরে যে যেরূপ ভূতজাতিতে যাদৃশ যাদৃশ বাসনা-কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, পরে সেই সেই ভূতজাতির প্রাণশক্তি সহকারে হয় জঙ্গম শরীরে, না হয় স্থাবরশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক শুক্রশোণিতাদিরূপ বীজভাব ধারণ করে এবং অনন্তর তাহা হইতে ক্রমে যোনিতে জন্ম লইয়া থাকে। অবশেষে কাকতালীয়ক্রমে সমুৎপন্ন যে যে বাসনাপরম্পরা, সেই সেই বাস-নার অনুরূপ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে এবং সেই সেই কর্ম্মের অনুরূপ ফল-সমূহ প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর তাহারা শুভ বা অশুভ বাসনার অনুসারে পুণ্য বা পাপ কর্ম্মরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। এই অব-স্থায় তাহাদিগকে কখন ঊর্দ্ধগতি এবং কখন বা অধোগতি লাভ করিতে হয়। সেই জীবগণ ইচ্ছাময় অর্থাৎ ইচ্ছাই হইল, জীবগণের কর্ম্ম ও কর্ম্মবাসনার জীব। উল্লিখিত জীবপরম্পরার মধ্যে কোন কোন জীব পরমতত্ত্ব বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র জন্ম, কর্ম্মরূপ বাত্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া কখন গিরি-

দরীতে বিলুণ্ঠিত এবং কখন বা বনপর্ণবৎ বিশীর্ণ হইতে থাকে। কোন কোন জীব চিৎসত্তার অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া অসংখ্য জন্মলাভ করে এবং শত শত কল্প পর্য্যন্ত কেবল জন্ম গ্রহণই করিতে থাকে। কোন কোন জীব মনোরম জন্মান্তর অতিবাহিত করিয়া এই জগতে শুভ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করত সংসারে সুখে বিহার করে। যেমন জলধির জলবিন্দু সকল বায়ু-বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় জলধি মধ্যেই বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি কোন কোন জীব পরমাত্ম-বিজ্ঞান বিদিত হইয়া পরমপদ লাভ করত পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। এইরূপে ব্রহ্মপদ হইতেই সর্ব্বজীবের সমুদ্ভব এবং ইহাই আবির্ভাব ও তিরোভাবক্রমে বিনশ্বর সংসাররূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জীবোৎপত্তিই বাসনাবিষ ধারণ, বৈধুর্য্য-জ্বর উৎপাদন, অনন্ত সঙ্কট সজ্ঘটন, অনর্থকর কার্য্যের সৎকার বিধান এবং নানাদিক্, দেশ, কাল ও শৈলকন্দরে বিচরণ করে। ইহাই চমৎকারিণী, বৈচিত্র্যময়ী, ভ্রমবিধায়িনী ও অসত্যরূপিণী।

হে রামভদ্র! এই যে বিক্ষেপ-বহুল মনঃশরীরধারিণী জগৎ-রূপিণী,—মোহ-জঙ্গলের জীর্ণবল্লী, ইহাকে যদি তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ কুঠার দিয়া কর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে, বলা বাহুল্য ঐ বল্লী আর পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! অধুনা আমি ভুবনভেদে প্রাণিগণের যে উত্তম, মধ্যম ও অধম উৎপত্তি-বিভাগ, তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

রাম! যে জীব পূর্ব্বকল্পে শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়াও গুরূপদেশাদির অভাব নিবন্ধন অথবা অন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ

তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাবিধ জীব বর্ত্তমান কল্পের প্রথম জন্মেই জ্ঞানপ্রাপ্তির পাত্র হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীবের যে তাদৃশ জন্ম, তাহাই 'ইদংপ্রথমতা' অর্থাৎ প্রথম জন্ম বলিয়া বিদিত। এই প্রথমতা জন্মান্তরীয় শুভাভ্যাসেরই ফলস্বরূপ। উহাতেই মুক্তিলাভ ঘটে; এইজন্য ইহাকে প্রথম বা উত্তম আখ্যায়ও অভিহিত করা যায়। ঐ প্রথমজাত ব্যক্তি যদি স্বীয় বৈরাগ্যের অল্পতাবশত শুভ লোকলাভের কামনায় উপাসনাদি করে, আর সেই হেতু যদি তাহার বিচিত্র বাসনারাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে, পর পর কতিপয় শুভ জন্ম গ্রহণ করত বাসনা ক্ষয় করে এবং বাসনা ক্ষয় হইবার পর সে ব্যক্তি সংসার-মুক্ত হয়। এইরূপ জন্ম 'গুণপীবর' নামে নিরূপিত। যে জন্মে সেই-সেইরূপ সুখ-দুঃখ লক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় কার্য্যাকার্য্যের অনুমান হয়, হে রাম! কৃতাত্মা ব্যক্তিগণ সেই জন্মকে 'সসত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে জন্ম বহুবিচিত্র সংসার-বাসনাময়, যাহাতে পূর্ব্বকল্পীয় বহু দুষ্কর্ম্ম ও বহু দুর্ব্বাসনা-জনিত মালিন্য বিদ্যমান, যে জন্মের পর সহস্র সহস্র জন্ম অতীত হইলে অবশেষে জ্ঞানলাভ হয় এবং যে জন্মে সেই সেই সুখ-দুঃখরূপ লক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুমিত হয়, সেই জন্মকে সাধুগণ 'অধমসত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে জন্মে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণ আছে, অধিকন্তু অসংখ্য অনন্ত জন্মপরম্পরার পরও যাহাতে মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহাকে 'অত্যন্ততামসী' জন্ম আখ্যায় অভিহিত করা হয়। যে জন্ম পূর্ব্বকল্পীয় বাসনার অনুসরণপূর্ব্বক তদনুরূপ চরিত্র সম্পাদন করে এবং যাহা বর্ত্তমান কল্পের দুই বা তিন জন্মের মধ্যে মধ্যম, অর্থাৎ মনুষ্যাদিরূপ ও মনুষ্যাদি-সমুচিত স্বর্গ কিম্বা নরকাদির প্রাপক এবং যাহাতে মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ,—হে রামচন্দ্র! তাদৃশ জন্ম 'রাজস' আখ্যায় কথিত। উল্লিখিত রাজস জন্মে দুঃখানুভূতি নিবন্ধন বৈরাগ্যের উদয় হইলে যদি তত্ত্বজ্ঞান-লাভ অদূরবর্ত্তী হয়, তবে তৎপরবর্ত্তী জন্মকে মুমুক্ষুগণ মোক্ষলাভের যোগ্য মনে করিয়া 'রাজসসাত্ত্বিক' নামে অভিহিত করেন। এই জন্মই যদি আবার যক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অপরাপর কতিপয় জন্মের পর মোক্ষযোগ্য হয়, তাহা হইলে তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে 'রাজস' নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে ঐ জন্মই যদি শত শত জন্মের পর মোক্ষলাভের উপযোগী হয়, তাহা হইলে সাধুগণ তাহাকে 'রাজসতামস' নামে অভিহিত করেন। আর যদি তাহাতে সহস্র সহস্র জন্মেও মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয়, তবে সে জন্ম 'রাজসাত্যন্ততামস' নামে নিরূপিত হয়। যে জন্মে সহস্র সহস্র জন্মভোগ হয় অথচ চিরকালেও মোক্ষ হইবার নয়, মহর্ষিরা তাহাকে 'তামস' আখ্যায় অভিহিত করেন। সেই জন্মেই যদি মোক্ষলাভ ঘটে, তবে তাদৃশ জন্ম তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে 'তামসসত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যদি কতিপয় জন্ম অতীত হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই রজস্তমোবহুল জন্মকে 'তমোরাজস' নামে নিরূপিত করা হয়। যদি এমনটী ঘটে যে, পূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ হইয়া গিয়াছে, পরেও শত শত জন্ম অতীত হইবে, তথাপি মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হওয়া যাইবে না, তাহা হইলে তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সেই জন্ম 'তামস-তামস' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লক্ষ জন্ম ভোগ হইয়াছে, পরেও লক্ষ জন্ম ভোগ হইবে, তথাপি যদি মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে সে জন্মকে 'অত্যন্ততামস' বলা হয়।

রামচন্দ্র! ঐ যে সকল জীবজন্মের বিষয় উল্লিখিত হইল, তৎসমস্তই ব্রহ্ম হইতে সমাগত হইতেছে। কিঞ্চিৎ প্রচলিত পয়োরাশি হইতে তরঙ্গ-মালার ন্যায় সেই ব্রহ্ম হইতেই জীবজন্মপরম্পরা নিক্রান্ত হইতেছে। নিজ তেজোময় স্পন্দন-স্বভাব প্রদীপ হইতে রশ্মিমালার ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই উহারা প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং প্রজ্বলিত পাবক হইতে কিরণপুঞ্জময় স্ফুলিঙ্গ-সঙ্ঘের ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বজীব সমুত্থিত হইতেছে। এই যে কিছু দৃশ্যদৃষ্টি, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হইতেছে। মনে হয়, মন্দার-কুসুমের মঞ্জরীর ন্যায় চন্দ্রবিম্ব হইতে কিরণাবলী যেন বিনিঃসৃত হইতেছে। বিটপী হইতে যেমন বিচিত্র বিটপশোভার আবির্ভাব, মনে হয়, ব্রহ্ম হইতে জীবরাশির তেমনি সমুদ্ভব। রাম! একই সুবর্ণ যেমন কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূর প্রভৃতি বিবিধ ভূষণাকারে বিরাজমান, তেমনি একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই সর্ব্ববিধ জীবভেদে প্রকাশমান। বৎস! নির্ম্মল নির্ঝরদেশ হইতে যেমন জলবিন্দুসমূহের অবতারণা, তেমনি এক অজ ব্রহ্ম হইতেই এই

নিখিল ভূতপরম্পরার কল্পনা। যেমন একমাত্র মহাকাশ হইতেই ঘটাকাশাদি বিবিধ আকাশ কল্পিত, তেমনি এক ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জীব কল্পনা সমুত্থিত। যেমন একমাত্র জল হইতে সীকর, আবর্ত্ত ও লহরীবিন্দু সকল সমুদ্ভূত, রামচন্দ্র! তেমনি সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত দৃশ্যদৃষ্টি প্রকটিত। যেমন মরীচিকানদী দিবাকর-কর হইতে অভিন্ন, তেমনি যাবতীয় দৃশ্যদৃষ্টিই সেই দ্রষ্টা হইতে প্রকৃত পক্ষে অনতিরিক্ত। চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্নার ন্যায় এবং তেজ হইতে প্রভার ন্যায় এই বিবিধ ভূতজাতিসমূহ যাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই পুনরায় বিলীন হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! জীবসমূহের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাহারা সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ করিয়াও নিবৃত্ত হয় না, অনেকে আবার কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই আত্মাতে বিলয় পাইয়া যায়। ভগবদিচ্ছায় এতাদৃশ বিবিধ জগতে ব্যবহার-পরায়ণ উপাধি-সহিত জীবনিবহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক জন্ম হইতে জন্মান্তরে আসিতেছে, যাইতেছে, পতিত হইতেছে এবং উৎপতিত হইতেছে।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! কর্ত্তা ও কর্ম্ম এই উভয় পরস্পর অভিন্ন; উহারা পরমপদ হইতে এককালে স্বয়ংই সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে পাদপ হইতে যুগপৎ প্রকাশিত ও পরস্পর অভিন্ন পুষ্প ও সৌরভের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে নীলিমা পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত নির্ম্মল ব্রহ্মপদে জীবনিবহ প্রভাসিত হইতেছে। হে

রঘুনন্দন! যেখানে দেখা যায়, অজ্ঞজন-সম্মত ব্যবহার প্রচলিত, সেই খানেই 'জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন' এইরূপ উক্তি প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু হে রাঘব! যেখানে তত্ত্ববিদ্‌গণের ব্যবহার-পরম্পরা প্রচলিত, সেখানে ঐরূপ উক্তি শোভা পায় না। তাঁহাদের মত এই যে, যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা উৎপন্নই নয়; তাহা না হইলেও যতকালে না দ্বৈত কল্পনা অপনীত হইয়া যায়, তাবৎ উপদেশ্য, উপদেশক ও উপদেশ, এ সকল কার্য্যোপযোগী হয়। অতএব যাহারা ভেদদর্শী, তাহাদের প্রতি এরূপ উপদেশ দেওয়া অসঙ্গত নয় যে, এই সমুদয় জীবই ব্রহ্ম। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ উপদেশই সঙ্গত। তত্ত্বদৃষ্টির উন্মেষণে স্পষ্টতই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়, তবে যে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহা ভ্রমজ্ঞানেরই মহিমা। মেরু ও মন্দরাদির ন্যায় বহু বিশাল জীবনিবহ পরমপদ হইতে বারম্বার আবির্ভূত হইয়া পুনরায় পরমপদেই বিলয় পাইয়াছে ও পাইতেছে। যেমন নানাদিকের নিকুঞ্জস্থিত পাদপে বিবিধ পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, তেমনি ব্রহ্মেতেই সহস্র সহস্র জীবদেহের উৎপত্তি ও স্ফূর্ত্তি। যেমন বসন্তকালের সমাগমে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্গম হয়, তেমনি অদ্যাবধি সেই ব্রহ্ম হইতেই জীবনিবহের উদ্ভব হইতেছে এবং নিদাঘকালীন বসন্ত-রসের ন্যায় তাঁহাতেই বিলয় পাই-তেছে। এই সকল, সেই সকল এবং অপরাপর ভাবী জীব সকল যথাকালে সেই পরব্রহ্মেই উৎপন্ন, স্থিত ও বিলীন হয়।

হে রঘুনন্দন! পুষ্প ও সৌরভের ন্যায় পুরুষ ও পুরুষ-কর্ম্ম, উভয়ই অভিন্ন। এই যে পুরুষ ও পুরুষ-কর্ম্ম, ইহারা পরমেশ্বর হইতেই আইসে, আবার পরমেশ্বরেই প্রবেশ করে। দেখা যায় বটে, সুর, অসুর উরগ ও নর, ইহারা প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন না হইলেও বাসনাপ্রবাহে এই জগতে বারম্বার জন্মিতেছে, স্ফুরিত হইতেছে আবার চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু হে সাধো! ঐ সকল জীবের তথাবিধ উৎপত্তির প্রতি তাহাদের পুনরুৎপত্তি-বিধায়িনী আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত অপর কোনই কারণ দেখা যায় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! প্রামাণিক-দৃষ্টিশালী বিষয়-বিরত মনু প্রভৃতি মহর্ষিরা শ্রুতিমূলক যুক্তিসহকারে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই

শাস্ত্রনামে নির্দ্দিষ্ট। আর অত্যন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ যাঁহাদের ভূষণ, যাঁহারা ধীর ও সমদর্শী এবং অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দময় ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল যাঁহাদের করতলগত হইয়াছে, তাঁহারাই সাধু আখ্যায় অভিহিত। যাঁহারা পরমতত্ত্ব কি, তাহা বিদিত নহেন, তাঁহাদের ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শনের নিমিত্ত সদাচার ও শাস্ত্র এই দুইটীই সর্ব্ব-কর্ম্মসম্পাদক নেত্রদ্বয়ের ন্যায় সর্ব্বদা অনুগত হইয়া থাকে। যে জন স্বর্গ ও অপবর্গের উপযোগী শাস্ত্রের অনুগমন না করে, তাহাকে সকলেই বহিষ্কৃত করেন; সে ব্যক্তি দুঃখ সাগরে মগ্ন হয়। হে প্রভো! লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহারে ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরস্পর পর্য্যায় ক্রমে সঙ্গত; ভাবার্থ—উহারা হেতু-ফলভাবে বিরাজিত। কেননা, কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তার উৎপত্তি এবং কর্ত্তা দ্বারা কর্ম্মের নিষ্পত্তি; ফলিতার্থ এই যে, বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় কর্ম্ম হইতে জন্তুগণ জাত, আর অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় জন্তুগণ হইতে কর্ম্ম সম্ভূত; ইহা লোকে ও বেদে প্রথিত। জন্তু সকল যে প্রকার বাসনা লইয়া ভবপিঞ্জরে জন্ম লয়, অনন্তর তাহারা তথাবিধ বাসনারই অনুরূপ ফল অনুভব করে। হে ব্রহ্মন্! জীবগণের জন্ম লাভের যখন এইরূপ নিয়ম রহিল, তখন আপনি জন্মের বীজস্বরূপ কর্ম্মের কথা না কহিয়া 'ব্রহ্ম পদ হইতেই জীবগণের উৎপত্তি' এ কিরূপ কথা কহিলেন? হে ভগবন্! আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকাশিত মতে এই জগতে যে, কর্ম্ম ও জীবের অন্বয়ব্যতিরেকে হেতু-ফলভাব প্রমাণিত হইয়াছিল, তাহা অধুনা আপনার জীব ও কর্ম্মের সহোৎপত্তি-মতে নিরাকৃত হইল। ভগবন্! কারণ-পরিহীন মায়াশবল ব্রহ্মে যে আকাশাদি স্থূলদেহ পর্য্যন্ত ভোগায়তন-সৃষ্টিরূপ ফল বিদ্যমান, আর তৎফলভূত হিরণ্যগর্ভাদি স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিতে যে ভোগফল বর্ত্তমান, এই দুইটী প্রবাদ ভবদীয় উল্লিখিত বাক্যে প্রমার্জ্জিত হইল। ঐ কথায় আরও একটা দোষ দাঁড়াইল এই যে, যদি কর্ম্মফল বলিয়া একটা কিছু না থাকে, তাহা হইলে লোকসঙ্কর সৃষ্টি হওয়া সম্ভাবিত, আর নরকাদি ভয়ের অভাবে বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে হিংসা করিয়া মীনবৎ ভক্ষণ করাও নিশ্চিত; সুতরাং উহাতে ত একরূপ সর্ব্বনাশেরই সম্ভাবনা। অতএব হে ভগবন্! সম্পাদিত কর্ম্ম, ফলে পরিণত হয় কি না, তাহা আমাকে

যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বলুন। হে তত্ত্ববিদ্‌গণের বরেণ্য! এ বিষয়ে আমার মহাসন্দেহ হইয়াছে, আপনি উপদেশ দানে সেই সন্দেহ নিরাস করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! তুমি আমার নিকট উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার যাহাতে বিশেষরূপ জ্ঞানোদয় হইতে পারে, আমি অধুনা সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছি; তুমি শ্রবণ কর। মনের প্রথম বিকাশ বা ক্রিয়া যে কর্ত্তব্যানুসন্ধান, তাহাই কর্ম্মের বীজ; কেন না, তাহারই পরক্ষণে ক্রিয়ানিষ্পত্তিরূপ ফল জন্মিয়া থাকে। সৃষ্টির আদিতে যৎকালে ব্রহ্মপদ হইতে মনস্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়, তখন হইতেই জন্তুগণের কর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই কাল হইতে জীবগণ কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া আসিতেছে। যেমন পুষ্প ও পুষ্প-মধ্যগত সৌরভ পরস্পর অভিন্ন, তেমনি কর্ম্ম ও মন এই উভয়ও পরস্পর ভিন্ন নয়। এ সংসারে যাহা স্পন্দাত্মক ক্রিয়া, তাহাকে বুধগণ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সেই কর্ম্মাশ্রয় দেহ, ইহাও পূর্ব্বে মনোরূপেই বিরাজ করিতেছিল; সুতরাং কর্ম্ম ও মন এ উভয়ই এক। জানিবে—যেখানে আত্মকৃত কর্ম্মের ফল নাই, সেখানে শৈল, ব্যোম, অব্ধি ও জগৎ এ সমুদায়েরও কিছুই বিদ্যমান নাই। ফল কথা, ঐ যে শৈল ব্যোম প্রভৃতি, এতৎসকলই আত্মকৃত কর্ম্মের ফল। ঐহিক বা প্রাক্তন কর্ম্ম—যাহা সাবধানে সম্পাদিত, তাহাই পরম পুরুষপ্রযত্ন। ঐ প্রযত্ন কখন নিষ্ফল হইবার নয়। কজ্জলের কালিমা নষ্ট হইয়া গেলে কজ্জলেরও যেমন কিছুই থাকে না, তেমনি স্পন্দাত্মক কর্ম্ম যদি নষ্ট হয়, তবে মনেরও কিছুই থাকিবার নয়। কর্ম্মনাশ হইলেই মনোনাশ হয় আর মনোনাশেই কর্ম্মের নাশ, এইরূপ ব্যাপার কেবল মুক্ত পুরুষেরই হয়, যিনি অমুক্ত, তাঁহার পক্ষে ইহা কদাচ হইবার নয়। বহ্নি ও উষ্ণতার ন্যায় চিত্ত ও কর্ম্ম সদাই সংশ্লিষ্ট; সুতরাং উভয়ের মধ্যে যদি এক তরের অভাব হয়, তাহা হইলে উভয়ই বিলয় পাইয়া যায়।

হে রাম! জানিও—চিত্তই স্পন্দাত্মক ক্রিয়া উপগত হইয়া পুণ্য-পাপাত্মক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে; আবার কর্ম্মও চিত্তের ফল-ভোগানুসারে স্পন্দাত্মক বিলাস সমাসাদিত হইয়া চিত্ত হইয়া যায়। এই

জন্যই চিত্ত ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্মনাম প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্ম আখ্যায় জগতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভাবনামাত্রই মন। ঐ ভাবনাই স্পন্দ-ধর্ম্মিণী হইয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়াকারে পরিণত হয়। সেই ক্রিয়া আবার সূক্ষ্মতা নিবন্ধন অদৃষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরাদিরূপ ফল উৎপাদন করে। সকল জন্তুই তাদৃশ ফলের অনুসরণ করিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মন জড় অথচ অজড়াকৃতি; তথাবিধ মনের যে সঙ্কল্প-সমারূঢ় রূপ, আপনি তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আত্মতত্ত্ব অনন্ত ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। সেই আত্মতত্ত্বের সঙ্কল্প-শক্তিতে কল্পিত যে রূপ, তাহাই মন বলিয়া বিদিত। সৎ ও অসৎ অর্থাৎ আছে বা নাই, এই দুই পক্ষমধ্যে থাকিয়া লোকের যে-একটা ভাব দোলায়মান হয়,—ফলে উভয় পক্ষে থাকে বলিয়া যাহা কোন এক পক্ষেই স্থায়ী হইতে পারে না, তাহাই হইল মনের সঙ্কল্প-সমারূঢ় অবস্থা। আত্মা সর্ব্বদাই চিদ্রূপ; সুতরাং তিনি ভাসমান সত্ত্বেও 'আমি জানি না' ও কর্ত্তা না হইলেও 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাকার প্রত্যয় যাহা হইতে হয়, তুমি তাহাই মনের স্বরূপ বলিয়া বুঝিবে। এই জগতে যেমন গুণহীন গুণী হওয়া অসম্ভব, মনেরও তেমনি কল্পনাত্মিকা কর্ম্মশক্তি হইতে বিরহিত হওয়া সম্ভব নয়। বহ্নি ও উষ্ণতা এই দুয়ের যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, তেমনি কর্ম্ম ও মন এবং জীব ও মন, ইহাদিগেরও পৃথক্ সত্তা অসম্ভব। সেই মন, আপন চিত্তরূপে ফলধর্ম্মী কর্ম্ম দ্বারা স্বকীয় সঙ্কল্প-শরীরকে নানারূপে বিস্তার করিয়া এই কারণহীন বাসনাকল্পনাময় বিশ্বকে বিবিধাকারে বিস্তৃত করিতেছে। যেখানে যাহার বাসনা যেরূপে

উন্মেষিত হয়, সেইখানে সেইরূপেই তাহা ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাসনা দ্রুমের সহিত উপমিত হইতে পারে। যথা—কর্ম্ম উহার বীজ, মনঃস্পন্দ দেহ এবং ক্রিয়া সকল উহার বিবিধ বিচিত্র ফলশালিনী শাখা। মন যাহা অনুসন্ধান করে, কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকে। এই কারণেও মনকে কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। চিতি যখন কাকতালীয়বৎ আপনার সর্ব্বব্যাপী চিৎস্বরূপতা পরিহার করিয়া চেত্যাকারে পরিণত অর্থাৎ বাহ্য কল্পনায় উন্মুখ হয়েন, তৎকালে মন বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ম্ম, কল্পনা, সংসার, বাসনা, অবিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া ও ক্রিয়া, এবম্বিধ বহু বিচিত্র শাব্দিক ব্যবহার সকল তদীয় পর্য্যায়রূপে কল্পিত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! মন, বুদ্ধি, ইত্যাদি করিয়া উক্ত বহুবিচিত্র শব্দ ব্যবহার যদি বিশুদ্ধ চিদ্ব্রহ্মের পর্য্যায় হয়, তাহা হইলে ঐ সকলও কি প্রকারে সেই সেইরূপে প্রসিদ্ধ হইল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই পরম সম্বিদ্ যেন অবিদ্যাবশে কলঙ্কিত হইয়াই কদাচিৎ উন্মেষরূপিণী হয়েন এবং সেইরূপ হইয়া যখন 'আমি এইরূপ, অথচ এইরূপ নহি' এবম্বিধ বিকল্পরূপে নানাকার ধারণ করেন, তখনই তিনি মনঃস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন; অর্থাৎ মন নামে অভিহিত হয়েন। যৎকালে তিনি প্রথমে অথবা ঐরূপ বিকল্পনার পরে বিশেষ ভাবনা প্রাপ্ত হইয়া একতর কোটির অনুসন্ধান নিশ্চয় করিয়া লইয়া সুস্থির হইয়া থাকেন, তখনই তাঁহাকে বুদ্ধিনামে অভিহিত করা হয়। ঐ সম্বিদ্ যৎকালে মিথ্যা ব্যাপারে আত্মাভিমানপুরঃসর আপন সত্তা কল্পনা করিয়া লয়েন, তখন তিনি অহঙ্কার আখ্যা ধারণ করেন। এই অবস্থায় তিনি সর্ব্ব অনর্থের মূল বলিয়া 'ভববন্ধনী' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে কালে তিনি বালকবৎ কোমল ভাব ধারণ করিয়া পূর্ব্বাপর বিচার পরিহার করত এক বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য বিষয় স্মরণ করেন, তখন তাঁহাকে চিত্তনামে নিরূপিত করা হয়। কর্ত্তা স্পন্দধর্ম্মী হইলেও ঐ সম্বিদ্ই আবার যখন তাহাকে শূন্য স্পন্দধর্ম্মী করিয়া দিয়া সেই স্পন্দের

ফল—শরীরাদির দেশান্তর সংযোগাদি ঘটাইয়া দিবার জন্যই ধাবিত হয়, তখন তাহাকে কর্ম্মনামে অভিহিত করা যায়। যে কালে তিনি কাকতালীয়বৎ সহসা পদার্থান্তরের অবকাশবিহীন আপন স্বরূপনিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বীয় পূর্ণভাব বিস্মৃত হইয়া বাঞ্ছিত পরিচ্ছিন্নভাব কল্পনা করিয়া লয়েন, তখন তিনি কল্পনা নামে অভিহিত হয়েন। সেই সম্বিদ্‌ 'পূর্ব্বে ইহা দেখা হইয়াছে কিম্বা দেখা হয় নাই' এইরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের নিশ্চয় করিবার জন্য অন্তরে যখন সচেষ্ট হয়েন, তখন তিনি স্মৃতিনাম ধারণ করেন। যে কালে তিনি অনন্যচেষ্ট হইয়া তিরোহিত পদার্থ ও পদার্থশক্তিগুলির শূন্যপ্রায় সুসূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বাসনা নামে অভিহিত করা হয়। 'একমাত্র নির্ম্মল আত্মতত্ত্বই বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন অবিদ্যা-কলঙ্কে সমুৎপন্ন যে দ্বিতীয় প্রপঞ্চপ্রতিভা, তাহা বস্তুতই ত্রৈকালিক অসিদ্ধ' এইরূপে যখন ঐ সম্বিদ প্রবুদ্ধ হয়েন, তখন তিনি বিদ্যানামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি যখন তৎপদ ভুলিয়া যান, তখন তাঁহাকে বিস্মৃতি আর আত্মার অদর্শনে যখন তিনি মিথ্যা বিকল্পজালে স্ফুরিত হয়েন, তখন তাঁহাকে মলরূপে কল্পনা করা হয়; ফল কথা, আবরণশক্তির প্রাধান্যে তখন তাঁহাতে মল সঞ্চিত হয়। ঐ মনঃস্বরূপা সম্বিদ্‌ যখন শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন, ঘ্রাণ ও বিমর্শনাদি ক্রিয়াদ্বারা ইন্দ্রকে অর্থাৎ কার্য্য-কারণের অধিপতি জীবভাবাপন্ন পরমেশ্বরকে ভোগসমূহে আনন্দিত করেন, তখন তাঁহাকে ইন্দ্রিয় আখ্যায় অভিহিত করা যায়। ঐ মনোরূপিণী সম্বিদ্‌ যখন অলক্ষিতভাবে পরমাত্মাতে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের উপাদান কারণরূপে নির্ম্মাণকর্ত্রী হয়েন, তখন তিনি প্রকৃতি আখ্যা ধারণ করেন। এই প্রকৃতি কখন সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ করিয়া থাকেন; এই যে সদসদ্‌-বিকল্প, ইহা ঐ প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত হয়, এই জন্য তিনি মায়ানামে নির্দ্দিষ্ট। এই মায়া অঘট-ঘটনে পটীয়সী।

রাম! এই সম্বিদ্‌ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা কার্য্য-করণভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে চিতি যখন চেত্যোন্মুখতা ও সকলঙ্কভাব উপগত হইয়া সেই সেই রূপে স্ফুরিত হয়েন, তখন তিনি উল্লিখিত পর্য্যায়সমূহে নিরূপিত হইয়া

থাকেন। তিনি চিত্তভাবাপন্ন হইয়া সংসারপদ প্রাপ্ত হইলে তদীয় পর্য্যায়-বৃত্তি সকল তাঁহার আপনারই শত শত সঙ্কল্প দ্বারা বিশেষরূপে যোগরূঢ় হইয়া গিয়াছে। ঐ বিশুদ্ধস্বভাব চিৎ 'আমি অজ্ঞ' এবম্বিধ অজ্ঞান-মালিন্যের অথবা চেত্য বিষয় হইতে উপগত দ্বৈত বাসনা-কলঙ্কের সন্নিধান বশতঃ দেহাদি জড় পদার্থের অনুগত হইয়া স্বীয় পূর্ণতার বৈকল্য নিবন্ধনই যেন আকুল হইয়া পড়েন; তাই তাঁহাতে সংখ্যা ও বিভাগ কল্পনা উপগত হয়। সুতরাং ঐ সম্বিদ বা চিৎই জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এতাবতা বুঝিতে হইবে, পরমাত্ম পদ হইতে বিচ্যুত অজ্ঞান-কলঙ্কময় একাত্ময় সম্বিদেরই ঐ ঐরূপ বিবিধ সঙ্কল্প-কল্পনাকে বুধগণ ঐ সকল পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! মন কি? মন জড়, না চেতন? হে তত্ত্বজ্ঞ! আমি এ বিষয়ের একটা কিছুই নিশ্চয় করিয়া লইতে পারিতেছি না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! মন জড়ও নয়, চেতনও নয়। চিদ্বস্তু যখন সংসার-দশায় উপাধি মালিন্য ধারণ করেন, তখন তিনি মন আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। সৎ ও অসতের মধ্যগত উক্ত চিতের যে আবিল রূপ, জগতের কারণ হইয়া প্রত্যেক প্রাণীতে পরিস্ফুরিত হয়, তাহাই চিত্তনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চিৎ যে দশায় স্বীয় শাশ্বত ও নিশ্চিত একরূপতা পরিহার করিয়া অবস্থান করেন, তথাবিধ দশায় তিনি চিত্ত আখ্যায় অভিহিত হয়েন। সেই চিত্ত হইতে এই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। ম্লানরূপিণী চিতির যে জড় ও অজড় এই উভয় ভাবের অভ্যন্তরে দোলায়মান রূপ, স্বীয় কল্পনায় অবস্থিত, তাহাই মন আখ্যায় অভিহিত। চিতের যে বহির্ম্মলিন ঔপাধিক চাঞ্চল্যভাব ও কলঙ্ক-কলুষিত রূপ, তাহারই নাম মন। রাম! এহেন মন জড়ও নয় এবং অজড় বা চিন্ময়ও নয়। অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীব ইত্যাদি এবং অন্যান্য যে কিছু, সকলই সেই মনেরই কল্পিত বিচিত্র নাম মাত্র। নট যেমন বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্নরূপ ধারণ করে, মনও তেমনি কর্ম্মভেদে বহুবিধ নাম ধারণ করিয়া থাকে। কর্ম্মানুরোধে মনুষ্যগণ যেমন ধারক, পাঠক, পাচক প্রভৃতি নানা নাম ধারণ করে, মনও তেমনি কর্ম্মভেদে বিবিধ উপাধি উপগত হইয়া থাকে।

হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট মনের এই যে বিভিন্ন নাম নির্দ্দেশ করিলাম, বাদিগণ আবার অপরাপর শত শত কল্পনা দ্বারা ঐ সকল অন্য প্রকারে উল্লিখিত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব তর্কানুমোদিত দ্রব্যত্ব-অণুত্বাদি-বিষয়ক বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া স্বেচ্ছায় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বহুবিচিত্র নাম-প্রণালী নিরূপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ মনকে জড়, কেহ অজড়, কেহ অহঙ্কার এবং কেহ কেহ উহাকে বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে রাঘব! সঙ্কল্প-বিকল্পাদি বৃত্তি অনুসারে আমি এই একই মনের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রভৃতি নাম তোমার নিকট নিরূপণ করিয়া বলিলাম; কিন্তু নৈয়ায়িকগণ এ বিষয়ে অন্য প্রকার বলিয়াছেন। সাংখ্য-মতবাদীরা আর এক প্রকার বলেন। এইরূপে চার্ব্বাক-মতাবলম্বী নাস্তিকগণ, জৈমিনি-মতাবলম্বিগণ, আর্হত-মতাবলম্বী সকল, বৌদ্ধ মতাবলম্বিগণ, বৈশেষিক-মতাশ্রয়িগণ এবং পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি অন্যান্য মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব বুদ্ধি-সমুৎপন্ন তর্ক দ্বারা উহার অন্যথা কল্পনা করেন। পরন্তু পথিকেরা যেমন আপন আপন ইচ্ছায় বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিয়া অবশেষে সকলেই একই নির্দ্দিষ্ট পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি ঐ বিভিন্ন বাদিগণেরও গন্তব্য পথ সেই একই পরমপদ। উহারা কেবল পরমার্থ-পদের অনবগতি-নিবন্ধন বিপরীত বুদ্ধিতে আপন আপন বিকল্পপ্রভাবে পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্যই বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অর্থাৎ উহাঁদের স্ব স্ব বুদ্ধির বিভিন্নতাই উল্লিখিত বিবাদের মূল হইয়া দাঁড়ায়। দেশ, কাল ও পাত্রাদির প্রভেদকেই রুচিভেদের মূল বলা যায়। কেহ রজোগুণ-প্রধান, কেহ তমোগুণ-প্রধান, কেহ মলিনসত্ত্ব-প্রধান এবং কেহ বা অর্দ্ধ মলিনসত্ত্ব-প্রধান হয়। এ সম্বন্ধে বিশদ উক্তি এই যে, যিনি যেমন বুঝেন, তাঁহার উক্তি এবং কার্য্য তেমনই হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বসাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাদৃশ নির্ম্মলসত্ত্ব-সম্পন্ন বিশিষ্ট ঋষিগণের বৈদিকজ্ঞানে যাহা বিজ্ঞেয় হইয়াছে, তাহাই অভ্রান্ত; পরন্তু যাহা মাত্র স্বীয় বুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত, তাহা প্রায়ই ভ্রমময়। তবে কোথাও কোথাও কাকতালীয়বৎ উহা অভ্রান্ত হইয়া থাকে।

রাম! পূর্ব্বে যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদিগণের কথা কহিলাম,

তাহাদের স্ব স্ব মতের প্রশংসা বিষয়ে এইরূপ বলা যায় যে, পথিকগণ যেমন আপন আপন রুচি অনুসারে স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথের প্রশংসা করে, বিভিন্ন দেশ-কাল-জাত ঐ বিভিন্ন বাদিগণও তেমনি স্ব স্ব দেশ-কালাদির অনুরূপ স্ব স্ব অভিরুচির অনুযায়ী স্ব স্ব কল্পিত পক্ষের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে রঘুনন্দন! যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিবার মনন করে, তাহাদিগের জন্য ঐ সকল বিভিন্ন মত-বাদীরা যে কিছু স্বকপোল-কল্পিত যুক্তিবৈচিত্র্য উদ্ভাবন করেন, সে সমুদায়ই মিথ্যা, অর্থাৎ প্রমাণ-প্রধান উপনিষদাবলী সে সমুদায়ের সমর্থন করেন না; কাজেই মুমুক্ষুসম্প্রদায়ের নিকট সে সকল যুক্তি উপাদেয় নহে। যেমন একই ব্যক্তি স্নান, দান ও গ্রহণাদি বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া সেই সেই ক্রিয়াভেদে স্নায়ী, দাতা ও গৃহীতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই মনও বিবিধ বিচিত্র কার্য্য করে বলিয়া জীব, বাসনা ও কর্ম্ম প্রভৃতি নানা নাম ভেদে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ চিত্তই যে এই নিখিল বিশ্ব, এ রহস্য সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ। যাহার চিত্ত নাই, এই জগৎ সে দেখিতে গেলেও দেখিতে পারে না। যাহার মন আছে, সেই ব্যক্তিই শুভাশুভ বিষয়ের শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন ও আঘ্রাণ করিয়া হর্ষ বা বিষাদ অনুভব করে। আলোক যেমন রূপপ্রতীতির কারণ হয়, মনও তেমনি অর্থপ্রতীতির কারণ হইয়া থাকে। যাহার মন আপনাকে বদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া লয়, সে বদ্ধ, আর মুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া লইলে সে মুক্ত। বদ্ধ ও মুক্ত সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত। মনকে যাহারা জড় বলিয়া জানে, মন তাহাদের নিকট জড়; যাহার নিকট মন চেতন, সে কিন্তু মনকে জড় বলিয়া জানে না; সুতরাং তাহার নিকট ত মন চেতনই। ফলে কিন্তু এই মন জড়ও নয় এবং চেতনও নয়। এই মন হইতেই এই বিচিত্র সুখ-দুঃখ-চেষ্টাময় জগতের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই মন যৎকালে একরূপ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়, এ সংসার তখন তাহাতেই বিলয় পাইয়া যায়। কেননা, কলুষজলবৎ মলিন চিদাকারই ঐ সমষ্টিভূত মন দ্বারা ভ্রান্তিবশে এই সংসারের কারণ হইয়া থাকে। অতএব হে রাঘব! কেবল তেজ

বা কেবল পৃথিব্যাদি যেমন নীল-পীতাদি রূপের কারণ নয়, তেমনি কেবল চেতন মন বা কেবল জড় মনও এই সংসারের কারণ নহে। যদি চিত্ত ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে বল দেখি, যাহার চিত্ত নাই, তাহার দৃষ্টিতে এই জগৎ কি? অর্থাৎ চিত্তের অসত্তায় জগতের সত্তা প্রমাণিত হয় না; সুতরাং বুঝিতে হইবে, এ জগৎ চিত্ত বা মনোমাত্র ব্যতীত অপর কিছুই নয়। চিত্ত বা মন যদি নষ্ট হইল, তাহা হইলে সমুদায় প্রাণীর নিকট সর্ব্বজগৎই বিলীন হইয়া যায়। যেমন একই কাল ঋতুবিশেষে বিচিত্রাকার ধারণ করে, তেমনি একই মন নানা-কর্ম্ম ভেদে বিচিত্রাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। চিত্তের আভোগ ব্যতীত অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া যদি শরীরকে ক্ষোভিত করিতে পারিত, তাহা হইলে বলা যাইত যে, জীবাদি চিত্ত হইতে অতিরিক্ত। কুতর্ক-বাদীরা যে বিভিন্ন দর্শনে তর্কবলে ঐ সকলের ভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, বলিতে কি, হে রাম! তাহার ত প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ব্যাস প্রভৃতি তত্ত্বদর্শীরাও ত সে সম্বন্ধে কোথাও কিছুই বিশেষ করিয়া বলেন নাই। তবে কথা এই—অজ্ঞান, সাম্প্রদায়িক শিক্ষাশূন্যতা ও মনোদেবতার যে স্বাভাবিক কুতর্ক-বিস্তরের শক্তি, এই সমস্তই ঐ সম্বন্ধে কারণ। যে কাল হইতে বিশুদ্ধ চিৎপদার্থে অজ্ঞানজাড্যের মিথ্যা উদ্রিক্ততায় জড়শক্তির উদয় হইয়াছে, তখন হইতেই এবম্বিধ জগদ্বৈচিত্র্য উপস্থিত হইয়াছে। চেতন ঊর্ণনাভ হইতে জড় তন্তু জন্মিবার ন্যায় নিত্য চেতন পরম পুরুষ ব্রহ্ম হইতেই এই জড়প্রকৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বিভিন্ন বাদিগণের কথা বলিলাম, অবিদ্যাবশে তাঁহাদিগের স্ব স্ব চিত্ত-ভাবনা স্থিরীকৃত হইহাছে; তাই তাঁহারা মনের নাম-রূপ-ভেদ কল্পনা করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের ভ্রান্তিই ঐরূপ ভেদকল্পনার কারণ।

রামচন্দ্র! অনির্ম্মলা চিৎই জীব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি নামে প্রথিত হইয়াছেন এবং তিনিই এই জগতে চেতন, চিত্ত ও জীব ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনই বিবাদ নাই।

ষন্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অধুনা আমি ভবদীয় বাক্যার্থ অবগত হইয়া বুঝিলাম, একমাত্র মন হইতেই এই বিশাল আড়ম্বরময় ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃতি পাইয়াছে; সুতরাং ইহা মনেরই কার্য্য বৈ আর কিছুই নয়।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! যেমন মরুভূমিতে দিবাকর-করের অনববোধে তাহাই জলাকারে স্ফুরিত হইতে দেখা যায়, তেমনি পরমার্থতত্ত্বের অস্ফুরণ নিবন্ধন মূঢ়তাপন্ন মন দ্বারাই পরমার্থ পদে এই বিশ্ব বিস্তৃত হইতেছে। এই ব্রহ্ম-ভূত জগতে মনই একাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কোথাও নর, কোথাও সুর, কোথাও দৈত্য, কোথাও যক্ষ, কোথাও গন্ধর্ব্ব এবং কোথাও বা কিন্নররূপে সমুদিত হইতেছে। আমার মতে একমাত্র মনই আকাশ, দেশ, পুর ও পত্তন প্রভৃতি বিস্তৃতাকারে প্রকাশমান হইয়াছে। এইরূপভাবে দেখিতে গেলে সমস্ত জীবদেহও তৃণ-কাষ্ঠাদির সহিত তুলনীয়। যাহা হউক, সে বিচারে প্রয়োজন নাই। এস্থলে মনই এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য। আমি মনে করি, সেই এক মনই এই নিখিল বিশাল বিশ্ব বিস্তৃত করিয়াছে। মনের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। আত্মা যিনি, তিনি সর্ব্বাতীত, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাশ্রয়। মন সেই আত্মারই প্রসাদে সংসারে ধাবিত ও চেষ্টিত হইতেছে। কর্ম্ম ও শরীরের প্রতি মনই একমাত্র কারণ। জনন এবং মরণ মনেরই হইয়া থাকে। আত্মাতে ঈদৃশ গুণসমষ্টি নাই। আমি বুঝিয়াছি, বিচার দ্বারাই মন বিলয় পাইয়া যায়। মনের যদি বিলয় হয়, তবেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। মনোনামক স্পন্দনশীল কর্ম্ম যখন নষ্ট হয়, তখনই জীবকে মুক্ত বলা যায়; সে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছেন, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে জীবগণের জন্ম ত্রিবিধ এবং সদসদাত্মক মন তাহার

প্রধান কারণ বলিয়া নির্ব্বাচিত। কিন্তু মনের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে ত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না; সুতরাং কূটস্থ চিন্মাত্রস্বভাব ব্রহ্ম হইতে মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেননা, মনের সৃষ্টি ত বুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। অতএব আমি জানিতে ইচ্ছা করি, বুদ্ধিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্ব হইতে কি প্রকারে এই জগচ্চিত্রকর মন উত্থিত হইয়া বিস্তৃত হইল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ, এই ত্রিবিধ বিশাল আকাশ সর্ব্ব-সাধারণ সর্ব্বকার্য্যে স্থিত এবং বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্বের সত্তাতে সত্তাসম্পন্ন। যাহা সকলের অন্তরে বাহিরে বিরাজিত, সত্তা ও অসত্তার যাহা সাক্ষিভূত এবং যাহা সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত, তাহাই চিদাকাশ আখ্যায় অভিহিত। যাহা সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্ববিধ ব্যবহার পরম্পরার মূল বলিয়া হিতকর, যাহা সকল প্রকার কার্য্য-কারণ ভাবের নিয়ন্তা বলিয়া শ্রেষ্ঠ এবং যাহার কল্পনায় এই বিশাল বিশ্ব বিস্তৃত, তাহা চিদাকাশ নামে নিরূপিত। যাহা নিখিল দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত এবং যাহা পবন ও পয়োধর প্রভৃতির আশ্রয়ীভূত, সেই আকাশ ভূতাকাশ নামে কথিত। এই যে শেষোক্ত চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ, ইহারা এক চিদাকাশ হইতেই আবির্ভূত। চিদাকাশই দিবসের ন্যায় সর্ব্বকার্য্যের কারণ। 'আমি জড় অথচ আমি জড় নহি' চিতের যে ইত্যাকার নিশ্চয়, তাহা ব্রহ্মনামধেয় চিতেরই মালিন্য। তাদৃশ মালিন্য-সমন্বিত চিৎকেই মন বলিয়া বিদিত হইবে। সেই যে মন, তাহা হইতেই আকাশাদির কল্পনা। শাস্ত্রে যে ঈদৃশ আকাশত্রয়ের কল্পনা, তাহা কেবল অপ্রবুদ্ধ অজ্ঞদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্তই হইয়াছে। যাঁহারা প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের নিমিত্ত তথাবিধ কল্পনা হয় নাই। তাঁহাদের নিকট সর্ব্ববিধ কল্পনা-বিরহিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বময়, একমাত্র নিত্য পরব্রহ্মই বিরাজমান। উল্লিখিত দ্বৈতাদ্বৈত-ভেদ-ঘটিত বাক্য সন্দর্ভ দ্বারা অজ্ঞজনেরাই উপদিষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু যাঁহারা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহারা কখন এরূপে উপদিষ্ট হয়েন না।

রামচন্দ্র! যতকাল তুমি অপ্রবুদ্ধ রহিবে, আমি এই আকাশত্রয় কল্পনা করিয়াই ততকাল তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। প্রচণ্ড

রবিকর-যোগে মরুভূমিতে যেমন জলভ্রান্তির মূল মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তেমনি মলিন চিদাকাশ হইতেই ঐ আকাশাদি আবির্ভূত হইয়াছে। চিদাকাশ চিত্তরূপে পরিণত হইয়া মলিনরূপ প্রসব করে। এই যে ইন্দ্রজালরূপ জগৎরচনা, ইহা সেই চিত্ত হইতেই হয়। বোধহীন ব্যক্তিগণ যেমন শুক্তিকাখণ্ডে রজতভাব অবলোকন করে, তেমনি অবোধ ব্যক্তিবর্গ আপন অজ্ঞানতা বশতঃ এই যে মলিন চিদাত্মক তত্ত্ব, ইহাতে চিত্ততা অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ অনুভব বোধশালী ব্যক্তিদিগের হয় না। সুতরাং জানিবে,—আপনার মূর্খতা বশতই বন্ধন এবং আপনার জ্ঞান প্রভাবেই মোক্ষ ঘটিয়া থাকে।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! চিত্ত যে কোন বস্তুই হউক, আর যে কোনরূপেই উৎপন্ন হউক, মোক্ষ কামনা করিয়া প্রযত্নের সহিত সতত উহাকে পরমাত্মাতে যোজিত করিতে হইবে। হে রঘুনন্দন! চিত্ত যদি পরমাত্মায় যোজিত হয়, তাহা হইলে বাসনা-বিরহিত ও বিশুদ্ধ হইয়া অনন্তর কল্পনাশূন্যরূপে আত্মভাব লাভ করিবেই করিবে। এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎ চিত্তেরই আয়ত্ত; সুতরাং বন্ধ এবং মোক্ষ এ উভয়ও নিশ্চিত চিত্তেরই অধীন। রামচন্দ্র! পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার নিকট এ বিষয়ে এক অপূর্ব্ব চিত্তাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত করিয়া শ্রবণ কর।

রাম! কোন এক প্রদেশে এক অতি বিস্তৃত অটবী আছে। ঐ অটবী অতীব ভয়াবহ। সেখানে মৃগ পক্ষী প্রভৃতি কোন জীবই নাই। উহার বিস্তার এত পরিমাণ যে, শত যোজন-পরিমিত ভূভাগও উহার একটী মাত্র কণিকার ন্যায় লক্ষিত হয়। সেই অটবীতে এক ভীমাকার

পুরুষ বাস করে। তাহার সহস্র কর ও সহস্র চরণ। বুদ্ধি তাহার পর্য্যাকুলিত এবং দেহ অতি বিস্তৃত। সেই পুরুষ সহস্র বাহু দিয়া সহস্র মুদ্গর গ্রহণ করিয়া সতত আত্মপৃষ্ঠে প্রহার করিতেছে। আবার নিজেই নিজের প্রহারভয়ে ভীত হইয়া শত যোজন দূরে পলাইয়া যাইতেছে। ঐ পলায়ন-পর পুরুষ ক্রন্দন করিতে করিতে বহুদূরে গিয়া পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ও শীর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইয়া অবশেষে এক অন্ধকূপে পতিত হইল। ঐ কূপ অতি ভয়ঙ্কর। উহা সর্ব্বদা অন্ধকারে আবৃত এবং উহার খাত অতি গভীর।

অনন্তর সেই পুরুষ বহুকালের পর সেই কূপ হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় নিজেই নিজেকে প্রহার করত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। শেষে বহুদূরে গিয়া পাবক-প্রবেশোদ্যত পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় এক কণ্টকাকীর্ণ করঞ্জবন-গুল্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আবার কিছুকাল পরেই তথা হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় আপনাকে আপনি প্রহার করিতে করিতে পলায়ন করিল। অনন্তর বহুদূরে গিয়া হাসিতে হাসিতে এক মনোরম চন্দ্র-কর-স্নিগ্ধ কদলী-কাননে প্রবেশ করিল। পুনরায় সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ নিজেকে প্রহার করিতে করিতে পলায়ন করিল। অবশেষে বহুদূর গমনপূর্ব্বক এক গভীর অন্ধকূপে প্রবেশ করিয়া বিশীর্ণদেহে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর সেই পুরুষ অন্ধকূপ হইতে উত্থিত হইয়া আবার কদলীবনে, সেই স্থান হইতে সেই করঞ্জগুল্মে, তথা হইতে কূপে এবং কূপ হইতে আবার কদলীবনে প্রবেশ করিল। আর পূর্ব্ববৎ নিজেই নিজেকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার তাদৃশ আকৃতি ও সেই সেই কার্য্য দেখিয়া তাহাকে সবলে ধারণ করত মুহূর্ত্তকাল পথিমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তুমি? কিসের জন্য এইরূপ করিতেছ? তোমার ইচ্ছা কি? তুমি এরূপ মোহমগ্ন হইয়াছ কেন?

হে রঘুনন্দন! আমার ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে সেই পুরুষ বলিল,—হে মুনে! আমি কেহই নহি। কিছুই আমি করিতেছি না। তুমি আমার গতিরোধ করিয়াছ, অতএব আমার তুমি শত্রু। আমি তোমা কর্ত্তৃকই সুখে ও দুঃখে দৃষ্ট ও নষ্ট হইতেছি। সেই পুরুষ এই কথা কহিয়া

আপনার বিবশ দেহ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইল এবং অতি কাতরভাবে বিকট রবে রোদন করিতে লাগিল। রোদনকালীন তাহার নয়নজল এত নিপতিত হইল, যেন বোধ হইতে লাগিল, মেঘ সেই অটবীতে বারিবর্ষণ করিল। কিঞ্চিৎ পরেই ঐ পুরুষ রোদন হইতে বিরত হইয়া আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক চিৎকার ও হাস্য করিতে লাগিল। পরে সে অট্টহাস্য সহকারে আমার সম্মুখেই তাহার অঙ্গ সকল পরিত্যাগ করিল। প্রথমতঃ সেই পুরুষের ভীষণ মস্তক পড়িয়া গেল, পরে তাহার বাহু সহস্র, তৎপরে বক্ষঃস্থল, অনন্তর তাহার উদর নিপতিত হইল। ক্রমে সেই পুরুষ তদীয় সর্ব্বাঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়তি শক্তির প্রভাবে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। অনন্তর আমি অপর একটী বিজন প্রদেশে গিয়া দেখিলাম, অন্য একটী পুরুষও আপন বাহু সমূহ দ্বারা নিজেই নিজেকে প্রহার করত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। সে কোন একটা কূপে পতিত হইল, তাহা হইতে উঠিল, পুনরায় ধাবিত হইল, আবার কুণ্ডমধ্যে পড়িয়া গেল এবং তাহা হইতে উঠিয়া অতীব কাতরভাবে পলায়ন করিল। এবম্বিধ কষ্টকর অবস্থাতেও সন্তুষ্ট হইয়া সে আপনাকে বারম্বার প্রহার করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি বিস্ময়ের সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার তাদৃশ আচরণ দেখিয়া যোগপ্রভাবে তাহাকে স্তম্ভিত করত পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় উত্তর করিল এবং ক্রমে আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন করিল, কাঁদিল, হাসিল এবং নিয়তি-শক্তি বিচার করিয়া বিশীর্ণদেহে কোথায় কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। এই ঘটনার পর আমি অন্য এক প্রান্তে আরও এক পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, সে ব্যক্তিও ঐরূপ আপনি আপনাকে প্রহার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং পলাইয়া গিয়া এক গভীর অন্ধকূপে নিপতিত হইল। আমি সেই পতিত ব্যক্তির প্রতীক্ষায় বহুকাল তথায় রহিলাম। যখন দেখিলাম যে, সেই ব্যক্তি সেই কূপ হইতে আর উঠিল না, তখন সেইস্থান হইতে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া দেখিলাম, তাহার ন্যায় আর এক ব্যক্তি কূপ মধ্যে পতনোদ্যত হইয়াছে। আমি সেই ব্যক্তির পথ অবরোধ করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিলাম—'হে কমলদল-নয়ন!' কিন্তু সে আমার কথা

বুঝিল না। অধিকন্তু আমাকে বলিল,—'রে মূঢ়! তুই কিছুই জানিস্ না। আঃ পাপ! দুর্ব্বিজ!' এই কয়েকটী কথা কহিয়াই সে তাহার স্বীয় কার্য্য সমাধা করিতে চলিয়া গেল।

রাম! আমি সেই মহারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাদৃশ বহু-সংখ্যক পুরুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদের প্রতি আমি প্রশ্ন করিলে, কেহ কেহ স্বপ্ন-সম্ভ্রমের ন্যায় শান্তিলাভ করিল অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ আকৃতি নাশ প্রাপ্ত হইল, আবার কেহ বা মদীয় বাক্যে শবদেহবৎ ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিল। তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে অন্ধকূপ হইতে নির্গত হইল এবং পুনরায় তাহাতেই আবার পতিত হইতে লাগিল। কেহ কদলীবন মধ্যে প্রবেশ করিল, আর তাহা হইতে বহির্গত হইল না। কেহ কেহ বিশাল করঞ্জগুল্মের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ বা কাম্য-ধর্ম্মে নিরত হইয়া স্থির থাকিতে পারিল না।

হে রঘুনন্দন! এই সুবিশাল অটবী অদ্যাপি সেই ভাবেই বিদ্যমান। সেখানে সেই পুরুষগণ এখনও সেইরূপেই বর্ত্তমান। তুমি সেই অটবী দেখিয়াছ এবং তাহাতে বিচরণ করিয়াছ। তবে কথা এই, তোমার বিবেক এখনও সম্যক্ বিকশিত হয় নাই; তাই তুমি তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছ না। বলা বাহুল্য, সেই অতি ভীষণা অটবী প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত ও বিবিধ কণ্টক-সঙ্কটে সমাচিত হইলেও যাহারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের অধিকারী হয় নাই, তাহারাই তাহাতে নির্বৃতি লাভ করিয়া উদ্যানবাটিকার ন্যায় বিহার করিয়া থাকে।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কিরূপ সে মহাটবী? কবে কিরূপে আমি তাহা দেখিলাম? সেখানে সেই পুরুষেরাই বা কে

এবং তাহারা কি জন্যই বা সেরূপ কার্য্য করিতে উদ্যম প্রকাশ করিতেছে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ রঘুনাথ! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট সমস্তই খুলিয়া বলিতেছি। হে রাম! সেই মহাটবী দূরে নহে এবং সেই পুরুষেরাও দূরে অবস্থান করে না। এই যে বৃহৎ কোটরময়ী গভীর সংসারপদবী, ইহাকেই তুমি সেই বিকারবহুল শূন্য মহাটবী বলিয়া জানিবে। বিচারালোকের সাহায্যে ইহাকে দেখিলে, বোধ হইবে, ইহা এক অদ্বিতীয় বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তখন আর অন্য কিছু আছে এরূপ বোধ হইবে না। তখন ইহা কেবল শূন্যরূপেই প্রতিভাত হইবে। সেখানে যে সকল বৃহদাকৃতি পুরুষেরা বিচরণ করিতেছে, তাহারা পুরুষ নয়; জানিবে—সে সকলই অতি দুঃখমগ্ন মন। হে মহামতে! আমি যে সেখানে দর্শক হইয়া উপস্থিত ছিলাম, সেই আমি—বিবেক। আমি বিবেক-রূপেই সেই সমস্ত দেখিয়াছিলাম। হে নিষ্পাপ! আমি বিবেকরূপ ব্যতীত অন্য কোনও রূপে সে সকল দেখি নাই। সতত সুপ্রকাশ প্রভাকর যেমন কমলকুলকে বিকসিত করিয়া তুলেন, বিবেকরূপী আমিও তেমনি সেই সকল মনঃসমষ্টিকে প্রবোধিত করিয়া থাকি। হে মহামতে! আমারই প্রসাদে কোন কোন মন আমার প্রবোধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভে উপশান্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন মন মোহ-ক্রমে আমার অর্থাৎ বিবেকের অভিনন্দন করে না, তাহারা আমায় উপেক্ষা করিয়াই কূপমধ্যে পতিত হয়।

হে রঘুবংশনায়ক! যাহারা সেই অন্ধকূপে প্রবেশ করিয়া আর নির্গত হইল না, তাহারা মহাপাতক-যুত মন। আর যাহারা সেই কূপ হইতে বাহির হইয়া কদলীকাননে প্রবেশ করিল, জানিও—তাহারা পুণ্যফল-ভোগকর্ত্তা চিত্ত। যাহারা করঞ্জবনে গিয়াছিল, আর সে বন হইতে নির্গত হয় নাই, জানিও—তাহারা মনুষ্যরূপে পরিণত চিত্ত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন চিত্ত সম্প্রবুদ্ধ হইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, আবার কোন কোন বহুরূপধর মন একযোনি হইতে অন্য যোনিতে প্রবেশ করিতেছে। ঐ সকল চিত্ত কখন ঐরূপে অবস্থান করিতেছে, কখন নিপতিত হইতেছে

এবং কখন বা উৎপতিত হইতেছে। সেই যে করঞ্জ-কাননের কথা কহিয়াছি, তাহা বুধগণের মতে মানবদিগের কলত্র-বন বলিয়া বিদিত। উহা দুঃখকণ্টকে সমাকীর্ণ এবং বিবিধ ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। ঐ করঞ্জগহনে যে সকল মন প্রবেশ করিতেছে, তাহারা মনুষ্য হইয়া জন্ম লইতেছে এবং তাহাতেই তাহারা রসিক হইয়া রহিতেছে। সেই যে শশাঙ্ককরবৎ শীতল কদলীকাননের কথা কহিয়াছি,—হে রঘুবংশভূষণ! তাহাকে তুমি মনঃপ্রীতিকর স্বর্গ বলিয়া জানিও। কোন কোন মন বিধি-বোধিত ধ্যান-ধারণাদির পবিত্র উপাসনায় ধ্রুব-সপ্তর্ষি প্রভৃতির দেহ ধারণ করত গগন-গাত্রে সমুদিত হইয়া চির বিরাজমান রহিয়াছে। বলিয়াছি, সেই যে অবোধ পুরুষেরা আমায় তিরস্কার করিল, তাহারা অনাত্মজ্ঞ মন। আত্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন তাহাদের সেই তিরস্কার বা অবজ্ঞা স্বীয় বিবেককেই করা হইল। তোমায় বলিয়াছি, সেই যে পুরুষ উক্তি করিল, 'তুমি দেখিয়াছ, তাই আমি নষ্ট হইলাম; সুতরাং তুমি আমার শত্রু।' এই যে কথা, ইহা কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানহীন চিত্তের বিলাপমাত্র বলিয়াই জানিবে। বলিয়াছি, সেই যে কোন পুরুষ গভীর চিৎকার করিয়া বহু রোদন করিল, জানিও,—ভোগসমূহ-পরিত্যাগে প্রবৃত্ত চিত্তই সে রোদন করিয়াছিল। যাহার বিবেকোদয় অর্দ্ধপরিমাণে হইয়াছে, এখনও যাহার নির্ম্মল পরম পদ প্রাপ্তি ঘটে নাই, তথাবিধ চিত্তের ভোগজাল পরিত্যাগ-কালে একান্তই পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই যে পুরুষ আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দেখিয়াছিল, তাহাকে ঈষদ্বিবেক-প্রাপ্ত চিত্ত বলিয়াই বিদিত হইবে। ঐ চিত্ত আপনার স্ত্রী-পুত্রাদির স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া ভাবিতেছিল,—আহা! আমি এই সকল ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইব? যে চিত্ত অর্দ্ধ-পরিমাণ বিবেক লাভ করিয়াছে, অমল পদপ্রাপ্তি এখনও যাহার ঘটে নাই, অঙ্গসকল পরিত্যাগ কালে সে চিত্তের পরিতাপ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে পুরুষ আমাকে জানিতে পারিয়া আনন্দের সহিত হাসিয়াছিল, রাম! জানিও—সেই চিত্ত বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া তুষ্ট হইয়াছিল। চিত্ত যখন বিবেক-প্রাপ্তির পর সংসারস্থিতি পরিত্যাগ করিয়া আপন স্বরূপ পরিহার করে, তখন তাহার অপার আনন্দ হয়। যে পুরুষ হাসিতে হাসিতে আপনার

অঙ্গসকল দেখিল, ঐ দেখার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত আত্মবঞ্চনের হেতুভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেখিয়া উপহাস করিল। সে তখন ভাবিল, এই মিথ্যা-বিকল্প-রচিত অঙ্গগুলি এতদিন আমায় প্রতারিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই ভাবিয়াই সেই চিত্ত স্বীয় অঙ্গসমূহকে উপহাসের সহিত দেখিতেছিল। মন যখন বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করে, তখন সে, প্রাক্তন ক্লেশের আধার বিষয়সমূহকে দূর হইতে দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকে। বলিয়াছি যে, বলপূর্ব্বক কোন পুরুষের গতি রোধ করিয়া আমি পরমাদরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তাহাতে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, বিবেক বলপূর্ব্বক চিত্তকে পরিগ্রহ করিল। বলিয়াছি, সেই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিশীর্ণ হইয়া অন্তর্হিত হইল ; তাহাতে প্রদর্শিত হইল যে, চিত্ত ব্যতীত বিষয় বা ও বিষয়তৃষ্ণা কিছুই থাকে না ; সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই যে সহস্র-নেত্র ও সহস্র হস্তবিশিষ্ট পুরুষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে চিত্তের অনন্ত আকৃতিমত্তাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই যে বলিয়া আসিয়াছি, একটা লোক আপনি আপনাকে প্রহার করিতেছিল ; ঐ ব্যাপারে বুঝিতে হইবে, মন আপনি আপন কুকল্পনার আঘাতে আত্মাকে প্রহার করিতেছে। সেই যে পুরুষ আপনি আপনাকে প্রহার করিয়া পলায়ন করিল, তাহা এই যে, মন আপন বাসনায় প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। অহো! দেখ, অজ্ঞান-বিলসিত কিরূপ! চিত্ত আপন ইচ্ছায় আপনি আপনাকে প্রহার করিল ; আবার আপনিই পলাইয়া গেল! সমস্ত মনই আপন বাসনায় উপতপ্ত হইয়া পরম পদ পাইবার আশয়ে আপনিই পলায়ন-পরায়ণ হয়। এই যে বিস্তৃত দুঃখজাল, ইহা মনই বিস্তার করে ; আবার মন নিজেই তাহাতে অতিশয় খিন্ন হইয়া তাহা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। আপনার লালাময় জালে কোশকার কৃমির ন্যায় মন আপনারই সঙ্কল্প-বাসনা-জালে আপনিই বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বিনীত বালকের ন্যায় চঞ্চল মন আপনার ভাবী দুঃখ দেখিতে পায় না ; পরন্তু যাহাতে অনর্থ ঘটে, সে সেইরূপ খেলাই খেলিতে থাকে।

রামচন্দ্র! কোন অরণ্য প্রদেশে কতিপয় লোক একটা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের কতক অংশ অর্দ্ধভাগে বিদীর্ণ করিয়া একটা কীলক দিয়া রাখিয়া

গিয়াছিল। একটা বানর সেই কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। তাহার অণ্ডকোষটী সেই বিদীর্ণ কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। বানর আপনার ভাবী দুঃখের বিষয় কিছুই ভাবিল না; স্বীয় চপলতা বশতঃ সেই কীলক সে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল, তখন সেই অণ্ডকোষে সেই দুই কাষ্ঠ-খণ্ডের বিষম চাপ লাগিয়া সেই বানরের প্রাণ যেমন বিপন্ন হইয়াছিল, পূর্ব্বে যে মনের কথা কহিয়াছি, সেই মনের অবস্থাও ঐরূপই। মন স্বকৃত কর্ম্মের ভাবী ফল না বুঝিতে পারিয়া দুঃখপঙ্কে পতিত হয়। ঐ মন যখন বহুকাল অসঙ্গ আত্মার ভাবনা করিয়া এবং নিঃসঙ্গভাবে অবস্থিত রহিয়া, অভ্যাস-বলে জ্ঞানবাধ্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন আর বিষয়বাসনার নিমিত্ত তাহাকে কখন শোক করিতে হয় না। মনের প্রমাদবশতই এই দুঃখরাশি গিরি-শৃঙ্গবৎ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার ঐ মন যখন বিবেক-বশ্য হয়, তখন দিবাকরতাপের সন্নিকর্ষে হিমরাশির ন্যায় ঐ দুঃখ সকল বিগলিত হইয়া যায়।

বৎস রাম! মন যদি শাস্ত্রার্থ-সমুৎপন্ন অনিন্দিত বাসনার সহিত সম-রস হইয়া রাগাদি বিষয়সমূহের নিরোধপুরঃসর আজীবন মুনিবৎ একরসে রত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পশ্চাৎ তত্ত্ববোধের অভ্যুদয়ে যাহা পরম পবিত্র, জন্মাদি-বিক্রিয়া বিরহিত, সুতরাং ত্রিতাপ-পরিহীন ও পূর্ণস্বরূপ, সেই ব্রহ্মপদ অধিগত হইয়া তাহাতেই অবস্থান করত জীবন্মুক্ততা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং প্রলয়াদি মহাবিপদে পড়িয়াও সে আর কখন শোচনীয় হয় না।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই চিত্ত পরম পদ ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। যেমন সাগর হইতে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ একরূপে জলময় এবং অন্যরূপে জলময় নয়, তেমনি এই চিত্ত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন;

কিন্তু উহা ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় এবং চিত্ত দৃষ্টিতে ব্রহ্মময় নয় অর্থাৎ তখন উহা চিত্তময়। যাঁহারা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহারা চিত্তকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিয়া মনে করেন না; তাঁহাদের নিকট চিত্ত ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত। দৃষ্টান্ত দেখ, যাঁহারা জলের স্বভাব বিদিত আছেন, তাঁহাদের নিকট সাগরতরঙ্গ একটা পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা বুঝেন, জল ও তরঙ্গ একই বস্তু। হে রাম! জলের স্বরূপ বা স্বভাব যাহারা জানে না, তাহাদের নিকট যেমন জল ও তরঙ্গ পরস্পর পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, এইরূপ যাহারা অজ্ঞ—তত্ত্ব বিষয়ে অপ্রবুদ্ধ, তাহাদেরই মন সংসারপ্রাপ্তির কারণ হইয়া উঠে। তত্ত্ব পদার্থ যদিও এক, তথাপি কেবল অপ্রবুদ্ধদৃষ্টি লোক-দিগের বোধ-সুবিধার জন্যই বাচ্য-বাচকাদি সম্বন্ধভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, নিত্য পরিপূর্ণ ও অব্যয় পদার্থ। সেই বিস্তৃত আত্মায় যাহা নাই, তাদৃশ কোন কিছুরই বিদ্যমানতা অসম্ভব। পরমাত্মা সর্ব্বশক্তি ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। তিনি যখন যেরূপ শক্তি সঞ্চয়ে ইচ্ছা করেন, তখন সর্ব্বগামিরূপে তাদৃশ শক্তিই বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

রঘুনন্দন! সেই ব্রহ্মেরই চিৎশক্তি সমস্ত ভূতশরীরে দৃষ্ট হইতেছে। পবনে তাঁহারই স্পন্দশক্তি, প্রস্তরে তাঁহার জলশক্তি, সলিলে তাঁহার দ্রবশক্তি, অনলে তাঁহার তেজঃশক্তি, আকাশে তাঁহার শূন্যশক্তি এবং সংসারস্থিতিতে তাঁহারই ভাবশক্তি বিলসিত হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বশক্তি সর্ব্বদিকে প্রসারিত। বিনাশে তাঁহার নাশশক্তি, শোকাক্রান্ত জনে শোকশক্তি, মুদিত জনে আনন্দশক্তি, যোদ্ধা বীর জনে বীর্য্যশক্তি, সৃষ্টিতে সৃষ্টিশক্তি এবং কল্পান্তে তাঁহারই সর্ব্বশক্তি ব্যক্ত হইয়া থাকে। যেমন বৃক্ষবীজের অভ্যন্তরে ফল, পুষ্প, লতা, মূল, পত্র ও শাখা সহ বিশিষ্ট বৃক্ষ বিরাজমান, তেমনি এই যে কিছু বস্তু, সকলেরই ব্রহ্মপদে অবস্থান। ব্রহ্ম মধ্যে প্রতিভাস বা আবরণশক্তির স্ফুরণ বশতঃ চিৎ ও জড়ের মধ্যগত যে চিত্ত সমুদিত হয়, সেই চিত্তেরই অপর নাম জীব। পরমার্থ তত্ত্বের অনববোধেই এই জগৎকল্পনা হয়; তাই এই বিবিধ তরু, লতা, গুল্মজাল ও পল্লবাদি যে কিছু, সকলই নির্ব্বিকল্প চিন্মাত্র বৈ কিছুই নয়। হে রঘুনন্দন! বিবেচনা করিয়া দেখ, এই জগৎ ও অহংতত্ত্বাকারে ভাসমান জীবতত্ত্ব, সকলই

মাত্র আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই আত্মা সর্ব্বগামী, তাঁহার বিরাট দেহ নিত্য সমুদিত। তিনি যখন ঈষৎ মননধর্ম্মী হন, তখনই মন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আকাশে যেমন পিচ্ছভ্রম হয় এবং জলে যেমন আবর্ত্তবুদ্ধি জন্মে, তেমনি আত্মাতে মন ও জীব প্রভৃতি প্রাতিভাসিক ভেদমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এই যে মনের মননাত্মক রূপ সমুদিত, ইহাও সেই ব্রাহ্মী শক্তি। অতএব হে অরিন্দম! জানিও—এ সকলই সেই ব্রহ্ম। শক্তি এবং শক্তিকার্য্য অভিন্ন; এইজন্য 'ইদং' এই পুরোবর্ত্তিরূপে, 'তৎ' এই পরোক্ষরূপে এবং 'অহং' এই প্রত্যকৃতাদাত্ম্যরূপে ভাসমান যে ত্রিবিধ দৃশ্য বিভাগ, এ সকলই প্রতিভাস-জাত বা প্রাতিভাসিক অর্থাৎ ইহারা কেহই বাস্তব নহে। যদি বল, কাম, কর্ম্ম ও বাসনা প্রভৃতিই ত দ্বৈত-প্রপঞ্চের হেতু বলিয়া পরিশ্রুত; সুতরাং ব্রহ্মশক্তিকেই তাহার হেতু বলা হয় কেন? এ কথায় বক্তব্য এই যে, মন, জীব ও ব্রহ্মের ভেদাদি ভ্রম বিষয়ে কামাদি অন্যান্য যে যে কিছু পরম কারণ বলিয়া অভিহিত, তৎতাবৎ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মের পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মতা বা বৃংহণশক্তি বলিয়াই কথিত হইয়াছে; ফল কথা, মনেতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব ক্রমে যে কিছু সদসদাত্মক হয়, তৎ সমস্তই মননশক্তিনাম্নী ব্রাহ্মী শক্তি। মনে যাহা কিছু অবস্থিত, তৎসমস্তই ব্রহ্মরূপ। যেমন বসন্তাদি ঋতুর ধর্ম্ম বৃক্ষাদিতে অবস্থিত, সেইরূপ মনের ধর্ম্ম ঐ কামাদিও ব্রহ্মেতে বিরাজিত। সমস্ত ঋতুতে সমভাবে সকল কুসুমের প্রসবশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও মৃত্তিকা, দেশ, বীজ ও সংস্কারাদির অনুসারে পুষ্পসকল যেমন সুব্যবস্থায় সমুদ্ভূত হয়, সর্ব্ব-লোক-সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তেমনি সুনিয়মে চিত্তশক্তি ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মেতেই চিত্তের বাসনানুরূপ জীবচেষ্টা হয়। সমুদায় ব্রহ্মশক্তিই এককালে সর্ব্বজীবে সঙ্কীর্ণ হয় না। যেমন দেশ-কালাদির বৈচিত্র্যবশতঃ ভূতল হইতে ধান্যশক্তি সমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম হইতে শক্তিপুঞ্জ কখন কখন কোন কোন ক্ষেত্রে আবেশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ সকলই প্রতিভাস মাত্র; বস্তুগত্যা কিছুই জাত নয়। সম্বন্ধি-নিয়ম, সংখ্যা ও রূপাদি সকলই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়া মনঃশব্দে কল্পিত হইয়া থাকে; পরন্ত হে রাম! তুমি ঐ সকল ব্রহ্ম বলিয়াই অবধারিত

করিবে। মনের যাদৃশ প্রতিভাস বা তন্ময়তা হয়, বস্তুদর্শন সেইরূপই হইয়া থাকে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থলে পূর্ব্বোক্ত ঐন্দবগণকেই উল্লেখ করা যায়। অক্ষুব্ধ বিমল জলে যেমন স্পন্দন আবির্ভূত হয়, সংসার-কারণ জীবও তেমনি পরমাত্মায় সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! সাগরে যেমন সলিলই তরঙ্গাকারে আবর্ত্তিত হয়, তেমনি পূর্ণ ব্রহ্মই বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। নানা তরঙ্গভঙ্গময় সমুদ্রে যেমন সলিল ভিন্ন অপর কল্পনা নাই, পরব্রহ্মেও তেমনি নাম, রূপ বা ক্রিয়াস্বরূপ কোন দ্বিতীয় সত্তা নাই; মাত্র একই সত্তা বিরাজমান। যাহা কিছু জন্মিতেছে, নাশ পাইতেছে, চলিয়া যাইতেছে, থাকিতেছে, এ সকলই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেই সকল বিবর্ত্তিত। যেমন তীব্র আতপ মৃগতৃষ্ণিকারূপে স্ফুরিত হয়, তেমনি নাম রূপাদি-রহিত পরমাত্মা বিচিত্র বিশ্বাকারে বিভাসিত হইতেছেন। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, জনন, মরণ ও স্থিতি, এ সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন কোনই কল্পনান্তর নাই। লোভ নাই, মোহ নাই, তৃষ্ণা নাই, রঞ্জনা নাই; বস্তুতঃ আত্মাতে আত্মার আবার লোভ মোহাদি কি এবং কোথা হইতেই বা হইবে? বলিবে, তবে ঐ সকল ধর্ম্ম কাহার? উত্তরে বলিব, ঐ ধর্ম্ম সকল আত্মার নয়—শরীরের। আত্মায় কোনরূপ ধর্ম্ম নাই। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার কূটস্থ চৈতন্য। কাজেই কোন ধর্ম্ম বা ক্রিয়া তাঁহাতে নাই, থাকিতে পারে না। ঐ সকল শরীর-ধর্ম্ম, উহারা শরীরের সহিত কল্পিত। বর্ত্তমানে কল্পিত হয় নাই; অনাদিকাল হইতে প্রবাহের ন্যায় উহারা কার্য্য-কারণ-ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই নিখিল জগৎ আত্মা ভিন্ন কিছুই নয়; এই যে কিছু কল্পনাক্রম, ইহাও সেই আত্মা। সুবর্ণের যেমন বলয়াদিরূপে উৎপত্তি, আত্মারও তেমনি মনোরূপে উদ্ভূতি। অজ্ঞানাবৃত আত্মাই চিত্ত ও জীব আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। বন্ধু-জনকে চিনিতে না পারিলে,সে যেমন অবন্ধুমধ্যেই গণ্য হয়, তেমনি আত্মাকে জানিতে না পারাতেই তিনি জীব হইয়া রহিয়াছেন। গগন যেমন অশূন্য হইয়াও শূন্যতার প্রকাশক হইতেছে, তেমনি চিন্ময় ব্রহ্ম অজ্ঞানে আবৃত হইয়া সঙ্কল্পবশে আপনাকে জীবরূপে প্রকাশ করিতেছেন। যেমন দৃষ্টি দুষ্ট হইলে একই চন্দ্র দুই বলিয়া ভাসমান হয়। তেমনি এই জীব আত্মা

হইলেও দৃষ্টিদোষেই অনাত্মবৎ বিরাজ করিতেছেন এবং বিষয় ও পরমার্থ এই উভয় ভাবে সৎ ও অসৎরূপে সমুত্থিত হইতেছেন। ব্যামোহ মূলক বন্ধ ও মোক্ষ শব্দার্থ একান্তই অসম্ভব। একমাত্র আত্মাই সত্য বস্তু; সুতরাং আত্মা আবার বদ্ধই বা কোথায় আর মুক্তই বা কোথায়? আত্মা বদ্ধ, আত্মা মুক্ত, ইহা কেবল কথা মাত্র; পরন্তু উহা বাস্তব নহে। বন্ধন যখন একান্ত পক্ষে অসম্ভব, তখন 'আমি বদ্ধ' ইহা ত কুকল্পনা বৈ কিছুই নয়। আর বন্ধন যখন কাল্পনিক, তখন মোক্ষও ত কাল্পনিক বা মিথ্যা, উহা বস্তুগত্যা কিছুই নয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! মন যে বিষয়ের নিশ্চয় করিয়া লয়, তাহার যখন অন্যথা ঘটে না, তখন মনের অন্যতর কল্পনা বন্ধন না থাকিবে কেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নকল্পনার অলীকতার ন্যায় এই বন্ধনও একটা অলীক পদার্থ। যাহারা মূর্খ, তাহাদিগেরই মিথ্যা বন্ধন কল্পনা হয়। অপর যে মোক্ষকল্পনা, তাহাও মিথ্যা; মূর্খদিগেরই অন্তরে তাহা সমুদিত হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞানতা বশতই বন্ধ-মোক্ষ-দৃষ্টি উপস্থিত হয়। হে মহামতে! বস্তুগত্যা আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ বলিয়া কিছুই একটা নাই। হে প্রাজ্ঞ! যিনি রজ্জুতত্ত্ব জানেন, তাঁহার নিকট রজ্জুতে সর্পজ্ঞান যেমন অলীক বলিয়া বোধ হয়, তেমনি যিনি প্রবুদ্ধমতি পুরুষ, তাঁহার নিকট এই কল্পনার অবাস্তবত্বই প্রতীত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ জনের বন্ধ-মোক্ষাদি সম্মোহ কোন কিছুই নাই। হে রাঘব! যাহারা অজ্ঞ, তাহাদেরই এই বন্ধ-মোক্ষাদি মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

হে সুভগ! অগ্রে মন, পশ্চাৎ বন্ধ-মোক্ষ-জ্ঞান, তদনন্তর ভুবনাভিধেয় প্রপঞ্চরচনা, এইরূপে ক্রমশঃ এই নিখিল প্রপঞ্চ, বালক-সমীপে বর্ণিত মিথ্যা আখ্যায়িকার ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছে। ফল কথা, বালক যেমন মিথ্যা উপকথা সত্য বলিয়া মনে করে, তেমনি যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকটই এই মিথ্যাপ্রপঞ্চ সত্যবৎ অনুভূত হইতেছে।

শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! ইতিপূর্ব্বে মনের স্বরূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে আপনি যে বালকাখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, লোকে উহা কি প্রকারে কথিত হইয়া থাকে, আমার নিকট তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন। কোন এক মুগ্ধমতি বালক তদীয় ধাত্রীকে কহিল,—ধাত্রি! তুমি আমার নিকট একটী চমৎকার আখ্যায়িকা বর্ণন কর। সেই ধাত্রী তখন বালকের চিত্ত-বিনোদনের জন্য একটী সরস সরল মধুর আখ্যায়িকা বর্ণন করিতে লাগিল। ধাত্রী কহিল, পূর্ব্বে এক একান্ত অসত্য রাজধানীতে তিনটী সুন্দর রাজপুত্র বাস করিতেন। সেই রাজপুত্রেরা সকলেই মহাত্মা, ধার্ম্মিক ও শৌর্য্যসম্পন্ন। তাঁহাদের রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি নগর ছিল। তাঁহারা আকাশগত তিনটী জলতারকার ন্যায় সেই রাজধানীতে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের তখনও জন্ম হয় নাই এবং একজন গর্ভেই বাস করেন নাই। কিয়দ্দিন পরে সেই রাজপুত্রেরা বন্ধুবিহীন হইলেন। অন্নাভাবে তাঁহাদের মুখ বিষাদ-ক্লিষ্ট হইল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া শোকাকুল-চিত্তে অর্থলাভের প্রত্যাশায় নগরান্তর গমনে উদ্যত হইলেন। রাজপুত্রেরা একত্র মিলিয়া যখন সেই শূন্য নগর হইতে নির্গত হইলেন, তখন মনে হইল, গগনে যেন বুধ, শুক্র ও শনৈশ্চর, এই তিনটী গ্রহ একত্র মিলিত হইল। ঐ তিন রাজপুত্রের দেহ শিরীষ-কুসুমবৎ সুকোমল। তাঁহারা দিবাভাগে মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া নিদাঘ-ক্লিষ্ট পল্লবদলের ন্যায় পথিমধ্যে পরিম্লান হইয়া পড়িলেন। পথের উপর বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহাদের সুকোমল চরণতল দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় দুঃখভরে কাতর হইয়া 'হা তাত! হা তাত!' বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চরণতল দর্ভাগ্রে ক্ষত বিক্ষত হইল এবং তাপভরে অঙ্গসন্ধি সকল খিন্ন হইতে লাগিল। তাঁহারা ধূলিজালে

ধূসরিত হইলেন। এই অবস্থায় বহুদূর অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে তাঁহারা তিনটী বৃক্ষ পাইলেন। ঐ বৃক্ষ তিনটীতে নানাজাতীয় মৃগ পক্ষী বাস করিতেছে; বিবিধ ফল, পল্লব ও মঞ্জরীপুঞ্জ বিলম্বিত রহিয়াছে। ঐ তিনটী বৃক্ষের মধ্যে দুইটী এখনও উৎপন্ন হয় নাই এবং একটীতে অনায়াসে আরোহণ করা যায়; পরন্তু তাহার আদৌ বীজই বিদ্যমান নাই। রাজপুত্রত্রয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ তিনটী তরুর একটির তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মনে হইল, স্বর্গের পারিজাততলে যেন শক্র, অনিল ও যম সুখাসীন হইলেন। রাজপুত্রেরা সেখানে অমৃতকল্প ফল ও ফলরস ভোজন ও পান করিয়া গুলুচ্ছলতা-মঞ্জরীর মাল্য ধারণ করিলেন এবং বহুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর পুনরায় সেস্থান হইতে চলিলেন। যাইতে যাইতে বহুদূর অতিক্রম করিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। তখন তরঙ্গমালা-মুখরিত তিনটী নদী তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই নদী তিনটীর একটি একেবারেই শুষ্ক এবং অপর দুইটীতে জন্মান্ধের দর্শনশক্তির ন্যায় সম্পূর্ণই জলাভাব। নিদাঘ-তাপার্ত্ত রাজকুমারেরা পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক নদীটীতেই সযত্নে স্নান করিলেন। মনে হইল, যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, ইহাঁরা একযোগে গঙ্গাস্নান করিলেন। অনন্তর রাজকুমারেরা সেই নদীতে বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া এবং তাহার ক্ষীরোপম জল পান করিয়া হৃষ্টচিত্তে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর দিবাবসানে দিনমণি যখন অস্তাচল-শিখরে চলিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা এক নব-নির্ম্মিত ভাবী বিশাল নগর প্রাপ্ত হইলেন। নির্ম্মল নীলাকাশ ঐ নগরের জলাশয়, উহা পতাকাশ্রেণীরূপ নলিনীনিচয়ে মণ্ডিত রহিয়াছে। দূর হইতেই ঐ নগরের অধিবাসীদিগের গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। রাজপুত্রেরা সেখানে তিনটী ভবন অবলোকন করিলেন। ঐ ভবনত্রয় সুমেরুশৃঙ্গবৎ মণি-কাঞ্চনময় ও রমণীয়। সেই ভবন তিনটীর মধ্যে দুইটী অনির্ম্মিত এবং অপরটীর ভিত্তি কিছু মাত্রই নাই। রাজপুত্রেরা ভিত্তিবিহীন রম্য ভবনেই প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেখানে বিচরণ করিতে করিতে তিনটী তপ্ত কাঞ্চনময় স্থালী প্রাপ্ত হইলেন। তন্মধ্যে দুইটী ভাঙ্গিয়া কর্পূরতুল্য হইয়া গিয়াছে। সেই সুমতি বহুভোজী রাজ-

কুমারেরা সেই চূর্ণীভূত স্থালী গ্রহণ করিয়া তাহাতে শতদ্রোণ-রহিত শত দ্রোণ-পরিমিত তণ্ডুল পাক করিলেন। পরে তাঁহারা তিনটী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন; নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণত্রয়ের মধ্যে দুইজনের দেহ নাই এবং এক জনের মুখ নাই। যাঁহার মুখ নাই, সেই ব্রাহ্মণই সেই শত দ্রোণ-পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিলেন। রাজপুত্রেরা তাঁহাদের মুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

বৎস! সেই রাজপুত্রগণ অদ্যাপি ভবিষ্যৎ নগরে মৃগয়া-বিহার করত পরম সুখে বাস করিতেছেন। হে অনঘ! আমি তোমার নিকট এই রমণীয় আখ্যায়িকা বর্ণন করিলাম। হে প্রাজ্ঞ! তুমি ইহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে প্রকৃত পণ্ডিত হইতে পারিবে। রামচন্দ্র! সেই বালক ধাত্রীর মুখে এই মনোহর আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। হে নলিনাক্ষ! চিত্ত বর্ণন প্রসঙ্গে তোমাকে দৃষ্টান্তস্বরূপে এই বালকাখ্যায়িকা বলিলাম। এই আখ্যায়িকা অসঙ্গত হইলেও সেই বালকের হৃদয়ে যেমন দৃঢ়লগ্ন হইয়াছিল, সেইরূপ এই যে সংসার, ইহাও অলীক হইলেও দৃঢ়কল্পিত সঙ্কল্পের বলে স্থির ও সত্য হইয়া রহিয়াছে। হে অনঘ! এই কল্পনা-জাল-ভাসিত প্রতিভাসিক সংসাররচনা বন্ধ-মোক্ষাদি অশেষ কল্পনায় প্রকাশিত হইতেছে। ফলে, ইহা সঙ্কল্প বৈ আর কিছুই নয়। সঙ্কল্পবশে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎ অথবা কিঞ্চিৎ। অকিঞ্চিৎ—রজ্জু-ভুজঙ্গবৎ মিথ্যা; আর কিঞ্চিৎ—ভ্রান্তির আধার ব্রহ্মচৈতন্য। এই যে পৃথ্বী, পবন, গগন, পর্ব্বত, সরিৎ ও দিঙ্মণ্ডলাদি, এ সকলই সঙ্কল্পসমূহে সমুল্লসিত এবং সকলই আত্মার স্বপ্ন বলিয়া বিদিত। সেই ভাবী নগরের রাজপুত্রত্রয় ও সেই নদীত্রয় যেমন এবং মনের সঙ্কল্প যাদৃশ, এই জগতের সত্তাও তথাবিধরূপেই বিজ্ঞেয়। চঞ্চল সাগরের সর্ব্বত্রেই যেমন জল, তাহার জলরূপত্ব ব্যতীত যেমন অন্য কোন সত্তা নাই, তেমনি সঙ্কল্পেরও আত্মসত্তা ভিন্ন অন্য সত্তা নাই। পরমাত্মা হইতে প্রথমে যে একমাত্র সঙ্কল্প সমুদিত হইয়াছিল, ঐ সঙ্কল্পই সূর্য্যের দিবস-ব্যাপারবৎ ক্রমশঃ লোক-ব্যাপারে বিস্তৃতি পাইয়াছে।

রামচন্দ্র! এই যে নিখিল জগৎ, ইহা একমাত্র সঙ্কল্প বৈ আর কিছুই

নয়। কি রাগাদি মনোবৃত্তি, কি যাবতীয় জ্ঞেয় পদার্থ, জানিও—সকলই সঙ্কল্প। তাই বলিতেছি, রাম! তুমি ঐ সঙ্কল্পের মূলোচ্ছেদ করিয়া নির্ব্বিকল্প আত্মনিশ্চয় লাভে শান্তি লাভ কর।

একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অজ্ঞ লোকেরাই আপন আপন সঙ্কল্প বশতঃ মোহ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা মোহগ্রস্ত হয়েন না। দেখ, যাহারা শিশু, তাহারাই অক্ষয় পদার্থে ক্ষয় সঙ্কল্প করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্‌বর! ভবদুক্ত সঙ্কল্পিত ক্ষয় কি? কেই বা সঙ্কল্প করে? কোন্ অসত্য নিমিত্ত দ্বারাই বা আত্মা মহামোহ বা সংসারভ্রম উপগত হইয়া থাকেন? ভাবার্থ এই, নিত্যাত্মা কি নশ্বরাত্মাকে সঙ্কল্পযুক্ত করেন? অথবা নশ্বরাত্মাই কি নিত্যাত্মাকে সঙ্কল্পযুক্ত করিয়া থাকেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! শিশু যেমন মিথ্যা-বেতাল কল্পনা করিয়া লয়, পরমাত্মা তেমনি প্রাক্তন প্রাণিদিগের অহম্ভাবে বাসিত ও অবিদ্যোপহিত হইয়া অহঙ্কারনামধারী ক্ষয় বা নশ্বরাত্মা কল্পনা করিয়াছেন। 'অহং' বা 'আমি' এ ভাবটা তাঁহারই অজ্ঞানে কল্পিত; সুতরাং শিশুর বেতাল-কল্পনার ন্যায় তাহা মিথ্যা। যখন একমাত্র পূর্ণস্বভাব পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, তখন আর 'অহং' নামে কোন্ পৃথক্ পদার্থ কোথা হইতে আসিবে? অদ্বৈত পরমাত্মাতে অহঙ্কার বাস্তবিকই নাই। যেমন মরীচিকায় নদী ভ্রম হয়, তেমনি অসম্যগ্‌দর্শীদিগের নিকটই ঐ ভ্রান্তি-বিলসিত অহঙ্কার স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই সংসারকে মনোরূপ চিন্তামণিরই একটা মহাকার্য্য বলিয়া লক্ষিত হয়। জল যেমন নিজেই

নিজেকে আশ্রয় করিয়া আবর্ত্তাকারে প্রকাশ পায়, তেমনি মনই আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া সংসাররূপে স্ফুরিত হয়। অতএব হে রামচন্দ্র! তুমি অসদ্‌বিষয়ক অসম্যক্ দৃষ্টি পরিহার করিয়া যাহা সত্যমূলক, সত্য ও আনন্দপ্রদ, সেই সম্যক্‌দর্শন আশ্রয় কর। অধুনা মোহাড়ম্বরহীন বিবেকবতী বুদ্ধির সাহায্যে তুমি সত্যস্বরূপের বিচার কর, আর যাহা অসত্য, তাহা পরিহার কর। যিনি প্রকৃত পক্ষে বদ্ধ নহেন, তাঁহাকে বদ্ধ ভাবিয়া কেন বৃথা শোক করিতেছ? আত্মতত্ত্ব অনন্ত,তাঁহাকে কি কেহ কখন কোনরূপে বদ্ধ করিতে পারে? নানাত্ব আর অনানাত্ব এ উভয়ই ব্রহ্ম পদার্থে কল্পিত; যখন ঐ কল্পনার পরিহার হয়, তখন এক অদ্বিতীয় সর্ব্বময় ব্রহ্মতত্ত্বই বিরাজ করিতে থাকেন; সুতরাং তখন আর কে বদ্ধ এবং কেই বা মুক্ত রহিবে? আত্মা অনার্ত্ত, অর্থাৎ তিনি যথার্থ আর্ত্ত হয়েন না; তবে কথা এই, দেহ আর্ত্ত হইয়া পড়িলে, তিনি আর্ত্তবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকেন; কেন না, দেহাদি যদি কর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ক্লেশ অনুভব করেন। এদিকে কিন্তু বস্তুতই আত্মাতে কোন ভেদাভেদ-বিকার কিম্বা কোন আর্ত্তি বা পীড়া একেবারেই অসম্ভব; অতএব বুঝা যায়, দেহ যদি নষ্ট, ক্ষত বা ক্ষীণ হয়, তাহাতে আত্মার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ভস্ত্রা যদিই বা দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে কি তাহার ভিতরের বায়ু দগ্ধ হইয়া থাকে? দেহ উপচিত হউক, বা অপচিতই হউক, আমাদের তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? পুষ্প যদি নষ্ট হয়, তবে তাহার সৌরভের কোন ক্ষতি হয় কি? সৌরভ ত আকাশের আশ্রয়ে থাকে। এই দেহকমলে সুখ-দুঃখরূপ তুষারপাত যতই হয় হউক, আকাশে উৎপতনশীল অলি—আমরা, আমাদের তাহাতে কি ক্ষতি উপস্থিত হইবে? আমরা আকাশে উড়িয়া যাইব, দেহ পতিত হয় হউক, আর উঠিতে হয়, উঠুক, অথবা আকাশের ভিতর যাইতে হয়, যাউক, আমি যখন দেহ হইতে ভিন্ন, তখন আর আমার তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? পয়োধরের সহিত পবনের আর কমলের সহিত মধুকরের যেরূপ সম্বন্ধ, জানিও—রাম! তোমার দেহের সহিত তোমার আত্মারও সম্বন্ধ সেইরূপই।

হে রাম! মনই সর্ব্বজগতের শরীর অর্থাৎ মনই জগদাকারে দেখা যাইতেছে। মনই দৃশ্য জগতের আদ্যা শক্তি। যাহা দেহোপহিত চৈতন্য,

তাহা কদাচ নষ্ট হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আত্মা যিনি, তিনি কোথাও গমন করেন না এবং কদাপি তাঁহার নাশ নাই; সুতরাং সেজন্য কেন বৃথা পরিতাপ করিতেছ? যেমন মেঘ বিশীর্ণ হইলে মারুত এবং পদ্ম বিশুষ্ক হইলে ভ্রমর অনন্ত আকাশে চলিয়া যায়, আত্মাও তেমনি দেহক্ষয়ে অনন্ত আকাশপদে বিলীন হইবেন। এই যে সংসারবিহারী জীব, জ্ঞানাগ্নি ব্যতীত ইহার মনেরও যখন নাশ নাই, তখন আত্মার নাশ ত দূরের কথা। যেমন কুণ্ড ও বদরফলের অবস্থিতি এবং যেরূপ ঘট ও ঘটাকাশের স্থিতি, বিনশ্বর দেহ ও অবিনশ্বর আত্মার অবস্থানও তেমনই। যেমন কুণ্ড বা আধারপাত্র ভগ্ন হইলে বদর ফল হস্তে বা আধারান্তরে উপস্থিত হয়, তেমনি দেহ নষ্ট হইয়া গেলে আত্মাও আকাশদেশে উপগত হইয়া থাকেন। কুম্ভ ভাঙ্গিয়া গেলে কুম্ভমধ্য-গত আকাশ যেমন আকাশে মিশিয়া যায়, দেহ ক্ষয় হইলে নিরাময় দেহীও তেমনি পরমাত্মায় গিয়া বিরাজ করেন। জন্তুদিগের মনোরূপ দেহও কিয়ৎকালের জন্য দেশকাল হইতে তিরোহিত হইয়া বারম্বার মরণরূপ প্রাবরণে আবৃত থাকে; সুতরাং সেই শঠ মনের জন্য আবার আক্ষেপ করিবার কি আছে? হে মহাভুজ! দেশ ও কাল ভেদে আত্মার যে তিরোধান, তাহাই মরণ-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। তথাবিধ মরণস্বরূপ বুঝিতে পারিলে, মরণে মূঢ় লোকেরও ভয় হয় না। বস্তুতঃ আত্মার মাত্র তিরোধানই হয়, আত্মার প্রকৃত নাশ কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই। পক্ষিশাবক আকাশগগনে সমুৎসুক হইয়া যেমন স্বীয় অণ্ড পরিত্যাগ করে, তুমিও তেমনি 'আমি মিথ্যা' এইরূপ স্থির করিয়া অহম্ভাব-বাসনা বিসর্জ্জন কর। এই বাসনাই মানসী শক্তি এবং ইহাই ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়ে অনুরক্তি বা বিরক্তি-বিধায়িনী। এই মিথ্যা ভ্রমময় বাসনা বশেই স্বপ্নসন্নিভ জগৎ কল্পনা হয়। এই বাসনাই দুরন্ত অবিদ্যা এবং ইহাই কেবল দুঃখ দানার্থ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যতদিনে না এই অবিদ্যা অবগত হওয়া যায়, ততদিনই ইহা এই অসৎ জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করিতে থাকে। আকাশ বাস্তবিক মলিন নয়; কিন্তু কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইলেই তাহাকে যেমন মলিন দেখা যায়, তেমনি এই মোহকরী বাসনার এমনই স্বভাব যে, ইহাতে মুগ্ধ জীবেরা আপনাকে মলিন বলিয়া অবলোকন

করে। ঐ বাসনারূপিণী মানসী শক্তির প্রভাব বশতই মহাড়ম্বরময় বিশাল বিশ্ব সুদীর্ঘ-স্বপ্নের স্থায় অসৎ হইয়া সতের স্থায় সমুদিত হইতেছে। এই বাসনার কর্ত্তা ও স্বরূপ একমাত্র ভাবনা ব্যতীত অপর কেহই নয়। নেত্র দুষ্ট হইলে লোকে যেমন আকাশে কেশগুচ্ছাদি অবলোকন করে, আত্মা তেমনি অজ্ঞান-কলুষিত হইয়াই আপনাতে জগদ্দর্শন করেন।

হে রাম! যেমন সৌরতাপে হিমশিলা গলিয়া যায়, তুমিও তেমনি বিচারবলে এই বাসনাময়ী মানসী শক্তির বিলয় বিধান কর। হিমাপায়ে অভিলাষী হইলে সূর্য্যদেবের যেমন আপন উদয়েই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তেমনি মনোনাশ করিবার যাহার অভিলাষ, বিচারবলেই অবশ্য তাহার সে ইষ্ট সুসিদ্ধ হইবে। এই যে অনর্থদায়িনী দুর্জ্ঞেয় অবিদ্যারূপিণী মেঘ-মালা, ইহা আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শম্বরাসুরবৎ বিশ্ববিস্তাররূপ ইন্দ্রজাল-ময় সুবর্ণ বর্ষণ করে। মন আপনিই আপনার বিনাশক্রিয়া করে; আপনিই আত্মঘাতী নাটকের অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। মন কেবল আপনার বিনাশের জন্যই আত্মদর্শন করে। অর্থাৎ আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারে মন বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি মন বুঝিতে পারে না যে, তাহার নিজের বিনাশ অতি সন্নিকট। জানিতে পারে না বলিয়াই মন আত্মদর্শন করে। যাহারা মনোবিনাশে অভিলাষী হয়, মন নিজেই সঙ্কল্প মাত্রে তাহাদের সে অভিলাষ পূরণ করিয়া দেয়। এই ব্যাপারে কোনরূপ ক্লেশ করিবারই আবশ্যক হয় না। মন যদি বিবেক দ্বারা সুসংস্কৃত হয়, তাহা হইলে আপনার প্রাক্তন সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ অংশ পরি-হারপূর্ব্বক ব্রহ্মাকার বিস্তৃত আত্মাববোধ প্রাপ্ত হইতে পারে।

রামচন্দ্র! মনের নাশই মহান্ অভ্যুদয়, আর মনের উদয়ই মহানর্থের নিদান। অতএব তুমি মনোবিনাশে যত্ন প্রকাশ কর। পরন্তু মনের বহি-র্ব্যাপারে কখন যত্ন করিও না। এই যে নিখিল সংসার-কানন, ইহা কৃতান্ত-রূপ মহাভুজঙ্গে ভয়াবহ এবং সুখদুঃখ-রূপ বৃক্ষরাজিতে নিতান্ত নিবিড়তর। মহাবিপদের মূল অবিবেকী মনই এই সংসারসকলের একমাত্র প্রভু।

মুনিবর বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতেছেন; ইত্যবসরে দিবা অবসান হইল। দিবাকর সায়ন্তন বিধির অনুসরণ করিতে গিয়া অস্তাচল

অবলম্বন করিলেন। সভ্যমণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদনান্তে সায়ং স্নান সমাধার জন্য সভাক্ষেত্র হইতে নির্গত হইলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে দিনকরের কিরণ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সভা আরম্ভ হইল।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যেমন সাগর হইতে কল্লোল উত্থিত হয়, তেমনি পরব্রহ্ম হইতে মন উদ্ভূত হইয়াছে। অনন্তর ঐ মন ক্রমশঃ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এই বিশাল বিশ্বের বিস্তৃতি বিধান করিতেছে। বলিতে কি, এই মনের এমনই অপূর্ব্ব শক্তি যে, মন হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব করিয়া দেয়; অপিচ এই মনই পরকে আপনার এবং আপনাকে পর করিয়া তুলে। যে পদার্থ প্রাদেশ মাত্র, মন তাহাকে আপনা হইতে সমুদিত ভাবনাবলে সহসা পর্ব্বতবৎ বিশাল করিয়া লয়। মন পরমাত্মা হইতে সমুত্থিত ও নিমেষ মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া এই সংসার বিস্তার করে; আবার ইহা সংহার করিয়াও ফেলে। এই যে নিখিল পদার্থ-পরিপূর্ণ চরাচরাত্মক জগৎ দেখা যাইতেছে, এ সকল চিত্ত হইতেই উপাগত হইয়াছে। মন স্বভাবতই চঞ্চল। এই মন দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যশক্তির প্রভাবে ইতস্ততঃ সমাকুলিত হইয়া নটের ন্যায় একভাব হইতে ভাবান্তরে উপনীত হইয়া থাকে। মনই সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ করিয়া তুলে। মন যেরূপ যেরূপ ভাবনা করে, সেই সেইরূপ সুখ দুঃখই সে লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন চঞ্চলস্বভাব; সে যেরূপ কল্পনায় যাদৃশ ভোগ্য বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া লয়, কর-চরণাদি অঙ্গসমূহও তদনুসারেই যত্ন করিতে থাকে। তৎকালে কর-চরণাদি-ক্রিয়াও অবিলম্বেই সলিল-সিক্ত লতার ন্যায় মনোভীষ্ট ফলাফল সমর্পণ করে।

রামচন্দ্র! বালক যেমন মৃৎপিণ্ড হস্তে লইয়া পরে তাহা দিয়া বিবিধ খেলার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লয়, অন্তঃস্থ ভাব লইয়া মনও তেমনি জগদ্‌বিকল্প নির্ম্মাণ করিতে থাকে। মন, পদার্থরূপ মৃৎপিণ্ড দিয়া এই যে নরদেহাদিরূপ খেলার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছে, ইহার ভিতর এমন একটা কোনই পদার্থ নাই, জগতে যাহাকে সত্য বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। ঋতুসমূহের বিভাগকর্ত্তা কাল যেমন বৃক্ষদিগের রূপ-ভেদ বিধান করিয়া দেয়, চিত্তও তেমনি পদার্থ-পরম্পরার বিভিন্নরূপতা সম্পাদন করিয়া থাকে। মনোরথ, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প এই সকল চিত্ত-কার্য্যের অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে—চিত্তেরই লীলাবশতঃ বহুযোজন-পরিমিত স্থানও গোষ্পদবৎ অত্যল্প বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অবিবেকী জনের দৃষ্টিতে এই বিশ্ব বহুযোজনায়ত, আর বিবেকীর দৃষ্টিতে ইহা গোষ্পদ-নিভ। বলা বাহুল্য, এই মন কল্পকালকে ক্ষণকাল করিতে পারে এবং ক্ষণকেও কল্প করিয়া তুলে; সুতরাং জানিও—দেশ, কাল ও ক্রিয়াক্রম প্রভৃতি করিয়া যে কিছু, সকলই মনেরই অধীন। এখানে কথা হইতে পারে, মন যদি সমস্ত বস্তু নির্ম্মাণ করিতেই সমর্থ, তাহা হইলে আমাদের মন কেন সমগ্র সৃষ্টি সম্পাদন করিতে পারে না? এই কথায় বক্তব্য এই যে, রজোগুণের উৎকর্ষ বশতঃ মানসী শক্তির তীব্রতা হইয়া থাকে, তমোগুণের উৎকর্ষে উহার মন্দতা হয়; এইরূপ আহারের উপচয়ে বহুত্ব, আহারের অপচয়ে অল্পত্ব এবং সেই সেই বস্তুসৃষ্টির অনুকূল উপাসনাদির বিলম্ব, এই সকল নানাকারণে সমস্ত মনের সমস্ত সৃষ্টিশক্তি সমানভাবে উপস্থিত থাকিতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া মনের যে বাস্তবিক সর্ব্বসৃষ্টিবিষয়ে শক্তিমত্তা নাই, এমন কথা বলা যায় না। পাদপ হইতে পল্লবোৎপত্তির ন্যায় চিত্ত হইতেই মোহ, সম্ভ্রম, অনর্থ, দেশ, কাল, গতি ও অগতি প্রভৃতি সকলই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যেমন জলকেই সাগর ও উষ্ণতাকেই অগ্নি বলা যায়, তেমনি এই যে সংরম্ভাত্মক সংসার, ইহাকেও চিত্ত ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন এবং ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, ইত্যাদি বিবিধ রূপভেদ-সঙ্কুল এই জগৎ চিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাঞ্চনতত্ত্ব-পরীক্ষাকারী লোক যেমন কেয়ুর, কটক, ও মৌলিক প্রভৃতি

নানা ভেদ-কল্পিত সুবর্ণকে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবুদ্ধিতে পরীক্ষা করিতে গিয়া সকলকেই একমাত্র কাঞ্চন বলিয়াই অবধারণ করিয়া লয়, তেমনি যাঁহারা বিবেকশালী, তাঁহাদের নিকট এই বনশৈলাদি-সঙ্কুল বিশাল বিশ্ব বিভিন্ন-রূপে বিলোকিত হইলেও একমাত্র চিত্তরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই জাগতিক চেষ্টারূপ ইন্দ্রজাল ব্যাপার যে প্রকারে চিত্তের অধীনতায় রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে একটী উত্তম উপাখ্যান এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

এই বসুধাতলে বিবিধ বন-সমাকুল এক অতি সমৃদ্ধ জনপদ আছে। সেই জনপদের নাম উত্তরামণ্ডপ। তাহার নীরন্ধ্র ঘনগভীর বনবিভাগে কত তাপস বিশ্রাম করেন। বিদ্যাধরীরা তদীয় উপবন মধ্যে লতার দোলায় আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করে। ঐ জনপদমধ্যে যে সকল শৈল আছে, কমলকুলের কিঞ্জল্কপুঞ্জ বাতবেগে সমুত্থিত হইয়া তাহাদিগকে পিঙ্গলবর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কত শত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; বোধ হয়, তাহারা যেন বনভূমির শিরোভূষণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। ঐ জনপদের প্রান্তভাগে কত জঙ্গল আছে। সেই সকল জঙ্গল করঞ্জমঞ্জরীর কুঞ্জে ও নানাজাতীয় কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত রহিয়াছে। তথাকার গ্রামগুলি অসংখ্য খর্জ্জুরবনে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই বনের উপরিভাগ দিয়া কত বিহঙ্গম উড়িয়া যাইতেছে; তাহাদের ঘুজ্ঝুম ধ্বনিতে অম্বরদেশ ধ্বনিত হইতেছে। পক্ক শালিক্ষেত্রের মধ্যগত কেদারশ্রেণী যেন কোন অত্যুত্তম পিঙ্গলবর্ণ মণির ন্যায় পিঙ্গলাভা ধারণ করিতেছে। ময়ূরগণের উদ্দাম নিনাদে পার্শ্বস্থ বন-জঙ্গল সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেখানকার কনককান্তি কাননদেশ সারসগণের কলরবে মুখরিত, তমাল ও পাটলাতরুতে নীলবর্ণ গিরিগ্রাম-

গুলি সেই জনপদের কুন্তলাকারে সুশোভিত, স্থানে স্থানে বিবিধ বিচিত্র বিহঙ্গমকুলের বিরাবে কাকলীধ্বনি সমুত্থিত, তত্রত্য নদীতটগুলি কুসুমিত নিম্বতরুগণে অরুণিত, ক্ষেত্রপালিকা কৃষক-কামিনীদিগের সুমধুর গীতিস্বরে পথিকগণের হৃদয়ে মদনতাপ উদ্দীপিত, বায়ুপ্রবাহে শ্লথবৃন্ত ফল ও ফুল-দল পতিত ও কুসুমরূপ বারিধর বিচালিত, কত সিদ্ধ ও চারণবৃন্দ তথাকার গুহাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত, যেন স্বর্গ হইতে স্বর্গলাবণ্য আনয়ন করিয়াই সেই জনপদের সৌষ্ঠব সুবিহিত, কত গন্ধর্ব্ব, কত কিন্নর সেখানকার কদলী-মণ্ডপে সঙ্গীত করিতে নিরত এবং মন্দ মন্দ মারুতবেগে নিপতিত কুসুম-রাশিতে সেখানকার উদ্যানভূভাগ পাণ্ডুরবর্ণে সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

রামচন্দ্র! ঐ জনপদে লবণনামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বংশধর। লোকে তাঁহাকে ভূতলস্থ দিবাকরের ন্যায় মনে করিত। তদীয় যশঃকুসুমে শৈলসকল পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া চিতা-ভস্মলিপ্ত মহাদেববৎ সর্ব্বদা সুশোভিত হইত। তিনি কৃপাণবলে অসংখ্য অরাতি সমূলে উন্মূলিত করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার নাম স্মরণেই অরাতিমণ্ডলের অন্তরে সন্তাপ উপস্থিত হইত। তদীয় উদার কার্য্যাবলী ও আর্য্যজন-রক্ষণের পবিত্র চেষ্টা-চরিত্র, হরিচরিতের ন্যায় চিরকাল জন-গণের স্মৃতিপথে সমুদিত রহিবে। সুমেরুশৈলের শিখরে শিখরে যত দেবালয় আছে, সে সমুদায়ের মধ্যে থাকিয়া সুর-সুন্দরীরা পুলকিতকায়ে এখনও প্রতি-নিয়ত তাঁহার চরিত-গাথা গান করিয়া থাকেন। সুরসভায় সুর-সুন্দরীদিগের কণ্ঠে কণ্ঠে সতত তদীয় গুণ গীত হয়। লোকপালেরা চিরতরে সাদরে তাঁহার গুণগান শ্রবণ করেন। অভ্যাসবশে বিরিঞ্চিবাহন হংসেরা তদীয় গুণ-গীতি সকল সতত ধ্বনিত করে। রাম! তিনি অসাধারণ উদারতাগুণে মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে কেহই কোন দোষলেশ কদাচ দেখে নাই বা শুনে নাই। কৌটিল্য যে কি, তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না। উদ্ধত স্বভাব কখন তাঁহার ছিল না। ব্রহ্মার কর-বিরাজিতা অক্ষমালার ন্যায় সর্ব্বদাই তদীয় হৃদয়ে উদারতা বিরাজ করিত।

একদা দিবসের অষ্টম ভাগে দিনমণি অম্বরতলে সমাগত হইলে, সেই নরপতি সভামধ্যে আসিয়া সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। নিশাকালে নভো-

মণ্ডলগত নিশাকরের ন্যায় তিনি তথায় সুখোপবিষ্ট হইলে, ক্রমে সামন্তগণ ও সেনাগণ সসম্ভ্রমে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। গায়িকা কামিনীগণ গান আরম্ভ করিল। অন্যান্য রাজগণ সুখে সমুপবিষ্ট হইলেন। বীণা-বেণুর মধুররবে সভাসদ্‌গণের মন প্রাণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইল। চারু চামর-হস্তে বিলাসিনী ললনাকুল রাজাকে বীজন করিতে লাগিল। বৃহস্পতি ও শুক্রপ্রতিম রাজমন্ত্রিগণ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণান্তে উপস্থিত রাজকার্য্যের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। নিপুণতর অমাত্যবর্গ নানাদেশের ঘটনাবলী বিবৃত করিতে লাগিলেন। পুণ্যময় ঐতিহাসিক পুস্তক সকল পঠিত হইতে লাগিল। বন্দিগণ অদূরে প্রণতভাবে পুণ্য স্তুতি-গীতি-গাথা পাঠ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে জনৈক ঐন্দ্রজালিক পুরুষ সগৌরবে সভামধ্যে প্রবেশ করিল। মনে হইল, যেন ঘনবর্ষী ঘোর বারিধর বসুধাতলে সমুদিত হইল। সেই পুরুষ প্রবেশ মাত্র ফলভারানত পাদপের ন্যায় উন্নতগ্রীব মহীপতির পাদপ্রান্তে প্রণত হইল। অনন্তর সেই পুরুষ রাজার অগ্রে উপবেশন করিল। মনে হইল, যেন কুসুম-সমুদ্ভাসিত সফল পাদপের শিখরদেশে কপিবর উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর ঐ অর্থলোলুপ ঐন্দ্রজালিক, মন্দ-মারুতান্দোলিত আমোদময় কমলের নিকট মধুকরের গুন্ গুন্ রবে গুঞ্জনের ন্যায় কিরীট-মণ্ডিত নরপতির সমীপে নিবেদন করিল,—হে বিভো! চন্দ্র আকাশে থাকেন। তিনি সেইখানে থাকিয়াই ভূতলের বিবিধ অশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শন করেন। আমি অনুরোধ করি, আপনিও সেইরূপ আপনার ঐ সিংহাসনে থাকিয়াই মৎ-প্রদর্শিত একটী অলীক কৌতুকক্রীড়া অবলোকন করুন। ঐন্দ্রজালিক এই কথা কহিয়া দর্শকবৃন্দের ভ্রান্তিবিধায়ক এক ময়ূরপুচ্ছ ভ্রমণ করাইতে লাগিল। বোধ হইল, ঐ পুচ্ছ যেন পরমাত্মার মায়ার ন্যায় নানা কল্পনার নিদান-স্বরূপ। দেবরাজ যেমন ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আপনার বিচিত্র ধনু দর্শন করেন, ঐ নরপতিও তেমনি সেই বিবিধ তেজঃপুঞ্জময় ময়ূরপুচ্ছ দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় সহসা সভামধ্যে এক অশ্বপাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

মনে হইল, যেন নক্ষত্র-মালাখচিত নভোমণ্ডলে জলধরের আবির্ভাব হইল। দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুখাসনে সমাসীন সুররাজের পশ্চাৎ দিক্ হইতে সমাগত উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় তৎকালে একটী সুন্দর বেগবান্ অশ্ব, সেই অশ্বপালকের পৃষ্ঠভাগ হইতে আগমন করত ক্রমে রাজার নিকট আসিল। অশ্বপাল রাজাকে সেই অশ্ব দেখাইয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিলে, মনে হইল, যেন স্বয়ং ক্ষীরসাগর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব লইয়া আসিয়া দেবেন্দ্রসমীপে তদীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিতে সমুদ্যত হইল। অশ্বপাল বলিল,—মহারাজ! এই অশ্ব ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার সহিত সর্ব্বাংশে তুলনীয়। ইহার গতি এতদূর বেগবতী যে, ইহাকে মূর্ত্তি-মান্ বায়ু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হে প্রভো! আমাদের যিনি প্রভু, তিনি আপনাকে উপহারস্বরূপ এই অশ্বটী প্রেরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহা উত্তম বস্তু, তাহা মহতের হস্তগত হইলেই সুশোভিত হইয়া থাকে।

তখন অশ্বপাল এই কথা কহিলে, মেঘসমীপে চাতকের ন্যায় সেই ঐন্দ্রজালিক রাজার নিকট নিবেদন করিল—প্রভো! রবি যেমন আপন প্রতাপে ভূমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া বিচরণ করেন, আপনিও তেমনি এই সদশ্বে সমারূঢ় হইয়া এই বিশ্বমণ্ডলে বিচরণ করুন। ঐন্দ্রজালিক এই কথা কহিয়া বিরত হইলে, রাজা সেই অশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মনে হইল, ময়ূর যেন গভীরগর্জ্জী মেঘের প্রতি সমুৎসুক হইয়া তাকাইল। নরপতি নির্নিমেষ-নয়নে সেই অশ্বকে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইলেন। তিনি তখন চিত্রলিখিতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুরাকালে সাগর-পানোদ্যত অগস্ত্য মুনিকে দেখিয়া সমুদ্র যেমন আপনার অন্তর্গত অদ্রি ও মীনাদি জলজন্তুগণ সহ স্তম্ভিত হইয়াছিল, সেই অশ্বদর্শনে রাজাও তেমনি নিশ্চল হইয়াছিলেন। বিষয়বিরক্ত ও পরমানন্দময় আত্মাতে ধ্যানাসক্ত মুনিজনের ন্যায় দুই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তখন নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ঐ অবস্থায় রহিলেন। ভয়ে কেহই তাঁহাকে প্রবোধ প্রদানে সাহসী হইল না। সকলেই ভাবিল, রাজা কোন একটা নিগূঢ় বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। রাজার

তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে চামরধারিণী কামিনীকুলের করস্থিত শ্বেত চামর তখন নিশ্চল হইয়া রহিল। মনে হইল, নিশা যেন নিশাকরের কিরণপুঞ্জ একত্র স্তম্ভিত করিয়া রাখিল। সভাসদ্‌গণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিষ্পন্দভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন এক একটী নিশ্চল-কেসর পক্ষ্মময় পদ্ম সুশোভিত হইল। সভাস্থানের জন-কোলাহল সকল ধীরে ধীরে শান্ত হইল। মনে হইল, বর্ষাবিগমে আকাশের অম্ভোদনাদ বিলুপ্ত হইল। পুরাকালে বিষ্ণু অসুরসমরে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, সুরগণ যেমন সংশয়াকুল হইয়াছিলেন, তৎকালে মন্ত্রিগণ সেইরূপ সন্দেহ-সাগরে মগ্ন ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভূপতি স্তিমিতনেত্রে অবস্থান করিলে সভাস্থ সমস্ত জনতা সে কালে বিস্ময়ভরে অলস ও ভয়-মোহে বিবশ হইয়া মুকুলিত কমলকাননবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অনন্তর দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইলে বর্ষাজল-মুক্ত উত্তম কমলের ন্যায় মহীপতি প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন। এইবার মহী-পতির কম্প উপস্থিত হইল। ভূকম্পকালীন বন-শৃঙ্গাদি সহ শৈলের ন্যায় নরপতি তখন প্রবোধ পাইবার পর আপন অঙ্গভূষণ সহ কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি কম্পন-কালে দিগ্‌গজগণের বিক্ষোভ-বিচালিত কৈলাস-শৈলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিলেন। রাজা যখন কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, তখন—যেমন প্রলয়ে পতনোন্মুখ সুমেরুকে কুলাচলগণ তটভূমি দিয়া ধরিয়াছিল, সম্মুখস্থ জনগণ তেমনি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিল। সে কালে রাজার মতি পর্য্যাকুলিত হইয়াছিল। পতন কালে পুরোবর্ত্তী লোকেরা যখন তাঁহাকে ধরিল, তখন তিনি চন্দ্রোদয়-ক্ষুব্ধ সাগরের সলিল শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মুকুলিত কমলের মধ্যগত মধুকরের ন্যায় নরপতি একটা অস্ফুটধ্বনি করিলেন। সে ধ্বনির মর্ম্ম এই যে, এ কোন্ প্রদেশ? আমি কোথায় আছি? এ সভা কাহার? তখন রাহুগ্রস্ত রবিকে দেখিয়া মধুর গুঞ্জনশালিনী পদ্মিনীর ন্যায় সেই সভা যেন সাদরে এইরূপ প্রতিধ্বনিত করিল—'দেব! এ কি?' অতঃপর অমরগণ যেমন প্রলয়-কল্লোলভীত মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, তেমনি তখন রাজমন্ত্রিগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—হে দেব! আপনি এই অবস্থায় রহিয়াছেন, ইহাতে আমরা অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। সত্য বটে, ভ্রান্তিবিশ্বাস বাহ্যিক কারণ না থাকিলেও অভেদ্য মনকে ভয় ও বিষাদপ্রভৃতিতে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু ভবদীয় মন আপাতমধুর পরিণাম-বিরস বিষয়ভোগের ন্যায় কোন না কোনরূপ বিকল্প-বিক্ষোভে বিমূঢ় হইয়াছে কি? আমাদের মনে হয়, আপনার সেরূপ কিছুই ঘটে নাই; তাই জানিতে ইচ্ছা করি, ভবদীয় এই নির্ম্মল মন সতত বিবেক-চর্চ্চায় সুশীতল হইলেও কেন এক্ষণে ভয়-বিমূঢ় হইয়া পড়িল? যে মনের তুচ্ছ বিষয় আশ্রয় হয়, তাদৃশ মনই বিষয়ধ্বংসে বিধ্বস্ত ও বিষয়-বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ে; কিন্তু ভবাদৃশ ব্যক্তির মন বিবেক-জলে বিধৌত; সে মনের ত এরূপ হওয়া উচিত নয়। যাহার মনে দেহাভিমানে বিবেকস্পর্শ প্রায় কদাচ ঘটে না, তাহারই মনের এহেন ভ্রান্তি সম্ভবিতে পারে; পরন্তু আপনার মনের আশ্রয় অতুচ্ছ বিষয় এবং তাহা সতত ধীর, প্রবুদ্ধ ও গুণগ্রাহী; সুতরাং এরূপ হইয়াও সে যে ঈদৃশ বিক্ষুব্ধভাব ধারণ করিল, ইহা বড়ই বিচিত্র। যে মনের বিবেকাভ্যাস নাই, যাহা দেশ-কালের বশবর্ত্তী হইয়া বিরাজমান, মন্ত্র কিম্বা ঔষধির বলে সেই মনেরই এইরূপ হইবার কথা; কিন্তু যে মনের প্রকৃতি অতি উদার তাহার, ত কখন এ অবস্থা হয় না। যে মন বিবেকশালী, তাহার এইরূপ বিশীর্ণভাবে বিধুনন, সাধারণ সমীরবেগে সুমেরু-সঞ্চলনেরই অনুরূপ।

তখন স্বজনগণের তথাবিধ আশ্বাসবাক্যে নরপতির আনন কমনীয় কান্তি ধারণ করিল; অর্থাৎ বিষাদ-বিগমে রাজার মুখে প্রফুল্ল শ্রী দেখা দিল। মনে হইল, চন্দ্র যেন পূর্ণিমায় পূর্ণভাবে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন।

নরপতি নয়ন উন্মীলিত করিয়া কথঞ্চিৎ প্রফুল্লমুখে মধুর শোভা ধারণ করিলেন। বোধ হইল, শীতঋতুর অবসানে ফুল্ল পুষ্পময় বসন্ত যেন বনদেশে সুশোভিত হইল। গ্রস্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চন্দ্রমা যেমন রাহুদর্শনে ভীত ও বিস্ময়-বিষাদে ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন, তেমনি রাজাও তখন ঐন্দ্রজালিককে দেখিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুস্মরণে আকুল হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর হিংস্রক নকুলের প্রতি তক্ষকসর্পের ন্যায় সেই রাজা, ঐন্দ্রজালিকের প্রতি তাকাইয়া একটু যেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ওহে মূর্খ! তুমি এই মায়াজাল প্রসারিত করিয়া এ কি করিলে? এই দেখ, তোমার এই কার্য্যে যেন প্রসন্ন প্রশান্ত সাগর ক্ষণমধ্যে ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! বস্তুগত শক্তি কি অপূর্ব্ব! আমার মন বিবেক-বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় হইলেও আজ কিনা সেই শক্তিরই প্রভাবে তাহা মোহমগ্ন হইল! আমরা সমস্ত লোক-ব্যবহারের রহস্যবেত্তা, সেই আমরাই বা কোথায় আর এই মনোমোহ-বিধাতা মহাবিপদই বা কোথায়? ফলতঃ আমরা হইলাম—সকল বিষয়ের অভিজ্ঞ; সুতরাং এহেন ঘটনায় বিহ্বল হওয়া আমাদের পক্ষে একান্তই আশ্চর্য্য বৈ কি? অথবা মন মহাজ্ঞান অভ্যাস করিলেও যতকাল দেহ থাকে, সে কালের মধ্যে সে কখন না কখন মোহমালিন্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ওহে সভাসদ্‌গণ! এই ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি এখানে আমাকে মুহূর্ত্ত কালের জন্য যাহা প্রদর্শন করিয়াছে, তোমরা সকলে সে আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ কর। আমি এই ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় পড়িয়া অধুনা কিঞ্চিৎ কালের জন্য অনেকবিধ ক্ষণ-বিনাশী কার্য্যক্রম দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, পুরাকালে বলি একদা ইন্দ্রকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া সবলে নিগৃহীত করিবার উপক্রম করিলে ইন্দ্র মায়াবলে সৈন্য সৃষ্টি করিয়া বলিকে মায়াবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। বলি তখন আপন বন্ধন-মোচনের জন্য স্তব করিয়া ব্রহ্মাকে প্রসাদিত করেন। ব্রহ্মা আসিয়া সেই ঐন্দ্রী মায়া চূর্ণ করিতে উদ্যত হইলে, শেষে ইন্দ্রের প্রার্থনায় সে কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, সেই ইন্দ্রসৃষ্ট মায়াকৌতুক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলেন। আমি মনে করি, আমারও বুঝি আজ সেইরূপই দশা ঘটিয়াছিল।

রাজা এই কথা কহিলে, উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী তদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। নরপতি সহাস্যমুখে স্বীয় অনুভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনাবলী বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন,—এই ভূমণ্ডল হ্রদ, নদ, পুর, পর্ব্বত, কুলশৈল ও সাগরাদি বিবিধ পদার্থ-পরম্পরায় পরিপূর্ণ; এখানে একটী বিভবশালী প্রদেশ বিদ্যমান।—

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততম সর্গ।

রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—ঐ মদুক্ত প্রদেশটী যেন এই বসুধামণ্ডলের কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় বিরাজমান। এই সেই প্রদেশ; আমি এ প্রদেশের রাজা। পুরবাসীদিগের মত লইয়া আমি সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি। স্বর্গগত ইন্দ্রের ন্যায় আমি যখন এই সভামধ্যে সমাসীন ছিলাম, তখন রসাতলোত্থিত মায়াবী ময়দানবের ন্যায় এই অজ্ঞাতনামা ঐন্দ্রজালিক নিজেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। অনন্তর এই ব্যক্তি প্রবল বাতাহত ঘনঘটায় ঘূর্ণিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় একটা তেজোময়ী ময়ূরপিচ্ছিকা ঘুরাইতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে ভ্রান্তচিত্তে কোন একটা অশ্বের সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং পরে নিজেই সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। সেই অশ্বটী বড়ই সুন্দর; আমি তদুপরি আরোহণ করিয়া যখন চলিতে লাগিলাম, তখন যেন মনে হইল প্রলয়ক্ষুব্ধ গিরিশিখরে সমুদিত পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের সমুদায় শোভা ধারণ করিলাম। যেমন প্রলয়কালে পয়োধির তরঙ্গমালা প্রবল স্রোতে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিয়া যায়, তেমনি আমিও তখন অতি দ্রুতবেগে একাকী মৃগয়া করিতে চলিলাম। বিষয়-ভোগের একান্ত অভ্যাসবশে যাহার চিত্ত জড়তায় পরিপূর্ণ, তথাবিধ মূঢ় জন যেমন পরমপদ হইতে অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, আমিও তেমনি সেই বায়ু-বেগগামী অশ্ব কর্ত্তৃক বহুদূরে নীত হইলাম।

অনন্তর আমাকে লইয়া বেগে চলিতে চলিতে সেই অশ্ব যেইমাত্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, আমিও অমনি এক ঘনঘোর মহারণ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেখানে তরু নাই, জল নাই, পক্ষী নাই বা দুঃসহ শীতের প্রকোপ নাই। সে অরণ্য দরিদ্রের চিত্তের ন্যায় শূন্য, রমণীর হৃদয়ের ন্যায় বিষম, এবং প্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যায় অতি ভীষণ। সেই জন-প্রাণিহীন শুষ্ক অরণ্যভূমি দেখিয়া মনে হইল, উহা যেন অন্য একটা আকাশ কিম্বা অষ্টম বা পঞ্চম মহাসাগর। বুদ্ধিমানের চিত্তের ন্যায় উহার বিস্তৃতি এবং মূর্খজনের ক্রোধের ন্যায় উহার বিষম গতি। সেখানে তৃণপল্লবের লেশমাত্র নাই। জনমানবের সঙ্গ তথায় একেবারেই দুর্লভ। আমি সেই ভীষণ অরণ্যে উপস্থিত হইলে আমার চিত্ত একান্ত বিষাদমগ্ন হইল। অন্ন-বস্ত্রহীন দরিদ্র পতির হস্তে পড়িয়া রমণীর যেমন দুঃখ-কষ্টের অবধি থাকে না, সেই অরণ্যে গিয়া আমারও তেমনি দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। সে ত অরণ্যভূমি নয়, সে যেন এক ভীষণ মরুভূমি। সেখানে পানীয় জল একেবারেই মিলে না। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ডতাপে মরীচিকাই কেবল জলভ্রান্তি জন্মাইয়া দিঙ্মণ্ডল আপ্লুত করিতেছে। সেই অরণ্যে আমি একান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সেখানে আমায় অতিকষ্টে কাটাইতে হইল। মোহপাশ কাটিয়া গেলে বিবেকশালী পুরুষের পক্ষে এই অন্তঃসারহীন সংসার যেমন অতীব কষ্টের হইয়া উঠে, দিনমণির অস্তকাল যাবৎ সেই স্থান আমার নিকট তেমনি কষ্টকর হইয়াছিল। দিবাকর যেমন সমস্ত দিন শূন্যপথে ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত অশ্বগণ সহ অস্তাচলে উপনীত হইয়া থাকেন, আমিও তেমনি আমার সেই শ্রান্ত অশ্বে আরোহণ করিয়াই সে ভীষণ মরুস্থলী পার হইলাম এবং ক্রমে এক জঙ্গলে গিয়া উপনীত হইলাম। দেখিলাম, সেই জঙ্গলে পান্থদিগের বন্ধুজনের ন্যায় নানাজাতীয় বিহঙ্গমেরা কদম্ব ও জম্বু প্রভৃতি বৃক্ষে বসিয়া কলস্বরে কূজন করিতেছে। কুটিলপ্রকৃতি লোক অবৈধভাবে অর্থোপার্জ্জন করে, কিন্তু অন্তরে সদাই শঙ্কা থাকে বলিয়া তাহার হৃদয়ে যেমন আনন্দের ভাগ একান্তই বিরল, দেখিলাম—সে অঞ্চলে শষ্পশ্রেণীর তেমনি অভাব বিদ্যমান। ভীষণতা সে জঙ্গলেও কম নয় বটে; কিন্তু প্রথমে যে সেই এক নীরস কর্কশ অরণ্যে

গিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা সে জঙ্গল কিঞ্চিৎ সুখাবহ বলিয়া বোধ হইল। যেমন মরণ অপেক্ষা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকাও ভাল, ঐ জঙ্গল আমার পক্ষে সেইরূপই সুখাবহ হইল। প্রলয়ে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে মার্কণ্ডেয় মুনি ভাসিয়া ভাসিয়া যেমন এক বটবৃক্ষ পাইয়াছিলেন, আমিও তথায় তেমনি এক জম্বীরতরুর তলদেশ প্রাপ্ত হইলাম। এতকাল আমি অশ্বপৃষ্ঠেই ছিলাম, কিন্তু এখন অশ্ব ছাড়িয়া সেই বৃক্ষের একটা স্কন্ধলগ্ন লতা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম। তখন নিদাঘতপ্ত পর্ব্বতের পার্শ্বে লম্বমান মেঘের ন্যায় আমার শোভা হইল। যেমন পতিতপাবনী জাহ্নবীর শরণাপন্ন জনের দুষ্কৃতিরাশি বিনাশ পাইয়া যায়, তেমনি সেই অশ্বটী তখন কোথায় যেন চলিয়া গেল। আমি তখন সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিয়া সাতিশয় খিন্ন হইয়াছিলাম; সুতরাং অস্তাচলের ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রান্ত বিভাকরের ন্যায় আমিও সেই কল্পতরুপ্রতিম লতালম্বিত বৃক্ষের তলে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

তৎকালে দিবাকর যেন সংসারস্থ লোকদিগের দৈনিক কৃত্যসকল সঙ্গে লইয়াই বিশ্রাম-বাসনায় অস্তাচলপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। সর্ব্ববিশ্ব শ্যামল হইয়া উঠিল। সেই জঙ্গলে যে কিছু প্রাণী ছিল, তাহারা স্ব স্ব নৈশ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল। রাত্রিকালে কুলায়বিলীন বিহঙ্গের ন্যায় আমি তখন সেই জম্বীরকুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিলাম। সেই রজনী আমার নিকট কল্পের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। আমি সর্প-দষ্টের ন্যায়, মুমূর্ষুর ন্যায়, বিক্রীত দীন ব্যক্তির ন্যায় ও অন্ধকূপপতিত নিরুপায় লোকের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া অতি দুঃখে সেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিলাম। আমার তখন একার্ণবে ভাসমান মার্কণ্ডেয় মুনির অবস্থা মনে পড়িতে লাগিল। সে রাত্রিতে স্নান, সন্ধ্যোপাসনা ও ভোজনাদি কিছুই আমার হইল না। সর্ব্ববিধ বিপদের মধ্য দিয়াই সে রাত্রি আমার কাটিয়া গেল। নিদ্রা হইল না, ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না; তরুপল্লবের ন্যায় কলেবর আমার কাঁপিতে লাগিল। এই ভাবেই সে রাত্রি আমি কাটাইলাম। আমার তখন দুঃখের সময়; সুতরাং সে দুঃখের রাত্রি অতি দীর্ঘ বলিয়াই বোধ হইল।

অনন্তর ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। তারকাস্তবকের সঙ্গে সঙ্গে তিমিরপুঞ্জ আমারই ন্যায় পরিম্লান হইল। জঙ্গল মধ্যে বেতালদলের বিকট চীৎকার আর শ্রুত হইল না। রাত্রিশেষে শীতার্ত্ত প্রাণীদিগের দংষ্ট্রাধ্বনি ও সীৎকার-রব কমিয়া গেল। দেখিলাম, পূর্ব্বদিক্ যেন মধুপান করিয়াই অরুণিত হইয়া উঠিল; ভাবিলাম, আমাকে বিপন্ন দেখিয়া সে যেন উপহাস করিতে লাগিল। অজ্ঞ জন জ্ঞানলাভে যেমন উৎফুল্ল হয়, দরিদ্র যেমন আশা-পূর্ণমনে স্বর্ণ দেখিয়া হৃষ্ট হয়, পূর্ব্বদিকের গগনগাত্রে দিবাকরকে উদয়োন্মুখ দেখিয়া আমিও তেমনি আনন্দিত হইলাম। হর যেমন সন্ধ্যা-কালীন নৃত্য করিতে সমুৎসুক হইয়া আপনার পরিধান হস্তিচর্ম্ম সম্মার্জ্জিত করিয়া লয়েন, আমিও তেমনি গাত্রোত্থান করিয়া মদীয় আস্তরণ বস্ত্র ঝাড়িয়া লইলাম। প্রলয়ে সকল জীব দগ্ধ হইয়া গেলে, কালরুদ্র যেমন শূন্য জগতে বিচরণ করেন, আমিও তেমনি সেই বিশাল বিস্তৃত জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু যেমন মূর্খদেহে কোনই একটা কমনীয় গুণ দেখা যায় না, তেমনি সেই জীর্ণ জঙ্গলের কোথাও একটী জীবজন্তু দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, সেই বনভূমির স্থানে স্থানে কতকগুলি বিহঙ্গম চীচীকুচী রব তুলিয়া নিঃশঙ্কমনে বিচরণ করিতেছে।

অনন্তর দিনমণি আকাশের অষ্টমভাগে উপনীত হইলে নীহারসিক্ত লতারাজির জলবিন্দুসকল শুষ্ক হইয়া গেল। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম,—একটী কন্যা অন্ন লইয়া আমার সম্মুখে আসিতে লাগিল। মনে হইল, মোহিনীবেশধর হরি যেন দানবদলের সমীপে সুধাকুম্ভ লইয়া আসিতে লাগিলেন। সেই কন্যার মলিন অম্বর পরিধান, বর্ণ শ্যামাভ, এবং নয়ন দুইটীর তারকা সদা চঞ্চল। নক্ষত্রনয়না নীলাম্বরা শ্যামা বিভা-বরীর সম্মুখে সুধাকরের ন্যায় আমি তাহার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম; বলিলাম—অয়ি বালিকে! আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। তুমি আমাকে সত্বর এই অন্ন দান কর। দেখ, দীন জনের দুঃখ দূর করিলে সর্ব্বসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অয়ি বালিকে! আমার ক্ষুধা এত অধিক হইয়াছে যে, জীর্ণতরুর কোটরগত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় এই বিষম ক্ষুধাতেই আমাকে যমরাজের অতিথি হইতে হইবে। এই

বলিয়া আমি সেই কন্যার নিকট অন্ন চাহিলাম ; কিন্তু এত করিয়া অতি-দীনতার সহিত প্রার্থনা করিলেও সেই বালিকা আমায় কিছুই প্রদান করিল না। তখন মনে হইল, লক্ষ্মী যেন দুষ্কৃতকারীকে ধনদানে বিমুখ হইলেন। বালিকা সে বন হইতে বনান্তরের দিকে প্রস্থান করিল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। যখন দ্রুতগমনে ছায়ার ন্যায় সেই বালিকার অগ্রে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বালিকা বলিল,—হে হারকেয়ূরধারী পুরুষ-বর! আপনি আমার পরিচয় লউন ; আমি এক চণ্ডালী। রাক্ষসীর ন্যায় গজাশ্বাদি আমার ভক্ষ্য। আমি অতি ক্রূরপ্রকৃতি। হে রাজন্! যেমন কোন ইষ্টসিদ্ধি না করিয়া দিলে গ্রাম্য জনের নিকট হইতে কোন সৌজন্য পাওয়া যায় না, তেমনি মাদৃশ ব্যক্তির নিকট হইতেও কোন একটা উপকার ব্যতীত কেবল প্রার্থনায় আহার মিলিবে না। বালিকা এইরূপ বলিয়া লীলাক্রমে মন্দগমনে কিয়দ্দূর গমন করিয়া কুঞ্জমধ্যে লুকাইল এবং সেইখান হইতেই লীলাবনতভাবে আবার বলিতে লাগিল,—রাজন্! সামান্য লোকে কোনরূপ ভালবাসা ব্যতীত বিশেষ উপকার করে না ; অতএব আপনি যদি আমার ভর্ত্তা হইতে পারেন, আমি আপনাকে আহার প্রদান করিতে পারি। মদীয় পুকসজাতীয় পিতা ঐ অদূরবর্ত্তী ক্ষেত্রমধ্যে হল দ্বারা কর্ষণ করিতেছেন। তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া শ্মশানবাসী বেতালবৎ রূক্ষ ও ধূলিধূসরাকারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারই জন্য আমি এই অন্ন লইয়া যাইতেছি। আপনি যদি আমার ভর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে অগত্যা আপনাকেই ইহা দিতে হয় ; কেন না প্রাণ দিয়াও প্রিয়জনকে পূজা করিতে হয়।

সেই চণ্ডালকন্যা এই কথা কহিলে, আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—হে সুব্রতে! আমি তোমার ভর্ত্তা হইব। বস্তুতঃ বিপদে পড়িয়া কেই বা নিজের বর্ণ, ধর্ম্ম ও কুলমর্য্যাদা বিচার করিতে পারে ?

অনন্তর আমার এই অঙ্গীকার-বাক্যের পর সেই রমণী তাহার হস্তস্থ অন্নের অর্দ্ধভাগ আমায় প্রদান করিল। পুরাকালে মোহিনীবেশে হরি যেমন ইন্দ্রকে অমৃতার্দ্ধ অর্পণ করিয়াছিলেন, এই অন্নদানব্যাপারে তাহাই আমার মনে পড়িল। আমি ক্ষুধায় অতি কাতর হইয়াছিলাম ; সুতরাং

সেই অর্দ্ধপরিমিত অন্নই আমার নিকট যথেষ্ট বলিয়া মনে হইল। তখন চণ্ডালান্ন ভোজন ও জম্বুফলরস পান করিয়া আমি মোহমগ্ন-মনে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। মেঘমলিনা বর্ষা যেমন দিবাকরমণ্ডল নিরাবরণ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ সেই শ্যামলাঙ্গী রমণী যেন মদীয় বহিশ্চর প্রাণ লইয়া প্রয়াণ করিল। ঐ রমণীর পিতা অতি কদাকার; সর্ব্বদা দুরাচারে নিরত, তাহার স্থূলাকার দেহ দেখিলেই ভীত হইতে হয়। রমণী অন্ন লইয়া তাহার সেই পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তখন মনে করিলাম, যাতনা যেন অবীচি-নরকে গমন করিল।

অনন্তর সেই চণ্ডালকন্যা তদীয় পিতার নিকট লজ্জিতভাবে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিল,—পিতঃ! এই পুরুষ আমার স্বামী হইবেন। আপনি ইহা অনুমোদন করুন। সেই কামিনী যখন এই কথা কহিল, তখন আমার মনে হইল, যেন ভ্রমরসঙ্গিনী ভ্রমরী গুন্ গুন্ রবে মাতঙ্গের কর্ণকুহরে কি যেন কি এক অস্ফুট বিষয় বলিল। যাহা হউক, সেই কন্যার পিতা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। কৃতান্ত কর্ত্তৃক কিঙ্করদ্বয়ের মুক্তির ন্যায় সেই চণ্ডাল কর্ত্তৃক হলবাহী বলদ দুইটী বন্ধনমুক্ত হইল। ক্রমে দিঙ্মণ্ডল নীহারময় নীরদবৎ ধূসরিত হইয়া যেন ধূলিময় হইয়া উঠিল। আমরা সন্ধ্যা সময়ে সেই পিশাচ-নিবাস অরণ্যানী হইতে প্রস্থান করিলাম। কিঞ্চিৎ পরেই সেই বিশাল জঙ্গল পার হইয়া চণ্ডালগৃহে আসিয়া উপনীত হইলাম। মনে হইল, বেতালদল যেন এক শ্মশান হইতে শ্মশানান্তরে আসিল। তখন্ সেই চণ্ডালগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—বানর, কুক্কুট ও বায়স প্রভৃতির কর্ত্তিত খণ্ড খণ্ড মাংসরাশি গৃহমধ্যে রহিয়াছে। রক্তাক্ত মৃত্তিকার উপর মক্ষিকাদল ঘুরিতেছে। মৃত জন্তুগণের রাশি রাশি আর্দ্র অন্ত্রতন্ত্রী শুকাইবার জন্য বাহিরে প্রসারিত আছে। পক্ষিকুল আসিয়া তদুপরি উপবেশন করিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ উদ্যানমধ্যে কতকগুলি জম্বীরকুঞ্জ আছে। তন্মধ্যে বিহঙ্গ সকল কূজন করিতেছে। বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠে প্রচুর পরিমাণ বসা আতপ-তাপে শুকাইতেছে। তাহারও উপর অনেক পক্ষী আসিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে। নানাস্থানে

মৃত পশুগুলির রক্তাক্ত আর্দ্র চর্ম্ম হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিত ক্ষরিত হইতেছে। চণ্ডাল-বালকদিগের হস্তস্থিত মাংসখণ্ডগুলির উপরিভাগেও মক্ষিকাদল ভন্ ভন্ করিতেছে। কতকগুলি উদ্ধত চণ্ডাল-বালক চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে তত্রত্য বৃদ্ধ চণ্ডালেরা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে এবং চারিদিকে শিরা ও অস্ত্র সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমরা সেই অগণিত মৃত জন্তু-পরিপূর্ণ ভীষণ চণ্ডালভবনে প্রবিষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, আমরা যেন প্রলয়কালীন কৃতান্তানুচর, সর্ব্ব-জীবের শবদেহসঙ্কুল জগদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আমার বসিবার আসনের জন্য সসম্ভ্রমে একটা বৃহৎ কদলীপত্র আনীত হইল। আমি সেই নূতন শ্বশুরালয়ে সেই আসনে বসিলাম। আমার শাশুড়ীর নয়নদ্বয় স্বভাবতই আরক্ত ও কুটিল। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, ইনি আমার জামাতা। তৎপরে 'উত্তম হইয়াছে' বলিয়া তিনি আমায় অভিনন্দনও করিলেন।

অনন্তর আমি অজিনাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে স্বসঞ্চিত দুষ্কৃতরাশির ন্যায় সেই চণ্ডালভোজ্য কদর্য্য খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করিলাম। তারপর উহাদের কত শত প্রণয়বাক্য শ্রুতিগোচর হইল। ঐ বাক্যগুলি অনন্ত দুঃখের আকর, অপ্রীতিকর ও অশ্লীল।

একদা অম্বরে মেঘাড়ম্বর নাই, সমুজ্জ্বল নক্ষত্রমালা সমুদিত রহিয়াছে। এমন একটী দিন দেখিয়া সেই কৃষ্ণকলেবর চণ্ডাল বসন ভূষণ প্রদান করিয়া মহাসমারোহ সহকারে দুষ্কৃতের যাতনা-দানের ন্যায় আমাকে সেই অতি ভীষণা অতি মলিনা স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিল। আমার যে দিন বিবাহ হইল, সেই দিনকার মহোৎসবে চণ্ডালসকল অপরিমিত মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঢক্কা সকল বাদিত হইতে লাগিল। সেই চণ্ডালদলকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ মহাপাতকরাশি একত্র সম্মিলিত হইয়াছে।

ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

রাজা বলিতে লাগিলেন,—এ সম্বন্ধে আর অধিক কহিব কি, সেই বিবাহোৎসবের সময় হইতে চিত্ত আমার চণ্ডালীপ্রেমে বশীভূত হইল। সেই দিন হইতেই চণ্ডালগণের মধ্যে আমি একজন পুষ্ট পুক্কস বা অবিকল চণ্ডাল হইয়া গেলাম। বিবাহ হইবার পর সপ্তরাত্রি আমোদ উৎসবে কাটিয়া গেল। অনন্তর অষ্ট মাস অতীত হইল। তখন আমার সেই চণ্ডালী ভার্য্যা ঋতুমতী ও ক্রমে গর্ভবতী হইল। বিপদ যেমন দুঃখদায়িনী ক্রিয়ার জননী হয়, তেমনি সেই ভার্য্যা আমার যথাকালে এক কন্যা প্রসব করিল। মূর্খ জনের চিন্তার ন্যায় সেই কন্যা অল্পদিন মধ্যেই হৃষ্টপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনটী বর্ষ অতীত হইল। আবার আমার ভার্য্যা এক কদাকার পুত্র প্রসব করিল। তাহা দেখিয়া মনে হইল, কুবুদ্ধি যেন আশাপাশের হেতুভূত অনর্থ উৎপাদন করিল। কিয়দ্দিন পরে আবার আমার এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মিল। ক্রমে আমি একজন পাকা চণ্ডাল-গৃহস্থ হইয়া পড়িলাম। ব্রহ্মহত্যাকারী পাপী যেমন নরকে গিয়া চিন্তা সহকারে অশেষ যাতনা ভোগ করে, আমিও তেমনি সেই চণ্ডালীর সহিত বহুবর্ষ যাপন করিলাম। সেই অবস্থায় আমার এমন অনেক সময় গিয়াছে, যাহাতে বহুদিন ধরিয়া আমি বর্ষীয়ান্ কচ্ছপের ন্যায় শীত, বাত ও আতপ-ক্লেশে ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে বা পল্বলমধ্যে মগ্ন রহিয়াছি। সময় সময় কলত্র-ভরণ-চিন্তায় বুদ্ধি আমার বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্তর দগ্ধ হইয়াছে, সমস্ত কার্য্যই দুঃখময় বলিয়া মনে হইয়াছে। ভাবিতাম, সর্ব্বত্রই যেন দিগ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। মস্তকে আমার বহুদিনের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের এক শিরস্ত্রাণ ছিল। আমি তদুপরি মূর্ত্তিমান্ পাপরাশির ন্যায় কাষ্ঠরাশি বসাইয়া বনমধ্য হইতে আনয়ন করিতাম। কতদিন কত যূকাকীর্ণ জীর্ণশীর্ণ ক্লেদ-দুর্গন্ধময় কৌপীন পরিয়া চণ্ডালপল্লীর মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। দুর্ব্বহ ভার-বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া অনেক সময় ধবলিক বৃক্ষের মূলদেশে বিশ্রাম করিয়াছি।

পরিবার-বর্গের উদর-পূরণের চিন্তায় সদাই আমাকে উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইয়াছে। আমি হেমন্ত কালের অতি কঠোর শীত সমীরণে জর-জর হইয়া মণ্ডূকবৎ বনমধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছি। কত সময়ে সংসারের দারুণ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া চণ্ডালীর সহিত কলহ করিয়াছি। অনেক সময় অশ্রুপাতচ্ছলে নয়নযুগল দিয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়াছি। বর্ষাকালে জল-ক্লিন্ন হইয়া অরণ্যমধ্যে বরাহমাংস ভক্ষণ করিয়াছি। কতদিন শিলা-তলে উপবেশন করিয়া ঘন-ঘটাচ্ছন্ন গাঢ় তিমিরাবৃত রজনী যাপন করিয়াছি। এমন অনেক সময় গিয়াছে, যখন বর্ষাঋতুর অবসান হইয়াছে; সুনীল নীরদ-মালার নিবিড়তা অপগত হয় নাই। বীজবপনের যোগ্য কাল উপস্থিত হই-য়াছে। ঐ সময় কোন না কোন কারণে বন্ধুগণের সৌহার্দ্দ-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। দারুণ কলহে সর্ব্বদা শঙ্কিত রহিয়াছি। কলহের পরিণাম এমন ঘটিয়াছে যে, কখন কখন অতি দীনভাবে মদীয় মুখর দুর্দ্দান্ত সন্তানগুলি লইয়া আমি পরগৃহে গিয়া বহুকাল বাস করিয়াছি। আমার ভার্য্যা সেই চণ্ডালী সর্ব্বদা কলহে কলহে প্রতিবেশি-মণ্ডলীকে এতই উত্যক্ত ও বিরক্ত করিয়া তুলিত যে, প্রায় সকল সময়েই প্রতিবেশী চণ্ডালগণের তর্জ্জন গর্জ্জন আমাকে শুনিতে হইত। তাহাতে আমার মুখমণ্ডল রাহুদর্শনে চন্দ্রবৎ সততই পরিম্লান থাকিত। কোন কোন নরকবাসী পাপী, কোন কোন নরকবাসী মৃত জীবকে অন্যান্য নরকবাসীর নিকট বিক্রয় করিলে তাহারা যেমন তাহাদের নাড়ীভুঁড়ী ছিঁড়িয়া ভোজন করে, আমাকেও তেমনি অনেক দিন খর্ব্বিত ওষ্ঠ দ্বারা মৃত শার্দ্দূলের মাংসপেশী চর্ব্বণ করিতে হইয়াছে। দুরন্ত শিশির কালে প্রায়ই আমি অনাবৃত গাত্রে মৃত্যু-নিক্ষিপ্ত শরধারার ন্যায় হিমালয় কন্দরোদ্গীর্ণ তুষার-কণবর্ষী কঠোর শীত সহ্য করিয়াছি। ক্রমে বয়স হইতে লাগিল। আমি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। সঞ্চিত সুকৃতের মূলোৎপাটনের ন্যায় একাকী আমি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কত জীর্ণ তরুর মূলোৎপাটন করিয়াছি। দুঃশীল পরিবারবর্গ লইয়া অটবী মধ্যে কতকাল শরাবে করিয়া কত তৃণপল সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি। আমি চণ্ডাল, তাই কোন উচ্চবর্ণ আমায় স্পর্শ করিত না। যাহাতে সত্বর আমার বলক্ষয় হয়—মরিয়া আমি এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই, এই ভাবিয়া সেই অরুচিকর সিদ্ধ পলাদি আমি মুখবিকৃতি

করিয়া ভক্ষণ করিতাম। কখন আমি অপরের নিকট হইতে মেষ ও মৃগ-মাংস ক্রয় করিয়া নিজের দেহমাংসের ন্যায় সে সকল বিক্রয় করিয়াছি। কখন বা নিজেই প্রাণিবধ করিয়া লৌহপাত্রে রাশি রাশি মাংস ভর্জ্জন করত বিন্ধ্যাচলস্থ চণ্ডালপল্লীতে গিয়া বিক্রয় করিয়াছি। বিক্রয়াবশিষ্ট মাংসরাশি সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপরাশির ন্যায় শুষ্ক করিয়া রাখিবার জন্য উদ্যানগত পরিষ্কৃত ভূমিতে ছড়াইয়া দিয়াছি। সেই মাংসরাশি কত অপবিত্র মলমূত্রাদিতে জড়িত থাকিত। আমি এত দুর্দ্দশায় ছিলাম, এখন আমার বোধ হয়, আমি যেন রৌরব নরকে পতিত হইয়াছিলাম।

তৎকালে বিন্ধ্যাচলের তৃণ-গুল্মাদিই আমার একমাত্র জীবিকা উপায়ের আশ্রয় ছিল। একখানি কুদ্দাল আমার বন্ধুর ন্যায় সহায় ছিল। সন্ধ্যাকাল আমার বড়ই অনাদরের হইত; কেন না, যে বনজাত তৃণগুল্মাদি তুলিয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, সে কার্য্য আমার সন্ধ্যাকাল মধ্যে সমাধা হইত না। কাজেই সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, মনে বড় কষ্ট হইত; কেন সন্ধ্যা আসিল, ভাবিয়া তাহার উপর বিরক্ত হইতাম। ঈদৃশ দুর্দ্দশায় থাকিলেও বিধি-বিড়ম্বনায় কতকগুলি কুপোষ্য-পালনের ভার আমার উপর অর্পিত ছিল। অন্য উপায় ছিল না। অতি জঘন্য কদন্ন দ্বারা আমাকে পুত্র-পরিবারদিগের তৃপ্তি জন্মাইতে হইত। সেই অতি কষ্টে সংগৃহীত অন্ন আনিয়াও আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না; কেন না, তাহা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা আমাকে যষ্টি লইয়া কুক্কুরাদির উপদ্রব নিবারণ করিতে হইত। এমন সময় গিয়াছে, যখন শুষ্ক তালপত্রে পতিত বর্ষার প্রবল বারিধারায় চটাপট্ শব্দ হইতেছে; আমি সেই তালতরুর তলে দাঁড়াইয়া শীতে দন্ত-কটকট ধ্বনি করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-কায়ে বন-বানরের সহিত একত্রে বাস করিয়াছি। আমি তখন মাংসখণ্ড লাভ-লালসায় মস্তকে করিয়া অবিরাম মুক্তাফলনিভ বারিধারা সহিয়াছি। শিশিরকালে শীতের প্রকোপে চক্ষু আমার কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে; কম্প-জনিত ঘর্ষণে দন্ত শব্দিত হইয়াছে, এহেন অবস্থাতেও বনমধ্যে থাকিয়া পরি-বারের সহিত তুমুল কলহ করিয়াছি। আমার গাত্র মসীর ন্যায় মলিন ছিল; তাহাতে আমি বেতালবর্গের আত্মীয় স্বজনের ন্যায় প্রতীত হইতাম।

অনেক সময় মৎস্য ধরিবার জন্য নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম। আমার তখনকার অবস্থা ভাবিয়া মনে হয়, বুঝি বিশ্ব-বিধ্বংসে কৃতান্ত পাশাস্ত্র লইয়া এইরূপই বিচরণ করেন। সময় সময় বহু উপবাসের পর জননীর স্তন্য দুগ্ধের ন্যায় সদ্যঃকৃত্ত হরিণের বক্ষঃস্থল হইতে ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করিতাম। আমি অমেধ্য মাংস আহার করিয়া রক্তাক্ত দেহে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়াছি। আমাকে দেখিয়া শ্মশানস্থ বেতালদল যেন চণ্ডিকা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াই ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। অনেক সময় পুত্র-কলত্রাদি-জনিত সুপ্রসর আশার ন্যায় মৃগপক্ষীদিগের বন্ধনার্থ বাগুরা বিস্তারিত করিয়া রাখিতাম। যেমন জীবগণ মায়াজালে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে, আমিও তেমনি চারিদিকে জাল পাতিয়া বিহগদিগকে জর্জ্জরিত ও মৃতপ্রায় করিতাম। মন আমার কেবলই পাপকর্ম্মের দিকে ধাবিত হইত। বর্ষাকালের তরঙ্গিণীর ন্যায় মদীয় আশালতা দূরপ্রসর্পিণী ছিল। ভুজঙ্গ যেমন ভল্লূকীর অতিদূরে বাস করে, আমিও তেমনি ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতাম। পুণ্য কর্ম্মে কদাচ আমার মতি হইত না। ভুজঙ্গের নির্ম্মোক-পরিত্যাগের ন্যায় দয়াধর্ম্ম একেবারেই আমি বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। নিদাঘকালের অপগমে গগন যেমন জলবর্ষণশীল মেঘমালা ধারণ করে, আমিও তেমনি বাণবর্ষণ, নিষ্ঠুরভাষণ ও তর্জ্জন-গর্জ্জনের হেতুভূত একমাত্র ক্রূরতাকেই সহজে অবলম্বন করিয়াছিলাম। গভীর বনের গর্ত্তদেশ যেমন জনগণের দূর-পরিহৃত তীব্রগন্ধময় কুৎসিত পুষ্পমঞ্জরী ধারণ করে, আমিও তেমনি জনসমাজের পরিত্যক্ত দুঃসহ আপদ বহুদিন ধরিয়া বহন করিয়াছি। আমি, মোহরূপ বৃষ্টিযোগে 'এত কাল ইহা ভোগ করিতে হইবে' ঈদৃশ বিভাগযুত মহানরক-ভূমিতে বহুদিন পর্য্যন্ত পাপরূপ বীজমুষ্টি বপন করিয়াছি। জীবগণের প্রতি কৃতান্ত-কৃত নির্দ্দয় ব্যবহারের ন্যায় আমি আমার বিস্তৃত জাল-পতিত মৃগগণের উপর অশেষ প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছি। বিবেকহীন আমি অনেক সময় পরিশ্রান্ত হইয়া শেষনাগের শরীরশায়ী হরির ন্যায় আমার সেই পামরী ভার্য্যার কণ্ঠদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াছি। আমি যখন চলিতাম, তখন আমার মলিন বসনের ছিন্নাংশ সকল পদপ্রান্তে বিলোলিত হইত। আকৃতি আমার একান্তই মলিন ছিল।

আমার সেই আকৃতি নীহার-বল্লিত শষ্পময় বিন্ধ্যাচলের জলপ্রায় দেশস্থ গুহার সহিত উপমিত হইত। পুরাকালে মহাবরাহ যেমন স্পন্দনশীল জীবগণ সহ ভূভাগ বহন করিয়াছিলেন, আমি তেমনি নিদাঘদিনেও মলিন কায়ে যূকাকীর্ণ কন্থাভার বহন করিয়াছি। প্রলয়ের কালানলে জগদ্দহনোদ্যত কালরুদ্রের ন্যায় আমি অনেক সময়ে দাবানলে বহু প্রাণীকে দগ্ধ করিয়াছি। অতি বড় ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি যেমন আপন দেহে বহুরোগ সৃষ্টি করিয়া লয় এবং দুস্ট গ্রহ যেমন অনর্থ উৎপাদন করে, তেমনি সুখের জন্যই হউক আর দুঃখের জন্যই হউক, মদীয় পত্নী ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি সন্তান-সন্ততি প্রসব করিল। ছিলাম বটে আমি একমাত্র রাজপুত্র; কিন্তু হায়, তখন আমাকে নিরবচ্ছিন্ন পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াই ষষ্টি বর্ষণ যাপন করিতে হইল। সেই ষষ্টি বর্ষই আমার নিকট একটী কল্পকালের ন্যায় প্রতীত।

হে সভ্যবৃন্দ! আমি তখন ক্রোধবশে কখন আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছি, কখন বিপদে পড়িয়া নিরন্তর ক্রন্দন করিয়াছি, কখন কদন্ন আহার করিয়াছি, এবং নিন্দিত চণ্ডালগৃহে আমাকে বাস করিতে হইয়াছে। এইরূপে দুর্ব্বাসনারূপ নিগড় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া এবং মোহবশে জ্ঞান হারাইয়া তখন বহুকাল আমাকে অতিবাহিত করিতে হইল।

সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রাজা কহিলেন,—এইভাবে কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল। মদীয় জীবন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িল। আমার শ্মশ্রুরাজি তুষারময় শষ্পশ্রেণীর অনুরূপ শোভা ধারণ করিল। সুখ-দুঃখময় দিনগুলি কর্ম্মরূপ বাতবেগে বিচালিত হইয়া জীর্ণপর্ণবৎ গলিয়া যাইতে লাগিল। রণস্থল-পতিত শরধারার ন্যায় নিরন্তর সুখ, দুঃখ, কলহ, অশান্তি ও অকার্য্য সকল কত যে উপস্থিত হইতে

লাগিল, তাহার ইয়ত্তা রহিল না। মদীয় জড় চিত্ত নিরাশ্রয়ভাবে ভ্রমণশীল হইয়া জলধি-কল্লোলের ন্যায় এই প্রকার বহুতর কল্পনাবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। আমার ভ্রান্ত আত্মা চিন্তাচক্রে আরোহণ করিয়া কালসাগরের আবর্ত্তে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। বিন্ধ্যবন-ভূমির ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় আমি একমাত্র উদরপূর্ত্তির নিমিত্তই ব্যস্ত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলাম। বলিব কি, আমার মনে হয় আমি যেন এক দ্বিবাহু-বিশিষ্ট গর্দ্দভ হইয়াই এইভাবে বহুবৎসর অতিপাতিত করিলাম। শবদেহের বেগ-বিস্মৃতির ন্যায় আমি আমার ভূপত্ব একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। আমি যে রাজা, এ স্মৃতি আমার সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হইল। ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের অচলতার ন্যায় আমার চণ্ডালত্বই স্থির হইয়া গেল।

একদা ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বিন্ধ্যাচলের কচ্ছদেশে অন্ন, জল, তৃণ, পর্ণ, কিছুই রহিল না। দুর্ভিক্ষের দারুণ প্রকোপে কত লোক মরিয়া গেল। প্রচণ্ড চণ্ডালগণের আবাসভূমি এই দুর্ভিক্ষ-দিনে অতি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল। তখন মনে হইল, বুঝি বা প্রলয়কাল উপস্থিত হইল, কিম্বা কাননে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, অথবা সাগরতরঙ্গ তটভূমি আক্রমণ করিল, কিম্বা শুষ্ক পাদপে বজ্রপাত হইল! সে কাল ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণভাব ধারণ করিল। মেঘে বর্ষণ নাই, ভূতলে জল নাই, ক্ষেত্রে শস্য নাই, বায়ুর সে ধীর গতি নাই। যদি কচিৎ কোথাও একটু মেঘ দেখা গেল, ক্ষণমধ্যেই তাহার বিলয় ঘটিতে লাগিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গারকণা-মিশ্রিত তপ্ত মারুত বহিতে লাগিল। বনপ্রদেশে শীর্ণ পর্ণরাশির মর্ম্মরধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। বনস্থলী দাবানলে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র শূন্যাকারে পরিণত হইল। দাবদগ্ধ বনভূমি পিঙ্গল জটাধারিণী পরিব্রাজিকার ন্যায় প্রতিভাত হইল। সহসা সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া চণ্ডালপল্লী গ্রাস করিল। প্রবল দাবদহনে সমগ্র বনভূমি শোষণ করিয়া ফেলিল। তৃণ-ঘাসাদি সমস্তই ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। অনবরত বায়ু বহিয়া এত ধূলি উত্থিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে সমস্ত লোকের সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত হইয়া গেল। যাবতীয় লোক ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল। দেশে অন্ন, জল, এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সর্ব্বস্থান মহারণ্যে পরিণত হইল। মহিষগণ দলে দলে

জলভ্রমে ভূব্যাপ্ত রবিকর-জালে অবগাহন করিতে লাগিল। বায়ুপ্রবাহে বিন্দুমাত্র বারিও লক্ষিত হইল না। জলের অভাব এত হইয়া পড়িল যে, জনগণের মধ্যে কেহ পানীয়শব্দ উচ্চারণ করিলেও অনেকে ঔৎসুক্যের সহিত সে শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিল। আতপ-তাপ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তাহার তীব্র শোষণে বানরেরা অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্ষুধানল-দগ্ধ জনতার মধ্যে কেহ একটী বৃক্ষপত্র কুড়াইয়া পাইলে সেই পত্রটী কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিবার জন্যও বহুব্যক্তি পরস্পর কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইত। সে কলহের পরিণামে অনেকের জীবনপাতও ঘটিত। খাদ্য বস্তুর অভাবে জনসাধারণ ক্ষুধায় এরূপ হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইল যে, অগত্যা নিজ নিজ গাত্র-মাংস পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিবার অভিপ্রায়ে গাত্রে দশনাঘাত করিতে লাগিল। এমন কি, খদির কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডও ক্ষুধিত জনসম্প্রদায় অনায়াসে মাংস-ভ্রমে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। ভূতলে অনেক অসার পাষাণ-খণ্ড পড়িয়াছিল, ক্ষুধানলের এমনি জ্বালা, মানবেরা পিষ্টকভ্রমে সে সমুদায়েরও এক একটী তুলিয়া গিলিতে লাগিল। অনেক লোক মাতা, পিতা ও পুত্র-পরিজনাদি আত্মীয়বর্গকে ফেলিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে লাগিল। গৃধ্রদল অন্য কোন মাংস না পাইয়া এক একটা উত্তম উত্তম সারিকা ধরিয়া জীবন্ত অবস্থায় গিলিতে লাগিল। তখন বোধ হইল, তাহাদের উদরস্থ হইয়াও সারিকা সকল চীৎকার করিতে লাগিল। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণিগণ পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। এই ভীষণ কাণ্ডে তাহা-দের গাত্ররক্তে ধরাপৃষ্ঠ অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ক্ষুধিত মত্ত মাতঙ্গগণ এক একটা সিংহ ধরিয়া উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। পাছে আপনাদিগকে অন্যে কেহ আসিয়া গ্রাস করে, এই শঙ্কায় সিংহগণ স্ব স্ব গুহাভ্যন্তরেই ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিবার জন্য অনেকে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অঙ্গারময় রূক্ষ বায়ু বহিয়া পাদপদিগকে নিষ্পত্র করিয়া ফেলিল। শোণিত-পিপাসু মার্জ্জারদল শোণিত-ভ্রমে গৈরিকবর্ণ তটভূমি লেহন করিতে লাগিল। বহ্নিজ্বালাময় প্রবল বনবায়ু নানাদিকে আবর্ত্তের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। চারিদিকে পাবকরাশি প্রজ্বলিত হইয়া জঙ্গলদেশ পিঙ্গলাভ করিয়া তুলিল। কুঞ্জমধ্যস্থ বৃহৎকায় সর্পসকল অগ্নি-

সংযোগে দগ্ধ হইতে লাগিল। সেস্থান হইতে সমুত্থিত ধূমপুঞ্জে বনজাত বৃক্ষলতাদি শ্যাম শোভা ধারণ করিল। বায়ু-বিধূত বহ্নিরাশি গগনে উত্থিত হইলে নভোমণ্ডল সান্ধ্যজলদে সমাবৃত বলিয়া বোধ হইল। চারিদিকে দাব-দগ্ধ প্রাণীদিগের বিকট চিৎকারধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। ধূমজাল গগনে প্রসারিত হইলে, দণ্ডশূন্য ছত্রাকারে প্রতীত হইতে লাগিল। লোক সকল স্ব স্ব স্ত্রীপুত্র লইয়া দীনভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সম্মুখে শবদেহ পাইলে ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ অতি ব্যগ্রতার সহিত দন্তে দন্তে তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিতে লাগিল। শবদেহ ছিন্ন করিয়া মাংস ভক্ষণ করিবার সময় অনেকে মাংসের গন্ধে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া নিজ নিজ রক্তাক্ত অঙ্গুলি-দল গ্রাস করিতে লাগিল। অনেকে নীলবর্ণ লতা বা পত্র মনে করিয়া প্রগাঢ় ধূমপুঞ্জ পান করিতে উদ্যত হইল। গগনচারী ভ্রান্ত গৃধ্রগণ বায়ু-বেগ-বাহিত খণ্ড খণ্ড অঙ্গারগুলি আমিষবোধে গিলিতে লাগিল। ক্ষুধাতুর জনগণ পরস্পর কর্ত্তৃক পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে পলাইতে লাগিল। কাহারও কাহারও হৃদয় ও উদর অগ্নিদগ্ধ হইয়া টনৎকার ধ্বনির সহিত বিদীর্ণ হইয়া গেল। বিবরে বায়ু প্রবেশ কালে যেমন এক একটা বিকট রব হয়, ভীষণ দাবাগ্নি হইতে সেইরূপ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অগ্নিদগ্ধ অঙ্গারময় তরুগণ ভীতিগ্রস্ত অজগরসর্পের ফুৎকারে পতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সেই বিন্ধ্যাচলের কচ্ছপ্রদেশ পূর্ব্বে রমণীয় থাকিয়াও সহসা সেই দারুণ দুর্ভিক্ষদাহে বিশোষিত হইয়া দ্বাদশ দিবাকর-দগ্ধ জগতের সহিত উপমিত হইতে লাগিল। তরুনিচয় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলে তাহাদের স্পর্শ মাত্রেই লোক সকল একান্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই প্রদেশ তখন অগ্নি, সূর্য্য ও শনৈশ্চর গ্রহের লীলাভূমিরূপে পরিণত হইল।

অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

রাজা কহিলেন,—তৎকালে তথাবিধ অকাল মহাপ্রলয়ের ন্যায় নিতান্ত সন্তাপপ্রদ দারুণ বিধি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে বহুলোক পুত্র, কলত্র ও আত্মীয় স্বজন সহ দেশান্তরে প্রস্থান করিল। মনে হয়, শরৎকালের পয়োধরনিচয় যেন আকাশ হইতে চলিয়া গেল। কতকগুলি লোক পুত্র-কলত্রাদি স্নিগ্ধ বন্ধুজনকে ক্রোড়ে লইয়া সেইখানেই ছিন্ন তরুর ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া গেল। কেহ কেহ স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল, মনে হয়, শ্যেন পক্ষীরা যেন নীড়-নির্গত অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকদিগকে ভক্ষণ করিল। কেহ কেহ শলভের ন্যায় প্রজ্বলিত অনলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। শৈল-বিচ্যুত শিলাখণ্ড-সমূহের ন্যায় অনেকে গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

তখন আমি দেখিলাম, আমার শ্বশুরাদির চলৎশক্তি নাই, পরিবার আমার অনুগমনে সক্ষম; সুতরাং অগত্যা পরিবারকে লইয়াই সেই কষ্টময় দেশ হইতে নির্গত হইলাম। আমি মরণভয়ে অনল, অনিল, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুগণকে প্রতারিত করিয়া সেখান হইতে সপরিবারে নির্গত হইবার পর কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই দেশের প্রান্ত সীমায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে এক তালতরু ছিল, আমি স্কন্ধ হইতে বিষম অনর্থপরম্পরার ন্যায় আমার সেই শিশু সন্তানগুলিকে সেই তরুতলে নামাইলাম। আমি এতকাল দীর্ঘ দাবানল-তাপে তাপিত হইয়া নিদাঘকালীন জলশূন্য দেশের কমলের ন্যায় বিশুষ্ক ও পরিশ্রান্ত হইয়া ছিলাম, এক্ষণে সেইখানে থাকিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলাম। মনে হয়, তখন যেন রৌরব নরক হইতেই নির্গত হইয়াছিলাম। সেই তালতরুর শীতল ছায়ায় মৎপত্নী চণ্ডালী তাহার শিশুসন্তান দুইটীকে ক্রোড়ে লইয়া বিশ্রাম করত নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমার পূচ্ছক নামক কনিষ্ঠ পুত্রটী আমার বড়ই প্রিয় ছিল। সে আমার সম্মুখে থাকিয়া দীনভাবে সজলনয়নে বলিল, তাত!

আমার ক্ষুধা পাইয়াছে। আমাকে সত্বর রক্ত ও মাংস অর্পণ করুন। আমার সেই শিশুটী ক্রন্দন করিতে করিতে পুনঃপুনঃ আমায় ঐরূপ বলিতে লাগিল এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া তখন মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। আমি বহুবার বলিলাম, পুত্র! মাংস এখানে নাই, তথাপি সেই দুর্ম্মতি বালক 'মাংস দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া তখন অতি দুঃখে বলিলাম, বৎস! তবে আমারই মাংস পাক করিয়া ভক্ষণ কর। সেই অতি ক্ষুধাতুর বালক 'দাও' বলিয়া আমার মাংস ভক্ষণ করিতেও স্বীকার করিল। আমি আমার সেই শিশু পুত্রটীর তাদৃশ কষ্ট দর্শনে স্নেহ ও কারুণ্যে মোহিত, অতি দুঃখে অভিভূত এবং তীব্র বিপত্তি সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া সর্ব্বদুঃখ অপনোদনের জন্য মনে মনে মরণকেই পরম মিত্র বলিয়া নিশ্চয় করিলাম। তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সেখানে চিতা প্রস্তুত করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে চিতা চটপটা শব্দে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমার আরোহণ আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। আমি যেই মাত্র তাহাতে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি, অমনি এই রাজভাব উপগত হইয়া সিংহাসন হইতে সবেগে চলিতে লাগিলাম। অনন্তর তূর্য্যনাদ ও জয়ধ্বনিতে আমি জাগরিত হইলাম। এই শাম্ব-রিক বা ঐন্দ্রজালিক যেরূপে আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছিল, অজ্ঞানতা বশতঃ জীবের ন্যায় আমি এইরূপে শত শত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

তৎকালে মহাতেজা রাজেন্দ্র লবণ এই কথা কহিলে, সেই শাম্ব-রিক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন সভ্যমণ্ডলী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন,—হে দেব! এই যে ব্যক্তি আসিয়াছিল, ইহাকে প্রকৃত শাম্বরিক বলিয়া মনে হয় না; কেন না, ইহার ত ধনাকাঙ্ক্ষা নাই। সুতরাং মনে হয়, 'সংসারস্থিতি এইরূপই' ইহা বুঝাইবার জন্যই কোন দৈবী মায়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ 'মায়াতে মনের বিলাসই সংসার' এই রূপ প্রতীতিই জন্মিল। মন কি? সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন অনন্ত বিষ্ণুর যে মায়াবিলাস, তাহাই মন। সেই যে মন, তাহাই এই জগৎ। সর্ব্ব-

শক্তিশালী বিধাতার বিচিত্র শক্তির অন্ত নাই; কেন না, এই বিধাতাই মায়াবলে বিবেকী জনের মনও মোহমুগ্ধ করেন। কোথায় এই নিখিল লোক-বৃত্তান্ত-বেত্তা মহীপতি, আর কোথায় বা সামান্য লোকের মনোবৃত্তি-যোগ্য এই বিষম মোহ! ফলে এই উভয়ের বহু পার্থক্য থাকিলেও কোন দৈবী মায়া হইতেই অদ্য এই অঘটন-ঘটনা হইয়াছিল। এই মনোমোহ-কারিণী মায়া শাম্বরিকদিগের অভিপ্রেত হইতে পারে না; কেন না, তাহারা সর্ব্বদা অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। এইরূপ মায়াজাল বিস্তার করিলে তাহাদের অর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে কি? রাজন্! যদি এ ব্যক্তি যথার্থই শাম্বরিক হইত, তাহা হইলে যত্ন করিয়া অর্থ চাহিত; এরূপে অন্তর্দ্ধান কখনই সে করিত না। বস্তুতঃ এ বিষয়ে আমরা এক প্রকার সন্দেহ-সাগরের বেলাভূমিতেই রহিয়াছি, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আমাদের একরূপ একটা স্থির সিদ্ধান্তই হইয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তৎকালে আমি সেই রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলাম। যাহা কহিলাম, আমি তাহা নিজের চক্ষেই দেখিয়াছি। কাহারও নিকট শুনিয়া আমি ইহা বলি নাই। অতএব হে মহাত্মন্! জানিও—এই বিবিধ কল্পনায় বর্দ্ধিতবপুঃ মনই একমাত্র সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান। তুমি যদি পরব্রহ্মের স্বভাবে বিচার ও জ্ঞান যোগে বাসনারাহিত্যরূপ শমভাব আনয়ন করিতে পার, তাহা হইলে পরমপাবন পূর্ণাত্মপদ-প্রাপ্তি তোমার অবশ্যই ঘটিবে।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯

দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! চিৎ বা চৈতন্য প্রথমতঃ স্বসম্বলিত অজ্ঞানতা বশতঃ বিষয়োন্মুখতা উপগত হয়। এইরূপে সে সঙ্কল্পাকার

ধারণ করত বিবিধ অর্থকলায় কলুষভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই সেই বাসনার প্রথমাঙ্কুর বলা হয়। হে রাম। ঈদৃশ স্থিতিসম্পন্ন মিথ্যা মোহ যখন ক্রমশঃ উপচিত হইয়া উঠে, তখন সেই চিৎ আপনার পূর্ণতা বিস্মৃত হইয়া তুচ্ছ মনোরূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং চিরদিনের জন্য জনন-মরণাদি ভ্রমসমূহে মুহ্যমান হইয়া থাকেন। মিথ্যা বেতালের উদ্ভাবন করিয়া বালিকা যেমন বৃথা দুঃখ অনুভব করে, মনোবৃত্তি বা মনোভাবাপন্ন আত্মচৈতন্য তেমনি সহস্র সহস্র তুচ্ছ বাসনা-দোষে পরিম্লান হইয়া অনর্থক দুঃখপরম্পরা বিস্তার করিয়া থাকে। এইরূপ দুঃখবিস্তার বাসনা-কলঙ্কিত মনোবৃত্তি হইতেই হয়। বাসনা ক্ষয় হইয়া গেলে মনোবৃত্তি যখন কলঙ্কভাব হইতে অপগত অর্থাৎ স্বাভাবিক চিৎ-স্বরূপতা উপগত হয়, তখন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের অসত্যতার ন্যায় যে মহাদুঃখ পূর্ব্বে সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ অসত্যতায় উপনীত হইয়া থাকে। মনের এমনই অসীম শক্তি যে, দূরকে নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয় এবং যাহা নিকট, তাহা দূরবর্ত্তী করিতে পারে। যেমন কোন পক্ষিশাবক করায়ত্ত হইলে দুষ্ট বালক তাহা লইয়া যথেচ্ছ ক্রীড়া করে, মনও তেমনি জীবের উপরই যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকে। স্থাণু প্রকৃতপক্ষে ভয়প্রদ না হইলেও মুগ্ধ পথিক যেমন দূর হইতে স্থাণু দর্শনে পিশাচজ্ঞানে ভীত হয়, বাসনার আবেশবশে মনও তেমনি অভয়কেও ভয় বলিয়া ধারণা করে। কলঙ্ক-মলিন মন মিত্রকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। দেখ, যাহার মতি মদমত্ত হয়, তাদৃশ জনের দৃষ্টিতে ভূতলও ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। মন যখন একান্তই আকুল হইয়া উঠে, তখন সুধাকর হইতেও বজ্রপাত হইতেছে বলিয়া অনুভূত হয়। বিষ-ভাবনায় ভোজন করিলে অমৃতও বিষ-ক্রিয়া উৎপাদন করে। গন্ধর্ব্ব-নগরী অসত্য হইলেও একমাত্র বাসনাবেশেই মন তাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করে এবং যাহা জাগ্রদবস্থা, তাহাকেও স্বপ্নবৎ ধারণা করিতে থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, একমাত্র উৎকট মনোবাসনাই জীবের মোহমগ্ন হইবার প্রধান কারণ; সুতরাং সেই বাসনাকেই সমূলে উৎপাটিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র। এই সংসাররূপ মহারণ্যে নরগণের মনোরূপ মৃগশাবক বাসনারূপিণী বাগুরায় সমাকৃষ্ট হইয়াই সাতিশয় বিবশ হইয়া পড়ে। যিনি বিচারবলে জীবের ঐ বাসনাজাল ছেদন করিতে পারেন, মেঘমুক্ত মার্ত্তণ্ড-কিরণের ন্যায় তাঁহারই আলোক সম্যক্ সুশোভিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তদীয় তত্ত্বদৃষ্টি পূর্ণস্বরূপে বিকশিত হইয়া উঠে। অতএব এই মনকেই তুমি জীব বলিয়া জানিবে। এ দেহ জীব নহে, দেহ জড় পদার্থ। সুধীগণের মতে যাহা মন, তাহা জড় ও অজড় উভয়রূপেই কীর্ত্তিত। হে তাত রঘুনন্দন! মন যাহা করে, তাহাই যথার্থ কৃত আর সে যাহা ত্যাগ করে, জানিবে,—তাহাই প্রকৃত ত্যক্ত হইয়া থাকে। এই যে নিখিল জগৎ, ইহা একমাত্র মন বৈ আর কিছুই নয়। এই যে গগন, পবন, ভুবন, এ সকলও সেই এক মাত্র মন। মন যদি পদার্থসমষ্টিকে প্রকাশভাবে কল্পনা করিয়া না লয়, তাহা হইলে ঐ সূর্য্যাদি পদার্থেরও প্রকাশপ্রাপ্তি কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। মানুষের মন মোহগ্রস্ত হইলেই তাহাকে মূঢ় বলা হয়; কিন্তু শরীর যদি মোহপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে মূঢ় বলা চলে না; পণ্ডিতেরা সে শরীরকে শবনামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। একমাত্র মনই দর্শনশক্তি-লাভে চক্ষু, শ্রবণশক্তি-লাভে কর্ণ, স্পর্শন-শক্তিলাভে ত্বক্ এবং ঘ্রাণ-শক্তিলাভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং আস্বাদ-শক্তিলাভে রসনেন্দ্রিয় হয়। উহাদের বৃত্তিগুলিও পরস্পর বিচিত্র ও বিভিন্ন। ফলে, এই দেহ যেন একটা প্রকাণ্ড নাট্যশালা। মন ইহাতে নটের ন্যায় নানা সময়ে নানামূর্ত্তিতে বিবিধ অভিনয় সমাধা করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনের শক্তি চমৎকার। মন, হ্রস্বকে দীর্ঘ, দীর্ঘকে হ্রস্ব, অসত্যকে সত্য, সুস্বাদুকে বিস্বাদ এবং শত্রুকে মিত্র করিয়া লয়। চিত্ত মধ্যে তদ্গতভাবে যাদৃশ প্রতিভাস সমুদিত হইবে, প্রত্যক্ষ হইতে হইলে সেইরূপই হইয়া থাকে। হরিশ্চন্দ্রের মন স্বপ্নাবস্থায় ব্যাকুল ছিল, একমাত্র প্রতিভাসবশেই তিনি একরাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিরিঞ্চি-ভবনে অবস্থানকালে একমাত্র চিন্তানুভব বশতই এক যুগকে মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দেখ, পরদিন যাহার রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ

বদ্ধ ব্যক্তির যেমন তৎকালিক বন্ধনও সুখের হইয়া থাকে, তেমনি মন যদি বিশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে রৌরব নরক-ভোগও সুখজনক হইয়া উঠে। যেমন আধারসূত্র দগ্ধ হইয়া গেলে সেই সূত্রস্থ মুক্তাফল-গুলি আপনা হইতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি একবার যদি মনোজয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দমিত হয়।

রাম! চিতিশক্তি সর্ব্বত্র বিরাজিত, স্বচ্ছ, সম, নির্ব্বিকার, সূক্ষ্ম, সাক্ষিভূত ও সর্ব্বভাবের অনুগত। আত্মার সত্তা সেই শক্তিতেই নিহিত। মন বাক্যাদি-ব্যাপার-বিরহিত হইলেও ঐ চিতি-শক্তিরূপিণী আত্ম-শক্তির সাহায্যে ব্রহ্মকে দেহের সহিত তাদাত্ম্য-কল্পনায় দেহবৎ জড় করিয়া অন্তরে মনন ও সঙ্কল্পাদি ভ্রান্তি এবং বাহিরে শৈল, সাগর, নদ, নদী, পুরী প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ কল্পনা করিয়া বৃথাই ভ্রমণ করিতে থাকে। বলিতে পার, মূঢ় মন বৃথা কল্পনা করিতে থাকে, করুক; পরন্তু সে যখন বিচারবলে জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তখন ত আর বৃথা কল্পনা করিবে না; সুতরাং মনোনাশের উপায় চিন্তা করিয়া কি হইবে? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মন জাগরূক হইলেও তাহার অন্যথা কল্পনার সম্ভাবনা একেবারে যায় না। বিবেকবলে মনের জাগ্রদবস্থা ঘটিলেও মন অনুরাগবশে অস্বাদু উচ্ছিষ্ট কান্তাধরাদি বস্তু অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু বোধ করে। আবার যদি অমৃতও অনভিমত হয়, তবে তাহাকেও বিষবৎ হেয় জ্ঞান করে। আত্মার পূর্ণভাব যাহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তাহাদের নিকটই মন নিজ নিজ অভিমত বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ জন, তাঁহা-দের নিকট মনের কোনই বিচিত্র কৃতিত্ব নাই। কেন না, তাঁহাদের নিকট মনোবিজ্ঞান মিথ্যা বুদ্ধিতেই বাধিত। ফলতঃ তাঁহারা জানেন, মিথ্যা মনোবিলাসে চমৎকার দর্শন কিছুই নাই। মন চিতিশক্তিতে স্ফুরিত হইয়া স্পন্দধর্ম্মে বায়ুভাব, প্রকাশধর্ম্মে প্রকাশভাব, দ্রবধর্ম্মে দ্রবভাব, পার্থিব অংশে কঠিনভাব এবং শূন্যভাবে শূন্যভাব উপগত হইয়া থাকে। চিৎ-শক্তিবশে স্ফুরিত মন সর্ব্বদাই ইচ্ছানুরূপ স্থিতিলাভ করে। মন শুক্লকে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকে শুক্ল করিয়া লয়। মন, দেশ-কালাদির অপেক্ষা না

করিয়াই কতদূর যে শক্তি ধারণ করে, এই তাহা প্রত্যক্ষ কর। দেখ, মন যদি অন্য বস্তুতে আসক্ত রহে, তাহা হইলে, মিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে থাকিলেও তাহার কোনই স্বাদ অনুভূত হয় না। মন যাহা দেখে, তাহাই দৃষ্ট, আর সে যাহা না দেখে, তাহা কখন দৃষ্ট হয় না। ফলে, মন যদি না দেখে, তাহা হইলে নিকটস্থ বস্তুও দৃষ্ট হইবার নয়। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় সত্ত্বেও অন্ধকারে বস্তু দর্শন হয় না, তেমনি ইন্দ্রিয় থাকিলেও মন ব্যতীত পদার্থোপলব্ধি হইতে পারে না। এই ব্যাপারটী বিশেষভাবে বুঝিলে বুঝা যায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ মন কর্ত্তৃকই স্বীয় আত্মায় কল্পিত। যদিও ইন্দ্রিয়ালোচিত আকার ধারণ করে বলিয়া মন ইন্দ্রিয় নিমিত্ত দেহসম্পন্ন বা সাবয়ব হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়ও মনোধীন বিষয়ের আলোচক বলিয়া মনোনিমিত্ত অবয়বসম্পন্ন হয়, এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের সহায়তা হয় বলিয়া মন ও ইন্দ্রিয় তুল্য হইলেও মনই তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কেননা, মন হইতেই ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব; ইন্দ্রিয় হইতে মনের উৎপত্তি হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে চিত্ত ও দেহ নিতান্ত বিভিন্ন। পরন্তু যে সকল তত্ত্বদর্শী লোক উল্লিখিত চিত্ত ও দেহকে অভিন্নরূপে ধারণা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞাতজ্ঞেয়; তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই সুপণ্ডিত এবং তাঁহারাই সকলের নমস্য। দেখ, যাঁহাদের মন নাই, কোন কুসুমোল্লসিত কবরী-মণ্ডিত লোলনয়না সুন্দরী কামিনীও যদি কামাবেশে তাঁহাদের অঙ্গে ঢলিয়া পড়ে, তথাপি সে তাঁহাদের কোনরূপ বিকার জন্মাইতে পারে না। কথিত আছে, বীতরাগ নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি বনমধ্যে তপস্যায় নিরত আছেন, এই সময় কোন এক হিংস্র জন্তু আসিয়া তদীয় ধ্যানকালীন অঙ্কস্থিত হস্ত চর্ব্বণ করিয়াছিল; কিন্তু মুনি তাহা সে সময়ে অনুভব করিতে পারেন নাই। এই অনুভব না হইবার কারণ এই যে, তাঁহার মন তখন অন্যত্র—ধ্যেয় বস্তুতেই সমাসক্ত ছিল। দেখ, অতি বড় দুঃখকেও সুখরূপে পরিণত করা, আর সুখকেও যে দুঃখরূপে পরিণত করিয়া লওয়া, এই দুইটী কার্য্য একমাত্র মুনির মনেরই আয়ত্ত। মুনির মনের অভ্যাসস্থিরীকৃত সুদৃঢ় ভাবনারাশি অনায়াসেই সুখে দুঃখ ও দুঃখে সুখ, ইহার

যে কোনভাবে বিভোর হইতে পারে। শ্রোতা যদি অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বক্তা ব্যক্তি অতি যত্নের সহিত কোন কথা কহিলেও সে কথা কুঠার-কর্ত্তিত লতার ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অথবা অন্যমনস্ক হইয়া কথা কহিতে গেলে বক্তার যত্ন সত্ত্বেও পরশুচ্ছিন্ন লতার ন্যায় কখন কখন সে কথার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। মন যদি শৈলতটে আরোহণ করে, তাহা হইলে গৃহাবস্থিত ব্যক্তিকেও শুভ্র অভ্র-পরিবৃত গিরিকন্দরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয়। স্বপ্নকালে গগনবৎ বিস্তৃত মনোমধ্যেই গিরি-নগরাদি বিবিধ পদার্থপুঞ্জকে স্ব স্ব কার্য্যক্ষম হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। মনের এমনই অসীম শক্তি যে, সাগরের তরঙ্গমালা বিস্তারের ন্যায় মন স্বপ্নাবস্থায় আপনা হইতেই হৃদয় মধ্যে গিরি-নগরাদি পদার্থ-পরম্পরা বিস্তার করিতে থাকে। যেমন সমুদ্রের অন্তর্গত সলিল তরঙ্গমালায় পরিণত হয়, দেহান্তর্গত মনও তেমনি স্বপ্নাবেশে গিরি-নগরাদির আকারে পরিণত হইয়া থাকে। পুষ্প, ফল, লতা, পত্র, এ সকল যেমন একই অঙ্কুর হইতে সমুদ্গত হয়, তেমনি এই জাগ্রৎ ও স্বপ্নবিলাস সকল মন হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাঞ্চনময়ী প্রতিমা হইতে কাঞ্চন অভিন্ন, তেমনি কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, এই উভয় অবস্থার ক্রিয়াও চিত্ত হইতে অনতিরিক্ত। একমাত্র জলই যেমন ধারা, বিন্দু, তরঙ্গ ও ফেনাদি বিভিন্ন ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, বিবিধ বিভবরাশিও তেমনি একমাত্র চিত্ত হইতে আবির্ভূত হইয়াই নানাকারে লক্ষিত হইতেছে। একই নটপুরুষ যেমন শৃঙ্গার, বীর ও করুণাদি রসভেদে ও পাত্রভেদে বিবিধ বিচিত্র বেশ, ভাষা ও ভাবভঙ্গী লইয়া নানাভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনি আপনার একমাত্র চিত্তবৃত্তিই জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্বরূপে সমুদিত অনেকবিধ পদার্থস্বরূপ ধারণ করিতেছে। যেমন প্রতিভাস বশতঃ পূর্ব্বোক্ত লবণ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তেমনি মননাত্মক মনই এই বিশাল বিশ্বরূপে স্ফুরিত হইতেছে। যে কোন বিষয়েরই সংবেদনা বা দৃঢ় ভাবনা করা যাউক, সেই সেইভাবে অচিরেই উপনীত হওয়া যায়। মনের যে মনন ধর্ম্ম, তাহাকে তুমি যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার। জাগ্রৎ ও স্বপ্নময় মনই নানা গিরি, নদী ও নগররূপ ধারণ করিয়া দেহীদিগের

অন্তরেই তৎসমস্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। মনের প্রতিভাস-বশেই লবণ-ভূপতির চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির ন্যায় দেবত্ব হইতে দৈবত্ব ও নাগত্ব হইতে নগত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ প্রথমে যে দেব ছিল এবং পরে সে যে দৈত্য হইল, প্রতিভাসই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপে পূর্ব্বে নর থাকিয়া পরজন্মে যে নারী হয়, ও পূর্ব্ব জন্মে পিতা হইয়া পরজন্মে যে পুত্র হইয়া থাকে, ইহার কারণ কেবল মনেরই সঙ্কল্প। ফল কথা, জন্মান্তরে হয় ত ঐরূপ নারী বা পুত্র হইবার বাসনা অন্তরে পোষিত থাকে, পরে মনও তেমনি নিজ সঙ্কল্পবশে একভাব হইতে ভাবান্তরে উপনীত হয়।

রাম! মন নিজে নিরাকার বটে, কিন্তু চিরাভ্যস্ত সঙ্কল্প-বশে সে জীবভাব উপগত হইয়া মৃত এবং জাত হইয়া থাকে। এই যে মনন-সম্মূঢ় বাসনাময় বিস্তৃত মন, ইহা সঙ্কল্পবশতই যোনিগত হইয়া সুখ, দুঃখ ও ভয়াভয় প্রাপ্ত হয়। তিলে যেমন তৈলের অবস্থান, তেমনি সুখ ও দুঃখ এই দুইটী বস্তুরও নিয়ত মনোমধ্যেই অধিষ্ঠান। তবে কথা এই যে, দেশ ও কাল ভেদে ঐ সুখ দুঃখ কখন বা অধিক এবং কখন বা অল্প হইয়া থাকে। তিল-নিষ্পেষণে নিশ্চিতই যেমন তৈল নির্গম ঘটে, মনও তেমনি মনন-সংযোগে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখ অথবা দুঃখ প্রকাশ করে।

রামচন্দ্র! এই যে দেশ-কালের কথা কহিলাম, ইহাও একমাত্র সঙ্কল্প বৈ আর কিছুই নয়; কেননা, দেশ-কালের যে সত্তা বা স্থিতি, তাহা ত একমাত্র সঙ্কল্পবলেই হয়। মনোরূপী দেহের সঙ্কল্প যখন ফলিত হয়, তখন এই স্থূলদেহ প্রশান্ত হয়, আবার কখন উল্লসিত হইয়া উঠে, কখন গমন করে, কখন আনন্দিত হয় এবং কখন বা চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। পরন্তু স্বাতন্ত্র্যভাবে স্থূলদেহের কোন শক্তি বা কোনই ক্রিয়া নাই। অন্তঃপুরমধ্যে রমণীজনের প্রগল্ভ ব্যবহারের ন্যায় এই মন দেহের অভ্যন্তরেই আপন সঙ্কল্প-কল্পিত বিবিধ উল্লাসের সহিত বল্গিত হইয়া থাকে। অতএব এই মনের নিগ্রহোপায়ের সাফল্য বিষয়ে বলা যায় যে, মন যদি বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে না পারে, তাহা হইলেই সে ক্ষয় পাইতে থাকে। যিনি বিষয়ান্বেষণ-রূপ চপল কর্ম্মে মনকে নিয়োগ না করেন, আলান-বদ্ধ

করীর ন্যায় তাঁহার মন ক্ষীণ হইয়া যায়। স্তম্ভনাস্ত্র প্রয়োগে মহাশক্র যেমন নিস্পন্দ হয়, তেমনি মন যাঁহার নিশ্চল বা নিস্পন্দভাব অবলম্বন করে, সংসারে তাঁহাকেই প্রকৃত সৎপুরুষ বলা যায়। এতদ্ভিন্ন অপর লোকদিগকে কর্দ্দমস্থ কীটপ্রায় বলিয়াই জানিবে। যাঁহার মন একবিষয়-নিষ্ঠ হইয়া নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, হে অনঘ! বুঝিবে, তাদৃশ পুরুষই সর্ব্বোত্তম পরমাত্ম-পদ ধ্যান করিতে সমর্থ। মন্থনের পর মন্দরাচলের নিস্পন্দতায় ক্ষীর মহাসাগরের প্রশান্তভাবের ন্যায় একমাত্র চিত্ত-সংযম দ্বারাই সংসার-বিলাসের শান্তি হইয়া থাকে। ভোগ-সঙ্কল্পের বিলাসে মনের যে যে বৃত্তিগুলি সমুদিত হয়, তৎতাবৎই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ।

হে রাম! এই সংসার একটী প্রবলতর নদীর ন্যায় প্রতিভাত। চঞ্চল চিত্ত এই সংসারনদীর প্রবাহ-চালিত কুবলয়-বন। মদমোহ-মূঢ় সমগ্র পুরুষ ভ্রমর-নিকরের ন্যায় ঐ কুবলয়-বন বেষ্টন করত ভ্রমণ করিতে গিয়া মহাজাড্যাকার জলপ্রবাহে বিশীর্ণপ্রায় চিন্তারূপ আবর্ত্তচক্রে নিপতিত হইতেছে।

দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! শ্রবণ কর, আমি এক্ষণে একটী মহৌষধির কথা কহিতেছি, এই মহৌষধি উল্লিখিত চিত্তরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসায় অবশ্যই ফলপ্রদ এবং ইহা সকলেরই আয়ত্ত। যদি অভীপ্সিত বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া আত্মসম্বেদন-রূপ পুরুষকার আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনায়াসেই চিত্ত-বেতাল বিজিত হইয়া থাকে। যে জন অভিমত বিষয়ভোগ বর্জ্জনপূর্ব্বক রাগাদি চিত্তরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান করে, দন্তশালী হস্তী কর্ত্তৃক ভগ্নদন্ত হস্তীর সহজ পরাজয়ের ন্যায় সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক মন অনায়াসেই বিজিত হইতে পারে। যদি আত্মসম্বেদন-বিষয়ে সুদৃঢ় যত্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বিষয়-

রাগ জন্য চাপল্যাদি রোগ হইতে চিত্তরূপ বালককে সুচিকিৎসায় সুরক্ষিত করা সহজসাধ্য হয় এবং তখন উহাকে অবস্তু হইতে সদ্‌বস্তুতে সংযোজিত ও বোধিত করাও কঠিন হয় না।

রামচন্দ্র! মনোরূপ লৌহ যদি চিন্তানলে তাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ-বশে ধীরতা-প্রাপ্ত ও সংসারের তাপে অতাপিত লৌহময় মন দ্বারাই তাহাকে ছেদন করিয়া ফেল। যেমন বালকদিগকে লালন ও ভয়প্রদর্শনাদি উপায়দ্বারা সহজেই সকল বিষয়ে নিযুক্ত করা যায়, চিত্তকেও তেমনি আত্মবস্তুতে যোজিত করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে কিছুই ত আমার দুষ্কর বলিয়া বোধ হয় না। পরিণামে যাহাতে শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা একান্তই রহিয়াছে, তাদৃশ সমাধি অভ্যাসরূপ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, মনকে আপন পৌরুষ বলেই চিন্ময় আত্মার সহিত একীভূত করা যায়। কামনা পরিহার করিয়া বিষয়-বৈরাগ্য অবলম্বন করাই পরম হিতপ্রদ; পুরুষের পক্ষে সেরূপ করা বিশেষ আয়াস-সাধ্য নয়। তথাপি যে পুরুষ তাহা করিতে অপারগ হয়, তাদৃশ কীটোপম পুরুষ ধিক্কারের যোগ্য। বিষয়রাশি একান্তই অরম্য; এই অরম্য বিষয়কে পরমার্থ-রম্য ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিতে পারিলে, মল্ল যেমন শিশুকে সহজে জয় করিতে পারে, মনকে তেমনি অনায়াসেই জয় করা যায়। পুরুষকার প্রযত্নে চিত্ত জয় সহজেই হয়। চিত্ত যদি জিত হয়, তাহা হইলে পরব্রহ্মকে অক্লেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্ত-নিগ্রহ সহজসাধ্য ও স্বায়ত্ত হইলেও যাহারা সেটুকু মাত্র করিতেও অক্ষম, তাহারা ত শৃগালের সহিতই উপমিত; সুতরাং পুরুষ মধ্যে তাহারা ধিক্কার পাইবারই যোগ্য পাত্র। একমাত্র আপন পুরুষকার দ্বারাই কামনা ত্যাগ করিতে পারা যায়; কামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই মনের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মনকে শান্ত করিবার অন্য কোন শুভ উপায় নাই। মনের বিনাশ-সাধন অসাধ্য নহে। মনোবিনাশ হইলেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারাই মোহাদি শত্রু বিজিত হয়। তখন এই জীবন্মুক্ত দেহেই অনাদি অনন্ত নিত্য নিষ্কণ্টক স্বরাজ্য-সুখ সমধিগত হওয়া যায়।

রাম! মন যদি প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে কি গুরূপদেশ, কি শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যা, কি মন্ত্রাদি সাধন, সকলই তৃণবৎ তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। সঙ্কল্পত্যাগরূপ শস্ত্রের সাহায্যে চিত্তকে যৎকালে সমূলে সমুৎপাটিত করিতে পারিবে, তখনই বুঝিবে সর্ব্বময়, সর্ব্বগত, শান্ত ব্রহ্মপদ সমধিগত হইয়াছে। সঙ্কল্পরূপ অনর্থের নিবৃত্তি হইলে যখন শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন জীবন্মুক্ত-ভাব উপস্থিত হয়, তখন আর এই অধিকারি-শরীরে পুরুষের কোনই কদর্থনা বা ক্লেশ থাকে না। বলিতে পার, দৈবের প্রতিকূলতায় কার্য্যসিদ্ধি হইবে কেমন করিয়া? তদুত্তরে বলিব, তুমি দৈবকে উপেক্ষা করিয়া আপনার পুরুষকার বা স্বাত্মাকার ভাবনা দ্বারা জ্ঞানযোগের আশ্রয়ে এই মূঢ় সঙ্কল্প-কল্পিত চিত্তকে অচিত্ততায় উপনীত কর, চিত্তকে চিরদিন সেই মহাপদবীতে অর্থাৎ ব্রহ্ম-রূপতায় উন্নীত করিয়া রাখ; পশ্চাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বৃত্তি-বলে চিতের প্রকাশে অবিদ্যার উচ্ছেদ হইয়া গেলে, ঐ চিত্তকে চিৎকর্ত্তৃক একেবারে কবলিত করাইয়া সম্পূর্ণ চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করিতে থাক।

হে রঘুনন্দন! তুমি প্রথমতঃ সতত কেবল চৈতন্যমাত্রের ভাবনায় নিরত হও; পশ্চাৎ সেই ভাবনার দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য প্রমাদ-পরিহীন বুদ্ধিকে সদা আশ্রয় করিয়া থাক। অনন্তর অব্যগ্র হইয়া চিত্তগ্রাসী পরমাত্মাকে ধারণ কর এবং পরম পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তকে অচিত্ততায় উপনীত করিয়া সেই মহাপদবী প্রাপ্ত হও। সেই মহাপদবীতে অধিরূঢ় হইতে পারিলে তখন আর নাশের সম্ভাবনা নাই। রাম! বুঝিয়া দেখ, কখন দিঙ্মোহ বা দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইলে, যে বিপর্য্যস্ত বুদ্ধি পশ্চিম দিকে পূর্ব্বদিক্ বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, বিবেক ও পুরুষ-প্রযত্ন দ্বারাই সেই বুদ্ধিকে যেমন জয় করা সহজ হইয়া উঠে, সেইরূপ একমাত্র পুরুষকার প্রযত্ন দ্বারাই মনকে অনায়াসে জয় করিতে পারা যায়। রাজ্যাদি যে কিছু সম্পদ্, একমাত্র অনুদ্বেগই তাহার মূল; ঐ অনুদ্বেগ হইতেই জীবের মনোজয়-ব্যাপার সিদ্ধ হয়; যদি মনোজয় করিতে পারা যায়, তখন এই ত্রৈলোক্যকে জয় করাও তৃণের ন্যায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। রাজ্য-সুখলাভে যুদ্ধ করিয়া শত্রু-জয়াদি

কার্য্যে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং স্বর্গ-সুখলাভে মরিয়া ঊর্দ্ধগতি ও পাশ্চাৎ পুণ্যক্ষয়ে অধোগতি ইত্যাদি কত কদর্থনাই পাইতে হয়; কিন্তু মনোজয় জন্য যে সুখশান্তি ঘটে, তাহাতে একটুকু মাত্র ক্লেশও নাই। আর বুঝিয়া দেখিলে মনোজয় ব্যাপারটাই বা কি? তাহা ত কেবল স্বীয় স্বভাবে পূর্ণ-ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি মাত্র বৈ আর কিছুই নয়; সুতরাং তাহাতে আবার ক্লেশের কথা কি? যাহারা মনের নিগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা নরসমাজে অধম বলিয়া কীর্ত্তিত। তাদৃশ নরাধমেরা কিরূপেই বা লৌকিক ব্যবহারপরম্পরা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে? মানুষ মনে করে বটে, আমি পুরুষ; আমি জন্মিয়াছি, আমি বাঁচিয়া আছি, আমি মরিলাম; কিন্তু বলিতে কি, এই এই সকল কুদৃষ্টি কেবল চপল চিত্ত হইতেই প্রাদুর্ভূত মিথ্যা ব্যাপারমাত্র। কেন না, প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, কেহই মরে না এবং কেহই জন্মেও না। মনই কেবল আপনিই আপনাকে ও অপরকে মৃত ও জাত ইত্যাদিরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। এই লোক হইতে পরলোকে প্রয়াণ, এই যে ব্যাপারটা, ইহাকেও মনেরই অন্য প্রকারে স্ফুরণমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই বলা চলে না। যতদিনে না মুক্তি ঘটিবে, ততদিন পর্য্যন্তই উহা হইতে থাকিবে; সুতরাং মৃত্যু-ভয় কোথায়? প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই ত মরে না। চিত্ত ইহলোকেই বিচরণ করিতে থাকুক, কিম্বা পরলোকেই বিচরণ করিয়া বেড়াউক, যাবৎ পর্য্যন্ত না মোক্ষলাভ ঘটে, তাবৎ কাল একই ভাবে থাকিবেই থাকিবে। অতএব দেখা যায়, চিত্তই সংসারের রূপ; ভ্রাতা কিম্বা অভিমত ভৃত্য প্রভৃতির মৃত্যু ঘটিলে লোকে যে অনর্থক শোক প্রকাশ করে, আমার মতে তাহা আত্মচৈতন্য ভিন্ন চিত্তেরই ধর্ম্ম বৈ আর কিছুই নয়; সুতরাং পরমাত্মাতে সমূলে চিত্তনাশই মুক্তির প্রধান উপায়, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যাহা সত্য, সর্ব্বহিত, মায়ামালিন্য-রহিত ও প্রমাণশিরোমণি শ্রুতি দ্বারা বোধিত, তথাবিধ পরমাত্মাকে চিন্ময়ভাবে পর্য্যবসিত করিয়া না লইতে পারিলে মোক্ষলাভের আর উপায় কিছুই নাই। কি ঊর্দ্ধলোক, কি অধোলোক, কি বিভিন্ন দ্বীপ-দেশ, সর্ব্বস্থানস্থিত তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরাই ইহা বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য অসীম অনন্ত

সত্য আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বিষয়ে একমাত্র চিত্ত প্রশমনই প্রয়োজন; তদ্ব্যতীত তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অন্য উপায় নাই। মনের যদি বিলয় হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত বিশ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি সুবিশাল হৃদয়াকাশে চিৎস্বরূপ চক্রদ্বারা নিঃসংশয়ে মনকে ছেদন করিয়া ফেল; দেখিবে—কদাচ কোনওরূপ মানসিক দুঃখ তোমাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে না। যদি দোষানুসন্ধান করিয়া সমস্ত আপাত-রম্য বিষয়কে জ্ঞানযোগে তুমি অরম্য বলিয়া অবধারণ করিতে পার, আমার মতে তাহা হইলেই তোমা কর্ত্তৃক চিত্তের সর্ব্বাঙ্গ কর্ত্তিত হইবে। 'এই সে, এই আমি, এই বস্তু আমার' ইত্যাকার ভ্রমকেই মনের অবয়ব বলা যায়, যদি ঈদৃশ ভাবনার অভাবরূপ দাত্র দিয়া আঘাত করা হয়, তাহা হইলেই চিত্ত-দেহের কর্ত্তন হইয়া থাকে। শরৎকালে নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড মেঘ দেখা যায়, কিন্তু সামান্য মাত্র বায়ুর হিল্লোলেই ঐ মেঘখণ্ডগুলি যেমন অনায়াসে অপসারিত হয়, মনও তেমনি 'আমি ও আমার' এবম্বিধ কল্পনার অভাব দ্বারাই বিতাড়িত হইয়া থাকে। যেখানে শস্ত্র আছে, বায়ু আছে, কিম্বা বহ্নি আছে, মানিলাম—সেইখানেই না হয় ভয় আছে; কিন্তু যাহা নিজেরও আয়ত্ত ও অনায়াস-সাধ্য, তথাবিধ নির্ম্মল সঙ্কল্পাভাবের সাধন-ব্যাপারে ভয় কি আছে? কি ভাল, কি মন্দ, ইহা ত বালকেরও বোধগম্য; সুতরাং ইহাই চিরন্তন প্রসিদ্ধ যে, অল্পবয়স্ক পুত্র সন্তানের ন্যায় মনকে মঙ্গল বিষয়েই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যাহা হইতে সংসার বিস্তার ঘটে, তথাবিধ প্রবলতর অক্ষয় চিত্ত-সিংহকে যাঁহারা নিহত করিতে পারেন, এ সংসারে তাঁহাদের ন্যায় নির্ব্বাণ-পদপ্রদ মহাপুরুষেরাই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবভাজন। মরুস্থলীস্থ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় আবেগ-দায়িনী এই সকল ভীষণ বিপত্তি কেবল সঙ্কল্প হইতেই উৎপন্ন হয়। দেখ, কল্পান্ত-কালের পবনই প্রবাহিত হউক, আর সমস্ত সাগর একীভূত হইয়াই যাউক, অথবা দ্বাদশাদিত্যই এককালে তাপ দান করুক, তাহাতে নির্ম্মনস্ক ব্যক্তির কোনই ক্ষতি নাই। একমাত্র মনোবীজ হইতে এই সুখ-দুঃখ ও শুভাশুভময় সংসার-বনখণ্ড এবং এই সপ্তলোক-রূপ পল্লব সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

রামচন্দ্র! অসঙ্কল্পই তোমার সাম্রাজ্য হউক, সেই সাম্রাজ্যে তুমি পরমাত্মপদ-রূপ সিংহাসন অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর। একমাত্র সঙ্কল্পত্যাগেই সেই অসঙ্কল্প-সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা পাইলে সর্ব্বসিদ্ধিই করায়ত্ত হইয়া থাকে। দেখ, যে জন জ্বলন্ত অঙ্গার নির্ব্বাপিত করিয়া বহ্নিতাপ প্রশমিত করিতে অভিলাষ করে, তাহার পক্ষে সেই অঙ্গার ক্রমশঃ দাহ্যকাষ্ঠ ক্ষয় করিয়া ও পরে আপনিই ক্ষীণ ও নির্ব্বাণ হইয়া যেমন তাপশান্তি করিয়া দিয়া পশ্চাৎ প্রমোদ প্রদর্শন করে, মনও তেমনি ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া পরমানন্দ বিতরণ করিতে থাকে। মনের যদি ক্ষয় হয়, তাহা হইলে চিদণুর অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড পৃথক্ ভাবে স্পষ্টতঃ লক্ষীভূত হইয়া থাকে। মাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি পদার্থ সম্পাদন করিয়াছে এবং ঐ সঙ্কল্প দ্বারাই জনন-মরণ-নরকাদি মহান্ অনর্থ উদ্ভাবন করিয়াছে।

হে রঘুনন্দন! তুমি সতত ভাবিত সঙ্কল্পাভাব-বলে মাত্র সন্তোষ দ্বারাই মনকে জয় করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গৌরব লাভ কর। মনো-জয় করিবার পর যাহা আত্মজ্ঞ জনগণের সম্মত, তথাবিধ পরম পাবন অবৈষম্য বৃত্তিবলে অপরিমিত অহন্ভাব বিদূরিত করিয়া যাহা জন্মাদি-বিকার-বিরহিত অবশিষ্ট ব্রহ্মপদ, তাহাই তোমার অধিগত হউক।

একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! মন, যে যে পদার্থে যেরূপ যেরূপ ইচ্ছায় যে যে প্রকর্ষে তীব্রবেগ-সম্পন্ন হয়, সেই সেই পদার্থে সেই সেই ইষ্ট বিষয়-সিদ্ধি, সেই সেইরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মনের যে ঐ বাসনাময় তীব্রবেগ, তাহার কোনই হেতু নাই। উহা জল-বুদ্বুদাবলীর ন্যায় স্বভাবতই কখন উৎপন্ন হয় এবং কখন বা বিলয়

পাইয়া যায়। শৈত্য যেমন হিমের রূপ এবং কৃষ্ণত্ব যেমন কজ্জলের রূপ, তেমনি তীব্র ও অতীব্রস্বরূপ চঞ্চলতাই মনের রূপ।

রামচন্দ্র কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! অতি চঞ্চল মনের যে বেগ বা চঞ্চলতা, তাহা আপনি স্বাভাবিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়; তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করা যায় কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এ সংসারে চঞ্চলতা-বিরহিত মনের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না। অনলের ধর্ম্ম যেমন উষ্ণতা, মনের ধর্ম্ম তেমনি চাঞ্চল্য। যে ক্রিয়াশক্তি জগৎকারণ মায়া-শবলিত চৈতন্যে অবস্থিত, সেই জগদাড়ম্বরময়ী শক্তিই মনোরূপে পরিণত বলিয়া বিদিত হইবে। যেমন স্পন্দ ব্যতীত পবনের সত্তা উপলব্ধি হয় না, তেমনি চাঞ্চল্য বা স্পন্দন ভিন্ন চিত্তের অস্তিত্বই অসম্ভব। যে মন চঞ্চ-লতা-বিরহিত, তাহাকেই মৃত বলিয়া অভিহিত করা হয়। মনের তাদৃশ অবস্থাই মোক্ষ আখ্যায় উল্লিখিত; ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। মনের বিলয় মাত্রেই সর্ব্বদুঃখ প্রশমিত হয় আর মনের মননমাত্রেই অশেষ দুঃখ-ভোগ ঘটিয়া থাকে। চিত্তরূপ রাক্ষসের প্রাদুর্ভাবে উৎকট দুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব অনন্ত ভোগ-সুখের জন্য যত্নের সহিত তুমি উহাকে নিপাতিত কর।

রামচন্দ্র! মনের যে চঞ্চলতা, তাহাই অবিদ্যা; তুমি বিচারবলে ঐ বাসনানাম্নী অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধন কর। ঐ যে চিত্তসত্তারূপিণী বাসনা বা অবিদ্যা, যদি বাহ্য বিষয়ের বর্জ্জনে উহার বিলয় বিধান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম মঙ্গল লাভ হয়। বৎস! সৎ ও অসতের যে মধ্য বা মিশ্রভাব এবং চিন্ময়ত্ব ও জড়ত্বের যে মধ্যভাগ, তাদৃশ অবস্থাই মন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। উল্লিখিত উভয় দিকেই মনের আকার দোলায়মান। মন বিষয়ানুসন্ধানে দূষিত হইয়া জড়তার ঐকা-ন্তিক অভ্যাসবশে জড়তা উপগত হয়; অন্যদিকে ঐ মনই আবার বিবেকানুসন্ধানের সুদৃঢ় অভ্যাস বশতঃ চিদংশরূপে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অভ্যাস-ভেদে মন কখন জড়স্বরূপ এবং

কখন বা চিন্ময়স্বরূপ হয়। মনকে পুরুষকার প্রযত্নে যে পদে উপনীত করা যায়, অভ্যাস বশতঃ সেই পদই সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই বলি, তুমি পুরুষকারবলে তোমার উল্লিখিতরূপ জড়স্বরূপ মনকে উল্লিখিত চৈতন্যস্বরূপ মন দ্বারা অভিভূত করিয়া, যাহাতে কোন শোকলেশ নাই, তথাবিধ পদে অধিরোহণপূর্ব্বক নিঃশঙ্ক ও স্থৈর্য্যশালী হও। হে রাম! ভব-ভাবনায় নিমগ্ন মনকে যদি বিবেক-বিশুদ্ধ মন দ্বারা সবলে উদ্ধার করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সে মনের উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই।

হে রঘুনন্দন! জানিবে, একমাত্র মনই মনের নিগ্রহ করিতে সমর্থ। দৃষ্টান্ত দেখ, রাজাই রাজাকে জয় করেন, পরন্তু অরাজা কি কখন রাজাকে জয় করিতে পারে? যাহারা সংসার-সাগরের প্রবাহে পড়িয়া তৃষ্ণারূপ জলজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আবর্ত্ত মধ্যে ভাসমান, নিজ নিজ মনই তাহাদের নৌকার ন্যায় তরণোপায়। যে জন মনোদ্বারাই দৃঢ়-বদ্ধ মনোরূপ পাশ ছেদনপূর্ব্বক আত্মাকে মুক্ত করিতে না পারিল, অন্য কোন উপায় দ্বারা তাহার আর যে আত্মমুক্তি ঘটিবে, সে আশা নাই। বাহ্য বিষয়ে মনন নামে যে যে বাসনার উদয় হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সেই বাসনা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবেন; তাহা হইলেই অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধন হইবে।

রামচন্দ্র! তুমি ভোগরাশির বাসনা পরিহার করিয়া তৎপরে যে কিছু ভেদ-বাসনা, সে সকল পরিত্যাগ কর, অনন্তর ভাব ও অভাব পরিহার করত নির্ব্বিকল্পভাবে সুখী হও। মিথ্যা বাহ্য প্রপঞ্চের চিন্তা না করাই বাসনাক্ষয়। এই বাসনাক্ষয়ই মনোনাশ এবং ইহাই অবিদ্যা নাশ বলিয়া কথিত। পরমাত্ম-বিজ্ঞানের গোচরে যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় উপস্থিত হইবে, সে সকলকে প্রশ্রয় প্রদান না করাই উত্তম। অর্থাৎ আমি জানিলাম, আমি জানিতেছি, আমি করিলাম, করিতেছি, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান না করিলেই ক্রমে অসম্বিত্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই অসম্বিত্তি অবস্থাই পরম সুখ; সুতরাং এই অবস্থায় উন্নীত হইবার জন্যই সবিশেষ চেষ্টা করিবে।

হে রঘুনন্দন! তোমার মনে মনে যে যে বিষয়-বাসনাদি বিদ্য-

মান রহিয়াছে, সে সকলকে অপদার্থ বলিয়া মনে কর এবং বীজ-মুখোত্থিত অঙ্কুরের ন্যায় ঐ সকল বিষয়-রাগাদি-পরিপূর্ণ মনকে অজ্ঞান বা বাসনা-বীজের সহিত উন্মুলিত করিয়া পূর্ণাত্মানুভব-রূপ সুধা-স্বাদে পরিতৃপ্ত হও; তাহা হইলে আর কোন কিছুরই বশীভূত হইতে হইবে না।

দ্বাদশাধিক শততমসর্গ সমাপ্ত। ১১২।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! পূর্ব্বে যে বাসনার কথা কহিয়াছি, এই সেই মিথ্যা বাসনা দ্বিতীয় চন্দ্রভ্রমের ন্যায় নিত্যই সমুত্থিত হইতেছে; ইহার পরিহার করা একান্ত পক্ষে কর্ত্তব্য। যাহার বিবেক নাই ও প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তির নিকটই উল্লিখিত বাসনা পরমার্থ সত্যের ন্যায় সুদৃঢ় বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু যাঁহারা যথার্থ বিবেকবান্ প্রাজ্ঞ জন, তাঁহাদের নিকট উহা বন্ধ্যানন্দনের ন্যায় অপ্রকৃত বস্তুরূপে নামমাত্রেই পর্য্যবসিত; সুতরাং বিবেকীর চক্ষে বাসনা আবার কি? রামচন্দ্র! আমি তোমায় সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অজ্ঞ হইও না, প্রাজ্ঞ হও; সম্যক্‌রূপে বিচার কর। বুঝিয়া দেখ, ঐ যে আকাশ, উহাতে একই চন্দ্র আছে; দ্বিতীয় চন্দ্র নাই। তবে যে দ্বিতীয় চন্দ্র দর্শন ঘটে, তাহা কেবল ভ্রান্তিরই বৃথা বিলাস। এইরূপে বুঝিয়া দেখিলে দেখিবে, এ সংসারে তত্ত্বপদ পরমাত্মা ব্যতীত কোন বস্তু বা অবস্তু কিছুই নাই। বস্তুতঃ বিস্তৃত সাগরবক্ষে একমাত্র বারি-প্রবাহ ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষিত হয় কি? পরমাত্মা যিনি, তাঁহার দেহাদি বন্ধন নাই। তিনি নিত্য, বিশুদ্ধ ও বিস্তীর্ণ, তাঁহাতে এই অসন্ময় ভাবা-ভাবের আরোপ তুমি করিও না। জানিও—যত কিছু ভাবাভাব, সকলই আপনার বিকল্প বৈ আর কিছুই নয়। তুমি ত কর্ত্তা নও, তবে কেন এ সকল ক্রিয়ায় তোমার 'আমার' বলিয়া অভিমান। যখন একা-দ্বয় পরমাত্মাই বিদ্যমান, তাঁহা ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই, তখন বুঝিয়া

দেখ, কে আর কি করিবে? আবার ইহাও বলি,—তাই বলিয়া তুমি 'আমি সম্পূর্ণ অকর্ত্তা' এরূপ অভিমানও পোষণ করিও না; কেন না সেরূপ করিলে, তোমার আপন যত্ন-সম্পাদ্য কোন ফলই লাভ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ আপনার নিশ্চেষ্টতায় কোন ফলই সিদ্ধ হইবার নয়; সুতরাং তুমি কর্ত্তা ও অকর্ত্তা এই দুই প্রকার অভিমান-শূন্য ও স্বস্থ হইয়া অবস্থান কর।

হে রঘুকুলনায়ক! তুমি যদি অভিমান পরিহারে অক্ষম হইয়া কর্ত্তা হও, তাহা হইলে তোমার সে কর্ত্তৃত্ব দোষাবহ হইবে। অন্যথা, অকর্ত্তা হইয়া অক্ষমতা ক্রমে যদি তুমি কর্ত্তার ন্যায় হও, তবে তাহা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইবে না। কেন না, যাহার নিষ্ক্রিয়াত্মজ্ঞান আছে, সে দেহের ক্রিয়া ও কর্ত্তৃত্বাদি আত্মায় আরোপ করে না। ক্রিয়াফল যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা উপাদেয় বটে, আর যদি অসত্য হয়, তবে তাহার হেয়তাই নিশ্চিত। পরব্রহ্মই উপাদেয় বিষয়, তাহাতেই আসক্তি হওয়া আবশ্যক; সুতরাং উল্লিখিত হেয় ক্রিয়ায় আসক্তি-যুক্ত হওয়া সঙ্গত নহে। যখন দেখা যায়, সকলই ইন্দ্রজাল-প্রায় মায়াময় ও অবস্তু, তখন তাহাতে অস্থাই বা কি আর হেয়তা বা উপাদেয়তা-দৃষ্টিই বা কিরূপে তাহাতে সম্ভবিতে পারে? যাহা মিথ্যা বিষয়, তাহার কোনরূপ কল্পনাই হইতে পারে না।

হে রঘুনন্দন! সংসারের বীজকলিকা এই অবিদ্যা যদিও উক্ত রূপে অবিদ্যমানা, তথাপি উহা বিদ্যমানা বা সৎস্বরূপার ন্যায় স্ফারতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে দেখিতেছ, বিশাল অসার সংসারচক্র, জানিও—ইহাই বটে মোহবিধায়িনী মনোবাসনা। সুন্দর বংশযষ্টির ন্যায় ঐ সংসারবাসনার অন্তরে সার নাই, উহার অন্তর কেবল শূন্যতাময় কোটরে অম্বিত। নদীর তরঙ্গমালা ভাঙ্গিয়া দিলেও তাহার যেমন শান্তি হয় না, তেমনি ঐ সংসার-বাসনার উচ্ছেদ করিলেও উহা নষ্ট হয় না। ফলে বাসনার বিনাশ করিতে হইলে উহার মূলীভূত অজ্ঞান নাশই আবশ্যক। নির্ঝরের তরঙ্গরাজির ন্যায় ঐ বাসনা মৃদু বটে, অথচ উহা অতি তীক্ষ্ণ; হস্তে করিয়া ধরিতে যাও, উহা ধরিয়া

রাখা যায় না। মনে কর, স্বপ্নে একটী নদী দেখা গেল, ঐ নদী স্বপ্ন-সাময়িক স্নান-পানাদি কার্য্য সাধন করিয়া দিলেও উহা যেমন একটা আকার বা ভাবমাত্রেই পরিনিষ্ঠিত, পরন্তু প্রকৃত অর্থক্রিয়ার উপযোগিতা উহার কিছুই নহে, তেমনি অবিদ্যা বা বাসনাও কার্য্য-কর কারণকলাপের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু সদর্থ ক্রিয়ার সহিত ইহার উপযোগিতা কিছুই নাই। এই যে বাসনার কথা কহিতেছি, উহার আকার কখন বক্র, কখন স্পষ্ট, কোথাও দীর্ঘ এবং কোথাও বা খর্ব্ব বলিয়া অনুভূত হয়, আবার কখন স্থির ও কখন চঞ্চল আকারে উহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহার প্রসাদে এই সকল পদার্থাকার আবির্ভূত, তাহা হইতে উহারা পরস্পর ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাম! এই বাসনাময় সংসারচক্র যদিও অন্তঃসার-শূন্য, তথাপি উহা সর্ব্বত্র সারবান্ ও সুন্দর বলিয়া প্রতীত। উহার অস্তিত্ব কোথাও নাই বটে, তথাপি উহা সর্ব্বত্রই লক্ষিত। উহা জাড্যময় হইলেও চিন্ময়বৎ বিলসিত। এই বাসনা বা অবিদ্যা মনের স্পন্দন অবলম্বন করিয়াই জীবিত। যদিও উহা কুত্রাপি নিমেষমাত্র স্থির নহে বটে, তথাপি উহার স্থিরপ্রতীতি প্রতিভাত হইয়া থাকে। উহা সত্ত্বগুণ-বলে বহ্নিশিখার ন্যায় উজ্বল ও বিশুদ্ধ হয় বটে, তথাপি তমোগুণে মসীর ন্যায় উহা মলিনা। পরমাত্মার সন্নিধ্য বশে এই বাসনা বা অবিদ্যা বিবিধাকারে চালিত হয় বটে, কিন্তু তাহারই সাক্ষাৎকার লাভে পুনরায় উহা খণ্ডিত হইয়া যায়। পরমাত্মার নির্ম্মল আলোকে থাকিলেও উহা ম্লান হয়; পরন্তু তমোগুণের অন্ধকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ অবিদ্যা মরীচিকার ন্যায় শূন্যভাবা ও নানা বর্ণে সমুল্লসিতা। উহা তৃষ্ণারূপে কৃষ্ণ সর্পীর ন্যায় ক্ষীণা ও কোমলা-বয়বা হইলেও স্বভাবতঃ কর্কশা ও বিষময়ী এবং ললনার ন্যায় চপলা, লুব্ধা ও ভীষণা। স্নেহ ক্ষয় হইলে দীপশিখার ন্যায় উহা আপনা হইতেই আশু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার স্নেহ বিনাও সিন্দূর-ধূলি-রেখার ন্যায় স্নেহবতী হইয়া প্রকাশ পায়। ঐ অবিদ্যা দীপশিখা ও সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চলা ও ক্ষণ-বিনাশিনী, এবং মুগ্ধ জনগণের ভয়-

বিধায়িনী ও বক্রস্বভাবা। কেবল জাড্যময় আশাতেই উহার অবস্থিতি। ক্ষণ-ভঙ্গুর বিদ্যুতের ন্যায় বাসনার উদয় হয়; পরে যত্নের সহিত যাহাকে গ্রহণ করে, তাহাকেই দগ্ধ করিতে থাকে। উহা বারম্বার আবির্ভূত হয় এবং বারম্বার বিলয় পাইয়া যায়, অন্বেষণ করিলেও আর পাওয়া যায় না। উহা প্রার্থনা না করিলেও আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, স্মরণীয় হইয়াও অনর্থ উদ্ভাবন করে এবং অকাল-সম্ভূত কুসুমমালার ন্যায় কোথাও উহা মঙ্গলার্থ অভিনন্দিত হয় না। এই ভ্রমবিধায়িনী অবিদ্যাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে পারিলেই সুখোদয় হইয়া থাকে। উহা থাকিতে সুখ-সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দুঃস্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় উহাকে অনর্থপ্রদ বলিয়াই বোধ হইবে। ঐ বাসনা বা অবিদ্যা প্রতিভাস বশতই মুহূর্ত্তমধ্যে এই ত্রিজগৎ উৎপাদন করিয়া আবার তাহা গ্রাস করে। ইহারই প্রভাবে লবণ রাজার মুহূর্ত্ত মাত্র সময় বহু বৎসর বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র যে এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহারও মূলে ইহার প্রভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই বাসনার প্রসাদেই কান্তা-সহবাসে সুখী লোকদিগের একটী রাত্রি কান্তাবিরহী জন-গণের নিকট বৎসরবৎ অতি দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। লোক-মাত্রেই ভ্রান্তিগ্রস্ত; তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সুখী, তাহাদের সুখ-ভোগের কাল অল্পরূপে অনুভূত হইয়া কাটিয়া যায় আর যাহারা দুঃখী, তাহাদের দুঃখকাল যে দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হয়—কিছুতেই যে তাহা অতীত হইতে চায় না, এই বৈষম্যের কারণ কেবল সেই বাসনারই মহিমা। এই বাসনা বা অবিদ্যার সন্নিধিমাত্রেই জগৎপ্রপঞ্চের উপর যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা বস্তুতঃ নহে। আলোক-কার্য্যের প্রতি প্রদীপের যেমন কর্তৃত্ব, জানিও—উহাও সেইরূপই। চিত্রলিখিত স্তন-জঘনবতী রমণী যেমন রমণীর কোনই কার্য্য করিতে পারে না, তেমনি এই পূর্ব্বানুভূত অর্থের বাসনারূপিণী অবিদ্যাও কোন কিছুই সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহে। উহার আকার মনোরাজ্যের ন্যায়; উহাতে সত্যের লেশ মাত্র নাই। উহা শত সহস্রশাখায় সমন্বিত হইলেও

পরমার্থতঃ কিছুই নহে। মরুস্থলীস্থ মৃগতৃষ্ণা যেমন মুগ্ধ মৃগদিগকে প্রতারিত করে, এই আড়ম্বরময় বাসনা বা অবিদ্যাও তেমনি অজ্ঞ লোকদিগকে বিড়ম্বিত করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বিজ্ঞ লোক, তাঁহাদের কিছুই করিতে পারে না। ফেনশ্রেণীর ন্যায় উহা যেমন যেমন উত্থিত হয়, অমনি বিলয় পাইয়া যায়। বিরাম-বিচ্ছেদ নাই, নিরন্তরই ঐরূপ চলিতেছে। উহা নীহাররাজির ন্যায় কখন চঞ্চলাকৃতি আবার কখন কল্পান্তবাত্যার ন্যায় ভুবন-বিবর আক্রমণ করিয়া রজোধূসরা ও ভীষণা হইয়া বিচরণকারিণী। উহা ধূমরাজির ন্যায় অঙ্গ-সংলগ্ন হয় এবং অনলের ন্যায় দাহ প্রদান করে। অন্তঃ-সলিলা ধূমশ্রেণীর ন্যায় অন্তরে আত্মচৈতন্যরূপ রস ধারণ করিয়া জগৎ ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। মেঘমুক্ত বারিধারার ন্যায় উহা অতি দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হয় এবং অসার সংসার-আকারে পরিণত হইয়া তৃণময় রজ্জুসদৃশ সুদৃঢ়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। উহা নর্ত্তিত তরঙ্গে কল্পিত উৎপলমালার ন্যায় কিছুই নয়, এবং মৃণালীর ন্যায় জড়তাময়, পঙ্কমগ্ন ও বহুচ্ছিদ্রময়ী। লোকে উহাকে বর্দ্ধনশীল হইতে অবলোকন করে বটে, কিন্তু ফলতঃ উহার বৃদ্ধি নাই। উহা বিষমিশ্রিত মোদকের ন্যায় আপাততঃ মধুর বটে; কিন্তু পরিণামে উহা অত্যন্ত দারুণ। উহা যখন তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নাশ পায়, তখন দীপশিখার ন্যায় কোথায় যে উহার বিলয় হইয়া যায়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কুহেলিকার ন্যায় যদিও সম্মুখে দৃষ্ট হয়; কিন্তু তথাপি গ্রহণ করিতে গেলে কিছুই উহার থাকে না। পরমাণুময় ধূলিমুষ্টি ছড়াইয়া দিলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় এবং আকাশগত নীলিমা যেরূপ অকারণে আলোকিত হয়, ঐ অবিদ্যাও তেমনি বৃথাই লক্ষিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় চন্দ্র-দর্শনের ন্যায় উহা ভ্রান্তিমাত্র বৈ কিছুই নয়। স্বপ্ন যেমন ভ্রম জন্মাইয়া থাকে, উহাও তেমনি ভ্রম উৎপাদন করে। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তির নিকট তীরস্থিত বৃক্ষরাজির চলন অনুভব হয়, উহার গতিও সেইরূপই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই বাসনায় চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, জনগণ তখন আকুল হইয়া দীর্ঘকাল স্বপ্ন-ভ্রমের ন্যায় এই দীর্ঘ সংসার কল্পনা করে। এই বাসনা দ্বারা আত্মা

উপহত হইলে চিত্ত মধ্যে সাগরতরঙ্গের ন্যায় বিচিত্র বিভ্রম সকল এক একবার উত্থিত হইয়া আবার বিলয় পাইতে থাকে। ইহার এমনই চমৎকার প্রভাব যে, যিনি সর্ব্বমনোজ্ঞ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিও সেই প্রভাবে অসৎ-স্বরূপে অবলোকিত হয়েন, আবার যাহা অমনোহর ও অসত্য, সেই জগৎও সত্যরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাগুরা যেমন পক্ষীকে আক্রমণ করে, তেমনি ঐ উৎপন্ন বাসনারূপিণী অবিদ্যা বিষয়াকারতা প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যিনি করুণার অক্ষয় আধার, স্নেহে যাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা ও স্তন হইতে ক্ষীরধারা ক্ষরিত হয়, সেই যে আনন্দময়ী জননীমূর্ত্তি, তাহাও সেই অবিদ্যাই ধারণ করিয়া থাকে, আর যে সেই পরম প্রণয়াস্পদ গৃহিণী মূর্ত্তি, তাহাও সেই অবিদ্যারই রূপ। যিনি সুধাক্ষরণে ত্রিজগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছেন, সেই সুধাময় সুধাকর-মণ্ডলকে ঐ অবিদ্যাই আবার কখন কখন বিষময় করিয়া তোলে। ঐ ভ্রম-বিধায়িনী অবিদ্যার প্রভাবেই ভ্রান্ত মানবগণ কখন কখন অরণ্য-মধ্যস্থিত নিঃশব্দ স্থাণুদিগকে সশব্দে নৃত্য-পরায়ণ উন্মত্ত বেতালদলের ন্যায় অবলোকন করে। সন্ধ্যা প্রভৃতি কালে লোষ্ট, পাষাণ ও ভিত্তিগুলিকে যে সর্প ও অজগরাকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই অবিদ্যারই প্রসাদ। যেমন একই চন্দ্র ভ্রমবশতঃ দুইটী বলিয়া বোধ হয়, তেমনি একই পদার্থ অবিদ্যাবলে অনেকরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। নিজের মৃত্যু যেমন বহু পরে বলিয়া স্থির থাকিলেও স্বপ্নাবস্থায় তাহা উপস্থিতের ন্যায় দেখা যায়, তেমনি বহুদূরে যে বস্তু রহিয়াছে, তাহা অবিদ্যার প্রভাবে সমীপস্থ বলিয়া অনুভূত হয়। অতি দীর্ঘ কালও উহার প্রভাবে ক্ষণকাল বলিয়া প্রতীত হয়। যাহারা বিরোহী লোক, তাহাদের নিকট ক্ষণ-পরিমিত কাল যেমন অতি দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হয়, তেমনি আবার কখন কখন ক্ষণ-পরিমিত কাল রৌদ্র প্রলয়-নিশার ন্যায় ভয়ঙ্কর বর্ষপ্রতিম দীর্ঘ বলিয়াও বোধ হইয়া থাকে।

হে রঘুনন্দন! এমন কোনই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা এই উদ্ধতপ্রকৃতি অবিদ্যা দ্বারা সাধিত না হয়। এই অবিদ্যা অকিঞ্চন হইলেও ইহার প্রভাব যে কতদূর, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। এই

অবিদ্যারূপিণী বিষয়বুদ্ধিকে সহসা নিরোধ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই ; তবে যদি একমাত্র বিবেকবুদ্ধি যত্ন প্রকাশ করে, তাহা হইলেই উহাকে নিরোধ করিতে পারে। স্রোত বন্ধ করিতে পারিলে নদী যেমন আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়, তেমনি ঐ অবিদ্যা-নিরোধে সক্ষম হইলে মনোনদী শুষ্ক হইয়া যায়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! যাহা বিদ্যমান নাই, যাহা অতি কোমল ও অতি তুচ্ছ, সেই এই মিথ্যা ভাবনা জগৎটাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে! ঐ অবিদ্যার রূপ নাই, আকার নাই বা চেতনা নাই, উহা নিজে অসত্য ও বিনশ্বর, তথাপি যে জগৎকে অন্ধ করিয়াছে, ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার! ঐ পেচক-নেত্রনিভা অবিদ্যা আলোকে নষ্ট হইয়া যায় এবং তমোমধ্যে বিকাশ পাইয়া থাকে ; কি আশ্চর্য্য, উহাই আবার জগৎকে অন্ধ করিয়াছে! ঐ অবিদ্যার ক্রিয়াশক্তি মাত্র আশ্রয় বলিয়া সর্ব্বদাই উহা কুকর্ম্মে আসক্ত এবং উহার জ্ঞানশক্তি নাই বলিয়া উহা দেহকেও জানিতে অক্ষম ও বোধ-বিলোকন সহ্য করিতেও অপারগ। কি বিচিত্র কথা, উহতেই কিনা এই জগৎটা অন্ধ! ঐ অবিদ্যা অনবরত অনাচারে নিরতা এবং যাহারা মূঢ় জন, তাহাদেরই উহা কমনীয়া। কি আশ্চর্য্য, ঐ অসত্য অবিদ্যার প্রভাবেই এই জগৎ অন্ধ! উহা অনন্ত দুঃখে সমাকুল, সততই মৃতের ন্যায় বর্ত্তমানা ও বোধপরিহীনা, উহা হইতেই যে এই জগৎটা অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের কথা! যাহা কামকোপে পরিপূর্ণ, তমোভাবের বিস্তারে যাহার বক্রতা এবং জ্ঞানের উদয়ে যাহার দেহনাশ, সেই এই অবিদ্যার এবম্বিধ জগদন্ধীকরণ-শক্তি একান্তই বিস্ময়কর! যাহারা আত্মজ্ঞানে বিমূঢ়, ঐ অবিদ্যা তাহাদেরআস্পাদস্বরূপ। উহা নিজে জাড্যদোষে জীর্ণভাব উপগত এবং দুঃখভরে অনবরত উহা প্রলাপ- কার্য্যে নিরত। বড়ই বিচিত্র ব্যাপার, এই অবিদ্যাই কিনা জগৎটা অন্ধ করিয়া রাখিল! কোন পুরুষ যখন ঐ অবিদ্যার তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহা সেখান হইতে পলায়ন করে ; কিন্তু কি নির্লজ্জ, আবার আসিয়া পুরুষ-সঙ্গ করে, এবং পুরুষানুরাগিণী ও ক্রিয়াস্বরূপিণী হইয়া পুরুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে! ইহা প্রকৃতই বিস্ময়কর বিষয়। বলিতে

কি, যে পুরুষের সাক্ষাৎকার সহ্য করিতেও ঐ অবিদ্যা অক্ষম,কি আশ্চর্য্য—সেই আবরণরূপিণী অবিদ্যারমণীই কি না পুরুষকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। যাহার চেতনা নাই, যাহা নষ্ট না হইলেও নষ্ট হয়, তাদৃশ কঠোর-স্বভাবা স্ত্রীরূপিণী অবিদ্যা পুরুষকে অন্ধ করিয়া রাখিল, ইহা প্রকৃতই আশ্চর্য্য!

হে প্রভো! যাহা কেবল বহুবিধ দুশ্চেষ্টায় নিরত ও জনন-মরণাদি বিবিধ সুখ-দুঃখের উৎপাদক, সেই ঐ মনো-গুহানিবাসিনী বিষমা বাসনা কিরূপে নির্ম্মূল হইবে?

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পুরুষের এই যে নিবিড়তর মহা-মোহান্ধভাব, ইহা অবিদ্যাবিভব হইতে উৎপন্ন। কিরূপে ইহার বিনাশ সাধন হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! যেমন ভাস্করের আলোক মাত্রেই তুষারকণিকা ক্ষণমধ্যে বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইবামাত্রই ঐ অবিদ্যার উচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত না মোহ-ক্ষয়করী আত্মদর্শনেচ্ছা আপনা হইতে আবির্ভূত হয়, ততদিন যাবৎ ঐ অবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখরূপ নিবিড় কণ্টক-সমাচিত সংসাররূপ শৈলপ্রপাতে আত্মার সহিত দেহাভিমানী অহঙ্কারকে পাতিত করিয়া বারম্বার বিলুণ্ঠিত ও বিক্ষো-ভিত করিতে থাকে। হে রাঘব! ছায়া যদি আতপতাপ অনুভব করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার ছায়াত্ব যেমন নষ্ট হইয়া যায়, এই অবিদ্যাও তেমনি আত্মদর্শন করিতে উদ্যত হইবামাত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি এককালে সকল দিকে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হয়, তাহা হইলে যেমন কুত্রাপি ছায়ার অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি সর্ব্বগত পরমাত্মা সাক্ষাৎকৃত হইলে অবিদ্যা

আপনা হইতে সম্পূর্ণ বিলয় পাইয়া যায়। রামচন্দ্র! জানিও—ইচ্ছা মাত্রই অবিদ্যা, তাহার বিনাশ সাধনই মোক্ষ। সঙ্কল্পমাত্রের পরিহার করিলেই সেই মোক্ষসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। বাসনারূপিণী যামিনীর অবসানে মনোরূপ আকাশে চিদাদিত্যের কিঞ্চিন্মাত্র অভ্যুদয় ঘটিলেই অন্ধকার অর্থাৎ অবিদ্যাবরণ অপসারিত হইয়া যায়। যেমন সূর্য্যোদয়ে রাত্রি কোথায় চলিয়া যায়, তেমনি বিবেকের আবির্ভাবে অবিদ্যা কোথায়—কোন্ অজ্ঞাত স্থানে যে বিলীন হয়, তাহার আর সন্ধান থাকে না। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলেই বেতাল-বাসনায় বাসিত বালকের চিত্তে যেমন বেতালভয় গাঢ় হইয়া উঠে, অন্য সময়ে হয় না, তেমনি চিত্তস্থ বাসনার প্রাচুর্য্যবশতই সংসার-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়া পড়ে; পরন্তু বাসনার যখন ক্ষয় হয়, তখন উহা ঘটে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! জানিলাম, এই যে কিছু দৃশ্য বস্তু, তৎসমস্তই অবিদ্যা। আত্মভাবনা দ্বারাই ঐ অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বলুন, ঐ আত্মা কি প্রকার?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! যাঁহাতে বিষয়ব্যাপ্তি বা অবিদ্যাবরণ নাই, যিনি সর্ব্বগামী, পূর্ণস্বভাব ও আখ্যাবর্জ্জিত চিন্ময় বস্তু, তাঁহাকেই আত্মা এবং তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হয়। হে নিষ্পাপ! এই ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই সর্ব্বদা আত্মা বলিয়া বিদিত। ইহার কোথাও অবিদ্যাভিধেয় কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। সকলই নিত্য অক্ষত চিদ্ঘন ব্রহ্ম। মনোনাম্নী কোন কল্পনারই অস্তিত্ব তাহাতে নাই। এই যে পরিদৃশ্যমান মিথ্যা জগত্রয়, ইহার কিছুই জন্মে না বা মরে না। এই দৃশ্য বিকারী পদার্থের কুত্রাপি বাস্তবিক সত্তা নাই। যিনি কেবলই প্রকাশময়, সর্ব্বানুগত, সৎস্বরূপ ও অক্ষত, যাঁহার বিষয়ব্যাপ্তি কিছুমাত্র নাই, সেই একমাত্র চিন্মাত্র বস্তুই সতত বিদ্যমান। সেই পরমাত্মা নিত্য, বিতত, বিশুদ্ধ, উপদ্রব-বর্জ্জিত, শান্ত ও নির্ব্বিকারভাবে সমুদিত; তাঁহাতে যে চিৎস্বভাবের পরিপন্থী আবরণরূপে প্রথম উল্লাস ও বিক্ষেপ-বিশেষের কল্পনা আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়, তাহাই মন নামে প্রসিদ্ধ। সেই যে সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বগামী মহাত্মা মনোদেবতা, তাঁহা

হইতেই সলিল-সমুল্লসিত লহরীর ন্যায় বিবিধ বিভাগ-কল্পনা-শক্তি সমুত্থিত হইয়াছে। এই সংসারের বস্তুগত্যা বিদ্যমানতা কিছুই নাই। ইহা সেই একাদ্বয় শান্ত বিতত পরমাত্মাতেই সিদ্ধবৎ প্রতিভাত হইতেছে। বহ্নি-শিখা যেমন বায়ু হইতে আবির্ভূত হইয়া আবার বায়ুবশেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি এই সঙ্কল্প-সিদ্ধ সংসার সঙ্কল্পবলেই পুনরায় বিলয় পাইয়া থাকে। সঙ্কল্প পুরুষপ্রযত্নে সুসিদ্ধ; সেই সঙ্কল্পবলেই এই সংসার-রূপিণী অবিদ্যা ভোগাশারূপে পরিণত হইয়াছে। পরন্তু যেইমাত্র পুরুষ-কার-সিদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ঐ সঙ্কল্পের তিরোধান ঘটিবে, অমনি সেই অবিদ্যারও অবসান হইবে।

রামচন্দ্র! 'আমি ব্রহ্ম নহি' ঈদৃশ সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াই মন বদ্ধ হয় এবং 'সমস্তই ব্রহ্ম' এইরূপ প্রগাঢ় সঙ্কল্পবলেই মন মুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যায়, সঙ্কল্পই পরম বন্ধন এবং সঙ্কল্পই মোক্ষ। অতএব আমি বলি, তুমি সঙ্কল্প জয় করিয়া যথেপ্সিত কার্য্য সম্পাদন কর। দেখ, বালকেরা কখন কখন আপন ইচ্ছায় আকাশটাকে একটা পদ্মিনী বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়। পরে ভাবনাক্রমে দেখিতে থাকে, তাহাতে স্বর্ণপদ্ম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তাহার সৌরভ-গৌরবে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। বৈদূর্য্যমণিময় মধুকর সকল ঐ পদ্মদলের উপরি উপরি ব্যাকুলভাবে উপবেশন করিতেছে এবং ঐ পদ্মিনী যেন আপনার মৃণাল-রূপ বিশাল বাহু সকল বিস্তার করিয়া প্রকাশমান চন্দ্রময় রশ্মিমণ্ডল দেখিয়া হাস্য করিতেছে। বালকের যেমন এবম্বিধ কল্পনা বিস্তার হয়, তেমনি যাহারা মূঢ়লোক, তাহারাই এই ভববন্ধনকরী চঞ্চলপ্রকৃতি অবিদ্যাকে অনন্ত দুঃখপরম্পরার নিমিত্তই কল্পনা করিয়া থাকে। ঐরূপে অবিদ্যা-দর্শী ব্যক্তিবর্গই স্ব স্ব সঙ্কল্পবলে 'আমি দুঃখী, আমি ক্ষীণ, আমি বদ্ধ, আমি কর-চরণাদিমান্' ইত্যাকার ভাবনার অনুরূপ ব্যবহারে আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা 'আমি দুঃখী নহি, আমার দেহ নাই, কোন্ আত্মারই বা বন্ধন ঘটিয়া থাকে?' ইত্যাকার ভাবনার অনুরূপ ব্যবহারে নিরত, তাহারাই মুক্ত হইয়া থাকে। 'আমি মাংস নহি, অস্থি নহি, আমি দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ' এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ পুরুষই 'ক্ষীণাবিদ্য' আখ্যায়

অভিহিত। দেখ, নভোমণ্ডলের নীলিমা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও উহাকে যেমন ভুবনান্তরচারী জনসমূহের মধ্যে কেহ কেহ প্রবল সঙ্কল্পবলে সুমেরু শিখর-সম্ভূত বৈদূর্য্যমণির কান্তি বলিয়া কল্পনা করে এবং কেহ কেহ বা সৌরকর-দুর্ভেদ্য অত্যূর্দ্ধস্থান-স্থিত তিমিরস্তোম বলিয়া স্থির করিয়া লয়, তেমনি যাহারা অপ্রবুদ্ধ পুরুষ, তাহাদের নিকটই ঐ অবিদ্যা আত্মভিন্ন বস্তুতে আত্মভাবনারূপ কল্পনা করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! যাঁহারা প্রবুদ্ধ পুরুষ, তাঁহাদের কখন উক্ত প্রকার ভাবনা হয় না।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার বাক্যভঙ্গীতে বুঝিলাম, নভোমণ্ডলের ঐ যে নীলিমা, উহা সুমেরুশৈলস্থিত নীলকান্ত-মণির কান্তিচ্ছটা নয়, এবং উহা যে প্রগাঢ় তিমিরপুঞ্জ, তাহাও নহে। তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই, ঐ নীলিমা কে করিল? উহা কি প্রকার? আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! নীলত্ব যে আকাশের গুণ, ইহা ত বলা যায় না; কেন না আকাশও শূন্যস্বরূপ! সুমেরুশৈলে পদ্মরাগাদি অপরাপর কতই মণি রহিয়াছে, তাহাদের যখন প্রভার অভাব আছে, তখন উহাকে মেরুস্থিত নীলকান্তমণির প্রভা বলিয়াও বর্ণন করা যায় না। ঐ নীলিমাকে তমস্তোম বলিয়া ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নহে; কেন না, তদুপরি তেজঃপুঞ্জময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। তাহার তেজ চারিদিকে প্রসারিত, এবং অন্ত-মধ্য-বিস্তৃত আকাশের পর-পারেও প্রকাশভাবে বিরাজিত; সুতরাং ঐ স্থানে অন্ধকারের অবস্থান একান্তই অসম্ভব। অতএব হে সুভগ! জানিও, ঐ যে নীলিমা লক্ষিত হয়, উহা কেবল শূন্যতা বৈ আর কিছুই নয়! ঐ নীলতা অবিদ্যারই অনুরূপ সহচরীর ন্যায় লক্ষিত; কেন না, অবিদ্যা অসন্ময়, আর ঐ যে নীলতা, উহাও অসন্ময়। তবে উহাতে নীলতা দেখা যায় কেন? তাহার কারণ এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে দর্শনশক্তি, তাহার একটা সীমা আছে। সেইজন্যই দৃষ্টি যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায়, ততদূর পর্য্যন্ত আর নীলতা দেখা যায় না। যেখানে গিয়া দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত কিম্বা দৃষ্টির দৃশ্য-দর্শন-শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়, সেইখানেই নীলিমা অবলোকিত হইয়া থাকে। কাজেই বলা যায়, ঐ নীলতার কারণ নিজেরই চাক্ষুষ জ্যোতির অভাব; অর্থাৎ

অজ্ঞ লোক আপনারই চাক্ষুষ তিমির আকাশে আরোপিত করিয়া বলিয়া থাকে যে, আকাশই নীলবর্ণ-ময়। ফলে কিন্তু চাক্ষুষ তেজের অব্যাপ্তি স্থান অন্ধকার; সে অন্ধকার নিজেরই চক্ষুর দোষ। অনভিজ্ঞ লোক এ তত্ত্ব জানে না; তাই বলে, আকাশ নীলিমময়। প্রকৃত কথা, দৃষ্টি-দোষবশতই আকাশে কালিমা দেখা যায়। বস্তুগত্যা আকাশের তাহা কালিমা নয়, সুতরাং আকাশে কালিমা দেখা গেলেও তদভিজ্ঞলোকের যেমন কালিমা জ্ঞান হয় না, তেমনি অবিদ্যারূপ তিমিরকেও তুমি আকাশ-নীলতার ন্যায় বিদিত হও। সুধীগণ বলিয়া থাকেন, এক মাত্র সঙ্কল্পবর্জ্জনই অবিদ্যা-নিগ্রহের উপায়। আর সেই যে উপায়, তাহাও দুষ্কর নয়; বরং সুকর। হে সাধো! আমি মনে করি, আকাশবর্ণের ন্যায় এই জাগতিক ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাকে একবারে ভুলিয়া যাওয়াই মঙ্গলকর। স্বপ্নাবস্থায় 'আমি মরিলাম' এইরূপ সংকল্প করিয়া লোক তখন প্রকৃতই যেমন মরণ-দুঃখ উপগত হয়; আবার 'আমি প্রবুদ্ধ হইলাম' এইরূপ সংকল্প দ্বারা যেমন সুখ বা স্বপ্ন-দুঃখের অবসান লাভ করে, এইরূপ মনও মোহসংকল্পে মূঢ় হয় আবার প্রবোধসংকল্পে প্রবোধার্থ ধাবিত হইয়া থাকে। 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ সংকল্প যদি দৃঢ় হইয়া উঠে, তাহা হইলে অবিদ্যা তখন শাশ্বতীরূপে প্রতিভাত হয়, যখন ঐরূপ সঙ্কল্পের বিস্মরণ ঘটে, তখন আবার ঐ অবিদ্যা নশ্বরীরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের ভাবনারূপিণী অবিদ্যা বা বাসনাই সর্ব্বপ্রাণীর মোহ উৎপাদন করে। যতদিনে না আত্মদর্শন হয়, তাবৎ উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যখন আত্মদর্শন হয়, তখনই উহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রিগণ যেমন তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ প্রতিপালন করেন, তেমনি মন যে যে বিষয়ের অনুসন্ধান করে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সেই মুহূর্ত্তেই সেই সেই বিষয়গুলি সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জন্য ইহা নিশ্চয় বলা যায়, যে, যে জন প্রতিনিয়ত ব্রহ্মভাবনায় নিবিষ্ট হইয়া এই জগদ্ব্যাপার হইতে মনের অনুসন্ধান নিবারণ করে, তাহারই শান্তিলাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যখন আদিতে উৎপন্ন হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানেও উহার বিদ্যমানতা নাই। সুতরাং এই যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, তৎসমস্তই একমাত্র অনিন্দিত

শান্ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এই ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ঈদৃশ বিকার-বিহীন অনাদি অনন্ত অসঙ্কোচ মননীয় পদার্থ আর কেহ কি কখন কুত্রাপি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? অতএব যত্নের সহিত পরম পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সুনিপুণ বুদ্ধিবলে চিত্ত হইতে ভোগবাসনার ভাবনাকে সমূলে উন্মূলিত করা বিধেয়। জরা-মরণের মূলীভূত এই যে বিষম মোহ সমুদিত রহিয়াছে, ইহা সেই বাসনারই বিলাস-বিভূতি। কারণ, বাসনাই সেই সেই মোহ-কারণের আকারে প্রকটিত হইয়া শত শত আশাপাশে সমুল্লসিত হইতেছে। এই আমার পুত্র, এই আমার ধন, এই সেই আমি, এই আমার যান, বাহন ও গৃহ, ইত্যাদি ইন্দ্রজালরূপে বাসনাই কেবল বিকাশ পাইতেছে। বায়ু যেমন কখন কখন জলহিল্লোলে নদীর আকার উৎপাদন করে, তেমনি এই শূন্য শরীর মধ্যে এই অনন্ত বাসনাই পরমাত্মার অহম্ভাবরূপ অস্থির কল্পনা করিয়া থাকে।

হে বিবেকশালিন্! তুমি পরমার্থদৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে—'আমার ও আমি' এই দুইটী একবারে কিছুই নয়। একমাত্র আত্মতত্ত্বই সত্য; তদ্ব্যতীত আর কোনও কিছু কদাপি সত্য নয়। আকাশ, অদ্রি, স্বর্গ, উর্ব্বী, ও বিবিধ নদীনিচয়, ইত্যাদি করিয়া যত কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই বারম্বার দৃষ্টিসমকালীন সৃষ্টি হইতেই জন্মিতেছে অর্থাৎ সে সকলই কেবল ভ্রম বৈ আর কিছুই নয়। কেননা, ঐ দৃষ্টিসৃষ্টিরূপিণী অবিদ্যাই বিবিধ বিচিত্র নব নব পদার্থরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। যেমন রজ্জুর অজ্ঞানে ভুজঙ্গভ্রম উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মার অজ্ঞানে অবিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। আবার যেমন রজ্জুজ্ঞান জন্মিলে ভুজঙ্গভ্রম তিরোহিত হয়, তেমনি আত্মজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা বিলয় পাইয়া যায়।

হে রঘুনন্দন! যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকটই এই আকাশ, অদ্রি, সমুদ্র, উর্ব্বী, ও নদী প্রভৃতি বিবিধ পদার্থময়ী অবিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ জন, তাঁহাদের নিকট ঐ অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা মনে করেন, এ সকলই স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নয়। রজ্জু ও সর্প এই দুই বিকল্প-কল্পনা অজ্ঞ জনেরাই করিয়া থাকে; কিন্তু বিজ্ঞ জনের সেরূপ কল্পনা নাই, তাঁহারা কেবল একমাত্র অকৃত্রিম ব্রহ্মদৃষ্টিই

স্থির করিয়া লয়েন। তাই বলিতেছি,—রাম! তুমি অজ্ঞ হইও না, প্রাজ্ঞ হও। প্রাজ্ঞ হইয়া সংসার বাসনা জয় কর। দেখ, যাহা আত্মা নয়, তাহাতে আত্মভাবনা করিয়া কেন বৃথা বিলাপ করিতেছ!

রামচন্দ্র! ভাবিয়া দেখ, যাহার জন্য তুমি সুখ-দুঃখে বিহ্বল হইয়া পরাভূত হইতেছ, এই সেই তোমার জড় ও মূক দেহ কে? তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যেমন কাষ্ঠ ও জতু এবং বদর ও কুণ্ড,ইহারা পরস্পর মিলিত হইলেও এক পদার্থ নয়, জানিও তেমনি দেহ এবং দেহবান্‌ও কখন এক হইতে পারে না। যেমন ভস্ত্রা দগ্ধ হইয়া গেলেও তদন্তর্গত মারুত দগ্ধ হয় না, তেমনি দেহ নাশ হইলেও আত্মবিনাশ ঘটে না।

হে রঘুবংশ-ধুরন্ধর! 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি রূপ ভ্রান্তি তুমি মৃগতৃষ্ণার ন্যায় মনে করিয়া পরিত্যাগ কর এবং যাহা সত্য, তাহাই আশ্রয় কর। কি আশ্চর্য্য! যাহা সত্য, তাহাই যে ব্রহ্ম, নরগণ এ কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। আর যাহা অবিদ্যানামক মিথ্যা পদার্থ, তাহাই তাহাদের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া রহিয়াছে। হে রঘূদ্বহ! অবিদ্যাকে তুমি প্রশ্রয় দিও না। চিত্ত যদি অবিদ্যায় আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে আর দুঃখ-কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকে না। ঐ অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবেই মিথ্যা এবং প্রকৃতই অনর্থবিধায়িনী। মনের মননব্যাপারে বৃথাই উহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং বিবিধ দুঃখদায়িনী হইয়া মহামোহে পর্য্যবসিত হয়। ঐ মিথ্যা অবিদ্যা সুধাময় চন্দ্রবিম্বেও রৌরব নরক কল্পনা করিয়া লইয়া নরক-বাস-জনিত দাহ-তাপ-দুঃখ অনুভব করাইয়া থাকে। এমন সরোবর আছে, যেখানে কহ্লার কুসুমদল ফুটিয়া রহিয়াছে। জল-কল্লোলে সে সকল হেলিতেছে, দুলিতেছে, বায়ু প্রবাহে জলবিন্দু সকল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু ঐ অবিদ্যার এমনই প্রভাব যে, এ হেন সরোবরেও মরীচিকাময় মরুস্থলীর ভাব লক্ষিত হয়। স্বপ্নাদি সময়েও গন্ধর্ব্ব নগর নির্ম্মাণ এবং পতন, উৎ-পতন ও সম্ভ্রম প্রভৃতি যে কিছু বিচিত্র ব্যাপার অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাও ঐ অবিদ্যারই খেলা। অবিদ্যা যদি চিত্তের মধ্যে সংসার বাসনা আনয়ন করিয়া না দেয়, তাহা হইলে এই যে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-সাময়িক ব্যাপার-পরম্পরা, ইহারা কি কোনও কালে আত্মার উপর এবম্বিধ কিম্ব বিপক্ষ

উপস্থাপিত করিতে পারে? যদি মিথ্যা জ্ঞান বলবৎ হইয়া উঠে? তাহা হইলে স্বপ্নময় উদ্যান-বনভূমিতেও রৌরব ও অবীচি প্রভৃতি নারকীয় বিষম যাতনা সকল অনুভূত হইতে থাকে। মন অবিদ্যায় বিদ্ধ হইলে অতি সূক্ষ্ম মৃণালতন্তুর অভ্যন্তরেও এই নিখিল সংসারসাগরের বৃথা বিভ্রম অবলোকন করে। ঐরূপ অবলোকন তাহার ক্ষণমধ্যেই সংঘটিত হয়। রাজগণ রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকুন, আর নাম ও কর্ম্মখ্যাতি দিকে দিকে বিঘোষিতই হউক, তাঁহাদের মন যদি অবিদ্যায় আকুলিত হইয়া উঠিল, তবে তাঁহাদিগকে এমন দুরবস্থায়ই উপনীত হইতে হয় যে, যাহা চণ্ডালাদি নীচ জনেরও যোগ্য নয়। অতএব হে রামচন্দ্র! যাহা ভববন্ধনের হেতু, তুমি সেই সর্ব্বরাগময়ী বাসনা পরিত্যাগ কর এবং স্ফটিক মণির ন্যায় রাগহীন হইয়া অবস্থান করিতে থাক।" স্ফটিক যেমন বিচিত্র প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তেমনি তুমি বিবিধ কার্য্য লইয়া অবস্থান করিলেও কার্য্যরাগে তোমার যেন রঞ্জনা হয় না। অর্থাৎ শুদ্ধ স্ফটিকে নানা প্রতিবিম্ব পতিত হয়; কিন্তু স্ফটিক তাহাতে লিপ্ত হয় না, এইরূপ তুমিও রাগশূন্য হইয়া কার্য্যে অবস্থান কর।

বৎস! তুমি যদি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বুধমণ্ডলীর সমীপে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের সহিত সতত 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়-সম্পন্ন হইতে পার, আর সমস্ত অবিদ্যা-ক্রিয়া-বিরহিত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী সুশীতল ব্রহ্মবুদ্ধি ও ব্রহ্মব্যাপারে নিরত হও, তাহা হইলে তোমার জীবন্মুক্তি ঘটিবে এবং সেই অবস্থায় তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত সমভাব সমধিগত হইতে পারিবে।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ কথা কহিলে, কমলদল-নয়ন রামচন্দ্র যেন উন্মীলিত হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ বিকশিত হইয়া

উঠিল। তিনি সমধিক শোভা ধারণ করিলেন; তিমিরপুঞ্জ ক্ষীণ হইয়া গেলে, সূর্য্য-সন্দর্শনে পদ্ম যেমন প্রমোদ প্রাপ্ত হয়, উল্লিখিতরূপ উপদেশে আশ্বস্ত হইয়া তিনিও তেমনি প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন। পরে অপূর্ব্ব বোধ বিকাশে তাঁহার মন বিস্মিত হইল এবং আননে শুভ্র সৌম্য স্মিতশোভা বিকাশ পাইল। তিনি বশিষ্ঠ মুনির প্রতি তদীয় দশনরশ্মি-সুধা-বিধৌত বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলী বলিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—অহো, কি আশ্চর্য্য! যাহা একান্তই অসৎ, সেই অবিদ্যা সকলকে বশীভূত করিল; যেন মৃণালতন্তুতে অদ্রিগণ আবদ্ধ হইল! দেখিতেছি, এই সংসারদুঃখ তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও অবিদ্যা বলেই ত্রিভুবনে উহা বজ্রবৎ সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। যাহা প্রকৃতই অসৎ, তাহা যেন সৎস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। হে ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া মদীয় বোধবৃদ্ধির জন্য পুনরায় এই সংসার-নিদান মায়ানদীর স্বরূপ বর্ণন করুন। বলিতে কি,—হে মহাত্মন্! আমার হৃদয়ে আরও এই একটী সংশয় রহিয়াছে যে, ঐ মহাভাগ লবণ ভূপতি কি নিমিত্ত তথাবিধ বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! দেহ ও দেহী, ইহারা উভয়ে জতুকাষ্ঠের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং মল্ল ও মেষের ন্যায় পরস্পর আহত। ঐ উভয়ের মধ্যে কে সংসারী এবং কেই বা শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফলভোগকারী? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই যে চঞ্চল কর্ম্মশীল ঐন্দ্রজালিক পুরুষ, সে কেন সেই লবণ ভূপতিকে তাদৃশ ঘোর বিপদে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল? কে ঐ ঐন্দ্রজালিক?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! দেহ কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় অচেতন। ইহাকে কিছুতেই সত্য বস্তু বলা চলে না। চিত্তই স্বপ্ন সন্দর্শনের ন্যায় দেহ কল্পনা করে। ফল কথা, দেহ অচেতন ও অসৎ, তাই দেহের কর্ম্ম-ফল-ভোক্তৃত্ব অসম্ভব। চিত্ত চিৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবত্ব উপগত হইয়া থাকে এবং সংসারে সমাসক্ত হইয়া পড়ে। জানিবে—উহা বানর শিশুর ন্যায় একান্তই চঞ্চল।

রামচন্দ্র! জীবই দেহী; সেই দেহীই বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে এবং বহুবিধ দেহ ধারণ করে। ঐ দেহীই অহঙ্কার, মন ও জীব

নামে পরিকল্পিত হয়। হে রঘুনন্দন! সেই জীব বা দেহী যখন অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন তাহারই এই অনন্ত সুখ-দুঃখ ভোগ ঘটে; কিন্তু সে যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন আর শরীরসম্বন্ধীয় সুখ-দুঃখাদি তাহার কিছুই থাকে না। অপ্রবুদ্ধ মনই বিচিত্র বৃত্তিনিচয় প্রাপ্ত হয় এবং বিবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়া বিচিত্র আকার ধারণ করে। মন যতদিনে না তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে, তাবৎ কালই তাহাকে নিদ্রিত বলা হয়। ঐ নিদ্রাবস্থাতেই মন সংসারস্বপ্ন অনুভব করে; পরন্তু মন প্রবুদ্ধ হইলে কখন তাহার আর ঐ সংসারস্বপ্ন অনুভূত হয় না। জীব বা মন অবোধ-নিদ্রায় ক্ষুভিত হইয়া যতকালে না প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই এই দুর্ভেদ্য সংসারপ্রবৃত্তিরূপ ভ্রান্তি দর্শন করে। মন প্রবুদ্ধ হইলে দিবালোকে বিকসিত কমলের হৃদয়স্থিত অন্ধকারের ন্যায় যাবতীয় তমোভাব বিলীন হইয়া যায়। কৃতাত্মা বুধগণ যাহাকে চিত্ত, অবিদ্যা, মন, জীব, বাসনা ও কর্ম্মাত্মা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই দেহীই দুঃখ ভোগ করে। দেহ জড় পদার্থ, সুতরাং সে কখন দুঃখভোগ করে না; পরন্তু যাহাকে দেহীনামে অভিহিত করা হয়, সেই দেহীই অবিচারবশতঃ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অবিচারও প্রগাঢ় অজ্ঞান-হেতুই ঘটে; সুতরাং অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। কোশকার কীট যেমন আপনার রচিত কোশে আপনিই আবদ্ধ হয়, তেমনি জীব একমাত্র আপনার অবিবেক-দোষেই বদ্ধ হইয়া শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে থাকে। অবি-বেকরূপ রোগগ্রস্ত মন নানাবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া নানাকারে বিহার করত চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। মনই এই শরীরে উদিত হয়, রোদন করে, হনন করে, ভোজন করে, গমন করে, আস্ফালন করে এবং নিন্দা করিয়া থাকে; পরন্তু শরীর কখন সেরূপ করে না।

হে রাম! গৃহপতি যেমন গৃহের ভিতর নানাপ্রকার কার্য্য চেষ্টা করে, জড় গৃহ কখনই সেইরূপ করিতে পারে না। এইরূপ, এই দেহ-গৃহের অভ্যন্তরে জীবই নানাবিধ চেষ্টা করিতে থাকে; পরন্তু দেহের সেরূপ চেষ্টাসামর্থ্য নাই। যত কিছু সুখ-দুঃখ বা যত কিছু ব্যাপার আছে, মনই সে সমুদায়ের একমাত্র কর্ত্তা ও তত্তৎ ফলের ভোক্তা।

সুতরাং তুমি সকল ভাবনাকেই মানস বা মনোনির্ম্মিত বলিয়াই বিদিত হইবে।

হে রাঘব! পূর্ব্বোল্লিখিত লবণ ভূপতি যেরূপে মানসভ্রমে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে বিষয়ে আমি তোমাকে এই উত্তম বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। শুভ হউক, আর অশুভই হউক, মনই কর্ম্মফল ভোগ করে, তুমি অবশ্য ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ। তুমি ইহা যেমন বুঝিতেছ, অধুনা সেইরূপ বৃত্তান্তই শ্রবণ কর।

হে অনঘ! ভূপতি লবণ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বংশধর। তিনি একদা একান্তে বসিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন যে, মৎপিতামহ মহীপতি হরিশ্চন্দ্র একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহারই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং আমাকেও সেইরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইবে। আমি মনোদ্বারাই যজ্ঞ করিব। ভূপতি লবণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া মন দ্বারাই সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য আয়োজন করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য মনে মনেই ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিলেন, সাধুচেতা মুনিবৃন্দকে অর্চ্চনা করিলেন এবং দেবগণকে আমন্ত্রণ করিয়া বহ্নি স্থাপন করিলেন।

এইরূপে উপবনমধ্যে থাকিয়া মহীপতি মানসিক যাগে প্রবৃত্ত হইলে, দেব, ঋষি ও দ্বিজগণের পূজায় তাঁহার এক বৎসর কাটিয়া গেল। যজ্ঞাবসানে তিনি দ্বিজাতিদিগকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিলেন। এইরূপে তাঁহার মনোযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। সেই দিন অপরাহ্ণ কালেই তিনি ধ্যান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই উপবনমধ্যে প্রবুদ্ধ হইলেন।

রামচন্দ্র! লবণ ভূপতি এইরূপে সসন্তোষে মনোযজ্ঞ সমাধা করিলেন বটে; কিন্তু সেই যজ্ঞের অবান্তর ফলে চণ্ডালত্বাদি ভ্রান্তিরূপ অনিষ্ট ফলও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব হে রাঘব! মনকেই তুমি সুখ-দুঃখের ভোক্তা মানব বলিয়া জানিবে এবং এইজন্যই এই মনকে তুমি মনঃপবিত্রতার উপায় স্বরূপ সত্যপথে যোজিত কর।

এই সময় মুনিবর বশিষ্ঠ সভা-সমাসীন সভ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন,—হে বুধগণ! মনোরূপ পুরুষ কালাদি-পরিচ্ছেদ-পরিহীন স্বাত্মাকারপ্রদ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণ হয় এবং বিনশ্বর দেহাদি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই ভাব-প্রাপ্তি নিবন্ধন বিনাশ পাইয়া থাকে। অতএব যাহাদিগের নশ্বর অহম্ভাব-নিশ্চয় বর্ত্তমান, তাহারা বৃথা পুরুষ; তাহাদের দ্বারা কোনই প্রয়োজন সাধিত হইবার নহে। মন যখন পরম বিবেক বশে সম্যক্ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন পবিত্রবুদ্ধি পুরুষের সর্ব্বদুঃখ বিগলিত হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত দেখ, যখন দিবাকর-করের সংস্পর্শে কমলকুল প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তখন তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কোচ, জাড্য ও তিমির একেবারেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! ঐন্দ্রজালিকের মায়াজাল বিস্তারে লবণ ভূপতি যে মনঃকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞের অনিষ্ট ফল-স্বরূপ চণ্ডাল-ভাবাদি প্রাপ্ত হইলেন, এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি আছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ঐন্দ্রজালিক যখন সেই লবণ ভূপতির সভায় আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি তখন সেইখানে উপবিষ্ট ছিলাম। যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, আমি তখন তাহা স্বচক্ষেই দেখিয়াছি। ঐন্দ্রজালিক যখন সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন স্বয়ং লবণ ভূপতি এবং তদীয় সভাস্থ অন্যান্য সভ্যবৃন্দ আমাকে সযত্নে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহর্ষে! এ ব্যাপারটা কি? আমি তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যানযোগে ঐন্দ্রজালিকের চেষ্টার বিষয় বিদিত হইয়া তৎকালে যাহা কহিয়াছিলাম, হে রাম! তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র! রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু যাঁহারা সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কর্ত্তা, তাঁহাদিগকে দ্বাদশবর্ষ কাল* বিবিধ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই লবণ ভূপতির মনঃকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞ যেমন সমাধা হইল, অমনি ইন্দ্র তাঁহাকে দুঃখভোগ করাইবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে ঐন্দ্রজালিক বেশে অনেক দেবদূতকে তৎসকাশে প্রেরণ করিলেন। দেবদূত ঐন্দ্রজালিকের বেশ ধরিয়া রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা লবণ ভূপতিকে মহা বিঘ্ন-বিপদে পাতিত করিয়া সুর-সিদ্ধ-সেবিত স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন। অতএব রঘুনন্দন! পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনা যে আমার নিজেরই প্রত্যক্ষ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

হে রাম! মনই বিলক্ষণ ক্রিয়ার কর্ত্তা ও ফলভোক্তা। এই জন্যই বলিতেছি, তুমি হঠযোগ দ্বারা চিত্তরত্নকে ঘর্ষণ করিয়া রাজযোগে উহাকে সংশোধিত করত আতপ-তাপে হিমকণার ন্যায় নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে উহার বিলয় বিধান কর; পশ্চাৎ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। তুমি এই চিত্তকেই সর্ব্বভূত-মহাড়ম্বর-বিধায়িনী অবিদ্যা বলিয়া বিদিত হইবে। ঐ চিত্তরূপিণী অবিদ্যাই— বিবিধ বিচিত্র রচনাস্বরূপ ইন্দ্রজালবৎ যে বাসনারূপ, তাহারই প্রভাবে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ উদ্ভাবন করে। যেমন বৃক্ষ ও তরু শব্দ অভিন্ন, তেমনি অবিদ্যা চিত্ত, জীব ও বুদ্ধি এই সকল শব্দেরও অর্থগত কোনই ভেদ নাই; বস্তুতঃ উহারা একই। তুমি এই সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিত্তকে কল্পনাশূন্য কর। যখন সূর্য্যবিম্বের ন্যায় চিত্ত নৈর্ম্মল্য সমুদিত হইবে, তখন নিখিল সঙ্কল্প-বিকল্প-জনিত দোষান্ধকার অপসারিত হইয়া যাইবে। হে রাঘব! এমন ত কোন পদার্থই নাই, যাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহাকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায় না, যাহা পরিপরিত্যাজ্য নয় এবং যাহা বা মরণদশায় উপনীত হয় না। যখন সকলই আত্মীয় এবং সকলই পরকীয় হয়, তখন সমস্তই সর্ব্বদা সর্ব্ব-

* মানস যজ্ঞে ইহার পাঁচগুণ অধিককাল দুঃখভোগ।

পদবাচ্য হইতে পারে, ইহাই পারমার্থিক স্থিতি। যেমন নানা-জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন অপক মৃদ্ভাণ্ড সকল জলে রাখিলে গলিয়া গিয়া একটা পিণ্ডাকারে পরিণত হয়, তেমনি এই সকল দৃশ্য পদার্থ, এই দৃশ্য পদার্থরাশি-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিরূপ বোধ এবং তদুপহিত যাবতীয় জীব-সমূহ, এতৎসমস্তই একপিণ্ডতা অর্থাৎ ব্রহ্মৈকরসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন, এইরূপে যখন মনঃক্ষয় হয়, তখনই সর্ব্ববিধ সুখ-দুঃখের শেষ সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে আপনি এই কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু হে মহাত্মন্! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এই চঞ্চলবৃত্তি মনের লয় কেমনে হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘবেন্দ্র! মন প্রশমিত করিবার যুক্তি শ্রবণ কর। এই যুক্তি অবগত হইতে পারিলে, মনোবৃত্তি সকল স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের দূরবর্ত্তী পরব্রহ্মে যোজিত করিতে পারিবে। ইহ-সংসারে ব্রহ্ম হইতে যে সর্ব্বভূতের ত্রিবিধ উৎপত্তি হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মনঃসঙ্কল্পে 'আমি চতুর্ম্মুখ দেহ-বিশিষ্ট' ইত্যাকার যে ব্রহ্মরূপ কল্পনা, তাহাই পুনরায় কল্পনাযুক্ত হইয়া যাহা সঙ্কল্প করে, তাহাই দেখে—তাহা দ্বারাই এই জগৎপ্রপঞ্চ কল্পিত হইয়া থাকে। এই যে বিচিত্র ভুবনাড়ম্বর, ইহা সেই চতুর্বক্ত্র ব্রহ্মাখ্য আদ্য মনেরই কল্পনা। ঐ কল্পনাত্মিকা অবিদ্যাই আবার জনন-মরণ, সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র সংসারকল্পনা করিয়া সুরাসুরাদি নানা আখ্যা বিস্তারপুরঃসর চতুর্যুগ সহস্রকাল অবস্থান করে; অনন্তর আপনিই আতপে হিমকল্পনার ন্যায় অনন্তশায়ী নারায়ণে বিলীন হইয়া যায়। পুনরায় যখন সৃষ্টিকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ভগবানের নাভি-কমল হইতে সেই প্রাক্তনী কল্পনা প্রাদুর্ভূত হইয়া কল্পান্তরীয় অন্য সৃষ্টিরূপে প্রকটিত হয় এবং পুনরায় বিলয় পায়। এইরূপে উল্লিখিত কল্পনারূপিণী অবিদ্যা বারম্বার উদ্ভূত হইয়া সংসারাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং আপনিই আবার উপশান্ত হইয়া থাকে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহারই অভ্যন্তরে আরও কত কোটি কোটি ব্রহ্মা অতীত হইয়া গিয়া-ছেন, হইতেছেন এবং হইবেন, এইরূপ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও কত কত

অনন্ত অসংখ্য ব্রহ্মা অতীত হইয়া গিয়াছেন, হইতেছেন, এবং হইবেন, তাহার ইয়ত্তা করা একেবারেই অসম্ভব।

রামচন্দ্র! পূর্ব্বোল্লিখিত সমষ্টিকল্পনা তাদৃশ পরমাত্মায় বিদ্যমান হইলে, সেই পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সমাগত প্রত্যেক বিভিন্ন জীব যে প্রকারে জীবন ধারণ করে ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

হে রাঘব! সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্ম হইতে মনঃশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হয়েন। অনন্তর তাহা সম্মুখস্থিত শব্দ-তন্মাত্রাত্মক আকাশ-শক্তি অবলম্বন করিয়া স্পন্দধর্ম্মী স্পর্শতন্মাত্র পবন-শক্তির অনুপাতিনী হইয়া ঈষৎ প্রচলনরূপ ঘনীভূত সঙ্কল্পাকার ধারণ করে। পাশ্চাৎ সম্মুখোপনত রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত মনঃশক্তি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ইত্যাকার ব্যবহার-বীজ জীবোপাধিত্ব উপগত হয়। অতঃপর উহা পঞ্চতন্মাত্ররূপে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া পঞ্চীকৃত স্থূলভূত প্রকৃতিরূপে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় পঞ্চীকৃত গগন পবন ও তেজোরূপে সঙ্কল্পিত হইলে ক্রমে নীহার বা বৃষ্টি প্রভৃতি সলিলাকারে পরিণত হইয়া শাল্যাদি শস্যসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনন্তর সেই অন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও শুক্রাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রীযোনিতে নিষিক্ত হইবার পর কলল-বুদ্বুদাদি ক্রমে প্রাণিগণের গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সেই গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন ব্যক্তি পুরুষ আখ্যায় অভিহিত হয়। জন্মগ্রহণ করিবার পর বাল্য কাল হইতেই বিদ্যাভ্যাস ও গুরু-সম্প্রদায়ের অনুগমন করা পুরুষের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে, তুমি যেমন বিবেক ও বৈরাগ্যাদি সাধন-সম্পদে সমন্বিত হইয়াছ, এইরূপ বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন-সমৃদ্ধি ক্রমশঃ সেই পুরুষেরও হইতে পারে। তখন নির্ম্মল চিত্তবৃত্তিশালী পুরুষের নিকট 'সংসার হেয় এবং মোক্ষ উপাদেয়' এইরূপ বিচার আবির্ভূত হইতে থাকে।

রামচন্দ্র! পুরুষ যখন উল্লিখিতরূপে বিবেক-সম্পন্ন এবং 'আমি

বিমল সত্ত্বশালী ব্রাহ্মণ' ইত্যাকার সঙ্কল্পাভিমান পোষণ করত ধীরচিত্তে অবস্থিত হয়, তখন তথাবিধ পুরুষেরই জ্ঞানবলে পরম পুরুষার্থদায়িনী চিত্ত-প্রসাদনকরী সপ্তবিধ যোগভূমি ক্রমশঃ চিত্তোপরমের তার-তম্যানুসারে অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! হে নিখিল তত্ত্বজ্ঞগণের বরেণ্য! আপনি যে সপ্তবিধ পুরুষার্থ-সাধনী যোগভূমির উল্লেখ করিলেন, উহারা কি প্রকার? আমার নিকট সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! জ্ঞানভূমি সপ্তপদী এবং অজ্ঞানভূমিও সপ্তপদী। এই উভয়বিধ ভূমির আরও বহুসংখ্যক পদ বিদ্যমান। পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপ প্রযত্ন এবং ভোগাবিলাসের দৃঢ়তারূপ রসাবেশ, এই দুইটি অজ্ঞানভূমি প্রতিষ্ঠার অসাধারণ হেতু, এবং শাস্ত্রোক্ত সাধনচতুষ্টয়-বিশিষ্ট শ্রবণ-মননাদি প্রযত্ন ও মোক্ষাভিলাষের দৃঢ়তারূপ প্রযত্ন, এই দুইটী জ্ঞানভূমি প্রতিষ্ঠার কারণ। এতদ্ভিন্ন যাহা অধিষ্ঠান ব্রহ্মসত্তার উৎকর্ষাধীন আত্মসত্তা লাভ, তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয় ভূমি-সম্বন্ধেই সাধারণ হেতু। এই সকল হেতু হইতে যখন উক্ত ভূমিকাদ্বয় প্রতিপদে স্ব স্ব বিষয়ে বদ্ধমূল হয়, তখন অজ্ঞানভূমিকা স্বীয় সমুচিত সংসার-দুঃখরূপ ফল এবং জ্ঞানভূমিকা সেই সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি ও নিরতিশয় আনন্দ-প্রাপ্তি-রূপ ফল প্রসব করে। উল্লিখিত উভয় ভূমি-কার মধ্যে অগ্রে অজ্ঞানভূমির বিষয়ই শ্রবণ কর। অনন্তর সপ্তবিধ জ্ঞানভূমির বিবরণ শ্রবণ করিবে।

হে রাম! ব্রহ্ম-স্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহারই নাম মুক্তি। আর তাহার যে অভাব, তাহাই অহম্ভাব বা বন্ধন আখ্যায় অভিহিত। ইহাই

তত্ত্বজ্ঞ ও অতত্ত্বজ্ঞের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। যাঁহারা রাগ-দ্বেষাদির অনুদয়ে শুদ্ধসন্মাত্র জ্ঞানস্বরূপ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন না, তাঁহাদের অজ্ঞত্ব কদাচ সম্ভাবিত নহে। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিচ্যুতি নিবন্ধন চেত্য বিষয়ে যে নিমগ্ন হওয়া যায়, ইহা অপেক্ষা বিষম মোহ আর নাই; এরূপ অপর কোন মোহ কখন হয় না এবং হইবেও না। চিত্ত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করে। ঐ চিত্তের পূর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ এবং অপর বিষয় অঙ্গীকার, এই দুই ক্রিয়ার মাধ্যমিক যে মননহীন অবস্থা, তাহারই নাম স্বরূপস্থিতি। যৎকালে সকল প্রকার সঙ্কল্প তিরোহিত হইয়া যায়, যখন জাড্য নিদ্রা থাকে না, পরব্রহ্মের তৎকালিক যে শিলার ন্যায় নিশ্চল অবস্থান, তাহাই স্বরূপস্থিতি নামে অভিহিত। অন্তরের অহম্ভাব এবং বাহিরের ভেদজ্ঞান যখন একবারেই প্রশান্ত ও নিস্পন্দ হইয়া যায়, তখন যে জাড্য দোষ-বিরহিত চিৎ আপনা হইতে প্রকাশমান হয়, তাহাই স্বরূপাখ্যায় নিশ্চিত। সেই স্বরূপাবস্থিত চৈতন্যে যে অজ্ঞান আরোপিত হয়, সেই সকল অজ্ঞানভূমিকা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ, ও সুষুপ্তি, এই সপ্তবিধ মোহ। এই সপ্ত প্রকার মোহ আবার পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া বহু প্রকার হয়, তাহাদেরও লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। মায়া-শবলিত ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এবং অস্মদাদি ব্যক্তিবর্গের জাগ্রদাবস্থার আদিতে যে চেতনার প্রথম স্ফুরণ বা চিদাভাসযুত মায়াশক্তির আদ্য উন্মেষ, তাহাই প্রাণ-ধারণাদি ক্রিয়ার উপাধি দ্বারা ভবিষ্যৎ চিত্ত ও জীব প্রভৃতি শব্দ ও তত্তৎ অর্থের ভাজন। বক্ষ্যমাণ জাগ্রদবস্থার বীজ তাহাই 'বীজজাগ্রৎ' আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এই যে বীজ-জাগ্রৎ, ইহা জ্ঞপ্তি বা চিদ্বস্তুর নূতন বা আদি অবস্থা। এক্ষণে জাগ্রৎ অবস্থার কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ যে পরমাত্মা হইতে নবোদ্ভিন্ন বীজ-জাগ্রৎ, উহার পর যে স্বরূপ বিস্মরণে সাধারণতঃ 'এই আমি ইহা আমার' ইত্যাকার জ্ঞান স্ফুরণ হয়, তাহা আমরা জাগ্রৎ আখ্যায় অভিহিত করি। এই যে জাগ্রদবস্থা, ইহা জন্মান্তরীয় সংস্কারের সমুদ্রকে এবং অভ্যাসের পাটবে পীবর হইয়া উঠিলে মহাজাগ্রৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দৃঢ়-ভাবেই হউক কিম্বা অদৃঢ়-

ভাবেই হউক, যদি জাগ্রদবস্থায় মনোরাজ্য তন্ময়ভাবে সত্যবৎ সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাগ্রৎস্বপ্ন আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এই জাগ্রৎস্বপ্ন-অবস্থা লবণ ভূপতির হইয়াছিল। আকাশে দ্বি-চন্দ্র, শুক্তিকায় রজত ও মৃগতৃষ্ণায় জল, ইত্যাদি ভ্রম জ্ঞান ভেদে ঐ জাগ্রৎস্বপ্ন অনেক প্রকার হয়। জীব পূর্ব্ব অভ্যাসের প্রভাবে জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর সময়ে সময়ে অনেকবিধ স্বপ্নভাব অনুভব করিয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় অথবা নিদ্রাবসানে স্বপ্নকালীন অনুভূত বিষয়ে 'আমি এই মাত্র ইহা দেখিলাম, ইহা কখন সত্য নয়' এইরূপ যে প্রত্যয়, তাহা স্বপ্ন আখ্যায় নির্দ্দিষ্ট। এই স্বপ্ন, মহাজাগ্রতের অন্তর্গত স্থূল দেহের কণ্ঠ ও হৃদয়ের মধ্যগত নাড়ীবিশেষের অভ্যন্তর প্রদেশে সমুদিত হইয়া থাকে। চির-সন্দর্শন বা স্থায়ী অনুভব ঘটে না অথচ অপ্রফুল্ল বা অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, এ হেন অবস্থাও স্বপ্নবিশেষ বলিয়া বিদিত। ঈদৃশ স্বপ্ন যদি জাগ্রতের ন্যায় দৃঢ়াভিনিবেশে বা স্থায়িত্ব কল্পনায় উপচিত হইয়া মহাজাগ্রতের সমান ভাব উপগত হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থাকে "স্বপ্ন জাগ্রৎ আখ্যা" অর্পণ করা যায়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। এই যে স্বপ্নজাগ্রৎ অবস্থা, ইহা স্থূল দেহের স্থিতি ও নাশ উভয় কালেই হয়। উল্লিখিত ছয়টী অবস্থার পরিহারে জীব যে জড়াবস্থায় অবস্থান করে, সেই জড়াবস্থাই তাহার সুষুপ্তি আখ্যায় অভিহিত। এই যে সুষুপ্তি অবস্থা, ইহাই সেই সেই ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখাদির বোধক বাসনাকার্য্যে সমন্বিত হইয়া থাকে। এই অবস্থারই অভ্যন্তরে তৃণ, লোষ্ট্র, ও শিলাদি যাবতীয় পদার্থ বীজভাবে বিরাজ করে।

হে রঘুনন্দন! এই আমি তোমাকে অজ্ঞানভূমিকার সপ্ত অবস্থা বর্ণন করিলাম। ইহাদের প্রত্যেকটীর আবার বিবিধ বিভবরূপিণী শত শত শাখা প্রশাখা বিদ্যমান। পূর্ব্ব-কথিত জাগ্রৎস্বপ্ন চিরাভ্যাসবশে জাগ্রদ্‌ভাবে পরিণত হইয়া বিবিধ পদার্থাকারে বিলসিত হইয়া থাকে। এই যে জাগ্রদ্‌ভাবাপন্ন জাগ্রৎস্বপ্ন দশা, ইহারই উদরে মহাজাগ্রদ্দশা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত দশাসমূহের অভ্যন্তরেও জীব একপ্রকার মোহ হইতে মোহান্তরে উপনীত হইয়া থাকে এবং নদীমধ্যবর্ত্তী আবর্ত্তের

অত্যন্তরে নৌকা নিপতিত হইলে তাহা যেমন ঘুরিতে থাকে, সেই দশা-সমূহের মধ্যে পড়িয়া ঐ জীব তেমনি মহামোহে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন সংসারাবস্থা দীর্ঘকাল স্বপ্ন-জাগ্রদাকারে বিদ্যমান থাকে, আবার কোন কোন স্বপ্নজাগ্রৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নরূপে অতিপাতিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! আমি সপ্তপদী অজ্ঞানভূমিকার বিষয় তোমার নিকট সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন করিলাম। ঐ ভূমিকাগুলি বিবিধ বিকারে বিকৃত বলিয়া নিন্দার্হ বা অবশ্যই হেয়। যদি সুচারু বিচারণা দ্বারা বিমল বোধ-স্বরূপ আত্মদর্শন লাভ করিতে পার, তাহা হইলে ঐ যে অজ্ঞানভূমিকা, উহা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে পূতচরিত! অধুনা আমি সপ্তপদী জ্ঞানভূমির বিবরণ বলিতেছি, ইহা শ্রবণ কর। যদি এই জ্ঞানভূমির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তাহা হইলে পুনরায় আর মোহপঙ্কে মগ্ন হইবে না। সাংখ্য-যোগ-বাদিগণ যম-নিয়মাদি বিবিধ প্রসিদ্ধ যোগভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার সেই সকল ভূমিকাগুলিকে অকিঞ্চিৎ-কর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু আমার মতে এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানভূমি সকলই শ্রেষ্ঠ; কেননা, জ্ঞানভূমি হইতেই পরম পুরুষার্থরূপ শুভ ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সপ্তভূমির জ্ঞানকেই বুধগণ অববোধ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। এই সপ্ত ভূমির অভিজ্ঞতা দ্বারা মুক্তিই একমাত্র জ্ঞেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সত্যাববোধ ও মোক্ষ, এই দুইটাই একপর্য্যায়ক শব্দ। জীব মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর সত্যস্বরূপ বোধ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই দুই কথা একই; কেননা, উভয়ত্রেই তাহার আর অঙ্কুরোদয়েরও সম্ভাবনা নাই।

রামচন্দ্র! এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমির প্রথমটীর নাম শুভেচ্ছা। দ্বিতীয় জ্ঞানভূমির নাম বিচারণা। তৃতীয় ভূমির নাম তনুমানসা; চতুর্থী সত্ত্বাপত্তি; পঞ্চমী অসংসক্তি, ষষ্ঠী পদার্থভাবনী এবং সপ্তমী জ্ঞানভূমি তুর্য্যগা নামে অভিহিত। এই সপ্তবিধ জ্ঞানভূমির যখন অবসান ঘটে, তখনই মুক্তিলাভ হয়। যখন মুক্তি ঘটে, তখন আর শোক করিতে হয় না।

রামচন্দ্র! ঐ যে সপ্ত ভূমিকার কথা কহিলাম, এক্ষণে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণাদি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ বৈরাগ্যোদয়ে "আমি কেন মূঢ় হইয়াই রহিলাম, এরূপে আমি আর অবস্থান করিব না; গুরু ও শাস্ত্র বাক্যের সহায়তায় আমি ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিব" এবম্প্রকার যে ইচ্ছা, তাহাকেই বুধগণ 'শুভেচ্ছা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রালোচনা ও সাধু-সংসর্গে বৈরাগ্যাভ্যাস-পূর্ব্বক যে সদাচার প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুরু-শুশ্রূষা, ভিক্ষাশন, ও শৌচ প্রভৃতি যতি ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক যে শ্রবণ-মননাদি, তাহাই বিচারণা নামে অভিহিত। শুভেচ্ছা ও বিচারণা এই উভয় দ্বারা শব্দ-স্পর্শ ও রূপ-রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে যে অনাসক্তি, তাহাই তনুমানসা নামে নিরূপিত। ঐ অবস্থায় মন তনু অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া উহার নাম তনুমানসা। উল্লিখিত ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাস বশতঃ বহির্বিষয় হইতে চিত্তের বিরতি ঘটে এবং এই জন্য মায়া, মায়াকার্য্য ও উক্ত তিন অবস্থা হইতে পরিশোধিত সর্ব্বাধিষ্ঠান সম্মাত্রস্বরূপ আত্মাতে যে নির্ব্বিকল্প সমাধিবৎ একনিষ্ঠা উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই—সেই আত্মনিষ্ঠতাকেই সত্ত্বাপত্তি আখ্যায় অভিহিত করেন। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, ও সত্ত্বাপত্তি, এই চারি অবস্থার অভ্যাস নিবন্ধন অস্পর্শযোগ বা বিষয়-সঙ্গ-রাহিত্যরূপ উত্তম ফল জন্মিয়া থাকে। সেই ফল জন্মিলে তাহা হইতে যে আত্ম-চমৎকৃতি বা নিরতিশয়ানন্দ নিত্য অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎকার ঘটে, বুধগণের মতে তাহাই অসংসক্তি নাম্নী পঞ্চমী জ্ঞানভূমি। উল্লিখিত শুভেচ্ছা প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার জ্ঞানভূমির অভ্যাস এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থসমষ্টির একবারে বিস্মরণ, এই দুই কারণে আত্মা মাধ্যস্থ বৃত্তি অবলম্বনে সাক্ষী বা উদাসীনবৎ দ্রষ্টা

মাত্র হইয়া অবস্থান করেন এবং পরেচ্ছা মাত্রে প্রেরিত হইয়া দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এই অবস্থারই নাম পদার্থভাবনা।. ইহাই ষষ্ঠা জ্ঞানভূমি আখ্যায় অভিহিত। ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার জ্ঞানভূমির চিরাভ্যাস নিবন্ধন যখন ভেদজ্ঞান চলিয়া যায়, অন্যে ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেও যখন ভেদজ্ঞান হয় না, তখন যে ব্রহ্মৈকনিষ্ঠতা জন্মিয়া থাকে, সেই অবস্থাই তুর্য্যগা। এই তুর্য্যগাই সপ্তমী জ্ঞানভূমি। অর্থাৎ জাগ্রদাদি তিন অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত যে পদার্থময় অদ্বৈত ব্রহ্ম, তিনিই তুর্য্য শব্দে অভিহিত। সেই তুর্য্যগামিনী অবস্থাই তুর্য্যগাভূমি নামে নিরূপিত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইহজন্মেই এই তুর্য্যগা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই তুর্য্যগা অবস্থার পরেই বিদেহমুক্তি ঘটে। ইহাকেই তুর্য্যাতীত ব্রহ্মপদ বলা হয়।

হে রাম! যে সকল মহাত্মারা এই সপ্তমী ভূমিকা বা তুর্য্যগা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত আত্মারাম বা আত্মাতে ক্রীড়া-নিরত হইয়া মহৎপদ লাভ করিয়াছেন। সেই সকল জীবন্মুক্ত কোনও প্রকার সুখ বা দুঃখে সমাসক্ত হয়েন না; এই অবস্থায় কোনও রূপ বাহ্য কর্ম্মেও তাঁহাদের স্বতঃপ্রবৃত্তি থাকে না। ষষ্ঠ ভূমিকায় অধিরোহণ করিয়া যদিও তাঁহারা কিঞ্চিৎ ক্রিয়া করেন বটে, কিন্তু সপ্তমী ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া আর কিছুই তাঁহারা করেন না। তবে কি তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন? না—তাহাও নহে। যেমন সুপ্ত ব্যক্তি পার্শ্বস্থ জন কর্তৃক বোধিত হইয়া প্রবুদ্ধ জনের ন্যায় কার্য্য করে, তেমনি তাঁহারা প্রবুদ্ধ হওয়ায় ফলাসক্তি-বিরহিত হইয়া আশ্রমধর্ম্মীদিগের কুল-ক্রমাগত সদাচার মাত্র অক্ষতভাবে পালন করিতে থাকেন। পরন্তু সুন্দরী কামিনী যেমন আপনার রূপরাশি দেখাইয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন ব্যক্তির কোনও রূপ সুখ জন্মাইতে পারে না, তেমনি কোনও প্রকার জাগতিক ক্রিয়াই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের কিছুমাত্র সুখ সম্বিধানে সমর্থ হয় না। কেন না, তাঁহারা আত্মারাম,—আত্মাতেই তাঁহাদের ক্রীড়াসক্তি।

হে রাঘব! এই যে সপ্তপদী জ্ঞানভূমির কথা কহিলাম, ঐ সকল কেবল ধীমান্‌দিগেরই বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে; পরন্তু পশু অথবা

ম্লেচ্ছাদির ন্যায় দেহাত্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের পক্ষে উহা প্রাপ্য নহে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যদি পশু ও ম্লেচ্ছাদি জীব কখন কখন প্রাক্তন সম্বল সাহায্যে ঐ সকল জ্ঞানভূমি লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও দেহবান্‌ই হউন, আর বিদেহই হউন, নিশ্চিতই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত—হনুমানাদি পশুজাতীয় জীব, ধর্ম্ম ব্যাধ প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতীয় প্রাণী এবং প্রহ্লাদ ও কর্কটী প্রভৃতি দৈত্য ও রাক্ষস-কুলোৎপন্ন জীব, জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়াছিলেন! আত্মার যে মায়ারূপ আবরণের উন্মোচন, তাহারই নাম জ্ঞপ্তি। এই জ্ঞপ্তি হইলেই লোকের মুক্তি ঘটিয়া থাকে। মুক্তি কাহাকে বলা যায়? ভ্রান্তির উপশমই মুক্তি। এই সংসার-বন্ধন যখন মরুমরীচিকায় জলবুদ্ধির ন্যায়, তখন মুক্তি অবশ্যই ভ্রান্তির উপশম বৈ আর কি? যাঁহারা মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, পরন্তু সেই পাবন পদ এখনও পাইতে পারেন নাই, তাঁহারাই আত্মলাভার্থ ব্যগ্র হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তপদী জ্ঞানভূমিকায় বিচরণ করিয়া থাকেন। এই জগতে এমন অনেক সাধুপুরুষ আছেন, যাঁহারা উক্ত সপ্ত জ্ঞানভূমিই জয় করিয়াছেন। কেহ কেহ দুই বা তিন ভূমিকায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ বা একটী মাত্র ভূমিকা লাভ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও বা ছয় ভূমিকাই অধিগত হইয়াছে। কেহ কেহ বা সপ্তভূমিকাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ চারি ভূমিকা, কেহ কেহ শেষ ভূমিকা এবং কেহ কেহ বা কোন এক ভূমিকার অংশ বিশেষ জয় করিয়াছেন। কেহ সার্দ্ধ ভূমিত্রয়, কেহ সার্দ্ধ ভূমি-চতুষ্টয় এবং কেহ কেহ বা ষষ্ঠ-ভূমিকায় বিচরণ করিতেছেন। এইরূপে বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই উল্লিখিত জ্ঞান-ভূমিকাসমূহে উপনীত হইয়া অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় জন্য দেহ-তাপ প্রশমিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যাঁহারা উক্ত সপ্তবিধ ভূমিকা জয় করত ইন্দ্রিয়গণ সহ মনোজয় করিতে পারেন, সেই ধীরচেতা ব্যক্তি-গণকেই সর্ব্বশত্রুজয়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজা নামে অভিহিত করা যায়। বাস্তবিক এই মনোজয়ের নিকট দিগ্‌গজপ্রতিম গজাশ্বাদি-বহুল নিখিল শত্রুসৈন্যের বিজয়সাধন তৃণের ন্যায়ই তুচ্ছ ব্যাপার।

রামচন্দ্র! যাঁহারা ঐ সমস্ত জ্ঞানভূমিই জয় করিতে পারেন, সেই

সকল ইন্দ্রিয়-শত্রুজয়ী মহাজনগণই লোক-সমাজে বন্দনীয়। তাঁহাদের নিকট সম্রাট্ বিরাট্ প্রভৃতির পদও তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। ঐ সপ্ত-ভূমিকা প্রাপ্তির পরই ইহ জগতে তাঁহারা বিদেহ কৈবল্য সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণ অঙ্গুরীয় ভাবে পরিণত হইয়া আপনাকে অঙ্গুরীয় নামে একটা পৃথক্ পদার্থরূপে কল্পনা করতঃ আপনার সুবর্ণত্ব ভুলিয়া গিয়া বাহ্য মলের সংক্রমণে 'আমি ত আর সেই সুবর্ণ নহি, আমি কাংস্যাদিময় হইয়া গিয়াছি' এইরূপ ভাবনায় রোদন করে অর্থাৎ কাংস্যাদি বাহ্য মলময় আঙ্গুরীয় নামে অভিহিত হয়, তেমনি পরমাত্মাও আপনার স্বপ্রকাশ ও পরিপূর্ণ ভাব ভুলিয়া গিয়া অহ-ম্ভাবের কল্পনায় রোদন করেন, অর্থাৎ শোক-দুঃখাদির অনুভাবক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! সুবর্ণের অঙ্গুরীয়-জ্ঞান এবং আত্মার অহম্ভাবোদয় কিরূপে হয়? আমার নিকট যথাযথ বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! যাহা সৎ বা সত্য পদার্থ, তাহারই উৎ-পত্তি ও বিনাশের কথা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য; পরন্তু যাহা অসৎ বা অসত্য, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। দেখ, অঙ্গুরীয়ত্ব ও অহম্ভাব বা আমিত্ব, এই দুইটী কোনও কালেই সৎ হয় না; সুতরাং সে সম্বন্ধে আবার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কি? মনে কর, কোন ক্রেতা সুবর্ণ ক্রয় করিতে আসিলে, বিক্রেতা ব্যক্তি তাহাকে যদি একটা সুবর্ণাঙ্গুরীয় প্রদান করে, তাহা হইলে ক্রেতা সুবর্ণের সমুচিত মূল্য দিয়া তাহাকে সুবর্ণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে; পরন্তু 'ইহা সুবর্ণ নয়, ইহা

অঙ্গুরীয় নামক কোন একটা পৃথক্ বস্তু' এই বলিয়া তাহা অবশ্য কখনই সে ফিরাইয়া দেয় না। কেন দেয় না? তাহার কারণ এই যে, ক্রেতা তখন নিঃসন্দেহে মনে করে যে, ঐ অঙ্গুরীয় ক্রয়েই তাহার সুবর্ণক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব দেখা যায়, সুবর্ণই সত্য; অঙ্গুরীয় সুবর্ণেরই মিথ্যা বেশান্তর মাত্র। এইরূপ ব্রহ্মই সর্ব্ব ব্যবহারের মধ্যে সত্য ও সে সকলের মূলে অবস্থিত এবং অহম্ভাবে সমুৎপন্ন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! অঙ্গুরীয় যদি সুবর্ণই হয়, তাহা হইলে আমরা যে স্পষ্টতঃ অঙ্গুরীয় দেখিতে পাই, ইহার সুবর্ণস্বরূপ ভিন্ন স্বতন্ত্র আকার কি প্রকার? আর যদি তাহা নাই থাকে, তাহা হইলে উহাকে অঙ্গুরীয় বলিয়াই বা নির্দ্দেশ করি কেন? যদি এই বিষয়টীর তথ্য নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই আমি ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! যাহা অসৎ পদার্থ, তাহার কোনই আকার নাই। যদি তাহার আকার নিরূপণ করিতে চাও, তাহা হইলে বল দেখি, বন্ধ্যা-নন্দনের আকার বা গুণ কিরূপ হইতে পারে? বস্তুতঃ সুবর্ণের অঙ্গুরীয়ত্ব একটা বৃথা ভ্রান্তি মাত্র; উহা অসৎ-স্বরূপিণী মায়া বা অবিদ্যা বলিয়াই বিদিত। বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে, উহার যে অদর্শন, তাহাই উহার রূপ। ভাবিয়া দেখ, মরীচিকা জল, দ্বিতীয় চন্দ্র ও অহম্ভাব প্রভৃতির আকৃতি-সত্তা কতটুকু কাল থাকে? ফলে, যে পর্য্যন্ত না বিচার দৃষ্টিবলে উহা অলভ্য হয়, ততকালই উহার অস্তিত্ব। এইরূপ বিচার-দৃষ্টিতে যখন উহার স্বরূপ লক্ষ্য হয় না, তখনই উহার আকৃতি অসত্য হইয়া পড়ে। যে জন ভ্রমক্রমে শুক্তিতে রজতাকৃতি অবলোকন করে, ক্ষণেকের জন্যও সে তাহাতে অণুমাত্র রজতকণা পায় না; সুতরাং বলিতে হইবে, বিচার দৃষ্টির অভাব নিবন্ধনই শুক্তিতে রজতজ্ঞান ও মরীচিকায় জল-জ্ঞান অসৎ হইলেও সৎস্বরূপে প্রতিভাত হয়। যাহা বস্তুতঃই অসৎ, সম্যক্‌রূপে দেখিলে দেখা যাইবে, তাহার অস্তিত্বাভাবই সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি সম্যক্ দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে, মরীচিকায় যেমন জলবুদ্ধির উদয় হয়, তেমনি ঐ অস্তিত্বাভাব বা নাস্তিত্বেই আবার অস্তিত্ব-

জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অর্থাৎ বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, যাহা নাই, তাহা নাই বলিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে; পরন্তু সম্যক্‌রূপে না দেখিতে পাইলে মরুমরীচিকায় জলস্ফূর্ত্তির ন্যায় যাহা নাই, তাহারই মিথ্যা স্ফূর্ত্তি হয়। যাহা অসৎ বা নাই, ভ্রান্তির মহিমায় তাহাও সত্তের ন্যায় কার্য্যকর হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে বালকদিগের বেতাল-দর্শনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মিথ্যা বেতাল দর্শন ভ্রমক্রমে সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া বালকের ভয় রোদনাদির কারণ হয়, এমন কি—অবশেষে বালকের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটাইতে পারে। ফল কথা, ঐ সুবর্ণে সুবর্ণত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। যেমন সিকতাময় প্রদেশে শৈলাদির অসদ্ভাব, তেমনি সুবর্ণেও অঙ্গুরীয়ত্ব বা কটকত্বাদির অভাব বিদ্যমান। এই বিশ্বের মধ্যে সত্য-মিথ্যা উভয়ের যুগপৎ অস্তিত্ব কিছুই নাই। বালকদিগের নিকট প্রতীয়মান মিথ্যা বেতালের ন্যায় যখন যাহা যেরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাই সেই সেইরূপেই কার্য্যকারী হইয়া থাকে, সৎই হউক আর অসৎই হউক অর্থাৎ থাকুক আর নাই থাকুক, ধারণায় সুদৃঢ়ভাবে সমারোপিত হইলেই তাহা অর্থক্রিয়ার সম্পাদক হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, অতি তীব্র বিষও দৃঢ় ভাবনায় সুধার কার্য্য করিয়া দেয়। এই যে অপ্রতিষ্ঠ অসৎ অহম্ভাব, ইহার ভাবনাই পরম অবিদ্যা। ইহারই নাম মায়া এবং ইহাকেই সংসারাখ্যায় অভিহিত করা হয়। সুবর্ণে যেমন অঙ্গুরীয়কত্বাদি নাই, পরমাত্মাতেও তেমনি অহম্ভাবাদি অসম্ভব। অহম্ভাব সদ্বস্তু নহে; স্বচ্ছ শান্ত প্রকাশময় পরব্রহ্মে তাহা কোনও কালেই নাই; সনাতনত্ব বা বিরিঞ্চিত্ব কিছুই নয়। ব্রহ্মাণ্ডত্ব ও ব্রহ্মসূনুত্ব বা প্রজাপতিত্বও কিছুই নহে। লোকান্তর, স্বর্গাদি, মেরু, অসুর, মন, দেহ, মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি, কারণ, কালত্রয়, ভাব, অভাব, তুমি, আমি, সত্ত্ব, অসত্ত্ব, ইত্যাদি করিয়া যত কিছু বস্তু, তৎসমুদায়ের কিছুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্ম ব্যতীত ইহাদের আর পৃথক্ সত্তা কস্মিন্ কালেও হইতে পারে না। কদাচ কোন ভেদ-কল্পনা, রঞ্জন বস্তু বা রঞ্জনা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। সমস্তই কল্পিত মাত্র; কেবল একা-দ্বিতীয়, অবাঙ্মনস-গোচর, শান্ত, সর্ব্ব, নিরালম্বন, নিরাময়, শাশ্বত

শিব, বোধমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান। এই ব্রহ্মই জগতের পারমার্থিক স্বরূপ। উঁহার আভাস নাই, উপাধি নাই, বিকার নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই বা কারণ নাই। উহা শূন্যাদপি শূন্য, স্থূলাদপি স্থূল এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং সুখাদপি সুখস্বরূপ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি এক্ষণে যদিও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, সমস্তই ব্রহ্ম; তথাপি আপনি পুনরায় প্রকাশ করিয়া বলুন, এই সৃষ্টি কেন অনুভবগম্য হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! পরম তত্ত্ব স্ব-স্বভাবেই অবস্থিত। ফলে তিনি পূর্ণ স্বরূপ, তাঁহাতে এই সৃষ্টি বা সৃষ্টিসংজ্ঞা অমুক অমুক রূপে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে কখনই অবস্থান করে না। মহাজলধিজলে জল যেমন বিরাজমান, জানিবে—পরব্রহ্মে তেমনি সৃষ্টিসংজ্ঞা বিদ্যমান। প্রভেদ এই যে, জল দ্রবপদার্থ, তাই তাহার স্পন্দধর্ম্ম আছে; কিন্তু পরম পদে সে ধর্ম্ম নাই—তিনি নিষ্পন্দ। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থ আত্মসত্তায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; পরন্তু পরম পদ ব্রহ্মের সেরূপ দীপ্তি প্রাপ্তি নাই; তিনি সর্ব্বদাই স্বয়ম্প্রকাশ। এই জন্য সূর্য্যাদির ন্যায় পরাধীনভাবে তাঁহার প্রকাশ নাই। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক-নিচয়ের স্বভাবই হইল দীপ্তি পাওয়া, সুতরাং তাহা একটা ক্রিয়াবিশেষ; কিন্তু পরমপদের তাদৃশ ক্রিয়া নাই; কেন না, তিনি নিষ্ক্রিয়। জলধির যেমন ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে কিছুই নাই, কেবল তদীয় মধ্যভাগেই জলাংশ বিদ্যমান, পরমপদেরও তেমনি আদ্যন্ত অংশ অব্যক্ত; সেই পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পরম পদের মধ্যাংশেই নানা জগৎ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সেই জগৎও বস্তুগত্যা চৈতন্যস্বরূপ। তোমার বুদ্ধি অপরিপক্ক; তাই এখন চৈতন্য যেন তোমার নিকট চেত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং এই কারণেই তুমি তাহাকে সৃষ্টিরূপে দর্শন করিতেছ; কিন্তু যখন জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মিবে, তখন আবার দেখিবে, উহা ব্রহ্ম-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত। যখন স্থির হইল, সৃষ্টি পরমপদ বা ব্রহ্মেরই নামান্তর, তখন জানিয়া রাখ—নানাকারে প্রতীয়মান সৃষ্টি আকাশের আকাশান্তরের ন্যায় সম্পূর্ণই মিথ্যা। চিত্ত হইতে এই সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হই-

য়াছে। যখন চিত্তধ্বংস বা মনোলয় হইবে, তখন ঐ সৃষ্টির ক্ষয় সুনিশ্চয়। যদিও এই সৃষ্টি সেই পরম শান্তিময় পরমপদে বিরাজমান, তথাপি চিত্তের যদি উপশম ঘটে, তাহা হইলে সুবর্ণে কটকজ্ঞানের ন্যায় উহা অসত্য হইয়াই যায়। চিত্তের উদয় হইলে যাহা অসৎ বস্তু, তাহাও আপনা হইতেই সৎ হইয়া থাকে। চিত্তের যখন অনুদয় বা তিরোভাব হয় ও শাশ্বত ব্রহ্মভাবে উদয় বা আবির্ভাব ঘটে, তখন এই অসতী সৃষ্টিরও ব্রহ্মসত্তায় অবসান ঘটিয়া থাকে। সম্বেদন বা চিত্ত অহ-স্তাবে আবিষ্ট হইয়াই সৃষ্টিবিভ্রম আখ্যায় অভিহিত হয়। জানিও—সেই পরব্রহ্ম ঐ সম্বেদন বা চিত্তের অতীত পরম শান্তিময়। তিনি জড় নহেন,—জড়তার সম্পর্ক তাঁহাতে নাই। সুদক্ষ শিল্পী কর্ত্তৃক মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সৈন্য যেমন বস্তুগত্যা মৃত্তিকাস্তূপ হইলেও যুদ্ধাদি সৈনিক-কর্ম্মে নিরত প্রকৃত সৈনিক পুরুষ বলিয়া কখন কখন মনে হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ জনের নিকট এই সৃষ্টি একমাত্র পরম মঙ্গলময় ব্রহ্মস্বরূপ হই-লেও যাহারা অজ্ঞ জন, তাহাদের নিকটই উহা পৃথক্‌ভূত ও নানাবিধ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। ফলতঃ যাঁহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই বা বিকার নাই, সেই একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই পূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপি-রূপে বিরাজ করিতেছেন। এই যে সৃষ্টি বিস্তার দেখিতে পাইতেছ, জানিও—ইহা আর কিছুই নহে; ইহা কেবল সেই ব্রহ্মেই ব্রহ্মের অবস্থান। আকাশে আকাশ, শান্তিময়ে শান্তিময় এবং মঙ্গলময়ে মঙ্গলময়ই বিশ্রাম করিতে-ছেন। ফল কথা, আকাশে যেমন আকাশ, শান্তিময়ে যেমন শান্তি এবং মঙ্গলময়ে যেমন মঙ্গল বিরাজমান, তেমনি এই সৃষ্টিপরম্পরা পরব্রহ্মেই বিদ্যমান; পরব্রহ্ম হইতে ইহার ভেদ-ভিন্নতা নাই। মনে কর, কোন নগর যদি নব যোজন-ব্যাপীও হয়, তথাপি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে ঐ নগরের দূর-বিস্তৃতি যেমন অদূর-বিস্তার হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কোন ক্ষুদ্রায়তন দর্পণে যেমন তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত স্থানব্যাপী বস্তুর প্রতি-বিম্ব-পাত হইলে সে বস্তু দর্পণাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া যায়, পরব্রহ্ম বিষ-য়েও সেইরূপ নিয়মই বিদিত হইবে। ফল কথা, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন; তিনি যদি বুদ্ধিবিম্বিত হয়েন, তবেই তাঁহার পরিচ্ছিন্নতা ঘটিয়া থাকে।

রামচন্দ্র! উল্লিখিতরূপে এই বিশ্বকে সৎ ও অসৎ উভয়ই বলা যাইতে পারে। এই বিশ্ব বুদ্ধিবিম্বিত চৈতন্য বলিয়া সৎ, আবার বিশ্বনামে কোন পদার্থান্তর নাই বলিয়া বিশ্বাকারে উহা অসৎ। এই সৃষ্টি মুকুর-বিম্বিত নগরের ন্যায়, মরীচিকায় জলের ন্যায়, এবং দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় ভ্রান্তিময়; সুতরাং ইহাতে আবার সত্যতা কি? ঐন্দ্রজালিকেরা আকাশে মোহজনক চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে তাহাতে যেমন নগর ভ্রম হয়, তেমনি চৈতন্যময় পরব্রহ্মে অবিদ্যাবলে বিলসিত এই অসার সংসার স-সাররূপে সমুল্লসিত হইতেছে। ঐ অবিদ্যা জীর্ণ বল্লীর ন্যায় যত দিনে না বিচারবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, ততকাল উহা বহুল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করত অতীব গহনাকারে পরিণত হইয়া সুখ-দুঃখ স্বরূপ নানা বন উৎপাদন করিতে থাকে।

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! আমি এই যে স্বর্ণাঙ্গুরীয়াদির ন্যায় মিথ্যা অবিদ্যার কথা কহিলাম, ইহার মাহাত্ম্য যে কতদূর, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে লবণ ভূপতির কথা কহিয়াছি, যিনি পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে ভ্রম দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তথাবিধ ভ্রম দেখিবার পরদিনই আবার সেই মহারণ্যে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। ভূপতি ভাবিলেন,—যেখানে আমি ঘোর দুঃখ পাইয়াছি, অধুনা সেই অরণ্যানী আমার মনোমুকুরে প্রতিফলিত হইয়া স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে। আমার বিশ্বাস, আমি যদি বিন্ধ্যাচলে যাই, তাহা হইলে সেখান হইতে হয় ত কখন বা সেই অরণ্যানী পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিব। মহীপতি লবণ মনে মনে এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া অমাত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়চ্ছলে পুনরায় সেই দক্ষিণাপথাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর আদিত্য যেমন ব্যোম

পথ পরিভ্রমণ করেন, সেই লবণ ভূপতি তেমনি বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত-মনে পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম মহাসাগরের তটভূমি ভ্রমণ করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে কোন এক প্রদেশে তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অরণ্যানী অবলোকন করিলেন। সেই ভীষণ অরণ্যানী দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, উহা যেন সম্মুখবর্ত্তিনী অনন্ত চিন্তা অথবা উহা যেন সাক্ষাৎ পরলোক-ভূমি। ভূপতি সেখানে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বতন ঘটনাবলী একে একে সমস্তই স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া জানিতে লাগিলেন, এবং জানিয়া জানিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন। তিনি তথাকার পুক্কসজাতীয় ব্যাধগণকে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিলেন। এইরূপে সবিস্ময়ে কৌতুকাক্রান্ত-মনে নরপতি সেই মহাটবীর নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহীপতি সেই মহারণ্যের ধূম্র-ধূসরিত প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া তাঁহার সেই ক্ষুদ্র বাসগ্রামখানি দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে ঐ গ্রামেই তিনি একজন পাকা পুক্কস গৃহস্থ ছিলেন। দেখিলেন, সেখানে সেই সেই নর-নারী, সেই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশ্রেণী, সেই সেই নানা জনাশ্রয় সকল, সেই সেই ভূমিতটগুলি, সেই সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্বীয় সহচর জনমণ্ডলী, সেই সেই স্কন্ধবিহীন বিশীর্ণ বৃক্ষরাজি, সেই সেই প্রদেশ এবং সেই সেই বন্ধুবর্জ্জিত স্বীয় ব্যাধজাতীয় সুতগণ, সকলই বর্ত্তমান—সকলেই যথাযথ. স্থানে অবস্থিত। রাজা আরও দেখিলেন, অনাবৃষ্টিরূপ উগ্র অশনিপাতে সেই প্রদেশ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তথায় একটি ক্ষীণাঙ্গী ক্ষীণস্তনী অতিবৃদ্ধা রমণী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে আর্ত্তনাদ করিতেছে; বৃদ্ধার নিকটে আরও কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দুঃখিতভাবে বসিয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা রমণী তাহাদিগের নিকট দুর্ভিক্ষদাব-পতিত আত্মীয় স্বজনগণের দারুণ দুঃখকাহিনী বর্ণন করিতেছে এবং এই বলিয়া রোদন করিতেছে যে,—হা পুত্রি! তিন দিন অনাহারে তোমার দেহলতা জীর্ণশীর্ণ হইয়াছিল, তুমি এক্ষণে কোথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে? আহা! আমার স্মরণ হইতেছে, তোমারই স্বামী অম্বুদবৎ সমুন্নত শৈলের উপরিভাগে

গিয়া সুন্দর গুঞ্জাফল-মালায় মণ্ডিত হইত এবং তালতরুতে আরোহণ করিয়া লোহিতাভ পক্ক ফলগুলি দন্তে ধারণপূর্ব্বক যখন অবতরণ করিত, তখন হনু-মানের ন্যায় লম্ফ দিয়া তালপত্র বনের আশ্রয় লইত। অহো! সে দৃশ্য বড়ই চমৎকার ছিল। আহা! আমার সেই পুত্রস্থানীয় জামাতা—কদম্ব, জম্বীর, লবঙ্গ ও গুঞ্জাবল্লীর মধ্যে মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র লুক্কা-য়িত থাকিত, তাহাদিগের বধের নিমিত্ত বড় বড় লম্ফ প্রদান করিতেন। আহা! কবে আবার আমি তাঁহাকে সেইরূপ লম্ফ দিতে দেখিব। হা বৎস! তুমি যখন তোমার প্রণয়িনীর মুখ হইতে মাংসখণ্ড কাড়িয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে থাকিতে, তখন তোমার সেই তমালপত্র-নিভ সুনীল চিবুক দেশে যে কি অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ পাইত, আমার মনে হয়, কন্দর্পের সৌম্য বদনেও বুঝি বা সে শোভার সমাবেশ নাই। আহা! কুসুমগুচ্ছ-শোভিনী তমালবল্লী যেমন প্রলয় পবনে অপহৃত হয়, আমার মনে লয়, যমুনার সমান নীলকান্তি মদীয় সেই কন্যাটীকেও যমরাজ তাহার স্বামীর সহিত সেইরূপেই অপহরণ করিয়াছেন। আহা! আমার পীনস্তনী স্থূলাঙ্গী পুত্রি! তুমি গুঞ্জাফলের হার ধারণ করিতে, তাহাতে তোমার কতই শোভা হইত। তদীয় দেহশোভা বায়ু-বিচালিত কজ্জলের ন্যায় সমুজ্বল ছিল; বৃক্ষ পত্রের বসন পরিয়া কাল কাটাইয়াছ, তোমার দশনপংক্তি বদরীবীজ ও জম্বুবীজের ন্যায় সুশোভিত ছিল। অহো! আজ তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ। আহা! চন্দ্রপ্রতিম মনোজ্ঞ রাজনন্দন! তুমি আপনার অন্তঃ-পুরিকা বিলাসিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মদীয় কন্যায় অনুরক্ত হইয়াছিলে, কৈ তোমার সেই পত্নী! হায়! সে ত আর নাই। নদীর তরঙ্গরাজির গতির ন্যায় এই সংসারের ঘটনাবলী দেখিলে বড়ই হাস্য উপস্থিত হয়। এই সংসারগতি কি কুকর্ম্মই না ঘটাইয়াছিল! অহো, কোথায় একজন রাজাধিরাজ আর কোথায়ই বা একটা চণ্ডালকন্যা! এমনই সংসারের গতি, সেই উভয়কেই কি না সঙ্গত করাইল! অসম্ভব সম্ভব হইল! বহু মনোরথ-সমাকুল আশা যেমন ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ধনের সহিত বিনাশ পাইয়া যায়, অহো! আমার সেই চকিত-মৃগনয়না কন্যা আর সেই শার্দ্দূলবৎ বলশালী জামাতা উভয়েই কি না সেইরূপই যুগপৎ অস্তগত

হইল। কি দুঃখ! আমি অনাথা হইলাম; যমরাজ আমার কন্যাটীকে এত সত্বরই হরণ করিয়া লইলেন। আমি দুর্দ্দেশে আসিয়া পড়িয়াছি; আমার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। আমি ঘৃণিত নীচ জাতি-কুলে জন্মিয়াছি, মহাবিপদ আসিয়া আমায় ঘেরিয়াছে। কি বলিব, সঙ্গিনীগণ! আমার এত ভয় হইয়াছে যে, আমি নিজেই যেন মুর্ত্তিমতী ভীতি হইয়া পড়িয়াছি অথবা যেন সাক্ষাৎ মহাবিপত্তিরূপেই প্রতিভাত হইতেছি। আহা! বিধির বিধানে আমি এখন অনাথা; বিধাতা আমায় নীচাবমান-জনিত কোপ, ক্ষুধাতুর পোষ্য পরিজনবর্গের প্রতিপালনে অক্ষমতা এবং অসহ্য শোক সহনের আধার, ইত্যাদি অনন্ত দুঃখপুঞ্জের আকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি মহতী মনোব্যথায় ব্যাকুল হইয়াছি। আমার বন্ধু-বান্ধব নাই। আমার ন্যায় দৈবদগ্ধ মূঢ় ব্যক্তির পক্ষে এ হেন ঘোর বিপদে বাঁচিয়া থাকা অথবা মরিয়া যাওয়া উভয়ই সমান কথা। আমি বড়ই মন্দ-ভাগিনী; মনে হয় আমা অপেক্ষা নির্জ্জীব তৃণ-পাষাণাদি জড় পদার্থও শত গুণে শ্লাঘ্য। আমি কুদেশে বাস করিতেছি; আমার আত্মীয় স্বজন কিছুই নাই। যেমন বর্ষাগমে শৈলস্থিত তৃণরাশি সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া অনন্ত বিস্তৃতাকারে পরিবর্দ্ধিত হয়, আমি হতভাগিনী, আমার দুঃখও তেমনি অনন্ত হইয়া উল্লসিত হইতেছে।

হে রাঘব! সেই বৃদ্ধা এইরূপে বিলাপ করিতেছিল, তখন সেই নরপতি তদীয় সঙ্গিনীগণের সাহায্যে তাহাকে সমাশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বল বৃদ্ধা! কে তুমি, তোমার কি হইয়াছে? কে তোমার কন্যা? কেই বা তোমার পুত্র?

তখন মহারাজের কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধা বাষ্পপূর্ণ-নয়নে বলিল,—রাজন্! এই যে গ্রাম দেখিতেছেন, এই গ্রামে আমার স্বামী বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল পুকসঘোষ। তাঁহার ঔরসে আমার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। সেই কন্যাটী আমার রূপে যেন চন্দ্রকলা ছিল। দৈবঘটনায় একদা এক ইন্দ্রপ্রতিম কান্তিমান্ রাজা এই অরণ্যে আগমন করেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধে এবং কন্যার সৌভাগ্যক্রমে সেই রাজাই তাহার পতি হইলেন। তখন মনে হইল, সদা কদাহারকারিণী

করভী যেন সৌভাগ্যবশে অকস্মাৎ অনাবৃত মধুকুম্ভ প্রাপ্ত হইল। এই যে জীর্ণ কানন, এইখানেই আমার কন্যা সেই নরপতির সহিত বহু-কাল সুখভোগ করিয়া বহু পুত্র কন্যা প্রসব করিল। যেমন বৃক্ষের আশ্রয় পাইলে অলাবুবল্লী বর্দ্ধিত হয়, তেমনি সেই কন্যা আমার যোগ্য পতির আশ্রয় পাইয়া নানা ভরণ-পোষণে পরিপালিত হইতেছিল।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বৃদ্ধা চণ্ডালী বলিতে লাগিল,—হে জনেশ্বর! কিয়দ্দিন পরে এই গ্রামে অনাবৃষ্টি জন্য ভীষণ কষ্ট উপস্থিত হইল। তাহাতে গ্রামবাসী লোকদিগের আর দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। সেই মহাবিপত্তির দিনে গ্রামস্থ লোক সকল দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইল এবং কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে পথি মধ্যেই তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দূর দেশে গিয়া একে একে সকলেই মৃত্যুগ্রস্ত হইল। বলিব কি, নর-নাথ! সেই জন্যই আমরা আজ বান্ধব-বিহীন হইয়া এখানে দুঃখভোগ করিতেছি। হে সৌম্য! একদিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে বন্ধুজন-বিয়োগ, এই দুই কারণে আমাদের নয়ন দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহি-তেছে; আমরা শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি। কত দুঃখে যে আমা-দের দিনাতিপাত হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়!

ভূপতি লবণ সেই বৃদ্ধা চণ্ডালীর মুখে ঐ সকল দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্বীয় অমাত্যবর্গের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি পুনঃপুন সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীর বিষয় মনে মনে আলোচনা করিলেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোক-

বৃত্তান্তদর্শী নরপতি করুণাক্রান্ত হইয়া যথাযোগ্য দানমানাদি দ্বারা সেই সকল চাণ্ডালীর দুঃখ মোচন করিলেন এবং কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থানপূর্ব্বক নিয়তির বিচিত্র গতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আসিবামাত্র পুরবাসীরা তাঁহার অভিনন্দন করিল, তিনি পুরপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর প্রভাতে ভূপতি সভামণ্ডপে আগমন করিলেন এবং বিস্ময় সহকারে আমাকে তখন এই কথা কহিলেন,—মুনিবর! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; সেই স্বপ্ন কেন আবার আমার প্রত্যক্ষ হইল? নরপতি এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার নিকট নিখিল নিগূঢ় তত্ত্ব যথাযথ বিবৃত করিলাম; তাহাতে আকাশ হইতে সমীর-তাড়িত জলদাবলীর ন্যায় নরপতির হৃদয় হইতে সমস্ত সংশয় অপসারিত হইল। হে রঘুনন্দন! মহতী অবিদ্যাই এইরূপে লোকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া দিয়া অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ করিয়া তোলে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! স্বপ্ন এইরূপে কি করিয়া সত্য হইল? এ বিষয় মহতী ভ্রান্তির ন্যায় আমার মনে একটা গভীর সন্দেহ রহিয়াছে; কিছুতেই তাহা অপনীত হইতেছে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! অবিদ্যায় সকলই সম্ভব হয়। এই একমাত্র অবিদ্যার এমনি প্রভাব যে, উহাতে স্বপ্ন-দর্শনাদি ব্যাপারে ঘটেও পটত্ব ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে; মুকুরে যেমন পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব-পাত হয়, তেমনি উহারই প্রভাবে দূরও নিকটের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে; সুখনিদ্রায় অতিপাতিত যামিনীর ন্যায় যাহা দীর্ঘকাল, তাহাও শীঘ্রভাব ধারণ করে, অধিক কি, স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় মৃত্যু-সন্দর্শনের ন্যায় যাহা একান্ত অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হইয়া পড়ে; স্বপ্নকালীন গগন-গতির ন্যায় অসৎও সৎস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। নিজের ভ্রম জন্মিলে অচলা ভূমিও যেমন চলিতেছে বলিয়া মনে হয়, অবিদ্যাবলে স্থির পদার্থও তেমনি চলিত হয়; মদিরোন্মত্ত মানুষের চিত্তে সমগ্র দৃশ্য যেমন বিচলিত বলিয়া বোধ হয়, তেমনি যাহা অচল পদার্থ, অবিদ্যাবলে তাহাও চলিত হইয়া থাকে। বাসনা-বলিত চিত্ত যেরূপে যাহা ভাবনা করে, সে তাহা সেইরূপই সত্বর অনুভব করিতে

থাকে ; বলিতে কি, তাহা যদি অসৎও হয়, তথাপি তাহা সৎ হইয়া দাঁড়ায়। ‘তুমি, আমি’ ইত্যাদি সংস্কারময়ী বৃথা অবিদ্যা যখনই প্রকট হইয়া পড়ে, তখনই অনাদি অমধ্য অনন্ত ভ্রমপরম্পরা সমুদিত হইয়া উঠে। প্রতিভাস বশতঃ সকলেরই বৈপরীত্য ঘটে ; যাহা ক্ষণ, তাহা কল্প হয়, এবং যাহা কল্প, তাহাও ক্ষণ হইয়া থাকে। অবিদ্যায় চিত্ত বিপর্য্যস্ত হইলে জীব আপনাকে মেষাকার অবলোকন করে ; সেই মেষ আবার বাসনাবশে আপনিই সিংহাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ অবিদ্যাই বিষম ভ্রমের জননী ; অবিদ্যা হইতেই চিত্ত-বিপর্য্যাস জন্মে এবং সেই চিত্ত-বিপর্য্যাস-বশেই মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। আপনার চিত্তস্থ বাসনা বশতই মহারম্ভময় লৌকিক ব্যবহার-পরম্পরা কাকতালীয়বৎ পরস্পর সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদিও সকলই চিত্ত-কল্পনা, তথাপি সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম বশতঃই লোকে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয়। পূরাকালে ঐ চণ্ডাল-পল্লীতে কাহারও হয়ত ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই ঘটনা সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, এই বর্ণিত লবণ ভূপতির মনে তাহাই বা প্রতিভাত হইয়াছিল। বলিতে পার, উহা হইল এক প্রকার স্মৃতি ; সেই যে স্মৃতি, তাহা ত অনুভূত বিষয়েরই হয়। লবণ রাজার যে চণ্ডালী-বিবাহাদি, তাহা ত তাঁহার অনুভূত বিষয় বলিয়া বলা যায় না ; সুতরাং কিরূপে তাহার স্মৃতি হইল ? এই কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বকৃত মনের ক্রিয়া যদি সুদৃঢ়ও হয়, তথাপি তাহার বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে ; অন্য দিকে আবার যাহা কদাচ করা হয় নাই, ‘করিয়াছি’ বলিয়া তাহারও স্মরণ হয়, ইহা ত নিশ্চিতই। সুতরাং বলা যায়, লবণ ভূপতিরও তাহাই ঘটিয়াছিল। অনেক সময়ে এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে ভোজন করিল, ভোজনের পর শয়ন করিয়া স্বপ্নাবস্থায় দেশান্তরে গিয়া মনে মনে স্থির করিল, আমার ভোজন করা হয় নাই। এরূপ স্বপ্ন ঘটনা প্রাকৃত লোকেও হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন যেমন বহু পূর্ব্বকথা হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, লবণ ভূপতির অন্তরেও তেমনি বিন্ধ্যাচলস্থ চণ্ডাল-পল্লীর ঘটনাবলী প্রতিভাসিত হইয়াছিল। অথবা ঐ রহস্য এরূপ ভাবেও বুঝিয়া লইতে পার যে, লবণ ভূপতি তৎকালে যাহা স্বপ্নে

দেখিয়াছিলেন, বিন্ধ্যবাসী চণ্ডালদিগের চিত্তেও তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; কিম্বা এরূপও ধরিয়া লওয়া যায় যে, লবণ ভূপতির চিত্ত প্রতিভাস বিন্ধ্যবাসী চণ্ডালদিগের চিত্তে এবং বিন্ধ্যবাসী চণ্ডালদিগের চিত্ত-প্রতিভাস লবণ ভূপতির চিত্তে সমুদিত হইয়াছিল। একই সময়ে একই প্রকৃতির কল্পনা যে অনেকের চিত্তে আবির্ভূত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে। দেখ, বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন চিন্তাশীল কবির মানসিক রচনা অনেক সময় অবিকল একইরূপ হয়, এইরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি অবিকল একইরূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করে। এই সকল স্বপ্নানুভূত বিষয়ও অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সত্তাবশতঃই সত্য হইয়া থাকে। ফল কথা, সম্বেদন বা অধিষ্ঠান-চিৎসত্ত্ব ভিন্ন কোন পদার্থেরই পৃথক্‌সত্তা নাই। চিন্ময়—সর্ব্বাধার, তাঁহারই সত্তায় নিখিল বহিরন্তর বিষয় সত্যরূপে সমুদ্ভাসমান। ব্রহ্মচৈতন্য সত্য-স্বরূপ, তিনিই ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হইয়া চৈতন্য-সত্তা হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত—জলে তরঙ্গ এবং বীজে বৃক্ষ। ফলে, জল ও তরঙ্গ এবং বীজ ও বৃক্ষ পরস্পর এক হইলেও তরঙ্গ জল হইতে এবং বৃক্ষ বীজ হইতে পৃথগাকার ধারণ করে বলিয়া পৃথকের ন্যায় প্রতিভাসিত হয় বটে; কিন্তু বস্তুগত্যা উহারা একই পদার্থ। সম্বেদনের সত্তা ভিন্ন পদার্থনিবহদিগের যে সত্তা, তাহা আছে বলিলেও চলে আর নাই বলিলেও বলিতে পারা যায়। সম্বিত্তির উদয়েই তাহার অস্তিত্ব, আর অনুদয় কালেই তাহার অভাব হইয়া থাকে। উল্লিখিত সত্তা অসত্তা উভয়ই ভ্রান্তি সম্বেদনের অধীন।

রামচন্দ্র! এই যে অবিদ্যা বিভূতির বর্ণন করিতেছি, বালুকাময় স্থানে তৈলাদি দ্রব বস্তু পড়িলে, তাহার যেমন কোনই সত্ত্বা থাকে না, তেমনি ঐ অবিদ্যাভিধেয় কোন পদার্থেরই সত্তা উক্ত ব্রহ্মচৈতন্যে নাই। বুঝিয়া দেখ, সুবর্ণবলয়ে সুবর্ণাতিরিক্ত আর কি পদার্থ আছে যে, তাহাকে সুবর্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বলা যাইবে? যদি বল, চৈতন্যের সহিত উহার সম্বন্ধ আছে; সুতরাং উহাকে একটা পৃথক্ বস্তু বলা হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যার সহিত আত্মতত্ত্বের কোন সম্বন্ধই নাই বা হইতেও পারে না। পরস্পর সমান বস্তুরই সম্বন্ধ হইতে

পারে এবং তাহা আপন অনুভবেও স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু অবিদ্যা ও আত্মতত্ত্ব এই উভয় ত পরস্পর সমান বস্তু নয়; কাজেই ঐ উভয়ের সম্বন্ধ সম্ভবিতে পারে কি? বলিতে পার, পার্থিবত্ব ও দ্রবত্ব এই দুইরূপ সমান ও অসমান অংশের যোগে ত জতুকাষ্ঠাদির সম্বন্ধ দেখা যায়; এ কথার উত্তরে বলিব, এই প্রকার সম্বন্ধ ঐ প্রস্তাবিত অবিদ্যা ও ব্রহ্ম, এই দুই অসদৃশ বিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিতই হইতে পারে না; কেন পারে না? তাহার কারণ এই, ঐ যে জতুকাষ্ঠাদি, উহারা একমাত্র অবিদ্যারই বৈভব। দৃষ্টান্ত পৃথক্ পদার্থের সহিতই হইয়া থাকে; উহারা ত অবিদ্যা হইতে পৃথক্ নহে। নিখিল প্রপঞ্চের সহিত অবিদ্যার বা অবিদ্যা-বিলাসের সম্বন্ধ বিদ্যমান, সুতরাং উহাকে সদ্বস্তু বলা চলে না; বিশেষতঃ অবিদ্যার সহিত আত্মতত্ত্ব বা চৈতন্যের যখন কোনই সম্বন্ধ নাই, তখন উহার সদ্বস্তুতা একবারেই সুদূর-পরাহত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরস্পর সদৃশ বস্তুরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে, ইহা স্পষ্টতঃই অনুভব-লভ্য হয়। বলিতে পার, যতুকাষ্ঠের পার্থিব ও দ্রব এই দুই অসমান অংশ যোগের ন্যায় উহাও অসমান হইলেও পরস্পর সেইরূপই সম্বন্ধ-সম্পন্ন। এ কথায় বলিব, জতুকাষ্ঠের যোগ উল্লিখিত অসদৃশ যোগের দৃষ্টান্ত-যোগ্য নয়; কেন নয়, তাহার কারণ এই যে, জতুকাষ্ঠও সেই অবিদ্যারই বিকার মাত্র। জতুকাষ্ঠ যখন একমাত্র অবিদ্যা, তখন তাহা পরস্পর সদৃশ হইবে না কেন? আর এক কথা, ঐ অবিদ্যাপ্রপঞ্চকে যদি চৈতন্যেরই সমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চিতের সহিত উহাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঐ সম্বন্ধে চিতির প্রভাবেই পাষাণাদি জড় বস্তুনিচয়ের প্রকাশ ঘটে, এরূপ বলা যাইতে পারে সত্য; পরন্তু ঐ রূপ সম্বন্ধ কল্পনা করা অপেক্ষা এই জাগতিক যাবতীয় পদার্থপুঞ্জ যখন চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ, তখন ইহা বলাই সঙ্গত যে, পরস্পর চিতির স্বপ্রকাশতা-প্রভাবে আপনা হইতেই উহারা প্রকাশমান হইতেছে। এক্ষেত্রে চিতির সহিত সম্বন্ধ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। পরস্পর বিসদৃশ পদার্থপুঞ্জের পরস্পর সম্বন্ধ-সঙ্ঘটন যখন অসম্ভব এবং পরস্পর পরস্পারের অসদ্ভাবে যখন তাহাদের পরস্পর অনুভব দুর্ঘট, বিশেষত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়ের সমত্বাভাবে যখন জ্ঞান প্রাপ্তি দুর্ল্লভ, তখন এই কথা

বলাই ভাল যে, সদৃশ বস্তুই সদৃশ বস্তুর সহিত একতা অর্থাৎ আভাস-চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যের স্বারূপ্য সম্প্রাপ্ত হইয়া একতাবশতই স্বীয় স্বরূপের প্রকাশ করিয়া থাকে, অন্যথা প্রকাশ করা অসম্ভব। চৈতন্যের জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা, এই ত্রিপুটীরূপে মূঢ় জনগণের নিকট যে অনুভব হইয়া থাকে, তথা-বিধ অনুভব যে জড়-চৈতন্যের অভেদসম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়া হয়, তাহা বলা চলে না। কেন না, জড় ও চৈতন্য পরস্পর সম্পূর্ণই বিলক্ষণ; এই বৈলক্ষণ্য বশেই উহাদের একরূপতা কদাপি সম্ভবিতে পারে না। জড় বস্তু জড় বস্তুর সহিত মিলিয়া গিয়া হয় ত অতি জড় হওয়া সম্ভব; কিন্তু একই ত্রিপুটী-পট-চিত্রে চৈতন্য ও জড় উভয়ের মিলন অসম্ভব। যদি জড়ত্ব অঙ্গীকার না করিয়া চিন্ময়ত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে ত একমাত্র চৈতন্যেরই উপলব্ধি হয়, তাহাতে কাষ্ঠ-পাষাণাদি যে কিছু জড় পদার্থ, তাহার আর অনুভূতি হইতে পারে না। কেন পারে না? তাহার কারণ এই যে, কাষ্ঠপাষাণাদি চিন্ময় নয়; উহারা জড়। কাষ্ঠাদি জড় পদার্থ সকল গৃহাদি বিভিন্ন পদার্থভাবে পরিণত আকারেই অনুভূত হইয়া থাকে; পরন্তু চিদুপলব্ধি সেরূপে হইবার নয়। জিহ্বা জলীয় ইন্দ্রিয়, তাই তাহার দ্বারা সজাতীয় জল-বিকার রস গৃহীত হয়; এখানেও সজাতীয় পদার্থের একীভাবকেই সম্বন্ধ বলিয়া বিদিত হইবে; সুতরাং অসজাতীয় জড় ও চেতনের ঐরূপ সম্বন্ধ কখন হয় হয় না। এই সকল আলোচনায় বুঝা যায়, কাষ্ঠ-পাষাণাদি জড় নয়, একমাত্র চিৎই সকল রূপে বিরাজমান; কাষ্ঠপাষাণাদি চৈতন্যেরই বিলাস। ঐ সকল চিতের সহিত একীভাব লাভ করিয়াই দ্রষ্টৃ দৃশ্য প্রভৃতি ভ্রম উদ্ভাবন করে। ফলতঃ যে কিছু কাষ্ঠ-পাষাণাদি পদার্থ, সকলই সেই পরমার্থ চৈতন্যস্বরূপ। তবে কথা এই,—আত্মাতে যে চৈতন্যময় দৃশ্য সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহা কল্পিত; কল্পিত সম্বন্ধ অনুসারেই দৃশ্যতা ব্যবহার হয়, সে সম্বন্ধ বাস্তব চিদ্রূপে হয় না।

হে তত্ত্বজ্ঞপ্রবর! এই সর্ব্ববিধ পদার্থ-পরিপূর্ণ সমগ্র বিশ্বকে তুমি সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়াই বিদিত হও; কেন না, অসীম অনন্ত ব্রহ্মই সর্ব্বথা সর্ব্বভাবে বিরাজমান। এই বিশ্ব মিথ্যাত্ব-বোধে মিথ্যা হয়, মিথ্যা হইলেও উহা সত্যরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে; সুতরাং এ বিশ্ব লক্ষ লক্ষ ভ্রমে

পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ ঐ সকলই একমাত্র অপূর্ব্ব চিদ্বিলাস মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সঙ্কল্পরাজিরূপ নগরনিচয় নরগণের নিকট যেরূপে আপন বিলাস প্রদর্শন করিতেছে করুক, দেশ-কালের নিরোধ করিতে গিয়া অস্মাদৃশ ব্যক্তিবর্গের এই সৃষ্টিব্যাপার মধ্যে ঐরূপভাবে অবস্থান করা বিধেয় নহে। পক্ষান্তরে মনোরাজ্যের অধিবাসীরা যেমন পরস্পর সকলেই নিস্পন্দ,—কেহই কাহারও কিছুই করে না; তেমনি মিথ্যা জ্ঞানের উপশম ঘটিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই নিস্পন্দ বা নিঃস্বভাব; সকলেরই সার—সেই একমাত্র চিৎ। তত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, বোধকালে কি সৃষ্টি, কি সৃষ্টির অন্তর্গত দেশকালাদি, কিছুই থাকিবার নয়; ভেদ বোধকালে সৃষ্টি, সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী দেশকালাদি এবং 'অহং' 'মম' প্রভৃতি সকলই আছে বলিয়া স্ফূর্ত্তি পায়। সুবর্ণে যে কটকাদি জ্ঞান জন্মে, উহাকে বাস্তবিকই ভ্রম বলা যায়। কেন না, প্রকারান্তরে সুবর্ণই কটকাদি হইয়া শোভা পায়; সুবর্ণের সত্তাতেই কটকাদি সত্তা লাভ করে। যদি ভেদজ্ঞান পরিহার করা যায়, তাহা হইলে কটকাদি একমাত্র সুবর্ণাকারেই প্রতীত হইবে। এইরূপে ভেদদৃষ্টি বা ভেদজ্ঞান নিবন্ধন যাহা পৃথক্ অবিদ্যার বৈভব বলিয়া বোধ হইতেছে, ঐ ভেদদৃষ্টি বা ভেদজ্ঞান পরিহার করিলে তাহা আর উপলব্ধ হইবে না—একমাত্র বিমল ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। বোধব্যক্তি একই বস্তু, তাই এই সৃষ্টি সৎ বিশ্বকে কখন অসৎ করিয়া তোলে, আবার অসৎ বিশ্বকে কখন সৎ অর্থাৎ সদেক-রসতায় উপনীত করিয়া থাকে। মৃত্তিকা বলিয়া জ্ঞান থাকিলে বিচিত্র মৃন্ময়ী সেনা যেমন মৃত্তিকা বলিয়াই মনে হয়, জল যতই কেন নানা তরঙ্গ-ভঙ্গময় হউক, জল জ্ঞানে উহা যেমন জল বৈ আর কিছুই নয়, কাষ্ঠপুত্তলিকা যত রকমেরই হউক, কাষ্ঠজ্ঞানে উহা যেমন কাষ্ঠই এবং কুম্ভ, কুণ্ড, শরাব, সকলই যেমন মৃত্তিকা জ্ঞানে মৃত্তিকা, তেমনি এই যে ভ্রম-কল্পিত ত্রিজগৎ, জানিবে—একমাত্র চৈতন্য-জ্ঞানে ইহা একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই।

রামচন্দ্র! দৃশ্যের সহিত দৃষ্টির সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দৃশ্য ও দৃষ্টির অভ্যন্তরে দ্রষ্টার যে দ্রষ্টৃ, দৃশ্য ও দর্শন, এই ত্রিবিধ ভেদ-বিরহিত স্বরূপ এবং

উল্লিখিত ত্রিপুটীর যাহা সাক্ষীর ন্যায়, তাহাকেই পরমপদ বলিয়া বিদিত হইবে। অথবা এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতেছে, এক বিষয় ছাড়িয়া বিষয়ান্তরের আকারে পরিণত হইতেছে, ঐরূপ ভাবের অন্তরালে চিত্তের যে জড়তা-বিরহিত স্বরূপ, তাহাকেই তুমি পরমপদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। চিত্তের যে জড়তা-বিরহিত সম্বিৎ-মনন, তুমি নিত্য কাল তন্ময়ভাবেই অবস্থান কর। জাগ্রৎ নাই, স্বপ্ন নাই, নিদ্রা নাই, এইরূপ অবস্থায় তোমার যে অজড় অচেতন সনাতন রূপ বিরাজ করে, তুমি সতত তন্ময় হইয়াই অবস্থিত হও। শিলার জড়ত্ব পরিহারে তাহার হৃদয় যেমন চিদ্ঘন হয়, তুমি সমাধিমগ্ন কিম্বা ব্যবহার-পরায়ণ, যেরূপ অবস্থাতেই অবস্থান কর না কেন, নিয়ত তন্ময় বা চিদ্ঘন হও। এ সংসারে কাহারও কিছুই উদয় বা বিলয় হয় না, তুমি যেমন কোন অবস্থায়ই থাক না, পরমার্থ দৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়া যথাসুখে অবস্থান করিতে থাক। দেহ বিষয়ে পুরুষের কোথাও কিঞ্চিৎ বাঞ্ছা বা বিদ্বেষ নাই, ইহা জানিয়া তুমি নিঃশঙ্কভাবে সুস্থ হইয়া অবস্থান কর; কোনরূপ দৈহিক ব্যাপারে সমাসক্ত হইও না। যেমন ভবিষ্যৎ ব্যবহার্য্য বিষয়ে চিত্তের কোনওরূপ আসক্তি থাকে না, এই বর্ত্তমান অবস্থাতেও তেমনি তুমি মিথ্যাত্বদর্শী হইয়া চিত্তকে অনাসক্ত বা উদাসীন করিয়া তোলো। চিত্তবৃত্তিতে কদাচ অবস্থান করিও না। এইরূপ করিলে তুমি সত্যাত্মতা লাভ করিতে পারিবে। যে লোক দূর দেশে আছে, সে যেমন থাকিলেও না থাকারই মত এবং দারু-শিলা নিকটে থাকিলেও অচেতন বলিয়া তাহার যেমন কোনই আসক্তি বা অভিমানই নাই, আপনার চিত্তকে তুমি সেইরূপই অর্থাৎ থাকিলেও না থাকারই-প্রায় করিয়া তোলো। প্রকৃতই যদি বিবেচনাপূর্ব্বক আত্ম-স্বরূপে ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে চিত্তের অচিত্ততাই প্রতিপন্ন হয়; ইহা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের অনুভব-সিদ্ধ। যেমন শিলাতে জল নাই, জলে অনল নাই, তেমনি আপনাতেই যখন চিত্ত নাই, তখন পরমাত্মাতে তাহা থাকিবে কিরূপে? যাহাকে দেখিতে গেলে, থাকে না, সে যদি কখন কিছু করে, তবে সে করা বস্তুতঃ কিছুই নহে। ফল কথা, যাহার মৌলিক সত্যতা নাই, তাহার কার্য্যে কি কখন সত্যতা থাকিতে পারে?

তুমি এই প্রকার বিচার করিয়া চিত্তপথের অতীত হইয়া অবস্থান করিবে। যাহা একান্ততই অনাত্মভূত, সেই চিত্তের যদি কেহ অনুবর্ত্তন করে, তবে গ্রামপ্রান্তস্থ ম্লেচ্ছের অনুবর্ত্তী হওয়াই তাহার পক্ষে সঙ্গত নয় কি? তুমি সর্ব্বদা চিত্তরূপ চণ্ডালকে অবজ্ঞার সহিত দূরে পরিহার করত মৃন্ময় প্রতিমা প্রভৃতির ন্যায় নিশ্চল হইয়া নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান করিতে থাক। চিত্ত আমার নাই, পূর্ব্বেও কখন ছিল না, পরেও রহিবে না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি পাষাণময়ী প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থিত হও। তুমি বিচার দৃষ্টিতে দেখিতে যাও, চিত্তকে দেখিতে পাইবে না। এ দিকে পরমার্থ পক্ষেও তুমি চিত্ত-বিরহিত; সুতরাং কেন আর তবে অনর্থ-নিদান চিত্ত কর্তৃক চালিত হইয়া কদর্য্য কার্য্যে কলুষিত হইতেছ? যাহারা চিত্তরূপ মিথ্যা যক্ষের বশীভূত হয়, তাহাদের বুদ্ধি অতি স্থূল। তাদৃশ লোকদিগের নিকট চন্দ্র হইতেও বজ্র-বহির্গম সম্ভব হইয়া থাকে। তুমি চিত্তকে দূর করিয়া স্থির হইয়া থাক এবং পরম যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান দ্বারা ভবভাবনা হইতে মুক্তিলাভ কর। যাহা অসত্য বা অবিদ্যমান, তাদৃশ চিত্তের যাহারা অনুবর্ত্তন করে, তাহাদিগকে আকাশের বিনাশ-কর্ম্মেই বৃথা কাল-কর্ত্তনকারী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অতএব তথাবিধ অজ্ঞ অকর্ম্মণ্য লোক ধিক্কারেরই পাত্র।

হে রাঘব! তুমি তত্ত্বজ্ঞানে তৎপর হইয়া অগ্রে মনের বিলয় করিয়া লও, পশ্চাৎ সেই জ্ঞান-বলে অমলাত্মা হইয়া ভবপারে উপনীত হও। আমি দীর্ঘ দিন বহু বিচার করিয়া দেখিয়াছি, পরন্তু অমল আত্মাতে মানস মল কিছুই কখন পাই নাই।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুরুষ জন্মিবামাত্র কিঞ্চিৎ বুদ্ধি বিকসিত হইবার পর—ইহ জন্ম বা জন্মান্তরানুষ্ঠিত নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ঘটিলে,

তাহার পক্ষে সৎ-সঙ্গ-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা, যদি সৎসঙ্গ ও ও সৎশাস্ত্রালোচনা না করা হয়, তাহা হইলে এই যে অনবরত বেগবাহিনী অবিদ্যা-নদী সকল, ইহাদিগের পর-পারে উপনীত হওয়া যায় না। সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে পুরুষের যখন বিবেকোদয় হয়, তখন তাহার কি হেয়, কি উপাদেয়, এরূপ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। উল্লিখিত বিচার-ক্ষমতা লাভ করিবার পর পুরুষ পূর্ব্বোক্ত শুভেচ্ছা-নামধেয়া বিবেকভূমিতে উপনীত হইয়া থাকে। ক্রমে বিবেকবশতই বিচারণানাম্নী দ্বিতীয় জ্ঞানভূমিকায় অধিরূঢ় হয়। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা অসম্যক্ বাসনাকে জয় করিবার পর সংসার-ভাবনা হইতে পুরুষের মন ক্ষীণভাব ধারণ করিতে থাকে। এই সময় পুরুষ পূর্ব্বোক্ত তনুমানসা নাম্নী তৃতীয় বিবেকভূমিতে পদার্পণ করে। যখন যোগমার্গে বিচরণ করিতে করিতে পুরুষের সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয়, তখনই সত্ত্বাপত্তিভূমিকা উপস্থিত হয়। এই সত্ত্বাপত্তি অবস্থার অভ্যুদয়ে বাসনা যখন ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন পুরুষ অসংসক্ত আখ্যায় অভিহিত হয়। অর্থাৎ তৎকালে তাহার আর কোন বিষয়ে আসক্তি থাকে না এবং সে কর্ম্মফলেও আবদ্ধ হয় না। উল্লিখিতরূপে বাসনা ক্ষয় হইয়া গেলে তখন অসত্য বাহ্য বিষয়ের ভাবনাকেও ক্ষীণ করিতে অভ্যাস করেন। ফলতঃ তৎকালে 'আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাকার ভাবনায় পুরুষের একেবারেই বাহ্যার্থের বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। যোগী তখন সমাধি অবলম্বনে বাহ্যার্থ-বিরহিত হইয়াই থাকুন, কিম্বা ব্যুত্থিত অর্থাৎ স্নান-ভোজনাদি অসত্য সংসারব্যাপারে লিপ্ত অথবা অভ্যাসবশে বাহ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতই হউন, তাঁহার মন স্বাত্মাতে অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি তখন কোন বিষয়ের কিছুই দর্শন করেন না, রুচিপূর্ব্বক কোন বিষয়েরই সেবা করেন না ও চিন্তা করেন না, কি করিলাম, না করিলাম, তাহাও স্মরণ করিয়া রাখেন না, সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে বিস্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে থাকেন। বাসনা-ক্ষয়ে কেবল মূঢ়বৎ অর্দ্ধসুপ্ত ও অর্দ্ধপ্রবুদ্ধরূপে বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ অবস্থায় যোগী আপনার চিত্তকে একমাত্র সূক্ষ্মতম ব্রহ্মরসময় করিয়া লয়েন এবং তৎকালে বাহ্য বিষয়ের ভাবনা-রাহিত্যরূপ যোগভূমিকায় অধিরোহণ করেন।

এইরূপে চিত্তকে অন্তর্লীন করিয়া কতিপয় বর্ষ যাবৎ ব্রহ্ম ভাবনা অভ্যাস করিতে থাকেন। অনন্তর যোগী ব্যক্তি বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহার তদ্গত ভাবনা একেবারেই থাকে না। তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন এবং ঐ অবস্থায় তথাবিধ যোগীকে জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত করা হয়। তৎকালে ইষ্ট বস্তু লাভ করিলেও তাঁহার হর্ষোদয় হয় না এবং অভীষ্ট বিষয় না পাইলেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন না, কেবল নিঃশঙ্ক বা নিরাতঙ্কভাবে যথাবিষয়েরই অনুবর্ত্তন করিতে থাকেন।

হে রঘুনন্দন! যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, সকলই তুমি অবগত হইয়াছ। তোমার বাসনাও সর্ব্বকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তুমি শরীরস্থ বা শরীরাতীত যে কোন অবস্থাতেই অবস্থান কর না কেন, কদাচ হর্ষ বা শোকের বশ্য হইবে না। তুমিই যে নিরাময় আত্মা, ইহাই স্থির নিশ্চয় কর। হে রাম! স্বচ্ছ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বগামী, সর্ব্বদা সমুদিত পরমাত্মাই তুমি; সুতরাং তোমার সুখ-দুঃখ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? জনন-মরণের কথা কহিবে?—তাহাই বা তোমার কি নিমিত্ত হইবে? তোমার ত কোন বন্ধুই নাই; সুতরাং সে জন্যই বা তুমি শোক করিতেছ কেন? এই আত্মা অদ্বয়, ইহাঁর আবার দ্বিতীয় বান্ধব কে আছে? বল দেখি, লোকে যে বন্ধুদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে, সে কি তাহাদের দেহের জন্য অথবা আত্মার জন্য শোক করিয়া থাকে? যদি বল দেহের জন্য শোক করে, তদুত্তরে বলিব, দেহ ত নশ্বর, তাহার জন্য আবার শোক কিসের? দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে, কেবল কতকগুলি ভৌতিক পরমাণু-সমষ্টিই দৃষ্ট হয়; সুতরাং অচেতন দেহের জন্য শোক করা উচিত হয় কি? যদি বল, মৃত বন্ধুর আত্মার নিমিত্ত শোক করিতে হয়। ইহার উত্তরে বলিব, আত্মা অমর—অবিনশ্বর; তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ বৃথা। আত্মার আবির্ভাব-তিরোভাব নাই। তিনি অবিনাশী; তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে হইবে কেন? তুমি আপনি অবিনাশী, তথাপি বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া শোক করিতেছ, ইহা একান্তই অমূলক। আত্মা স্বচ্ছ, অবিনশ্বর, তাঁহার কখন বিনাশ আছে কি? দেখ, ঘট ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খোলা হইয়া গেলে, তাহাতে ঘটাকাশ নাশ পায় না; এইরূপ এই শরীরের

নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না। মরীচিকায় নদী বুদ্ধি নাশ পাইয়া গেলেও তদবস্থিত তীব্র সৌরাতপের যেমন বিনাশ ঘটে না, তেমনি দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মার নাশ হয় না, তিনি যেমন, তেমনই থাকেন। রাম! তোমার অন্তরে কেন বৃথা ভ্রান্তি বা বাঞ্ছার উদয় হয়? তুমি ত অদ্বিতীয় আত্মা; আত্মা আবার দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি বাঞ্ছা করিবেন কেন?

হে রাঘব! এ জগতের যত কিছু শ্রবণীয়, দর্শনীয়, স্পর্শনীয়, আস্বাদনীয় ও আঘ্রাণীয় বস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে এমন কোন একটা বস্তুই নাই, যাহাকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলা যায়। আত্মা অব্যক্ত, সুবিস্তীর্ণ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন; তাঁহাতে যে এই নিখিল সৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান, তাহা আকাশস্থ শূন্যতারই ন্যায় বিদিত হইবে। হে রঘুবংশধুরন্ধর! আমি ত এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ত্রিলোকীরূপিণী কামিনী চিত্ত হইতেই আবির্ভূত হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে ক্রমশঃ জন্ম লাভ করতঃ ভ্রম উদ্ভাবন করিতেছে। বাসনার অবসানই উক্ত চিত্তের উপশম। সম্যক্‌রূপে বাসনাবসান হইলেই এই নিখিল ক্রিয়াদি শক্তির আধারভূতা মায়া আপনা-আপনিই বিলয় পাইয়া যায়। উহার জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না।

হে রঘুনাথ! এই সংসার যেন একটা বিপুল পেষণযন্ত্র; বাসনা ইহার অধঃস্থ শিলার মধ্যবর্ত্তী শঙ্কুসংলগ্ন রজ্জুস্বরূপ। তুমি যত্নের সহিত এই রজ্জুরূপিণী বাসনাকে ছেদন করিয়া ফেলো। এই অনন্ত বাসনা যত দিন অপরিজ্ঞাত রহিবে, ততকাল উহা মহামোহ উৎপাদন করিবেই করিবে। পরন্তু ঐ বাসনাকে যখন তুমি বিদিত হইবে, তখন উহাই আবার ব্রহ্মপদ প্রদানপূর্ব্বক অশেষ সুখদায়িনী হইবে। এই বাসনা ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা সংসারভোগের পর স্বীয় লীলাস্বরূপ অধ্যাত্ম-বিদ্যাবলে ব্রহ্মস্মৃতি লাভ করিয়া পুনরায় সেই ব্রহ্মেই গিয়া বিলীন হয়। হে রঘুনন্দন! তেজ হইতে প্রকাশ যেমন প্রকট হয়, তেমনি রূপবর্জ্জিত অপ্রমেয় নিরাময় শিব হইতে এই সমগ্র ভূত আবির্ভূত হইয়াছে। বৃক্ষ-পত্রে শিরা বা রেখারাজি, জলে তরঙ্গমালা, সুবর্ণে কটকাদি ও অনলে উষ্ণতাদির ন্যায় এই জগত্রয় বাসনাত্মক ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত, ব্রহ্মেই

অবস্থিত এবং জানিবে—তাঁহারই অংশস্বরূপে উহা প্রতিভাত। সেই ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তাঁহাকে জানা হইলে, ত্রিজগতের কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না; সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই ত্রিজগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা। যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তথাবিধ মহামনা যোগিগণই কেবল শাস্ত্রীয় ব্যবহারার্থ সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের চিৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়সমূহের দৈবাৎ সংযোগ সংঘটিত হইলেও মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে জীবন্মুক্তদিগের যে হর্ষামর্ষ-বিহীন অনুভূতি, তাহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ আত্মা বলিয়া অভিহিত; পরন্তু মূঢ়গণের অনুভূয়মান সংসারস্বভাব আত্মা নহেন। চিদাত্মা আকাশ হইতেও সমধিক শুদ্ধ ও স্বচ্ছ; তাঁহাতেই এই জগৎ পৃথক্ পদার্থের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে। যাহা বিশুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্য, ঐ জগতের প্রিয় বা অপ্রিয়রূপে তাঁহার বিবেচনাশক্তি নাই বলিয়া জগৎ ও কূটস্থ সাক্ষীর অন্তরালে আবার বুদ্ধি বিম্বিত হয়। সেই চিদ্‌বিম্বিত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণই লোভ-মোহাদি ভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে। এইরূপে ঐ জগৎ, জগদ্‌গত বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রযুক্ত লোভ-মোহাদি, ইহারা পরস্পর মিথ্যা পার্থক্যে বিভিন্ন হইয়া চিদাত্মায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে, বস্তুতঃ উল্লিখিত সমস্তই আত্মস্বরূপ; আত্মা হইতে উহাদিগকে অতিরিক্ত বস্তু বলা যায় না।

রামচন্দ্র! এই জন্যই বলিতেছি, তুমি অদেহ; একমাত্র নির্ব্বিকল্প চিৎই তোমার আকার। সেই চিদ্‌ব্যতীত তোমার আর আকারান্তর নাই। সুতরাং কেন তবে লজ্জা, ভয় বা বিষাদ-জনিত মোহ আসিয়া তোমায় ঘিরিতেছে। প্রকৃতই তুমি দেহবিহীন, তথাপি মূর্খ জনের ন্যায় কেন এরূপ দেহ-সম্ভূত লজ্জাভয়াদি মিথ্যা বিকল্পজালে অভিভূত হইতেছ? যাহারা অসম্যগ্‌দর্শী, দেহ নাশ হইলে তাহাদেরও যখন অখণ্ড চিৎস্বরূপ আত্মার কদাপি নাশ নাই, তখন যিনি সম্যগ্‌দর্শী জন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য আছে কি? রাম! এ জড় শরীর আত্মা নহেন। যিনি সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি; আকাশমার্গেও যাঁহার গতাগতি রোধ ঘটে না, সেই চিত্তকেই তুমি পুরুষ বা সংসারী আত্মা বলিয়া বিদিত হইবে। এই দেহ

থাকুক, আর নাই থাকুক, ত্রিজগতে পুরুষ বিজ্ঞই হউন আর অজ্ঞই হউন, তিনি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। দেহ নাশের সহিত তাঁহার নাশ কদাপি দৃষ্ট হয় না। এই যে বিচিত্র দুঃখপরম্পরা দেখিতেছ, এতৎসমস্ত দেহধর্ম্ম বলিয়াই বিদিত হইবে। উহাদের সহিত চিন্ময়াত্মার কোনই সম্বন্ধ নাই। কেন না, তিনি কাহারও গ্রাহ্য নহেন। যিনি মনোমার্গের অতীত বলিয়া শূন্যবৎ বিরাজ করিতেছেন, সেই চিৎ সুখ-দুঃখাদির গ্রাহ্য হইবেন কিরূপে? ভ্রমর যেমন কমল হইতে উড়িয়া গিয়া আকাশপথ অবলম্বন করে, সেই সংসারী আত্মা তেমনি দেহপিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠা-ভূত পরমাত্মায় উপনীত হয় অর্থাৎ তাঁহারই সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। তখনও ঐ সংসারী আত্মার অভ্যস্ত বাসনা সমূলে নির্ম্মূল হয় না বলিয়া একেবারেই তাহার মুক্তি ঘটে না।

হে রাঘব! এই জীবভূত আত্মতত্ত্ব যদি অসৎই হয়, তথাপি এই দেহপিঞ্জর বিধ্বস্ত হইলে তোমার কি কিছু নষ্ট হইবে? কিছুই নহে। সুতরাং কেন আর তুমি শোক করিতেছ? মদীয় উপদেশ শ্রবণ কর। ঐ জীবভূত আত্মতত্ত্বকে তুমি সত্য বলিয়া ভাবিতে থাক; পরন্তু উহাকে তুমি ভ্রান্ত অসৎ দেহাদিরূপে ভাবনা করিও না। যিনি নিরিচ্ছ নির্ম্মল-স্বভাব, তথাবিধ আত্মার কোন ইচ্ছাই নাই। কেন না, তিনি নিত্য পূর্ণ-ব্রহ্মভাবেই পরিতৃপ্ত। চিদাত্মা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, নির্ব্বিকল্প, সম ও সাক্ষিভূত; এই জগৎ তদীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেই তাঁহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। রশ্মি যেমন শ্রেষ্ঠ মণিতে আপনা হইতেই প্রতিভাসিত হয়, তেমনি আপনিই এই জগৎ স্বচ্ছ, সম, নির্ব্বিকল্প সাক্ষিভূত আত্মাতে প্রতিবিম্বা-কারে দৃষ্ট হইতেছে। দর্পণ ও দর্পণপ্রতিবিম্বের যেমন ভেদ ও অভেদ ব্যবস্থা, জানিবে—আত্মা ও জগতেরও ভেদ ও অভেদ ব্যবস্থা সেইরূপ। যেমন সূর্য্যের সন্নিধান-মাত্রেই যাবতীয় জগদ্ব্যবহার সম্পন্ন হয়, চিতির সত্তা মাত্রেই তেমনি এই জগৎক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! উল্লিখিতরূপে এই জগৎস্থিতির সাকারতা নিরাকৃত হইল। আমি মনে করি, সভাস্থ শ্রোতৃগণও অন্তরে উহাকে আকাশ, বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন। প্রদীপের সত্তামাত্রে আলোক যেমন স্বভা-

যতই প্রকাশ পায়, তেমনি আত্মতত্ত্বের সত্তায় এই জগৎস্থিতি স্বাভাবিকই হয়। গগনের নীলবর্ণতা বস্তুগত্যা মিথ্যা হইলেও লোকলোচনে ঐ নীল গগন যেমন ইন্দ্র-নীলমণিময় মহাকটাহবৎ অবলোকিত হয়, তেমনি পরমাত্মা হইতে প্রথমোদিত মন মিথ্যা হইলেও আপন বিকল্পপরম্পরায় বিশাল জগৎস্বরূপে বিস্তৃতি লাভ করে বলিয়া উহা সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। সঙ্কল্পক্ষয়ে চিত্ত যখন গলিয়া যায়, এই সংসার-মোহরূপিণী হিমকণিকা তখন আপনা হইতেই বিগলিত হয়। ঐ সময় শরৎকালীন আকাশবৎ স্বচ্ছ একমাত্র চিন্মাত্রই প্রত্যগাত্মরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। ঐ চিন্মাত্র বা চৈতন্যের আদি নাই, জন্ম নাই; বা অন্ত নাই।

হে রাঘব! প্রথমতঃ পরমাত্ম তত্ত্ব হইতে মন সমুদিত হয়। অনন্তর সেই মনই চিদ্‌বিম্বিত পদ্মযোনি প্রভৃতি জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া বালকের বেতাল-বপুঃকল্পনার ন্যায় এই বিবিধাকার বিশ্বকে বৃথাই বিস্তার করিয়া থাকে। এই মন যদিও অসৎ, তথাপি আপনার অধিষ্ঠানচৈতন্যে জগদাকার ধারণপূর্ব্বক বাহ্য দৃষ্টিতে সৎস্বরূপে লক্ষিত হইতেছে। উহা মহার্ণবগত তরঙ্গমালার ন্যায় বারম্বার পূর্ণ ব্রহ্মে উত্থিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে!

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

উৎপত্তি-প্রকরণ সম্পূর্ণ।